সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরলভী র.

গবেষণামূলক স্মারকগ্রন্থ



সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরলভী মেমোরিয়াল লাইব্রেরি
এন্ড সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ

সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরলভী র. গবেষণামূলক স্মারকগ্রন্থ

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা

প্রফেসর ড. এম. শমশের আলী
প্রফেসর ড. আ. র. ম. আলী হায়দার মুর্শিদী
কবি মাওলানা রুহুল আমিন খান
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
অধ্যক্ষ আ. খ. ম. আবু বকর সিদ্দীক
আহমদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী

সম্পাদক

মাসুক আহমেদ

সম্পাদনা পর্ষদ

ড. মুহাম্মদ নুরুন্নবী আল আজহারি
মুফতি মফিদুল ইসলাম আহমাদী
আবদুল্লাহ যোবায়ের
মীর মুদ্দাসসির আহমাদ
জাবেদ বিন ফারুকী
মোহাম্মদ মঈন উদ্দিন আলম
মুহাম্মাদ নাহিদ সারোয়ার
শিহাব উদ্দীন
মুহাম্মাদ ফাহিম মুন্সী

সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরলভী মেমোরিয়াল লাইব্রেরি এন্ড সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ

সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরলভী র. গবেষণামূলক স্মারকগ্রন্থ

প্রকাশকাল

দ্বিতীয় সংস্করণ

জমাদিউস সানি ১৪৪৩ হিজরী

জানুয়ারি ২০২২ ইং

প্রথম প্রকাশ

জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৩ হিজরী

ডিসেম্বর ২০২১ ইং

গ্রন্থস্বত্ব ও প্রকাশক

সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরলভী মেমোরিয়াল লাইব্রেরি

এন্ড সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ

ছত্নরা শরীফ, কুতুবুল ইরশাদ আল্লামা প্রফেসর আব্দুল খালেক (রাঃ)'র মাযার শরীফ রোড, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

যোগাযোগ : ০১৬৭৭-০৫২৬৫৮

প্রচ্ছদ

জাহিদ মোস্তাফি

হাদিয়া

৫৫০ টাকা মাত্র (পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)

Sayyid Ahmad Barelvi Memorial Library & Center for Islamic Research

sayyidahmadbarelvicenter@gmail.com

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ॥ ৭

অভিমত

প্রফেসর ড. এম. শমশের আলী ॥ ৯
ড. আ.ফ.ম আবু বকর সিদ্দিক ॥ ১১
অধ্যাপক ড. সিদ্দিকুর রহমান নিজামী ॥ ১৩
ড. মুফতি মুহাম্মদ কাফীলুদ্দীন সরকার সালেহী ॥ ১৪
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন ॥ ১৬
আ. খ. ম আবু বকর সিদ্দিক ॥ ১৭
মুফতি সৈয়দ সালেহ আহমাদ মামুন আল হোসাইনী ॥ ১৮
আহমদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী ॥ ২০

প্রথম অধ্যায় : জীবনধারা

হযরত সাইয়্যেদ আহমাদ বেরলভী রহ. : মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন খান ॥ ২১
শহীদে বালাকোট সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) : আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী ॥ ৫০
হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ. : আবুল হাসান আলী নদভী ॥ ৬৬
আহ্‌মদ শাহীদ, সায়্যিদ বেরীলবী : ইসলামী বিশ্বকোষ ॥ ৬৯
Life Sketch of Syed Ahmed Shahid : Maulana Syed Abul Hasan Ali Nadwi ॥ ৭৯
Sayed Ahmad Shaheed : Board Of Editors ॥ ৯৭

দ্বিতীয় অধ্যায় : দর্শন ও চিন্তাধারা

সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) ও তাঁর আদর্শের প্রাসঙ্গিকতা : প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামান ॥ ১০১
মুসলিম চেতনায় বালাকোট ও সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহঃ) : কাযী মুহাম্মদ আবুল বয়ান এম. আর. রহমান হাশেমী ॥ ১০৭

সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.), উপমহাদেশের ইসলামী চেতনার বাতিঘর : মারজান আহমদ চৌধুরী ॥ ১২৪
শতাব্দীর রেনেসার নায়কের ডাক : মাওলানা এ. এস. এম. আতহার উদ্দীন মোল্লা ॥ ১৩২
চিন্তাবিদগণের চোখে বেরলভী রহঃ : মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন ওয়াইসী ॥ ১৩৫

তৃতীয় অধ্যায় : আক্বীদা ও অপবাদ খন্ডন

তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া ও ওয়াহাবী মতবাদ : মাওলানা মোঃ নূরুল ইসলাম ॥ ১৩৯
হযরত সায়্যিদ আহমদ বেরেলভী (র.) ও উপমহাদেশের সুন্নিয়াত : ড. মাওলানা এ. কে. এম মাহবুবুর রহমান ॥ ১৪৮
হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহ.) : আহমদুল ইসলাম চৌধুরী ॥ ১৫২
মোজাদ্দেদ সাহেব প্রসঙ্গে : মুহাঃ মুবারক আলী রহমানী ॥ ১৫৫

চতুর্থ অধ্যায় : তাসাওউফ

মুহাম্মদীয়া তরীকা : আল্লামা শায়খ বোরহানুদ্দীন উয়েসী ॥ ১৭২
তাসাউফের মহান মুর্শিদ: ইমামুত তরিকত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ) : অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম ॥ ১৭৩
খোদাপ্রদত্ত জ্ঞান : মাওলানা মো. গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী ॥ ১৭৬

পঞ্চম অধ্যায় : বুক রিভিউ

মোহাম্মদ রুহুল আমীন বশীরহাটি র. প্রণীত কারামতে আহমদীয়া : সত্যের অদম্য উচ্ছ্বাস : মোহাম্মদ মঈন উদ্দিন আলম ॥ ১৮০
উইলিয়াম হান্টারের “দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস” ও সায়্যিদ আহমাদ বেরলভী রহ. এর ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনঃ একটি বিশ্লেষণ : মুহাম্মাদ ফাহিম মুন্সী, মুহাম্মাদ নাহিদ সারোয়ার ॥ ১৯০

ষষ্ঠ অধ্যায় : স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস ও অবদান

উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী'র অবদান : মোহাম্মদ সাইফুল হক সিরাজী ॥ ২০৬
ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র বিপ্লব ও আমিরুল মোমিনীন সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ : মুহাম্মাদ রবিউল হক ॥ ২১৫
ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সিংহপুরুষ সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহ.) : এম এ বাছিত (আশরাফ) ॥ ২১৯
সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)-এর আন্দোলন : মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান ॥ ২২৬
সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (রহ.) ও বালাকোটের যুদ্ধ : এবাদত আলী ॥ ২৩১
বিভ্রান্তি অপনোদনে তাঁহার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান : মাওলানা মুহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দীক্ব ফারুক্বী ॥ ২৩৪

ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানের ভূমিকা : সত্যেন সেন ॥ ২৩৭
জেহাদ আন্দোলনে বাংলার ভূমিকা : মাওলানা এ.এস.এম. আতহার উদ্দীন মোল্লা ॥ ২৪৬
পাক-ভারতে ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন : দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ॥ ২৫৭
প্রকৃত স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি : আল্লামা গোলাম আহমাদ মোর্তজা ॥ ২৬৫
ইতিহাসের এক উপেক্ষিত বীর শহিদ শের আলী খান আফ্রিদি : আকতারুল ইসলাম ॥ ২৭৩

সপ্তম অধ্যায় : বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ

Tariqah-i-Muhammadiyah Movement: An Analytical Study : Prof. Dr. Muin-ud-Din Ahmad Khan ॥ ২৭৬
Sayyid Ahmad Shahid's Campaign Against the Sikhs : Prof. Dr. Muin-ud-Din Ahmad Khan ॥ ২৯০
Sayyid Ahmad Shahid & Structural Review of His Islamic Khilafat (State) : Dr. Shah Ebadur Rahman ॥ ৩১২
Struggle For Islamic State And Society: An Analysis Of Syed Ahmad Shaheed’s Jihad Movement : Dr. Sultan Mahmood, Hafiz Nasiruddin, Dr. Muhammad Rizwan ॥ ৩২৬
Mysticism, Religious Mobilization and Islamic Revivalism in British India: An Assessment of Mujahideen Movement after 1831 : Waqar Ahmad, Ajaz Khan ॥ ৩৪৩
Sayyid Ahmad Shahid's Role in Islamic Revivalism: A Critique : Dr. Abdullah Khan ॥ ৩৫৭

অষ্টম অধ্যায় : বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ

খিলাফত ও খুলাফায়ে রাশেদিন : ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান ॥ ৩৭৬
আওলাদে রাসুলের মর্যাদা : আহমাদ আমিন ॥ ৩৮০
সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা রক্ষায় সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহঃ)’র সিলসিলার অবদান : জাবেদ বিন ফারুকী ॥ ৩৮৭
ইসলামে মুজাদ্দিদের গুরুত্ব: একটি পর্যালোচনা : ড. মুহাম্মাদ মোফাজ্জেল হোসেন ॥ ৪১৩
জিহাদের উদ্দেশ্য : অধ্যাপক আবদুল খালেক এম. এ. ॥ ৪৩১
শরীয়তের দৃষ্টিতে মুজাহিদ ও শহীদের মর্যাদা : এস. এম. নাজমুস সাকিব ॥ ৪৪১
মুজাহিদ ও শহীদ হিসেবে হযরত সায়্যিদ আহ্মাদ শহীদ বেরলভী (রহ.) এর মর্যাদা : মাওলানা মুহিব্বুল ইসলাম চৌধুরী ॥ ৪৪৪

নবম অধ্যায় : সিলসিলা ও অবদান

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি (রহ.), উপমহাদেশের কালজয়ী মুসলিম দার্শনিক ॥ ৪৪৯
শাহ্ আব্দুল আযীয দিহ্লবী : জীবন ও চিন্তাধারা : অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ ॥ ৪৫৩
ইতিহাসের নায়ক মহাবীর তিতুমীর : আহমাদ রায়েদ ॥ ৪৭১

বাংলা-আসামের হিদায়াতের দিশারি মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) : মোহাম্মদ মিফতাহুল ইসলাম তালহা ॥ ৪৭৩
অমর বালাকোট-সংগ্রামী : নোয়াখালীর মাওলানা গাজী ইমামুদ্দীন বাঙ্গালী রাহ. : শরীফ মুহাম্মদ ॥ ৪৮৪
মর্দে মুজাহিদ সূফি নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী (১৭৯০- ১৮৫৮) : জীবন ও অবদান : মাসুক আহমেদ ॥ ৪৯১
বাঙ্গালী ফারসী কবি সূফী ফৎহ্ 'আলী (রঃ) : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ॥ ৫০২
শিক্ষা বিস্তার ও সংস্কারে ফুরফুরার পীর আবূ বকর সিদ্দীকী (র) : ড. আ. র. ম. আলী হায়দার ॥ ৫০৮
نبذة من حياة الشيخ العلامة العارف بالله مولانا كرامت علي الجونبوري الهندي ثم البنجلاديشي الحنفي (1290هـ/1873م). وكتابه "الملخص" : الدكتور مولانا محمد سيف الإسلام الأزهري الحنفي القادري ॥ ৫৩৬

দশম অধ্যায় : সাক্ষাৎকার

ড. মুহাম্মাদ আহসান উল্লাহ ফয়সালের সাক্ষাৎকার ॥ ৫৪৩

একাদশ অধ্যায় : উম্মাহর ঐক্য

ঐক্যের আহ্বান : প্রফেসর মাওলানা সালাহ উদ্দিন ॥ ৫৫২
ঐক্যের সংকটে উত্তরণ ভাবনা : মুফতি মফিদুল ইসলাম আহমাদী ॥ ৫৫৫
দিওয়ান-ই আযীয ও সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. সিলসিলার ফয়েজঃ একটি পর্যালোচনা : আহমদ সানী বোরহান ॥ ৫৬৯

দ্বাদশ অধ্যায় : মাকতুবাতে সায়্যিদ আহমাদ বেরলভী (রহঃ) ॥ ৫৭৭

কবিতা

রায় বেরেলীর জঙ্গী পীর : ফররুখ আহমদ ॥ ৫৮০
বালাকোট ডাক দিয়ে যায় : রুহুল আমিন খান ॥ ৫৮২
বালাকোট : হোসেন মাহমুদ ॥ ৫৮৪
দুটি কবিতা : আবদুল মুকিত চৌধুরী ॥ ৫৮৬
বালাকোট আমার অহংকার : মুহাম্মাদ রায়হান চৌধুরী আল-আহমাদী ॥ ৫৮৮
অভিন্ন নদীর স্রোত : মাসুক আহমেদ ॥ ৫৯০
Dedicated Poem : Mo'min Khan Mo'min ॥ ৫৯১

সম্পাদকীয়

সকল প্রশংসা স্তব-স্তুতি মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য। সুন্দরতম দরূদ ও সালাম মহানবী আহমাদ মুজতবা মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি। সালাম সকল নবী-রসূল, খুলাফায়ে রাশেদীন, আহলুল বাইত, সাহাবা ও আউলিয়া কেরামের প্রতি। আল্লাহুম্মা আমিন।

সায়্যিদ আহমাদ শহীদ ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় নাম। আখেরী নবী (দঃ) এর মুবারক বংশে তাঁর শুভ আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি ছিলেন নবী নন্দিনী হযরত ফাতিমাতুয যাহরা রা. ও বাবে মাদীনাতুল ইলম হযরত আলী রা. এর সন্তান ইমাম হাসান রা. এর অধঃস্তন বংশ ধারার সুযোগ্য সন্তান। আহলুল বাইতের পবিত্র রক্তধারা যাঁর শিরা উপশিরায় শাহাদাতের অমীয় সুধায় উন্মুখ হয়ে তিনি দ্বীন প্রতিষ্ঠার রাহে বালাকোটের প্রান্তরে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর মহান জীবন যেন পৃথিবীতে শুভাগমন ও সুন্দরতম পরিসমাপ্তির এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ১৭৮৬-১৮৩১ সংক্ষিপ্ত সময়ের জীবনকালে এই মহান ব্যক্তিত্ব বিস্ময়াকীর্ণ অবদান রেখে ইতিহাসে অক্ষয় অমর হয়ে আছেন। যাঁকে পঠন, অধ্যয়ন, অনুসরণে উম্মাহ পেতে পারে ঈমানী জজবার ঐশী প্রেরণা।

তিনি ছিলেন রাব্বে ক্বারীম প্রদত্ত অনন্য ও অলৌকিক প্রতিভার মানসছবি। দ্বীন ও মিল্লাতের বহুমাত্রিক খেদমতে ছিল তাঁর দীপ্ত পদচারণা। তিনি ছিলেন তাঁর পীর ও মোর্শেদ শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দেস দেহলভী রহ.-এর প্রধানতম প্রতিনিধি। বস্তুত মোটাদাগে তিনি ছিলেন ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.-এর ইত্তেবায়ে সুন্নাহ আন্দোলন, ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী রহ.-এর দর্শন ও চিন্তাধারা এবং শাহ আবদুল আযীয দেহলভী রহ.- এর ঐতিহাসিক ফতোয়া বাস্তবায়নের দায়িত্বশীল মুখপাত্র। তিনি শুধু একজন সূফীই ছিলেন না, বরং তিনি নিজেই যেন তাসাউফ। তিনি ছিলেন ত্বরীক্বায়ে মুহাম্মাদিয়ার ইমাম যা কাদিরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, মুজাদ্দেদীয়া ত্বরীক্বা সমূহের সমন্বিত নির্যাস। ইলমে লাদুন্নীর নেয়ামতে ধন্য তিনি ছিলেন একাধারে দ্বীনের মুজাদ্দেদ, ইমামুত তরিকত, খেলাফত আলা মিনহাযুন নববীয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী, দুঃসাহসিক দুর্বার মুজাহিদ, ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রপথিক। এ সমস্ত কিছু মিলিয়ে তিনি শুধু মুসলিম উম্মাহ'র নন বরং বিশ্ব ইতিহাসের আবশ্যিক পাঠ্য বিষয়। আপাত দৃষ্টিতে বালাকোটে দৃশ্যমান পরিসমাপ্তি মনে হলেও তাঁর আদর্শ ও

আন্দোলন সেখানেই থেমে যায় নি, বরং এই ভূখন্ডে পরবর্তীতে সবগুলো ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন ও সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনুপ্রেরণা হিসেবে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, পাকিস্তান আন্দোলন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় সেই অনুপ্রেরণার প্রোজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। মওলানা ভাসানী, মওলানা তর্কবাগীশ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান প্রমুখ স্বাধীনতাকামী নেতাদের জীবনেও রয়েছে সায়্যিদ আহমাদ শহীদের আন্দোলনের প্রগাঢ় প্রভাব। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের জাতিসত্ত্বার নায়কেরা সব সময় নিদারুণভাবে স্বার্থবাদী প্রাচ্যবিদদের অপবাদ ও অপব্যাখ্যার শিকার হয়েছেন। তার চেয়েও দুঃখজনক যে, কিছু প্রাচ্যবীদ ঐতিহাসিকের লেখনী দ্বারা আমাদেরই কেউ কেউ প্রভাবিত হয়েছেন সচেতন কিংবা অসচেতনভাবে। তথ্য সংকট কিংবা স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থে তথ্য বিকৃতির ফলে এখানে প্রকৃত তথ্যের অনুপস্থিতি সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান।

সময় এসেছে, সত্যের অদম্য উচ্ছ্বাসে অবগাহনের। সময় এসেছে, ইতিহাসের এক মহান বীরের বীরত্বগাথা সগৌরবে প্রকাশের। এরকমই এক আত্মিক দায়বদ্ধতা থেকে আমরা উপলব্ধি করেছি, যুগ জিজ্ঞাসার জবাব দিতে এক মজলুম-আওলাদে রসূল, ইমাম, মুজাদ্দেদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামী মুজাহিদের পক্ষে কলম শানিত করবার জরুরত।ত্রাতা-বিধাতা, সৃজনকর্তা মহান আল্লাহ তা'আলাই আমাদের ভরসা।

নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন ক্বারীব ওয়া বাশশিরিল মু'মিনীন; আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী - মু'মিনদের জন্য সুসংবাদবার্তা। এই আয়াতখানা আমাদের প্রেরণার উৎস। দূর্বল অক্ষমদের জন্য তাঁর হাবীব স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ সাল্লামার নেক নেগাহ, আউলিয়া সালেহীনদের তাওয়াজ্জুহই সাহস ও শক্তি।

আন্তরিকতা ও সচেতনতা সত্ত্বেও ভুল-ভ্রান্তি থেকে আমরা নিরাপদ নই। পাঠকবৃন্দের কাছে আবেদন, যে কোনো ধরনের ক্রটি-বিচ্যুতি পেলে আমাদের জানিয়ে সংশোধিত হতে সাহায্য করবেন। সত্যানুসারীদের প্রতি আন্তরিক সালাম।

মুসলমানদের গৌরবময় ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একথা সহজেই উপলব্ধিতে আসবে একটা সময় সমগ্র বিশ্বে নেতৃত্ব দেওয়ার পেছনের রহস্য গুলো কি ছিল? এক কথায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় নিরলস বিচরণ। মুসলিম দেশগুলোর গ্রন্থাগারগুলোতে ছিল জ্ঞানপিপাসুদের ভিড়। তাই আধ্যাত্মিক জ্ঞান চর্চার পাশাপাশি জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় নিজেদের সম্পৃক্ত করায় আমরা পেয়েছিলাম এমন জ্ঞানী যারা একই সাথে ধর্মতত্ত্ববিদ, ও বিজ্ঞানী কিংবা দার্শনিক। মুসলিম বিজ্ঞানী, দার্শনিক, চিকিৎসাবিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ, সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে আজকের বিশ্বসভ্যতা চিরঋণী। সমগ্র বিশ্বে মুসলমানদের সংকটের অন্যতম মৌলিক কারণ- নিজেদের ইতিহাস ঐতিহ্য ভুলে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা থেকে পিছিয়ে পড়া। আজকে মুসলিম সমাজে আচার আছে আচরণ নেই। পূর্নাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ইসলামকে আচারসর্বস্ব ধর্মে পরিণত করার মাধ্যমে আমরা হারিয়েছি বিশ্বনেতৃত্ব। মুসলমানদের কাছে আছে বিস্ময়কর গ্রন্থ বিজ্ঞানময় কুর'আন কিন্তু নেই এই কুর'আন নিয়ে অর্থবহ চিন্তা, ফিকির, গবেষণা। কুরআনের আয়াতগুলোর মধ্যে বড় অংশ জুড়ে রয়েছে বৈজ্ঞানিক নির্দেশনা। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যারা কুর'আন নিয়ে পড়ালেখা করে তারা বিজ্ঞান পড়েনা আবার যারা বিজ্ঞান পড়ে তারা কুর'আন সম্পর্কে অজ্ঞ। এই সমন্বয়হীনতা কতটা আত্মঘাতী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এই পিছিয়ে পড়া জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাতেই। আমাদের সমাজে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু শিক্ষার্থীর সংখ্যা? মৌলিক গবেষকের সংখ্যা?

Revealed Knowledge (ওহীর জ্ঞান) ও Derived Knowledge (চর্চার ফলে আহরিত জ্ঞান) এর সমন্বয়েই জ্ঞান চর্চা পূর্ণতা পাবে। জাতিসত্ত্বার বিকাশে চিন্তার অসীম শক্তিকে চর্চা করতে তাই যুব সমাজকে করতে হবে গ্রন্থাগারমুখী। করতে হবে আবিষ্কারপ্রবণ ও ইতিহাস সচেতন। তাই 'সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরলভী মেমোরিয়াল লাইব্রেরি এন্ড সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। সেই সাথে স্বাগত জানাতে চাই হযরত সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরলভী (র.) এর মতো এক মহান ব্যক্তিত্বের নামে নামকরণের জন্য। যিনি ছিলেন ইলমে তাসাওউফে প্রাজ্ঞ সুফি ও তরিকায়ে মুহাম্মাদীয়ার ইমাম, সংস্কার আন্দোলনে দ্বীনের মুজাদ্দিদ, স্বাধীকার আন্দোলনের

অন্যতম পথিকৃৎ। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেও তাঁকে নিয়ে উচ্চতর গবেষণার গুরত্ব আছে। কেননা, উপমহাদেশের স্বাধীকার আন্দোলনের ইতিহাস রচনায় প্রাচ্যবিদ ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই বিকৃতভাবে ইতিহাসকে উপস্থাপন করেছেন। দেখা যায়, ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধাদের বিদ্রোহী বা সন্ত্রাসবাদী হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরলভী (র.) ও তাঁর আন্দোলনকে 'ওহাবী আন্দোলন' আখ্যা দিয়ে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টাও আমরা দেখতে পাই। তাই প্রকৃত অবস্থা উন্মোচনে ইতিহাসের কষ্টিপাথরে সত্যকে যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আমি আশাবাদী নিয়মিত ভাবে 'সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরলভী গবেষণা স্মারক' প্রকাশনার মাধ্যমে উদ্যোক্তারা সেই প্রয়োজনীয়তা পূরণে সক্ষম হবে। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সহায় হন। সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক শুভকামনা।

প্রফেসর ড. এম. শমশের আলী
পরমাণু বিজ্ঞানী
প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য - বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও সাউথ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়

আওলিয়া কেরামের মাধ্যমে এই উপমহাদেশে ইসলাম এসেছে। খাজা গরীবে নেওয়াজ মইনুদ্দীন চিশতী (র.)'র মাধ্যমে ভারতবর্ষে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাদশা আকবরের প্রবর্তিত দ্বীনে এলাহীর মাধ্যমে তা গভীর সংকটে পতিত হয়। এই সংকটাবস্থা থেকে দ্বীন ও মিল্লাতকে রক্ষার জন্য শায়খ আহমাদ ফারুকী সেরহিন্দী (র.) মুজাদ্দিদ হিসেবে প্রেরিত হন। তিনি মুজাদ্দিদে আলফে সানী অভিধায় ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। পরবর্তীতে যখন উপমহাদেশে ব্রিটিশ বেনিয়াদের অন্যায় শোষণ উৎপীড়ন শুরু হয় ঠিক তখনই অদম্য মনোবল ও রুহানী জজবা নিয়ে মুজাদ্দিদের ভূমিকায় আগমন করেন সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)।

সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর চিন্তাধারা ও আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে যে মৌলিক বিষয়গুলো চিহ্নিত করা যায় সেগুলো হলো- ১। মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) এর ইত্তেবায়ে সুন্নাহ ও বিশুদ্ধ তাসাউফ ২। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শন ৩। শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) এর বিট্রিশ বিরোধী ঐতিহাসিক ফতোয়া।

তিনি তাসাওউফের মুর্শীদ বা শায়খ হিসেবে পেয়েছিলেন শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) এর মতো যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ও আরেফ বিল্লাহকে। বিপ্লবী মুজাদ্দিদ হিসেবে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) বিট্রিশ বিরোধী সশস্ত্র জিহাদ ও সংস্কার আন্দোলনের যে রূপরেখা আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন তা প্রেরণার বাতিঘর। আপাত দৃষ্টিতে তাঁর আন্দোলন বালাকোটে শহীদ হওয়ার মাধ্যমে পরিসমাপ্তি হয়েছে মনে হলেও বাস্তবতা হল এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। বিশুদ্ধ তাসাওউফ চর্চায় তাঁর মাধ্যমে যে তরিকায় মুহাম্মাদীয়া বিকাশ লাভ করেছে সেই ধারাবাহিকতায় তাঁর সিলসিলার উত্তরসূরীদের মাধ্যমে আজও দ্বীনের খেদমত চলমান রয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে বিট্রিশদের লিখিত ইতিহাস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কেউ কেউ এই মহান ব্যক্তিত্বের উপর নানাভাবে অপবাদও দিয়ে থাকেন। বাস্তব সত্য হচ্ছে প্রকৃত ও নিরপেক্ষ গবেষণায় এই অপবাদগুলো নিরেট মিথ্যাচার ছাড়া কিছুই না।

সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী মেমোরিয়াল লাইব্রেরি এন্ড সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চকে ধন্যবাদ যে তারা গবেষণামূলক স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছে। এই মহতী কর্মের সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি রইল আন্তরিক মুবারকবাদ।

ড. আ.ফ.ম আবু বকর সিদ্দিক
প্রাক্তন চেয়ারম্যান, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপমহাদেশের ইসলামী চেতনা পুনর্জাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ হযরত সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরলভী (র.) আমাদের কাছে যে মহান জীবনাদর্শ রেখে গেছেন তা আমাদের প্রতিটি ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামী প্রচেষ্টার প্রেরণা শক্তি হিসেবে কাজ করে। তবে অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বিশেষ করে বাংলাভাষায় এই মহান মনিষী নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান চর্চা খুবই অপ্রতুল।

মুসলিম যুব সমাজের কাছে আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে যদি আমরা যুগাপোযোগী করে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হই তবে আমাদের জাতি সত্ত্বার বিকাশ চরমভাবে ব্যহত হবে। সায়্যিদ আহমাদ শহীদ (র.) যেমন ছিলেন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব অন্যদিকে সমাজ সংস্কারক, স্বাধীনতাকামী বীর মুজাহিদ। তাঁর এই জীবনাদর্শের নানাদিক নিয়ে আলোচনা, চর্চা, গবেষণা করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। 'সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরলভী মেমোরিয়াল লাইব্রেরি এন্ড সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ' প্রতিষ্ঠা সেই কাঙ্ক্ষিত প্রয়োজন পূরণে এক স্বার্থক পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি। সেই সাথে গবেষণামূলক স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা যেন ধারাবাহিকতা রক্ষা করে স্বার্থক ও সফল হয়। সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক দোয়া ও মুবারকবাদ।

অধ্যাপক ড. সিদ্দিকুর রহমান নিজামী
প্রাক্তন চেয়ারম্যান-আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শহীদে বালাকোট, মুরশিদুনা হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব যিনি উনবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে উপমহাদেশের ঘুমন্ত মুসলমানদের অন্তরে ঈমানী চেতনা জাগ্রত করেছিলেন। শাহাদাতে বালাকোটের ইতিহাস রসূল প্রেমিকদের মনে এমন এক অনুপ্রেরণা জোগায় যেখানে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মোহে আচ্ছন্ন দিশাহারা জাতি খুঁজে পায় দ্বীনের জন্য, রসূলের রাহে জীবন বিলিয়ে দেওয়ার রুহানী চেতনা।

আধ্যাত্মিক জগতের মহানায়ক এ মহান ব্যক্তির জীবনাদর্শ আমাদের এই মেসেজ দেয়- আধ্যাত্মিকতা চর্চার পাশাপাশি দ্বীনের প্রয়োজনে যেন জীবন দিতে পিছপা না হই। তাঁর জীবন ও কর্ম আমাদের জীবনকে শাণিত করেছে, আমাদের রক্তধারায় দ্বীনের প্রকৃত চেতনা পুণঃপ্রোথিত করেছে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পুরোধা ব্যক্তিত্ব শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) এর খলিফা সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) ছিলেন তরিকায়ে মুহাম্মাদীয়ার ইমাম। উপমহাদেশে তাঁর সিলসিলার সূত্র পরম্পরা 'সিলসিলাতুয যাহাব' বা স্বর্ণচেইন হিসেবে স্বীকৃত। এই সিলসিলা থেকেই এসেছেন সূফি নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র.), মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী (র.) এর মতো প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব, সূফি ফতেহ আলী ওয়াইসী (র.) এর মতো আশেকে রসূল। প্রবাহিত হয়েছে ফুরফুরা, জৈনপুর, ছারছিনা, ছতুরা, ফুলতলী প্রভৃতি হক সিলসিলা ও দরবার। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার, মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা, খানকা ইত্যাদি নানামুখী দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রকৃত খেদমত এই সিলসিলার মাধ্যমে এখনো বিদ্যমান।

ব্রিটিশদের রচিত বিকৃত ইতিহাসের সাথে সুর মিলিয়ে কেউ কেউ এই মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নানা অপবাদেও লিপ্ত। কিন্তু নিরপেক্ষ গবেষণার দৃষ্টিতে যদি তারা সত্যকে ধারণ করতে চান, প্রকৃত সত্যের মুখামুখি হতে চান তবে তারাও স্বীকার করবেন সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বিরাট নিয়ামত। বিশ্বব্যাপী উম্মাহর ক্রান্তিলগ্নে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সবাইকে সেই চেতনায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমরা তাঁর উত্তরসূরী হয়ে গর্বিত। কিন্তু, রুহানী উত্তরসূরী সেটা শুধু দাবী করার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। জাতির সামনে তাঁর আদর্শ, চেতনাকে দৃশ্যমান করার দায়িত্ব আমাদেরকেই নিতে হবে। মেমোরিয়াল লাইব্রেরি, রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা ও গবেষণামূলক স্মারক প্রকাশের উদ্যোগ সেই দায়িত্ব পালনকে স্বার্থক ও অর্থবহ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এই মুবারক উদ্যোগে আমি পূর্ণ সমর্থন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

ড. মুফতি মুহাম্মদ কাফীলুদ্দীন সরকার সালেহী
গভর্নর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ
সাবেক প্রিন্সিপাল, নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা

ব্রিটিশদের পরাধীনতার শিকল থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার আন্দোলন ও ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) তিনি ২৯ ই নভেম্বর ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের অযোধ্যা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাসহ সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী এক সুসংগঠিত স্বাধীনতা আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। এ আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)। তাঁর আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভারতে একটি অখন্ড ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। তিনি মুসলমানদের কাছে আমীরুল মোমেনীন হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তৎকালীন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অন্ধ্র প্রদেশ থেকে শুরু করে মর্দান পর্যন্ত এ বিশাল অঞ্চলে তিনি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে ইসলামি শাসনব্যবস্থা চালু করেন। তিনি তরিকায়ে মুহাম্মাদীয়া নামে একটি সুফি তরিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

১৮৩১ সালের ৬ই মে মোতাবেক ২৪ যুলকা'দা ১২৪৬ হিঃ সনে পবিত্র জুম'আর দিনে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র.) মানসেহরা জেলার পর্বতময় উপত্যকা বালাকোট ময়দানে শিখদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক জিহাদে শাহাদাৎ বরণ করেন। তাঁর মহান জীবনালেখ্যে রয়েছে গবেষকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উপাদান। বিশেষ করে উপমহাদেশে ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনায় সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর প্রসঙ্গ একটি আবশ্যিক বিষয়। বিশুদ্ধ তাসাউফ চর্চা ও বিকাশে তিনি রেখেছেন অসামান্য অবদান। বাংলাদেশে অধিকাংশ হাক্কানী সিলসিলার উৎসমূলে তার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ। ইসলামী সংস্কৃতির পুনঃপ্রচলন ও দ্বীনের বিশুদ্ধ দাওয়াতের ক্রমবিকাশ তার সিলসিলার উত্তরসূরীদের মাধ্যমে চলমান রয়েছে।

এই মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে উচ্চমানের গবেষণা হলে বর্তমান প্রজন্ম সমৃদ্ধ হবে। এই বিষয়ক উদ্যোগ গ্রহণ প্রশংসনীয়। সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক শুভ কামনা। মহান আল্লাহ তায়ালা এই কার্যক্রমের প্রতিটি পদক্ষেপে সফলতা প্রদান করুন। আল্লাহুম্মা আমিন।

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইমামুত তরীকত, শহীদে বালাকোট হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী র. আমাদের চেতনার বাতিঘর। বাংলাদেশের হক্কানী সিলসিলা ও দরবারগুলোর অধিকাংশই তাঁর উত্তরসূরী। ঐতিহাসিক বালাকোট যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করলেও তাঁর চেতনা ও আদর্শ ইতিহাস থেকে মুছে যায়নি বরং বালাকোট পরবর্তী সকল ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম, বিট্রিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন এমনকি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা যে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র পেয়েছি এগুলোর উৎসমূলেও সায়্যিদ আহমদ শহীদ র. এর আদর্শ ও চেতনা অত্যন্ত সক্রিয়। নেতৃত্বহীন মুসলিম উম্মাহ আজ গভীর সংকটে। বাংলাদেশের মুসলমানরাও এই সংকটের বাইরে না। ইসলামের মূল প্রাণপ্রবাহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উসুল ও আকিদাকে বিতর্কিত করতে সক্রিয় দেশি-বিদেশি কুচক্রী মহল। এই ক্রান্তিলগ্নে প্রয়োজন ইস্পাত কঠিন ঐক্য। সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী র. ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যেমন ভারতীয় মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পয়গাম দিয়েছিলেন সেই চেতনায় আমাদের সকল ভেদাভেদ ভুলে দ্বীন ও ঈমানের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ছাত্রসমাজকে শুধু মেধাবী হলে হবে না। হতে হবে সৎ ও আদর্শ মানুষ। দ্বীন ও দেশের কল্যাণে যুব সমাজের হতে হবে ত্যাগী ও সেবক। এই সকল কিছুর অনুপ্রেরণা আমরা সায়্যিদ আহমদ শহীদ র. এর তরিকা, আন্দোলন ও জ্যোতির্ময় জীবনালেখ্যে দেখতে পাই। তাই এমন আদর্শ মানব সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়। বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ কর্তৃক এই মহান ব্যক্তিত্বের উপর বার্ষিক সম্মেলন আয়োজন হয়ে থাকে। সম্প্রতি ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি প্রতিষ্ঠান দারুননাজাত সিদ্দিকীয়া কামিল মাদ্রাসায় নির্মিত হয়েছে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী রহ. হল। তাই 'সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরলভী মেমোরিয়াল লাইব্রেরি এন্ড সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ' এর উদ্যোগে গবেষণামূলক স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্ববোধ করছি। সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক দোয়া ও মুবারকবাদ।

আ. খ. ম আবু বকর সিদ্দিক

অধ্যক্ষ

দারুননাজাত সিদ্দিকীয়া কামিল মাদ্রাসা, ডেমরা, ঢাকা।

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد-

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অকুতোভয় সিপাহসালার, ইমামুত তরিকত, শহীদে বালাকোট, আমীরুল মু'মিনীন, আওলাদে রাসুল সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরলভী রহ. মেমোরিয়াল লাইব্রেরি এন্ড সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ কর্তৃক প্রকাশিত সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরলভী র. গবেষণা স্মারক নামে প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। সম্পাদক, লেখক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আমার উম্মতের হেদায়েতের জন্য প্রতি শতাব্দীর শেষে অথবা শুরুতে এমন একজন মানুষ প্রেরণ করবেন, যিনি তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে সংস্কার করবেন' - (আবু দাউদ- ৪২৯২)। রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভবিষ্যৎ বাণীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সতেরো শতাব্দীর শেষের দিকে এক মহামানবের আগমন ঘটেছিল ভারতীয় উপমহাদেশে। যিনি সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী রহ. হিসেবে প্রসিদ্ধ। এমন এক সময় তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল যখন ভারতের মুসলমানদের উপর ইংরেজ, শিখ ও হিন্দুদের অত্যাচারের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে ব্রিটিশ, হিন্দু ও শিখদের প্রভাব প্রতিপত্তির ফলে মুসলমানরা তাদের তাহজিব-তামাদ্দুন তথা মূল আদর্শ-সংস্কৃতি ভুলে গিয়ে পাশ্চাত্য ও হিন্দুয়ানি আদর্শ-সংস্কৃতি গ্রহণ করা শুরু করেছিল। এমনকি বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানরা হিন্দুদের পোষাক-পরিচ্ছেদ ব্যবহার করাসহ তাদের নামের পূর্বে "শ্রী শ্রী" শব্দ পর্যন্ত ব্যবহার করত। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সিপাহসালার, তৎকালীন যামানার শ্রেষ্ট মুজাদ্দেদ, তরিকতের ইমাম এবং যুগের শ্রেষ্ট বুজুর্গ ও পীর। ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে তাঁর নাম। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দৌহিত্র এবং হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু (রা.) ও হযরত ফাতেমাতুজ জাহরা (রা.) এর পুত্র ইমাম হাসান (রা.)'র বংশধারার ৩৬ তম অধঃস্তন পুরুষ। তিনি ইমামুল মুহাদ্দিসীন, শায়খুল মাশায়েখ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ

করেন। তিনি অতি অল্পদিনেই ইলমে তাসাউফের সু-উচ্চ মাকামে আরোহণ করেন। তাঁর জীবনী পর্যালোচনা করলে তার আন্দোলন সংগ্রামকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়- দ্বীনী সংস্কার আন্দোলন, আধ্যাত্মিক আন্দোলন (তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া), সশস্ত্র জিহাদ। ন্যায়ের পক্ষে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়েছেন জীবনভর। আজও বালাকোটের সেই ময়দান তাঁর শাহাদাতের গ্লানি মুছে ফেলতে পারেনি। মুছে ফেলতে পারেনি তাঁর স্মৃতিগাঁথা প্রথিতযশা ঘটনাগুলো।

৬ মে ১৮৩১ সালে ঐতিহাসিক বালাকোটে সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহ.)-এর নেতৃত্বে ৭০০ মুজাহিদ নিয়ে শিখ সেনাপতি রনজিৎ সিং-এর ১০, ০০০ শিখ সৈন্যের সাথে মোকাবিলা করেন। হজরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী রহ. এর আধ্যাত্মিক আন্দোলন কত উচ্চ শিখরে ছিল তাঁর সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্তমান সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশের হক্কানী সিলসিলা ও দরবার শরীফ সমূহ দেখলে বুঝা যায়। সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী রহ. আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য 'তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া' নামে একটি তরীকা প্রতিষ্ঠা করেন। এটি হলো চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশেবন্দিয়া ও মুজাদ্দেদীয়া তরিকার সার নির্যাস।

উক্ত স্মারকখানার বিষয়বস্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞানপিপাসু পাঠকবৃন্দ খুবই উপকৃত হবেন। আল্লাহপাক স্মারক সংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল করুন এবং আমাদের সকলের নাযাতের মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন।

আলহাজ্ব মাওলানা মুফতি সৈয়দ সালেহ আহমাদ মামুন আল হোসাইনী
পীর ছাহেব
ঐতিহ্যবাহী ফান্দাউক দরবার শরীফ, নাছিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

আমরা জানি যে ইমাম সায়্যিদ আহমাদ বেরলভী রহ. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধর ছিলেন। সায়্যিদ ছিলেন। তিনি তাঁর নানার উম্মতের ব্যাপারে, নানার দ্বীনের খেদমতে অসীম ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি একাধারে তরিকতের মুর্শিদ ছিলেন, মুজাহিদ ছিলেন, মানব সেবক ছিলেন। তাঁর জীবনকে আমাদের জন্য বড় আদর্শ হিসেবে, আমাদের চেতনার বাতিঘর হিসেবে খুঁজে পাই। বিশেষ করে সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরলভী রহ. এই উপমহাদেশে যেই ব্যতিক্রম কাজ করেছেন সেটা হচ্ছে যে, তিনি আমাদের সমাজে যে সমস্ত শিরক বেদাত ছিলো তার বিরুদ্ধে ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি মজলুম মুসলমানদের আহ্বানে শিখ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য পাঞ্জাবে চলে গিয়েছেন এবং তিনি সেখানে যুদ্ধ করেছেন। তিনি সেখানে খেলাফত কায়েম করেছিলেন তাই তিনি আমীরুল মু'মিনীন উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। তিনি একাধারে তরিকতের ইমাম, আমীরুল মু'মিনীন এবং আমাদের চেতনার স্মারক। তিনি সেই সকল বুযুর্গদের অন্তর্ভুক্ত যারা সূফী, সত্যিকারের আল্লাহওয়ালা মানুষ, যারা একাধারে রূহবানুল লাইল ফুরসানুন ওয়া নাহার অর্থাৎ রাতের বেলা যাঁরা দরবেশ, আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে কাটান, দিনের বেলা যাঁরা দ্বীনের প্রচারের জন্য, প্রতিষ্ঠার জন্য এবং মজলুম মুসলমানদের জন্য খেদমত করে যান।

সুতরাং আমরা তাঁকে স্মরণ করার মধ্য দিয়ে যেমন তাঁর রূহানী ফয়েয লাভ করবো ঠিক তেমনি তাঁর শিক্ষা এবং চেতনায় আলোকিত হয়ে এই সমাজের জন্য, দ্বীনের জন্য আমরা যেন কিছু করতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুক। আমরা যেন আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গানে কেরাম থেকে ফয়েয নিতে পারি, তাঁদের শিক্ষায় আলোকিত হতে পারি। আমরা যেন জীবনের কোনো প্রান্তে আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের পথ থেকে, আমাদের তরিকার ইমামদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হই, আল্লাহর কাছে এই দোয়া করছি।

চেতনার বালাকোট উজ্জীবন পরিষদ কর্তৃক প্রতিবছর সম্মেলন ও স্মারক প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়। আমি মনে করি সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী মেমোরিয়াল লাইব্রেরি এন্ড সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ -এর উদ্যোগে গবেষণামূলক স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ সেই চেতনাকে সমাজের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আরো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক দোয়া ও মুবারকবাদ রইল।

আহমদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী
সহকারী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম অধ্যায়

জীবনধারা

হযরত সাইয়্যেদ আহমাদ বেরলভী রহ.

মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন খান *

নাম ও বংশ পরিচিতি

তাঁর নাম সাইয়্যেদ আহমাদ। পিতার নামঃ সাইয়্যেদ মোহাম্মদ ইরফান (মৃ. ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে)।[১] মাতার নাম সাইয়্যেদাহ নাজিয়াহ। পরিবারে তিনি নাজাহ নামে পরিচিত ছিলেন।[২] দাদার নাম সাইয়্যেদ মোহাম্মদ নূর আল্ হুসাইনী র.।[৩] তিনি আমীরুল মিল্লাহ শায়খুল ইসলাম কুতুবুউদ্দীন আহমদ ইবন মুহাম্মদ মাদানীর বংশধর ছিলেন।[৪] কুতুবুদ্দীন আহমদ মাদানী ছিলেন বেরেলভী রহ. এর বংশের উর্ধ্বতন ২০ তম শায়খ। বেরেলভী রহ. ও তাদের বংশধর এ ভূখন্ডের ছিলেন না। বরং তারা মুহাজির হিসাবে এ অঞ্চলে আগমন করেন। বেরেলভী রহ. এর বংশের উর্ধ্বতন পুরুষ কুতুবুদ্দীন আহমদ মাদানী র. দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে এ এলাকায় আগমন করেন।

'তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ' গ্রন্থে উল্লেখ আছে- 'শায়খুল ইসলাম সাইয়্যেদ কুতুবুদ্দীন এক দল মুজাহিদ সাথে করে গজনী থেকে হিন্দুস্তান আসেন। বিভিন্ন স্থানে যাত্রা বিরতির মধ্য দিয়ে 'কড় মানিকপুর' এ আগমন করে তা বিজয়

---

[১]. ড. মতিউর রহমান, **আয়নায়ে ওয়ায়েসী**, পৃ. ৯৬।

[২]. গোলাম রসুল মেহের, **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ,** (মোম্বাইঃ মাকতাবাতুল হক্ক, নতুন প্রকাশ কাল-২০০৮), খ. ১, পৃ. ৮৮; **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ,** খ. ১, পৃ. ১০৭।

[৩]. মাওলানা মোহাম্মদ হামযাহ, **তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ,** (করাচীঃ শাকীল মুঞ্জিগা প্রেস, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৬ সাল), পৃ. ২৬।

[৪]. আব্দুল হাই ইবন ফখরুদ্দীন আল হুসায়নী, (১৮৬৯-১৯২৩ সাল), **নুযহাতুল খাওয়াতির ওয়া বাহজাতুস সামি' ওয়ান নাওয়াযির,** (বৈরুতঃ দারু ইবন হাযাম, ১ম সংস্করণ-১৯৯৯ সাল), খ.৭, পৃ. ৯০০; প্রোফেসর আব্দুল হাফীয, **তা'য়ারিফে জামাতে মুজাহিদীন,** (লাহোরঃ নো'মানী কুতুব খানা), পৃ. ৩৫।

করার পর তিনি এ কড় মানিকপুরেই তাঁর স্থায়ী নিবাস গড়েন।[৫] এখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন এবং সমাহিত হন।[৬]

এখানে বলাবাহুল্য যে, সাইয়্যেদ কুতুবুদ্দীন রহ. ভারতবর্ষে মূলতঃ ইসলামী হুকুমত কায়েমের নিমিত্তেই হিযরত করেছিলেন। যা তাঁর জীবনীগ্রন্থ থেকে জানা যায়। যে বিষয়ের আলোচনা 'সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ' নামক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।[৭]

"মাখযানে আহমদী"র বর্ণনানুযায়ী এ মহান আমীরুল মু'মিনীনের বংশ তালিকা ৩৪ মাধ্যম হয়ে হযরত আলী রা. পর্যন্ত পৌঁছেছে।[৮] এ বংশ তালিকা দেখার জন্য দেখুন বর্ণনা **"সাওয়ানেহে আহমাদী", "আয়নায়ে উধ",** এবং **"সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ"** গ্রন্থ সমূহেও এরকম উল্লেখ আছে।

জন্ম

সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ বেরেলভী র. ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জুন পলাশী যুদ্ধের ২৮ বছর পর ১২০১ হিজরীর[৯] ৬ই সফর মোতাবেক ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ নভেম্বর সোমবার লাখনৌ থেকে ৪৯ মাইল দূরে অবস্থিত, অযোধ্যার রায়বেরেলীর এক ঐতিহ্যবাহী সায়্যিদ পরিবারে দায়রায়ে হযরত শাহ আলীমুল্লায়[১০] জন্ম গ্রহণ করেন।[১১]

জিহাদের প্রেরণা

শৈশবকাল থেকেই শরীয়ত সম্মত খেলাধুলার প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল।[১২] বিশেষতঃ সেনাদের মত শক্তি ও নেতৃত্বব্যঞ্জক জিহাদী খেলাধুলার প্রতি। অধিক

---

৫. প্রফেসর আব্দুল হাফীয, **তা'য়ারিফে জামাতে মুজাহিদীন,** পৃ. ৩৫।

৬. **তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ,** পৃ. ২৫; **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ,** খ. ১, পৃ. ৬০।

৭. আবুল হাসান আলী নদভী, **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ,** (লাখনৌঃ মাজলীসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম, ৯ম সংস্করণ-২০০১১ হি.), খ. ১, পৃ. ৮২।

৮. আবুল হাসান আলী নদভী, **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ,** খ. ১, পৃ. ১০৯।

৯. কারামতে আহমদীয়ায় উল্লেখ আছে তিনি ১২০২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

১০. মাওলানা মোহাম্মদ হামযাহ, **তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ,** পৃ. ২৬।

১১. গোলাম রসুল মেহের, **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ,** খ. ১, পৃ. ৯২; মাওলানা মোহাম্মদ হামযাহ, **তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ,** পৃ. ২৭; রুহুল আমিন বশিরহাটি, **কারামতে আহমদীয়া,** (নবনূর প্রেস, বশিরহাট, ৩য় সংস্করণ-২০০৫), পৃ. ৫; আলী নদভী, **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ,** খ. ১, পৃ. ১০৯; আলী নদভী, **যব ঈমান কী বাদ বাহারী চলী,** (লাখনৌঃ মাকতাবায়ে ফেরদৌস, ৫ম সংস্করণ-২০০৪ হি.), পৃ. ১৯।

১২. আবুল হাসান আলী নদভী, **যব ঈমান কী বাদ বাহারী চলী,** পৃ. ২০ এবং **তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ,** পৃ. ২৭।

সময় বালক সাইয়্যেদ আহমাদ বালকদের মধ্য থেকে দুটি দলে বিভক্ত করতেন এবং একটি দল অপর দলের উপর আক্রমণ চালাত।[১৩]

'তাওয়ারীখে আযীবাহ' গ্রন্থে উল্লেখ আছে: "সাইয়্যেদ আহমদ বস্তির বালকদের মধ্য থেকে একটি 'লস্কর-ই ইসলাম' দল গঠন করতেন উচ্চস্বরে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে কল্পিত[১৪] 'লস্কর-ই কুফ্ফার' (কাফির সৈন্যদল) এর উপর উপর আক্রমণ চালাতেন এবং ইসলামী সেনাদল জয়লাভ করল এবং কাফের সেনা দল হেরে গেল বলে আকাশ বাতাস মুখরিত করতেন।"[১৫]

খিদমতে খাল্ক ও ইবাদাত বন্দেগী

'মাখযানে আহমাদী' গ্রন্থের লেখক উল্লেখ করেন যে, সাইয়্যেদ সাহেব যখন প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছেন তো তিনি খিদমতে খাল্ক কে স্বীয় আবশ্যক কর্মে পরিণত করেন। দূর্বল, মিসকিন এবং দারিদ্র-অভাবগ্রস্থদের সাহায্যার্থে অস্বাভাবিকভাবে ঝুকে পড়েন। তাঁর এ খিদমতে উঁচু-নিচু ধনী-গরীবে কোন ফারাক ছিল না। সকাল-সন্ধ্যা সবসময় গরীবদের খোঁজ-খবর নিতেন। বিশেষ করে ঘরে ঘরে গিয়ে বিধবা নারীদের। তাদের জন্য ইন্ধন, পানি ও আগুন ইত্যকর যেসব বস্তু তাদের প্রয়োজন তিনি তা বলার সাথে সাথেই আনয়ন করে দিতেন। আবার অনেক সময় এরকমও হত যে, বন্ধু-বান্ধব এবং প্রতিবেশীদের ঘরে প্রবেশ করে যে পানির পাত্র খালি পেতেন তা নিয়ে গিয়ে ভরে আনতেন। আবার এরকমও হত যে, কারো যদি ইন্ধন প্রয়োজন পড়ত সাথে সাথে তিনি জঙ্গলে গিয়ে লাকড়ী কাটতেন অতঃপর স্বীয় চাদরে বেঁধে প্রয়োজনীয় ঘরে পৌঁছে দিতেন। ভ্রাতৃপ্রতিমরা ইহা দেখে তাকে এমনভাবে বকাবকি করত যে, যা শুনলে লোম খাঁড়া হয়ে যেত। কিন্তু তিনি এ বাঁধা-বিপত্তিতে কোন খেয়াল করতেন না বরং স্বীয় ঢং মোতাবেক স্বাভাবিকভাবে নিজের কাজ চালিয়ে যেতেন।[১৬] এ মহান বীর মোজাহিদ শহীদ পীর ছোট বেলা থেকেই উপরে বর্ণিত খিদমতে খাল্ক এর সাথে সাথে ইবাদাত ও যিকরে এলাহীর প্রতি অনেক পরিমাণে আগ্রহশীল হয়ে পড়েন। রাতে তাহাজ্জুদ নামাজে অতিবাহিত করতেন। আর দিনে খিদমতে খালকে অতিবাহিত করতেন। বেশি পরিমাণে দু'য়া মুনাজাত করতেন। এটাই ছিল তাঁর দৈনন্দিন কাজ।[১৭]

---

[১৩]. **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ,** খ. ১, পৃ. ১১০ এবং **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ,** খ. ১, পৃ. ৯২।

[১৪]. উইকিপিডিয়া।

[১৫]. **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ,** খ. ১, পৃ. ৯৫; **তাওয়ারীখে আযীবাহ, বা সাওয়ানীহ আহমদী,** খৃ.০৪।

[১৬]. **মাখযানে আহমদী,** পৃ. ১৩; **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ,** খ. ১, পৃ. ৯৯ এবং **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ,** খ. ১, পৃ. ১১০-১১২।

[১৭]. **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ,** খ. ১, পৃ. ১১২ এবং **তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ,** পৃ. ২৭।

লাখনৌ সফর

হযরত সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভী রহ. এর বয়স যখন ১২ বছর[১৮] তখন তাঁর পিতা মাওলানা সাইয়্যেদ ইরফান ইন্তেকাল করেন। কেউ কেউ বলেন: এ সময় তাঁর বয়স ছিল ১৩[১৯]/১৪[২০]/১৬[২১]/১৭[২২]/১৮[২৩] বছর। তবে গোলাম রসুল মেহেরের মতে এ সময় তাঁর বয়স ছিল ১৭ কিংবা ১৮ বছর। [২৪] একদা লাখনৌর উদ্দেশ্য ১২১৮/১২১৯ হিজরীতে এই সফর করেন স্বীয় ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবের এক দল নিয়ে লাখনৌ এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।[২৫] তাদের এ দল ছিল ৮ জনের।[২৬] এ সফরে সাইয়্যেদ সাহেবের বড় ভাগিনা 'মাখযানে আহমাদী' গ্রন্থের লেখক সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলীও ছিলেন। সাইয়্যেদ সাহেব ব্যতীত অপর সাথীদের কারোর নাম জানা যায় না।[২৭]

তাদের এ সফর কি শুধু কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যই ছিল নাকি অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। সে বিষয়ে কিছুটা বিপরীত মুখী তথ্য পাওয়া যায়।

'ওয়াকায়ে আহমাদী' গ্রন্থকারের মতে হযরত আমীরুল মু'মিনীন এর বয়স যখন ১৭/১৮ বছর হল। তো ইলম ও মা'রেফাতে এলাহী অর্জনের উদ্দেশ্যে রায়বেরেলী এলাকা থেকে রওয়ানা হন।[২৮]

যা হোক, ৮ জন লোকের বাহন ছিল মাত্র একটি ঘোড়া। তারা পালাক্রমে উহাতে আরোহন করতেন। সাইয়্যেদ সাহেব শুরু থেকেই নিজের অশ্বারোহণের হকটি সঙ্গীদের দান করেছিলেন। অর্থাৎ তাঁর অশ্বে আরোহনের পালা আসলে তিনি আরোহন না করে পদব্রজে চলতেন। আর তাঁর হকটি অপর বন্ধুদের অর্পণ

---

[১৮]. **তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, পৃ. ২৭ এবং **যব ঈমান কী বাদ বাহারী চলী**, পৃ. ২০।

[১৯]. গোলাম রসুল মেহের, **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ৮৮।

[২০]. দেখুন- নওয়াব মুহাম্মদ উযীর খান বাহাদুর, **ওয়াকায়ে আহমাদী**, খ.১, পৃ. ৪৭-৪৮।

[২১].আবুল হাসান আলী নদভী, **যব ঈমান কে বাদে বাহারী চাগী**, পৃ. ২০।

[২২]. **তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, পৃ. ২৮; আর সাইয়্যেদ ইমাম আহমাদ ইবন এরফান শহীদ' গ্রন্থে ১৭ বছরের কথা উল্লেখ আছে।-পৃ. ১৯।

[২৩]. 'জগতের সেরা বার আউলিয়া' গ্রন্থে ১৮ বছরের কথা উল্লেখ আছে, পৃ. ২৫৪।

[২৪]. নওয়াব মুহাম্মদ উযীর খান বাহাদুর, **ওয়াকায়ে আহমাদী**, খ.১, পৃ. ৪৯।

[২৫]. কাসিম আহমাদ উসমানী, **বেরেলী সে বালাকোট**, পৃ. ২৩।

[২৬]. আলী নদভী, **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ১১৪; গোলাম রসুল মেহের, **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ১০২; **তা'য়ারিফে জামাতে মুজাহিদীন**, পৃ. ৩৬।

[২৭]. গোলাম রসুল মেহের, **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ১০২-০৩ এবং **জগতের সেরা বার আউলিয়া**, পৃ. ২৫৪।

[২৮]. নওয়াব মুহাম্মদ উযীর খান বাহাদুর, **ওয়াকায়ে আহমাদী**, খ.১, পৃ. ৪৯।

করতেন। রায়বেরেলী থেকে লাখনৌর দূরত্ব ছিল উনপঞ্চাশ মাইল।[২৯] সম্পূর্ণ পথ তিনি পায়ে হেঁটেই অতিক্রম করেন এবং লাখনৌ পৌঁছেন।[৩০]

সময়টা ছিল নওয়াব সা'দাত আলী খানের শাসনামল, যিনি নওয়াব শুজা'উদ্দৌলার উত্তরাধিকারী ছিলেন।[৩১] তারা সেখানে পৌঁছে সবাই রোজগারের তালাশে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু রোজগার ছিল দুর্লভ বস্তু। দিনভর মেহনত করেও কাজের সন্ধান মিলল না। এদিকে হাতের সম্বলও ফুরিয়ে আসছে। সাইয়্যেদ সাহেব নিজের থেকেও তাদের নিয়েই বেশি পেরেশান এবং চিন্তা করছিলেন। শুধুমাত্র সাইয়্যেদ সাহেব জনৈক আমীরের মেহমান হন। যদিও তার নিজের অবস্থাও ততো ভাল ছিল না। কিন্তু তিনি সাইয়্যেদ সাহেবের খান্দানের প্রতি অনেক ভক্তি-সম্মান রাখতেন। এজন্য এ আমীরের নিকট থেকে তাঁর জন্য দু'বেলা ভালমানের খানা আসত। তাঁর জন্য যে খাবার আসত তা তাঁর সাথীদেরকে খাওয়াতেন আর নিজে একটু ডাল রুটি দিয়ে দিন কাটাতেন। এ অবস্থায় তাদের ৪ মাস অতিবাহিত হয়।[৩২]

দিল্লীতে শাহ সাহেবের খেদমতে

অতঃপর একদিন উক্ত আমীরের সর্দার লাখনৌর শাসনকর্তা সম্যবিহারে বের হন এসময় এ দলে তারাও ছিলেন। এ সম্যবিহার সফরের শুরু থেকেই পুরা সফরভর সাইয়্যেদ সাহেব তাঁর বন্ধুদের বার বার এ বলে বুঝাতে থাকেন যে, ভাই! এই সাহচর্য্যে থাকার ইচ্ছা ত্যাগ কর। চল দিল্লী গিয়ে সাইয়্যেদুল মুহাদ্দীসিন শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. এর নিকট থেকে ফয়েয অর্জন করি। তিনি আল্লাহ পাকের অনেক বড় নিশান। কিন্তু তাঁর উপদেশে বন্ধুরা সাড়া দিল না।[৩৩] ফলে নিজেই একাই দিল্লীর উদ্দেশ্য রওয়ানা দেন।

অবশেষে তিনি ১২২২ হিজরী সনে মোতাবেক ১৮০৬ সালে মে মাসে দিল্লী পৌঁছেন।[৩৪] দিল্লী পৌঁছে তিনি শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. খেদমতে উপস্থিত হন। বেরেলভী রহ. সেখানে পৌঁছলে সাধারণভাবে শাহ সাহেব

---

[২৯]. মাওলানা মোহাম্মদ হামযাহ, **তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, পৃ. ২৭।

[৩০]. গোলাম রসুল মেহের, **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ১০৩; **জগতের সেরা বার আউলিয়া**, পৃ. ২৫৬ এবং **তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, পৃ. ২৭; আবুল হাসান আলী নদভী, **যব ঈমান কী বাদ বাহারী চলী**, পৃ. ২০। এ গ্রন্থে মজুর খোঁজ করা এবং সাইয়্যেদ সাহেবের ওয়াদা নেয়ার কথা উল্লেখ নাই।

[৩১]. মাওলানা মোহাম্মদ হামযাহ, **তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, পৃ. ২৮।

[৩২]. গোলাম রসুল মেহের, **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ১০৪-১০৫; **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ১১৪; **তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, পৃ. ২৮।

[৩৩]. গোলাম রসুল মেহের, **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ১০৫।

[৩৪]. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইফাবা, পৃ. ২৪৩।

প্রথম সাক্ষাতের সময় স্বীয় রীতি অনুসারে তাঁর সাথে মোসাফাহা ও কোলাকুলি করলেন। তাঁর কাছে বসালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, কোথা থেকে এসেছ?

সাইয়্যেদ সাহেব বললেন: রায়বেরেলী থেকে। **শাহ সাহেব বললেন:** তুমি কোন খান্দানের লোক? **সাইয়্যেদ সাহেব বললেন:** সাইয়্যেদ খান্দানের। **শাহ সাহেব বললেন:** আচ্ছা! তুমি সাইয়্যেদ আবু সাঈস এবং সাইয়্যেদ নু'মান কে চিন? **সাইয়্যেদ সাহেব বললেন:** জী! সাইয়্যেদ আবু সাঈস হলেন আমার নানা এবং সাইয়্যেদ নু'মান হলেন আমার আপন চাচা।

সাইয়্যেদ সাহেবের এ জবাব শুনেই শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. স্বতঃস্ফুর্তভাবে পুনরায় গলা জড়িয়ে আলিঙ্গন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, কি উদ্দেশ্যে কষ্ট করে এতদূর পথ এসেছ? তখন বেরেলভী রহ. বললেন: আপনার পবিত্র সত্ত্বাকে গনীমত মেনে আল্লাহ পাকের পরিচয় লাভের জন্য এসেছি।

শাহ সাহেব বললেন: আল্লাহ তা'য়ালার অনুগ্রহ থাকলে অবশ্যই তোমার মাতৃ ও পিতৃ পূর্বপুরুষদের অমূল্য সম্পদ মা'রেফাত লাভ করবে। অতঃপর শাহ সাহেব একজন খাদেমকে হাতে হাত ধরে আদেশ করলেন, এ প্রিয় মেহমানকে আমার ভাই শাহ আব্দুল কাদির এর নিকট আকবার আবাদী মসজিদে নিয়ে যাও এবং বলবে, এ প্রিয় মেহমানকে যেন কদর করা হয় এবং তাঁর যথাযথ খেদমতে কোনরূপ ত্রুটি না হয়। আমি নিজে এসে পরে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত বলব। এরপর তিনি শাহ আব্দুল কাদির রহ. এর নিকট আকবার আবাদী মসজিদে অবস্থান করতে লাগলেন।[৩৫]

শাহ সাহেব তাঁকে মিজানুস সরফ নামক কিতাবের সবক দিলেন। যা দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রদের পড়ানো হয়ে থাকে। **মিয়াজী মুহাম্মদী বলেন:** আমি তখন শাহ সাহেবের নিকট কাফিয়া পড়ছিলাম। ইহা পঞ্চম বা ষষ্ঠ মানের ছাত্রদের পড়ানো হয়। সাইয়্যেদ সাহেব অল্প দিনের মধ্যে পড়ায় এমন উন্নতি করলেন যে, আমি কাফিয়া শেষ করার সাথে সাথেই সাইয়্যেদ সাহেব শাহ সাহেবের নিকট মিশকাত শরীফও পড়তে লাগলেন।[৩৬] এ কথা **"আরওয়াহে সালাসা"** গ্রন্থেও উল্লেখ আছে।[৩৭]

---

[৩৫]. **মাখযানে আহমদী**, পৃ. ১৮; **ওয়াকায়ে আহমাদী**, খ.১, পৃ. ৫০-৫১; **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ১১১; **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ১১৯; **তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, পৃ. ২৬; **তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, পৃ. ২৮-২৯।

[৩৬]. **জগতের সেরা বার আউলিয়া**, পৃ. ২৫৪।

[৩৭]. **আরওয়াহে সালাসা**, পৃ. ১০৩; **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ৯৪; **বেরেলী সে বালাকোট**, পৃ. ২৩ এবং মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী কর্তৃক অনুবাদকৃত, **হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী র. এর পত্রাবলী**, ইফাবা ...

মৌলভী আব্দুল কাইয়ূম সাহেব বলেন: এভাবে বেশি দিন যেতে না যেতেই তাঁর মধ্যে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হল। তিনি পড়ার জন্য কিতাব খুলতেই উহার অক্ষরগুলি তাঁর দৃষ্টি হতে অদৃশ্য হয়ে যেত। একটি অক্ষরও তিনি দেখতে পেতেন না। শুধু সাদা কাগজ তাঁর দৃষ্টিগোচর হত। একে রোগ মনে করে তাকে চিকিৎসকের শরণাপন্ন করা হল। কিন্তু কোন কিছুতেই ফলদায়ক হল না। শেষ পর্যন্ত হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বললেন, পরীক্ষা করে দেখা যাক সে অন্যান্য ক্ষুদ্র জিনিসগুলো দেখতে পায় কিনা; যদি দেখতে না পায় তবে বুঝতে হবে যে, ইহা একটি রোগ এবং ইহার চিকিৎসা হওয়ার প্রয়োজন। আর যদি অন্যান্য ক্ষুদ্র জিনিসগুলো সে দেখতে পায় কেবল কিতাবের অক্ষর দেখতে না পায়; তাহলে তাকে মক্তব, মাদরাসায় বা কোন খাস উস্তাদের নিকট লেখা পড়া শিখবার চেষ্টা বন্ধ করে দেয়া উচিত। কেননা এক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে, জাহেরী এলম তাঁর ভাগ্যে নেই এবং সে আল্লাহ তায়ালার নিকট সরাসরিভাবে ইলম লাভ করবে অর্থাৎ ইলমে লাদুন্নী হাসিল করবে।[৩৮]

পরবর্তীতে দেখা গেছে যে, জটিল ও কঠিন সমস্যা উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে উচ্চশিক্ষিত লোকদেরকেও তিনি বিস্মিত করতেন। তিনি গতানুগতিক জাহেরী ইলমে বিশেষত্ব হাসিল করেন নি বটে কিন্তু তিনি খুব ফার্সী ভাষা জানতেন এবং ফার্সী ভাষায় অনর্গল কথাও বলতে পারতেন। আরবীতে এমন মাহারাত বা দক্ষতা অর্জন করেছিলেন যে, মিশকাতুল মাসাবীহ কারো সাহায্য ছাড়াই মুতায়ালা করতে পারতেন এবং বুঝতে পারতেন।[৩৯]

হাফিযুল হাদিস আল্লামা রুহুল আমির বশিরহাটি রহ. সাইয়্যেদ আহমদ বেরলভী রহ. এর ইলমে লাদুন্নি লাভের পক্ষে তাত্ত্বিক আলোচনার শেষে বলেন: "মূল কথা যমানার আলেমরা কিতাব পড়ে হাদীস অবগত হয়ে থাকেন। আর ইলমে লাদুন্নী প্রাপ্ত মোকাশাফা বিশিষ্ট অলীরা হযরত নবী সা. এর সাক্ষাৎ করে হাদিস অবগত হয়ে থাকেন। হযরত মুসা আ. তাওরাত কিতাবের মহা পয়গম্বর হয়েও ইলমে লাদুন্নি প্রাপ্ত হযরত খিযিরের নিকট শিক্ষা লাভের জন্য গমন করেছিলেন।"[৪০]

---

[৩৮]. আরওয়াহে সালাসা, পৃ. ১০৩-১০৪; বেরেলী সে বালাকোট, পৃ. ২৪; রসুল মেহের, সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ৯৪; সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ, খ. ১, পৃ. ১২৬।

[৩৯]. গোলাম রসুল মেহের, সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ৯২; জগতের সেরা বার আউলিয়া, পৃ. ২৫৪।

[৪০]. আল্লামা রুহুল আমির বশিরহাটি, কারামতে আহমদীয়া, পৃ. ৩৫।

তাছাউফ শিক্ষা ও চার ত্বরীকার বাইয়াত গ্রহণ

তিনি ১২২৩/১২২২ হিজরী সনে মোতাবেক ১৮০৮ সালের মে মাসে এ উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. এর হাতে বয়াত হন এবং তাঁর থেকেই খেলাফতপ্রাপ্ত হন।[৪১] এ সময় হিন্দুস্থানে নকশাবন্দিয়া, কাদেরিয়া ও চিশ্‌তিয়া ত্বরীকা তাসাউফের এ তিনটি সিলসিলা সবচেয়ে বেশি সমাদৃত ছিল। যে কোন ব্যক্তি যে কোন সিলসিলায় বয়াত হতে চাইত শাহ্ সাহেব তাকে সে-ই সিলসিলায়ই বয়াত করাতেন এবং তাকে ঐ সিলসিলার ত্বরীকার যিকির আমল শিখিয়ে দিতেন। কিন্তু সাইয়্যেদ সাহেবকে শাহ সাহেব তিন সিলসিলায়ই বয়াত করান।[৪২]

'মাখযানে আহমাদী' গ্রন্থে আছে যে, এর কয়েক দিন পর জুমআ'র দিন ইমামুল মুহাদ্দিসীন শাহ আব্দুল আযীয দেহভী রহ. এর মোবারক হাতে সাইয়্যেদ সাহেব বয়াত হন এবং ৩ ত্বরীকা চিশ্‌তিয়া, কাদেরিয়া এবং নক্‌শাবন্দিয়া ত্বরীকায় দাখিল হন।[৪৩]

বিলায়েতে আম্বিয়া অর্জন

এর কিছুদিন পর একদা আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহ্‌লভী রহ. সাইয়্যেদ সাহেবকে বিলায়েতে আম্বিয়ার খোশ খবর দেন। বলেন: হে সৌভাগ্যবান সন্তান! মহান আল্লাহ পাক স্বীয় দয়া ও রহমতে তোমাকে বিলায়েতে আম্বিয়া দান করেছেন।[৪৪]

যা হোক এ সময় সাইয়্যেদ সাহেবের কোন বিষয় মনের ভিতর প্রশ্ন জাগলে স্বয়ং মুরশীদের নিকট তার সমাধান জেনে নিতেন।[৪৫]

'মাখযানে আহমাদী' গ্রন্থের বর্ণানুযায়ী- সাইয়্যেদ সাহেবকে বিলায়েতে আম্বিয়ার খোশ খবর দেওয়ার পর সাইয়্যেদ সাহেব ইমামুল মুহাদ্দিসীনের খেদমতে বিলায়েতে আম্বিয়া (নবীগণের অলীত্ব) এবং বেলায়েতে আওলিয়া (অলিগণের অলীত্ব) এর মাঝে পার্থক্যেও বিষয়ে জানতে চাইলে শাহ সাহেব তার বিশদ বর্ণনা দেন। পাঠকরা এ বিষয়ে লেখকের অপর গ্রন্থে বিশদ আলোচনা পাবেন।

---

[৪১]. ড. মতিউর রহমান, **আয়নায়ে ওয়ায়েসী**, পৃ. ৯৬।

[৪২]. গোলাম রসুল মেহের, **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ১১৯।

[৪৩]. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলী, **মাখযানে আহমদী**, পৃ. ১৮; **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ১১৯; **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ১২০।

[৪৪]. **মাখযানে আহমদী**, পৃ. ২০; নওয়াব মুহাম্মদ উযীর খান বাহাদুর, **ওয়াকায়ে আহমাদী**, খ.১, পৃ. ৫২; গোলাম রসুল মেহের, **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ১২০; **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ১২১।

[৪৫]. মাওলানা হাফেয আহমাদ সাহেব, **জগতের সেরা বার আউলিয়া**, পৃ. ২৫৯।

"সিরাতে মুস্তাকিম" "মাখযানে আহমাদী" ও "তাওয়ারীখে আযীবাহ" গ্রন্থসমূহে সাইয়্যেদ আহমদ বেরলভী রহ. এর বিলায়েতে আম্বিয়া লাভের অবস্থা বর্ণিত আছে যে, বয়াত হওয়ার পর বয়াত ও তাওয়াজ্জুহ্ এর গুণে বহু আশ্চর্য আশ্চর্য (হাল) হাবভাব প্রকাশিত হল। যে কামালাতে নবুয়াত অস্পষ্টভাবে তাঁর প্রকৃতিতে নিহিত ছিল, তা বিস্তারিতভাবে স্পষ্টাকারে পরিলক্ষিত হতে লাগল ও কামালাতে বেলায়েতের মাকামগুলো সুন্দররূপে প্রকাশ পেতে লাগল।[৪৬]

আল্লাহ তায়া'লা অনুগ্রহ পূর্বক কারোর মধ্যস্থতা ব্যতীত তিনি নিজেই তাঁর শিক্ষা প্রদানের অবলম্বন স্বরূপ হলেন। এরপর ধারাবাহিকভাবে বহু ঘটনা সংঘটিত হতে লাগল।[৪৭]

পাঠক! এখানে আমরা শুধু সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত দিয়েছি। এ বিষয়ে আমাদের অপর গ্রন্থ দেখুন।

এভাবে তিনি সোহবতের মাধ্যমে মুরশীদের নিকট হতে শিক্ষা লাভ করে অল্পকালের মধ্যেই এমন আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেন এবং সেই উচ্চতর মাকামসমূহ হাসিল করেন যা বড় বড় মাশায়েখে কিরামদের বিরাট রিয়াযত ও মুজাহাদার মাধ্যমে হাসিল হয়ে থাকে।[৪৮]

এখানে ইমামুল মুহাদ্দিসীনের মূল্যায়ন প্রণিধানযোগ্য, তিনি এ বিষয়ে ধারণা দিতে গিয়ে বলেন: এই বিচক্ষণ বোধ শক্তি সম্পন্ন সাইয়্যেদ সামান্য ইশারাতেই বাতেনী এলেমের দুর্বোধ্য বিষয়ও সহজে হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেন এবং সহজেই উহা অতিক্রম করে ফেলেন।[৪৯]

এ সময় সাইয়্যেদ সাহেব র. আগের থেকে আরও বেশী পরিমাণে ইবাদাত-বন্দেগীতে মনোযোগী হন।[৫০]

'ওয়াকায়ে আহমাদী' গ্রন্থে আছে, সুলুকের পথে চলার শুরু থেকেই সাইয়্যেদ সাহেব বছরের পর বছর এক উযু দিয়ে ইশা ও ফজরের নামায আদায় করেছেন।[৫১]

---

৪৬. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলী, **মাখযানে আহমদী,** লাহোর, পৃ. ২৪।

৪৭. **সিরাতে মুস্তাকিম,** পৃ. ১৬৪; **ওয়াকায়ে আহমাদী,** খ.১, পৃ. ৫৫; রুহুল আমিন বশিরহাটি, **কারামতে আহমদীয়া,** পৃ. ৩৫; **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ,** খ. ১, পৃ. ১২৭-১২৮; **তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ,** পৃ. ৩০।

৪৮. **তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ,** পৃ. ৩০ এবং **যব ঈমান কী বাদ বাহারী চলী,** পৃ. ২২।

৪৯. গোলাম রসুল মেহের, **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ,** খ. ১, পৃ. ১২১।

৫০. গোলাম রসুল মেহের, **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ,** খ. ১, পৃ. ১২১।

৫১. ওয়াসাইয়া নিসফে আউয়াল, পৃ. ২৫৬ এবং গোলাম রসুল মেহের, **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ,** খ. ১, পৃ. ১২১।

সাইয়্যেদ সাহেব সর্বদাই রাত্রি জাগরণ করতেন।[৫২] কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, কিয়ামুল লাইল করতে করতে তাঁর পা ফুলে যেত।[৫৩]

যা হোক, শবে কদরের ঘটনা, মুরশীদের দিকনির্দেশনায় সাইয়্যেদ সাহেব পূর্বাপেক্ষা এদিনগুলোতে অধিক গুরুত্বের সাথে রাত্রি জাগরণ করতে লাগলেন। এভাবে কয়েক রাত কেটে গেল। এরপর তিনি ২৬ শে রমজান রাতভর ইবাদাত করার সংকল্প করেন। কিন্তু এশার নামাজের পর তিনি অভাবনীয়ভাবে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমন্ত অবস্থায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর দু'ব্যক্তি এসে তাঁর হাত ধরে তাঁকে জাগিয়ে দিলেন। চক্ষু খুলতেই তিনি ডানে হযরত রাসুল সা. এবং বামে আবু বকর সিদ্দীক রা. কে বসা দেখতে পেলেন। রাসুল সা. বললেন: ওঠ! তাড়াতাড়ি গোসল করো। তিনি উভয়কে দেখে তাড়াতাড়ি করে গোসল করতে মসজিদের গোসল খানায় গেলেন। (তখন ছিল প্রচণ্ড শীতকাল। পানি ছিল বরফের মত ঠান্ডা, কিন্তু তা তিনি উপেক্ষা করে গোসল করতে গেলেন।)[৫৪] আতঃপর সাইয়্যেদ সাহেব গোসল করে তাদের নিকট হাজির হলেন। রাসুল সা. বললেন: হে সন্তান! ইহা শবে কদর। আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হও এবং তাঁর দরবারে প্রার্থনা কর; এ বলে তারা উভয়ই প্রস্থান করেন।[৫৫] তারপর সাইয়্যেদ সাহেব কাপড় পরিবর্তন করে আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে লিপ্ত হলেন।

'মাখযানে আহমাদী' গ্রন্থের লেখক বলেন: এ ঘটনার পর সাইয়্যেদ সাহেব প্রায়ই বলতেন, সেই রাতে আল্লাহর রহমতে আমি বহু আশ্চর্যজনক ঘটনা অবলোকন করেছি। সেই রাতেই আমার বাতেনী চক্ষু খুলে যায়। আমি তখন বৃক্ষ-লতা, পাহাড়-পর্বত এমনকি দুনিয়ার প্রত্যেক বস্তুকে অল্লাহর দারবারে সেজদায় রত এবং তসবীহ তাহলীল রত অবস্থায় দেখেছি। অথচ আমি তখন জাগ্রত অবস্থায়ই স্বচক্ষে এ অবস্থা অবগত হয়েছি।[৫৬] এ সময় আমার ফানা-ই কুল্লী এবং এস্তেগরাকের দরজা হাসিল হয়।[৫৭]

---

৫২. গোলাম রসুল মেহের, **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ১২২।

৫৩. গোলাম রসুল মেহের, **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ১২১।

৫৪. মাঝের এই বর্ণনা টুকু তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ গ্রন্থ থেকে সংগ্রহিত। দেখুন: মাওলানা মোহাম্মদ হামযাহ, **তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, পৃ. ৩১-৩২।

৫৫. **মাখযানে আহমদী**, পৃ. ২২; **ওয়াকায়ে আহমাদী**, খ.১, পৃ. ৫৪; **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ১২২; **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ১২৭-১২৮; **তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, পৃ. ৩১।

৫৬. **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ১২২ এবং নওয়াব মুহাম্মদ উযীর খান, **ওয়াকায়ে আহমাদী**, খ.১, পৃ. ৫৪,৫৫।

৫৭. **মাখযানে আহমদী**, পৃ. ২৩; **বেরেলী সে বালাকোট**, পৃ. ২৯-৩১; **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ১২৭-১২৮; **তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, পৃ. ৩১-৩২ এবং **জগতের সেরা বার আউলিয়া**, পৃ. ২৬১।

যা হোক কিছুকাল পর শাহ আব্দুল আযীয র. এর নিকট থেকে খিলাফত ও এজাযত নিয়ে তিনি নিজ জন্মস্থান রায়বেরেলীতে ফিরে আসেন।

রায়বেরেলীতে প্রত্যাবর্তন ও বিবাহ

১২২২ হিজরীর শেষের দিকে এবং ১২২৩ হিজরীর শুরুতে ১৮০৮ সালে শাহ আব্দুল আযীয রহ. থেকে ইজাযত ও খিলাফত লাভ করে নিজ জন্মভূমি রায়বেরেলীতে প্রত্যাবর্তন করেন[৫৮] এবং ঐ বছরই তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। [৫৯] এ সময় তাঁর বয়স ২৩ বছর হতে চলল। তাঁর স্ত্রী ছিল স্বীয় বংশীয় সাইয়েদ মুহাম্মাদ রওশন সাহেবের বিদূষী কন্যা বিবি জোহরা খাতুন।[৬০] সাইয়েদ মুহাম্মাদ রওশন ছিলেন সাইয়্যেদ শাহ আলিমুল্লাহ রহ. এর চাচা সাইয়্যেদ ইসহাক ইবনে সাইয়্যেদ ফুযাইল রহ. এর অধঃস্তন ৫ম পুরুষ। ১২২৪ হিজরীতে এ ঘরে সাইয়্যেদ সাহেবের বড় কণ্যা সাইয়্যেদা সারাহ এর জন্ম হয়।[৬১] রায়বেরেলীতে তিনি একাধারে দুই বছর অবস্থান করেন।[৬২]

সেনাবাহিনীতে যোগদান ও সংস্কার

আল্লাহপাক তাকে যে মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর মাঝে যে জিহাদী প্রেরণা বহবান ছিল; যা নিয়ে তিনি যে চিন্তা ফিকির করছিলেন; সেক্ষেত্রে সেগুলোর পূর্ণ বাস্তবায়ন ও সুশৃঙ্খল উপযোগীতার প্রয়োজন ছিল। ফলে তিনি নওয়াব আমীর আলী খান এর সৈন্যদলে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন।[৬৩] সিদ্ধান্তানুযায়ী তিনি ১২২৬ হিজরী মুতাবেক ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে[৬৪] ২য় বার রায়বেরেলী থেকে বের হয়ে পড়েন[৬৫] এবং দিল্লীতে তাশরীফ নেন। দিল্লীতে কিছুদিন অবস্থানের পর ১২২৭ হিজরীতে তিনি নওয়াব আমীর আলী খান এর সৈন্যদলে যোগদান করেন।[৬৬]

---

৫৮. প্রফেসর আব্দুল হাফীয, তা'য়ারিফে জামাতে মুজাহিদীন, পৃ. ৩৬।

৫৯. ড. মতিউর রহমান, আয়নায়ে ওয়ায়েসী, পৃ. ৯৬ এবং বেরেলী সে বালাকোট, পৃ. ৩১।

৬০. সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ১২৪; সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ১২৯; ওয়াকায়ে আহমাদী, খ.১, পৃ. ৫৭; তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, পৃ. ৩২; যব ঈমান কী বাদ বাহারী চলী, পৃ. ২২।

৬১. সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ১২৪; সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, খ. ১, ১২৯; বেরেলী সে বালাকোট, পৃ. ৩১।

৬২. আবুল হাসান আলী নদভী, যব ঈমান কী বাদ বাহারী চলী, পৃ. ২২।

৬৩. আবুল হাসান আলী নদভী, সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ৮২।

৬৪. মাওলানা মোহাম্মদ হামযাহ, তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, পৃ. ৩৩।

৬৫. গোলাম রসুল মেহের, সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ১২৬; তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, পৃ. ৩৩।

৬৬. সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ১৩০-১৩১; তা'য়ারিফে জামাতে মুজাহিদীন, পৃ. ৩৬

এ সেনাবাহিনীতে তিনি ৬/৭[৬৭] বছর অতিবাহিত করেন। এ সময়ে তাঁর ইবাদাত, রিয়াযত ও সৈনিক জীবন যাপনের সাথে সাথে সংস্কার ও ধর্মীয় উপদেশ এবং শিক্ষামূলক তৎপরতায়ও নিয়োজিত থাকেন। তাঁর আগ্রহ উদ্দীপনা, চেষ্টা ও সাধনায় সমগ্র সৈন্যবাহিনীর ব্যাপক দাওয়াত ও তাবলীগের বিস্তৃত ময়দানে পরিণত হয়। সৈনিকের সামগ্রিক জীবনে বিপ্লবাত্মক সংস্কার সাধিত হয়। এমনকি সেনাপ্রধান আমীর খানের জীবনেও ব্যাপক পরিবর্তন আসে।[৬৮]

সেনাবাহিনীর সঙ্গ ত্যাগ

ইংরেজদের জোর তৎপরতায় ৯ই নভেম্বর ১৮১৭ খৃ./১২৩১[৬৯] ঈসায়ী হঠাৎ করে নওয়াবের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পরে। ফলে নওয়াব আমীর আলী খান ইংরেজদের সাথে সন্ধি[৭০] করে টুংক (Tonk)'র কর্তৃত্ব লাভ এবং সৈন্যবাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে রাযী হন। এ সময় সাইয়্যেদ সাহেব তাকে এ চুক্তি থেকে বিরত রাখতে একান্তভাবে চেষ্টা করেন এবং বার বার বলেন: ইংরেজদের সাথে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করুন।[৭১] কিন্তু এটা নওয়াবের সাহসে কুলায়ে উঠলো না। নওয়াব ইংরেজদের নিকট থেকে টুংকের জায়গীর কবুল করলেন। ফলে সাইয়্যেদ সাহেব ১৮১৮ সালের মাঝামাঝি সময় তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে দিল্লীতে শাহ সাহেবের খিদমতে চলে আসেন।[৭২]

সাইয়্যেদুল মুজাহীদিন খাতামুল মুহাদ্দিসিন শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. কাছে এক পত্র লেখেন: "এ অধমের বিনীত আরজ হযরতের কদমবুছি নেয়ার জন্য শীঘ্রই খিদমতে উপস্থিত হবে। এখানে সেনাবাহিনী গঠনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। নবাব সাহেব ইংরেজদের সাথে মিলিত হয়েছেন। এখানে আমার থাকার আর কোন উপায় নেই।"[৭৩]

চিঠি প্রেরণের পর একদা ১২৩২ হিজরীতে স্বীয় পীর শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী রহ. এর খেদমতে দিল্লীতে হাজির হন।[৭৪] তিনি সরাসরি শায়খের সাথে

---

৬৭. কাসিম আহমাদ উসমানী, বেরেলী সে বালাকোট, পৃ. ৩২।

৬৮. **যব ঈমান কী বাদ বাহারী চলী**, পৃ. ২২-২৩ এবং **তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, পৃ. ৩৩; **ওয়াকায়ে আহমাদী**, খ.১, পৃ. ৬৫-৬৭; **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ১৪৭; **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ১৩৯-৪০।

৬৯. প্রফেসর আব্দুল হাফীয, তা'য়ারিফে জামাতে মুজাহিদীন, পৃ. ৩৬।

৭০. ড. মতিউর রহমান, আয়নায়ে ওয়ায়েসী, পৃ. ৯৬।

৭১. **ওয়াকায়ে আহমাদী**, খ.১, পৃ. ৯৮ এবং মৌলভী জা'ফর আলী নকভী, **মানজুরাতুস সায়া'দাহ**।

৭২. **ওয়াকায়ে আহমাদী**, খ.১, পৃ. ৯৮; **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ১৬০; **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ১৪৪-১৪৫।

৭৩. **ওয়াকায়ে আহমাদী**, খ.১, পৃ. ১০১; **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ১৬২; **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ১৪৫।

৭৪. **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ১৪৬ এবং **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ১৬৬।

সাক্ষাত করেন এবং মুরশিদকে ২৫ রুপিয়া হাদিয়া পেশ করেন। শায়খ তা গ্রহণ করেন এবং আমীর খানের বাহিনীর হাল হাক্কিত সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন।[৭৫] অতঃপর শায়খ আকবরাবাদী মসজিদে তাঁর অবস্থানের ব্যবস্থা করেন।[৭৬]

সায়্যিদ সাহেবের হাতে বয়াত

শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী, শাহ আব্দুল কাদির ও মাওলানা রফীউদ্দীন রহ. এসব শায়খদের পরে মাওলানা আবদুল হাই রহ. এবং মাওলানা ইসমাইল রহ. দ্বয় ছিলেন হিন্দুস্তানে ইলম, তাকওয়া ও তাসাউফে উচ্চ মর্যাদাবান আলিমদের অন্তর্ভূক্ত। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. এর বংশের এই দুই মহান বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব দিকপাল একদিন সাইয়্যেদ সাহেবের হাতে বয়াত গ্রহণ করেন।[৭৭]

তাদের বয়াত হওয়ার উপর বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্ন রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তবে এসব বর্ণনার মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা হচ্ছে যা তাঁরই স্বীয় খলীফা মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী রহ. খোদ মাওলানা আবদুল হাই রহ. থেকে সরাসরি বর্ণনা করেছেন। তিনি বয়াত হওয়ার এ ঘটনাটি তাঁর "نور على نور" গ্রন্থের (৬৮-৭৩ পৃ.) উল্লেখ করেন।[৭৮] ঘটনাটি বেশ বড় হওয়ার কারণে আমরা তা ছেড়ে দিয়েছি। বিস্তারিত দেখতে আমাদের গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

খুব সংক্ষিপ্তাকারে ঘটনাটি হল যে, সাইয়্যেদ আহমাদ বেরেলভী এর ফয়েয ও তাওয়াজ্জুহের বরকতে মাওলানা আব্দুল হাই এর অনেক দিনের আশা 'সালাত আদায়ে সাহাবীদের ন্যায় মিষ্টতা লাভ করা।' তার এ আশা পূরণ হয় এবং এরপরই তিনি সাইয়্যেদ আহমাদ বেরেলভী র. এর হাতে বয়াত হন।

কারামত আলী জৌনপুরী রহ. বলেন: মাওলানা আব্দুল হাই আমাকে বলেন যে, আমি হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল আযীয রহ. এর কাছে আরয করলাম যে, হযরত! আমি অনেক দরবেশ এবং ত্বরীকত পন্থীদের নির্দেশনা অনুযায়ী রিয়াযত ও মোরাকাবা করেছি। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য কখনও অর্জিত হয় নি। কিন্তু হযরত সাইয়্যেদ সাহেব রহ. কেবলমাত্র মুখ দিয়ে একবার বলে দিলেন অমনি আমার অন্তরের কাঙ্খিত বাসনা পুরণ হয়ে গেল। তো হযরত সাইয়্যেদ সাহেব এই যে তা'লীম তা কোন ত্বরীকার তা'লীম। তখন শায়খুল হিন্দ বললেন, এসব লোক কোনো ত্বরীকার প্রতি মুখাপেক্ষী নন। এসব লোক মুখ দিয়ে যা বলেন তা-ই ত্বরীকা। এসব লোক নিজেরাই ত্বরীকা সৃষ্টিকারী হয়ে থাকেন। মাওলানা শাহ

---

[৭৫]. **ওয়াকায়ে আহমাদী**, খ.১, পৃ. ১০৩-১০১।

[৭৬]. **তা'য়ারিফে জামাতে মুজাহিদীন**, পৃ. ৩৬।

[৭৭]. প্রফেসর আব্দুল হাফীয, **তা'য়ারিফে জামাতে মুজাহিদীন**, পৃ. ৩৬।

[৭৮]. আবুল হাসান আলী নদভী, **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, , পৃ. ১৪৯-১৫০।

আব্দুল আযীয রহ. এর বর্ণনা শোনার পর সাইয়্যেদ সহেবের ত্বরীকা সহীহ হওয়ার ব্যাপারে তাঁর উপর আমার আরও বেশি ইয়াকীন পয়দা হল। আর তাঁর প্রতি এমন এ'তেকাদ পয়দা হল যে তাঁর গোলামী করার জন্য আমি প্রস্তুত হলাম বটে কিন্তু নিজেকে তাঁর গোলামীর উপযুক্তও পেলাম না।[৭৯]

পাগড়ী প্রদান ও দাওয়াতী সফর

মাওলানা শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. এর মত জগত বিখ্যাত মুরশিদ বর্তমান থাকা অবস্থায় অপর কোন ব্যক্তির নিকট বিখ্যাত এ হযরত দ্বয়ের বয়াত হওয়ার বিষয়টা কোন সাধারণ ঘটনা ছিল না। যার কারণে খুব তাড়াতাড়িই তাদের এ বয়াত হওয়ার খবরটি চতুর্দিকে চাউর হয়ে গেল এবং উলামা ফুদালা ও সালেহীন ব্যক্তিবর্গরা তাঁর নিকট বয়াত হতে লাগলেন।[৮০] শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. এর বংশের আরেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ নাবীরা সহ হযরত আহলুল্লাহ, মৌলভী অজীহুদ্দীন, হাকীম মুগীসুদ্দীন, হাফিয মুঈনুদ্দীন সহ আরও অনেকে তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন।[৮১] এসব হযরতদের বয়াতের পর দিল্লীর সাধারণ স্তরের মানুষ, বিশেষ ব্যক্তিবর্গ এবং বিশিষ্ট ওলামা ও মাশায়েখগণ সাইয়্যেদ সাহেবের খেদমতে এমনভাবে ঝুঁকে পড়েন যে দিন দিন তাঁর খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা বেড়েই চলল এবং তাঁর নিকট বিভিন্ন এলাকা থেকে ব্যাপকভাবে প্রচুর দাওয়াতপত্র আসতে শুরু করল।[৮২]

সাইয়্যেদ সাহেব শাহ ইসমাঈল দেহলভীকে দিয়ে আগত দাওয়াতপত্রগুলো শাহ সাহেব রহ. এর নিকট প্রেরণ করেন যে, তাঁর নিকট থেকে কি হুকুম আসে। দাওয়াতপত্রগুলো পেয়ে শাহ সাহেব রহ. সাইয়্যেদ আহমদ বেরলভী রহ. কে স্বীয় পোশাক খিরকা পরিয়ে দেন এবং অনেক আনন্দ ও খুশির সাথে তাকে বিদায় জানান।[৮৩]

---

৭৯. **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ১৫০-১৫৪, মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী, **নুরুন আ'লা নূর**, (জৌনপুরঃ আ'জামুল মাতাবি'), পৃ. ৬৮-৭৩ এবং **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ১৭১।

৮০. প্রফেসর আব্দুল হাফীয, **তা'য়ারিফে জামাতে মুজাহিদীন**, পৃ. ৩৬।

৮১. **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ১৫৪-১৫৫; **মাখযানে আহমদী**, পৃ. ৩৭; **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ১৭২; **তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, পৃ. ৩৪-৩৫; **যব ঈমান কী বাদ বাহারী চলী**, পৃ. ২৩।

৮২. মাওলানা মোহাম্মদ হামযাহ, **তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, পৃ. ৩৫।

৮৩. **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ১৫৬; **যব ঈমান কী বাদ বাহারী চলী**, পৃ. ৩৫; **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ৯২; সাইয়্যেদ নফীস হুসাইনী, **হযরত সাইয়্যেদ আহমাদ সে**

সুতরাং সাইয়্যেদ সাহেব শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. এর দোয়া ও এজাযত নিয়ে এবং শাহ ইসমাঈল শহীদ ও মাওলানা আব্দুল হাইকে সাথে নিয়ে তাঁর তাবলীগী এবং সংস্কারমূলক সফর শুরু করেন।[৮৪] গাযীউদ্দীন নগর বা গাযীআবাদী, মুরাদ নগর, মীরাট, সর্ধানা, কান্দালাহ, বাড়ানা, ফুলত, মুজাফ্ফর নগর, দেওবন্দ, গাংগুহ, সাহারানপুর, নানুতাহ, থানাভন, গড়, মুক্তেশ্বর এবং দোয়াবা এলাকার রামপুর, বেরেলী, শাহজাহানপুর এসব এলাকায় সফর করেন।[৮৫]

এ সফরে এত অগণিত মুসলমান তাশরীফ নিয়ে তারা তাদের জীবনে দ্বীনী ফায়দা এবং বরকত হাসিল করেছেন যার দৃষ্টান্ত জুড়ি মেলাভার।[৮৬]

এ সফরে সাহারানপুরের বিখ্যাত পীর হাজী আবদুর রহীম বিলায়েতী সাহেব অবস্থান করছিলেন।[৮৭] যিনি সে যুগে অন্যতম বড় বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন এবং হাজার হাজার লোক ছিল তাঁর মুরীদ মণ্ডলীর অন্তর্ভূক্ত।[৮৮] ইনি ছিলেন হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজীরে মক্কী রহ. এর দাদা পীর এবং মিয়াযী নূর মোহাম্মদ ঝানঝানবী র. এর পীর। এ মহান শায়খও ১২৩৩ হিজরীর জিলহাজ্ব মাসে[৮৯] সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভীর রহ. এর হাতে বয়াত হন এবং তাঁর মুরীদদেরকেও বয়াত করান।[৯০] এরপরে মিয়াযী নূর মোহাম্মদ ঝানঝানবী র. ও বয়াত হন।[৯১] যা থানভী রহ. তাঁর "আনওয়ারে মুহম্মাদী"তেও উল্লেখ করেন।[৯২]

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বিলায়েতী রহ. ও ঝানঝানবী রহ. সাইয়্যেদ সাহেবের হাতে জিহাদী বয়াত নয় বরং তারা তাঁর কাছে ত্বরীকতেরই বয়াত

হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. কে রুহানী রেসতে, লাহোর: অলম্বপিয়া প্রেস, ১ম সংস্করণ-২০০৩, প.১২৫ এবং বেরেলী সে বালাকোট, পৃ. ৩৭।

৮৪. মাওলানা মোহাম্মদ হামযাহ, তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, পৃ. ৩৪-৩৫।

৮৫. প্রফেসর আব্দুল হাফীয, তা'য়ারিফে জামাতে মুজাহিদীন, পৃ. ৩৬।

৮৬.সাইয়্যেদ আহমাদ সে হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী, পৃ. ১২৫ এবং সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, খ.১, পৃ. ১২৪।

৮৭. সাইয়্যেদ আহমাদ সে হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী. প.১২৭ এবং সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, খ.১, পৃ. ১২৭।

৮৮. আবুল হাসান আলী নদভী, যব ঈমান কী বাদ বাহারী চলী, পৃ. ২৪।

৮৯. সাইয়্যেদ আহমাদ সে হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী, প.১২৭ এবং সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, খ.১, পৃ. ১২৬।

৯০. সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ১৬৭; সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ১৮৪; আবুল হাসান আলী নদভী, যব ঈমান কী বাদ বাহারী চলী, পৃ. ২৪; তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ,পৃ. ৩৬।

৯১. সাইয়্যেদ আহমাদ সে হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী, পৃ. ১২৭ এবং সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, খ.১, পৃ. ১২৭।

৯২. আশরাফ আলী থানভী, আনওয়ারে মুহাম্মাদী, মিরাট: মাতবায়ে দিয়াউ মিরাট, পৃ. ৩৫; সাইয়্যেদ আহমাদ সে হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ., প.১২৭ এবং সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, খ.১, পৃ. ১২৭-২৮।

হয়েছিলেন।[৯৩] সাইয়্যেদ সাহেবের এ পুরা সফরটি ছিল রহমতের বারিধারার ন্যায়।[৯৪]

নিজ দেশ রায়বেরেলীতে অবস্থান

অবশেষে আমিরুল মু'মিনীন রায়বরেলীতে প্রবেশ করেন। আগমনের দিনই রমযানের চাঁদ দেখা যায়। আমিরুল মু'মিনীনের সার্বক্ষণিক খাদেম মিঞা মুহাম্মদ বলেন: সফরে বিভিন্ন স্থানে স্থানে যাত্রা বিরতি দেন বটে কিন্তু এ সম্পর্কে আমার পূর্ণ ইয়াদ নেই। **"ওয়াকায়ে আহমাদী", "সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ"** ও **"সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ"** গ্রন্থসমূহের বর্ণানুযায়ী আমীরুল মু'মিনীন শা'বান মাসের ২৯ তারিখ ১২৩৪ হিজরী ও জুন মাসের ২৩ তারিখ ১৮১৯ সালে রায়বরেলীতে প্রবেশ করেন এবং সকাল থেকেই সবাই রোজা রাখা শুরু করেন।[৯৫] এ সময় ঐ এলাকাতে খরা ও দুর্ভিক্ষ বিরাজ করছিলো। সর্বত্রই ছিল হতাশা। চলছিল ক্ষুধা দারিদ্র আর নিঃস্বতার হুমড়ি।[৯৬]

এরকম একটি কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে তাঁর কাঁধে দায়িত্ব ছিল ১০০ মানুষের আহারের ব্যবস্থা করা। কিন্তু তাঁর অন্তর ছিল রহমানুর রহীম প্রদত্ত প্রশান্তি আর তাঁর প্রতি অপরিমেয় তাওয়াক্কুলে ভরপুর। এ কঠিন মুহূর্তেও তিনি ধৈর্য্যহারা হন নি।[৯৭]

এ সময়টাতে আধ্যাত্মিক রিয়াযতের কাজ চলছিল ফল্গু নদীর মত অবারিত গতিতে।

তাবলীগি সফর

রায়বেরেলীতে অবস্থান কালে তিনি সালোন, আহলাদগঞ্জ, এলাহাবাদ, বেনারস, কানপুর এবং সুলতানপুরে এক তাবলীগি সফরে বের হন।[৯৮] সামান্য দূর অতিক্রম করতে না করতেই লোকজন দলে দলে এসে তার সাথে সাক্ষাৎ করত এবং বয়াত

---

[৯৩]. সাইয়্যেদ আহমাদ সে হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. প.১২৮।

[৯৪]. সাইয়্যেদ আহমাদ সে হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ., পৃ. ১২৫।

[৯৫]. ওয়াকায়ে আহমাদী, খ.১, পৃ. ১৬৫; সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ১৯১; সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ১৮১।

[৯৬]. আবুল হাসান আলী নদভী, **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ,** খ. ১, পৃ. ১৮১।

[৯৭]. মাওলানা মোহাম্মদ হামযাহ, তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, পৃ. ৩৭ এবং আবুল হাসান আলী নদভী, **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ,** খ. ১, পৃ. ১৮১-৮২; গোলাম রসুল মেহের, **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ,** খ. পৃ. ১৯৩।

[৯৮]. আবুল হাসান আলী নদভী, **যব ঈমান কী বাদ বাহারী চলী,** পৃ. ২৫।

হতো।[৯৯] সাইয়্যেদ সাহেব এ সফরে কম সে কম তিন মাস অতিবাহিত করেন।[১০০]

রায়বেরেলীতে এসেও তিনি বসে থাকেন নি। এবার তিনি লাখনৌ এ-ও তাবলীগি সফর করেন।[১০১] এ সফরে হাজারো ওলামায়ে কিরাম, ফুদালা, আমীর-উমারা, ব্যবসায়ী এবং বড় বড় ফাসিক পাপাচার আমীরুল মু'মিনীনের হাতে বয়াত গ্রহণ করে এবং তাদের কৃত অপরাধ থেকে তওবাহ করে।[১০২] তাবলীগী সফর শেষে করে সাইয়্যেদ আহমদ বেরলভী রহ. লাখনৌ থেকে বের হয়ে দৌলতগঞ্জ পৌঁছেন। সেখান থেকে হাসানগঞ্জ অবস্থান নেন। অবশেষে তিনি সেখান থেকে নিজ দেশ রায় বেরেলীতে ফিরে আসেন।[১০৩] লাখনৌ-এ তাঁর এ তাবলীগী সফর ছিল এক মাস ব্যাপী।[১০৪] দেশে ফিরে আসার পরও হেদায়েত ও তাবলীগের কাজ চলতে থাকে আগের মতই। লাখনৌ থেকে ফিরে আসার পর রায়বেরেলীতে সর্বোপরি তাঁর অবস্থান কাল ছিল ১বছর।[১০৫]

হজ্জ্ব ও যিয়ারত

তৎকালীন সময়ে ইসলামের অন্যান্য শেয়ার দুর্বল হওয়ার সাথে সাথে হজ্জের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকনও ওলামায়ে কিরামদের ফিক্হী ওযর আপত্তির ভিত্তিতে আদায় করার হুকুম রহিত হওয়ার ফতোয়া দেওয়া হয়।[১০৬] তাদের যুক্তি ছিল- সমুদ্রের উপর ফিরিঙ্গীদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে সমুদ্র ভ্রমনের বিপদ আরো বৃদ্ধি পায়। ফলে কোন কোন আলিম এর উপর ভিত্তি করে হজ্জ ফরজ থাকে না বলে ফতওয়া প্রদান করেন। কেননা রাস্তা নিরাপদ হওয়া হজ্জ ফরজ হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত।[১০৭]

---

৯৯. তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, পৃ. ৩৮; মাখযানে আহমদী, পৃ. ৫৮; সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ১৮৫-৯২; ওয়াকায়ে আহমাদী, খ.১, পৃ. ২২৭-৩৭; সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ২২২-২২৬।

১০০.গোলাম রসুল মেহের, সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ২২৬।

১০১. প্রোফেসর আব্দুল হাফীয, তা'য়ারিফে জামাতে মুজাহিদীন, পৃ. ৩৭; সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ১৮৫।

১০২. তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, পৃ. ৩৯; সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ১৯৩; গোলাম রসুল মেহের, সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ২৩৯; মাওলানা মোহাম্মদ হামযাহ, তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, পৃ. ৪০-৪১।

১০৩. গোলাম রসুল মেহের, সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ২৪৬।

১০৪. আবুল হাসান আলী নদভী, যব ঈমান কী বাদ বাহারী চলী, পৃ. ২৬।

১০৫. তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, পৃ. ৪৩; সীরাতে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ২২৮।

১০৬. তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ, পৃ. ৪৭; যব ঈমান কী বাদ বাহারী চলী, পৃ. ২৭।

১০৭. ওয়াকাই আহমাদী এবং ইসলামী বিশ্বকোষ, ইফাবা, খ. ৩, পৃ. ২৪৪।

অন্যদিকে গড় (উত্তর প্রদেশের শহরের নিকটে) নামক স্থানের মৌলভী ইয়ার আলী আরও একধাপ এগিয়ে এমন অবস্থায় হজ্জে যাওয়াকে হারাম বলে ফতোয়া দেন।[১০৮]

এ সময় তিনি বিভিন্ন স্থানে হজ্জ আদায়ের আহ্বান জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। **চিঠির বিষয়বস্তু ছিল এই যে,** "আমরা বায়তুল্লাহ শরীফে হজ্জের উদ্দেশ্যে যাব। যে সকল ভাই হজ্জ করার ইচ্ছা করেন তারা আমার সাথে যেতে পারেন। তবে এই শর্তে যে, আমাদের কাছে না আছে সম্পদ আর না আছে কোন গুপ্তধন। এর পরেও আল্লাহর উপর ভরসা করেই যাচ্ছি। আর তার মহান সত্তার কাছে আমাদের দৃঢ় আশা যে তিনি স্বীয় রহমত ও দয়ায় আমাদের ইচ্ছা পূরণ করবেন। আর যাত্রাপথের যে সব স্থানে খরচ করা খুবই প্রয়োজন হবে সে সব স্থানে অবতরণ করে আমাদের লোকরা মেহনত ও শ্রমিকের কাজ করবে। তো যখন আমাদের খরচ করার মত পর্যাপ্ত পাথেয় জমা হবে তখন সেখান থেকে আমরা আমাদের সামনের সফরের জন্য রওয়ানা দিব। এদের মধ্যে যারা মহিলা এবং এমন দুর্বল লোক, যারা শ্রম দিতে ব্যর্থ তারা স্বীয় মালা-মাল ও তাবুর পাহারাদার হিসাবে দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত থাকবে। এক্ষেত্রে শ্রমিক এবং ডেরা পাহারাদার সবাই আয়-উপার্জনের ভাগিদার হবে।"[১০৯]

এ সব চিঠি তিনি বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করেন। বাড়ানায় মাওলানা আব্দুল হাই, দিল্লীতে মাওলানা ঈসমাইল দেহলভী, ফুল্‌তে মৌলভী ওয়াহীদ্দীন ও তার ভাই হাফিয কুতুবুদ্দীন এবং তাদের পিতা হাফিয মুঈনুদ্দীন, সাহারানপুরে মাওলানা ওয়াজীহুদ্দীন, হাফিয অব্দুর রব, হাকীম মুগীসুদ্দীন ও তার ভাগিনা শিহাবুদ্দীন[১১০] এবং ভাওয়ালপুরের মোল্লা দাওয়ান্দের কাছে।[১১১]

এছাড়াও তিনি বিভিন্ন স্থানে হজ্জের উদ্দেশ্যে তাবলীগি সফর করেন। এ সফরে তিনি কানপুর, কুড়াহ, জাহানাবাদ, খুযাহ, ফতেহপুর এবং দালমু এসব এলাকায় তাঁর তাবলীগি সফর শুরু করেন।[১১২]

হজ্ব কাফেলার আগমন

রায়বেরেলীর আশে-পাশের এলাকা, দালমূ, নাসিরাবাদ, জাইস এবং অন্যান্য এলাকা থেকে ১০০ লোক হজ্জের সফরের জন্য একত্রিত হয় এবং তাঁর অত্মীয়-

---

[১০৮]. ওয়াকায়ে আহমাদী। ইসলামী বিশ্বকোষ, ইফাবা, খ. ৩, পৃ. ২৪৪।

[১০৯]. **ওয়াকায়ে আহমাদী**, খ.১, পৃ. ৩৮৯-৩৯০; **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ**, খ. ১, পৃ. ২৫৬; **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ২৫৬।

[১১০]. **ওয়াকায়ে আহমাদী**, খ.১, পৃ. ৩৯০; **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ২৫৬।

[১১১]. গোলাম রসুল মেহের, **সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ২৫৬।

[১১২]. **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ২৫৮; **ওয়াকায়ে আহমাদী**, খ.১, পৃ. ৩৯১-৯৩।

স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে ছিল ৪০ জনের মত লোক হজ্জের জন্য প্রস্তুত হয়।[১১৩]

সে সময় হজ্জ যাত্রীদের মোটামুটি পরিসংখ্যান হল- মাওলানা ঈসমাইল এবং ফুল্‌ত ও সাহারানপুর : প্রায় ২৫০ জন। মাওলানা আব্দুল হাইর কাফেলায় ৪০ জন। সাইয়্যেদ সাহেবের নিকটস্থসহ ৪০ জন এবং রায়বেরেলীর, দালমু, জাইস, নাসিরাবাদ এবং অন্যান্য এলাকা থেকে ১০০ জন। সব মিলিয়ে কম সে কম ৪০০ ব্যক্তি হজ্জের জন্য প্রস্তুতি নেন।[১১৪]

যিয়ারতে হারামাইনিশ্ শরীফাইন

অতঃপর আমীরুল মু'মিনীন তাঁর ভক্ত-মুরীদদেরকে নিয়ে কাফেলা করে হজ্জের উদ্দেশ্যে ১২৩৬ হিজরী ১লা শা'বান ১৮২১[১১৫] খ্রিস্টাব্দের ২রা জুলাই তাকীয়া শরীফ থেকে রওয়ানা দেন।[১১৬] ড. মতিউর রহমান এবং গোলাম রসুল মেহেরের মতে সফরের তারিখ ছিল ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে জুলাই।[১১৭] যা হোক আমরা আরবী মাসের তারিখকে মূল তারিখ ধরব।

দিনটি ছিল ঈদের দিন। ঈদের সালাত আদায়ের পর সঙ্গী-সাথী নিয়ে নিজ ভূমি রায়বেরেলী ত্যাগ করে কলিকাতার দিকে রওয়ানা দেন। উদ্দেশ্য, কলিকাতা থেকে জাহাজ ভাড়া করে জেদ্দায় যাওয়ার ব্যবস্থা করা।[১১৮] এ সময় হজ্জের সফরসঙ্গী ছিলেন ৪৩০ জনের মত। তবে "তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ", যব ঈমান কী বাদ বাহারী চলী ও 'সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ', এ সকল গ্রন্থে আছে যে, এ হজ্জের কাফেলায় লোক ছিল ৪০০ জনের মত।[১১৯] আর "আয়নায়ে ওয়ায়েসী"তে উল্লেখ আছে ৪৩৭ জন।[১২০]

যাহোক, তিনি রায়বেরেলী থেকে রওয়ানা হয়ে দালমু, সেখান থেকে তিনি মির্যাপুর,[১২১] এলাহাবাদ, বেনারস, গাযীপুর, ছাপড়া, দানাপুর, আজিমাবাদ, মুংগ,

---

১১৩. **মাখযানে আহমদী**, পৃ. ৬১; **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ২৬০।

১১৪. গোলাম রসুল মেহের, **সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ২৫৯।

১১৫. কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ আছে- হজ্জের উদ্দেশ্যে সফর করেন, ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে। দেখুন- ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, ইফাবা, ঢাকা-১২০৭, ৩য় সংস্করণ-২০০৯, পৃ. ১৬।

১১৬. **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ২৬১; তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমদ, পৃ. ৪৯; **যব ঈমান কী বাদ বাহারী চলী**, পৃ. ২৭।

১১৭. **সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ২৫৯; **আয়নায়ে ওয়ায়েসী**, পৃ. ৯৬।

১১৮. আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ইফবা, পৃ. ৯৪।

১১৯. **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ২৬১; তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমদ, পৃ. ৪৯; **যব ঈমান কী বাদ বাহারী চলী**, পৃ. ২৭।

১২০. ড. মতিউর রহমান, **আয়নায়ে ওয়ায়েসী**, পৃ. ৯৬।

১২১. **ওয়াকায়ে আহমাদী**, খ.১, পৃ. ৪৬৪-৪৬৬।

রাজমহল হুগলী হয়ে গংগা নদী দিয়ে নৌকা যোগে কলকাতায় এসে পৌঁছেন। এ সফরের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় সফর বিরতি দিয়ে তা'লীম ও দ্বীনের দাওয়াত দেন এবং বহু লোক তাঁর হাতে বয়াত গ্রহণ করে। এমনকি মির্জাপুরের পুরো শহরটাই তাঁর ভক্ত ও অনুসারীতে পরিণত হয়েছিল।[১২২]

হুগলী বন্দরে অবস্থান কালেই কলিকাতার বিশিষ্ট আইনজীবী মুন্সী আমীনুদ্দীন আহমাদ নৌকাযোগে এসে সাইয়্যেদ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং কাফেলার সব লোককে তাঁর মেহমান হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। এ সময় তিনি বলেন- সেখানে লোকদের থাকার জন্য একটি ঘর এবং পর্দাশীল মহিলাদের থাকার জন্যও বিশেষ জায়গা আছে। এ বাগান বাড়িতে পারিবারিক ব্যক্তিরাও থাকতে পারবে, তার ব্যবস্থাও আছে।[১২৩] মুন্সী আমীনুদ্দীন ছিলেন কোলকাতার প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য একজন ব্যক্তি। মুন্সী সাহেবের আন্তরিক ভক্তি এবং আগ্রহ লক্ষ করে সাইয়্যেদ সাহেব তার মেহেমানদারীর আবেদন মঞ্জুর করে বললেন: সর্বপ্রথম আপনার ওখানেই অবস্থান নিব।[১২৪]

কোলকাতায় অবস্থান

অবশেষে তিনি সফর মাসের ১২৩৭ হিজরী কোলকাতার ঘাটে এসে উপস্থিত হন। এ সময় ঘাট থেকে অবস্থান স্থল পর্যন্ত মানুষের ভীড় লেগে যায়। হিন্দু, মুসলিম, নাসারা এবং অন্যান্য আরও বহু সংখ্যক লোক একত্রিত হয়। [১২৫] মাগরীব নামাজের পর নৌকা আমীনুদ্দীনের বাগান বাড়িতে পৌঁছে। কাফেলার সমস্ত লোক এবং মহিলাদের অবস্থান নিতে নিতে মধ্যরাত পর্যন্ত চলে যায়।[১২৬] এ বাগান বাড়িতে পুরা কাফেলার নারী-পুরুষ সকলের জন্যেই ভালভাবে সংকুলান হয়ে যায়।

'মাখযানে আহমাদী' তে আছে: দু'মাস পর্যন্ত প্রত্যেক দিন ১০ থেকে ১৫ জন হিন্দু মুসলমান হত। এরপর দ্বিতীয় তৃতীয় দিন তাদের খাত্না হত।[১২৭]

আমীরুল মু'মিনীনের কোলকাতা অবস্থানকালে সারা এলাকা হেদায়েতের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। মানুষ তাদের ফিস্ক ফুযুরীর কাজ থেকে তওবাহ

---

১২২. ওয়াকায়ে আহমাদী, খ.১, পৃ. ৪২৩-৫০।

১২৩. ওয়াকায়ে আহমাদী, খ.১, পৃ. ৫৭১; সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ৩০৯-১০; মাখযানে আহমদী, পৃ. ৭১; গোলাম রসুল মেহের, সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ২৯২-৯২।

১২৪. ওয়াকায়ে আহমাদী, খ.১, পৃ. ৫৭১; সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ৩০৯-১০; মাখযানে আহমদী, পৃ. ৭১; গোলাম রসুল মেহের, সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ২৯২-৯২।

১২৫. ওয়াকায়ে আহমাদী, খ.১, পৃ. ৫৭২; সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ৩১৩।

১২৬. মাখযানে আহমদী, পৃ. ৭১-৭২; ওয়াকায়ে আহমাদী, খ.১, পৃ. ৬৩৩-৩৪।

১২৭. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলী, মাখযানে আহমদী, পৃ. ৭৫।

করে সাচ্চা মুসলমানে পরিণত হয়। উদাহরণ স্বরূপ সাধারণ একটা তথ্যের মাধ্যমে তখনকার অবস্থা আরও ভালভাবে অনুমান করতে পারবো। আর তা হল,

'ওয়াকায়ে আহমাদী' গ্রন্থে বর্ণিত আছে- সাইয়্যেদ সাহেব কোলকাতা অবস্থান কালে সেখানকার শারাবের দোকানগুলোর অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তার বেচাকেনা বন্ধ হয়ে যায়। দোকানদাররা ইংরেজ সরকারের কাছে অভিযোগ পেশ করে যে, আমরা বিনা কারণে সরকারের ট্যাক্স দিয়ে যাচ্ছি। কেননা এক বুযুর্গ বিরাট কাফেলাসহ এই শহরে আগমন করেছে। যার ফলে আমাদের দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। শহর এবং গ্রামাঞ্চলের সমস্ত মুসলমান তাঁর নিকট মুরীদ হয়েছে এবং তাদের সংখ্যা দিন দিন আরও বাড়ছে। আর যার কারণে তারা সকল প্রকার নেশা জাতীয় মাদকদ্রব্য থেকে তওবাহ করেছে। এখন আর কেউ আমাদের দোকানের ধারে কাছেও ভিড়ে না।[১২৮]

আসাম ও বাংলায় হেদায়েত ও তাবলীগ

কোলকাতায় অবস্থান কালের এ সময়টাতে তাঁর অনেক অনুসারী বাংলার বিভিন্ন জেলা যেমন- ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, নোয়াখালী, ও অন্যান্য স্থানও থেকে তাঁর সাক্ষাৎ লাভের উদ্দেশ্যে কোলকাতায় এসে উপনীত হন। এদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর সাথে হজ্জব্রতও পালন করেন। কোলকাতায় অবস্থান কালে সাইয়্যেদ সাহেব তাঁর বিশিষ্ট মুরীদ ও খলীফা চট্টগ্রামের মাওলানা সূফী নূর মোহাম্মদ নিযামপুরী র. (মৃ. ১৮৫৮ খৃ.), নোয়াখালীর মাওলানা ইমামুদ্দীন র. (১৭৮৮-১৮৫৭ খৃ.) ও ঢাকার মাওলানা আব্দুল্লাহকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর সমাজ সংস্কার ও জিহাদের বাণী প্রচারের জন্য নিয়োগ করেন।[১২৯]

'মাখযানে আহমদী'র লেখক বলেন, এ জগত ও জনসমাজে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, (দেখলে) তুমি বলতে এ যেন নবীর যুগ পুনরুজ্জীবন লাভ করেছে।

দুঃস্থ ও অভাবীবের সাহায্য সহযোগীতা

'মাখযানে আহমাদী' গ্রন্থে উল্লেখ আছে- কোলকাতায় অবস্থান কালে অনেক অভাবী এবং শরীফ লোক সাইয়্যেদ সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হত। কেউ তার মেয়ের-ছেলের বিয়ে শাদীর জন্য, কেউ ঋণ পরিশোধের সাহায্যের জন্য, কেউ মসজিদ নির্মানের জন্য এবং কেউবা আবার কূপ খননের জন্য তাঁর নিকট সাহায্যের প্রার্থনা করত। তো তিনি কাউকেই না বলতেন না। ব্যবসায়ী শায়খ আব্দুল লতীফ সাহেব মির্জাপুরী এ মহান খেদমতের দায়িত্ব যার উপর অর্পিত

---

[১২৮]. ওয়াকায়ে আহমাদী, খ.১, পৃ. ৫৮৫; সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ৩১৯; তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ, পৃ. ৫৮।

[১২৯]. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, পৃ. ১৬।

ছিল; তিনি বলেন, কোলকাতায় অবস্থানকালে বিভিন্ন সাহায্য প্রার্থী এবং অভাবী লোক কে দশ হাজার রুপি দান করেছিলেন।[১৩০]

এ সকল সফরে তাঁর খেলাফতপ্রাপ্ত মুরীদ গাজীয়ে বালাকোট চিশ্‌তিয়ার তরীকার উর্ধ্বতন পীর চট্টগ্রামের মিঠানালার মলিয়াশ গ্রামের সূফী নূর মোহাম্মদ নিযামপুরী র. (মৃ. ১৮৫৮খৃ.) তাঁর সাথেই ছিলেন।

এভাবে পথিমধ্যে হজ্জ কাফেলা ৪০০/ ৪৩৭ থেকে ৭৭৫[১৩১] জনে পরিণত হয়।

জাহাজ ভাড়া ও হাজীদের সংখ্যা

প্রথমে তিনি পুরা জামাআ'ত কে দশ ভাগে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক দলের জন্য একটি করে জাহাজ ও প্রত্যেক দলের জন্য একজন করে আমীর নির্ধারণ করে দেন। এ সময় জাহাজে কাফেলার লোক ব্যতীত বাহিরে অন্য কোন লোক উঠেছিল কিনা জানা যায় না। [১৩২]

'ওয়াকায়ে আহমাদী' গ্রন্থে উল্লেখ আছেঃ এ সফরে তিনি **১১**টি জাহাজ ভাড়া করেন।[১৩৩] জাহাজগুলোর নাম হল- ১. দরিয়া বাকা, ২.ফাতহুল বারী, ৩.আতিউর রহমান, ৪. গুরাবে আহমাদী, ৫.ফাতহুল কারীম, ৬. ফায়েযে রব্বনী, ৭. ফায়যুল করীম, ৮.আব্বাসী, ৯. তাজ এবং ১০. ফাতহুর রহমান।[১৩৪]

এ সময় হজ্জ কাফেলায় সর্বমোট লোক নিয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেনঃ ৭৭৫ জন।[১৩৫] কেউ বলেন ধনী গরীব মিলে লোক ছিলেন ৮০০ জন।[১৩৬]

তবে 'ওয়াকায়ে আহমাদী' গ্রন্থকারের মত অনুযায়ী কাফেলোয় লোক সংখ্যা ছিল সাড়ে ৮ শ'র মত। সাধারণভাবে কাফেলায় লোক ছিল ৭০০ জন। এ এছাড়াও আরও ৫৭ ছিল মিসকীন এবং ১০০ জনের এর কাছাকাছি ছিল ছেলে মেয়ে। সর্বমোট মিলে হজ্জ কাফেলায় লোক ছিল প্রায় আটশত পঞ্চাশ (৮৫০) জনের মত।[১৩৭] এরপর **'ওয়াকায়ে আহমাদী'** গ্রন্থে এসব লোকদের একটি খাদ্যদ্রব্যের তালিকা তুলে ধারা হয়। যার দ্বারা তার সংখ্যাকে সঠিক বলে ধারণা করা যায়।

---

[১৩০]. **মাখযানে আহমদী**, পৃ. ৭৭।

[১৩১]. মাখযানে আহমদী গ্রন্থে উল্লেখ আছে- ৭৫৩ জনের কথা। দেখুনঃ মাখযানে আহমদী সূত্র ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ৩, পৃ. ২৪৪।

[১৩২]. গোলাম রসুল মেহের, **সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ৩০১।

[১৩৩]. **ওয়াকায়ে আহমাদী**, খ.১, পৃ. ৬৬১।

[১৩৪]. **ওয়াকায়ে আহমাদী**, খ.১, পৃ. ৬৬১।

[১৩৫]. আবুল হাসান আলী নদভী, **যব ঈমান কী বাদ বাহারী চলী**, পৃ. ২৮।

[১৩৬]. **হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ. কা হজ্জ আওর উস কে আছারাত**, পৃ. ৭৯।

[১৩৭]. নওয়াব মুহাম্মদ উযীর খান বাহাদুর, **ওয়াকায়ে আহমাদী**, খ.১, পৃ. ৬৬৫।

হজ্জ ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা

আমীরুল মু'মিনীন কোলকাতার এক বাগান বাড়িতে তিন মাস অবস্থান করেছিলেন।[১৩৮] অবশেষে আসে সেই শুভক্ষণ কাঙ্খিত সফর যিয়ারতে হারামাইন শরীফাইনের পথে রওয়ানা হওয়ার দিন। তিনি 'দরিয়া বাকা' নামক জাহাজে আরোহন করেন। এ সময় নদীর তীরে মানুষের ঢল নামে। তিনি তাঁর দু'হাত উঁচু করে উচ্চস্বরে বললেন 'আস্সালামু আলাইকুম' উপস্থিত হাজারো জনতা ভক্ত-অনুরক্ত মুরীদ মু'তাকেদ সালামের উত্তর দিল এবং এ সময় অনেক মানুষ কাঁদতে থাকে। আমীরুল মু'মিনীন অনেক দূর পর্যন্ত হাত দিয়ে ইশারা করতে থাকেন।[১৩৯] আর হাজার হাজার মানুষ জাহাজের সাথে সাথে নদীর কিনারা ধরে চলতে থাকে। এ অবস্থায় মাগরিবের ওয়াক্ত চলে আসলে সবাই ফিরে আসেন।[১৪০] আমীরুল মু'মিনীন মাগরিবের নামাজ জাহাজে বসে আদায় করেন। নামাজ শেষে জাহাজ ছাড়ার জন্য আদেশ করেন।[১৪১] সর্বশেষ জাহাজটি ছাড়ে সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভী রহ. এর 'দরিয়া বাকা'।[১৪২] এটি ছিল সবচেয়ে ধীরগতির এবং পুরাতন। অনেকেই এটাতে আরোহণ না করার অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু এটাকেই তিনি সর্বপ্রথম বেছে নিয়েছিলেন।[১৪৩]

জাহাজে মীলাদ মাহ্ফিলের আয়োজন

'মাখযানে আহমাদী' গ্রন্থে উল্লেখ আছে: জাহাজ সমুদ্রে পৌঁছলে অস্বাভাবিক তরঙ্গমালায় দুলতে লাগল। সায়্যিদ আহমদ র. সকলকে একস্থানে সমবেত করে নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর দরবারে দুআ আরম্ভ করলেন। সকলে 'আমীন' বলতে লাগলেন। দুআ'র ফলে সকলে এমন অভিভূত হলেন যে, দুআ' গ্রহণযোগ্য বলে অন্তরে সাড়া দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে জাহাজের অনুকূলে বাতাস প্রবাহিত হতে আরম্ভ করল। উত্তাল তরঙ্গমালা শান্ত ভাব ধারণ করল। জাহাজ অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে এগিয়ে চললো। রাত্রিকালে জাহাজ শ্রীলংকার কাছে পৌছলে সায়্যিদ সাহেব সমস্ত রাত্রি পাহারাদারের মতো কখনো উপরে কখনো নিচে আনাগোনা করতে লাগলেন। তার কারণ সম্পর্কে পরে তিনি বলেন, ভয়ংকর দৈত্য দানব দল

---

[১৩৮]. নওয়াব মুহাম্মদ উযীর খান বাহাদুর, **ওয়াকায়ে আহমাদী**, খ.১, পৃ. ৫৮৪।

[১৩৯]. **হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ. কা হজ্জ আওর উস কে আছারাত**, পৃ. ৮০-৮৩; গোলাম রসূল মেহের, **তাহরীকে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ৩০৭; আবুল হাসান আলী নদভী, **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ৩৪১-৪২।

[১৪০].গোলাম রসুল মেহের, **তাহরীকে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ৩০৭।

[১৪১]. আবুল হাসান আলী নদভী, **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ৩৪২।

[১৪২]. গোলাম রসুল মেহের, **তাহরীকে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ৩০৬।

[১৪৩]. **ওয়াকায়ে আহমাদী**, খ.১, পৃ. ৬৬৮; **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ৩৪০; **সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ৩০৩।

আমাদের ছোট্ট কাফেলার উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের লাঞ্ছিত করে ফিরিয়ে দিয়েছেন। বেরেলভী র. এর স্বীয় ভাগিনা **মাওলানা মুহাম্মদ আলী বলেনঃ**

صبح صادق ...... وجہازاز مکان خوف وہولناک بخیریت تمام بدرآمد وہرگاہیکہ روز روشن شد ناخدا چندطبق حلوای از حجرۂخویش برون آوردہ مجلس مولود شریف کردہ بعدازاختتام قصاید مولودیہ شرینی تقسیم نمود

প্রভাতে জাহাজ বিপজ্জনক ঘাটি অতিক্রম করলো। জাহাজের নাবিক শিরনির আয়োজন করলেন। সায়্যিদ সাহেব মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করলেন। মীলাদ মাহফিলে আরবী কাছিদা আবৃত্তি করা হলো। অতঃপর শিরনি বিতরন করা হলো।[১৪৪]

অবশেষে মক্কা মোয়াজ্জামায়

হজ্জের সফরে তিনি বিভিন্ন স্থানে যাত্রা বিরতি দেন। যেমন 'আদন', ইয়ামানের প্রসিদ্ধ 'মুখা' নামক বন্দর, 'হাদীদা'[১৪৫] নামক স্থান করে ইয়ালামলাম পাহাড়ের কাছাকাছি পৌঁছল সবাই গোসল করে ইহরাম বাঁধেন[১৪৬] এবং দু'রাকাত নামাজ আদায় করে তালবীয়া পাঠ করেন।[১৪৭] অত:পর ২৩শে শা'বান ১২৩৭ হিজরী বুধবার মোতাবেক ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই মে জোহরের সময়[১৪৮] জেদ্দায় উপনীত হন।[১৪৯] জেদ্দায় তিনি ৫ দিন অবস্থান নেন।[১৫০] অত:পর জেদ্দা থেকে রওয়ানা দিয়ে ২৮/[১৫১] ২৯[১৫২] শে শা'বান ২১শে মে ১৮২২ খৃ. মক্কা মোয়াজ্জামার কাছাকাছি পৌঁছেন। এরপর সেখান থেকে তিনি জান্নাতুল মুয়া'ল্লায় গমন করেন এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীযাতুল কুবরা রা. এর মাযার শরীফে কিছু সময় অবস্থান নেন।[১৫৩] এরপর কাফেলা বাবুস্ সালাম দিয়ে হারাম শরীফে প্রবেশ

---

১৪৪. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলী, মাখযানে আহমাদী, পৃ. ৮৫।

১৪৫. নওয়াব মুহাম্মদ উযীর খান বাহাদুর, ওয়াকায়ে আহমাদী, খ.১, পৃ. ৭১০।

১৪৬. ওয়াকায়ে আহমাদী, খ.১, পৃ. ৭১১; আবুল হাসান আলী নদভী, সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ৩৫১।

১৪৭. আবুল হাসান আলী নদভী, সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ৩৫১।

১৪৮. নওয়াব মুহাম্মদ উযীর খান বাহাদুর, ওয়াকায়ে আহমাদী, খ.১, পৃ. ৭১১।

১৪৯. **যব ঈমান কী বাদ বাহারী চলী**, পৃ. ২৮; তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ, পৃ. ৬২; সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ৩৫২।

১৫০. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলী, মাখযানে আহমদী, লাহোর, পৃ. ৯০।

১৫১. গোলাম রসুল মেহের, তাহরীকে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ৩১৩।

১৫২. মাওলানা মোহাম্মদ হামযাহ, তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, পৃ. ৬২।

১৫৩. গোলাম রসুল মেহের, তাহরীকে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ৩১৩।

করেন এবং তাওয়াফ করেন।[১৫৪] এরপর হারাম শরীফের সন্নিকটে তাবু গাড়েন। পরের দিন রমযানুল মোবারাকের চাঁদ দেখা দেয়।[১৫৫]

ইমাম ও মাশায়েখদের বয়াত

অত:পর ২০ শে রমজান তিনি এ'তেকাফের নিয়াত করেন এবং শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা গেলে মাগরিবের নামাজের পর তাঁর অবস্থান স্থলে গমন করেন। ঈদের দিন মক্কা মুয়াজ্জামার বড় বড় ওলামা মাশায়েখ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, শায়খ উমর ইবন আব্দুর রসুল হানাফী, যিনি অনেক প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ছিলেন এবং আরবে তখন তাঁর মত আলেমের দেখা মিলতো না।[১৫৬] মক্কার হানাফী মুসাল্লার ইমাম শায়খ মুস্তফা মিরদাদ, খাজা আগা আলমাস হিন্দী, শায়খ শামসুদ্দীন শাতা, এবং মিশরের সুলতান এর উপ-প্রধান মন্ত্রী শায়খ হাসান ইফেন্দীসহ প্রমূখ মহান মহান ব্যক্তিরা।[১৫৭]

হজ্জের মাস শুরু

অবশেষে আগমন করল কাঙ্খিত হজ্জের মাস। ১২৩৭ সালের ৮ই জিলহাজ্জ আমীরুল মু'মিনীন এবং তাঁর সাথীরা ইয়ামুত তারবীয়ার দিন হাতীমে অবস্থান নেন। এ সময় তারা দীর্ঘ দোয়ায় মশগুল হন এবং সকলেই অঝোরধারায় কাঁদছিলেন। উপস্থিত আগত হাজীরা তাদের এ রকম অবস্থা দেখে তাদের চোখও অশ্রুসিক্ত হয়।[১৫৮]

মিনায় অবস্থানকালে তিনি প্রথম আকাবার প্রান্তরেও উপস্থিত হন। যেখানে রাসূল পাক সা. এর হাতে আনসারদের প্রথম দল বাইয়াত হয়েছিল। সাইয়্যেদ আহমাদ বেরেলভী রহ.ও সেখানে বসেই জিহাদের জন্য মুরীদের কাছ থেকে বাইয়াত গ্রহণ করেন।[১৫৯] ইয়াওমুন নাহারের (১০ই জিলহাজ্জ) পর তিনি মিনায় ৩ দিন অবস্থান নেন। এ সময় তিনি প্রতিদিন কুরবানী করেন। ১৩ই জিলহজ্জ পাথর নিক্ষেপের পর মক্কা মোয়াজ্জামায় ফিরে আসন।[১৬০] এভাবে মক্কা মোয়াজ্জামায় হজ্জের যাবতীয় কার্যাবলী আদায় করেন।

---

[১৫৪]. সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ৩৫৩; গোলাম রসুল মেহের, তাহরীকে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ৩১৩।

[১৫৫]. তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, পৃ. ৬২।

[১৫৬]. নওয়াব মুহাম্মদ উযীর খান বাহাদুর, ওয়াকায়ে আহমাদী, খ.২, পৃ. ১০৭৫-৭৬।

[১৫৭]. হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ. কা হজ্জ আওর উস কে আছারাত, পৃ. ১০৫; সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ৩৫৩-৫৪; তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, পৃ. ৬২-৬৩; তাহরীকে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ৩১৫।

[১৫৮]. তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, পৃ. ৬৩।

[১৫৯]. সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ৩৫৭; গোলাম রসুল মেহের, তাহরীকে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ৩১৭।

[১৬০]. হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ. কা হজ্জ আওর উস কে আছারাত, পৃ. ১১৮।

যিয়ারতে সাইয়্যেদুল মুরসালিন

অত:পর রাসূলে পাক সা. এর রওজা শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্য সফর করেন। মুহাররম মাসে ১২০টি উট ভাড়া করে রওয়ানা দেন।[১৬১] যখন মদীনার কাছাকাছি পৌঁছেন তখন তিনি অনেক অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, হুযুরে পাক সা., হযরত আলী রা., হযরত ফাতেমা রা. ও হযরত হোসাইন রা. তাঁর নিকট আগমন করেন এবং প্রত্যেকেই তাদের একটি হাত তাঁর কাঁধের উপর রেখে তাকে সান্ত্বনা এবং শেফা দিচ্ছিলেন।[১৬২] তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। অতঃপর মাগরীবের পর যুল হুলাইফাতে পৌঁছেন। সেখান থেকে রওয়ানা দিয়ে যখন তারা এমন এক স্থানে পৌঁছেন, যেখান থেকে রওযা মোবারক দেখা যায়। তখন তাদের মাঝে রাসুল প্রেমের জোশ এবং মোহাব্বতের আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। সাথে সাথে তারা দরুদ সালাম ও কাসীদা এবং না'ত গাইতে থাকেন। অবশেষে সকলে রওজায়ে আত্বহারে তাশরীফ নেন এবং রাসুলে আরাবীর রওযা মোবারকের যিয়ারতে ধন্য হন।[১৬৩]

গোলাম রসুল মেহের উল্লেখ করেন যে, নওয়াব উযীরুদ্দৌলা তাঁর **'ওয়াসাইয়া'** গ্রন্থে লেখেন যে, সাইয়্যেদ সাহেব মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছেই রাসুলে পাক সা. এর রওযা মোবারকের সামনে দাঁড়িয়ে যান। যেদিন তিনি মদীনায় পৌঁছেন সেদিন রাতে তিনি অনেক অসুস্থ হয়ে পড়েন। অত:পর তিনি তাঁর রওযায়ে আতহারের সামনে বসে যান। এ সময় তাঁর রাসুলে পাকের যিয়ারত নসীব হয়।[১৬৪]

মদীনা শরীফে অবস্থান কালে তিনি এক এক করে মদীনা শরীফের আছার বা নিদর্শনাবলীর সকল স্থানসমূহ যিয়ারত করেন। যেমন, জান্নাতুল বাকী, হযরত হামযা রা. এর মাযার, উহুদ পাহাড়, মসজীদে কিবলাতাইন, মসজিদেব কোবা ও বীরে খাতিম সহ আরো বহু স্থান যিয়ারত করেন।[১৬৫]

অবশেষে মক্কা মোয়াজ্জামায় ফিরে আসেন।[১৬৬] তিনি মদীনা মোনাওয়ারায় ১ মাস যাবত অবস্থান করেছিলেন। ০৯ ই রবীউল আউয়াল ১২৩৮ হিজরীতে মদীনা থেকে রওয়ানা দেন।[১৬৭] তবে **'মাখযানে আহমাদী'** এর লেখক উল্লেখ করেন যে, তিনি ২৯ শে রবীউল আউয়াল মদীনা থেকে রওয়ানা দেন।[১৬৮]

---

[১৬১]. গোলাম রসুল মেহের, **তাহরীকে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ৩১৯।

[১৬২]. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলী, মাখযানে আহমদী, পৃ. ১০৩-০৪।

[১৬৩]. **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ৩৬০-৬১; **তাহরীকে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ৩২০-২১।

[১৬৪]. **তাহরীকে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ৩২৩, (হাশিয়া); নওয়াব ওয়াযীরুদদৌলা, **ওয়াসাইয়া**, খ. ১, পৃ. ২৯-৩০।

[১৬৫]. মাওলানা মোহাম্মদ হামযাহ, তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, পৃ. ৬৪।

[১৬৬]. গোলাম রসুল মেহের, **তাহরীকে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ৩২২।

[১৬৭]. গোলাম রসুল মেহের, **তাহরীকে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ৩২৩।

[১৬৮]. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলী, **মাখযানে আহমদী**, পৃ. ১০৯।

যে পথ দিয়ে মদীনা তাশরীফ নিয়েছিলেন পুনরায় সে পথ ধরেই তিনি রওয়ানা দেন। যুল হুলাইফা পৌঁছে তিনি এহরাম বাঁধেন। এবং ওয়াদিয়ে ফাতেমা হয়ে মক্কায় পৌঁছেন। [১৬৯]

দেশের উদ্দেশ্যে সফর এবং কোলকাতায় অবস্থান

এভাবে দ্বিতীয় বছর রমজান মাসও তিনি মক্কা মোয়াজ্জামায় অতিবাহিত করেন এবং দেশের উদ্দেশ্য রওয়ানা দেন। ১৫ই শাওয়াল ২৫ শে জুন ১৮২৩ খৃ. মক্কা মোয়াজ্জামা থেকে রওয়ানা দেন।[১৭০] তবে মনজুরা গ্রন্থকারের মতানুযায়ী ১৫ই শাওয়াল ২৫ শে জুন ১৮২৩ খৃ. মক্কা মোয়াজ্জামা থেকে রওয়ানা নয় বরং প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।[১৭১]

ফেরার পথেও তিনি বিভিন্ন স্থান অতিক্রম করে গঙ্গা নদী হয়ে ২রা সফর ১২৩৯ হিজরী ১২ই অক্টোবর ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কোলকাতায় পৌঁছেন।[১৭২]

কোলকাতায় অবস্থান কালে তিনি মাওলানা ইমামুদ্দীন বাঙ্গালী এবং নূর মোহাম্মদ নিযামপুরী রহ. কে বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন।[১৭৩] আমীরুল মু'মিনীন কোলকাতায় কয়েকদিন[১৭৪] অবস্থান করেছিলেন এবং আগের মতই বাংলার জামাতকে সুসংঘবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেন। ইমামুদ্দীন বাংগালী পূর্ব বাংলার নোয়াখালী, কুমিল্লা, ঢাকা ও মোমেনশাহী এলাকায় প্রেরিত হন। মৌলভী বরকতুল্লাহ উত্তর বঙ্গে এবং সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী রহ. কলকাতার আশে-পাশে প্রচার ও সংগঠনের কাজ শুরু করেন।[১৭৫]

কোলকাতা থেকে রওয়ানা হয়ে তিনি 'মঙ্গলকোট' 'মুর্শিদাবাদ' 'মুঙ্গ' 'বাড়াহ' 'আজীমাবাদ' 'ঢাকিয়া', 'দানাপুর', 'ভোজপুর', 'হালসার', 'ছাপড়া', 'রাইলগঞ্জ', 'বুকসার', হয়ে 'মাহমুদাবাদ' 'ইউসুফপুর' বেনারস মির্জাপুরে এলাহাবাদ আহলাদগঞ্জ এরপরে মুস্তফাআবাদ সহ অন্যান্য স্থান পার হয়ে তিনি[১৭৬] ১২৩৯ হিজরীর ২৯শে শা'বান মুতাবিক ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ শে এপ্রিল রায়বেরেলী তে

---

১৬৯. মাওলানা মোহাম্মদ হামযাহ, তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, পৃ. ৬৪।

১৭০. গোলাম রসুল মেহের, তাহরীকে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ৩২৪।

১৭১. **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ**, খ. ১, পৃ. ৩৬৭; **সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ. কা হজ্জ আওর উস কে আছারাত**, পৃ. ১৫৭।

১৭২. গোলাম রসুল মেহের, তাহরীকে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ৩২৩।

১৭৩. **সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ. কা হজ্জ আওর উস কে আছারাত**, পৃ. ১৭৫; **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ৩৬৮।

১৭৪. মাওলানা মোহাম্মদ হামযাহ, তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ, পৃ. ৬৫।

১৭৫. **আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম**, পৃ. ৯৫-৯৬।

১৭৬. **সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ৩৬৯- ৩৭৮; **তাহরীকে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ**, খ. ১, পৃ. ৩২৫-২৭; **তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, পৃ. ৬৫।

পদার্পন করেন। তাঁর এ মহান সফরে অতিবাহিত হয়েছিল ২বছর ১০[১৭৭] মাস।[১৭৮] কেহ বলেন: ২৯ শে এপ্রিল।[১৭৯] ১২৪১ হিজরীর ৭ই জামাদিউস সানী মুতাবিক ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী জিহাদের উদ্দেশ্য বের হওয়া পর্যন্ত সর্বমোট এক বছর ১০মাস যাবত কাল তিনি রায়বেরেলীতে অবস্থান করার সুযোগ পেয়েছিলেন।[১৮০]

তিনি যতদিনে রায় বেরেলীতে পৌঁছেন ততো দিনে বার্মা সীমান্ত থেকে শুরু করে দিল্লী পর্যন্ত তাঁর মহিমাময় দাওয়াত ও এশাদের পৌঁছে যায়। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টার ফলে শিরক ও বিদ'আতের সকল জঞ্জাল থেকে মুক্ত হয়ে খালেস তাওহীদের বিপ্লবী মন্ত্রে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল।[১৮১]

এখানে এটাই ছিল তাঁর জীবনের শেষ অবস্থান। কিন্তু বসে থাকেননি এখানেও। ছিলেন কর্মমূখর সারাদিন। দাওয়াত-তাবলীগ ও হেদায়েতের কার্যক্রমের সাথে সাথে জিহাদের প্রতি উৎসাহব্যঞ্জক কর্ম ব্যস্ততাও ছিল ব্যাপকভাবে। এ সামান্য অবস্থানকালীন সময়টার পুরোটাই নিজ গ্রামে অবস্থিত খানকা "দায়রায়ে শাহ আলামুল্লাহ রহ." ছিল কার্যকরী ও আধ্যাত্মিকতার প্রশিক্ষণ দান কেন্দ্র হিসাবে বিরাজমান।[১৮২]

সিল্‌সিলা

আমীরুল মু'মিনীন ছিলেন ফুরফুরা শরীফের মুজাদ্দিদে যামান আবু বকর সিদ্দীকি রহ. এর পর দাদা পীর এবং মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী রহ. পীর মুরশিদ। সিলসিলার ধারাবাহিকতা হল:

ফুরফুরার মুজাদ্দিদে যামান আবু বকর সিদ্দীকি রহ. → সূফী ফতেহ আলী রহ. → গাযীয়ে বালাকোট সূফী নুর মোহম্মদ নিযামপুরী রহ. → আমীরুল মু'মিনীন শহীদে বালাকোট সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভী রহ.→ শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. এভাবে রাসুল সা. পর্যন্ত।

'মাখযানে আহমাদী' গ্রন্থে আমীরুল মু'মিনীনের থেকে তিনটি সিলসিলা তথা চিশতিয়া, কাদরিয়া + মোজাদ্দেদিয়া ও নকশাবন্দীয়া ত্বরীকার ধারাবাহিক সনদ রাসুলে পাক সা. পর্যন্ত উল্লেখ করেন।[১৮৩] পাঠকরা তা দেখে নিতে পারেন।

---

১৭৭. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান উল্লেখ করেন ২বছর ১১ মাসের কথা। -জিহাদী আন্দোলনে বাংলার ভূমিকা, পৃ. ৯৬।

১৭৮. তাহরীকে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ৩২৭; সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ, খ. ১, পৃ. ৩৭৫ ।

১৭৯. ড. মতিউর রহমান, আয়নায়ে ওয়ায়েসী, পৃ. ৯৭।

১৮০. **যব ঈমান কী বাদ বাহারী চলী**, পৃ. ২৯; **তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, পৃ. ৬৬।

১৮১. 'আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম' গ্রন্থের মাওলানা মুহিউদ্দীন খান কৃত, জিহাদ আন্দোলনে বাংলার ভূমিকা, পৃ. ৯৬।

১৮২. **তাযকিরায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ**, পৃ. ৬৬।

১৮৩. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলী, **মাখযানে আহমাদী**, পৃ. ০৮-১২।

খলিফাবৃন্দ

"মৌলভী আব্দুল আহাদ সাহেব বলেছেন যে, হযরত সাইয়্যেদ সাহেবের হাতে চল্লিশ হাজারের অধিক হিন্দু ইত্যাদি অমুসলমান মুসলমান হয়েছিলেন। প্রায় ত্রিশ লক্ষ মুসলমান তাঁর হাতে মুরীদ হয়েছিলেন। আর তাঁর খলিফাগণের ও খলিফাগণের মুরিদের সংখ্যা কয়েক কোটি হবে।"[১৮৪] এ স্থানে কতগুলো খলীফার নাম উল্লেখ করা হচ্ছে-

১. মাওলানা আব্দুল হাই সাহেব। ইনি মাওলানা শাহ আব্দুল আযীয সাহেবের জামাতা ছিলেন। ২. মাওলানা আব্দুল গণি সাহেব। ইনিও উক্ত শাহ সাহেবের ছোট ভাই। ৩. মাওলানা মাখসুসুল্লাহ সাহেব। ইনি মাওলানা শাহ রফী উদ্দীন সাহেবের পুত্র। ১০. হাজী শাহ আব্দুর রহীম সাহেব বেলায়েতি। ১১. মিয়াজী শাহ নূর মোহাম্মদ সাহেব। (ইনি হাজী মাওলানা এমদাদুল্লাহ সাহেবের পীর মুরশীদ। ১৩. মাওলানা কারামত আলী সাহেব (জৌনপুরী)। ১৪. মাওলানা ইমামুদ্দীন বাঙ্গালী সাহেব (নোয়াখালী)। ১৫. গাজীয়ে বালাকোট সূফী নূর মোহাম্মদ নিযামপুরী সাহেব। ১৬. শেখ মোহাম্মদ উমর মুফতিয়ে মক্কা (ইনি শায়খুল ওলামা আব্দুর রহমান সেরাজের শিক্ষক) ১৭. সাইয়্যেদ আকীল। ১৮. সাইয়্যেদ হামযা (এ দুই বুযুর্গ (সাইয়্যেদ আকীল এবং সাইয়্যেদ হামযা) মক্কা শরীফের অলী ছিলেন। এরা কাশফের দ্বারা সাইয়্যেদ সাহেবের দরজা অবগত হয়ে তাঁর হাতে মুরীদ হয়েছিলেন। ১৯. খাজা আলমাস (ইনি মদীনা শরীফের গাওস ও প্রধান অলী ছিলেন)। ২০. শেখ মোস্তফা মেরদাদ (ইনি মক্কা শরীফের হানাফী মোসাল্লার ইমাম ছিলেন)। ২১. শেখ শামসুদ্দীন শাতা মিসরী (ইনি বায়তুল্লাহ শরীফের ওয়াজের উপদেষ্টা ছিলেন)। ২২. শেখ মোহাম্মদ আলী হিন্দী (ইনি মক্কা শরীফের মোদার্‌রেস ছিলেন)। ২৩. হাফেয মাগরেবী শেখ আহমদ ইবন ইদ্রীস (ইনি মাগরেবী বাদশাহের উজির ও হাফেযে সহীহ বুখারী ছিলেন)। ২৪. ওমর ইবন আব্দুর রাসুল (প্রসিদ্ধ অলী ও হানাফী মোহাদ্দিস)। ২৫. শেখ বোখারামী (মদীনা শরীফের মোদাররেস)।[১৮৫]

এরূপ আরব, রোম, শাম, মিসর, বুলগেরিয়ার হাজার হাজার আলেম ও আম লোক তাঁর নিকট মুরীদ হয়েছিলো।

শাহাদাত

ইমামুত ত্বরীকত আমীরুল মু'মিনীন সাইয়্যেদ আহমাদ বেরেলভী র. ১২৪৬ হিজরীর ২৪ শে জিলকদ মুতাবিক ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ৬ মে তারিখে শুক্রবার শিখদের বিরুদ্ধে বালাকোট ময়দানে শাহাদাত বরণ করেন।

* সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, ডেমরা, ঢাকা।

[১৮৪]. মৌলভী মুহাম্মদ জা'ফর থানেশ্বরী, তাওয়ারিখে-আজীবা, পৃ. ৭৪।

[১৮৫]. মওলবী জা'ফর থানেশ্বরী, তাওয়ারীখে আজীবাহ, পৃ. ১৩৯-১৪১; কারামতে আহমদীয়া, পৃ. ২৬-২৯।

শহীদে বালাকোট
সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)
আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী

যুগ যুগ ধরে ভারত ভূমিতে ধর্মের নামে অধর্মের যে আবর্জনা সঞ্চিত হয়েছিল তা দূর করে খুলাফায়ে রাশিদীনের আদর্শের উপর হুকুমত প্রতিষ্ঠার পথে বালাকোট প্রান্তরে শহীদ হয়ে অগণিত ভক্তের হৃদয়ে নবজীবন দান করলেন যিনি, তিনি হলেন হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)।

শুভ জন্ম ও বংশ পরিচয়

সায়্যিদ আহমদ (র.) বেরেলভী বিখ্যাত হাসানী সায়্যিদ পরিবারে ৬ই সফর ১২০১ হিজরী মুতাবিক ২৯শে নভেম্বর ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহন করেন।

নসবনামা

সায়্যিদ আহমদ বিন সায়্যিদ মুহাম্মদ ইরফান বিন সায়্যিদ মুহাম্মদ নূর বিন সায়্যিদ মুহাম্মদ হুদা বিন সায়্যিদ আলামুল্লাহ বিন সায়্যিদ মুহাম্মদ ফুদাইল বিন সায়্যিদ মুহাম্মদ মুয়াযযম বিন সায়্যিদ আহমদ বিন সায়্যিদ মাহমুদ বিন সায়্যিদ আলা উদ্দীন বিন কুতবুদ্দীন ছানী বিন সায়্যিদ মুহাম্মদ ছদর উদ্দীন বিন সায়্যিদ মুঈনুদ্দীন বিন সায়্যিদ আহমদ বিন সায়্যিদ আলী বিন সায়্যিদ কিয়ামুদ্দীন বিন সায়্যিদ ছদরুদ্দীন বিন সায়্যিদ রুকনুদ্দীন বিন সায়্যিদ নিজামুদ্দিন বিন সায়্যিদ কুতুবউদ্দিন বিন সায়্যিদ আহমদ মাদানী বিন সায়্যিদ মুহাম্মদ ইউসূফ বিন সায়্যিদ ঈসা বিন সায়্যিদ হাসান বিন সায়্যিদ হুসাইন বিন সায়্যিদ জাফর বিন সায়্যিদ কাসিম বিন সায়্যিদ আব্দুল্লাহ বিন সায়্যিদ মুহাম্মদ ছানী বিন সায়্যিদ আব্দুল্লাহিল আশজার বিন সায়্যিদ মুহাম্মদ ছাহেব নাফছে যাকিয়া বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসান মুসান্না বিন ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বিন আমীরুল মু'মিনীন আলী বিন আবি তালিব কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু।

জনসেবায় কিশোর সায়্যিদ আহমদ (র.)

কৈশরে পদার্পণ করলে সায়্যিদ সাহেবের হৃদয়ে এমন অস্বাভাবিক জনসেবার প্রেরণা জাগে যে বড় বড় সাধুপুরুষকেও তার কাছে হার মানতে হয়। তিনি

অনাথ, বিধবা ও দূর্বল প্রতিবেশীদের দ্বারে দ্বারে সকাল সন্ধ্যা হাজিরা দিতেন এবং তাদের জিজ্ঞেস করতেন, "পানি ও জ্বালানি কষ্টের প্রয়োজন আছে কি?" প্রতিবেশীরা সায়্যিদ সাহেবের বাপ-দাদার মুরীদ ছিল। তাঁরা উওরে বলত "কেন আমাদের লজ্জা দিচ্ছেন, আমরাতো আপনাদের খাদিম।" সায়্যিদ সাহেব তাদের কথা শুনে খিদমত থেকে বিরত থাকতেন না বরং তাদেরে খিদমতের ফজিলত সম্পর্কে বুঝাতেন এবং সম্মত করে প্রয়োজন মিটাতেন। তিনি সম্ভ্রান্ত সায়্যিদ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও নিজেকে মানুষের নগন্য খাদিম মনে করতেন। বাজার থেকে সওদা কিনে এনে, পানিভর্তি কলসি মাথায় নিয়ে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতেন, জঙ্গল থেকে জ্বালানীকাঠ সংগ্রহ করে নিজের চাদরে বোঝা বেধে মাথায় করে প্রতিবেশীর ঘরে পৌঁছে দিতেন।

আত্মভোলা কিশোর অন্যের সমালোচনায় কান না দিয়ে আপন মনে গরীব দুঃখীদের খিদমত করে যেতেন। তার প্রশান্ত চাহনি দুঃখী জনের ব্যাথাভরা হৃদয়ে শান্তির প্রস্রবন প্রবাহিত করত। স্নেহমাখা মুখে দু'টি কচি অধর যেন নীরব ভাষায় ঘোষণা করতঃ গরীব অসহায় বন্ধুরা আমার! আমি তোমাদের কাছে দানের প্রতিদান চাইনা। তোমাদের ধন্যবাদ পাওয়ার ইচ্ছা আমার নেই। আমি দয়াময়ের করুণাভিখারী, শেষ বিচারে জবাবদেহীর ভয়ে শঙ্কিত।

এতীম, বিধবা ও দূর্বল প্রতিবেশীরা যেন তাদের হৃদয়ের ভাষা দিয়ে বলত হে কিশোর! তোমার জীবন ধন্য হোক; তোমার রিক্ত হস্ত, তোমার নিঃস্বার্থ সেবার প্রতিদান দিতে অপারগ। যিনি ধনী-দরিদ্র পথের কাঙ্গাল সবারই মালিক তার দরবারে আমানত রইল তোমার জন্য দু'ফোটা আখিঁজল।

গোলাব যেমন সৌরভ বিতরণে অপরকে আনন্দিত করেই নিজের জীবনকে স্বার্থক মনে করে, কোন প্রতিদানের আকাংখা মনে রাখেনা সায়্যিদ আহমদ (র.) ও সেরূপ নিস্বার্থভাবে পরের সুখ স্বাচ্ছন্দ বিধান করেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করতেন। আল্লাহ তা'য়ালা তার নেক বান্দাহদের সম্পর্কে বলেছেন-

وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا

তরজমা

এবং তারা আল্লাহর মোহাব্বতে মিসকীন, এতীম ও কয়েদীকে খাদ্য দান করে (মনে মনে বলে) কেবলমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাদের খাদ্য দেই, তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান, ধন্যবাদ চাই না। আমরা আমাদের প্রতিপালকে পক্ষ থেকে আসন্ন কঠোর ভয়াবহ নৈরাশ্যজনক কিয়ামতের দিনের জন্য শঙ্কিত। (সূরা দাহর, আয়াত ৮-৯)

তাই দেখা যায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার প্রকৃত উম্মতেরা নিঃস্বার্থভাবে মানুষের খিদমত করে গেছেন। সম্মান প্রতিপত্তিলাভের আশায়, অন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করার কুমতলবে যে দান করা হয় সে দান মুসলমানী

দান নয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন সময় পবিত্র হস্তে আসহাবে সুফফার সাহাবগণের জীর্ণবস্ত্র পর্যন্ত সেলাই করে দিতেন।

বুকারটি ওয়াশিংটন, লেডি ওফদি লেম্প, দেশবন্ধু চিওরঞ্জন প্রমূখ অমুসলমান মানব দরদীর কাছ থেকেও আমরা অনেক কিছুই শিখতে পারি। যুগোপযোগী কার্যসূচীর মাধ্যমে দুস্থ মানুষের কল্যাণ সাধনে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারি, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে প্রতি পদক্ষেপে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত, আমরা যেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ থেকে দুরে সরে না যাই। সারা জীবন হারভাঙ্গা খাটুনির পর খালি হাতে যেন মালিকের দরবারে না যাই। যতদিন বেচেঁ আছি আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে তার কাছে গ্রহণযোগ্য কাজ করার তৌফিক দান করেন। আমিন।

ইবাদত-বন্দেগী

জনসেবার সাথে সাথে ইবাদতের প্রতিও সায়্যিদ সাহেবের গভীর আগ্রহ ছিল। দিনের বেলায় মানুষের খিদমতে মশগুল থাকতেন। কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন এবং এক একটি আয়াতের অন্তর্নিহিত রহস্য সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতেন।

রাত্রে মানুষ যখন নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ত, কর্মকোলাহল মূখর ধরনী মৌন রূপ ধারন করত তখন তিনি দাড়িয়ে দারিয়ে নামাজ পরতেন আর খোদার দরবারে দু'হাত তুলে মুনাজাত করতেন। হৃদয়ের দুয়ার খুলে দিয়ে একাগ্রমনে চিরজাগ্রত পরম বন্ধুর প্রেমের ধ্যান করতেন।

মুরশিদের দরবারে

সায়্যিদ আহমদ (র.) যখন প্রথম দিল্লিতে শাহ আব্দুল আযীব (র.)- এর খিদমতে উপস্থিত হলেন তখন শাহ সাহের (র.) করমর্দন ও আলিঙ্গনের পর জিজ্ঞাস করলেন, আপনার দেশ কোথায়? সায়্যিদ আহমদ (র.) উত্তরে বললেন, 'বেরেলী থেকে এসেছি'। বেরেলীর নাম শুনে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, বেরেলীর কোন খান্দানের? সায়্যিদ সাহেব উত্তরে বললেন 'বেরেলীর সায়্যিদ বংশের'। সায়্যিদ বংশের কথা শুনে শাহ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন-বেরেলীর সায়্যিদ আবু সাঈদ সাহেব ও সায়্যিদ আবু নু'মান সাহেব কে জানেন? সায়্যিদ সাহেব উত্তরে বললেন- সায়্যিদ আবু সাঈদ সাহেব আমি অধমের নানা ও সায়্যিদ নুমান সাহেবের পিতৃব্য। সায়্যিদ আহমদ (র.)-এর পরিচয় পেয়ে শাহ আব্দুল আযীব (র.) পুনর্বার দাড়িয়ে তার সাথে করমর্দন ও আলিঙ্গন করে জিজ্ঞেস করলেন, এত দূর দেশ থেকে দূর্গম পথ অতিক্রম করে কি উদ্দেশ্যে আপনি দিল্লিতে এসেছেন? সায়্যিদ

আহমদ (র.) বিনয়ের সহিত নিবেদন করলেন, আপনার অস্তিত্বকে দূর্লভ মনে করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা হৃদয়ে নিয়ে দূর বেরেলী থেকে ছুটে এসেছি আপনার দরবারে।

তখন শাহ আব্দুল আযীয (র.) সায়্যিদ সাহেবকে এই বলে বরণ করে নিলেন "খোদার ফজলে পিতামহ ও মাতামহের হাতের আমানত তোমার হাতেই ফিরে আসবে।" তারপর একজন খাদেমকে ডেকে বললেন, এই মেহমানকে ভাই মৌলভী আব্দুল কাদীরের কাছে পৌঁছে দিয়ে বলো, তিনি যেন এই সম্মানিত অতিথির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। মেহমানের বিস্তারিত অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন।"

যাই হোক সায়্যিদ সাহেব, হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল কাদীর সাহেবের সাহচর্যে এক পবিত্র পরিবেশে দিন কাটাতে লাগলেন।

শাহ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ

১২২২ হিজরীতে সায়্যিদ আহমদ (র.) শাহ আব্দুল আযীয (র.) এর হাতে বায়আত গ্রহন করেন। প্রথম দিন কলব লতিফার তালিম আরম্ভ হয়। ২য় দিনে অন্য পাঁচ লতিফা খোলে যায়। তৃতীয় দিনে সুলতানুল আযকার স্তর অতিক্রম করেন।

চতুর্থ বৈঠকে নফি ও ইসবাতের স্তর অতিক্রম করেন। তারপর মুরশিদের হিদায়াত মত বিভিন্ন ধরনের মুরাকাবা আরম্ভ করেন এবং প্রত্যেক স্তরে খোদার মেহেরবানীতে অস্বাভাবিক উন্নতি লাভ করেন।

বেলায়েতে আওলিয়া ও বেলায়েতে আম্বিয়া

কিছুদিন পর সায়্যিদ সাহেবের প্রিয় মুরশিদ শাহ আব্দুল আযীয (র.) তাকে ডেকে বললেন, "খোদার মেহেরবানীতে তুমি বেলায়েতে আম্বিয়া লাভ করেছ।"

যারা বেলায়েতে আওলিয়া লাভ করেন তারা নির্জনতাকে পছন্দ করেন। রাতদিন যিকর, তিলাওয়াত, নফল নামাজ ইত্যাদি কাজে মশগুল থাকেন। ওয়াজ নসীহতের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকে না। আর সে সমস্ত সৌভাগ্যবান মানুষ বেলায়েতে আম্বিয়া লাভ করেন তাদের অন্তর আল্লাহর মুহাব্বতে ভরপুর থাকে। নিয়ত মানুষকে সৎপথে আহবান করেন। দুনিয়াদার ও সমালোচকদের বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তাওহীদ ও সুন্নাতের বাণী প্রচার করতে থাকেন। মানুষের হিদায়েতের জন্য ওয়াজ মাহফিলে অংশ গ্রহণ করেন।

বিশ্বের বিস্ময় ছিলেন এই দরবেশ

অতি অল্প সময়ের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে আসাম পর্যন্ত সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.)'র আধ্যাত্মিক রাজত্ব কায়েম হয়েছিল। তিনি শুধু ভারতীয়

মুসলমানদের কাছেই পরিচিতি নন বরং এই দরবেশ বৃটিশ সিংহের টনক নাড়িয়ে দিয়েছিল। অক্সফোর্ড, ক্যাম্বব্রিজেও তার সম্পর্কে গবেষণা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

WW Hunter মুসলমানদের মনে সায়্যিদ আহমদ (র.) সম্পর্কে কু-ধারণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'the Indian Musalmans' পুস্তক প্রণয়ন করার প্রয়োজন অনুভব করেন।

হান্টার সাহেবের এই প্রচেষ্টায় বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই; দীর্ঘ চৌদ্দশত বছর ধরে হান্টার সাহেবদের কলমে আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গদের চিত্র বিকৃত করে আঁকা হয়ে আসছে। এ ধরনের বিকৃত চিত্রপ্রিয় এক শ্রেণীর মুসলমান নামধারী লোক শুধু সায়্যিদ আহমদ (র.) সম্পর্কেই নয় তারিক, সুলতান মোহাম্মদ, আরঙ্গজেবের সম্পর্কেও ধাঁধায় পড়ে কাদা ছুড়েন। দয়াময়! তোমার মকবুল বান্দাগণ সম্পর্কে আমাদের অন্তরে যেন কোন ধারণা সৃষ্টি না হয়। আমীন।

স্বপ্নে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ

সায়্যিদ আহমদ এক রামাদ্বান মাসের একুশ তারিখে শাহ আব্দুল আযীয সাহেবের খিদমতে আরজ করলেন, "রামাদান শরীফের তৃতীয়াংশের কোন এক রাত্রে শবে কদরের ফজিলত লাভের আশায় বিশেষ গুরুত্ব সহকারে রাত জেগে ইবাদত করব"। শাহ সাহেব উত্তরে বললেন তোমার রাত্রিজাগরণের অভ্যাসত এই দশদিনে ইবাদত করো কেবল জেগে থাকলে কাজ হয়না। দেখো, কত চৌকিদার ও পুলিশ সারারাত জাগে কিন্তু এই দৌলত থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। যদি তোমার অবস্থা আল্লাহ তায়ালার কৃপা দৃষ্টির অনুকূলে থাকে তবেই তিনি তোমাকে মহান রাতের বরকত দানের জন্য যথাসময়ে খবর দিবেন।

মুরশিদের আদেশ মতো সায়্যিদ আহমদ (র.) শবে কদরের অপেক্ষা করতে লাগলেন। ২৭ সে রমাদ্বানের রাত্রিতে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ইবাদত করবেন বলে ঠিক করলেন। কিন্তু সিদ্ধান্তমত বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারল না, ইশার নামাজ শেষ করেই নিদ্রার তারনায় শুয়ে পড়লেন। রাতের তৃতীয়াংশে স্বপ্নে দেখলেন তাঁর ডান পাশে বসে আছেন প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর বাম পাশে বসে আছে প্রিয় নবীর সুখ দুঃখের সাথী হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)। প্রিয় নবী আদর করে ডাকলেন হে আহমদ! জাগো। গোসল করো।

সায়্যিদ আহমদ তৎক্ষনাৎ হাউযের ঠান্ডা পানিতে গোসল করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপস্থিত হলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সম্বোধন করেন, "হে আমার প্রিয় ফরযন্দ! আজ শবে কদর, আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করো, আল্লাহর কাছে মুনাজাত কর।"

তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ) কে সঙ্গে নিয়ে প্রস্থান করেন। সায়্যিদ আহমদ (র.) এই রাত্রির ঘটনা সম্পর্কে প্রায়ই বলতেন -আমি অধমের প্রতি এই মহিমান্বিত রাত্রে খোদার অশেষ করুণা বর্ষিত হয়েছিল। আমি অনুভব করেছিলাম পৃথিবীর সব কিছু খোদার উদ্দেশ্য সিজদারত। সবই খোদার গুনগানে মশগুল। যদিও চর্মচক্ষে সবকিছু স্বস্থানে অবস্থিত মনে হচ্ছিল। আমি এই সময় আত্মিক উন্নতি লাভ করে, পূর্ন বিলীন ও পূর্নমগ্নতার ধ্যানে পরিপক্কতা লাভ করে। সায়্যিদ আহমদ (র.) ঘটনাটি আব্দুল আযীয (র.) কে শুনান। তিনি ঘটনাটি শুনে খুবই আনন্দিত হন এবং আমাকে বলেন, আল্লাহর শোকর; তুমি তোমার আকাংখিত বস্তু লাভ করেছ।

দ্বিতীয়বার স্বপ্নে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ

এই ঘটনার কিছুদিন পর তিনি পুনরায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্বপ্নে দেখেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরম যত্নে তিনটি খুরমা মুখে তুলে দেন। পবিত্র খুরমা ভক্ষণের পর তার হৃদয়ে যে অনুপম মধুর অনুভূতি সৃষ্টি হয় তা স্বপ্ন ভঙ্গের পরও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

স্বপ্নে হযরত আলী (রাঃ)-এর দর্শন লাভ

সায়্যিদ আহমদ (র.) কিছুদিন পর হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে স্বপ্নে দেখেন। হযরত আলী (রাঃ) স্বহস্তে তাকে গোসল করান এবং ফাতিমা (রাঃ) তাকে এক প্রস্থ কাপড় দান করেন।

সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল

কিছুদিনের মধ্যে সায়্যিদ সাহেবের সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। আল্লাহ যেন তার বান্দাদের অন্তরের মোড় সায়্যিদ সাহেবের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। নানা স্থান থেকে দাওয়াত আসতে লাগল। সায়্যিদ আহমদ (র.) তার মুর্শিদের অনুমতি নিয়ে মানুষের হেদায়েতের জন্য ভ্রমণ আরম্ভ করলেন। বিদায় বেলায় শাহ আব্দুল আযীয (র.) তার প্রিয় খলিফা সায়্যিদ আহমদ (র.) কে নিজের জামা দান করলেন। সায়্যিদ আহমদ (র.) ১৮১৮ খৃস্টাব্দে দিল্লি থেকে বের হন। তিনি বেরেলী পৌঁছা পর্যন্ত ছ'মাস সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানসমূহ ভ্রমন করেন। গাজীআবাদ, মুরাদনগর, মিরাঠ কান্দলহ, বুদ্ধনা, মুজাফরনগর, দেওবন্দ, গাংগু, নানুত, থানাবন, রামপুর, সহোরানপুর, শিকারপুর ও শেখপুরা ইত্যাদি।

উল্লেখিত স্থান সমূহের হাজার হাজার লোক সায়্যিদ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। বহু লোক তার হাতে বায়আত করে আবিদ শ্রেণীভূক্ত হয়ে যায়। তিনি যেখানে সামান্য সময় অবস্থান করেন সেখানকার অনাবাদ মসজিদগুলি আবাদ হয়ে যায়, শিরক ও বিদআত দূর হয়ে যায়।

তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া

হিন্দুস্তানে তিনটি প্রসিদ্ধ তরিকা প্রচলিত ছিল। চিশতিয়া, কাদেরিয়া ও নকশবন্দিয়া। তাছাড়া নকশবন্দিয়া তরিকার একটি শাখাকে মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত বলে মুজাদ্দিদিয়া বলা হত। সায়্যিদ আহমদ উল্লেখিত তরীকাসমূহ ছাড়া মুহাম্মদী তরীকার ও বায়আত নিতেন। এই সফরে রামপুরে অবস্থানকালে সায়্যিদ আহমদ (র.) কে তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। তিনি উত্তরে বলেন, তরীকায়ে মুহাম্মদিয়ার তাৎপর্য এই : প্রত্যেক মানুষের প্রতিটি কাজ যেন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হয়। যেমন পাপ থেকে বিরত থাকার জন্য বিবাহ করা, শরীয়তসিদ্ধ নিয়মে অন্নসংস্থানের জন্য বৈধ সম্পদ সংগ্রহ করে নিজেকে ও পরিবার বর্গকে পরামুখাপেক্ষী হইতে না দেওয়া, রাতের শেষদিকে তাহাজ্জুদ নামাজ ও ইবাদত করার উদ্দেশ্যে প্রথম দিকে নিদ্রা যাওয়া। এভাবে জীবনের প্রতিটি কাজে একমাত্র খোদার সন্তুষ্টি লাভকেই মূল উদ্দেশ্য মনে করা তরীকায়ে মুহাম্মদিয়ার সার। অর্থাৎ চার তরিকা মোতাবিক যিকির, ফিকর ও মোরাকাবা করার সাথে সাথে জীবনের সকল কর্ম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা মুতাবিক খালিস আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সম্পন্ন করার উপর প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করাই তরীকায়ে মুহাম্মদিয়ার মূল উদ্দেশ্য।

জিহাদের প্রস্তুতি

সায়্যিদ আহমদ (র.) এর সময় ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল এই- ইংরেজরা সমস্ত ভারত গ্রাস করতে চলছে। মোঘল এর ধ্বংসাবশেষের উপর গজিয়ে ওঠা রাজ্যগুলোর পরিচালকদের মধ্যে নৈতিক দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। তারা নিজের আরাম-আয়েশকে মুসলমানদের জাতীয় উন্নতির অনেক ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছে। তারা ও ইংরেজ অজগরের গ্রাসে পরিণত হতে চলেছে। শিখরা পাঞ্জাবে মুসলমানদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে হিন্দুদের চক্রান্তে অনেক এলাকার মুসলমানদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় চেতনা লোপ পেয়েছে। জিহাদের সে উদ্যম আর তাদের হৃদয়ে নেই। টিপু সুলতান ও হায়দার আলীর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এখন সায়্যিদ আহমদ (র.) এর মত একজন সাচ্চা মুজাহিদের নেতৃত্বে জিহাদের প্রয়োজন দেখা দিল। তিনি জিহাদ করবেন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে, শিখের বিরুদ্ধে।

বহুদিন থেকে সায়্যিদ আহমদ (র.) এর কাজটি আরম্ভ করার ইচ্ছা ছিল। এখন তিনি সহস্র সহস্র ভক্তের মুর্শিদ, যারা আল্লাহ ও রাসূলের দিনের জন্য প্রাণ দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না। তিনি ভক্তদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন।

সায়্যিদ সাহেবের দরবারে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.)

সায়্যিদ আহমদ (র.) এর বিশিষ্ট খলিফা মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) বাংলা ও আসামের মুসলমানদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত তিনি মাত্র ১৮ বছর বয়সে বেরেলীতে সায়্যিদ আহমদ এর দরবারে উপস্থিত হন এবং অল্প দিনের মধ্যে কামালিয়াত লাভ করেন।

হজ্জ

সায়্যিদ আহমদ (র.) ঠিক করে ফেলেছিলেন যে তিনি দলবল সহ কোনো নিরাপদ স্থানে হিজরত করে চলে যাবেন এবং সেখান থেকে ভারতে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠাকল্পে জিহাদ আরম্ভ করবেন কিন্তু তিনি হঠাৎ কর্মসূচি পরিবর্তন এর ঘোষণা করলেন, হজ্জে যাবেন। হঠাৎ মত পরিবর্তন করার কারণ ছিল এই অনেক ওলামা নামধারী ব্যক্তি জলপদ নিরাপদ নয় বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন যে ভারতবাসীর উপর এখন হজ্জ করা ফরয নয়। সায়্যিদ সাহেবের মুরশিদ আব্দুল আজিজ (র.) এই ফতোয়া কে দৃঢ়ভাবে খণ্ডন করেন।

সায়্যিদ আহমদ (র.) ঠিক করলেন যে তিনি দলবল সহ নিজে হজ্জে গেলে ভারতবাসী মুসলমানদের মন থেকে ফতোয়া দ্বারা সৃষ্ট ধারণাটি সহজে দূর হবে। তাই তিনি জিহাদ আরম্ভ করার আগে এই পবিত্র কাজটি সমাধান করতে বদ্ধ পরিকর হলেন। স্বীয় শিষ্যদের কাছে এই মর্মে পত্র লিখলেন আমি এবারে হজ্জে যাব যথাসময়ে প্রস্তুত হয়ে আসেন। হিন্দুস্তান জুড়ে সাড়া পড়ে গেল, রাসুলের আশিক বান্দারা জমা হতে লাগলেন।

১২৩৬ হিজরীর ১লা শাওয়াল চারশত হজযাত্রীকে নিয়ে সায়্যিদ সাহেব তকিয়া শরীফ থেকে রওয়ানা হন। তার কাছে কয়েকটি টাকা ছিল। তিনি তা গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। একমাত্র খোদার ভরসা রেখে সমস্ত কাফেলাকে নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেন।

ষোল মাইল পথ অতিক্রম করার পর কাফেলাকে নিয়ে ডলমুর অনতিদূরে এক বাগানে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল দুজন অশ্বারোহী তীব্রবেগে বাগানের দিকে ছুটে আসছে। অশ্বারোহীদ্বয়ের পিছনে পিছনে চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোকও আসতেছে। তারা কাছে এসে থেমে গেলেন। সায়্যিদ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে তার কাছে বায়আত করলেন। তারপর অশ্বারোহীদের একজন সায়্যিদ সাহেবের কাছে নিবেদন করলেন -আমরা দুই সহোদর আমি জ্যেষ্ঠ। এ পথে আপনার আগমন সংবাদ জানতে পেরে বেশ কয়েকদিন থেকে আপনার সমস্ত কাফেলাকে দাওয়াত করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নিচ্ছি। আজ আহার্যদ্রব্য প্রস্তুত আরম্ভ করেছি এমন সময় আমার ছোট ভাই আড়ি পেতে বসলো। সে আমার আগেই আপনার কাফেলাকে দাওয়াত করতে চায়। আমাদের

মধ্যে এ নিয়ে বিরাট ঝগড়ার সৃষ্টি হয়ে গেছে। মীমাংসায় পৌছা সম্ভবপর হচ্ছে না। এখন আপনার আদেশ শিরোধার্য।

সায়্যিদ আহমদ (র.) উভয়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে ঝগড়াটার ফয়সালা করে দিলেন। তারা সন্তুষ্ট চিত্তে সায়্যিদ আহমদ সাহেব কে কাফেলা সহ ডলমুতে নিয়ে গেলেন। সায়্যিদ সাহেব এখানে সপ্তাহকাল অবস্থান করলেন।

এক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় শত শত ভক্ত প্রবরে আগমনে জান্নাতী পরিবেশ সৃষ্টি হল। সহস্রাধিক নর-নারী সায়্যিদ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলো। স্থানে স্থানে ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা হলো। শহরে উলামেয়ে কিরাম শিরক বিদ'আতের পরিনাম, তাওহীদের মাহাত্ম্য এবং হজের ফজিলত ইত্যাদি বিষয়ে ওয়াজ করলেন।

চতুর্দিকে ঘোষণা করা হলো পরের দিন ফজরের নামাজের পর সায়্যিদ সাহেব ওয়াজ করবেন। সায়্যিদ সাহেবের ওয়াজ ও প্রতিক্রিয়া মাওলানা ওয়াহীদ উদ্দিন সায়্যিদ সাহেবের নিকট নিবেদন করলেন যে, "আজ রুগ্ন ব্যক্তি অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সামনে উপস্থিত। এখন চিকিৎসকের শুভদৃষ্টির প্রয়োজন। তখন আহসানুল খালিকীন অর্থাৎ চির সুন্দর আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর বর্ণনা আরম্ভ করলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলার কোন নিয়ামতের কিভাবে শুকরিয়া আদায় করতে হয় তা ব্যাখ্যা করলেন। দৈহিক সৌন্দর্য, ধন দৌলত এর কিভাবে শুকরিয়া আদায় করতে হয় তাও উপস্থাপন করলেন। তারপর মৃত্যু, কবর, হাশর ইত্যাদি ভয়াবহতা এমনভাবে বর্ণনা করলেন যে উপস্থিত লোকেরা বেহুশ হয়ে গেলেন। কামরার অভ্যন্তরে থেকে ওয়াজ শুনে মেয়ে লোকটি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। সে পাগলিনীর মত ছুটে এসে সায়্যিদ সাহেবের সামনে উপস্থিত হয় ও বায়আত করল। তারপর মুন্সী সাহেবও বায়আত করলেন।

মেয়েলোকটি সায়্যিদ সাহেবকে উকিল নিয়োগ করে বলল- হুজুর যেকোনো নগণ্য বা উচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তির সাথে আমাকে শাদী দিতে পরেন। তখন সায়্যিদ সাহেব ঐ মাহফিলেই মুন্সি সাহেবের সাথে তার শাদী দিলেন। শাদীর পির তিনি খোদাভীরু ও পরহেযগার হিসেবে সারা জীবন অতিবাহিত করেন।

গোলাম হোসেনের পরিণতি

গোলাম হোসেন কলকাতার একজন বিত্তশালী লোক ছিলেন। তাঁর নিকট ৯০ লাখ টাকা নগদ মজুদ ছিল। দিবারাত্রি সে একটি নেশায়ই মশগুল থাকতো যে কিভাবে আরো এক লাখ টাকা নগদ জমা করে কোটিপতি হবে। সে ছিল ব্যভিচারি ও শরাবী। সায়্যিদ সাহেব কে পরম শত্রু মনে করত সে। তিনি মদ, অন্যায় কর্ম নৃত্য, গীত নিষেধ করতেন। সে বলতো সায়্যিদ সাহেব যত বেশি এ সকল কর্ম নিষেধ করেন ততবেশি আমার অন্তরের আকর্ষণ এ সকল কর্মের প্রতি বেড়ে যায়।

সায়্যিদ সাহেব এর অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলেন কিন্তু তার সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি।

একদিন আসরের নামাজ শেষ করে সায়্যিদ সাহেব ময়দানে পায়চারি করছিলেন। হঠাৎ মাথার টুপি খুলে বললেন, "আল্লাহর গযব গোলাম হোসেন দালালের উপর নাযিল হয়ে গেল"। পরে জানা গেল যে গোলাম হোসেন পাগল হয়ে গেছে। সে প্রায় সময়ই পাগল অবস্থায় অতিবাহিত করত। মাঝেমধ্যে হুশ ফিরে আসলে বলতো, সায়্যিদ সাহেবকে নিয়ে আসো অথবা আমাকে সায়্যিদ সাহেবের নিকট নিয়ে যাও। লোকেরা তখন তাকে সায়্যিদ সাহেবের নিকট নিয়ে গেলে কিছুক্ষণ সে আরাম অনুভব করত। সায়্যিদ সাহেবের নিকট থেকে চলে গেলে আবার পাগল হয়ে যেত। এমতাবস্থায় সে তার পার্থিব ধন সম্পদ ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করেন। কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলো না।

গুজারিশ: আর্থিক সম্পদ সংগ্রহ করার নেশায় মশগুল অনেক ব্যক্তি পথিমধ্যে আযরাঈল (আঃ) এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। সম্পদ আহরণের নেশাটা অসীম অথচ মানুষের জীবন সসীম। মৃত্যু কোন সময় আসে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

এক মদ্যপায়ীর তাওবাহ

এক সম্পদশালী মুসলমান শরাবের প্রতি এতো অধিক আকৃষ্ট ছিল যে, দিনরাত সে শরাব পান করত। সায়্যিদ সাহেবের খিদমতে উপস্থিত হয়ে একদিন বলল আমি আপনার নিকট তাওবাহ করে সব নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ করব। তবে আমাকে শরাব পানের অনুমতি প্রদান করতে হবে। কেননা শরাব ছাড়া আমার পক্ষে বাঁচাই মুশকিল। সায়্যিদ সাহেব বললেন, তাই হোক। শুধু আমার সামনে শরাব পান না করলেই হয়। সায়্যিদ সাহেবের কথা শুনে ওই ব্যক্তি আনন্দচিত্তে তাওবাহ ও বায়য়াত করে ঘরে প্রত্যাবর্তন করেন। ঘরে পৌঁছে যখন শরাবের নেশায় অনুভব করল তখন খাদিমকে ডেকে বললেন, শরাবের পেয়ালা টা নিয়ে আয়। খাদিম নির্দেশ মত শরাবের পেয়ালা পূর্ণ করে সামনে রাখলো। লোকটি শরাবের পেয়ালা হাতে নিয়ে চুমুক দিবে এমন সময় দেখলেন দাঁতে অঙ্গুলী চেপে সায়্যিদ আহমদ (র.) দাঁড়িয়ে আছেন তার সামনে। তখনই তিনি দাঁড়ালেন এবং শরাব পান না করার প্রতিজ্ঞা করে পেয়ালা ফেলে দিলেন। তারপর দেখলেন, সায়্যিদ সাহেব ওখানে নেই। মনে মনে ভাবলেন হয়তো তার চোখে ধাঁধা লেগেছে। সায়্যিদ সাহেব তো ওখানে আসেননি।

তারপর আবার খাদেমকে ডেকে বললেন এক পেয়ালা শরাব নিয়ে আয় খাদিম নির্দেশমতো এক পেয়ালা নিয়ে আসে। এবার শরাবের পেয়ালায় চুমুক দিতে উদ্যত হওয়া মাত্র দেখলেন, সায়্যিদ সাহেব পূর্বের মত দাঁড়িয়ে আছেন।

তিনি তৎক্ষণাৎ পেলাটি ফেলে দিলেন। সায়্যিদ সাহেবকে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু সায়্যিদ সাহেব লাপাত্তা। অতঃপর এক কামরায় এসে তিনি সব দরজা জানালা বন্ধ করে শরাব তলব করেন। কিন্তু পেয়ালা হাতে তুলতেই দেখলেন, সায়্যিদ সাহেব পূর্বের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি পেয়ালাটা ফেলে দিয়ে সায়্যিদ সাহেবকে ডাকতে ডাকতে অগ্রসর হলেন। কিন্তু সায়্যিদ সাহেব অদৃশ্য হয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত পায়খানায় প্রবেশ করে শরাব পানের চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেখান থেকেও দেখলেন যে সায়্যিদ সাহেব পূর্বের মত দাঁড়িয়ে আছেন। অতঃপর লোকটি শরাব পান ত্যাগ করে তাওবাহ করেন।

সূরা ফাতিহার তাফসীর

সায়্যিদ আহমদ (র.) উন্নতি লাভ করলে শাহ আব্দুল আযীয (র.) স্বীয় মুরিদগণকে বলে দিয়েছিলেন, 'এখন যা কিছু হবার সায়্যিদ সাহেবের দ্বারাই হবে।' ফলে শাহ আব্দুল আযীয (র.)-এর মুরিদগণের মধ্যে বহু বিশিষ্ট উলামায়ে কিরাম সায়্যিদ সাহেবের সঙ্গী হন। তন্মধ্যে একজন বিশিষ্ট আলিম ছিলেন সায়্যিদ নেসার আলী। তিনি সায়্যিদ সাহেবের সাহচর্য অবলম্বন করেন এবং কলকাতায় সায়্যিদ সাহেবের সাথে ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, তখন কলকাতায় তিনজন স্বনামধন্য বিজ্ঞ আলিম ছিলেন। একজনের নাম মৌলভী রশিদ যিনি 'হেদায়া' কিতাব ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। ২য় জনের নাম মৌলভী মোয়াজ্জেম হোসেন। ৩য় জনের নাম বর্ণনাকারী উল্লেখ করেন নি। বর্ণনাকারী বলেন, কোন এক সময়ে সায়্যিদ সাহেবের নিকট কেবলমাত্র আমি উপস্থিত ছিলাম অন্য কেউ ছিলনা। এমন সময়ে বর্ণিত তিন আলিম সায়্যিদ সাহেবের খিদমতে উপস্থিত হয়ে সায়্যিদ সাহেবের বিদ্যা পরখ করার উদ্দেশ্যে সূরা ফাতিহার তাফসির জিজ্ঞাসা করেন। তখন সায়্যিদ সাহেব সূরা ফাতিহার তাফসির এমন সুষ্ঠুভাবে বর্ণনা করলেন যে, উপরোক্তি তিন আলিম তা শ্রবণ করে বিস্মিত হন। তাঁরা তৎক্ষণাৎ সায়্যিদ সাহেবের হাতে বায়আত করেন।

হিন্দু শেঠের ইসলাম গ্রহণ

জাফর থানেশ্বরী তৎপ্রণিত হায়াতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ গ্রন্থে লিখেছেন- মখযনে আহমদী প্রণেতা নবাব আজিরুদ্দৌলা উভয়েই নিম্নলিখিত ঘটনা নিজ পুস্তকে উল্লেখ করেছেন।

ঘটনাটি এইঃ বাংলাদেশের সিলেট শহরে বিরাট ঐশ্বর্যশালী এক হিন্দু বসবাস করতেন। তিনি দেখলেন আকাশ থেকে একটি সিঁড়ি নেমেছে। সিঁড়ি বেয়ে প্রথম আসমানে উপস্থিত হয়ে দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে দেখলেন উত্তম পোষাক পরে সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট এক লোক আসনে উপবিষ্ট। তাকে সালাম করে জিজ্ঞেস

করলেন আপনার সম্মানিত নাম কি? তিনি উত্তর দিলেন আমি বনি আদমের পিতা 'আদম'। স্বপ্ন দর্শনকারী ব্যক্তি বলেন আমি বামপাশে একটি দরজা দেখলাম যে দরজার অভ্যন্তরে কান্নাকাটির চিৎকার শুনলাম। দরজা দিয়ে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করে দেখলাম অভ্যন্তর ভাগে আগুনের লেলিহান শিখা ও মেঘমালার মতো ধোঁয়া স্থানটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মানুষের কান্নাকাটি ও আর্তনাদের রোল উঠেছে। অভ্যন্তরভাগে বিকট দুর্গন্ধ যা অসহনীয়। অবস্থা দর্শনে আমি সজ্ঞাহীন হয়ে পড়লাম। আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন আমাকে ডান পার্শের দরজার নিকটে নিয়ে যান। নির্দেশ মোতাবেক তিনি আমাকে ডান পাশের দরজার সম্মুখে নিয়ে গেলেন। উক্ত দরজা দিয়ে প্রবাহিত সুগন্ধি বাতাসের প্রভাবে আমি আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। চেয়ে দেখলাম অভ্যন্তরভাগে রয়েছে লাল জওহর মুতি নির্মিত দালান সমুহ। ফুলে ফলে সুশোভিত সবুজ বৃক্ষরাজি। স্বচ্ছ জলের নানাবিধ প্রস্রবণ প্রবাহিত। আমি আনন্দ চিত্তে কুর্সীতে উপবিষ্ট ব্যক্তির নিকট গিয়ে উভয় স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ডান দিকে একত্ববাদী মুমিনদের স্থল এবং বামদিকে যারা আল্লাহর ইবাদত ত্যাগ করে মূর্তিপূজা করে সে সকল কাফির ও মুশরিকদের কয়েদখানা। তুমি তাদের দলভুক্ত যদি কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করো তবে তোমার ঠিকানা ও দোযখে হবে যে দোযখ তুমি সচক্ষে অবলোকন করলে। যেহেতু এখনো তোমার মৃত্যুর সময় আসেনি তাই ইচ্ছা করলে মুত্যুর পূর্বে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে তাওবাহ করে সে বেহেশতটিকে ঠিকানা করে নিতে পার যা তুমি স্বচক্ষে অবলোকন করলে। উভয় স্থানের ব্যাখ্যা প্রদানের পর কুর্সীতে উপবিষ্ট ব্যক্তি (আদম আঃ) বললেন আল্লাহর তরফ থেকে একজন হিদায়াতকারী যিনি বর্তমানে হজ্জের পথে কলিকাতায় অবস্থান করছেন কিছুদিনের মধ্যে তিনি স্থান ত্যাগ করে হজ্জে চলে যাবেন। তুমি তার নিকট পৌছে তাওবাহ করে ইসলাম গ্রহণ করো।

উক্ত হিন্দু শেঠ স্বপ্নভঙ্গের পর মেইল গাড়িতে আরোহন করে সিলেট থেকে কলিকাতায় পৌছে সায়্যিদ সাহেবের নিকট উপস্থিত হন। সায়্যিদ সাহেব তাঁর সমস্ত ঘটনা ও স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণ করে তাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। সায়্যিদ আহমদ সাহেব হিন্দু শেঠকে খতনা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। সুস্থ হয়ে বায়আত করে ঐ ব্যক্তি তাঁর বাড়ীতে ফিরে আসেন।

কলিকাতায় বায়আত গ্রহণ

কলিকাতায় তিন মাস সময় সায়্যিদ আহমদ (র.) অবস্থান করেন। সেখানে বায়আত করার জন্য এত বেশী লোকের ভীড় জমে যে পাঁচশত থেকে হাজার পর্যন্ত লোককে এক স্থানে সমবেত করে সাত আটটি পাগড়ি ছড়িয়ে দিয়ে বলতেন বায়আতকারীগণ যে কোন পাগড়ির কিনার ধরেন। অতঃপর

বায়আতের বাক্যগুলি উচ্চ কণ্ঠে বলতেন। এভাবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অব্যাহত ধারায় বায়আত চলত।

শরাবের দোকানগুলি বন্ধ হয়ে গেল

কলিকাতায় শরাব বিক্রয়ের দোকানগুলোতে আকস্মিভাবে শরাব কেনা-বেচা বন্ধ হয়ে যায়। দোকানদাররা ইংরেজ সরকারের নিকট অভিযোগ পেশ করে যে, আমরা বিনা কারণে সরকারী ট্যাক্স যুগিয়ে যাচ্ছি। কেননা একজন বুজুর্গের বিরাট কাফেলাসহ এই শহরের বুকে পদার্পনের ফলে আমাদের দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। শহর ও গ্রাম অঞ্চলের সকল মুসলমান তাঁর নিকট মুরীদ হয়েছে এবং তাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। তারা সকল প্রকার নেশা জাতীয় মাদকদ্রব্য থেকে তাওবাহ করেছে। এখন কেউ আর আমাদের দোকানের কোলেও ঘেষে না।

অতএব সরকারী হুকুমনামা বের হলো যে, যতদির পর্যন্ত সায়্যিদ সাহেব এবং তার দলবল কলকাতায় অবস্থান করবে ততদিন পর্যন্ত সরকারী ট্যাক্স দেওয়া লাগবে না। তার বিদায় নেওয়ার পর যদি সাবেক অবস্থা পুনর্বহাল হয় এবং শরাবের ক্রয় বিক্রয় স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে তবে কর পুনরায় ধার্য্য করা হবে।

নও মুসলিমদের খৎনা

ইসলামে নব দীক্ষিত এত বেশী বৃদ্ধি পায় যে তাদের খৎনা করার পর যে বিরাট ঘরে তারা অবস্থান করত সেখানে শুশ্রূষার জন্য, দশ পনের জন লোকের সব সময় প্রয়োজন হত। হাজার হাজার মুসলমান এমন ও ছিল যাদের ঘরে বিবাহ ছাড়া অবৈধ অনেক মেয়েলোক ছিল। এমনো অনেক মুসলমান ছিল যারা বাল্যকালে খতনা দেয়নি। যারা বায়আত করতেন তাদেরকে খৎনা ও বিবাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হত। যারা খৎনা দেয়নি তাদেরকে খৎনা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং অবৈধভাবে আশ্রিত মেয়েদের সাথে ইসলামি বিধান মত বিবাহের ব্যবস্থা করা হয়।

হান্টারের উক্তি

বৃটিশ শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে মুসলিম শক্তিকে কিভাবে নির্মূল ও নিস্তেজ করা যায় এ বিষয়ে গবেষণাকারীদের মধ্যে ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের নাম উল্লেখযোগ্য। যিনি সায়্যিদ আহমদ (র.) কে অন্যায়ভাবে ওয়াহাবী বলে আখ্যায়িত করে ভারতীয় মুসলমানদের সরলমন বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করেছেন এবং সায়্যিদ আহমদ (র.) কে দস্যু ও শহীদ তিতুমীরকে গুন্ডা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তার প্রণিত 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' পুস্তক থেকে (তার অভদ্র ভাষায়) প্রয়োজনীয় কিছু উক্তি পেশ করলাম।

'পাঞ্জাব সীমান্তে বিদ্রোহী শিবিরের গোড়াপত্তন করে সায়্যিদ আহমদ। অর্ধ শতাব্দী আগে আমরা পিন্ডারী শক্তিকে নির্মূল করার ফলে যে কয়েক জন তেজস্বি পুরুষ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে ছিল সায়্যিদ আহমদ তাদের মধ্যে অন্যতম.......।'

'দস্যু বৃত্তি ত্যাগ করে ১৮১৬ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ সে দিল্লিতে চলে যায় মুসলমানী আইনের একজন সুবিখ্যাত পন্ডিত ব্যক্তির নিকট পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য। তিন বৎসর সেখানে শিক্ষানবিশীর পর সে নিজেই একজন প্রচারক হিসেবেই কাজ শুরু করে। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে এ ধর্মীয় নেতা ধীরে ধীরে দক্ষিণ অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। আধ্যাত্মিক মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ শিষ্যরা এই ভ্রমণকালে তার সেবা যত্ন করতে থাকে। সম্ভ্রান্ত এবং বিদ্বান লোকেরা পর্যন্ত সাধারণ ভৃত্যের মত নগ্নপদে তার পালকীর পাশে পাশে দৌড়ে অগ্রসর হয়। পাঠনার দীর্ঘ যাত্রা বিরতিকালে তাঁর অনুগামীর সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে, তাদের নিয়ন্ত্রণের রীতিমত একটা সরকার গঠন প্রয়োজন পড়ে। যাত্রাপথে অবস্থিত বড় বড় শহরে ব্যবসায়ীদের মুনাফার উপর কর আদায়ের জন্য সে প্রতিনিধি নিয়োগ করে কাফেলার আগে তাদের পাঠিয়ে দেয়। তদুপরি সে মুসলমান সম্রাটদের মতো প্রাদেশিক গভর্নর নিয়োগ করে। এভাবে পাঠনায় একটি স্থায়ী আস্তানা স্থাপনের পর সে কলকাতা অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। গঙ্গার গতিপথ অনুসরণ করে অগ্রসর হওয়ার সময় সে বহু লোককে ইসলাম ধর্মে দিক্ষীত করে এবং পথিপার্শের সমস্ত বড় বড় শহরে তার প্রতিনিধি নিয়োগ করে। কলকাতায় এত অধিক সংখ্যক লোক তার কাছে সমবেত হয় যে, প্রত্যেকের সংঙ্গে আলাদাভাবে মুসাফাহা করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে মাথার পাগড়ি খুলে লম্বাভাবে ছড়িয়ে দিয়ে সে ঘোষণা করে যে, পাগড়ীর যে কোন অংশ স্পর্শ করলেই সে ব্যক্তি তার শিষ্যত্ব লাভ করবে। ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে সে হজ্জ করতে মক্কা গমন করে। এইভাবে হজ্জের পবিত্র আবরণে সে তার দস্যু চরিত্রকে সম্পূর্নরূপে আচ্ছাদিত করে পরবর্তী বৎসর অক্টোবর মাসে বোম্বাই ফিরে আসে। বোম্বাই শহরেও ধর্ম প্রচারক হিসেবে সে কলকাতার মত বিরাট সাফল্য অর্জন করে।' (দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস পৃষ্ঠা-৫)

কলিকাতায় অবস্থান

পূর্ণ তিন মাস কাল সায়্যিদ সাহেব কলকাতায় অবস্থান করেন। হজ্জের উদ্দেশ্যে এগারটি জাহাজ ভাড়া করেন। প্রত্যেক জাহাজে একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। দরিয়া বাক্কা জাহাজের নাবিক ছিলেন হাদারাউমাত নিবাসী সায়্যিদ আব্দুর রহমান। জাহাজের সর্বাধিনায়ক ছিলেন সুরত নিবাসী শেখ দাউদ। উক্ত জাহাজে সায়্যিদ আহমদ (র.) এর নিকট সম্পর্কিত লোকসহ আরোহন করেন।

জাহাজে মিলাদ শরীফ

জাহাজ সমুদ্রে পৌঁছলে অস্বাভাবিক উত্তাল তরঙ্গ মালায় দুলতে লাগল। সায়্যিদ আহমদ (র.) সকলকে এক স্থানে সমবেত করে নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ আরম্ভ করলেন। সকলে 'আমীন' বলতে লাগলেন। দু'আর ফলে সকলে এমনি আবিভূত হলেন যে, দু'আ গ্রহণযোগ্য বলে অন্তরে সাড়া পেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে জাহাজে অনুকূল বাতাশ প্রবাহিত হতে আরম্ভ করলো। উত্তাল তরঙ্গমালা শান্ত ভাব ধারণ করল। জাহাজ অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে এগিয়ে চললো। রাত্রিকালে শ্রীলংকার নিকট জাহাজ পৌঁছলে সায়্যিদ সাহেব সমস্ত রাত্রি পাহাদারের মতো কখনো উপরে কখনো নিচে আনাগোনা করতে লাগলেন। তাহার কারণ সম্পর্কে পরে তিনি বলেন ভয়ংকর দৈত্য ও শয়তানের দল (ইফরিত) আমাদের ছোট্ট কাফেলার উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের লাঞ্ছিত করে ফিরিয়ে দেন। প্রভাতে জাহাজ বিপদজনক ঘাটি অতিক্রম করল। জাহাজের নাবিক শিরনির আয়োজন করলেন। সায়্যিদ আহমদ (র.) মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করলেন। মীলাদ শরীফে আরবী কাছিদা আবৃত্তি করা হলো। অতঃপর শিরনি বিতরণ করা হলো।

প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

সায়্যিদ আহমদ (র.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাচ্চা আশিক ছিলেন। তিনি বালাকোট প্রান্তরে শাহাদাত বরণ পর্যন্ত বারে বারে রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিদার স্বপ্নযোগে লাভ করেছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোচনায় সদা-সর্বদা পঞ্চমুখ থাকতেন। দুরূদ ও সালাম পাঠ করতেন এবং মীলাদ শরীফ পড়তেন। সায়্যিদ আহমদ (র.) এর অন্যতম খলিফা মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) স্বীয় মুরিদগণকে মীলাদ পাঠে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে 'আল-মুলাখখাস' কিতাব প্রণয়ন করেন।

উক্ত কিতাবে মীলাদ ও কিয়াম সম্পর্কে সুদৃঢ় দালীলিক প্রমাণ পেশ করেছেন। সৌদি হুকুমতের পূর্বে যারা হারামাইন শরীফের ইমাম ছিলেন তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট ইমামগণ মীলাদ কিয়ামের সপক্ষে যে ফতওয়া দিয়েছেন, তা ও উদ্ধৃত করেছেন।

কুদরতী মিষ্ট পানি

সমুদ্র পথে কোন এক স্থানে পৌঁছলে জাহাজের নাবিক সংবাদ দেন যে মিষ্ট পানি শেষ হয়ে গেছে। সায়্যিদ আহমদ (র.) তৎক্ষনাৎ আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ আরম্ভ করলেন। দু'আরত অবস্থায় তার নিকট ইলহাম হয় যে, এখানকার

লোনা পানি মিষ্টি পানিতে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়েছে। যতটুকু প্রয়োজন উঠিয়ে নাও। উক্ত শুভ সংবাদ শোনা মাত্র জাহাজ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন অনুযায়ী পানি সংগ্রহ করেন। সেই পানি ছিল মিষ্ট ও সুস্বাদু।

গায়বী সাহায্য

এডেন বন্দরে পৌঁছলে সায়্যিদ আহমদ (র.) কয়েকজন সঙ্গীসহ জাহাজ থেকে অবতরণ করে নৌকায় আরোহন করেন। সমুদ্র তীরে পৌঁছে অবগত হন যে, বন্দর থেকে শহর অনেক দূরে। অত্যাধিক গরমের মধ্যে পথ অতিক্রম করা ছিল দুরূহ ব্যাপার অথচ সেখানে কোন যানবাহন বা সওয়ারী ছিলনা। অধিকন্তু অনেকের পায়ে জুতাও ছিলনা। সওয়ারীর অনুসন্ধান নিয়ে জানতে পারলেন যে, সামনের পাহাড়ে ভাড়াটে উট পাওয়া যেতে পারে। এদিকে এক অধিক গরমে পাহাড় গিয়ে উট নিয়ে আসাটা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। তখন সকলেই অপারগ অবস্থায় সায়্যিদ আহমদ সাহেবের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তিনি বললেন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিকট প্রয়োজনীয় সব কিছু পৌছিয়ে দিবেন। চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই। তবে প্রত্যেককে সাতবার করে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে। নির্দেশ মোতাবিক সকলেই সূরা ফাতিহা পাঠ করতে লাগলেন। সাতবার পাঠ করার পূর্বেই দেখা গেল পাহাড়ের দিক থেকে কয়েকটি উট ছুটে আসছে তারা কাফেলার নিকট এসে থামল। সোজা সায়্যিদ সাহেবের নিকট পৌছল। তারা উট গুলিতে আরোহন করে এডেন শহরে পৌছালেন। আশ্চর্যের ব্যাপার গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর দেখলেন উট চালকসহ উটগুলি গায়েব হয়ে গেল। তাদের পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য অনেক অনুসন্ধান করেও সন্ধান পাওয়া গেল না।

পরিশেষে তারা উক্ত শহরের কাজির নিকট পারিশ্রমিকের টাকা জমা রাখতে চাইলেন। কাজী উত্তর দিলেন আপনারা উট ও উষ্ট্র চালকের যে বর্ণনা দিলেন এমন কোন উট ও উষ্ট্র চালক এ শহরে নেই। এখন টাকা নিয়ে আমরা কার হাতে দিব, এ ছিল গায়বী সাহায্য।

তথ্যসূত্র : [হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী বড় সাহেব কিবলাহ ফুলতলী রচিত জীবনীগ্রন্থ 'হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)' থেকে সংকলিত]

হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ.

আবুল হাসান আলী নদভী

শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা এমন কতিপয় উচ্চ যোগ্যতা, সাহসিকতা ও বিস্ময়কর ইচ্ছাশক্তির অধিকারী আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের পৃষ্ঠপোষকতার কাজ নিয়েছেন, যারা হাজার হাজার মানুষের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং এক পূর্ণ শতক সামলে রেখেছেন। শাহ সাহেব রহ.-এর জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও জীবন-সমুদ্রে ছিল পরম স্থিতিশীলতা।

এই দাবীর সত্যতার জন্য কেবল তার একান্ত খলিফা সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ. (১২০১-১২৪৬ হিজরি)-এর নাম নেওয়াই যথেষ্ট, যিনি এই উপমহাদেশের এই মহান ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, যার স্বয়ংসম্পূর্ণতা, প্রভাব শক্তি এবং ইসলামের সুমহান দাওয়াত, নববী আদর্শের নৈকট্য ও সাদৃশ্য না কেবল কেবল এই তেরো হিজরি শতকের দৃষ্টিগোচর হয়, বরং বিগত কয়েক শতকেও এ ধরনের ঈমানী চেতনা সৃষ্টিকারী আন্দোলন এবং নেককার বুযুর্গদের এমন সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল জামাতের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। তিনি আকায়েদ ও আমলের সংশোধন, মানুষের তরবিয়ত, ওয়াজ-নসিহত, তাবলিগে দীন, জিহাদ ও নির্ভীকতার বিশাল বিস্তৃত রণাঙ্গনে যেভাবে কর্মতৎপর ছিলেন, এর প্রভাব কেবল তার কর্মময় স্থান ও সমসাময়িক বংশধর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, তৎপরবর্তীকালে আগত আহলে হক, দীনের দাঈ, ঝান্ডাবাহী ও খাদেমের উপর গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে, ক্রমবর্ধমান ইংরেজ শক্তির মোকাবেলায় ভারতবর্ষ ও তার প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর হিফাজত, খুলাফায়ে রাশেদার আদর্শে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা-সংগ্রামের সূচনাও তিনিই করেছেন। এই আন্দোলন ও চেষ্টা-সংগ্রামের নেতৃত্বের লাগাম ভারতে প্রথম এই শ্রেণির উলামায়ে কেরাম ও নেতৃত্বের হাতে থাকে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মীয় কিতাবাদির রচনা ও সংকলন, অনুবাদ ও প্রচার-প্রসারের আধুনিক আন্দোলন (যা সাধারণ মুসলমান এবং সঠিক ইসলামী শিক্ষাদীক্ষা ও কুরআন-সুন্নাহর মাঝে বিদ্যমান প্রশস্ত-গভীর ঘাটতি পূরণ করেছে)

তারই চেষ্টা-সংগ্রামের অবদান, মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জাগরণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই দাওয়াত ও আন্দোলনেরই ফল ও সাফল্য। এই আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া, শিক্ষা-সাহিত্য, ইসলামী চিন্তাধারা, ভাষা ও বচনভঙ্গি বর্ণনায়ও পড়েছিল। এ আন্দোলন সমাজ সংস্কার, জাহেলী রীতি নীতির ভ্রান্তি-প্রমাণ হিন্দুধর্মের প্রভাব দূরীভূতকরণ এবং সঠিক ইসলামী জীবনের প্রতি প্রত্যাবর্তনের মহান কাজ আনজাম দিয়েছে। সাইয়েদ আহমদ রহ. এবং তার দাওয়াত ও তরবিয়তের প্রভাবে ব্যাপকতা, শক্তি, গভীরতা ও কার্যকরিতা আনুমান কারার জন্য এখানে আমরা কতিপয় চিন্তাবিদের রচনাবলি থেকে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি।

ভারতবর্ষের বিখ্যাত লেখক ও ঐতিহাসিক নবাব সিদ্দিক হাসান খান, গভর্নর: ভুপাল (মৃত্যু: ১৩০৭ হিজরি)- যিনি সাইয়্যেদ রহ. এর শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তাকে প্রত্যক্ষকারীদের এক বিরাট দলের যুগ পেয়েছিলেন, তিনি تقصار جيود الاحرار গ্রন্থে লিখেছেন, 'সৃষ্টিজীবের পথপ্রদর্শক এবং আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনা ও প্রত্যর্পণে তিনি ছিলেন আল্লাহর একটি নিদর্শন। এক বিরাট মানবগোষ্ঠী ও এক পৃথিবী তার আত্মিক ও শারীরিক তাওয়াজ্জুহে বেলায়েতের মর্যাদায় পৌছে গেছে। তার খলিফাগণ ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে ভারতের মাটিকে শিরক-বিদআত ও কুসংস্কারের খড়কুটা থেকে পবিত্র করে দিয়েছে, কুরআন-সুন্নাহর রাজপথে এনে দাঁড় করিয়েছে। আজও তাদের ওয়াজ-নসিহতের বরকত যথারীতি চালু আছে।

আরেকটু সামনে এগিয়ে লিখেছেন, 'মোটকথা এ যুগে পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রে এমন সুযোগ্য ব্যক্তিত্বের কথা শোনা যায়নি। যে ফয়েয-বরকত এই হকপন্থী দলের মাধ্যমে সৃষ্টিজীবের হয়েছে, তার দশ ভাগের একভাগও এ যুগের উলামা-মাশায়েখের দ্বারা হয়নি।'[১৮৬]

যুগশ্রেষ্ঠ আলেম উসতাযুল আসাতিযা হযরত শাহ আবদুল আযিয দেহলবী রহ.-এর শাগরিদ হযরত মাওলানা হায়দার আলী রামপুরী টঙ্কী (মৃত্যু: ১২৭৩ হিজরি), صيانة الناس গ্রন্থে লিখেছেন, 'তার হিদায়েতের নূর সূর্যের মতো পূর্ণ ক্ষিপ্রতার সাথে বিভিন্ন শহর-নগর ও মানুষের অন্তরে উদ্ভাসিত হয়। চতুর্দিক থেকে ভাগ্যবান লোকজন পরকালের প্রতি মনোযোগী হয়ে শিরক-বিদআত ইত্যাদির নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে (রীতিমতো যুগ যাতে অভ্যস্ত ছিল) তাওবা করে তাওহিদ ও সুন্নতের শাশ্বত পথ অবলম্বন করতে থাকে। আর প্রায়ই হযরতের পুণ্যাত্মা খলিফাগণ নানা স্থান সফর করে লাখ লাখ মানুষকে দীনে মুহাম্মদীর সরল

---

[১৮৬] تقصار جيود الاحرار من تذكار جنود الابرار (ফারসি) পৃষ্ঠাঃ ১০৯-১১১, মাতবুআ ভুপাল, ১২৯৮ হিজরি।

সঠিক পথ দেন। যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ছিল এবং আল্লাহর অনুগ্রহ যাদের সাহায্য করেছে, তারা এই পুণ্যের পথে চলেন।'

ভারতের এক বিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য আলেমে দীন মাওলানা আবদুল আহাদ, যিনি এই মুবারক জামাতের অনেক সদস্যের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন, যার সময়কাল সাইয়্যেদ রহ.-এর নিকটতর ছিল, তিনি লিখেছেন, হযরত সাইয়্যেদ সাহেব রহ.-এর হাতে ৪০ হাজারের অধিক হিন্দু প্রমুখ কাফের মুসলমান হয়েছে। ৩০ লাখ মুসলমান তার হাতে বায়াত গ্রহণ করেছে। আর বায়আতের যে ক্রমধারা তার খলিফাগণের খলিফাদের মাধ্যমে গোটা বিশ্বে চালু রয়েছে, এই সিলসিলায় তো কোটি কোটি মানুষ তার বায়আতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।'

এই বিশাল সংস্কার ও সংশোধনমূলক কৃতিত্বের কারণে প্রায় সকল চিন্তাবিদ ও ইনসাফপ্রিয় লোক তাকে তেরো শতকের মুজাদ্দিদ বলে স্বীকার করেন।

•

তথ্যসূত্র: সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস, আবুল হাসান আলী নদভী, আবুল হাসান হুসাইনী অনূদিত, ৫ম খন্ড, -.২৮০-২৮

আহ'মদ শাহীদ, সায়্যিদ বেরীলবী

(سید احمد شہید بریلوی)

গুলাম রাসূল মিহর (দা.মা.ই)/এ. এন. এম. মাহবুব রহমান ভুঞা

সায়্যিদ আহ'মাদ শাহীদ ইবন সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইরফান, জ. ৬ সাফার, ১২০১/২৮ নভেম্বর, ১৭৮৬ সালে (অযোধ্যায়) রায়বেরেলী-তে (সায়্যিদ মুহাম্মাদ য়া'কূব সায়্যিদ সাহিবের ভ্রাতা, ওয়াকাই আহ'মাদী) ম" ২৪ যু'ল-কা'দাঃ ১২৪৬/৬ মে. ১৮৩১ বালাকোট ও মিট্রী কোটের মধ্যবর্তী ময়দানে শাহাদাত লাভ করেন। তাঁহার বংশানুক্রম ছত্রিশ পুরুষ উর্ধ্বে আমীরুল-মু'মিনীন 'আলী (রা)-র সহিত মিলিত হয়। (হ'সানী) সায়্যিদগনের এ বংশসুলতান শামসু'দ-দীন ইলতুতমিশের শাসন আমলে ভারতে আসেন এবং কড়া মানিকপুরে বসতি স্থাপন করেন। তাক'ওয়া ও শিক্ষা-দীক্ষায় তারা প্রতি যুগেই বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। ফলে তাঁহাদের বাসস্থান পরিবর্তিত হইতে থাকে। রাহ'মান 'আলী (তায'কিরা-ই 'উলামা-ই হিন্দ, পৃ. ৮১) তাঁহার বংশকে রায়বেরেলী-র নেতৃস্থানীয় পরিবার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শাহ 'আলামুল্লাহ (মৃ. ১৯০৬ হি.) সম্রাট শাহজাহান ও 'আলমগীরের শাসনামলে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে গণ্য হইতেন। তিনি ছিলেন সায়্যিদ আহ'মদের পিতৃ ও মাতৃ বংশের উর্ধ্বতন ৪র্থ পুরুষ (সীরাত 'আলিয়্যাঃ ও তায'কিরাতুল-আব্রার)।

সায়্যিদ আহ'মাদ স্বীয় গৃহে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। বিদ্যার্জনে তাহার তেমন মনোযোগ ছিলনা। শক্তি ও নেতৃত্বব্যঞ্জক খেলাধুলার প্রতি তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিলো (মাখ্যান আহ'মাদী)। তিনি সমবয়স্ক বালকদের স্বমন্বয়ে সৈন্যদল গঠন করিতেন এবং জিহাদের অনুরূপ তাক্বীর দিয়া কল্পিত সৈন্যদলের উপর আক্রমন করিতেন (তাওয়ারীখ আজীবা)। এই সময় হইতেই তাঁহার মধ্যে জিহাদের আগ্রহ প্রবল ছিলো (মানজূরাঃ)। তাঁহার দৈহিক শক্তি ছিলো অসাধারণ। তিনি নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম করতেন। প্রতিবেশীদের সেবায় অধিকাংশ সময় সম্পৃক্ত থাকতেন। তাহাদের জন্য পানি বন-জঙ্গল হইতে ইন্ধন আনয়ন করিয়া দিতেন। কেহ আপত্তি করিলে তিনি অভাবী ও মিস্কীনদের সেবার ব্যাপারে এমন হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখিতেন যে শ্রোতাগণ অবিভূত হইয়া পড়িতেন (মাখ্যান আহ'মাদী)।

যৌবনের প্রারম্ভে চাকুরীর প্রত্যাশী কয়েকজন বন্ধু ও দেশবাসীসহ তিনি গমন করেন এবং তথায় সাত মাস অবস্থান করেন। অতঃপর যতগুলি চাকুরী পাওয়া গেল উহাতে তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়োগের ব্যাবস্থা করেন এবং নিজে কিতাবি আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনের উদ্দ্যেশ্যে শাহ 'আব্দু'ল-আযীযের নিকট দিল্লী গমন করেন। শাহ আব্দু'ল-আযীয তাঁহাকে স্বীয় ভ্রাতা শাহ আবদু'ল করি'ম মুহাদ্দিছের আকবার অবাদী মসজিদে প্রেরণ করেন (মাখযান আহ'মাদী)। একটি বর্ণনায় মীযান, কাফিয়া ও মীশকাত অধ্যয়নের কথা উল্লেখ আছে (আরওয়াহ' ছা'লাছা)। সেই সময় তিনি 'ইবাদাত বন্দেগীর জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন (আছা'রুস সা'নাদীদ, প্রথম সংস্করণ)। সাধনার শুরু হইতেই বৎসরের পর বৎসর 'ইশা ও ফজরের সালাত এক উযুতে পড়তেন (ওয়াসায়া'ল -ওয়াযীর)। ১২২২/১৮০৭ তিনি শাহ আবদু'ল আযীযের হস্তে বায়'আত গ্রহন করেন। শাহ সাহেব বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁহাকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও হিদয়াতের জন্য কোনো মাধ্যমের মুখাপেক্ষী রাখেন নাই (আছা'রুস-সানাদীদ)। তিনি আধ্যাত্মিক শিক্ষায় এইরূপ মেধাসম্পন্ন ছিলেন যে, সামান্য ইঙ্গিতেই অতি উচ্চ স্থানের উপলব্ধি করিতে পারিতেন (মান্‌জূ'রা)। ১২২৩/১৮০৮ সালে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন। এই সময়ই তাঁহার বিবাহ হয়।

ভারতে ইসলামী শাসন ও শরী'আতের আইনকানুন প্রবর্তন ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান ও সর্বাপেক্ষা প্রিয় লক্ষ্য। ইহার জন্য তিনি তাঁহার জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সমসাময়িক কালের বিশিষ্ট ব্যাক্তি ও সামরিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেবল নওয়াব আমীর খানই তাঁহার এই মহৎ উদ্দেশ্যে সাধনে সাহায্যকারী হইতে পারিতেন। তাঁহার নিকট বিরাট সেনাবাহিনী ও বৃহৎ অস্ত্রাগার ছিল। অন্যদের প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া ছাড়াও তিনি মধ্যরাতে সেনানিবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। সেখান হইতে বিভিন্ন অঞ্চলে সফল আক্রমন করিয়া পার্শ্ববর্তী মুসলিম শাসকগনের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারিতেন। বস্তুত সায়্যিদ আহ'মাদ ১২২৪/১৮০৯ নওয়াব আমীর খানের নিকট রাজপুরানায় গমন করেন (মাখযান আহ'মাদী, মানজূ'রা, ওয়াকা'ই আহ'মাদী ইত্যাদি)। এই উদ্দেশে তিনি সাত বৎসর নওয়াবের স্বীয় পূর্ন শক্তি জাতীয় ও ধর্মীয় স্বার্থে নিয়োজিত রাখিতে পারেন। এই সময় সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহন করেন সৈন্যবাহিনীতে ধর্মীয় চেতনা উজ্জীবনের কাজ অব্যাহত রাখেন।

ইংরেজদের জোর তৎপরতায় ১৮১৭ খৃ. হঠাৎ করিয়া নওয়াবের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পরে। তিনি ইংরেজদের সংগে সন্ধি করিয়া টুঙ্ক (Tonk) এর কর্তৃত্ব লাভ এবং সেনাবাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে রাজি হন। সায়্যিদ আহ'মাদ তাঁহাকে এই চুক্তি হইতে বিরত রাখিতে একান্ত চেষ্টা করেন। তিনি বারবার বলেন ইংরেজদের সাথে বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করুন (ওয়াকা'ই-মানজুর)। কিন্তু ইহা

নওয়াবের সাহসে কুলাইল না। অতএব সায়্যিদ আহ'মাদ ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া দিল্লী চলিয়া যান। উদ্দেশ্য, তথায় তিনি মুসলমানদের ধর্মীয় সংস্কারের সাথে সাথে জিহাদের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বাহিনী গঠন করার এবং তাঁহার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টা করিবেন। সেই ব্যাপারে আমীর খান তাঁহাকে সাহায্য করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন না।

দিল্লীতে তাঁহার অনেক বন্ধুবান্ধব জুটিয়া যায়, যাঁহাদের মধ্যে শাহ ওয়ালীউল্লাহর পরিবারের দুইজন খ্যাতনামা 'আলিম শাহ ঈসমাই'ল ও মাওলানা 'আবদু'ল-হায়্যির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমজন শাহ আবদু'ল আযীযের ভ্রাতৃষ্পুত্র এবং দ্বিতীয়জন তাঁহার জামাতা। প্রায় দুই বৎসর পর্যন্ত তিনি রোহিলাখন্ড, আগ্রা ও অযোধার বিভিন্ন শহরে ভ্রমণ করিতে থাকেন। যথা মীরাট, মুজাফফর নগর, সাহারানপুর, মুরাদাবাদ, রামপুর, কানপুর, লখনৌ, বেনারস ইত্যাদি (ওয়াকা'ই মানজু'রা)। ধর্মীয় সংস্কার ও জিহাদের সংগঠন উভয় কাজ একই সাথে চলতে থাকে। শাহ ঈসমাইল ও মাওলানা আবদু'ল হায়্যি ক্রমাগত জিহাদ ও শাহদাতের মর্যাদা সম্পর্কে ওয়াজ করিতে থাকেন। মুসলমানদের মন-মগজে জিহাদ ও শাহদাতের আগ্রহ এতো গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন যে, মুসলমানগন স্বেচ্ছায় আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করাকে সৌভাগ্যের বিষয়রূপে ভাবিতে থাকেন (আছাররু'স-সানদীদ)। আধ্যাত্মিক সাধনা ব্যাতীত ও যুদ্ধবিদ্যা অনুশীলন তাঁহার মুরিদদের বিশেষ কর্তব্যে পরিণত হইয়াছিলো (ওয়াকা'ই আহ'মাদী, মানজূ'রা)। তিনি বিধবা বিবাহে অনুপ্রেরিত করেন। কেননা সম্ভ্রান্ত মুসলমানগন বিধবা বিবাহকে অসম্মানজনক মনে করিতেন। অতএব তিনি স্বীয় বিধবা ভ্রাতৃবধুকে বিবাহ করেন (মাখ্‌যা'ন, আহ'মাদী, মানজূরা, ওয়াকা'ই আহ'মাদী ইত্যাদি)।

সমুদ্রের উপর ফিরিঙ্গিদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়ে, সমুদ্রের উপর বিপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং হজ্জে যাওয়া কষ্টকর হইয়া পরে-ইহার ভিত্তিতে কোনো কোনো আলিম এমন অবস্থায় হজ্জ ফরয থাকেনা বলিয়া ফাতওয়া দেন। কেননা রাস্তার নিরাপত্তা হজ্জ ফরয হওয়ার অন্যতম শর্ত (ওয়াকাই' আহ'মাদী)। লখনৌ-তে এরূপ একটি ফাতওয়া হইয়াছে। শাহ ঈসমাইল ও মাওলানা আবদুল হায়্যি অকাট্য প্রমাণ সহকারে ইহা খন্ডন করেন। হাদীছ'বিদ শাহ আবদু'ল আযীয ইহাদের অভিমত সমর্থন করেন (মানজূ'রা)। 'গড়' (উত্তর প্রদেশের kunti এর নিকটে) নামক স্থানের মাওলাবী য়ার'আলী আরো একধাপ অগ্রসর হইয়া এমন অবস্থায় হজ্জে যাওয়াকে হারাম বলিয়া ফাতওয়া দেন। তাঁহার মতে এমন অবস্থায় হজ্জে যাওয়ার অর্থ জানিয়া বুজিয়া নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ঠেলিয়া দেওয়া, যাহা কুর আনের নির্দেশ (لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (তোমরা নিজের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না (২ঃ১৯৫) পরিপ্রেক্ষিত নিষিদ্ধ

(ওয়াকা'ই-আহ'মাদী)। এই ভ্রান্ত ধারণা প্রতিরোধের জন্য সায়্যিদ আহ'মদ (র) স্বয়ং হজ্জে যাওয়ার মনস্থ করেন এবং সাধারণভাবে ঘোষনা দেন, মুসলমানগণ হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা থাকিলে প্রস্তুত হইতে পারেন, আমার সঙ্গে তাঁহারা হজ্জ করিবেন– খরচের অর্থ থাকুক বা না-ই থাকুক (মানজূ'রা, ওয়াকা'ই ইত্যাদি)।

শাওয়াল মাসের শেষ তারিখ, ১২৩৬/৩০ জুলাই ১৮২১ সালে সায়্যিদ আহ'মদ প্রায় চারি শত সঙ্গীসহ রায়বেরেলী হইতে হ'জ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মনযিলের পর মনযিল অতিক্রম করিয়া কলিকাতায় পৌঁছেন। ৩ মাস তথায় অবস্থান করেন। এই সময় ধর্মীয় অনুভূতির পুনরুজ্জীবন ও সংস্কার কাজ অব্যাহত ছিল। লক্ষ লক্ষ মুসলমান হিদায়াতপ্রাপ্ত হন। অনেক অমুসলমান ইসলাম গ্রহন করেন (মাখযান আহ'মদী, ওয়াকাই আহ'মদী ইত্যাদি)। তিনি হি. ১২৩৭ সালে বায়তুল্লাহ যিয়ারত করেন (তায'কিরা-ই 'উলামা-ই হিন্দ)।

হি'জায যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত ৭৫৩ জন মুসলমান হ'জ্জের উদ্দেশ্যে একত্র হইয়াছিলেন। তেরো হাজার আট শত ষাট টাকার বিনিময়ে দশটি জাহাজ ভারা করিয়া তাঁহাদেরকে উঠানো হয়। তাহাদের জন্য প্রায় তেত্রিশ হাজার টাকার খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করা হয়। হি'জাযে অবস্থান ও ফিরিয়া আসার যাবতীয় খরচ তিনি নিজেই বহন করেন, অথচ যাত্রার সময় একটি কড়িও ছিলো না তাঁহার সাথে। দুই বৎসর দশ দিন পর ২৯ শা'বান, ১২৩৯/২৯ এপ্রিল, ১৮২৪ সালে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন (মাখযান আহ'মাদী, ওয়া'কাই, মানজু'রা)। অতঃপর সম্পূর্ণভাবে জিহাদের প্রস্তুতির জন্য ব্যাপৃত হন।

জিহাদের উদ্দেশ্য এই ছিলোঃ ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত হউক, খৃষ্টানগণ ও মুশরিকদের প্রাধান্যের মূল উৎপাদিত হউক। রাজত্ব পদমর্যাদা বা ক্ষমতা লাভ ইহার উদ্দেশ্য ছিলো না, শুধু আল্লাহর বানীকে সমুচ্চ করাই ছিলো মূখ্য উদ্দেশ্য (মাকাতিব ওয়া 'আলাম নামাহজাত)। জিহাদের প্রস্তুতির প্রাথমিক ধাপ উত্তীর্ণ হওয়ার পর সঙ্গী সাথীদের পরামর্শ ক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে। সেই অঞ্চলের জনসাধারণ ছিলো মুসলমান। তাহাদের স্বাধীনতা শিখদের আক্রমণে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলো। উক্ত অঞ্চলের আশেপাশে কয়েকটি মুসলিম রাজ্য ছিলো যাহাদের শুভেচ্ছার আশা করা গিয়াছিলো। আশা ছিলো, পাঞ্জাব অভিযানে সিন্ধু ও ভাওয়ালপুরের মুসলমান রাজ্যদ্বয় সাহায্যকারী হইতে পারে।

৭ জুমাদা'ল-আখিরা, ১২৪১/১৭, জানুয়ারী ১৮২৬ সালে সায়্যিদ আহ'মাদ দারু'ল হারব ভারত হইতে হিযরত করেন, যেখানে তিনি জীবনের চল্লিশটি বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন। হিজরতের উদ্দেশ্যে তিনি রায়বেরেলী হইতে বাহির হন। প্রথম দখলের গাযীদের সংখ্যা পাঁচ-ছয় শতের মাঝামাঝি ছিলো এবং মাত্র পাঁচ

হাজার টাকা তার হাতে ছিলো। রায়বেরেলী হইতে কালপি, গোয়ালিয়ার, টুংক, আজমীর, পালী, অমরকোট, হায়দরাবাদ (সিন্ধু), পীরকোট, মাদহাজী, শিকারপুর, ঢাঢার বুলান, কোয়েটা, কান্দাহার, গজনী, কাবুল এবং জালালাবাদ হইয়া পেশাওয়ার পৌঁছেন। রাস্তায় সাধারণ মুসলমান ছাড়াও সিন্ধু, ভাওয়ালপুর, বেলুচিস্তান, কান্দাহার এবং কাবুলের শাসক, প্রধান নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে জিহাদের দাওয়াত দেন (মানজু'রা ওয়া'কাই)। আমীর দোস্ত মু'হাম্মদ ও তাহার ভ্রাতৃবৃন্দের পারস্পরিক বিরোধ নিরসনে উদ্দেশ্যে পয়তাল্লিশ দিন তিনি কাবুলে অবস্থান করেন।

সায়্যিদ আহ'মাদের জিহাদের সংকল্পের কথা শুনিয়া শিখ প্রশাসন বুধ সিংহের নেতৃত্বে দশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনীকে সীমান্ত প্রদেশের আকূড়ায় প্রেরণ করিয়াছিল। ২০ জুমাদা'ল-উলা, ১২৪২/২০ ডিসেম্বর, ১৮২৬ সালে নয়শত গাযী, যাহাদের মধ্যে ১৩৬ জন ছিলেন ভারতীয়, শিখ সেনাবাহিনীর উপর নৈশ আক্রমন চালাইয়া শত শত শিখ সৈন্যকে হত্যা করেন। ভারতীয় শহীদদের সংখ্যা ছিলো মাত্র ৩৬। শিখ সৈন্যবাহিনী আকূড়া হইতে কয়েক মাইল পিছনে হাটিয়া 'শায়দু' নামক স্থানে অবস্থান করে (মানজূ'রা, ওয়াকাই 'আহ'মাদী, মাকাতীব, ইত্যাদি)

আকূড়া যুদ্ধে জয়ের ফলে মুসলমানদের অন্তরে আশার আলো দেখা যায়। ১২ জুমাদা'ল আখিরা, ১২৪২/১১ জানুয়ারী, ১৮২৭ রোজ বৃহস্পতিবার সীমান্ত অঞ্চলের 'হুন্ড' নামক স্থানে এক বিরাট সমাবেশে 'আলিম ও খাঁনগন সায়্যিদ আহ'মাদের নেতৃত্বে জিহাদ করায় বায়'য়াত গ্রহণ করেন এবং মুহা'ম্মাদ সুলতান মুহা'ম্মাদ প্রমুখ পেশাওয়ারের অন্যান্য দুরবানী সরদারও বায়'আত গ্রহণ করেন এবং তাহার সঙ্গে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। সায়্যিদ আহমদের প্রচেষ্টায় শায়দূ-তে শিখদের সংগে যুদ্ধের নিমিত্তে প্রায় এক লক্ষ্য মুজাহিদ সমবেত হয়। শিখগণ গোপনে গোপনে ভীতিপ্রদ বার্তা প্রেরণ করিয়া যায় মুহাম্মাদকে নিজের দলে টানিয়া লয়। যুদ্ধের এক রাত্রি পূর্বেই সায়্যিদ আহমদকে সে বিষ প্রয়োগ করিতে প্রয়াস পায়। শিখগণ পিছু হটিতে থাকিলে গোপন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুহা'ম্মাদ ও তার ভ্রাতা মুসলমানদের পরাজয়ের সংবাদ রটাইতে রটাইতে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া যায়। এইভাবে গা'যীদের বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়। (ওয়া'কাই, মানজূ'রা, মাকাতীব ইত্যাদি)

সায়্যিদ আহ'মাদ পাঞ্জাতার (খাদ্দ ওয়া খায়াল)-এ কেন্দ্র স্থাপন করেন। দলে দলে ভারতীয় মুজাহিদগনের আগমনে তাহাদের যথেষ্ট শক্তি বৃদ্ধি পায়। পেশাওয়ার ও মারদান সমতল ও পাহাড়ী অঞ্চলের বহু লোক তার সাহায্যার্থে আগাইয়া আসে। হাযারার বনাঞ্চলে গা'যীগন তাম্‌গালা ও শাংকিয়ারী নামক স্থানে শিখদের পরাজিত করেন। এই সময়ে মুসলমানদের অবস্থা ছিল সন্তোষজনক।

কিছু দুররানী নেতৃবৃন্দের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হইতে থাকে। তাহাদের প্ররোচনায় অন্য খানরাও বিশ্বাসঘাতকতার পথ অবলম্বন করে। (মানজূরা, ওয়াকা'ই ইত্যাদি)

শা'বান ১২৪৪/ফ্রেবুয়ারী ১৮২৯ সালে সায়্যিদ আহমদ আড়াই হাজার আলিম ও খানদের পঞ্চতার কেন্দ্রে একত্র করিয়া তাহাদের নিকট হইতে শারী'য়াত আইন জারী করার জন্য প্রতিশ্রুতি গ্রহন করেন। ইহাই তাহাদের দাবি ছিল যে, সীমান্ত অঞ্চলে ধর্মীয় আইন প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং বিশিষ্ট ও সাধারণ শ্রেনির লোক সকলেই এই পবিত্র আইনের অধীনে একতাবদ্ধ হইয়া একটি জামা'আতে পরিগণিত হইবে; ইহাকে তাহার দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার উৎস বলিয়া মনে করতেন। হুন্ড-এর প্রধান খাদে খান শিখদের সহিত মিলিত হইয়া পাঞ্জতার আক্রমণ করে। কিছু শিখ সৈন্যদলের সেনাপতি যুদ্ধ করার সাহস করে নাই। সায়্যিদ সাহিব প্রথমে হুন্ড জয় করেন, অতঃপর যায়দা-র যুদ্ধে দুর্‌রানীদের বিরাট বাহিনীকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে যার মুহাম্মাদ নিহত হন। পূর্বদিকে আম্‌ব দখল করেন। ইহার পর (মারদান-এর নিকট মায়া-এ-সুলতান মুহা'ম্মাদ ও তাহাদের ভ্রাতাদের বাহিনীর উপর প্রবল আক্রমণ করিয়া মারদানই পেশাওয়ার জয় করেন। সুলতা'ন মুহাম্মাদ সন্ধির জন্য আবেদন জানায়। সায়্যিদ আহ'মাদ শারী'আতের আইন প্রতিষ্ঠা ও মুজাহিদ বাহিনীতে সাহায্যের প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে তাহাকে পেশাওয়ার ফিরাইয়া দেন। এইভাবে পেশাওয়ার হইতে আটক এবং আটক হইতে আমৃব পর্যন্ত সমগ্র সীমান্ত অঞ্চল এক আইনের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং সায়্যিদ আহ'মাদ নিশ্চিতে পাঞ্জাবে অভিযান পরিচালনা করার প্রস্তুতি গ্রহন করিতে থাকেন। (মানজূরা, ওয়াকা'ই ইত্যাদি)

শিখদের মনে এমন ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল যে, তাহার মুসলিম বাহিনীর সহিত সন্ধি করিবেন এবং এই শর্তে আটকের সমগ্র অঞ্চল সায়্যিদ আহ'মাদের অধীনে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হয়। তিনি এই প্রস্তাব এইজন্য গ্রহন করেন নাই যে, তাঁহার উদ্দেশ্য কোন অঞ্চল দখল অথবা জায়গীর লাভ করা ছিল না, বরং ভারতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও শারী'আতের বিধান জারী করাই ছিল তাহার প্রধান উদ্দেশ্য (মানজূ'রা, ওয়াকা'ই আছারুস-সানাদীদ ইত্যাদি)। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের শীতকালে সুলতান মুহাম্মাদ দুর্‌রানী সন্ধি ভঙ্গ করিয়া গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দেড় শত হইতে দুই শত গা'যীকে শহীদ করেন- যাঁহারা বিভিন্ন গ্রামে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিলেন। সায়্যিদ আহ'মাদের বর্ণনা মুতাবিক ভারতে যাঁহারা ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে এই গা'যীগনই ছিলেন অন্য সকলের তুলনায় অধিক খাঁটি ও প্রকৃত মুজাহিদ। মাএ সেই সকল গা'যীই বাঁচিয়া যান, যাঁহারা আম্‌ব ও পাঞ্জতার-এ অবস্থান করিতেছিলেন অথবা যাঁহারা সংবাদ পাওয়া মাএ নিরাপদ স্থাঁনে পৌঁছিয়া গিয়াছিলেন। অগত্যা সায়্যিদ আহ'মাদ

দুররানী নেতৃবৃন্দ ও কোন কোন খান-এর ক্রমাগত সন্ধির শর্ত ভঙ্গের ফলে চিন্তান্বিত হইয়া পড়েন এবং যেই কেন্দ্রে তিনি চারি বৎসর ছিলেন উহা ছড়িয়া দেওয়া সংগত মনে করেন এবং কাশ্মীরে চলিয়া যাওয়ার সংকল্প করেন, যেখানে মুসলমানদের পক্ষ হইতে ইতিপূর্বে বার বার আহবান আসিয়াছিল। হাযারা মুজাফ'ফারাবাদ ইত্যাদি অঞ্চলের খানগণ, যাঁহাদের এলাকা কাশ্মীরের রাস্তার উপর অবস্থিত ছিল, সহযোগিতা করিতে সর্বদা প্রস্তুত ছিল। অতএব তিনি দূর্গম পাহাড়ী রাস্তা অতিক্রম করিয়া আবাসীন নদী পার হইলেন এবং রাজদাওয়ারী (হাযারার উওরাঞ্চল)- এ গিয়া উপনীত হইলেন। তথা হইতে তিনি গাযী ভূগাঢ় মাঙ্গ, গোন্‌শ এবং বালাকোটে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া মুজাফ-ফারাবাদ (কাশ্মীর) পযন্ত গিয়া পৌঁছিলেন (মানজু'রা, ওয়াক'ই ইত্যাদি)। সাহায্যকারী খানগণকে শিখদের অত্যাচার হইতে বাঁচাইবার জন্য একটি চুড়ান্ত যুদ্ধ জরুরী বলিয়া মনে করা হইত। এই উদ্দেশ্য তিনি কিছু দিনের জন্য বালাকোট (মানসাহ্‌রাহ তাহ'সীল) অবস্থান করেন (মানজু'রা, ওয়াআ'ই' ইত্যাদি)।

এই সময় রঞ্জিত সিংহের পুত্র শের সিংহ দশ হাজার সৈন্যসহ মানসাহ্‌রাহ ও মুজাফফারাবাদের মধ্যবর্তী স্থানে ঘোরাফেরা করিতেছিল। হঠাৎ সে গিরিপথ দিয়া দীর্ঘ পথ অতিক্রম করত শিখ বাহিনীর এক বড় অংশকে এক সময় মিট্রিকোটের টিলায় লইয়া আসিতে সফল হয়, যাহা বালাকোটের ঠিক সম্মুখে পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ২৪ যিল-ক্বদ ১২৪৬/৬ মে, ১৮৩১ সালে শুক্রবার চাশতের সময় মিট্রিকোট ও বালাকোটের মধ্যবর্তী ময়দানে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ প্রায় দুই ঘন্টা পযন্ত স্থায়ী হয়। শিখদের সৈন্য সংখ্যা গা'যীদের তুলনায় কয়েক গুন বেশি ছিল। বহু শিখ সেন্য নিহত হয়। প্রায় তিনশত গা'যী শাহাদাত বরন করেন। সায়্যিদ আহ'মাদ ও মাওলানা ঈসমা'ঈল এই শাহীদগনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সায়্যিদ আহ'মাদকে গুজররা বন্দী করিয়া পাশের পাহাড়ে লইয়া যাওয়ার কথা শ্রবণ করিয়া অবশিষ্ট গা'যীগন যুদ্ধক্ষেএ ত্যাগ করেন। তাঁহার শাহাদাতের সংবাদ পরে জানা যায় (মানজু'রা, ওয়াক'ই ইত্যাদি)।

এইভাবে হাযারা জেলার উওর-পূর্ব কোণে এই বীর মুজাহিদ শাহাদাত বরন করেন, অথচ তিনি সহায়- সম্বলহীন হওয়া সত্ত্বেও ভারতকে বিধর্মীদের প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া সেখানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করার বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলিমদের মধ্যে তিনি বিশুদ্ধ ইসলামী জীবনাদর্শের প্রেরণা জাগ্রত করেন এবং প্রশিক্ষনের মাধ্যমে একটি জামা'আত প্রস্তুত করেন যাহার নমুনা প্রাথমিকযুগের মুসলমানদের পরে খুবই কম পাওয়া যায়।

শিখগণ সায়্যিদ আহ'মাদের মৃতদেহ তালাশ করিল। তখন মস্তক শরীর হইতে খন্ডিত অবস্থায় পাওয়া গেল। তাঁহারা উভয় অংশ একত্রে করিয়া সসম্মানে মৃতদেহটি দাফন করে (সৌহান লাল সুরী'উমদাতু'ত-তাওয়ারীখ, ৩খ, ১, ৩৫)।

দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিনে একদল শিখ (নাহাঙ্গ) মৃতদেহটি কবর হইতে তুলিয়া নদীতে ফেলিয়া দেয়। মস্তক ও দেহ পুনরায় পৃথক হইয়া যায়। দেহটি তালহাট্টা (গাঢ়হী, হাবীবুল্লাহ খান হইতে তিন মাইল উওরে কানহা নদীর পূর্ব তীরে)-এর কৃষকেরা নদী হইতে তুলিয়া একটি অজ্ঞাত স্থানে দাফন করে (Hazara Gazetter)। আজকাল সেখানে তাঁহার কবর আছে বলিয়া দাবি করা হইয়া থাকে, যাহা মূলত নির্ভরযোগ্য নহে। মস্তকটি স্রোতের টানে গাঢ়হী হাবীবুল্লাহ নামক স্থানে গিয়া পৌঁছে। সেখানে স্থানীয় খান নদী হইতে উহা উত্তোলন করাইয়া নদীর তীরে উহা দাফন করেন। মানসাহ্‌রাহ হইতে মুজাফ'ফারাবাদ যাওয়ার পথে পুলের অপর পার্শ্বে বামদিকে কবরটি দৃষ্ট হয়। ১৯৪৮ খৃ. পযন্ত কবরটি অতি ছোট ছিল। পরে ইহাকে বাড়াইয়া একটি পূর্ণ কবরের রূপ দান করা হয়। সায়্যিদ আহ'মাদের শাহাদাতের পর তাঁহার একটি ছবি শের সিংহ একটি অভিজ্ঞ চিএকার দ্বারা অঙ্কিত করাইয়া লাহোরে রঞ্জিত সিংহের নিকট পাঠাইয়া দেয় (জা'ফার নামা-ই দীওয়ান-ই অমরনাথ)। ইহার কোন হদিস পাওয়া যায় নাই। সায়্যিদ আহ'মাদ নিম্নোক্ত কয়েকটি পুস্তিকাও রচনা করেনঃ

(১) তানবীহু'ল গাফিলীন (ফারসী), দিল্লী ১২৮৫/১৮৬৮, মাতবা মুহাম্মদী, লাহোর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। দুইবার ইহার উর্দূ অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে;
(২) রিসালা-ই-নামায (ফারসী), ইহারও উর্দূ অনুবাদ দুইবার প্রকাশিত হইয়াছে;
(৩) রিসালা দার নিকাহ বীওয়াগান (ফারসী), এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই;
(৪) সিরাত মুস্তাকীম (ফারসী), ইহার বিষয়বস্থ তিনি নিজেই বর্ণনা করিতেন। প্রথম অধ্যায়টি মাওলানা শাহ ইসমাঈল এবং দ্বিতীয় অধ্যায়টি মাওলানা 'আব্দুল হায়্যি কর্তৃক লিপিবদ্ধ হয়। উভয়ই কিছু অংশ লিখিয়া সায়্যিদ সাহেবকে পড়িয়া শুনাইতেন। কোন কোন সময় তাঁহার নির্দেশ মোতাবিক দুই-তিনবার করিয়া পাঠের পরিবর্তন করা হইত (মানজূরা ওয়াকাই), কলিকাতা ১২৩৮/১৮২৩)। মক্কায় অবস্থানকালে মাওলানা আব্দুল হায়্যি 'আরবীতে ইহার অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইহার উর্দূ অনুবাদ ও প্রকাশিত হইয়াছে;
(৫) মুলহিমাত আহমাদিয়া ফিত-তারীকিল মুহাম্মাদিয়া, আগ্রা ১২৯৯/১৮৮২. কলিকাতা ১২৩৮/১৮২৩;

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) সায়্যিদ মুহাম্মদ আলী মাখযান আহমাদী (ফারসী), আগ্রা ১২৯৯ হিজরী, হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার; (২) সায়্যিদ জাফার আলী নাকবী, মানজূরাতুস সু'আদা ফী আহওয়ালি'ল গুযাত ওয়াশ শুহাদা, তারীখ আহামাদী নামে পরিচিত (ফারসী), পাণ্ডুলিপি, নওয়াব ওয়াযীরুদ-দাওলার ইঙ্গিতে

রচিত হয়। গ্রন্থটি প্রায় ১২০০ পৃষ্ঠাসম্বলিত। মুল হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি টুংক-এ সংরক্ষিত আছে। শেষোক্ত পান্ডুলিপি কিছুটা অসম্পূর্ণ; (৩) ওয়াকাই আহমাদী (উর্দূ)। ইহা তারীখ কাবীর নামেও পরিচিত টুংক এর গভর্ণর নওয়াব ওয়াযীরু'দ দাওলা সায়্যিদ আহমদের অবশিষ্ট সঙ্গী-সাথীগণকে একত্র করিয়া তাঁহাদের বর্ণনা অনুয়ায়ী সমগ্র অবস্থা লিপিবদ্ধ করান। ইহা কয়েকটি খন্ডে রচিত হয়। পুরা গ্রন্থটি প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠাসম্মলিত, ইহার পান্ডুলিপি টুংক ও নাদওয়া (লখনৌ) তে সংরক্ষিত রহিয়াছে; (৪) মাওলাবী জাফার থানেশ্বরী তাওয়ারীখ আজীবা অথবা সাওয়ানিহ আহমাদী (উর্দূ), গ্রন্থটি দিল্লী (১৮৯১ খৃ.) সাঢুরা (১৯১৪ খৃ) এবং লাহোর (তা.বি.) প্রকাশিত হইয়াছে; (৫) হায়াত তায়্যিবা (উর্দূ), মিরযা হাযরাত দিহলাবী কর্তৃক লিখিত, ইহা মূলত শাহ ইসমা'ঈল-এর জীবনীগ্রন্থ, শেষের দিকে সায়্যিদ আহমাদের আলোচনা সংযোজন করা হইয়াছে। দিল্লী ১৮৯৫ খ্রি. ; (৬) স্যার সায়্যিদ আহমাদ খান, আছারুস সানাদীদ (উর্দূ), প্রথম সংস্করণ, দিল্লী ১৮৪৭ খৃ. অধ্যায় ৪ পৃ. ২৬ প. ৫৫ (তাযকিরা-ই আহল-ই দিল্লী নামে এই অধ্যায়টি কাদী আহমাদ মিয়া আখতার জুনাগঢ়ী কর্তৃক সংকলিত হয়, সম্পা. আমান-ই তারাক্কী উর্দূ, পাকিস্তান, ১৯৫৫ খ্রি. [পৃ. ৩৪ প., ৬৭]; (৭) নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান, তাকসারু জয়ুদিল আহরার (ফারসী), ভুপাল ১২৯৮ হি. ; (৮) দীওয়ান অমর নাথ, জাফর নামাহ (ফারসী), পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, লাহোর ১৯২৮ খৃ.; (৯) নাওয়াব ওয়াযীরুদ-দাওলা ওয়ালী টুংক ১২৮৬ হি. ইহাতে কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে সায়্যিদ আহমাদ ও তাঁহার সঙ্গী সাথীদের অবস্থার বর্ণনা রহিয়াছে; (১০) মাকাতীব (ফারসী), সায়্যিদ আহমাদের 'মাকাতীব' এবং 'আলাম-নামাহ জাতের' কয়েকটি সংকলন প্রস্তুত করা হইয়াছে; (১১) সীরাত 'আলামিয়্যা (ফারসী), শাহ 'আলামুল্লাহ এর অবস্থা তাঁহার বংশের একজন ব্যক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন পরে অপর একজন তাযকিরাতুল আবরার (পান্ডুলিপি), বংশীয় অবস্থা বর্ণনায় ইহা একটি উত্তম গ্রস্থ; (১২) মাওলাবী রাহীম বাখশ তারীখু লুবুব লুবাব (উর্দূ), লাহোর ১৩৩৪ হি. ; (১৩) আরওয়াহ ছালাছা (উর্দূ), সাহারানপুন ১৩৭০ হি., ইহা আমির শাহ খানের বর্ণনার একটি সংকলন, যাহা মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, মাওলানা তায়্যিব সাহিব এবং আরও কিছু সুধী ব্যক্তির চেষ্টায় প্রকাশিত হইয়াছে; (১৮) জাফার নামাহ-ই রঞ্জিত সিংহ (ফারসী পদ্য), কানাইলাল হিন্দী, লাহোর ১৮৭৬ খৃ. ; (১৫) Hazara Gazetter, লাহোর ১৮৮৩-১৮৮৪ খৃ. ; (১৬) সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী, সীরাত সায়্যিদ আহমাদ শহীদ (উর্দূ), লখনৌ ১৯৩৯ খৃ. ; (১৭) সায়্যিদ আহমাদ শহীদ (উর্দূ) দুই খন্ডে, লাহোর ১৯৫৫ খৃ.; (১৮) রাহমান আলী, তাযকিরা-ই উলামা-ই-হিন্দ, পৃ. ৮১-৮২ ; (১৯) নিজামী বাদায়ুনী, কামুসুল-মাশাহীর (উর্দূ), ১ম খন্ড, পৃ. ৩১৪-৩১৫; (২০) Storey, Persian Literature, ১/২, ১০৪১, খন্ড ৩ ;

(২১) Beale oriental Biographical Dictionary, লন্ডন ১৮৯৪ খৃ., পৃ. ৩৫৪ প.; (২২) W. W. Hunter, The indian Musalmans, লন্ডন ১৮৭১ খৃ., পৃ. ১৪-১৮, ৩৫৪-৩৫৫ পৃ. । (২৩) Buckland, Dictionary of Indian Biography. পৃ. ৮, ১৮৮৮ খৃ., বিশেষত ২য় খন্ড, ৩৫০; (২৪) সৌহান লাল, 'উমদাতুত-তাওয়ারীখ, লাহোর, ১/৩, ১৬, ১৯, ৩০ পৃ. , ৮৫ প., ৫৬ স্থা.; (২৫) মুহাম্মদ ইকরাম, মাওজ-ই-কাওছার, বোম্বাই, পৃ. ৭-৪৮; (২৬) M. T. Titus, Indian Islam, লন্ডন ১৯৩০ খৃ., পৃ. ১৮১-১৮৬; (২৭) W. C. Smith. Modern Islam in India, লাহোর ১৯৪৩ খৃ. ।

তথ্যসূত্র: ইসলামী বিশ্বকোষ

Life Sketch of Syed Ahmed Shahid

Maulana Syed Abul Hasan Alj Nadwi

Abridged By (Late) Maulana Muhammed Sani Hasani

Translated By Qazi Abdul Hameed

The Pitiable Conditions off Muslims in thirteenth Century India

The political, religious and moral condition of Muslims in India in the thirteenth century Hijri (the end of eighteenth and beginning of nineteenth century C.E.) had come down to rock bottom. The Mughal Empire had disintegrated and East India Company and its allies swayed over various parts of India. The remaining parts were held by petty rulers and ^sardars. The Mughal King, Shah 'Alam, was a figure-head. The whole of South India was at the mercy of Marathas. The Punjab and part of Afghanistan were ruled by the Sikhs. The capital, Delhi and adjoining areas were *the* target of Maratha and Sikh forays. The political credibility of the Muslims was at a low ebb. They had no leader who could unite them. They were weak and anybodz could harass them at will.

The moral fabric of the Muslim society was shattered and many sinful and heretic practices had become a fashion and people used to pride over them. The use of alcohol was not uncommon, the high and low revelled in wild orgies. The morality and sense of shame had lost their importance with some people; many Muslim women had entered the European households.

The polytheistic and heretic rites had infiltrated in the "millat". The Muslims had acquired such beliefs for which the Jews, Christians and infidel Arabs had earned the wrath of Allah. Many un-Islamic and Shiite rituals had entered the 'sunni' society and most of its members had lost sight of 'shariat'. The Islamic traditions were being forsaken. The injunctions of Glorious Qur'an and 'traditions' were not observed even in literate and respectable Muslim families. The widow re-marriage, daughter's share in property and traditional greetings were under taboo by social conventions. The same way the obligatory duty of Hajj was dropped on the pretext of anarchic and disorderly

conditions. The Glorious Quran was thought to be a riddle not to be understood or impossible to be explained by the uninitiated and it was considered a 'forbidden tree'.

But it would not be correct to presume that the thirteenth century was all unenlightened or devoid of learning, religious activity, spiritual life or there was no pursuit of knowledge. The earlier part of thirteenth century is historic for Islam and Muslims in India. There were such erudite scholars that it would not be easy to find their equals anywhere else, scholars who were unique for their profound knowledge and understanding of Traditions of the Prophet (peace be on him) and geniuses in the fields of literature and poetry, tutors with encyclopaedic knowledge and sufis and mystics of high order were all there. There was a net-work of schools and monasteries (khanqah) and 'ulama[1] who were busy in teaching and preaching, writing and compiling, the schools and 'khanqah' were full of students and disciples (murid) in those days.

It cannot, however, be denied that the store of knowledge, which their predecessors had built up was being depleted for want of replenishment. There was no further addition and no progress. There were geniuses in different branches of learning but their energies were being frittered away for want of purpose in life. The noble qualities of fortitude and bravery, sense of shame and ambition were being wasted for contemptible ends and epicurism was the order of the day. There were scattered sages and geniuses but no organised bodz as such. The life had lost its moorings and there was no trace of any useful and popular movement.

There was an urgent need for such a person or bodz of persons who would utilise the talents of these persons and give them a direction, who would popularise the ecstasy of 'khanqah' and the light of learning of the schools. The 'ulama' who would ride the chargers and the 'mujahid' who would enkindle the flame of love of Allah, provide warmth to the low-spirited and enliven the spirit of religion from one end of the country to the other, who would put to good use the inherent talent of the Muslims; who would have foresight; who would not consider anything useless; who would have the healing-touch of a christ; who would be the epitome of all such qualities which go to make one an 'imam' of his time. This was the singular honour for which Syed Ahmed was the most suitable person in the galaxy of 'ulama' and sages. We are narrating in this book the selected facts and tales of his tenacity of purpose, impact on Muslim society and revolutionary changes which he brought about during his life time.

The Family

Shaikh-ul-Islam Syed Qutubuddin Muhammad al-Madani was the son of Syed Rashid-ud-Din, who was the twelfth descendant of Muhammad Zu Nafs Zakiyya Shahld, grandson of Hazrat Hasan. Shaikh-ul-Islam Syed Qutubuddin was a high-minded sage and a pious man who was endowed with courage and spirit of 'jihad' along with erudite knowledge and piety. He came to India with a party of 'mujahidin' through Ghazni and conquered Kara (in Allahabad) where he settled, died and lies buried. The scions of Shaikh Qutubuddin had inherited qualities of leadership, self-possession, abstinence and piety. There was one sage Hazrat Shah 'Alamullah in the descendants of Syed Qutubuddin during the reign of Aurangzeb Alamgir. He was 'authorised' (majaz) by Hazrat Syed Adam Binnori, one of the 'khalifa' of Hazrat Mujaddid Alf Sani. He was very pious and staunch "traditionalist". He died in 1096 (1684) and was buried at Daerah (Rae Bareli) which he had founded.

The Birth

Syed Ahmed was the fifth descendant of Shah 'Alamullah. He was born in 1201 (Nov. 1786). His father's name was Syed Muhammad Irfan and grandfather's Syed Muhammad Nur. At the age of four he was enrolled in a 'maktab'. But he was not disposed to learning and did not make any progress in book lore despite the best of efforts. He was fond of manful sports and soldiership from childhood. When he reached adolescence he used to attend on the old, infirm and widowed in the manner the elders used to wonder at it. He was very fond of prayers and 'zikr'.

To Lucknow In Search Of Livelihood

His father Maulana Muhammad Irfan breathed his last when he was only twelve years old. The conditions warranted that he should shoulder the responsibility of maintenance of the family, and look for livelihood. He went to Lucknow with seven other relations in search of a job. The distance from Rae Bareli is seventyeight km. They had one mount and they used to ride it in turn. But Syed Sahib used to insist on others to ride at his turn and preferred to walk. He looked after his companions throughout the journey and reached Lucknow. Nawab Sa'adat Ali was the Ruler at that time. He was an ambitious and able administrator. But inspite of that except for a few jagirdars and big businessmen there was unemployment and poverty. Everyone busied himself in looking for a job in Lucknow, But it was difficult to find one. Inspite of hard work and day-long labour they had to be content

with a frugal and insufficient meal. Syed Sahib was staying with a nobleman who had high regard for his family. But he used to feed the rich-fare he used to get from the host to his companions and he was content with potluck.

Under The Tutelage of Shah Abdul Aziz

He passed four months under difficult conditions. Once the ruler went for shooting and the nobleman with whom Syed Sahib was staying went with the entourage. Syed Sahib with his companions went with the party and attended on the co-travellers. He had to undergo many hardships in this safari. Syed Sahib tried to persuade his companions to proceed to Delhi and profit from Shah 'Abdul Aziz but to no avail. Ultimately he went to Delhi by himself.

He travelled the entire distance on foot, served the travellers on way but continued the journey most of the time thirsty and hungry and reached Delhi after many days. When he reached Delhi he had blisters in his feet on account of continuous walking. He presented himself before Shah Abdul Aziz. Shah Abdul Aziz knew the family well. He expressed great pleasure on introduction and after usual formalities sent him to his brother Shah Abdul Kadir.

He acquired such competence in 'contemplative sciences' in a very short span of time which others normally attain after hard and strenuous endeavour tanging over a long time. He was ordained (khalifa) and permitted to go to Rae Bareli. He stayed here for two years during which period he married also.

Joins The Army of Amir Khan

He needed actual fighting experience to perfect the art of 'jihad' for which he was destined and which was his main object in life.

He went to Delhi again in 1226 (1811) and at the instance of Shah Abdul Aziz joined the army of Amir Khan who was engaged in armed struggle in Malwa and Rajasthan. He tried to divert his struggle and contain the ascending English power. Amir Khan was an ambitious Afghan soldier of fortune, who had collected a good number of valiant and adventurous fighters around him. He was a power to reckon with and the rulers sometimes requisitioned his services. The Englishmen too could not ignore him.

Syed Sahib sewed Amir Khan for six years. He continued his prayers and preachings along with his duties with the result that the entire camp became a centre of preaching. The armymen greatly benefited from it and there was a marked change in the life of Amir Khan himself.

Return To Delhi

When Amir Khan, compelled by circumstances and disloyalty of some of his close associates sought truce with Englishmen, Syed Sahib opposed it, but when he eventually signed the treaty and accepted the State of Tonk. He was disheartened and left for Delhi.

This time a large number of people gathered around him and two eminent persons of the family of Shah Waliullah, Maulana Abdul Hai and Maulana Muhammad Ismail were initiated (bai'at). Because of these two renowned 'ulama' the great and small, 'ulama' and 'mashaikh' thronged around him in multitude, and his popularity increased day by day. He started preaching around Delhi and went to Muzaffarnagar, Saharanpur and other historical places, which had produced great men and were inhabited by 'ulama' and nobility - the cities like Rampur, Bareilly, Shahjahanpur, etc., where hundreds of people were 'initiated'[1] and they recanted and abandoned polytheistic and heretic practices. Haji Abdul Rahim. who was one of the famous 'mashaikh' of his time came for "initiation with thousands of his disciples. This tour proved very auspicious lor the entire region. It is said on authority that whenever he stayed even for a short time the obligatory (farz) prayers (in mosques) were re-established, religious beliefs were revived, 'sunnat' were restored, the zeal for Islamic tenets was renewed and above all people developed a dislike for polytheistic, heretic and Shiite practices. Maulana Abdul Hai and Maulana Muhammad Ismail were with him in this tour, lot of people benefited from their sermons and lives of many people were revolutionized.

Back To Home Town

He came back home to Rae Bareli. The entire region was then in the grip of a famine and there was scarcity and suffering, poverty and privation and he had over a hundred persons to feed. But there was an atmosphere of Shekinah and absolute faith in Allah. There were great scholars and sufis with him and everyone, inspite of his scholarly learning used to profit from him and he used to be busy in serving the people. This small hamlet was a crowded monastery (khanqah), a religious school and a training ground for 'jihad'. It was a time of great delight and ecstasy though full of hardships. He also visited Allahabad, Benares, Kanpur and Sultanpur during this period and people came to him in groups for 'bai'at'.

The Vist To Lucknow

There was a good number of Pathans in Lucknow Cantonment who were devotees of Syed Sahib' and his ancestors, of whom Nawab Faqir

Muhammad Khan is worth mentioning. He undertook this journey to Lucknow, with about one hundred and seventy disciples, at the request of these people for their reformation. Maulana Abdul Hai and Maulana Muhammad Ismail were with him in this tour also. Nawab Ghaziuddin Haider was the Ruler and Nawab Mo'tamad-ud-Dowlah Agha Mir was his Minister at that time. But there was chaos and disorder, repression and injustice in the State. The high and mighty indulged in epicureanism and sensualism. It was the spring time of merry-making, amusement and fun. But at the same time there were some people who were amenable to good counsel and they had regard and respect for the greatness of religion. The city was the centre of scholars and sages and the select among the nobility from outlying areas had also emigrated here. There were many pearls of the first water in the masses awaiting the master-touch of a wonder-worker.

Syed Sahib and his companions stayed on the western bank of Gomti near Shah Pir Muhammad mosque. The day he reached there, people started coming in great number and they used to mill around the place from morning till night. The successive and persuasive sermons of Maulana Muhammad Ismail had great effect on the local people. These sermons changed the lives of thousands of people. They came, recanted and started a new life. The people of Lucknow greatly benefited spiritually by the visit of Syed Sahib and

his blessed party during this short stay. The great savants and sages used to visit and enter the fold of 'bai'at'. Maulana Abdul Hai and Maulana Muhammad Ismail delivered sermons every Friday and members of different fraternities (biradaris) became the disciple (murTd) of Syed Sahib and recanted from polytheism and heresies (bid'at). There were innumerable feasts and many works of wonder (karamat) were witnessed during this time. The polytheism and heresies were reduced to the minimum and those addicted to crimes and wickedness recanted. The government was perturbed at the popularity of Syed Sahib, specially at the relinquishment of Shiite practices. He was warned but he continued his preachings and invited people to the true religion with determination and grit.

He returned to his home town after one month and during this period he felt the urgent need for 'jihad' in view of the oppressions over Muslims in the Punjab and became restless for it. Whenever he saw a youngman of strong physique, he would say, "He is good for our cause." He would often wear arms so that other people may realise their importance. He would hold mock-battles, target practice and display of martial arts and soldiership.

The Hajj

During this period along with other tenets of Islam, the fundamental tenet like Hajj was abandoned or neglected on account of the juristic excuse of insecurity on way. A few 'so called' 'ulama' had given a judicial decree (fatwa) for it to be dropped. Syed Sahib wanted to stop this practice and preached the obligatory nature of Hajj himself with great force. He considered it necessary to take practical steps to revive it and went for Hajj with a number of savants and distinguished persons. He asked his disciples to write letters to different places on the indispensabilily of Hajj. with the result thai a large number of pilgrims collected at this declaration and invitation for it. He started with four-hundred pilgrims on 2nd July. 1821. after Id prayers (Id-ul-Fitr) from his home town.

He went to Dalmau from Rae Bareli and from there he went to Calcutta by boat. On way Maulana Abdul Hai and Maulana Muhammad Ismail and other savants in the caravan delivered sermons in which polytheism and heresies were countered and correct beliefs and virtuous deeds were restituted. Thousands of men and women entered the fold of 'bai'at'. It is said that not a single Muslim was left as the entire city of Mirzapur entered the fold of 'bai'at' and thousands of Muslims in Benares including the savants and sages same for bai'at with the result that polytheistic and heretic practices were hit hard. He reached Patna via Ghazipur and Danapur and stayed there for two weeks. During his stay importance of 'shariat' was emphasised and heresies were denounced with vigour. He sent a few Tibetan nationals to Tibet from Azimabad for preaching and the effect of their efforts was felt in China also. He reached Calcutta from Azimabad and stayed there for three months. Calcutta was the seat of the British Government and the biggest city of India. He brought about a religious revolution there. The heads of different families and fraternities (biradan) declared to their families and fellow brothers that those who do not enter the fold of 'bai'at' of Syed Sahib and do not stick to 'shariat' would be boycotted. The people lined before the halting place of Syed Sahib at this announcement. The pubs and dens of vice were deserted. The grand-children of Tipu Sultan, whose ancestors had good relations with the ancestors of Syed Sahib greatly benefited by his advices. He left Calcutta for Hajj pilgrimage with seven hundred and seventyfive persons. The rush of on-lookers was so great that the roads were blocked with Muslims and non-Muslims and it was difficult for pedestrians to pass through the crowd. The caravan reached Jeddah on 16th May, 1822, stopping and preaching at every port and coastal region on way. He entered the 'Haram' on 21st May. 1822.

The people of this holy place also took advantage of his presence. The 'imam' of the Grand Mosque and the Grand 'Mufti' of Makkah became his disciples (murid) and the chieftains and noblemen of other Muslim states profited from him. He passed the month of fasting in Makkah. During the period of Hajj he took a vow (bai'at) for 'jihad' from his companions at 'Aqba-'e-Ula' - the place where Prophet Muhammad (peace be on him) had taken the vow (bai'at) from 'Ansar' and which later became the basis of his emigration to Madina.

He went to Madina from Makkah. There also savants and sages, high and low crowded round him in great numbers. He returned to Makkah, passed the second month of fasting there, performed Hajj for the second time and returned to Rae Bareli on 30th April, 1824.

The Pre-Occupation At Home Town

He stayed at Rae Bareli from 30th April, 1824 to 17th January, 1826 -- for one year and ten months. It was his last stay in his home town. He occupied himself with preaching and inducing others for 'jihad' which included practical training-- both spiritual and physical of the companions. This period was full of rigorous performance of religious duties, asceticism and vigorous work. The life was simple and spiritual, austere and disciplined. The entire village (Daera Shah 'Alamullah) was full of life and high spirits.

Need For Emigration

The pitiable condition of the Muslim scholars and helpless position in which Islam was placed at that time was clear to Syed Sahib. He was a spectator to the over-whelming influence of un-Islamic powers, specially intolerable tyranny to which the Muslims in the Punjab were subjected. The entire community was living a serf-like life of distrust and disrespect, disappointment and discomfiture. Their property was being confiscated on trivial grounds. The chambers in the famous Shahi Mosque of Lahore were being used as stables. There was restriction on azan and Islamic practices at many places and Muslims had become despondent and restless with this contemptible treatment.

In this big border province which was inhabited by martial community (Pathans) among Muslims and where they had clear majority this disgrace and subordination under a non-Muslim power, which was inimical to them, could not be allowed to remain as such. It was a permanent danger for Delhi, whole of north-west India, and Afghanistan. It was far-sightedness and political acumen of Syed Sahib and his companions that they realised this danger and made the Punjab the centre of their crusading activities.

The rise of British power in India, internecine feuds among Muslims and the resultant dispersion and decline of Islamic influence disturbed him. Raising the 'Voice of Truth' and need for liberation of Islamic lands made a demand for 'jihad' from all duty-conscious and self-respecting Muslims. In his opinion 'jihad' was an important part of religion and he considered emigration as the first step towards it. Becaue under the prevailing conditions 'jihad' was difficult without emigration. The clear verses of the Glorious Qur'an and Traditions incited him for 'jihad' and love of Allah and Divine Pleasure excited him to act and he made a firm determination for it.

Though his main object was India is clear from several letters which he wrote to different Heads of States and Muslim Rulers in and outside India. Maharaja Ranjit Singh had established his rule in the Punjab and the Muslims were tyrannised, that is why they needed immediate help. Besides, in view of military strategy and political expediency it was necessary to start this movement from north-west India which was the centre of powerful and zealous Afghan tribes. Then some of their families and relations were his disciples (murid) and respected him. They promised help and cooperation for this purpose. Moreover, other Muslim countries extended right up to Turkey. He was preparing himself and his c ompanions for 'jihad' from the very beginning.

The Emigration

He bid 'adieu' to his home town Rae Bareli on 17th January, 1826. The caravan passed through plains and deserts, hills and dales, forests and rivers, mountains and passes and covered United Provinces, parts of Malwa, Rajasthan, Baluchistan and INorth-West Frontier to reach Afghanistan which was in itself an arduous task. They had to undergo various hardships, hunger and thirst, because of shortage of provisions and water, fear of highway robbers. They passed through new places, encountered unfamiliar dialects and strange people, some courteous and some contemptuous, faced their doubts and suspicions, their curiosities and close enquiries, prying and spying, etc. They endured all these odd situations on their way. The caravan consisted of noblemen, saints and sages, rich and enthusiastic youngmen, weak and infirm, but full of zest for 'jihad' and consisted of six hundred 'mujahadin'.

He stopped at Dalmau, Fatehpur. Banda, Jalon, Gwalior, Tonk and he was welcomed at every place and people became his disciples (murid). The Maharaja of Gwalior asked for an audience and he presented gifts. He went to Tonk from Gwalior. The Nawab of Tonk

received him with great enthusiasm (Syed Sahib had served in his army for six years at Tonk) and saw him off. He reached Hyderabad (Sind) via Ajmer, Pali and through toilsome desert of Marwar. On way thousands of men and women entered the fold of 'bai'at' and many persons accompanied him. Sind was under the rule of independent rulers, who were members of a family and lacs of warriors and war-veterans lived in their territories. There were great many 'aulia' who had disciples all over Sind. They welcomed Syed Sahib and assured all help. The Ruler of Sind, Mir Muhammad and the *elite* received him with open arms.

He stayed at Hyderabad (Sind) for a week and went to Pirkot and stayed there for two weeks and then went to Shikarpur and met the respectable and prominent persons, of the place. He went to Chhatarbagh and Dhadhar from Shikarpur. On way he stayed at many places and invited the people for 'jihad'. The savants, sufis and citizens paid their homage to him. He journeyed through the narrow and perilous Bolan Pass with the entire'caravan. It is a natural gorge which has been carved by denudation for strong --willed conquerors and the needz passersby in the long chain of mountains which separate India from Afghanistan. He reached Shal (Quetta) through Bolan Pass. The Chief of Shal paid him great respect and many 'ulama[1] became his murid.

In Afghanistan

He went to Kandahar. The Barakzai brothers ruled over Afghanistan during this period, who were called Durranis. Purdil Khan ruled over Kandahar, Mir Mohammad Khan over Ghazni, Dost Muhammad Khan and Sultan Muhammad Khan over Kabul and Yar Muhammad Khan over Peshawar. But there was no love lost between them and they used to engage in family feuds most of the time. The main purpose of this visit was to unite these brothers and prepare them for 'jihad' against the enemies of Islam.

When he reached Kandahar, the ruler received him and thousands of 'ulama', noblemen and other persons came out of the town on foot to welcome him. The roads were jam-packed with people. He stayed in Kandahar for four days. Everybodz was readz and willing to join him for 'jihad.' He went to Ghazni from Kandahar. About four hundred learned men, students and sages from monasteries (khanqah) came to him eager for 'jihad.' He selected two hundred and seventy persons and took them with him. He informed Mir Muhammad Khan of Ghazni and Sultan Muhammad Khan of Kabul, of his arrival and the purpose of his

visit and asked for their cooperation. When he reached Ghazni, rich and learned persons came about three miles out of the town on foot to receive him. He encamped near the mausoleum of Sultan Mahmood Ghaznavi and lot of people entered the fold of 'bai'at'.

He stayed at Ghazni for two days and left for Kabul.

The rich, the *elite* and thousands of common people received him outside the town. The cloud of dust raised by the horses and crowd blinded everything. Sultan Muhammad Khan came out to receive him with his three brothers and fifty horsemen. He stayed in Kabul for one-and-a-half months. He spoke about reforms and 'jihad' most of the time. The *elite* and the commonmen, profited by his preachings finding the faith-lifting atmosphere, burning desire for 'jihad' and the will to lay down their lives in the 'Way of Allah' the people joined the blessed caravan. He did his best to bring reconciliation between the Barakzai brothers but he did not succeed. He left for Peshawar. The people used to receive him with great enthusiasm all through the journey. He exhorted the people for 'jihad' on way and reached Nowshera. He made the beginning of the highly desired object and a great divine worship which was the culmination of years of preaching and striving and the chief purpose of this strenuous journey Í 'jihad.'

The Battle of Akora

He asked in a despatch from Nowshera to the Ruler of Lahore to embrace Islam in the first instance or accept suzerainty of Islam and pay 'jizya' and in case of non-acceptance of these terms threatened him with war. He also wrote that probably you may not have that love for liquor which we have for martyrdom. The Ruler of Lahore sent a big Sikh army in reply to this notification. The moment he received the news he made preparations for 'jihad.' The 'mujahidin' were overjoyed with an opportunity for 'jihad' and everyone of them was brimming over with the high spirits of martyrdom. The 'mujahidin' were seven hundred and the enemy strength was estimated at seven thousand armed men. The handful 'mujahidin' confronted their ten times strong enemy at midnight on 20th Dec., 1826. The 'mujahidin' fought with their heart and soul and the enemy fell back. By dawn they were routed and put to flight. This victory inspired the Muslims, the tribal chiefs, 'ulama' and *elite* came to enter the fold of 'bai'at' at the hands of Syed Sahib. The people had confidence in him now. He made peace in between warring tribal chiefs. Khadi Khan of Hund fort became his disciple and Syed Sahib stayed at Hund fort for three months at his request.

The Raid on Hazru

The local people expressed their desire to make a dawn attack on Hazru which was a big trading centre in the Sikh territory. Syed Sahib permitted it, but he did not participate in it. The raiders committed many irregularities in taking the spoils of war. They did not heed the instructions given by Syed Sahib. They did whatever they liked without regard to any rules. The 'ulama' among the 'mujahidin' unanimously decided that the most important and the foremost task is to appoint an 'imam' and 'amir' so that the 'jihad' be carried out under his leadership and command.

Then on 13th January. 1827 at Hund 'bai'at' for 'imamat' and 'khilafat' was carried through at the hands of Syed Sahib unanimously. Khadi Khan. Ashraf Khan. Fateh Khan. Bahram Khan, and the big and small chiefs came to him for 'bai'at' on both the counts. Besides, the 'ulama' of India also accepted his 'imamat. Syed Sahib issued letters for 'bai'at' and 'imamat to all the chiefs, rulers, savants and sages of India. The Rulers of Peshawar and Kabul Yar Muhammad Khan and Sultan Muhammad Khan came with a big party for "bai'at' on seeing his piety and popularity. He promulgated laws of 'shariat after election as 'amir and issued ordinances based on 'shariat' all around. The judgements in Darul Qaza were being delivered according to 'sharial' now. The result of this superintendence (ihtisab) was that no non-praying Muslims were found in the whole area-far and near.

The Battle Of Saidu And Poisoning

The whole region had become united as a single unit under the 'imamat and 'khilafat' of Syed Sahib. The suzerainty of big and small landlords came to an end and they became envious though they entered the fold of 'bai'at' compelled by circumstances. But they were boiling within their "hearts for vengeance and were in league with the Sikh government at Lahore.

There were several skirmishes with the Sikh army. The local landlords who were outwardly with Syed Sahib but at heart with the Sikhs, expressed their desire to make an organised and final stand against the Sikhs. The plain of Saidu was selected at the instance of the local landlords. When the preparations for it were in full swing somebodz poisoned the food. The local people and some others from outlying areas were with the Muslim army including the landlords and their troops. The Muslim army had the upper hand and on the point of winning the battle then all of a sudden the chiefs of Peshawar joined hands with the Sikhs. Yar Muhammad Khan deserted with his troops.

The 'mujahidin' were left alone to fight the Sikhs -- rather the Sikhs and the deserters.

At Panjtar

In view of the changed circumstances Syed Sahib shifted to Panjtar from Hund at the request of Fateh Khan, ruler of Panjtar and made it the centre of his activities. Panjtar is a secure place situated in the mountains of Swat and it remained the headquarter of the 'mujahidin' for quite a long time. It was an Islamic camp and centre of preaching and reforms. This mountainous fastness was a solemn place of which every nook and corner was crammed with 'mujahidin' and devotees who were most of the time busy in recitation of the Glorious Qur'an- 'zikr', preparation for 'jihad' and there was an atmosphere and spirit of fellow-feeling and friendliness, service and sacrifice.

Khacli Khan became very apprehensive with Panjtar being the headqurter. he turned jealous and prejudiced against Syed Sahib and wanted to harm his cause. The unexpected turn of events at Saidu did not dishearten Syed Sahib and did not. in any way. affect his dedication to his mission. He went to Buner, Swat and Hazara. The tour was very successful so far as preaching, reformation and preparation for 'jihad' were concerned. He went to Khar which is the centre of Swat. He stayed there for one year. Maulana Abdul Hai passed away during this period. He was 'Shaikhul-Islam' of the Muslim army (mujahidin) and Syed Sahib had high regards for him.

Encounter With The French General

General Ventura, a French General in the services of Maharaja Ranjit Singh, attacked the 'mujahidin' with an army of about ten to twelve thousand and helped Khadi Khan of Hund. General Ventura retreated under fierce attack by the 'mujahidin' who fought with zeal for 'jihad' and fondness of martyrdom. He returned to Lahore after this defeat discomfited. He took the field again after a few months and advanced towards Sammah. Khadi Khan welcomed him and secretly helped him. Syed Sahib wrote letters to the responsible persons of that region and informed them of General Ventura's adventure, and organised a line of defence. The 'mujahidin' took a vow to fight to the last. When General Ventura saw that the 'mujahidin' have taken up positions of vantage in the hills and passes he again retreated out of fear. When the local people saw the steadfastness of 'mujahidin[1] and signs of Divine help, they came for 'bai'at' in groups. Syed Sahib also went round the villages and strengthened the system of 'shariat.' Khadi Khan conspired

with the enemies inspite of instructions and warning to desist from it. Syed Sahib attacked the Hund fort and seized it under compulsion. Khadi Khan lost his life in the battle.

The Battle Of Zaida

Amir Khan, brother of Khadi Khan, joined hands with Yar Muhammad Khan at whose instance Syed Sahib was poisoned at Saidu. Syed Sahib spoke to Yar Muhammad Khan and asked him not to create dissension and discord. However, he launched an attack on the 'mujahidin' at Zaida. The Durrani army was driven back by the 'mujahidin because of their firmness and resolute stand and they captured their cannons. The defeated army retreated in disorder. Yar Muhammad Khan was killed. The routed Durrani army attacked the Hund fort which was under the control of 'mujahidin.' They were fifty or so in number but they fought with undaunted courage and determination and repulsed their attack and this attempt also ended in fiasco.

The news, somehow got circulated that the 'mujahidin' intended to attack Peshawar which was in the hands of the Durranis. They, therefore, left Peshawar. The 'mujahidin' seized Ashra and Amb in the meantime.

Syed Sahib thought of advancing towards Kashmir and for it, it was necessary to seize Phulra. He sent an expedition under the command of his nephew, Syed Ahmed Ali. The Sikhs attacked them from an ambush and many 'mujahidin' lost their lives including Syed Ahmed Ali. Syed Sahib camped at Amb. enforced the system of 'shariat' and initiated reformation of society.

The Battle Of Mayar

Sultan Muhammad Khan decided to fight a decisive battle with the 'mujahidin. He collected a big army of Durranis and for this end in view he reached Charsadda via Chamkani. Syed Sahib also camped at Toru with 'mujahidin. He did his best to prevent the cheifs of Peshawar from this fraternal feud. But they did not value this spirit of reconciliation. Sultan Muhammad Khan and his relations swore by the Glorious Qur'an to fight to the last. The entire army passed underneath the Glorious Qur an which was hung in a gate. There was much blood-shed at the battle-field of Mayar which lies between Toru and Hoti. Maulana Muhammad Ismail and Shaikh Wali Muhammad seized their artillery. The Durranis turned tail and left the field in shambles and the 'mujahidin' emerged victorious. The 'mujahidin' demonstrated such fortitude and heroism, courage of conviction and devotion to duly and

penchant for the 'coming world that it reminded of the heroic deeds of early Muslims.

The Triumphant Entry in Peshawar

Syed Sahib advanced towards Peshawar after the victory of Mayar which was an important city after Kabul and Lahore in north-west and the capital of North-West Frontier Province for a long time. The circumstances compelled him to take over Peshawar. When Sultan Muhammad Khan felt sure that the 'mujahidin' have decided to annex Peshawar he left it with members of his family and started negotiations with Syed Sahib. When Syed Sahib entered Peshawar, the people were very happy. They illuminated the city and provided sherbet at different places. The 'mujahidin' demonstrated the spirit of true Islamic virtue and training, probity and circumspection. Sultan Muhammad Khan offered to make peace, promised fidelity and vowed that if Peshawar be given back to him, he would enforce 'shariat' laws and convert the region into an Islamic state. Syed Sahib had not undertaken this expedition for territorial conquest but to establish Islamic government and to enforce 'shariat'. He. therefore, accepted the offer and gave him one more chance. Peshawar was handed back to Sultan Muhammad Khan and Syed Sahib left for Panjtar.

The Massacre Of 'Quzat'

The tribal chiefs, specially Sultan Muhammad Khan and worldly-minded 'ulama' realised that enforcement of Islamic laws and 'shariat' and appointment of revenue collectors would be against their personal interests and result in loss of their income. They, therefore, decided to get rid of them.

Sultan Muhammad Khan prepared a scheme to defame the 'mujahidin' among the *elite* and the commonman a little after he was handed over Peshawar. He obtained the signatures of a few 'ulama' on a 'fatwa that the beliefs of the 'mujahidin' are perverse (fasid). He prepared a scheme to murder all the 'Quzat'. revenue collectors and censors (muhtasib) appointed by Syed Sahib at one time in the region of Peshawar and Sammah except Panjtar. They were murdered in a ruthless manner - somebodz was killed while praying in the mosque and somebodz while defending himself. The oppressors did not heed the supplications of 'ulama', womenfolk and non-Muslims too. The 'mujahidin' who were thus put to death were the choicest pick from India and were the product of years of hard training.

The Second Emigration

Syed Sahib lost heart with this merciless killing of innocent 'mujahidin.' He was so heart-broken with the infidelity, thanklessness, oppression and barbarism of the local people that he decided to emigrate from there. He collected the 'ulama' and the chiefs, investigated the reason for this heart-rending incident, placed before them the chief aim of his visit and his efforts in this regard. When he realised that his companions were innocent and oppressed and the entire blame for this massacre lay- op the local people, he finally decided to emigrate.

When the 'ulama' and those persons who were sincere at heart got wind of emigration they grew anxious and came to Syed Sahib in a bodz and requested him not to emigrate. But he did not agree. He had come to know that Fateh Khan had colluded with Sultan Muhammad Khan in his conspiracy to exterminate the 'Quzat', revenue collectors and censors. Fateh Khan also did not request to stay on but supported it in secret. Syed Sahib forgave them instead of any retaliation or revenge. He condoned Fateh Khan also and treated him with kindness and presented him a few gifts. But he did not waver in his firm resolve to emigrate from there and camped at Rajduari. On way the people from Sammah (where the Quzat . revenue collectors and censors were killed in cold blood) came in tears to him and requested him to come back to Sammah. He said. "A faithful (Muslim) is not bitten twice from the same hole."

Towards Kashmir

Syed Sahib selected Kashmir for future reformative activities. He moved towards Kashmir with the remaining companions who were not prepared to leave him in these conditions of gloom and confusion, indefiniteness and uncertainty. The Valley of Kashmir was safe and provided with such natural defences that an intelligent leadership could derive lot of advantages from it. The location was such that it could influence India and those Muslim countries of Central Asia which were important from racial and military point of view and which had established strong Islamic governments in the past. Besides, cordial relations could be established with them.

At Balakot

The administration of the states of Pakhli and Kaghan Valley were in a state of flux-partly on account of successive Sikh-incursions and partly because of their clan feuds. They wanted the help of Syed Sahib. These

states lay on way to Kashmir where he wanted to establish the centre of his future activities. The second emigration was being made for that purpose. Balakot was the most suitable place to lend support to these states, consolidate his own armed strength and for advancement towards Kashmir. It is situated at the southern end of Kaghan Valley and shut in by a mountain and there is no inlet except the mouth of Kunhar river. There are two mountain ranges running parallel with the valley in which the passage in between is not more than half-a-mile wide. The river Kunhar flows in this narrow passage with the hills of Kalu Khan and Matikot on the eastern and western sides respectively. This emigration was beset with many dangers and was painstaking. The mountains and valleys were covered with snow, and the path was full of twists and turns. There was no arrangement for supplies and transport. It proved to be an outstanding example of his ambition and daring. endurance and forebearance and strength of faith of his companions for the object in view. He reached Sachchun from Panjtar halting at different places on way and proceeded towards Balakot and reached there on 17th April, 1831.

The Last War And Martyrdom

Prince Sher Singh was deputed by his father, Maharaja Ranjit Singh, to fight a last-ditch battle with the 'mujahidin.' When he came to know that Syed Sahib had camped at Balakot with his companions, he brought a large army and camped at the east bank of Kunhar river about five miles from Balakot.

When it was clear that Sikh army would attack Balakot scaling down from Matikot, arrangements were made for a final show down with it. The valley of Balakot was strategically favourable for the 'mujahidin.'

Prince Sher Singh lost hope of winning the war on account of Balakot's natural defences and was thinking of going back. But some local people guided him and his army reached Matikot on 6th May. 1831 in a short time. The Sikh army attacked the 'mujahidin' while coming down from Matikot. Syed Sahib was in the forefront and the 'mujahidin' were closely following him. The volley of Sikh bullets was raining like hail. Syed Sahib moved ahead of others and called-out the battle-cry 'Allah-u-Akbar aloud. He was moving fast like a lion after its prey. He found a big rock in the field. He took cover behind it and started firing from there. The 'mujahidin' followed him and at first sent a salvo of gun-fire from their guns and then carbines and killed many enemy soldiers. The enemy started retreating under barrage of fire

towards the hills and ascending it. The 'mujahidin' dragged them down and put them to sword.

The 'mujahidin' lost sight of Syed Sahib and felt sure that he has been martyred. Maulana Muhammad Ismail was hit by a bullet in the head and he was martyred too. The enemy saw that the 'mujahidin' were confused, they attacked once again with all their might and sent a continuous barrage

of gun-fire with the result that the scales turned against the 'mujahidin and many of them lost their lives. (May their souls rest in eternal peace).

The journey of these intrepid 'mujahidin' which started on 17th January, 1826. when Syed Sahib left his home town Rae Bareli with a handful of 'mujahidin' ended at Balakot on 6th May, 1831. They left their beloved families at home and covered deserts and valleys, mountains and forests, countenanced the rebellion and infidelity of the Durranis, but they were so enamoured of their Creator and were so fond of martyrdom that :

"Life is the price for proximity with beloved in the realm of love,
The head is a burden on shoulders with this life-giving news"

Source: Published By- Board of Islamic Studies Indore, Bhopal (M.P.)
Printed And Distributed By -Zia Publications, Lucknow (U.P.)

SAYED AHMAD SHAHEED

Board Of Editors

Sayed Ahmad was born at the small town of Rai Bareli near Lucknow on 24 October 1786 A.D. or 1st Muharram 1201 A.H. He belonged to the well known Sayed family. He was the grandson of Maulvi Ilm Ullah who was highly appreciated due to his Purity, Taqwa and devotion to Allah Almighty. Maulvi Ilm Ullah refused all the gifts offered by Aurangzeb Alamgeer as he proffered to spend his life in poverty. He was the true follower of the Sunnah of the holy Prophet Hazrat Muhammad.

His father died while he was still a young boy. Sayed Ahmad registered in the Madrasa Rahimia of Shah Wali Ullah in Delhi in 1806 A.D. Here, under the sons of Shah Wali Ullah, he learned the Quran and the Hadith for two years. Dissimilar to other Sufis and Ulema of Islam, Sayed Ahmed had not keen interest in education. That is why he proved himself a Mujahid instead of Mujahid or scholar. During his childhood, he had a slight tendency regarding education. Sayed Ahmed had inclination towards Jihad since his childhood. He was fond of physical exercises and often used his time in practicing the use of his arms. By nature, Sayed Ahmad was more a man of battle than a scholar. After spending two years in Delhi, at 1808 A.D. he returned his home station Rai Barely. After two years at the age of 24, he joined the forces of a Pathan military leader Ameer Khan in 1810 A.D. the soldiers of Ameer Khan highly impressed by his strong character. Now he got chance to learn the use of European guns. Sayed Ahmed illustrated himself to his appointment as the commander of the soldiers. However, on the other hand; he was the responsible person for leading the army in prayer. In 1817 A.D., Ameer Khan became subservient of British and accepted the State of Tonk. However, it was not suitable for Sayed Ahmed Shaheed to server under a ruler who itself was under the British. Now Sayed Ahmed Shaheed left the army of Ameer Khan and returned to Delhi where he started his efforts to restore Islam to its original purity.

It was the time that Sayed Ahmed was the skillful man having a lot of spiritual power. Two stars from the family of Shah Abdul Aziz choose him their spiritual guide for themselves. One of them was Shah Ismail Shaheed and second was Maulana Abdul Haiy; the nephew and the son in law of Shah Abdul Aziz respectively. It was a great honour for Sayed Ahmed Shaheed and looking at the luminaries of the family of Shah Wali Ullah, thousands of other people gathered around him. The restoration of Islam in its purity was the main objective of Sayed Ahmed Shaheed. He performed the real services for Islam obviously. He eliminated the un-Islamic actions from the lives of Muslims with the help of Shah Ismail Shaheed and Maulana Abdul Haiy. Marriage with a widow was considered a nasty action not only in Muslims and Hindus but also in the family of Sayed Ahmed Shaheed. However, Sayed Ahmed Shaheed married with a widow as it was according to the Shariah.

On January16, 1826, he left Rai Bareli and he went out for Jihad. Now he launched his own movement for Jihad. Therefore, from Rai Bareli, he first went to Hyderabad, Sindh and then to Shikarpur, Bahawalpur, Baluchistan and Afghanistan. From Afghanistan he entered the subcontinent via Khyber Pass and arrived in Nowshera where he established his headquarter for Mujahidin. A number of Afghan *Mujahidin* also joined him. They were in the opposition of Sikhs now; on the other hand, Ranjit Singh got the clue and sent Sardar Budh Singh to crush the *Mujahidin*. First battle between *Mujahidin* and Sikh forces was fought on December 21, 1826, at the place of Akora. In this battle, *Mujahidin* inflicted defeat upon the Sikh forces. This victory, on the part of the *Mujahidin*, resulted in great popularity of the *Mujahidin* movement. More and more people, prominent amongst them were tribal elders and Sardars, started joining the movement. As a result, *Mujahidin*'s strength swelled to almost 80, 000.

On January 11, 1827, a number of rich people, commanders and two prominent Sardars of Peshawar, Yar Mohammad and Sultan Mohammad, took an oath of allegiance at the hand of Sayed Ahmad Shaheed. Sayed Ahmad Shaheed moved forward to Saidu Sharif and started preparing for a war against the Sikhs. There, Sayed Ahmad Shaheed was poisoned by the servants of Yar Muhammad but he escaped death. This battle was continued four days and the Mujahidin were in the position of command and their conquest was in sight. However, at end, Yar Muhammad the chief of Peshawar along with his allies left the Muslim ranks. Therefore, the victory of Mujahidin converted into defeat. This incident shows the managerial fault among the *Mujahidins*. However, the Mujahidin reorganized for another

battle. In spite of facing treacheries of some of the tribal leaders, Mujahidin succeeded to kill Yar Muhammad (the chief of Peshawar) and Khadi Khan (the chief of Hund) in 1830.

Sayed Ahmed did another blunder once again. He trusted on Sultan Khan, the brother of Yar Muhammad and maintained him the Governor of Peshawar. Sultan Khan planned to reprisal of the murder of his brother. Sultan Khan hired his killers; the slayers attacked on Mujahidin during their prayer at night and killed the large number of Mujahidin. Sayed Ahmed had enormous sorrow due to antagonism of the Muslims of Peshawar and decided to left for Balakot. He made it as his headquarter and planned to fight against Sikhs. Here, the Muslim masses also played the role of spy for the Sikhs. Although, *Mujahidin* kept their arrival secret but the spies delivered the reports of the combat preparations of the *Mujahidin*. In initial days of May in 1831, Sayed Ahmed Shaheed fought the decisive war against Sikhs. The Sikhs were many times greater in number and had superior weapons than the Muslims. Alost six thousands of Mujahidin lost their lives in the battle of Balakot. Sayed Ismail Shaheed, the real devotee of Sayed Ahmed Shaheed fought along with his mentor against the Sikhs and both gained martyred in this battle.

Sayed Ahmed Shaheed is considered the man of action who believed that Muslims should struggle against the British and the rule must be in the hands of Muslims. The Indian Muslims were oppressed due to non-Muslim forces including British and Sikhs. The Indian Muslims had the only way of armed struggle against the non-Muslim powers. He wanted to eliminate the evils due to which Islamic society had dishonored. When he served as militant in army, his companions were also of great piety; they had rejected the worldly wealth and pleasure at all. The armed persons associated with him wanted to improve the moral as well as intellectual lives of the Indian Muslims. Due to this, Sayed Ahmad Shaheed founded the jihad movement. The purpose of jihad movement was armed struggle to remove non-Muslims from and to restore the Muslim power. Sayed Ahmed had believed that after defeating non-Muslims they would be able to protect the Muslim's Power.

The major objectives of the Jihad Movements included the establishment of Islamic State, to get rid of Sikhs, to reduce the British influence, to control the spread of Christianity, to defeat the un-Islamic powers and establishing the peace in society on permanent basis. Sayed Ahmed Shaheed and his companions also made their efforts to eliminate the social evils e.g. worshipping graves by Muslims, drinking alcohol, gambling and other social evils.

The causes of failure of Sayed Ahmed Shaheed and his followers included tough training of Sikh army by the British, poor training of the *Mujahidin*, less management in Mujahidin, less financial and military support of *Mujahidin* by the Muslim countries and lack of other resources. One of the causes of the failure of Mujahidin was that the Mujahidin forced Muslim parents to marry their daughters in early age acting upon the rules of Shariah; however, the mujahidin presented themselves as the candidates for marriage to the Muslim girls of Pathan tribes. A large number of mujahidin get married on force with the young girls of the Pathan families. This action was highly disliked by the tribes and the people turned against the *Mujahidin*.

BIBLIOGRAPHY

1. Waheed Ahmed Masood (Ed.), *Seerat: Khawja Moinuddin Chishti* (Urdu), Lahore: Ziaulquran publications. January 1987.
2. Khalid Mahmood, *Data Ganj Bakhsh Aur Unka Ahed* (Urdu). Lahore: Maqbool Academy. N.D.
3. Hazrat Al-Sheikh Hakeem Mian Abdul Ghafoor Arshi, *Mazhar-i-Noor-i-Khuda* (Urdu), Lahore: Dar-ul-Hidayat publications. April 2012.
4. Dr. Fahmida Hussain (Ed.), Munawar Arbab (Compiled & Translated), *Spiritualism in the Poetry of Shah Abdul Latif Bhittai*, Shah Abdul Latif Bhitai Chair University of Karachi, 2006.
5. Maria. M. Abro and Dr. Kiran Sami, *Concept of Love in the Poetry of Bhitai and Browning*, in Mystic Thoughts: Research Journal of Sufism and Peace Vol. I. No. 1, 2015.
6. Robert Sampson & Momin Khan, *The Poetry of Rahman Baba*, Peshawar: University Book Agency, 2005.
7. G.M. Syed, *Shah Latif and his message*, Sehwan Sharif: Sain Publishers, 1996.
8. Muhammad Abdul Haq Ansari, *Sufism and Shariah*, U.K: The Islamic Foundation, 1986.
9. Kh. Jamil Ahmad, Hundred Great Muslims, Lahore: Feroz son's, 1984. 10. G.N. Jalbani, Life of Shah Waliyullah, Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1978. 11. A.D. Muztar, Shah Wali Allah, Islamabad: NIHCR, 1979

Source: Pakistan Studies

দ্বিতীয় অধ্যায়

দর্শন ও চিন্তাধারা

সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) ও তাঁর আদর্শের প্রাসঙ্গিকতা

প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামান

সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) উত্তর ভারতের রায়বেরেলীর একটি বিখ্যাত হাসানী সাইয়্যিদ পরিবারে ১৭৮৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩১ সালের ৬ই মে পাঞ্জাবের হাযারা জেলার বালাকোট প্রান্তরে শহীদ হন। তাঁর শাহাদাতের পর ১৭৯ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁর জীবন ও আদর্শের উপর ইংরেজীসহ বেশ কয়েকটি ভাষায় অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। প্রধানতঃ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা এসব রচনায় একদিকে যেমন তাঁকে স্বাধীনতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সিপাহসালার এবং সত্যিকার ইসলামের একজন প্রকৃত ধারক ও বাহকরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে, তেমনি আবার কারো কারো পক্ষ থেকে তাঁকে সাম্প্রদায়িক ও ওয়াহাবী বলেও চিত্রিত করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে আমরা তাঁর সঠিক পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করবো এবং সে সাথে সমকালে তাঁর আদর্শের প্রাসঙ্গিকতা বিচার করবো।

প্রথম কথা হলো, সাইয়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) ওয়াহাবী ছিলেন না।

এর অনেক কারণের একটি হলো- ওয়াহাবীরা যেখানে তাসাউফ অস্বীকার করে, সেখানে তিনি হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-এর সুযোগ্য সাহেবজাদা ও খলীফা শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-এর বিখ্যাত খলীফা ছিলেন। তিনি আমাদের ভারতবর্ষের সুপরিচিত চার তরীকা- চিশতিয়া, কাদিরীয়া, নকশবন্দিয়া ও মুজাদ্দিদিয়া তরীকায় খিলাফতপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তাসাউফে এমন উন্নতি ও পারদর্শিতা অর্জন করেন যে তিনি পরবর্তীতে

'তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া' নামে একটি শিরক ও বিদআতমুক্ত সমন্বিত সূফী তরীকা প্রবর্তন করেন।

দ্বিতীয়ত, ওয়াহাবীরা সবখানে ওলীআল্লাহ, নবী-রাসুল এমন কি হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) কেও মৃত মনে করে, সেখানে তিনি প্রিয়তম রাসূল (সা.) কে জিন্দা নবী হিসেবে বিশ্বাস করেন। অসংখ্য বার তিনি স্বপ্নে রাসূল (সা.) এর দীদার লাভ করেন ও তাঁর কাছ থেকে নির্দেশ ও হিদায়াত লাভ করেন।

তৃতীয়ত, অবিভক্ত বাংলা ও আসামে যে সব সূফী তরীকা তথা দরবার প্রধান যথা- ফুরফুরা, জৌনপুর, শর্ষিনা, ধামতী, ফুলতলী ইত্যাদি এগুলোর সিলসিলা এক পর্যায়ে সাইয়্যিদ আহমদ বেরলভীতে যেয়ে মিলিত হয়েছে। সুতরাং তাকে ওয়াহাবী বলা মানে এমন সূফী তরীকাকেও ওয়াহাবী বলে সাব্যস্ত করার শামিল।

সুতরাং যেসব বক্তা ও লেখক সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভীকে ওয়াহাবী বলে চিহ্নিত করেন তাঁরা তথ্য সংকটের শিকার। তবে তাঁকে যে ওয়াহাবী বলে অপবাদ দেওয়া হয় তার একটি কারণ আছে। আর তা হচ্ছে ইংরেজরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী আলিমদের আরবের মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব নজদীর অনুসারী বলে চিত্রিত করার অপচেষ্টা করেছিল। উইলিয়াম হান্টারসহ অনেক লেখকই এ ধারার অপতৎপরতার সাথে যুক্ত। ইতিহাস স্বাক্ষী দেয় যে, ভারতে বিশেষ করে উত্তর ও পূর্ব ভারতে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল সূফীগণের মাধ্যমে। তাই এখানে যে ইসলাম জনগণের হৃদয়ের গভীরে শেকড় গেড়েছে সেটি সূফী আদলের ইসলাম। তাই যদি কোনভাবে স্বাধীনতার নেতৃত্ব দানকারী আলিমদের সূফীবাদ বিরোধী তথা ওয়াহাবী বলে চিত্রিত করা সম্ভব হয়, তাহলে জনমনে তাঁদের যে উচ্চ স্থান আছে সেটা চলে যাবে এবং জনসাধারণ তাঁদের অনুবর্তী হবে না।

এই গভীর মনোসামাজিক ধর্মীয় কারণে সায়্যিদ আহমদ সহ সেইসব সর্বত্যাগী সাহসী আলিমদের বিরুদ্ধে ওয়াহাবিয়াতের অভিযোগ উত্থাপন করার অপচেষ্টা করা হয়। দ্বিতীয় অভিযোগ যে, সাইয়্যিদ আহমদ বেরলভী পরিচালিত সংগ্রাম সাম্প্রদায়িক ছিলো। এ কথাটিও কোনভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। ধর্মীয় বিবেচনা ছাড়াও সাধারণ নৈতিকতা ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি এ অভিযোগ সমর্থন করে না। প্রথমে আমরা এ অভিযোগটি সাধারণ নৈতিক যুক্তি আলোকে বিচার করবো। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত। এটি সাধারণ্যে গৃহীত একটি কর্মনীতি। জাতিসংঘ স্বীকৃত সার্বজনীন মানবাধিকারের প্রথম প্রস্তাবটিই হলো মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার। প্রতিটি মানুষের সম্মান ও মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। জাতিসংঘ স্বীকৃত সার্বজনীন মানবাধিকারের অপর একটি অনুচ্ছেদের মর্মকথা হলো মানুষের স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন ও প্রচার করার অধিকার আছে। তাছাড়া যুদ্ধ সংক্রান্ত নৈতিকতায় বলা হয়েছে যে, সব যুদ্ধ এক পর্যায়ের

নয়। কিছু যুদ্ধ আছে অন্যায় যুদ্ধ, কিছু যুদ্ধ আছে ন্যায় যুদ্ধ, অন্য কথায় সব যুদ্ধই অন্যায় নয়। তা যদি হতো তাহলে দেশের মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতার আন্দোলন অনৈতিক হতো। তা তো নয়ই বরং মুক্তিযুদ্ধ একটি ন্যায় যুদ্ধ, জাতির অস্তিত্বের লড়াই। সাইয়িদ আহমাদ বেরলভী (র.) কর্তৃক শিখদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধ সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। এরই ক্রমধারায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সব সংগ্রামই ন্যায়সঙ্গত। স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্মের অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্যে পরিচালিত লড়াই তাই নৈতিক লড়াই। এই ন্যায় যুদ্ধের একজন নির্ভীক সেনাপতি ছিলেন হযরত সাইয়িদ আহমদ বেরলভী (র.)। অবশ্য ন্যায় যুদ্ধ ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ যতক্ষণ এর প্রয়োজন থাকে এবং সে ক্ষেত্রেও কতগুলো নৈতিক সীমা ও শর্ত মেনে চলতে হয়। তা না হলে যুদ্ধ তো ন্যায় যুদ্ধ হবে কিন্তু সীমা অতিক্রমকারীর আচরণ নৈতিক হবে না। আমরা যদি সায়্যিদ আহমদ বেরলভীর সময়ের পশ্চিম ভারতের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো যে, সত্যিই সেখানে মুসলমানগণ ছিল চরমভাবে নির্যাতিত। যুদ্ধাংদেহী শিখ নেতারা নির্বিচারে মুসলমানদের উপর সীমাহীন নির্যাতন করে যাচ্ছিল। এসব নির্যাতিত মুসলমানদের জানমাল ও সম্মান রক্ষা করার সংগ্রাম সাম্প্রদায়িক হতে পারে না বরং এটি শক্তিমান সাহসী মানুষের জন্য অবশ্য পালনীয় একটি মানবিক কর্ম এবং অবশ্যই নৈতিকও বটে। এবার আমরা দেখবো এ ব্যাপারে ইসলাম কী নির্দেশনা দেয়। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে নিপীড়িত মানবতার সাহায্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অসংখ্য নির্দেশনা রয়েছে। কিছু সংখ্যক মানুষ মুসলমান বলে তারা সাধারণ মানবসুলভ আচরণও পাবে না এমন মনোভাব তো চরম জাতিগত বিদ্বেষ ছড়ানোর নামান্তর। এখন আমরা পবিত্র কুরআন থেকে একটি আয়াত ও রাসূল (সা.) এর অসংখ্য হাদীস থেকে একটি প্রাসঙ্গিক হাদীস উদ্ধৃত করবো। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- "তোমাদের কী হয়েছে যে তোমরা আল্লাহর পথে সে সব অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য লড়াই কর না যারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের প্রতিপালক! যালিমদের এ জনপদ থেকে বের করে আমাদের অন্য কোথাও নিয়ে যাও, তুমি আমাদের জন্য তোমার কাছ থেকে একজন অভিভাবক নিযুক্ত কর এবং আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী পাঠাও" (৪:৭৫)। পবিত্র হাদীসে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন নাজায়িয কাজ দেখে ক্ষমতা থাকলে সে যেন তা হাত দ্বারা তথা শক্তি প্রয়োগে বন্ধ করে দেয়। যদি তার ততটা ক্ষমতা না থাকে তাহলে সে যেন জবান দ্বারা খারাপ কাজের প্রতিবাদ করে। যদি এতটা ক্ষমতাও তার না থাকে তাহলে যেন সে অন্তর দ্বারা এ ধরনের কাজকে ঘৃণা করে, আর এটাই ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।" (মুসলিম)

সাইয়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় তিনি প্রথম জীবনে গতানুগতিক কিতাবী লেখাপড়ায় তেমন মনোযোগী ছিলেন

না। জন্মগতভাবে তিনি সুঠাম ও শক্ত গঠনের অধিকারী ছিলেন। বিভিন্ন ধরনের শরীর গঠনমূলক খেলাধুলা ও ব্যায়ামে তিনি ব্যস্ত থাকতেন। তিনি পরোপকারী ও সেবাপরায়ণ ছিলেন। বিপদগ্রস্থ মানুষের সাহায্যে তিনি ছুটে যেতেন। সামরিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি যৌবনে মধ্য ভারতের টংক-এর নবাবের সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন এবং একজন দক্ষ সৈনিক ও পরবর্তী সময়ে কৌশলী সেনাপতি হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলেন। বলা বাহুল্য, এমন একজন মানুষের পক্ষে স্বজাতি ও স্বদেশের দুংখের দিনে নীরব দর্শকের ভূমিকায় বা কেবল ওয়াজ নসীহত করে সন্তুষ্ট হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই কুদরতই অলক্ষ্যে তাঁকে গড়ে তুলেছিল আগামী দিনে অধঃপতিত ও নির্যাতিত মুসলিম জাতি ও ভারতবাসীকে মুক্ত করার জন্য, স্বদেশীয় অত্যাচারী শিখ ও বিদেশী ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলা, এ সংগ্রামকে সংহত করা ও নেতৃত্ব দানের জন্য। একজন লেখক অবশ্য অন্য কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন যে, সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) পরিচালিত আন্দোলন নবুওয়াতের অনুসরণে পরিচালিত ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনই ছিল এবং তা সফল হতো যদি তিনি সূফীবাদের দিকে ঝুঁকে না পড়তেন। তাঁর মতে সূফীবাদ থেকে সত্যিকার সফলতাকামী ইসলামী প্রচেষ্টাকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে। উল্টোভাবে এ কথা থেকে প্রমাণিত হয়,

এক- তিনি ওয়াহাবী ছিলেন না; দুই- সূফীবাদ অংশটুকু বাদ দিলে তার আন্দোলন সঠিক ইসলামী আন্দোলন ছিল।

এবার আমরা সাইয়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর একটি চিঠি থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দেব যে চিঠিতে তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে কোন পার্থিব বা জাগতিক কারণে তিনি সংগ্রাম করছেন না। কোনরূপ উচ্চাভিলাষ পূরণ বা সুনাম অর্জন করাও তাঁর লক্ষ্য নয় বরং সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং মানবাধিকার রক্ষা করাই তাঁর সব কর্মপ্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য।"...কেউ কেউ ধনৈশ্বর্য ও রাজ্য দখলের জন্য, আবার কেউ কেউ নিজের বীরত্ব ও বাহাদুরী প্রদর্শনের জন্য, আবার কেউ কেউ শাহাদাতের গৌরব অর্জনের জন্য যুদ্ধ করে থাকে। কিন্তু এ যুদ্ধে আমার উদ্দেশ্য ভিন্নতর। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মহান রবের নির্দেশ পালন করা, যিনি একমাত্র মালিক ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। মহা গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত আল্লাহ এ কথার সাক্ষী যে, এ যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা তাঁর হুকুম পালন করা ব্যতীত আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। এতে ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের কোন স্পৃহা না আমার মুখে কখনও উচ্চারিত হয়েছে, আর না কখনো অন্তরে উদিত হয়েছে। ... সারকথা, আমার না আছে বীরত্ব প্রদর্শনের কোন হীন উদ্দেশ্য, আর না আছে রাজত্ব হাসিলের কোন স্বার্থ। এর জ্বলন্ত প্রমাণ এই যে, যদি কোন সম্মানিত শাসক ও শীর্ষস্থানীয় সরদার ইসলাম কবুল করেন তাহলে

আমি তাঁর বীরত্ব শতমুখে অকপটে স্বীকার করে নেব, হাজার প্রাণের বিনিময়ে হলেও তার সাম্রাজ্যের উন্নতি করবো এবং তাঁর সরকারের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সীমাহীন প্রচেষ্টাও চালিয়ে যাব।" (সীরাতে সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ, পৃ. ৪৫৪-৪৫৫)।

কেবল আল্লাহপাকের সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তিনি সত্য ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন। এটি মানুষের মাঝে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। সুদূর বাংলাদেশ থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলমান তাঁর সংগ্রামী কাফেলায় যোগদান করে। ভারতের সীমা অতিক্রম করে আফগানিস্তান থেকেও অনেক লোক তাঁর সাথে শরীক হয়। অনেক হিন্দু ও শিখ মুসলমান হয়ে তাঁর সাথী হয়। কিন্তু গোত্রবাদের সংকীর্ণতা, কিছু সীমান্ত সরদারদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চিন্তা ও কঠোর হৃদয়ের কিছু সংখ্যক শিখদের নিষ্ঠুরতা (নির্বিচারে নারী ও শিশুদের হত্যা, ঘরবাড়ী, ফসলের ক্ষেত জ্বালিয়ে দেওয়া ইত্যাদি) মুক্তিকামী মানুষের এ অগ্রযাত্রাকে মাঝপথে থামিয়ে দেয়। এক অসম সম্মুখ সমরে সিংহ পুরুষ ও মর্দে মু'মিন ও সাচ্চা মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। আর সে সাথে রাসূলের আদর্শে একটি ন্যায় বিচারপূর্ণ মানবিক সমাজ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যায়।

এখন আমরা অতি সংক্ষেপে বর্তমান সময়ে সাইয়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর আদর্শের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে মাত্র দু'টি কথা বলবো। প্রথম কথা হলো ঃ তাঁর আদর্শ হলো সূফীবাদী ইসলাম, তবে তাঁর সূফীবাদ নিষ্ক্রিয়, বিদআত মিশ্রিত সূফীবাদ নয়। এটি জীবনমুখী, সাহসী, অন্যায়ের প্রতিবাদকারী, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন বাজী রাখা সূফীবাদ। সূফীবাদ হলো ইসলামের প্রাণ। প্রাণহীন দেহ দুর্গন্ধ ছড়ায়। মহান আল্লাহর সঠিক পরিচয় ও প্রিয়নবী (সাঃ) এর প্রতি সীমাহীন ভালবাসা ও তাঁর আদর্শের পূর্ণ অনুকরন ব্যতীত সত্যিকার ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। প্রকৃত সূফী চেতনাহীন ইসলাম পরিশেষে জাগতিক সুবিধাবাদিতা বা ভেদবুদ্ধির রাজনৈতিক ফায়দা লুটার কৌশলে পরিণতি লাভ করে। মুসলমানদের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ইতিহাস এ কথার সত্যতা বহন করে। অপরদিকে পবিত্র কুরআন, হাদিস, সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বায়তের অনুসরণ ও অনুবর্তিতাহীন সূফী সাধনা নাফসানিয়াতের কানাগলিতে পথ হারিয়ে ফেলে। স্বার্থবাদী নফস পূজারী ভন্ড সূফীদের জীবন কর্ম দেখলে যে কোন চোখ-কান খোলা মানুষের কাছে এ ধারার সূফী পথের বিভ্রান্তি ধরা পড়বে। আজকের মুসলিম দুনিয়ার দিকে তাকালেও আমরা প্রকৃত সূফী চেতনাহীন ইসলামী প্রয়াস ও ভন্ড সূফী নামধারীদের ধর্মের নামে ব্যবসা পরিচালনা লক্ষ্য করলে জাগতিক প্রয়াসের মধ্যে প্রকৃত সূফী জীবনবোধ যুক্ত করার অপরিহার্যতা স্বীকার করতে বাধ্য। সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর জীবনাদর্শ আমাদের পূর্ণ ইসলাম প্রতিষ্ঠার এ সঠিক রাজপথের দিকে নিরন্তর আহ্বান জানায়।

সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর দ্বিতীয় আদর্শ হলো অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে, মানবিক অধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থভাবে লড়াই করে যাওয়া। ইসলাম সাম্প্রদায়িক কোন ধর্ম নয়। ইসলাম হলো একটি সর্বমানবিক, সর্বকল্যাণ সমৃদ্ধ জীবনমুখী আদর্শ। ইসলামে আল্লাহর যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তাতে তিনি সমস্ত বিশ্বের কেবল স্রষ্টা নন, তিনি করুণাময় প্রতিপালক, পরম ন্যায় বিচারক ও সব শুভ ও কল্যাণের সংরক্ষক। ঠিক একইভাবে রাসূল (সাঃ) কেবল আরববাসী বা মুসলমানদের জন্য পথ প্রদর্শক নন। তিনি সব সৃষ্টির জন্য মহান আল্লাহর করুণার মূর্ত প্রতীক। ইসলামী জীবন পদ্ধতি জন্মগত নয়, সত্য-উপলব্ধি-জাত। সেজন্য ইসলামে কেবল জন্মগত কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব সঠিক বিশ্বাস ও সৎকর্ম নির্ভর। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে; 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে সম্মানিত, যে সর্বাধিক মুত্তাকী'।

রাসুল (সা.) বলেছেন, যার কর্ম তাকে পিছনে টানে, তার বংশ পরিচয় তাকে আগে বাড়াতে পারে না।

আমরা যদি এখন বিশ্ব পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তাহলে দেখবো নয়া উপনিশাসক বিশ্বায়নের নামে ক্ষুদ্র ও দুর্বল জাতিসত্তাকে গ্রাস করতে সর্বশক্তি নিয়োজিত করছে, শক্তিশালী প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে তারা আংশিক তথ্য দিয়ে বিশ্ব জনমতকে প্রভাবিত করছে, একটা কৃত্রিম সংস্কৃতি নির্মাণ করতে প্রয়াসী হচ্ছে, অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসবহুল জিনিসপত্র তৈরী করে সেগুলো বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অশুভ ব্যবহার করে যুব সমাজকে বিপথে পরিচালিত করছে। অর্থ ও বিভিন্ন অনৈতিক পদ্ধতি দ্বারা প্রলুব্ধ করে মেধাবীদের নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করছে অথবা নিষ্ক্রিয় করে রাখছে অথবা ভোগবাদী করে তুলছে। এসব কারণে ধনী আরও ধনী হচ্ছে। গরীব আরও গরীব হচ্ছে এবং গরীবের সংখ্যা বাড়ছেই। এভাবে এক অশুভ কর্মতৎপরতায় অনেক মানুষের জীবন বাধা পড়ছে। এর বিরুদ্ধে কি শুভ বুদ্ধির অধিকারী বিবেকবান মানুষের কিছুই করণীয় নেই? সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.)-এর মহৎ ও সাহসী, ত্যাগী ও তৎপর জীবন এ দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে আলোর দিশা হিসেবে কাজ করে। তাঁর আহবান মানবতার কল্যাণকামী সব মানুষের জন্য, এখানে কোন ধর্ম ও জাতির প্রশ্ন নেই। তাঁর এ ডাক পরিবর্তনকামী তথা শোষণমুক্ত সমাজ নির্মাণের সব কর্মীদের জন্য। সে কারণে তাঁর আদর্শ সমকালীন দেশীয় ও বিশ্ব পরিস্থিতিতে খুবই প্রাসঙ্গিক। মহান আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে চলার তাওফীক দিন, আমীন।

উপাচার্য-গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি
প্রাক্তন চেয়ারম্যান - দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সংগ্রহ : বালাকোট-চেতনা উজ্জীবন পরিষদ, সম্মেলন স্মারক ২০১৬

মুসলিম চেতনায় বালাকোট
ও সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহঃ)
কাযী মুহাম্মদ আবুল বয়ান এম. আর. রহমান হাশেমী

হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রঃ) যিনি তেরোশ' হিজরীর মোজাদ্দেদ হিসেবে তরীকায়ে মোহাম্মদীয়া প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চারটি তাওয়াজ্জুহ বিশিষ্ট নির্ভেজাল সিলসিলার ইমাম ছিলেন। তাঁর প্রায় শ'খানেক খোলাফা দ্বারা উপমহাদেশে ও বহির্বিশ্বে এখনও তাঁর সিলসিলাগুলো জারী রয়েছে। যা আমলের মাধ্যমে সাধারণ মুসলমান মোমেনে কামেল ও অলীয়ে কামেল হিসেবে কবুল হচ্ছেন। এ পন্থায় আজকের মুসলমান সমাজে এবং দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের এক অনন্য তাজদিদী বিপ্লব পরিচালিত হয়েছে ও হচ্ছে। সিলিসলা গ্রহণের মাধ্যমে এ শতাব্দীতে বিশ্বের মুসলমান অশান্তির কালো মেঘের নীচে খুঁজে পাচ্ছেন শান্তির আবেশ ও পরশ। মুসলমান জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত ও পালিত হচ্ছে প্রকৃত ইসলামী জিন্দেগী। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, মুসলমানদের অসহযোগী মনোভাব আর হিন্দুদের অনুগত সমর্থন-এ দুই নিয়েই শুরু হয়েছিল ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটিশ শাসন। মুসলমানরা এ পরিবেশকে 'দারুল হারব' বা শত্রু কবলিত এলাকা বলে ঘোষণা করলো। ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী 'দারুল হারব' এমন এলাকাকে বুঝায়, যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া অথবা সেখান থেকে হিজরত করা মুসলমানদের জন্য ফরজ-অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। বিদেশী ইংরেজ বেনিয়াদের সাথে ষড়যন্ত্র করে অনুগত হিন্দুরা মুসলমানদেরকে শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকেই বিচ্যুত করেনি, বরং তাদেরকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকেও চরম দেউলিয়াপনার দিকে ঠেলে দিয়েছে। উপমহাদেশে 'দারুল হারব'-এ উপলব্ধির ফলেই এই অঞ্চলের মুসলমানেরা ইংরেজ শক্তির উপর বার বার বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। সতেরশ সাতান্নর পর থেকে শুরু করে পুরো একশতকেরও অধিককাল মুসলমানেরা দেশটিকে প্রজ্বলিত রেখেছিল বিদ্রোহের অনলে, এবং এরই চরম বিস্ফোরিত রূপ দেখা দিয়েছিল আঠারোশত সাতান্ন'র সারাদেশ ব্যাপী গণ আন্দোলন তথা সিপাহী বিদ্রোহ, এর পরে ছিল আঠারোশত চৌষট্টির সীমান্ত অভিযান। সতেরশত

পঁয়ষট্টির ফকির বিদ্রোহ দিয়ে এ সংগ্রামের অধ্যায়ের সূচনা। মাঝখানে তিতুমীরের বিদ্রোহ, হাজী শরীয়তুল্লাহ ও দুদুমিয়ার আন্দোলনে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী (রহঃ) এর অভ্যুদয় সর্বশেষ পাটনা, আম্বলার ষড়যন্ত্র মামলার মাধ্যমে সে সশস্ত্র সংগ্রাম অধ্যায়ের ঘটে পরিসমাপ্তি। একদিকে মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অবসান, অপরদিকে বর্বর মারাঠাদের উপুর্যপরি আক্রমণ, পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজদের বিজয়, পাঞ্জাবে শিখদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ, এসব পরিবেশ পরিস্থিতির সমন্বয়ে উপমহাদেশের অধিবাসীদের ঘাড়ে তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রা হিসেবে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসলো ইংরেজ আধিপত্যবাদ। নিজেদের চরম অবহেলার ফলে সবকিছু হারিয়ে ফেলার পর মুসলমানরা তাদের শেষ সম্বল 'ঈমান' টুকু হারাতে রাজী হলনা। চারিদিকের প্রতিবন্ধকতা আর চাপের মুখে এবং অনুশোচনার তীব্র কষাঘাতে তাদের মধ্যে ঈমানী চেতনার বাণ ডাকলো। দেশে প্রতিকূল পরিবেশ থাকায় কৌশলগত কারণে সরাসরি রাজনৈতিক আন্দোলনের পথে অগ্রসর না হয়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দ উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। প্রথম থেকেই আন্দোলনের ব্যাপারে তাদের একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, তা হচ্ছে এই যে, ইসলামের সত্যিকার আদর্শ থেকে বিচ্যুতিই হচ্ছে মুসলমানদের পতনের মূল কারণ। তাই কুরআন ও হাদীসের প্রতি কঠোর আনুগত্যকে ভিত্তি করেই তৎকালীন মুসলমানদের সংগঠনগুলো গড়ে উঠেছিল। এ ধরনের একটি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শহীদ সৈয়দ আহমদ বেরলভী রহ্‌মতুল্লাহি তায়ালা আলায়হি।

ত্বরীকায়ে মুহাম্মদী (দঃ) আন্দোলন ঃ- আমীর খান পিন্ডারীর বাহিনীতে যোগদানের পর প্রাথমিক পর্যায়ে কেউ তাঁকে চিনতো না, উন্নত ব্যক্তিত্ব এবং চারিত্রিক মাধূর্যের কারণে মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সকলের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং বুদ্ধিমত্তার ফলে নবাব সাহেব তাঁকে খুব সম্মান করতেন। এমনকি সব ব্যাপারে সৈয়দ সাহেবের পরামর্শ গ্রহন এবং তা বাস্তবায়ন করতেন। সেনাবাহিনীতে চাকুরী করার পরও সৈয়দ সাহেব সুযোগ পেলেই নফল নামাজ পড়তেন। আশেপাশে দাওয়াতী কাজ করার মত লোক না পেলেও তিনি চাদর মুড়ি দিয়ে নিরিবিলিতে প্রভুর মোরাকাবা মোশাহাদায় সময় অতিবাহিত করতেন। নবাব আমীর খান ইংরেজদের সাথে সন্ধি করতে চাইলে তাঁর মন্ত্রী পরিষদের প্রায় সকলেই ঐক্যমত প্রকাশ করলেন। কিন্তু সৈয়দ সাহেব এই সন্ধির প্রবল বিরোধিতা করলেন। তিনি বললেন, 'ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরুন, আল্লাহর সাহায্য আসবে, জয়লাভ করলে গাজী হবো, মরলে শহীদ হবো। কোন মতেই তাদের সাথে সন্ধি করা ঠিক হবে না। আর যদি আপনি ইংরেজদের সাথে সন্ধি করেন, তাহলে আমি আপনার সঙ্গে থাকবোনা'। সন্ধির পর নবাব সাহেবের

বহু অনুরোধ সত্ত্বেও সৈয়দ সাহেব তাঁর কয়েকজন সাথীসহ বাহিনী ত্যাগ করে জয়পুর চলে যান। অতঃপর দিল্লী গিয়ে শিক্ষাগুরু শাহ আবদুল আজীজ দেহলবী (রহঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করে পুরো পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। শাহ সাহেব দোয়া করলেন। এবার সৈয়দ আহমদ মুসলিম সমাজ থেকে কুসংস্কার বিদূরীত করার কাজ শুরু করেন এবং এ উদ্দেশ্যে ব্যাপক কর্মী সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করেন। কুসংস্কারচ্ছন্ন মুসলিম সমাজকে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর মূল শিক্ষার দিকে ফিরে আসার আহবান জানাতেন বিধায় সৈয়দ সাহেবের নীতিসমূহ ত্বরীকায়ে মুহাম্মদী (দঃ) হিসাবে ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করে। সর্ব প্রথম সৈয়দ সাহেব উত্তর ভারতের রোহিলা সম্প্রদায়কে আন্দোলনের দাওয়াত দেন এবং তাদেরকে কর্মী হিসেবে গ্রহণ করেন। সেখান থেকে দিল্লী পৌঁছার কিছু দিন পর অর্থাৎ তাঁর সাংগঠনিক তৎপরতার প্রথম দিকেই কয়েকজন প্রখ্যাত ব্যক্তি এ আন্দোলনে শরীক হন এবং সৈয়দ আহমদের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে সর্ব প্রথম আনুগত্য গ্রহণ করেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবীর বড় ভাই শাহ আবদুল্লাহর পৌত্র মৌলবী ইউসুফ। তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সৈয়দ সাহেবের বন্ধু এবং নির্ভরযোগ্য পরমর্শদাতা হিসাবে কাজ করেন। সৈয়দ সাহেবের সাথে দেহলবী বংশের নেতৃস্থানীয় লোকদের যোগদানের ফলে উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে গেল। দেহলবী বংশের প্রভাব ও ব্যক্তিত্বের কারনে অসংখ্য মুসলমান সৈয়দ আহমদের ত্বরীকায়ে মুহাম্মদী আন্দোলনে যোগদান করেন। এতে করে ইসলামের একজন মহান শিক্ষক হিসাবে সৈয়দ আহমদ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। লক্ষ্মৌ সফরের সময় যে সমস্ত বিখ্যাত ব্যক্তি সৈয়দ সাহেবের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন তাঁদের তালিকায় মাওলানা ঈমাম উদ্দীন বাঙ্গালীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার অধিবাসী ছিলেন তিনি। সৈয়দ সাহেবের খুবই অনুরক্ত ছিলেন। বাইয়াত গ্রহনের পর থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত সৈয়দ সাহেবের সাথী ছিলেন। আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে আরেকজন বাংলাভাষী মুসলমানদের নাম পাওয়া যায় তিনি হচ্ছেন শেখ বুরহানউদ্দিন বাঙ্গালী। ইনিও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সৈয়দ সাহেবের সাথী ছিলেন। হজ্জে যাওয়ার সময় সৈয়দ সাহেব বহুস্থান সফর করেন এবং দাওয়াতের কাজ চালাতে থাকেন। সৈয়দ সাহেবের এই সফরের সময় কোলকাতায় অবস্থানরত টিপু সুলতানের পুত্রগণ এবং তাদের স্ত্রীগণ তাঁর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন। বার্মার জনৈক ব্যবসায়ী প্রায়ই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোলকাতা সফর করতেন। সৈয়দ সাহেবের কোলকাতা অবস্থানের সময় সৈয়দ হামযা নামক এক স্বর্ণ ব্যবসায়ী বাইয়াত গ্রহণ করেন। সাধারনতঃ বার্মার লোকদের দাঁড়ি খুব কম হয়, কিন্তু সৈয়দ হামযার দাঁড়ি ছিল ঘন এবং দীর্ঘ। তাই বার্মার শাসকগোষ্ঠীর নিকট তিনি খুব সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। সৈয়দ হামযা দেশে ফিরে মুসলমান জনসাধারন এবং

প্রশাসনের বিভিন্ন মুসলিম কর্মকর্তার নিকট আন্দোলনের দাওয়াত দিলে বহু লোক তা গ্রহণ করেন। এভাবে ত্বরীকায়ে মুহাম্মদী আন্দোলনের দাওয়াত বার্মায়ও প্রসার লাভ করে। ১২২৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই উপমহাদেশের সর্বত্র এ আন্দোলন সম্প্রসারিত হয়ে পড়ে। সৈয়দ আহমদ এ বিস্তৃত ভূখণ্ডে সর্বস্তরের মানুষের আশা-আকাংখার মূর্ত প্রতীক হিসাবে আবির্ভূত হন।

জিহাদের প্রস্তুতি ঘোষণা ঃ হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর একদিন সৈয়দ সাহেব রায়বেরেলীতে তাঁর সহকর্মীদের সাথে যিকির-আযকারে মশগুল ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি সকলকে ডেকে বললেন, 'যিকির বন্ধ করুন, এখন থেকে জিহাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অধিকাংশ সময় ব্যয় করত হবে'। অনেকেই বিস্মিত হলেন। প্রশ্ন উঠলো, যিকিরের মত নেকীর কাজ বাদ দিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন কি ? উত্তরে সৈয়দ সাহেব বললেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে যিকির আযকারের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমাদের সামনে উপস্থিত। আল্লাহর নামে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। জিহাদের সামনে অন্যসব নফল ইবাদত মূল্যহীন। জিকির-আযকার হচ্ছে জিহাদের পরবর্তী কাজ।

আন্দোলনের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার ঃ ইংরেজগণ আন্দোলনের ব্যাপকতা দেখে ক্রমেই ভীত হত লাগল এবং উপমহাদেশের মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে দেয়। যেখানে সৈয়দ আহমদ সরাসরি বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, সেখানে কর্মীদের মধ্যে জিহাদের উদ্দীপনাকে নিস্তেজ করে দেওয়ার জন্য ইংরেজগণ প্রচার করলো যে, সৈয়দ সাহেব ইংরেজদের শুভাকাংখী এবং বন্ধু।

দ্বিতীয়তঃ সৈয়দ সাহেবের ধর্ম বিশ্বাস সর্ম্পকেও বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্তি প্রচার করা হতো। বিশেষভাবে এই আন্দোলনকে 'ওয়াহাবী আন্দোলন' বলে প্রচার চলতো। সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজরা সৈয়দ সাহেবকে সুন্নী বিরোধী একজন ওয়াহাবী বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছে।

তৃতীয়তঃ শিয়া মতবাদের মধ্যে বেশ কিছু বিদ'য়াতী আনুষ্ঠানিকতা থাকায় সৈয়দ সাহেব ও তাঁর সাথীরা বিভিন্নভাবে এর বিরোধিতা করতেন। ইংরেজগণ এটাকে সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে শিয়া মতবলম্বীদের মধ্যে সৈয়দ সাহেবের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতো। যেহেতু নবি পরিবার সমূহে শিয়া মতবাদ বিস্তার লাভ করছিল।

চতুর্থতঃ ইংরেজগণ বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে সৈয়দ সাহেবের কয়েকজন সহচরকে ক্রয় করতে চেয়েছিল, কিন্তু সফল হয়নি। পঞ্চমতঃ ইংরেজগণ নিরক্ষর, অশিক্ষিত, অজ্ঞ, ধর্মান্ধ বলেও সৈয়দ সাহেবের বিরুদ্ধে প্রচার করতো।

জিহাদের উদ্দেশ্যে হিজরত ঃ একাধারে দশ মাস সকল দিকের প্রচার, জনসংযোগ এবং প্রস্তুতি গ্রহণের পর ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী সোমবার সৈয়দ সাহেব হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। জীবনের চল্লিশটি বছর যে অঞ্চলে কাটিয়েছেন, সেখানকার প্রতিটি অলিগলির সাথে স্থাপিত ছিল অন্তরের সম্পর্ক, সকল আত্মীয় স্বজনের মায়া মমতা পরিত্যাগ করে ফরজ জিহাদ আদায়ের উদ্দেশ্যে সৈয়দ সাহেব পা বাড়ালেন। সীমান্ত অঞ্চল ছাড়া উপমহাদেশের আর কোন এলাকা সৈয়দ সাহেবের পছন্দ হলো না। কারণ সীমান্ত অঞ্চলের সম্পূর্ণ এলাকা মুসলিম অধ্যুষিত ছিল। এলাকার জনসাধারণ যুদ্ধ বিদ্যায় ছিল পারদর্শী। তাদের একাগ্র সহযোগিতার আশায় সেখানে কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। এ সময় সীমান্তবাসীরা শিখদের অত্যাচার নিপীড়নের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছিল। তাই অতি সহজে তাদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা যাবে বলে চিন্তা করা হয়েছে। সীমান্তের উত্তর-পশ্চিঞ্চলে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত মুসলমান অধিবাসী ছিল, প্রয়োজনে তাদের সাহায্য পাওয়ার আশা ছিল। সাহায্য না করলেও বিরোধিতার কোন আশঙ্কা ছিল না। এসব অনুকূল পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে সীমান্তকে আন্দোলন এবং জিহাদের কেন্দ্র হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল। কিন্তু সীমান্তবাসীদের শেষ পর্যায়ের মোনাফেকীর কারণে সমস্ত সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এরপরও সাধারণ জ্ঞানে সৈয়দ সাহেবের সিদ্ধান্ত সর্বোতভাবে যুক্তিসংগত, মজবুত এবং সঠিক ছিল। সৈয়দ সাহেব রায়বেরেলী থেকে জিহাদের জন্যে রওয়ানা হওয়ার দশমাসের মধ্যে প্রায় তিন হাজার মাইল পথ অতিক্রম করেন। রায়বেরেলী থেকে বুন্দেলখন্ড, গোয়ালিয়র, টোঙ্ক, রাজপুতনা, সিন্ধু, বেলুচিস্তানের মরুভূমি, বিপদ সঙ্কুল পাহাড়-পর্বত এবং পানাহারের ভীষণ কষ্ট অতিক্রম করে পেশওয়ার হয়ে চরসাদ্দায় পৌঁছান। উপমহাদেশের ইতিহাসে দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য এমন ত্যাগ আর কষ্ট স্বীকার করার দ্বিতীয় উদাহরণ বিরল। যেমন ছিলেন ধৈর্যশীল নেতা, তেমনি কর্মী বাহিনী। সৈয়দ সাহেব এমনি একটি বজ্রকঠিন, ঐক্যবদ্ধ, সুশৃংখল, স্বার্থত্যাগী দল তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সীমান্তে পৌঁছার পর শিখদের সাথে ছোট ছোট কয়েকটি যুদ্ধ সংগঠিত হয়। অতঃপর জিহাদের আমীর নির্বাচনের প্রশ্ন উঠলে হান্ডের পুকুর পাড়ে আন্দোলনের উচ্চপর্যায়ের দায়িত্বশীল এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দের এক যৌথ সভায় ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী সৈয়দ সাহেবকে আমীর নির্বাচিত করা হয়। পরদিন জুমার খোতবায় সৈয়দ সাহেবের নাম সংযোজন করা হয়।

শিখ নির্যাতনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম ঃ সীমান্ত মুসলিম জনবসতির উপর শিখদের অত্যাচার বৃদ্ধি পাওয়ায় সৈয়দ সাহেব সর্বপ্রথম ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে শিখদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেন। শিখদের জুলুমবাজী যখন সহ্যের সীমা

অতিক্রম করে, এমনকি তারা যখন মসজিদে আজান দেয়া বন্ধ করে দেয়, গরু জবাইকে করে বেআইনী। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ কয়েক হাজার ঈমানদার মুসলমান মুজাহিদ নিয়ে শিখদের আক্রমণ করেন। জালিম শিখ শক্তির বিরুদ্ধে এই জিহাদে মুজাহিদ বাহিনীর ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। এই জিহাদে কেবল বাংলাদেশ থেকেই ১২ হাজার মুজাহিদ অংশ গ্রহণ করে। মুসলমানদের শিবির ছিল পাহাড়ী এলাকায়। আর শিখরা ছিল সমতল অঞ্চলে। মাঝে মধ্যে আক্রমণ পরিচালনা করে মুজাহিদরা শিবিরে ফিরে আসতো নিরাপদে। উইলিয়াম হান্টারের বর্ণনা অনুযায়ী "শিখরা সমতল ভূমি ছেড়ে পাহাড়ী এলাকায় মুসলমানদের শিবির আক্রমণ করার সাহস পেতনা।" ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ এক প্রবল আক্রমণের মাধ্যমে শিখদের উপর বিজয় লাভ করেন। ১৮৩০ সালের জুন মাসে জেনারেল অলার্ড ও হরি সিং নালওয়ার শিখ বাহিনীর নিকট একবার পরাজিত হয়েও মুজাহিদ সৈন্যরা অকুতোভয়ে পূণরায় সমতল ভূমি দখল করে এবং সে বছরেই পেশওয়ার তাদের হস্তগত হয়।

সীমান্ত মুজাহিদ প্রেরণের ব্যবস্থাপনা ঃ- বৃটিশ, শিখ, হিন্দু, একই সাথে এ তিন শক্তির মোকাবেলায় জেহাদী বাহিনী সংগঠিত হতে লাগলো। অঞ্চলিক প্রতিনিধিরা উপমহাদেশের প্রতিটি শহরে আন্দোলনের সর্বশেষ খবরাখবর কর্মী, সমর্থক ও শুভাকাংখীদের ঘরে ঘরে পৌছে দিতেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন ঃ- পেশওয়ার থেকে পাঞ্জতার আসার পর স্থানীয় সর্দারগণ সৈয়দ সাহেবকে অভ্যর্থনা জানান এবং তাঁর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। পাঞ্জতার ও তার নিকট পার্শ্ববর্তী বিরাট এলাকায় মুসলিম জনবসতি ছিল। সৈয়দ সাহেব বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে সর্দারদেরকে সাধারণ বাইয়াত না করিয়ে শরীয়তের বাইয়াত করালেন এবং বললেন, এ এলাকার সব অধিবাসী মুসলমান। এখানে নির্বিঘ্নে শরীয়তের হুকুম চালু করা যায়। আপনারা যদি এ এলাকায় শরীয়তের আইন চালু করেন, তাহলে আমি এখানে থাকবো। আর না হয় অন্যত্র চলে যাবো। সৈয়দ সাহেবের এই শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে ১২৪৪ হিজরীর পহেলা শা'বান পাঞ্জতারে আলেম ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের এক সভা আহ্বান করা হয়। সভায় সীমান্ত খান ও আমীরগণ ছাড়াও প্রায় দু'হাজার আলেম উপস্থিত হন। যীদার আশরাফ খান এবং হান্ডের খাবে খাঁনও এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। অত্র এলাকায় শরীয়াতের আইন চালু করার ব্যাপারে এ সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জুমার নামাজের পর সকল খান, আমীর ও আলেমগণ সৈয়দ সাহেবের নিকট শরীয়তের বাইয়াত গ্রহণ করেন। বাইয়াত গ্রহণের সময় লিখিত শপথ নামা পাঠ করানো হয়।

শপথ নামায় ছিলঃ ১) শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে চলার প্রতিশ্রুতিতে স্বেচ্ছায় সৈয়দ সাহেবকে ইমাম মনোনিত করে তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলাম।

২) এ এলাকার শরীয়ত বিরোধী কাজ বন্ধ করে শরীয়তের হুকুম প্রতিষ্ঠা করবো।

৩) ইমাম মনোনিত করার পর তার বিরোধিতা করা সাংঘাতিক অপরাধ। বিরোধিতার সীমা অতিক্রম করলে তার মোকাবেলায় অস্ত্র ধারণ সকল মুসলমানের উপর ফরজ।

৪) ইতোপূর্বেও আমরা বাইয়াত গ্রহণ করেছি। আজ আলেমদের সম্মুখে নতুন করে বাইয়াত গ্রহণ করলাম। সৈয়দ সাহেব আমাদের জন্য দোয়া করবেন, যেন আমাদের মরা-বাঁচা শুধুমাত্র ইসলামের জন্য হয়।

এই ঐতিহাসিক বাইয়াতের পর সীমান্তের বিরাট এলাকায় ইসলামী শরীয়াত চালু হয়। ক্ষুদ্র একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যার নেতৃত্বে ছিলেন সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রহঃ)। শরীয়াতের বিধান চালু হবার পর পুরো এলাকায় শান্তি স্থাপিত হলো। একের উপর অপরের জুলুম বন্ধ হলো। জুলুম করে পলায়নের পথ বন্ধ হলো। কাজী নিযুক্ত করে বিচার ফায়সালা শুরু হলো। উৎপাদিত ফসলের একদশমাংশ (ওশর) আদায়ের ব্যবস্থা করা হলো। খারায ও যাকাত আদায় এবং বন্টনের জন্য ব্যবস্থা গৃহীত হলো। এই ভাবে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হলেও এই উপমহাদেশের এক কোনে একটি ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আন্দোলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ঃ এবার একটা বিরাট বাহিনী গঠন করে প্রথমে শিখদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ এবং সশস্ত্র জিহাদ ঘোষণার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে স্থানীয় সর্দার-মোল্লাদের সন্দেহ প্রবনতা, স্বার্থপরতা এবং অন্যায় পক্ষপাতিত্বের ফলে এই আশার আলো দেখতে দেখতেই নিভে গেল। তিন চার বছরের কঠোর পরিশ্রমের পর যে ইঙ্গিত চরম লক্ষ্যে পৌঁছার পথ উন্মুক্ত হয়ে এসেছিল, তা বরবাদ হয়ে গেল। অত্র এলাকায় সৈয়দ সাহেবের আগমনের পূর্বে স্থানীয় মোল্লাগণ জনসাধারনের নিকট থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে সেটাকেই নিজেদের আয়ের উৎস হিসাবে ব্যবহার করতো। সৈয়দ সাহেবের আগমনের পর 'ওশর' ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে মোল্লাদেরকে চাঁদা দেয়ার নিয়ম বাতিল হয়ে গেল। এ কারণে তারা ভিতরে ভিতরে নিজেদের স্বার্থে সৈয়দ সাহেবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠিত হবার পর স্থানীয় সরদারদেরও বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। পাঠানদের শ্রেষ্ঠ অধিপতি মুজাহিদ বাহিনী বিরোধী চক্রান্তের প্রধান হোতা ইয়ার মোহাম্মদ খাঁন ১২৪৫ হিজরীর ১৫ই রবিউল আউয়াল ১৮২৯ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর জায়েদার যুদ্ধে নিহত হয়। সৈয়দ আহমদ শহীদ (রঃ) কে বিষ প্রয়োগকারী এ দূররানী নেতা বারো হাজার সম্মিলিত

বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়ে শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন। হাজার খানেক ঘোড়া ও কিছু গণীমতের মাল ফেলে যায়। গণীমতের মালের মধ্যে কিছু কাগজ পাওয়া যায় যা পাঠে শিখ রাজা রণজিৎ সিং ও ফরাসী জেনারেল ওয়ানতুরা কর্তৃক সৈয়দ সাহেব (রঃ) এর পক্ষ থেকে পেশওয়ার ছিনিয়ে নেয়ার গভীর ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে পড়ে। এখানে উল্লেখ্য যে, এ জেনারেল ওয়াতুনরা বা ভেন্তরা ছিলেন তৎকালীন ক্ষমতাসীন ইংরেজ সরকারের একজন সামরিক কর্মকর্তা। মোল্লা এবং সর্দারদের ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত একই সূত্রে মিলিত হয়ে সম্মিলিতভাবে যোগাযোগ করে এবং চিঠিপত্র দিয়ে ক্রমে ক্রমে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা হলো। বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্নভাবে অবস্থানরত গাজীদেরকে একই সাথে হত্যা করার চক্রান্ত হলো। ইংরেজ ও শিখদের সাথে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করা হলো। সৈয়দ সাহেবকে ইংরেজদের 'চর' হিসাবে কাজ কারার জন্য সীমান্ত এলাকায় পাঠানো হয়েছে বলে প্রচার করা হলো। প্রমাণ স্বরূপ ইংরেজদরে পক্ষ থেকে একটি ভুয়া চিঠি সীমান্তের সর্দারদের হাতে পৌঁছানো হলো। এই চিঠির ভিত্তিতে মোল্লারা জনসাধারনের নিকট প্রচার করলো যে, সৈয়দ সাহেবের সমর্থন করাতো দূরের কথা, তাঁর বিরোধিতা করাই হচ্ছে ইসলামের বড় খেদমত। এরকম একটি চিঠি সৈয়দ সাহেব (রাঃ) এর হস্তগত হলে তিনি অন্যতম পাঠান সর্দার সুলতান মোহাম্মদ খাঁনের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সুলতান মোহাম্মদ খাঁন এই চিঠির প্রেক্ষিতে নিজের দোষ স্বীকার করেন ও ক্ষমা প্রার্থনা চান। এ সময়ে সৈয়দ সাহেব (রাঃ) সুলতান মোহাম্মদ খাঁনকে ক্ষমা করে পেশওয়ারের কর্তৃত্ব অর্পণ করেন। যদিওবা বিশ্বাসঘাতক এই দুররানী নেতাকে পেশওয়ারের শাসনভার প্রদান অনেক পাঠান সরদার এবং সৈয়দ সাহেব (রাঃ)'র ভক্তদের অনেকে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু সুলতান মোহাম্মদ খাঁনের ক্ষমা প্রার্থনা যে শুধু প্রহসন মূলক ছিল তা পরের ঘটনাপঞ্জিতে সহজে ভেসে উঠে। সৈয়দ সাহেব পাঠান সর্দার ও কায়েমী স্বার্থবাদী মোল্লাদের বিভৎস বেঈমানীর ও নিষ্ঠুর কান্ডে বিশেষভাবে মর্মাহত হন। শিখ ও ইংরেজগণ এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে ইসলামী আন্দোলনের পৃষ্টে কুঠারাঘাত করার সিদ্ধান্ত নিল। সৈয়দ সাহেব ও তাঁর সাথীগণ এ ব্যাপারে পূর্বাভাষ পেয়েও পরিস্থিতির বাস্তবতার আঁচ করতে পারেননি। ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থানরত গাজীদেরকে এই বিশ্বাসঘাতকের দল নির্মমভাবে হত্যা করে। কাউকে ঘুমের মধ্যে, কাউকে নামায পড়া অবস্থায়, কাউকে পথ চলতে, কাউকে গল্পের আসরে হত্যা করা হয়। লুট করা হয় বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত ইসলামী রাষ্ট্রের খাদ্য গুদাম সমূহ। তিনি পেশওয়ারের সমস্ত খাঁন, সরদার, ওলামাদের ডেকে মহাষড়যন্ত্রমূলক ভাবে এসব গাজী- মোজাহিদদের শহীদ করার ব্যাখ্যা চান। তখন এসব বিদ্রোহী ও বেঈমানদের পক্ষ থেকে উত্তর আসে যে, সুলতান মোহাম্মদ খাঁন কর্তৃক প্রদর্শিত ভারত থেকে প্রেরিত উস্কানীমূলক চিঠির

হুবহু নকলই এ হত্যা কান্ডের জন্য দায়ী। তখন সৈয়দ সাহেব (রহঃ) অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে শুক্রবার বাদে জুমা ওয়াজের মাধ্যমে উনার সংস্কারমূলক ত্বরীকায়ে মোহাম্মদীয়া ও মোহাম্মদী আন্দোলনের ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং চিরতরে পেশওয়ারের ত্যাগের সংকল্প ব্যক্ত করেন। তখন বিশ্বাসী আলেম ওলামা ও খাঁনদের চোখ অশ্রুসজল ছিল। উনি অবশিষ্ট গাজী ও মোজাহীদ নিয়ে আল্লাহর রাহে বের হয়ে পড়েন। রেখে আসেন চার বছরের জেহাদী স্মৃতি ও প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের অবশিষ্ট রেশ, তাঁর সংস্কার ও সিলসিলার প্রবাহমান আবহ। এই করুণ পরিস্থিতির জিহাদের কেন্দ্র স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত হলো এবং সৈয়দ সাহেব ঘোষণা করলেন, 'যারা নিহত হয়েছেন তাঁরা সবাই শহীদ। আমি আমার জীবন আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে রেখেছি। সামনে আরো অধিক বিপদ মুসিবত আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমি সেদিকেই অগ্রসর হতে যাচ্ছি। যাঁরা এই অনাগত বিপদ মুসিবতকে ভয় পান, তারা যেন নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে যান' গাজীগণ একথা শুনে সকলেই কাঁদতে লাগলেন। প্রিয় ইমামকে জিহাদের ময়দানে একা ছেড়ে যেতে কেউ রাজী হলেন না। এরপর সৈয়দ সাহেব নিজের স্ত্রীদ্বয়কে অছিয়ত করেন, 'আমার জীবন যদি এই এবাদতেই শেষ হয়ে যায়, তবে তোমরা অন্য কোথাও বসতি স্থাপন না করে মক্কা অথবা মদীনা শরীফে চলে যাবে। কেননা এই ফেতনা-ফাসাদের যুগে এ ছাড়া অন্য কোথাও ঈমান বাঁচিয়ে রাখা দায়। কষ্ট হলেও সেখানে বসত করা শ্রেয়। ' দ্বিতীয় হিজরতের পূর্বে শেষবারের মত সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী (রহঃ) পাঞ্জতারের লোকদের ডেকে কয়েকটি উপদেশ দিলেন। 'ফতেহ খান তোমাদের নেতা, তাঁকে ওশর দিবে। শরীয়তের নির্দেশ মেনে চলবে। ভারত থেকে আগত মুজাহিদদেরকে যত্ন করবে এবং নিরাপদে আমার নিকট পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবে'। এরপর সৈয়দ আহমদ জিহাদের নতুন কেন্দ্রের সন্ধানে চার বছরের ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্র পরিত্যাগ করে হিজরত পর কাফেলা নদী অতিক্রম করে। রাউজদেউরী পৌঁছলে চারিদিকে প্রচার হয়ে যায় যে, সৈয়দ সাহেব কাশ্মীর আক্রমণ করার জন্য আগ্রসর হচ্ছেন। অবশ্য এর পিছনে কারণও ছিল। সৈয়দ সাহেব রাজদেউরী পৌঁছতে পৌঁছতে মুজহিদদের আগ্রগামী দল ভোগরমঙ্গল এবং বালাকোট ছাড়া কাশ্মীরের নিকটবর্তী শহর মুযাফফরাবাদে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। পরিস্কার মনে হচ্ছে যে, তারা কাশ্মীরে প্রবেশ করেবেন। এই সংবাদ পেয়ে রনজিৎ সিংহ তার পুত্র হরি সিংহকে সেনাপতি করে বিরাট বাহিনী সাথে নিয়ে হাযারা প্রেরণ করে। শ্যামা সিংহ এবং জাওয়াল সিংহকেও সাথে পাঠানো হলো। এরা সকলেই ছিল শিখ দরবারের অন্যতম সদস্য। যে কোনভাবেই হোক, সৈয়দ সাহেবকে কাশ্মীর প্রবেশে বাধা দেয়াই ছিল এদের প্রধান দায়িত্ব। শের সিংহ তার বাহিনী নিয়ে শানাকিয়ারী পৌঁছালো। মুজাহিদ বাহিনীর সুদৃঢ় অবস্থানের কারণে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী শানাকিয়ার দূর্গ থেকে শিখ সৈন্যরা বের হবার সাহস পায়নি।

বালাকোট যুদ্ধ ও ইমাম সাহেবের শাহাদাত ঃ ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে কাগান ও কাশ্মীরের কয়েকজন মুসলমান সর্দার শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রাথমিক ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরে এ ব্যাপারে সাহায্যের জন্য তাঁরা সৈয়দ আহমদ বেরলভীর নিকট আবেদন জানান। মুসলমান ভাইদের সাহায্যের ডাকে সাড়া দিয়ে সৈয়দ সাহেব মুজাহিদ বাহিনীকে তৈরী হবার নির্দেশ দেন। সোজা পথে প্রতিবন্ধকতা থাকায় সৈয়দ সাহেব তাঁর বাহিনী নিয়ে এক দুর্গম পথে কাশ্মীর রওনা হন। এদিকে মুজাহিদ বাহিনীর অগ্রসর হবার সংবাদ পূর্বেই শিখ ছাউনীতে পৌঁছে গিয়েছিল। এতদঞ্চলের শিখ বাহিনীর সেনাপতি ছিল শের সিংহ। শিখ শিবিরে শিখ সৈন্যদের সংখ্যা মুজাহিদ বাহিনীর চেয়ে বহুগুণে বেশী ছিল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসের ৬ তারিখে সূর্যোদয় হলো। মাটিকোটের উত্তর দিকে শিখ সৈন্যদের অগ্রযাত্রা দেখা দিল। তাদের গতি বালাকোটের দিকে। ক্রমেই শিখদের সংখ্যা বৃদ্ধিপেতে থাকে। লক্ষাধিক মুজাহিদ বাহিনী থেকে খসে যেতে যেতে এ ক্ষুদ্র আল্লাহর পথে প্রাণদানকারী গাজী ও মুজাহিদ বাহিনীকে ঠেলে দিল ইংরেজ বেনিয়া শক্তি ও বিশ্বাসঘাতক পাঠান সরদার, খাঁন, অর্থলোভী স্থানীয় মোল্লারা ভারতের সবচেয়ে মুসলিম বিদ্বেষী শিখ জাতির এক বিরাট বাহিনীর মুখে। বালাকোট থেকে শহীদ হওয়ার মাত্র এগারদিন পূর্বে প্রেরিত একটি চিঠিতে নওয়াব ওয়াজিরুদ্দৌল্লাকে লিখিত তথ্যে এসব চক্রান্তের কথা ফাঁস হয়ে যায়। অথচ পেশওয়ার গমনের সময়ে উক্ত আদি জাতির শ্রদ্ধা এতই নিরঙ্কুশ ছিল যে, তারা তাঁর ঘোড়ার পায়ে চুমু খায়। মুজাহিদ শিবিরে এবং পার্শ্ববর্তী মুসলিম জনবসতিতে শিখদের বন্দুকের গুলি এসে পৌঁছাতে লাগলো। এ পরিস্থিতিতে খুব ভোরে ভোরে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবার নির্দেশ এলো। তাছাড়া শত্রুর ভয়ে সরে যাওয়া ইসলাম কখনো অনুমোদন করে না। আল্লাহর ইচ্ছা এই বালাকোটেই বাস্তবে পরিনত হবে। সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী নিজেই আজকের যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। ছোট ছোট গ্রুপ কমান্ডারদের প্রতিও নির্দেশ এলো- সমবেত আক্রমন করা হবে। সকলেই নিজ নিজ ব্যূহের মধ্যে থেকেই গুলি চালাবে। যেহেতু শত্রু সংখ্যা বেশী। সেহেতু বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে নয়, সম্মিলিত ভাবেই আক্রমণ করলেই সুবিধা হবে। শিখ সৈন্যরা ক্রমে ক্রমে মুজাহিদ বাহিনীর দিকে স্রোতধারার মত অগ্রসর হতে থাকে। শিখ সৈন্যরা খুব কাছাকাছি পৌঁছালে ইমাম সাহেব তকবীর ধ্বনি করে আক্রমণ করলেন এবং সকলকে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। মুজাহিদ বাহিনীর প্রথম আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে শিখ বাহিনী পশ্চাদপসরণ করতঃ পাহাড়ের উপর আরোহন করতে থাকে। মুজাহিদ বাহিনীর তাদের পিছু ধাওয়া করতে করতে পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে উপস্থিত হয়। শিখ সেনাপতির উৎসাহে শিখ বাহিনী আবার সামনে অগ্রসর হতে শুরু করে। ইমাম সাহেব পুনরায় বিদ্যুতবেগে শত্রু'র উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।

শত্রুদের কেউ অস্ত্র ধারণ করলো, কেউ পলায়ন করলো। কিন্তু কোথায় পালাবে? তারা পাহাড় থেকে স্রোতের বেগে নামছিল, অথচ দৌঁড়ে পাহাড়ে উঠতে পারছিল না। যারা নিচে নেমে গিয়েছিল, তাদের প্রায় সকলেই নিহত হল। উপর থেকে শিখ সৈন্যরা গুলি করছিল, বৃষ্টির মত গুলি। উভয় পক্ষে পাথর বিনিময়ও চলছে। অবশেষে অসংখ্য শিখ সৈন্য স্রোতের মত মুজাহিদ বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে প্রচন্ড যুদ্ধ, হাতাহাতি এবং মল যুদ্ধ শুরু হয়। এক একজন মুজাহিদ কোন কোন বর্ণনা মতে ১০০ জন শিখ সৈন্যের সাথে মোকাবেলা করতে করতে শাহাদত বরণ করেন। এক পর্যায়ে দুপুর ১১টা কি ১২টা দিকে গুলির আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মটিকোটের খালের তীরে সৈয়দ সাহেব মানে সকলের ইমাম শাহাদাত বরণ করেন। দিনটি ছিল ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে, রোজ জুমাবার, ১২৪৬ হিজরীর ২০শে জিলকদ। এই যুদ্ধের পরও প্রায় তিনশত মুজাহিদ জীবিত ছিলেন। শিখ সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করলে মুসলিম অধিবাসীগণ মুজাহিদদের লাশ দাফন করেন। বালাকোটে দুনিয়া কাঁপানো এ সংস্কারক তথা মোজাদ্দেদ একশ ছত্রিশ থেকে একশ চুয়াল্লিশ জন মোজাহিদ নিয়ে শাহাদত বরণ করেন। তিনি বালাকোটে'র পরে রেখে গেলেন উনার প্রচারিত মোহাম্মদীয়া আন্দোলনের কিছু গাজীকে ও উনার সংস্কারের সংবিধানকে। তাঁর হাতে গড়া চল্লিশ লাখের অধিক বিধর্মী মুসলমান ও ত্রিশ লাখের অধিক সিলসিলাপন্থী মুসলমানকে। বলা প্রয়োজন যে, এ বালাকোটের ময়দানেই বাংলার বীর গাজী সূফী নুর মোহাম্মদ নেজামপুরীকে খেলাফত প্রদান করেন। এতদ সত্ত্বেও এক শ্রেণীর আলেম নামধারী হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহঃ) এবং তাঁর মোহম্মদী আন্দোলন সম্পর্কে এমন সব কথা বলে বেড়ান যা ইংরেজদের তল্পিবাহক লেখকদেরও হার মানায়।

এ প্রসঙ্গে প্রথমে হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহঃ) ও তাঁর আন্দোলন সম্পর্কে উইলিয়াম হান্টারের অভিমত সমূহ সুপ্রিয় পাঠকদের সামনে পেশ করতে চাই, যাতে করে সচেতন পাঠকমহল উইলিয়াম হান্টারের সাথে তথাকথিত ফতোয়াবাজ ও আত্মভোলা মোল্লাদের সাযুজ্যতা সহজে খোঁজে নিতে পারেন। এক সময়ের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ইংরেজ সিভিলিয়ান উইলিয়াম উইলসন হান্টার তাঁর রচিত 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান' গ্রন্থে তৎকালীন সর্বভারতীয় মুসলমানদের জেহাদ, চেতনাকে নানাভাবে চিত্রিত করে থাকলেও হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদের (রঃ) ও তাঁর অনুসারীদের কর্মকান্ডকেই বেশ কটাক্ষ ও বক্র দৃষ্টিতে নীচু স্থানে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। উচ্চ শিক্ষিত এই আমলা নিতান্ত মুন্সিয়ানা ভাষায় তার ভাব ও প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপস্থাপনা করেন। ফাঁকে ফাঁকে তৎকালীন মুসলমানদের অধিকার ও দাবী বৃটিশ রাজের কাছে উপস্থাপনার ভঙ্গিতে সাফাই গাওয়ার মাধ্যমে তার দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছেন, যা সহজে প্রণিধানযোগ্য। এসব বর্ণনার মধ্যে তার অজান্তেই তৎকালীন বৃটিশরাজের প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের

মানসিকতা, ধর্মভীরুতা, হযরত সৈয়দ সাহেব (রঃ) ত্বরীকত, জেহাদ ইত্যাদির আসলত্ব ফুটে উঠেছে। এই গ্রন্থের প্রথম দিকে এক স্থানে হযরত সৈয়দ সাহেব (রঃ) ও শিখদের সাথে বালাকোটে জিহাদ ছিল তৎকালীন ভারতীয় উলামাদের ফতোয়ারার মাধ্যমে বৈধ জিহাদ তা বর্ণনা করেছেন এবং ঐ জিহাদের জন্য তদানীন্তন ভারতীয় একজন আলেম কর্তৃক প্রচারিত জিহাদের ফতোয়ামূলক প্রচার পুস্তিকাকে কটাক্ষ করে যে বর্ণনা করেছেন তাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি ঐ প্রচার পুস্তিকাকে তার বইতে ফতোয়া বলে উপস্থাপন করেছেন।

এই ফতোয়ার সারমর্ম ছিল নিম্নরূপ ঃ শিখেরা লাহোরে ও অন্যান্য স্থানে বহুদিন ধরে হুকুমত চালাচ্ছে। তাদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। হাজার হাজার মুসলমানদের ললাটে লাঞ্চনা পুঞ্জিভূত হয়েছে। তাঁদের মসজিদে আযান দিতে দেয়া হচ্ছে না, গো- জবেহ একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে যখন তাদের অত্যাচার ও অপমান সহ্যের সীমা অতিক্রম করলো তখন সৈয়দ আহমদ (তাঁর সৌভাগ্য ও প্রশংসা অক্ষয় হোক) একমাত্র দ্বীনের হেফাজত করতে কয়েকজন মাত্র সঙ্গী নিয়ে কাবুল ও পেশয়ারের দিকে রওয়ানা হলেন, মুসলমানদেরকে গোমরাহীর নিদ্রা থেকে জাগাতে সমর্থ হলেন। তিনি তাঁদেরকে তাদের কর্মক্ষেত্রে বীরের মত অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করলেন কয়েক হাজার ঈমানদার মুসলমান তাঁর আহ্বানে আল্লাহর রাহে জান দিতে প্রস্তুত হলেন সবই আল্লাহর মহিমা ইত্যাদি। এ বর্ণনার দ্বারা যে হান্টার নিতান্ত ফাঁক ফোকের কটাক্ষের মাধ্যমে তার বইয়ের আলোচনার মধ্যপথে বিরতী দিয়ে ঐ ফতোয়ার উপস্থাপন করলেও হযরত সৈয়দ সাহেব (রঃ) এর বালাকোটের জেহাদ যে, তৎকালীন আলেমগণ কর্তৃক ফতোয়ার মাধ্যমে বৈধ জেহাদ ছিল তা সহজেই ভেসে উঠে।

ঐ গ্রন্থের প্রথমার্ধে তিনি হযরত সৈয়দ সাহেব (রঃ) কে দস্যু ইত্যাদি বলে কঠোরভাবে আক্রমন করেছেন। কিন্তু হযরত সৈয়দ সাহেব (রঃ) এর চরিত্র বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, তিনি বেশীরভাগ সময়ে মৌনতা অবলম্বন করতেন ও ধ্যানমগ্ন থাকতেন। ধ্যানে তিনি এতই মগ্ন হয়ে যেতেন যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় থাকে মৃগীরোগী বলে অভিহিত করা হয়। যদিও ইসলাম বিদ্বেষী, অবিশ্বাসী ও ধর্মের হাকিকত সম্পর্কে অনবহিত এই হান্টারের ভাষায় ধ্যানের এই উচ্চপর্যায়ের এই অবস্থাকে মৃগীরোগী হিসাবে অবহিত করা হয় কিন্তু ইসলামী তাছাউফ তথা হযরত সৈয়দ সাহেব (রঃ) এর ত্বরীকতের পরিভাষায় এই ধ্যানকে মোরাকাবা ও এই মৃগীরোগ যে, তাছাউফের ভাষায় 'অজদ' বা নুর ও তাজাল্লীর বেঁহুশী তথা জিকিরে জলি তা দিবালোকের মত সহজে পরিস্কার হয়ে যায়।

এ ছাড়া হান্টার তার গ্রন্থে পূর্বাপর বোঝাতে চেয়েছেন যে, হযরত সৈয়দ সাহেব (রঃ) ও তাঁর অনুসারীদের এই জিহাদ নিতান্ত ভাবে তাদের বিরুদ্ধে তথা

ইংরেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। তার লেখার ছত্রে ছত্রে তা এমনিতেই ফুটে উঠেছে। যেমন এক জায়গায় তিনি লিখেছেন ভারতীয় এই মুসলিম জাতি তাদের একটি অংশকে সর্বদা তাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত রেখেছে যারা প্রথমে লাহোরে রনজিৎ সিংয়ের বিরুদ্ধে ও পরে তাদের পিছনে লেগে থাকে। যার জন্য তাদের চরম মূল্য দিতে হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি ব্যয়বহুল যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছে।

এখানে প্রসঙ্গত বলতে হয় যে, ১৮৫৭ সালের পূর্বে মোহাম্মদী মোজাহিদগণ ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যে সব ইশতেহার প্রচার করে তার মধ্যে দু'টি বিষয় ছিল বেশী উল্লেখযোগ্য। একটি ছিল ধর্মীয় হস্তক্ষেপ ও দ্বিতীয় ছিল লাখেরাজের বাজেয়াপ্তি। এই ধর্মীয় হস্তক্ষেপ কয়েক প্রকারের ছিল। তাই এত কিছুর পরও এই ইংরেজ জাতির দৃষ্টি ছিল এখানে নয় অন্য জায়গায় অন্যখানে। এখানে একটি ব্যাপার এসে যায় যে, আমাদের বর্ণনায় প্রথমদিকে হযরত সৈয়দ সাহেব (রঃ) এর পবিত্র হজ্ব পালন বর্ণনা প্রসঙ্গে হান্টার প্রমুখের তথ্যে উনি যে পবিত্র হজ্ব পালন কালে আব্দুল ওহাব নজদীর অনুসারীদের সংস্পর্শে আসেন এবং ভারতে এসে ওহাবী মতবাদ প্রচার করেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এর প্রেক্ষিতে হান্টার প্রমুখের অনুসরণে অনেক মুসলিম ঐতিহাসিক ও লেখক উর্দু-ফার্সী কিছু পুস্তক-পুস্তিকায় ও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু পাঠ্য পুস্তকে যে সব উক্তি পাওয়া যায় তার আলোচনার আগে আমাদেরকে তৎকালীন হেজাজ নজদ প্রবেশ সন্নিবেশিত আরব দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ও আব্দুল ওহাব নজদী এবং তার কর্মকান্ডের রাজনৈতিক পরিধি সন্ধানে যেতে হবে। যেমন তথাকথিত ওহাবী আন্দোলনের নেতা মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদী জন্ম গ্রহণ করেন ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে। নজদের উয়াইনা এলাকার তামিম গোত্রে। ১৭২০ খৃঃ হজ্ব পালন করতে গিয়ে তুর্কী সুলতান কর্তৃক হজ্ব কার্যের কিছু অংশে তার দৃষ্টিতে অনৈসলামিক প্রতিপাদ্য হওয়ায় সুলতানের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ফলে তিনি তুর্কী সুলতান কর্তৃক বিতাড়িত হন। আদ্দরিয়ার শাসক মোহাম্মদ ইবনে সউদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মোহাম্মদ ইবনে সাউদের কন্যাকে বিবাহ করেন। তারা উভয়ে তুর্কী সালতানাতের কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ১৭৪৭ সালে রিয়াদের শেখের সাথে তাদের সংঘর্ষ বাধে। ১৭৮৭ সালে আবদুল ওহাব নজদীর মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর তার ও মোহাম্মদ ইবনে সউদের সংগঠিত বাহিনী ১৭৯১ সালের মধ্যে পূর্বে ভারত মহাসাগর পারস্য মহাসাগর ও উত্তরে লোহিত সাগর পর্যন্ত তাদের ক্ষমতার পরিধিকে বিস্তার করে। এই সময়ে ১৮১১ সালে মিশরের সর্বশেষ তুর্কী সুলতান মোহাম্মদ আলী পাশা তাদের এই শক্তিকে ধ্বংস করেন। ১৮১১ সালে মদীনাও ১৮১২ সালে মক্কা পুনরায় দখল করে নেন। এর মধ্যে সময়ে ১৮১৮ সালে মোহাম্মদ ইবনে সউদের মৃত্যু হয়। এই শক্তি ও মতবাদ আবার অনেক দিন পরে ১৯০৪ সালে প্রথমে নজদে ক্ষমতাকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করে। ১৯২৪ ও ২৫ খৃঃ

মক্কা ও মদীনা দখল করে। ১৮১২ থেকে ১৯২৪-২৫খৃঃ পর্যন্ত এই প্রায় এক শতাব্দী আরবে তথা মক্কা মদীনাতে আবদুল ওহাব নজদীর মতবাদের অনুসারীগণ ছিল একটি পরাজিত, বিধ্বস্ত ও পলাতক সম্প্রদায়। তাদের এসময়ে মক্কা মদীনা তথা আরবের কোন অঞ্চলে প্রকাশ্যে মতবাদ প্রচার করার কোন সুযোগ ছিল না।

হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রঃ) এই সময়ে ১৮২২ সালে পবিত্র মক্কা ও মদীনা হজ্ব পালন করতে গমন করেছিলেন। কমবেশী দেড়বছর অবস্থান করেছিলেন। উপমহাদেশের হযরত সৈয়দ সাহেব (রাঃ) এর নির্ভরযোগ্য ও প্রামান্য জীবনী গ্রন্থের মধ্যে "ওয়াকেয়ায়ে আহমদী" "মাখজানে আহমদী" "সীরাতে সৈয়দ আহমদ শহীদ" "মুনজুরাতুস সয়াদ" "ওয়াসায়া" ইত্যাদি গ্রন্থ সমূহে সৈয়দ সাহেব (রাঃ) পবিত্র হজ্ব পালন ও মক্কা মদীনায় অবস্থান সম্পর্কিত যে সব বর্ণনা পাওয়া তা এ ব্যাপারে প্রনিধানযোগ্য। এ সম্পর্কে বর্ণনা যে, হযরত সৈয়দ সাহেব (রাঃ) হজ্ব পালনকালে প্রথমে মক্কার বিখ্যাত হানাফী মোহাদ্দেছ বুজুর্গ আলেম শেখ ওমর বিন আবদেরাসুল (রঃ)'র সাথে মোলাকাত করেন। এই শেখ ওমর (রঃ) এতই উচ্চ মর্যাদার আলী ও জাহেদ ছিলেন যে, তিনি তৎকালীন তুর্কী সুলতান প্রদত্ত হাদিয়াও কোনদিন গ্রহণ করেননি। কিন্তু সে সময়ে তিন হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রঃ) এর দেয়া পাঁচ রিয়াল হাদিয়া গ্রহণ করেছিলেন। এই ঘটনা দেখে উপস্থিত মক্কাবাসী হাজীরাও আশ্চর্য হয়ে যায়। এ সময় সেখানে তিনি তার ত্বরীকতের প্রচারে ব্যস্ত থাকেন বিভিন্ন হাজীদের কাছ থেকে বায়াত গ্রহণ করেন। এছাড়া উনার হাতে তৎকালীন খানায়ে কাবার হানাফী মুছাল্লার ইমাম শেখ মোস্তফা, খাজা আগা আলমাছ হিন্দী, খাজা ছেরা সামগুদ্দিন আতাও সে সময়ের ক্ষমতাসীন মিশরীয় ছুন্নী তুর্কী সুলতানের প্রতিনিধি (নায়েব) শেখ হাসান আপেন্ধী প্রমুখ মজহাবের বড় বড় ইমাম ওলামা, বুজুর্গ ও সুধীবৃন্দ বায়াত হন। এই সময়টুকুতে যে সব মজহাবের ইমাম, মোহাদ্দেছ, মুফতি, বুজুর্গ ও ওলামাদের কাছ থেকে বায়াত গ্রহণ করেন ও মোলাকাত করেছিলেন তারা সকলে ছিল নিঃসন্দেহে হানাফী ছুন্নী আক্বিদার অনুসারী।

এছাড়া সে সময়ে ক্ষমতাসীন সরকার ছিল তুর্কীর ছুন্নী মুসলমান ও আবদুল ওহাব নজদী তার অনুসারীদের মক্কা ও মদীনা শরীফ থেকে উৎখাতকারী। যেখানে সে সময়ে প্রতিষ্ঠিত সরকার ছিল তুর্কী-ছুন্নী ও নজদী মতবাদের ঘোর বিরোধী ও নিপাতকারী, সুতরাং সে সময়ে কোন নজদী মতবাদের অনুসারীদের জনসমক্ষে তাদের মতবাদ প্রচার করা ও অপরজনকে দীক্ষিত করার কোন অবকাশ ছিল না, পক্ষান্তরে হযরত সৈয়দ সাহেব (রাঃ) তখন নজদী বিরোধী তুর্কী সরকারের সহযোগিতা লাভ করেন।

হান্টারের তথ্যে উনাকে তৎকালীন সরকার কর্তৃক মক্কা শরীফ থেকে বহিস্কার করা ইত্যাদি এসব কথার কোন ভিত্তি নেই। এখানে বুঝা যায় যে, হান্টার প্রমুখের

অনুসরণে কিছু মুসলমান ঐতিহাসিকের প্রচলিত পাঠ্য পুস্তক ভিত্তিক তথ্যে হযরত সৈয়দ সাহেব (রঃ) এর হজ্বে থাকাকালে ওহাবী মতবাদের সংস্পর্শে আসা ও ভারতে ফিরে এসে ঐ মতবাদ প্রচার করা সম্পর্কিত লেখাগুলো বাস্তবতা বিরোধী, ভিত্তিহীন ও মিথ্যা।

ত্বরীকায়ে মোহাম্মদীয়া ও মোহাম্মদী আন্দোলনকে ওহাবী ইজম তথা ওহাবী মতবাদ, ওহাবী আন্দোলন বলে প্রচার এবং এসব বর্ণনা বা তথ্যে "ওহাবী" শব্দ প্রয়োগ ছিল সে সময়ে ভারতীয় বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ও তার দোসর হিন্দু, শিয়া ও শিখ শক্তির দ্বারা নিছক বিবাদের উদ্দেশ্যে, ঈর্ষাকৃতভাবে ও স্বেচ্ছাচারী হিসেবে। সে সময়ে এ দেশের সাধারণ সুন্নী আক্বিদায় বিশ্বাসী ও ত্বরীকত পন্থী মুসলমানগণ কথিত আবদুল ওহাব নজদী ও তার মতবাদ আক্বিদাকে সহজে গ্রহণ করত না ও নিতান্ত হেয় চোখে দেখত। এ সুযোগে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের বুদ্ধিজীবী ও আমলারা হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রঃ) এর পরিচালিত মোহাম্মদী আন্দোলনকে ওহাবী আন্দোলন বলে প্রচার ও এদেশের সাধারণ মুসলমানদের কাছে অপ্রিয় করা ও ক্ষেপিয়ে তোলা এবং সে সুযোগে তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য "ওহাবী" শব্দকে উপযুক্ত অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে।

হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রঃ) এর জিহাদ ইত্যাদি ছিল নিতান্তভাবে ইংরেজ ও শিখ শক্তির বিরুদ্ধে। এর আড়ালে ত্বরীকতের প্রচার ও শরীয়তের সংস্কার ও একান্তভাবে জিহাদ ফি ছাবিলিল্লাহর মাধ্যমে ভারতীয় জনজীবনে খাঁটি দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা। উনার সে জিহাদ নিছক ক্ষমতার মোহে কোন মুসলমানের রক্তে তলোয়ার রঞ্জিত করার জন্য ছিলনা। যেমন হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রঃ) জেহাদের জন্য দিল্লী থেকে বের হয়ে বালাকোটে শহীদ হওয়া পর্যন্ত মধ্য পথে কতগুলি মুসলিম পাঠান উপশক্তি যেমনঃ ইয়াব মোহাম্মদ খান, খাদী খান ইত্যাদির সাথে যুদ্ধ ও রক্ত পাত করাতে প্রশ্ন জাগতে পারে তারা তো ছিল মুসলমান? উত্তর অতি সহজ। এরা মুসলিম হলেও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বৈধ ও অপরিহার্য ছিল, কারণ ওরা ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ও বৈধ ইমামের সাথে বিদ্রোহকারী মোরতাদ ও মুসলিম বিরোধী শিখ শক্তির ও ইংরেজ শক্তির সাথে আঁতাতকারী মোনাফেক।

পরিশেষে আমি আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান বেরলভী (রহঃ) এর নগণ্য অনুসারী হওয়ার সুবাদে সুন্নি ভাইদের উদ্দেশ্যে একটি মাসআলার ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। ইমাম আহমদ রেজা খানের সংকলন 'মালফুজাত' এর প্রথম খন্ডের একশ'দশ পৃষ্ঠাতে এক প্রশ্নোত্তরে তেরোশ হিজরীর মুজাদ্দিদ ও মোহাম্মদী আন্দোলনের সার্থক পরিচালক হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রঃ) কে কাফের হিসেবে মন্তব্য করা হয়েছে এবং আরো বলা হয়েছে যে হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রঃ) কে যাঁরা কাফের হিসাবে মেনে নিতে সন্দেহ করেন তাঁরাও কাফের।

এই মালফুজাতটি কতটুকু সঠিক তা অনুধাবনের জন্য কুতুবুল এরশাদ হযরত সৈয়দ হাফেজ মুনির উদ্দিন (রহঃ) ৫-১২-১৯৩২ ইং সনে চট্টগ্রামের দারুল উলুম আলীয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আবদুল আউয়াল ছাহেব (রাহঃ) কে দিয়ে নিজস্ব তত্ত্বাবধানে বিশেষ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালার উপর আলোকপাত করে একটি উর্দূ পুস্তিকা লিখিয়েছিলেন, পাঠকদেরকে সেই উর্দূ পুস্তিকাটি পাঠ করার অনুরোধ জানাই। উক্ত পুস্তিকাটির নাম ছিল আ'জামুল ফতোয়া'। ঐ পুস্তিকাটির একটি জায়গায় বড়পীর হযরত শাহ আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) পর্যন্ত বেলায়েত সমাপ্ত কিনা এক প্রশ্নোত্তরের জওয়াবে হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রঃ) কে অলি হিসাবে বর্ণনা করা হয়। তাঁর বেলায়েতে কোন সন্দেহ নেই বলে ফতোয়া প্রদান করা হয়। ঐ পুস্তিকাটিতে ঐ মতামতের স্বপক্ষে সে সময়ের চট্টগ্রামের আহলে ছুন্নাত ওয়াল জামাতের যে সমস্ত বুজুর্গ ওলামা, পীরে ত্বরীকত ও মোহাদ্দেছিনে কেরাম দস্তখত করেছিলেন তাঁরা হলেন যথাক্রমে ঃ

১) পীরে ত্বরীকত সুলতানুল কামেলীন হযরত মাওলানা আবদুল হামিদ বাগদাদী (রহঃ)
২) চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়ার মুহাদ্দিছ পীরে কামেল হযরত মাওলানা ছফিরুর রহমান হাশেমী (রহঃ)
৩) কলিকাতা আলীয়া ও চট্টগ্রাম মোহসেনীয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আবদুল হামিদ ফখরে বাংলা (রহঃ)
৪) আল্লামা গাজী শেরে বাংলা হযরত আজিজুল হক আলকাদেরী (রহঃ)
৫) পীরে তরিকত গারাঙ্গীয়ার হযরত শাহ মওলানা আবদুল মজিদ (রহঃ)
৬) চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দীস হযরত মাওলানা মীর মাছউদ আলী (রহঃ)
৭) হযরত মাওলানা সূফী আহসান উল্লাহ সাহেব (রহঃ)
৮) পীরে তরীকত হযরত মাওলানা সৈয়দ আবদুল করিম মাদানী (রহঃ)
৯) হযরত মাওলানা তকি সাহেব (রহঃ)
১০) হযরত মাওলানা এরশাদ আলী সাহেব (রহঃ)
১১) হযরত মাওলানা বদিউর রহমান সাহেব (রহঃ)
১২) হযরত হাফেজ সৈয়দ মুনির উদ্দিন সাহেব (রহঃ)
১৩) হযরত মাওলানা ফয়েজুল করিম (রহঃ)
১৪) চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়া মাদ্রাসার মোহাদ্দীস মাওলানা আফাজ উল্লাহ (রহঃ)
১৫) চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দীস চুনতি নিবাসী হযরত শাহ মাওলানা নজীর আহমদ (রহঃ) এবং হযরত মাওলানা আবদুল আওয়াল সাহেব (রহঃ) যিনি এই ফতোয়া ও পুস্তিকা 'আজামুল

ফতোয়ার লেখক'। আরব, আজম, হিন্দুস্তান ও বাংলায় জাহেরী বাতেনী কামালতে পূর্ণ বড় বড় আলেমগণ যাঁদের দ্বারা শিরক, বিদয়াত দূরীভূত হয়েছে। তাঁরা উক্ত সাইয়িদ সাহেবের মুরিদ ছিলেন। তাঁরা সকলেই মাজহাব অবলম্বনকারী ছিলেন। হযরত সৈয়দ সাহেব (রঃ) হযরত মাওলানা আবদুল আজিজ মোহাদ্দেদ দেহলভী (রহঃ)'র খাছ মুরিদ ছিলেন। যে ব্যক্তি এইরূপ তরিকত ও শরীয়াতের হাদী, হুজুর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের বংশধর ও কামেল মোর্শেদের উপর অযথা অপবাদ প্রয়োগ করে সে ব্যক্তি গুনাগার, বদকার, মিথ্যাবাদী ও অপবাদকারী ব্যতীত আর কিছুই নয়। যে ব্যক্তি এই ধ্রুব সত্যকে অস্বীকার করে সে ব্যক্তি ভ্রান্ত, সত্য পথ ভ্রষ্ট।

লেখক ঃ কাযী মুহাম্মদ আবুল বয়ান এম. আর. রহমান হাশেমী
অধ্যক্ষ - আহছানুল উলুম জামিয়া গাউছিয়া কামিল (বিশ্ববিদ্যালয়) মাদরাসা কুলগাঁও, জালালাবাদ, বায়েজিদ বোস্তামী, চট্টগ্রাম।

সংগ্রহঃ বালাকোট-চেতনা উজ্জীবন পরিষদ, সম্মেলন স্মারক ২০১০

সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)
উপমহাদেশের ইসলামী চেতনার বাতিঘর
মারজান আহমদ চৌধুরী

উপমহাদেশে ইসলাম

ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের প্রথম আগমন ঘটেছিল ৮ম শতাব্দীর একেবারে শুরুর দিকে। উমাইয়া শাসনামলে সেনাপতি মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের হাত ধরে ইসলামের বিজয় মশাল সাগর পারের সিন্ধু ভূমিতে এক ঝলক আলো ফেলেছিল। কিন্তু প্রথম আগমনটি স্থায়ী হতে পারেনি। পাহাড়ি জলধারার মতো দ্রুতবেগে এসে, সেটি আবার মিলিয়ে গিয়েছিল সময়ের প্রতিকূল স্রোতে। তবে ক্ষণিকের এ আগমন পরবর্তীদের স্থায়ী আগমনের পথকে সুগম করে দিয়েছিল। ইরান, আফগানিস্তানের পাহাড় মাড়িয়ে, কখনো আবার ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে উপমহাদেশের মাটিতে পা রেখেছিলেন মহান সব সুফি, শায়খ ও মুসলিম ব্যবসায়ীগণ। তাদের দ্বীনদারী, একনিষ্ঠ পরিশ্রম ও উত্তম চরিত্র হিন্দুস্তানের পৌত্তলিক-গৌড়ে কালিমা তায়্যিবার ধ্বনিকে বজ্রকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত করেছিল। এ উপমহাদেশের মুসলমানদের মুসলিম স্বত্তার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে প্রখ্যাত সব ওলী-আউলিয়ার নাম। সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেছেন, "ভারতবর্ষে যত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে ও ইসলামেল উপর চলবে, তার একটি সাওয়াব খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি (র.) এর আমলনামায় যাবে"।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে সুলতান মুহাম্মদ ঘুরীর হাত ধরে উপমহাদেশের বুকে দ্বিতীয়বার ইসলামী শক্তির আগমণ ঘটেছিল। সেবার আর পাহাড়ি জলধারা নয়; বহমান নদীর মতো স্থায়ীভাবে হিন্দুস্তানের মাটিতে পদচিহ্ন ফেলেছিল মুসলমানরা। তবে শক্তিশালী মামলুক, খিলজি, সায়্যিদ মোঘল প্রমুখ মুসলিম রাজবংশ এ মাটিতে মাটিতে শাসন করলেও ইসলাম প্রচারে তাদের ভূমিকা খুবই নগণ্য। সে কাজটি তখনও সুফি শায়খরাই করে গেছেন।

তাজদীদের পথ পরিক্রমা

প্রথমদিকের মুত্তাকী সুফি শায়খরা দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর ধীরে ধীরে তাসাউফের নামে অনেক বাতিল আক্বীদা এসে উপমহাদেশের মুসলমানদের

ভেতর প্রবেশ করেছিল। একইসাথে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শুরু হয়েছিল দ্বীনকে ধ্বংস করার এক অভিনব ষড়যন্ত্র। দীনে ইলাহী নামক কুফরি আকীদা প্রচার করা হচ্ছিল খোদ মোঘল সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজ দরবার থেকে। আল্লাহ তখন তাঁর প্রিয় বান্দা ইমাম আহমদ সিরহিন্দী (র.) (১৫৬৪-১৬২৪) এর মাধ্যমে উভয় দিক থেকে সমাগত ষড়যন্ত্র থেকে তাঁর দীনের পবিত্রতাকে রক্ষা করেছিলেন। ইমাম সিরহিন্দী একদিকে তাসাউফের নামে প্রবিষ্ট বাতিল আকীদাকে দফারফা করে তাসাউফকে সুন্নাতের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ফিরিয়ে এনেছিলেন। অপরদিকে তার ইলমি ও তাজদীদি কর্মসূচি 'দীনে ইলাহী' নামক কুফরি মতবাদকে দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় করে দিয়েছিল।

আজ অবদি তিনি মুসলমানদের কাছে মুজাদ্দিদে আলফে সানী বা হিজরী দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক হিসেবে অমর হয়ে আছেন।

ইমাম সিরহিন্দীর সমসাময়িক ছিলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আব্দুল হক দেহলভী (র.)। ইমাম সিরহিন্দী যখন কুফরের কালিমা ঝেড়ে ইসলামকে এবং বিদ'আত সরিয়ে সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন, শায়খ আবদুল হক তখন উপমহাদেশের উর্বর মাটিতে হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বীজ বপন করেছিলেন। ইমাম সিরহিন্দীর তাজদীদ (সংস্কার) ও শায়খ আবদুল হকের ইলমি খিদমাত পরবর্তী শতাব্দীতে এসে এক বিন্দুতে মিলিত হয়েছিল। সিন্ধুসদৃশ সেই বিন্দুর নাম ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র.) (১৭০৩-১৭৬২)।

উপমহাদেশে তো বটেই, সেই যুগে পুরো মুসলিম দুনিয়ায় শাহ ওয়ালিউল্লাহ'র তুলনার বহুবিদ্যাজ্ঞ (Polymath) দ্বিতীয়জন ছিলেন না। খ্যাতিমান আলিমে দ্বীন ও দার্শনিক ড. ইসরার আহমদ বলেছেন, 'ইমাম গাযালী (র.) ও ইমাম ইবনু তাইমিয়াকে একত্রিত করে যে ব্যক্তিত্ব তৈরি হতে, আমার নিকট শাহ ওয়ালিউল্লাহ তার চেয়েও বড়। সাহাবায়ে কিরামের পর মুসলিম দুনিয়ায় এরকম বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী দ্বিতীয় জন আসেননি'। সামনে এগুনোর পূর্বে উপমহাদেশের এ সর্বশ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদকে সংক্ষিপ্তভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর প্রধান কৃতিত্ব ছিল, তিনি ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রসার করেছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআনের ফার্সি অনুবাদ করে কালামে ইলাহিকে জনসাধারণের উপলব্ধির দ্বারপ্রান্তে নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে তার পুত্রদের দ্বারা কৃত উর্দূ অনুবাদ উপমহাদেশের কোণায় কোণায় কুরআনের দাওয়াত ছড়িয়ে দিয়েছিল। একই সাথে তিনি শায়খ আবদুল হক দেহলভী (র.) এর হাতে প্রোথিত ইলমে হাদীসের বীজকে সযত্নে লালন করে সুবিশাল মহীরুহে পরিণত করেছিলেন। মুয়াত্তা ও

মিশকাতের মতো বিশ্বখ্যাত হাদিসের কিতাবের ব্যাখ্যা রচনা করার মাধ্যমে উপমহাদেশে ইলমুল হাদীস অধ্যয়নকে তিনি স্থায়িত্ব এনে দিয়েছিলেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) তুলনামূলক ফিকহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছিলেন। তিনি হানাফি ও শাফিঈ মাযহাবের মধ্যাকার দূরত্বকে সুশৃঙ্খলভাবে নিরসনের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং মুজতাহিদ ইমামদের মতপার্থক্যের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করেছেন। যুগের প্রয়োজনে ইমামদের ইমামদের উসূলের উপর ভিত্তি করে ইজতিহাদের তথা গবেষণার রুদ্ধ দ্বারকে তিনি পুনরায় উন্মুক্ত করেছেন।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও বাতিলের মুকাবিলা করার জন্য জ্ঞানভিত্তিক প্রজ্ঞাপূর্ণ ঈমানের বিকল্প নেই। এজন্য তিনি তার লেখনিতে ঈমানের শাখা প্রশাখা এবং ইসলামী শরীআতের হিকমত (Perpose and Objectives) খুলে খুলে বর্ণনা করেছেন। তার 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' এমন এক অদ্বিতীয় রচনা, যার উদাহরণ পুরো ইসলামের ইতিহারে খুজে পাওয়া যাবে না। তাসাউফের জাগতেও শাহ ওয়ালিউল্লাহ এক বিস্ময়কর নাম। পিতার কাছেই তিনি তাসাউফের দীক্ষা পেয়েছিলেন। তাসাউফের তাত্ত্বিক জটিলতাকে তিনি সহজবোধ্য করেছেন, মুসলিম মননে আল্লাহর মারিফাতের নীর সিঞ্চন করেছেন, আত্মিক পরিশুদ্ধতাকে মুসলিম পরিচয় গঠনের পাথেয় বানিয়ে হাজির করেছেন। সর্বোপরি ইমাম গাযালি ও ইমাম আহমদ সিরহিন্দীর পথ ধরে কুরআন সুন্নাহর আলোকে তাসাউফকে দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উপস্থাপন করার সমুদয় কৃতিত্ব শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর অন্তত উপমহাদেশের বুকে। এছাড়াও তিনি একটি তথা সম্বলিত 'মুসলিম মানস' (Comprehensive Muslim Mindset) গঠন করার লক্ষ্যে ইসলামের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিকসমূহ সূচারুরূপে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। কালের গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া ইসলামী খিলাফতের স্বপ্নকে যুগের উপযোগী সংস্করণে পুনরায় হাজির করে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) পরবর্তীদের জন্য দ্বীনী খিদমতের পথকে সুগম করে গেছেন।

বালাকোট যুদ্ধের ভূমিকায় শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র.) এর কৃতিত্ব

আলোচনা করার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, বালাকোট থেকে শুরু করে আজকের যুগ পর্যন্ত এ উপমহাদেশের প্রকৃতপক্ষে ইসলামের যত খিদমাত হয়েছে সবই শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর সাদকাহ জারিয়াহ। বালাকোটের মহাবীর, ইসলামী আন্দোলনের সিপাহসালার, আমিরুল মুমিনীন সায়্যিদ আহমদ (র.) সরাসরি শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর রূহানী সন্তান বললে অত্যুক্তি হবেনা। সায়্যিদ আহমদ (র.) কখনো আমিরুল মুমিনীন হতে পারতেন না, যদি তার পেছনে ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর ইলমি ও তাজদীদি খিদমাতের ভর না থাকত।

নব উদ্যমের সূচনা

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর সন্তানরা একনিষ্ঠভাবে পিতার খিদমাত সামনে এগিয়ে নিয়ে চলছিলেন। একই সময়ে ভারতের বিভিন্ন কোণায় মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিল ইসলাম-বিধ্বসী সর্পকূল। সম্রাট জাহাঙ্গীরের অনুমতি নিয়ে বহু আগে থেকে উপমহাদেশের সমুদ্রতটে ব্যবসা করছিল ইংরেজ বেনিয়ারা। কিন্তু কেবল ব্যবসার নিয়ত তাদের কখনো ছিলনা। তাদের চোখ ছিল ভারতের সিংহাসনে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ক্ষয়িঞ্চু মোঘল রাজদরবার চলছিল এক প্রকার দান-দক্ষিণা নিয়ে। ইংরেজদের বাড়ন্ত শক্তিকে মুকাবিলা করার সামর্থ মোঘলদের ছিল না। ওদিকে মহারাষ্ট্রের কট্টরপন্থী হিন্দু রাজা ছত্রপতি শিবাজী মুসলমানদের হাত থেকে ভারতের ক্ষমতা দখল করার চেষ্টায় বহুবার ব্যর্থ হয়েছিল। তার বংশধররাও মোঘলদের ক্ষয়িষ্ণু শক্তিবলয়ে বারবার আঘাত হানছিল। এমনকি আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে মারাঠা সেনাপতি সদাশিব রাও- এর বিশাল বাহিনী ক্ষণিকের জন্য দিল্লি দখল করে ফেলেছিল। ভারতের কোন মুসলিম রাজা বা নবাবের শক্তি ছিলনা মারাঠাদেরকে আটকানোর। তখন শাহ ওয়ালিউল্লাহ পত্র লিখে আফগান শাসক আহমেদ শাহ আবদালিকে ভারত আক্রমণ করার আহবান জানিয়েছিলেন। ১৭৬১ সালে পানিপথের ৩য় যুদ্ধে আবদালিন মুসলিম বাহিনীর হাতে মারাঠা বাহিনী পরাজিত না হলে তখনই ভারতের বুকে মুসলমানদের গণকবর রচিত হয়ে যেত। এছাড়াও উত্তর পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব ছিল শিখদের হাতে, যারা ছিল কট্টর মুসলিম বিদ্বেষী এবং মারাঠাদের সহায়ক। ত্রিমুখী শত্রুর সামনে দাঁড়িয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা তো দূরের কথা; ভারতের মাটিতে মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষা করাও বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ঠিক এরকম একটি টালমাটাল সময়ে, ১৮০৬ সালে উত্তর প্রদেশের রায় বেরেলি থেকে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে দিল্লিতে পা রাখেন এক সাহসী তরুণ। ২০ বছর বয়সী সে তরুণের নাম ছিল সায়্যিদ আহমদ (র.)। পিতার নাম সায়্যিদ ইরফান। রায় বেরেলিতে প্রাথমিক দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করার পর ইলমে মারিফাত অর্জনের তৃষ্ণা মেটাতে সায়্যিদ আহমদ (র.) বেছে নিয়েছিলেন ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর আঙিনা। দিল্লিতে এসে তিনি বায়আত করেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর বড় পুত্র ও খলীফা শাহ আবদুল আযীয দেহলভী (র.) এর হাতে। পাঁচ বছর দিল্লিতে অবস্থান কালে ইমামুল হিন্দ ও তার সন্তানদের বিপ্লবী ও প্রজ্ঞাপূর্ণ চিন্তাধারা সায়্যিদ আহমদ (র.) কে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। একদিকে মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষা, আরেকদিকে সমাজে ছড়িয়ে থাকা শিরক-বিদআতকে অপনোদন করে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করার তীব্র স্পৃহা জেগেছিল ২৫ বছর বয়সী এ মুজাদ্দিদে জামানের মনে।

প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচি

আলতাফ কাদির তার Sayyid Ahmad Barailvi গ্রন্থে লিখেছেন, দীর্ঘ সাত বছর সায়্যিদ আহমদ (র.) আমির খান নামক এক যোদ্ধার সাথে বিভিন্ন অভিযানে যোগদান করেন। সাত বছর পর সায়্যিদ আহমদ (র.) বুঝতে পারেন তিনি ভুল মানুষের সাথে পথ চলছেন। আমির খানের একমাত্র উদ্দেশ্য বিভিন্ন জায়গায় হামলা করে সম্পদ আহরণ করা এবং নিজেকে নবাবদের কাতারে শামিল করা। ওদিকে মারাঠা সাম্রাজ্য ততদিনে বুঝতে পেরেছিল যে, ভারতের ক্ষমতা দখল করার পথে মুসলমানরা বাধা নয়; বাধা বাড়ন্ত ইংরেজ বেনিয়া শক্তি। ফলাফলস্বরূপ মুসলমানদের পিছু ছেড়ে মারাঠারা একের পর এক ইংরেজ কোম্পানির সাথে যুদ্ধে জড়াচ্ছিল। ১৮১৮ সালে ৩য় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিজয়ী হয়। আমির খান তখন ইংরেজদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে নবাব খেতাব পাওয়ার স্বাদ পূর্ণ করে। প্রসঙ্গত, বেশিরভাগ মুসলিম নবাবদের মূল লক্ষ্যই ছিল ইংরেজদের খুশি করা।

আমির খানের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে সায়্যিদ আহমদ (র.) মনোনিবেশ করেন ভারতের মুসলিম সমাজের দিকে। কারণ মারাঠাদেরকে ঘায়েল করে ইংরেজরা তখন ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তি। হাতে যেটুকু শক্তি আছে, তা নিয়ে ইংরেজ কোম্পানির মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। প্রস্তুতি ও লোকবল বৃদ্ধির আশায় মুসলিম সমাজে হাত দিয়ে সায়্যিদ আহমদ (র.) প্রচন্ড হতাশ হন। তিনি উপলব্ধি করেন, বেশিরভাগ মানুষ কেবল নামেই মুসলমান। ইসলামের মূল শিক্ষা ভুলে এরা ডুবে আছে নিজেদের বানানো রসম-রেওয়াজের মধ্যে। বারবারা যেটক্যাফ তার Islamic revival in British India গ্রন্থে লিখেছেন, সে সময়টি ছিল সায়্যিদ আহমদ (র.) এর পরিপক্কতা অর্জনের সময়। অর্থাৎ তিনি অমুসলিমদের সাথে জিহাদের পণ করে মাঠে নামলেও এটি খেয়ালই করেননি যে, তার ঘরেই হাজার সমস্যা। ইতিহাসবিদ অলিবিয়ার রয় লিখেছেন, সায়্যিদ আহমদ (র.) তখন মুসলিম সমাজের সাথে প্রচলিত শিরক-বিদআত অপনোদনে মনোনিবেশ করেন। তিনি এ আন্দোলনের নাম দের 'তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়া'। দুনিয়ালোভী মৌলভীদের কাছে না গিয়ে সাধারণ জনগণের দ্বারে দ্বারে তিরি ইসলামের মূল শিক্ষা পৌঁছে দিতে শুরু করেন। এর ফল আসে আশার চেয়েও বেশি। সাধারণ মুসলমানরা দলে দলে তার দিকে হাত বাড়ায়। সায়্যিদ আহমদ (র.) উপমহাদেশের মুসলমানদের অঘোষিত আমির হয়ে দাঁড়ান।

তার এ আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা ইংরেজদের মাথায় চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছিল। ফলাফল স্বরূপ তাকে 'ওয়াহাবি' বলে আখ্যায়িত করতে শুরু করে। সুচতুর ইংরেজরা বুঝতে পেরেছিল এই খেতাব সায়্যিদ আহমদের উত্তাল ঢেউকে থামিয়ে দেবে। কিন্তু তাদের কূটকৌশল সফল হয়নি। বারবারা যেটক্যাফ

লিখেছেন, সায়্যিদ আহমদ (র.) তিনটি জিনিসকে ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক মনে করতেন। একটি হচ্ছে সুফিবাদের নামে ভ্রান্ত মতবাদ, আরেকটি হিন্দুদের রসম রেওয়াজ। শিয়া ও ভ্রান্ত সুফিদের বিরুদ্ধে লাগাতার তিন বছর তিনি হাজার হাজার মুরিদীন সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন।

১৮২১ সালে সায়্যিদ আহমদ (র.) হজ্ব করতে যান। দুই বছর পর ফিরে এসে তিনি আবার দ্বীন কায়িমের স্বপ্নে মাঠে নেমে পড়েন। মারাঠা শক্তি তখন হিসাবের ভেতরেই ছিল না। অপরদিকে ইংরেজরা ছিল ধারণার চেয়েও বড় শক্তি। সায়্যিদ আহমদ (র.) তৎকালীন ভারতের অভ্যন্তরে যুদ্ধ পরিচালনার কেন্দ্র স্থাপন করেন নি। এটি তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার পরিচায়ক। তিনি তাঁর কৌশলকে খানিকটা পরিবর্তন পাঞ্জাব কে তাহার লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করেন! কারণ ভৌগলিক দিক থেকে হিসাব করলে, পশ্চিমে মরক্কো থেকে শুরু হয়ে মুসলিম বিশ্বের মানচিত্র পূর্ব দিকে একবারে আফগানিস্তান পর্যন্ত ছেয়ে আছে. এরপর পূর্ব দিকে এগুলে সামনে এক বিশাল বাধা, বৃহত্তর পাঞ্জাব। কিন্তু সীমান্ত এলাকা ব্যতীত সমগ্র পাঞ্জাবে শিখদের আধিপত্য ছিল। এরপর আবার শুরু হয় মুসলমানদের আবাসভূমি (বর্তমান পাকিস্তান ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিক)। এদিক থেকে চিন্তা করে সায়্যিদ আহমদ (র.) পাঞ্জাব বিজয়ের স্বপ্ন দেখেন। তার উদ্দেশ্য ছিলো পাঞ্জাব বিজয় করতে পারলে একদিকে যেমন ভারতের মুসলমানরা বিশ্বের মুসলমানদের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত হয়ে যাবে, অপরদিকে পাঞ্জাবকে দূর্গ বানিয়ে পূর্ব থেকে ধেয়ে আসা (বাঙাল এলাকা) ইংরেজ শক্তির সাথেও মুকাবিলা সম্ভব হবে। নির্দ্বিধায় বলা যায় পরিকল্পনাটি যুগোপযোগী ছিলো।

ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা

আলতাফ কাদির লিখেছেন সায়্যিদ আহমদ (র.) আট হাজার মুজাহিদ নিয়ে পাঞ্জবের উদ্দ্যেশ্যে রওনা হন। তবে তিনি সরাসরি পাঞ্জাব যাননি। বর্তমান ভারত ও পাকিস্তান পুরোটা ঘুরে লোকবল সংগ্রহ করে এবং জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে প্রচার করে আফগানিস্তানে পৌঁছান। কান্দাহার কাবুল অতিক্রম করে নওশহরে অবস্থান নেন। সেখানে শিখ রাজা বুখ্য সিং-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেন। সে যুদ্ধ জয়ের মধ্য দিয়ে মুসুলমানদের সাহস উদ্দীপনা বহুগুণে বেড়ে যায়। ১৮২৬ সালে তিনি পাখতুন জাতিগোষ্ঠীর বাসস্থান পেশওয়ারে পৌছান। পাখতুনদের নেতৃত্ব ছিলো পাঠানদের হাতে। সায়্যিদ আহমদ (র.) সেখানে গিয়েই ইসলামি অনুশাসন বাস্তবায়ন করেন। পাঠানদেরকে সরিয়ে তার সাথে আগত আলিমদের তিনি নেতৃত্ব তুলে দেন। এরপর পাঞ্জাবের রাজা রনজিত সিংয়ের কাছে পত্র

পাঠান। পত্রে লেখা ছিলো হয় ইসলাম কবুল করো নয় জিযিয়া দাও নয়তো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

রাজনৈতিক দিক থেকে বিবেচনা করলে, এ পদক্ষেপ সঠিক ছিলো বলে অনুমিত হয় না। সীমান্ত এলাকার মানুষ যে ইসলামি অনুশাসনে অভ্যস্ত নয় এ বিষয়টি হয়তো তিনি বিবেচনায় আনেন নি। বংশ পরম্পরায় মুসলমান হলেও এদের কাছে ইসলাম ছিলো নিজেদের বানানো কিছু রসম- রেওয়াজ। তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতে যেভাবে দাওয়াতি কার্যক্রম চালিয়েছিলেন, পেশওয়ারেও সেরকম কার্যক্রম চালালে অবস্থা ভিন্ন হতে পারতো। সেটি না করেই তিনি তাদেরকে ইসলামি অনুশাসন মানতে বাধ্য করেছেন, যা তার জন্য হিতে বিপরীত হয়েছে। তাছাড়া সীমান্ত অঞ্চলের ক্ষমতাধর পাঠানরা তাদের ক্ষমতা বেদখল হওয়া মেনে নিতে পারেননি। তাই এদের পক্ষ থেকে বারবার বিদ্রোহ হয়েছে। এতে সায়্যিদ আহমদ এর সময় ও শক্তি দুটিই নষ্ট হয়েছে।

১৮৩০ সাল পর্যন্ত সায়্যিদ আহমদ (র.) পুরো পেশওয়ারের নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তখন মুসলমানরা তাকে 'আমীরুল মুমেনীন' খেতাবে ভূষিত করে। তবে পাঠানদের বিরোধিতাকে তিনি কাবু করতে পারেননি। সেই বছর পাখতুনদের অতর্কিত হামলায় সায়্যিদ আহমদ এর বাহিনীতে বিপুল পরিমান ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। বাধ্য হয়ে বরফ ঢাকা শীতকালে তিনি পেশওয়ার ত্যাগ করে কাশ্মীরের দিকে পা বাড়ান। কিন্তু কাশ্মীরে তিনি পৌছাতে পারেননি।

বালাকোট যুদ্ধ

১৮৩১ সালের ৬ ই মে জুম্মার দিন সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর সৈন্যরা শিখ রাজা রনজিত সিংয়ের পুত্র শের সিংয়ের নেতৃত্বাধীন ১০ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনীর মুখোমুখি হয়। ততদিনে সায়্যিদ আহমদ এর হাতে বাকী ছিলো মাত্র ছয় থেকে সাতশ সৈন্য। যতসামান্য এই রসদ নিয়ে তিনি কাশ্মীরের মানসেহরা জেলার পাহাড় ঘেরা বালাকোট প্রান্তে যুদ্ধ শুরু করেন। স্থানীয় মুসলমানরা বিশ্বাসঘাতকতা করে কে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। সেসব সামন্ত পাঠানেরা সিকদার অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সায়্যিদ আহমদ (র.) কে আহ্বান করেছিলো, তারাই পরবর্তীতে মুসলমানদেরকে সাহায্য না করে গোপনে শিখদের সাথে হাত মিলিয়েছিলো। দুই ঘন্টা স্থায়ী বালাকোটের সেই যুদ্ধ ছিলো কারবালার ২য় অধ্যায়। মুসলিম বাহিনী চূড়ান্ত বীরত্বের পরিচয় দিয়ে ছোট ছোট দল বানিয়ে শিখদের আক্রমণ করতে থাকে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের এক পর্যায়ে শিখদের অতর্কিত আক্রমণে শাহাদাৎবরণ করেন আমীরুল মুমেনিন সায়্যিদ আহমদ (র.)। মেটিকোট ঝর্ণার পাশে পরে থাকা দেহটি প্রথমে কারো নজরে আসেনি। সৈন্যরা তার খোঁজে সবটুকু সৈন্য নিয়ে তখনো লড়াই করে যাচ্ছিলো। একপর্যায়ে শিখদের

দ্বারা প্ররোচিত হয়ে কিছু স্থানীয় মুসলমান কৌশলে সায়্যিদ আহমদ এর সৈন্যদেরকে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আসার আহ্বান যানান। দিশেহারা সৈন্যরা সেনাপতির খুজে পাহড়ের চূড়ায় উঠা মাত্র আগে থেকে সেখানে লুকিয়ে থাকা শিখ সৈন্যরা তাদের উপর মুহুর্মুহু আক্রমণ চালায়। এতেই মুসলিম বাহিনীর পরাজয়বরণ করতে হয়। ভারতে উত্তর-পশ্চিম অন্ধপ্রদেশ থেকে মর্দান পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা এক বীর মুজাহিদ যেনো অভিমান নিয়েই চলে যান মালিক মাওলার স্মরণে।

মাত্র ৪৫ বছরের জীবনে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) যে তুলনাহীন কাজ করে দেখিয়েছেন, তার প্রভাব কল্পনার চেয়েও সুদূর প্রসারী। সায়্যিদ আহমদ র. এর তাজদীদ, তার জিহাদ, তার ত্বরীকায়ে মুহাম্মদীয়া যুগযুগ ধরে উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে ইসলামের প্রচার-প্রসার, শিরক-বিদয়াতের অপসারণ আত্মশুদ্ধির মূল অনুপ্রেরণা হয়ে আসছে। সায়্যিদ আহমদ র. এর প্রধান দুই খলিফা হযরত মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী (র.) ও হযরত মাওলানা নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী (র.) এর সিলসিলা বৃহত্তর বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম এলাকা ইংরেজদের প্রতিরোধ, স্বাধীনতা আন্দোলন, ইসলাম প্রচার, হিন্দুয়ানী রসম-রেওয়াজ অপসারণ, মুসলমানদের আত্মশুদ্ধি, ইলমে দ্বীন চর্চা, বাতীলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদসহ সর্বোপরি ইসলামের যে পরিমাণ খিদমাত আঞ্জাম দিয়েছে, অন্যরা কেউ এর সিকিভাগও করতে পারেননি। এক্ষেত্রে মাওলানা কারামত আলী (র.) এর নামটি সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ১৮৩১ সালে বালাকোট যুদ্ধে সায়্যিদ আহমেদ শহীদ বেলরভী (র.) শাহাদাত বরণ করলেও তার আদর্শ মরেনি, তার চেতনা লুপ্ত হয়নি। বরং সেদিন থেকে আজ অবদি এ উপমহাদেশের বুকে যতগুলো ইসলামি আন্দোলন হয়েছে, হচ্ছে আর হবে, সবগুলোই মহান বালাকোট আন্দোলনের প্রতিধ্বনি। সহস্রাব্দের ঘুণে ধরা মুসলিম সমাজে ইসলামি দাওয়াত, খিলাফত, জিহাদ ইত্যাদি শব্দগুলোকে নতুন করে চিনিয়েছেন সয়্যিদ আহমদ (র.)। খনিকের জন্য হলেও দ্বীন কায়িমের স্বপ্নকে স্বার্থক করেছেন সায়্যিদ আহমদ (র.)। আল্লাহর জন্য শাহাদাতের অর্থ কি সেটি দেখিয়েছেন সায়্যিদ আহমদ (র.)। এ উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য ইসলামি চেতনার বাতিঘর হয়ে আছেন হযরত সয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)।

সংগ্রহ : মাসিক পরওয়ানা, মে ২০২১ সংখ্যা

শতাব্দীর রেনেসার নায়কের ডাক

মাওলানা এ. এস. এম. আতহার উদ্দীন মোল্লা

মুর্শিদানা হযরত মাওলানা শাহ সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রঃ) তদানীন্তন হিন্দুস্তান উপমহাদেশের মুসলমান সমাজকে অন্তর্নিহিত, ঈমান, আক্বীদা, কর্ম ও সংগঠন শক্তিকে নতুনত্বের পথে পরিচালিত করে পুনরুদ্দীপিত, পুনরুজ্জীবিত করে উনবিংশ শতাব্দীর উপযোগী করে তুলেছিলেন বলে তিনি কথিত হতেন 'মোজাদ্দেদ অর্থাৎ রেনেসা নায়ক বা নূতনতর পথে পুনরুজ্জীবনকারী হিসেবে। তিন তিন বার স্বপরিষদ হজব্রত পালন করে তিনি সংগঠনের মাধ্যমে মন্ত্রশিষ্য, শিষ্য, প্রশিষ্যদেয় দিলেন জেহাদের ডাক, এ জেহাদ অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, অনাচারের বিরুদ্ধে, তা ধর্মীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক যেই পর্যায়েরই হোক না কেন? ভারতের পশ্চিমাংশে মধ্যবিত্ত শ্রেণী না থাকায় এবং নিম্নতম শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা দীক্ষার অভাব ও জমিদার জায়গীরদার শ্রেণীর উপর তাদের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা প্রভৃতি কারণবশতঃ আঞ্চলিক পর্যায়ে মোজাহেদ বাহিনীতে ঐ অংশের লোক সংখ্যা হলো সীমিত, অন্যদিকে পূর্ব বাংলা থেকে মাওলানা ইমামুদ্দীনের প্রচার ও সংগঠন শক্তির কারণে এবং শাহ সূফী নূর মুহাম্মদ সাহেবের প্রচেষ্টায় মোজাহিদের বিশাল অংশ হলো সংগৃহীত। আর জেহাদের জন্য চাঁদাও সংগৃহীত হলো পূর্ববঙ্গ থেকেই সর্বাধিক।

যেহেতু, বৈরী কোম্পানী প্রশাসনের ভাড়াটিয়া সৈন্য, জায়গীরদার, জমিদারদের যুলুমের কারণেই মুসলমান সমাজকে ভোগান্তির চরমে পৌঁছাতে হচ্ছিল। সেহেতু তিনি প্রতিটি অঞ্চলের বিক্ষিপ্ত ঘটনার মুখে যুলুমের হোতাকে আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করার মানসে তাঁর মোজাহিন বাহিনীকে বহুসংখ্যক দলে বিভক্ত করে সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহে ছড়িয়ে পড়ে পাহাড় পর্বত বনজঙ্গলে লুকিয়ে থাকতে নির্দেশ দিলেন রক্ষিত সিংহের শিখ রাজ্যে মুসলিমরা পর্যন্ত যুলুমের শিকার হয়ে স্থানীয় শক্তিমদমত্ত শিখদের দাসীবৃত্তিতে নিয়োজিত হতো। তাই তিনি প্রথমে শিখ রাজ্যের এ বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলীর মুখে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ জারী করেন। শিখ জায়গীরদারদের গুণ্ডাবাহিনী অত্যাচার মুহূর্তে এইরূপ অতর্কিত

প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে চলছিল। এ সকল অতর্কিত আক্রমণকে রীতিমত গেরিলা যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছিলেন উইলিয়াম হান্টার। তাঁর মতে একমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেই একশত ষাটটি গেরিলা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। অন্যান্য অঞ্চলে মিলে সংঘর্ষ স্থল ছিল অসংখ্য, কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে অন্তত তিনশত। সব কয়টি যুদ্ধেই মোজাহিদ বাহিনী বিজয় লাভ করে চলছিল। জুলুমবাজি বন্ধ হয়ে বিরোধী শিবিরে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল। এ ছিল মহান জননায়ক ধর্মনায়ক মোজাদ্দেদ (রহঃ) এর অনুপম যুদ্ধ কৌশলের ফলশ্রুতি। তিনি স্থানীয় মোজাহিদদের দূর-দূরাঞ্চলে পাঠিয়ে দূরাঞ্চলের মোজাহিদদের রেখেছিলেন অকুস্থলে। এতে জেহাদে সংশ্লিষ্ট মোজাহিদদের সনাক্তকরণ হয়ে পড়েছিল দুরূহ ব্যাপার। বিশেষ করে বাঙ্গালী মোজাহিদগ দূর অঞ্চলের লোক হওয়ার কারণে পশ্চিমাংশের জেহাদগুলিতে অপরিচিতই রয়ে গেল।

১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে মোজাহিদ বাহিনীর হস্তে পেশোয়ার পতনের পর শত্রু শিবিরে সাংঘাতিক ত্রাসের সঞ্চার হয় এবং তারা এবার সম্মিলিতভাবে মোজাহিদদের মোকাবেলা করতে হলো বদ্ধপরিকর। ফলতঃ বিক্ষিপ্তভাবে মুসলমান গেরিলাদের মোকাবেলার জন্যই তাদের পরাজয় ও ধ্বংস সংঘটিত হয়ে চলছিল ত্বড়িৎ। এ জেহাদ বিক্ষিপ্তভাবে আরম্ভ হয়েছিল, তাকে সম্মিলিতভাবে মোকাবেলার জন্য সকল প্রস্তুতিই শত্রুরা গ্রহণ করেছিল। এই সম্মিলিত প্রস্তুতির জন্যই বালাকোটের যুদ্ধে ৬ই মে, ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে মোজাহিদ বাহিনীর পরাজয় ঘটে, যদিও পূর্ববর্তী কয়টি জেহাদের তাঁরা জয়লাভ করেছিল। এ পরাজয় ঘটার আর একটি কারণ হচ্ছে কতিপয় বিশ্বাসঘাতক মুসলমান সর্দার কর্তৃক মোজাহিদ বাহিনীর অবস্থানের খবর ফাঁস করা। এই বালাকোটেই উনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম রেনেসাঁর জন্মদাতা মুর্শিদানা হযরত মাওলানা শাহ সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রঃ) শাহাদাত বরণ করেন, শাহাদাত বরণ করেন মাওলানা ইমামুদ্দীন (রঃ) এর দুইটি দাঁত আল্লাহর রাহে শহীদ হয়। কোনো এক মাওলানা সাহেবের স্বপ্ন বৃত্তান্ত অনুযায়ী ঐ দুটি দাঁত শহীদ হওয়ার কারণে হযরত মাওলানা ইমামুদ্দীনের (রঃ) তাঁর জীবনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবনের প্রতিফলন দান্দান শহীদ হবার ব্যাপারটিও প্রতিফলিত হবার জন্যে। স্পষ্টতই বালাকোটের যুদ্ধের সঙ্গে ওহোদের যুদ্ধের সাদৃশ্য রয়েছে। ওহোদের যুদ্ধে পাহারায় থাকার অসামর্থ্য ও লুটের কাজে আত্মনিয়োগ যেমন হয়েছিল ঐ যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ, বালাকোটেও তেমনি অর্থলোভে কতিপয় সীমান্তবাসী উচ্চ বিত্ত মুসলমানের তরফ থেকে মোজাহিদদের গোপন অবস্থান ফাঁস করে দেয়াই ঐ যুদ্ধে পরাজয় ঘটার কারণ। অবশ্য দুইটি যুদ্ধেই খোদাতায়ালা দিয়ে গেলেন ভবিষ্যৎ বিজয়ের চাবি কাঠির ইঙ্গিত : মুনাফিকদের সম্পর্কে সতর্কতা এবং বালাকোটের যুদ্ধে খোদাতায়ালা তাঁর অশেষ

দয়ায় এতিম মাওলানা ইমামুদ্দীনকে এতিম নবী (সাঃ) এর অপর সুন্নাহ দান্দান শহীদের গৌরব দান করে করেছেন গৌরবান্বিত। যুদ্ধশেষ হলে মাওলানা রায়বেরেলীতে স্বীয় মুর্শিদের জন্মভূমি যেয়ারত করে দেশে ফিরেন।

রায় রায়বেরেলী- যে স্থানের মাটিতে মুর্শিদের জন্ম, যে প্রাকৃতিক জলবায়ু ঊনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ মুজাহিদ আল্লামা ও পথ প্রদর্শকের দেহকে চরিত্রকে সংগঠিত করেছে মহত্তম চারিত্রিক মাধুর্যে তাকে কি মুর্শিদের প্রিয়তম এতিম মন্ত্রশিষ্য, মানস সন্তান ইমামুদ্দীন ভুলতে পারে? পরম দুখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মুর্শিদের দেয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সাগর ও কর্মপ্রেরণার মহান সঞ্চয় নিয়ে ইমামুদ্দীন ফিরে এলেন বাংলায় ধর্মীয় শিক্ষা, হেদায়াত, বিপ্লবী চেতনা, ছড়িয়ে দিতে শুধু হিন্দুস্তানে নয় সমগ্র এশিয়া খণ্ডে, চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন, মালয়, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ইত্যাদি দেশে। পাথেয় তাঁর কুরআন সুন্নাহর অসীম জ্ঞান আর খোদাতায়ালার উপর অসীম বিশ্বাস আর নির্ভরশীলতা। হিন্দুস্তানের পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে পূর্ব সীমান্তের বঙ্গদেশ। দ্রুত নদনদী বন উপবন, গ্রাম গল্প পেরিয়ে তবে আসা। সুদীর্ঘ ত্রিশটি বছর পদব্রজে এ বিরাট ভূখণ্ডে নিজ মুর্শিদের সঙ্গে তবলিগের কাজে, নিজের ব্যবহারিক শিক্ষা ব্যাপদেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কোথায় আশ্রয় নিবেন, কারা তাঁর কদর বুঝবে তা তাঁর জানা। সাধারণ মুসলমানগুলো নিম্ন শ্রেণীর নিম্নবিত্ত ঈমানদার লোকগুলো হিন্দুস্তানের পূর্ব, পশ্চিমাংশে কেন পৃথিবীর সর্বত্রই এক। ইসলামিক ইখওয়ানিয়াত ওদের মধ্যে এবং মুসলমান মধ্যবিত্ত সত্যিকার আলেমদের মধ্যে তখনও ছিল, চিরদিন থাকবে। মোজাহিদ বাহিনীকে তো ধরিয়ে দিয়েছে মুসলমান উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কতিপয় মুনাফেক মুসলিমরা চেয়েছিলেন মদীনার মোহাজের আনসারদের আদর্শে মোজাহিদ মোহাজেরদের সঙ্গে স্থানীয় মুসলমান আনসার পরিবারের বিবাহ যোগ্য মেয়েদের বিবাহ বন্ধন দ্বারা মোজাহিদগণ স্থানীয় মুসলমানদের

আপন জ্ঞাতি কুটম্ব হয়ে থাক। তখন নিজেদের স্বার্থেই মোহাজেরদের তথা দামাম মোজাহিদদের পরিচয় আর ফাঁস হবার আশঙ্কা থাকবে না। কিন্তু সীমান্তের জাত্যাভিমানী স্বার্থান্ধ সর্দারদের কেউ কেউ ভুলে গেল যে, মোজাহিদ বাহিনী মুসলমান সমাজের তথা তাদেরই ইজ্জত আবরু রক্ষার জন্য তাদের উপর যুলুম বন্ধ করার জন্যই ওখানে অবস্থান করছে। তা ভুলে গিয়ে বিপুল ইনাম অর্থাৎ পুরস্কারের লোভে তারা করলেন বিশ্বাসঘাতকতা। এ মুনাফিকদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। অনেক কষ্টে ইমাম বিস্তর অভিজ্ঞতা লাভ করে বহুদিন পথশ্রমের পর বাড়ি ফিরলেন। খোদাকে জানালেন অশেষ শুকরিয়া।

তথ্যসূত্র: গাজী মাওলানা ইমামুদ্দীন বাঙ্গালী (রহ.)

চিন্তাবিদগণের চোখে বেরলভী রহঃ

মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন ওয়াইসী
(স্নাতক, আল হাদিস বিভাগ)

হযরত আহমদ শহীদ বেরলভী (রহঃ) সম্পর্কে বিশিষ্ট চিন্তাবিদগণের অভিমত নিম্নরূপঃ

(ক) হাদীয়ে বাঙ্গাল, মুহিউস সুন্নাহ হযরত কারামত আলী জৈনপুরী (রহঃ) বলেন-

"খোদা তায়ালার অনুকম্পা প্রাপ্ত এই উম্মতের ভিতর কুতুবুল আকতাব, আমীরুল মু'মিনিন (রহঃ) ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ রূপে আবির্ভূত হয়েছেন।" দলীল- মুকাশিফাতে রহমত ১৫ পৃষ্ঠা।

(খ) বিখ্যাত আলেম, হাফিজে হাদীস, মুফতিয়ে আযম, পীরে কামেল হযরত রহুল আমীন বশীরহাটি (রহঃ) বলেন-

"হযরত সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (রহঃ) হানাফী ছিলেন ও তাঁর ত্রিশ লক্ষ মুরীদ ছিল। তিনি তরীক্বতে হযরত নবী করিম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কদম মোবারকের উপর ছিলেন। এজন্য নিজ তরীক্বাকে মুহম্মদীয়া তরীক্বা বলতেন। এটা কাদেরীয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দীয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া ইত্যাদি তরীক্বা গুলোর অন্তর্ভুক্ত।" দলীল- বিজ্ঞাপন রদ

(গ) পীর প্রফেসর আবদুল খালেক (রহঃ) বলেন

"হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলবী (রাঃ) অতি উঁচু দরজার অলী ছিলেন এবং তরিকার প্রবর্তক ছিলেন। তাঁহার ও অন্যান্য বড় দরজার অলীগণের রীতিনীতি কার্যকলাপ তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিলে কোথায়ও শরীয়ত বা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ছুন্নতের বিপরীত এক বিন্দুবিসর্গও দৃষ্টিগোচর হয় না।"

দলীল- সিরাজুস্-সালিকীন ২০৬ পৃষ্ঠা।

(ঘ) মাওলানা হায়দার আলী রামপুরী বলেন-

"হযরত আহমদ শহীদ বেরেলবী (রহঃ) হেদায়েতের নূর অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় দেশ দেশান্তরের মানুষের হৃদয় রাজ্যে উদ্ভাসিত করে তুলেছে।" দলীল- সিয়ানাতুন্নস ৫-৬ পৃষ্ঠা।

(ঙ) হযরত মাওলানা বেলায়েত আলী আযিমাবাদী (রহঃ) বলেন-

"হযরত সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহঃ) এর ব্যক্তিত্ব খোদায়ী সাহায্যে পুষ্ট ছিলো এবং তিনি আল্লাহ পাক এর নিকট অত্যন্ত মকবুল ছিলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানুষের অন্তর তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতো, ফলে তাঁর মুরীদ হতে বাধ্য হতো।"

দলীল- রিসালত দাওয়াত ৬৫ পৃষ্ঠা

(চ) আল্লামা জাফর থানেশ্বরী (রহঃ) আমীরুল মু'মিনিন হযরত সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (রহঃ) সম্পর্কে বলেন-

"তিনি জাগ্রত অবস্থায় হযরত নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত লাভ করতে পারতেন। এবং কাশফের শক্তি বলে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর সাথে সাক্ষাত করতেন। এতে শরীয়তের জটিল মাসায়ালা অবগত হওয়া তাঁর নিকট সহজ ছিলো।" দলীল- তাওয়ারিখে আযীবা ৪০-৪১ পৃষ্ঠা।

(ছ) হযরত মাওলানা ওয়াজীর উদ দৌলা বলেন-

"হযরত সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (রহঃ) এর তিনটি বৈশিষ্ট্য। (১) বিনয় নম্রতা নিয়ে নামায আদায় করা। (২) কুরআনের ইলিম ও তৎপতি আমল। এবং (৩) মকবুল দোয়া।" দলীল- ওয়াসীলে ওয়াজীর।

(জ) মাওলানা আব্দুল মওদুদ ছাহেব বলেন-

"বালাকোটের বিপর্যয় আকস্মিক নয়, অভাবনীয় নয়। সম্প্রতিকালের যেসব প্রামাণ্য ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, সেসব থেকে নিঃসন্দেহে প্রমানিত হয় যে, ১৮৩১ সালের ৬ই মে (২৪ জিলকদ, ১২৪৬ হিজরী) তারিখে বালাকোটে হযরত আহমদ শহীদ বেরেলভী (রহঃ) ও হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) কয়েকশত মুজাহিদ নিয়ে যে মৃত্যু যজ্ঞের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা ছিলো কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনার মতোই পূর্বনির্দিষ্ট অবশ্যম্ভাবী ঘটনা।" দলীল- ওহাবী আন্দোলন ১৪৯ পৃষ্ঠা।

(ঝ) মাওলানা আব্দুল আহাদ (রহঃ) বলেন-

"হিন্দুসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী চল্লিশ হাজার মুশরিক হযরত আহমদ শহীদ বেরেলভী (রহঃ) এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করে ও ত্রিশ লক্ষ মুসলমান তার নিকট বাইয়াত হয়।" দলীল- সিয়ানাতুন্নস

(ঞ) মাওলানা হযরত সিদ্দীক আহমদ (রহঃ) বলেন-

"বিদয়াত ধ্বংসকারী, গোমরাহী মিটানেওয়ালা, হযরত সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (রহঃ) একজন আলিম, কাশফ শক্তি সম্পন্ন উচ্চ দরজার ওলী ছিলেন।" দলীল- কারামতে আহম্মদী।

(ট) আল্লামা গোলাম রসূল মিহির তার বিখ্যাত কিতাবে বলেন-

"হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) বলেন, আমার নিকট বার বৎসরে যা লাভ হবে, হযরত সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (রহঃ)'র নিকট তা বার দিনে হবে।" দলীল- সৈয়দ আহমদ শহীদ ৯২ পৃষ্ঠা।

(ঠ) বাংলা একাডেমী থেকে প্রনীত "মুসলিম সংস্কারক ও সাধক" পুস্তকে হুমায়ুন আব্দুল হাই বলেন-

"সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভী (রহঃ) ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে (১২০১ হিজরী) ভারতের অন্তর্গত উত্তর প্রদেশের রায় বেরেলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিলো সৈয়দ মোহাম্মদ নূর তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন তা বিখ্যাত হাসানী সৈয়দ বংশ নামে খ্যাত এবং তিনি ছিলেন এ বংশের পয়ত্রিশতম পুরুষ। এসময় সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভী (রহঃ) এর বিদ্যা ও পান্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে শাহ আব্দুল আযীয (রহঃ) ও জামাতা শাহ আব্দুল হাই (রহঃ) তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ক্রমান্বয়ে ধর্মীয় নেতা ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে তাঁর সুনাম দিল্লী ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে দেশদেশান্তর থেকে তাঁর ডাক আসতে থাকে। (মুসলিম সংস্কারক ও সাধক)

(ড) এ প্রসঙ্গে ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান বলেন- "হযরত সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (রহঃ) কে ওহাবী আন্দোলনের প্রবক্তা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ওহাবী ছিলেন না। কারন তার মতবাদ বহুলাংশে আব্দুল ওহাবের চিন্তাধারা হতে পৃথক ছিলো।

প্রথমতঃ তিনি আব্দুল ওহাব অথবা তার শিষ্যের সংস্পর্শে আসেননি। কারণ আব্দুল ওহাব পূর্বেই মৃত্যু বরণ করে এবং তার শিষ্যরা হেজাজ হতে বিতাড়িত হয়।

দ্বিতীয়তঃ আব্দুল ওহাব গোঁড়াপন্থী মুসলমান ছিল এবং কুরআন হাদীস (গোঁড়ামীভাবে) অনুসরণ করতো। অপরদিকে হযরত সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (রহঃ) আব্দুল ওহাব নয় বরং হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এর পুত্র হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এর শিষ্য ছিলেন এবং তার মতবাদে প্রভাবান্বিত হন।"

(ভারত বর্ষের ইতিহাস, পৃ. ৫৭২-৫৭৩, প্রকাশনা- গ্লোব লাইব্রেরী)

(ঢ) অধ্যাপক এম.এ খান বলেন-

"Muslim of Bengal played a pioneering role in this revolution just keeping with the dedicated part in the famous zihad movement of syed Ahmad shahid."

(The Great Revolt of 1857.)

(ণ) এছাড়া wahabism in India, encyclopedia of Islam, history of nationalism in east, what actually wahabism, civil disturbance during the British rule in India, a fascinating chapter of the history of Islam in east Pakistan ...প্রভৃতি গ্রন্থে হযরত আহমদ শহীদ বেরেলবী (রহঃ) ও তাঁর মুজাহিদ বাহীনির আন্দোলনকে জিহাদী আন্দোলন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তার সংস্কার আন্দোলনকে যারা ইংরেজদের সাথে সম্পর্ক যুক্ত করে এবং আরবের ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর সাথে একত্রিত করেছে তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হয়েছে।

(ত) বিখ্যাত ঐতিহাসিক রতন লাহিড়ী বলেন-"যার জীবনস্মৃতি প্রেরণা জুগিয়েছিল যুগে যুগে এদেশের মহাবিপ্লবিদের। যার জীবনাদর্শ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যদের আওতার বাইরে থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আক্রমণ করা, স্বাধীন সরকার গঠন করা, আবার সেই সাথে সাথে দেশের মধ্যে থেকেও সাম্রাজ্যবাদকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করা, পথ দেখিয়েছিল পরবর্তীকালে মহেন্দ্রতাপ, বরকতুল্লা, এম এন রায়, রাসবিহারী এমনকি নেতাজিকেও। কে এই মহাবিপ্লবী, যাঁর আদর্শে উদ্বোধিত হয়ে সহস্র সহস্র মানুষ প্রাণ দিয়েছিল, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে শত সহস্র মানুষ বরণ করেছিল দ্বীপান্তর, সশ্রম কারাদণ্ড, কঠোর যন্ত্রণাময় মৃত্যু। কে ইনি?.....ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আর তার দালালদের লেখা ইতিহাসে এর নামোল্লেখ থাকলেও এর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখা থাকা স্বাভাবিকও নয়। আর আজও স্কুল কলেজে যে ইতিহাস পড়ানো হয় সেসব সাম্রাজ্যবাদিদের প্রাচীন গলিত বিকৃত ইতিহাসের আধুনিক সংস্করণ মাত্র। তাই কি করে জানবে এ মহাপুরুষের নাম? এ মহান মহাবিপ্লবি মহাবিদ্রোহীর নাম হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ বেরলভী।"

রতন লাহিড়ী আরো বলেন, "বিপ্লবিরা না পিছিয়ে মরণপণ সংগ্রাম করতে লাগল। তারপর যুদ্ধ হল শেষ। বিপ্লবী বাহিনী হল ধবংস। ...... তাকে সকলে দেখেছিল বীরের মত লড়াই করতে একটার পর একটা শত্রুসৈন্য কচুকাটা করতে। যদিও নিজেরা একে মৃত বলে কবর দেবার ব্যবস্থা করল কিন্তু কেউ এর শেষ পরিণতি দেখেনি।"

রতন লাহিড়ী, ভারত পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সত্যিকারের ইতিহাস, পৃ. ৭-৮; গোলাম আহমদ মোর্তজা, চেপে রাখা ইতিহাস, মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০৭, পৃ. ২৩১-২৩২।

পরিসমাপ্তিঃ

অবশেষে ১৮৩১ সনের ৬ মে নিভে যায় ইসলামী আন্দোলনের উজ্জ্বলতম প্রদীপ। কিছু শিখ ও ইংরেজদের গুপ্তচর মুনাফিক সাইয়্যেদ বেরলভী (রহঃ) এর বাহিনীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। সেই ঐতিহাসিক বালাকোটের ময়দানে শিখদের বিরুদ্ধে (মূলত; ইংরেজদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধরত অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেন। মহান আল্লাহ পাক! তাঁর মর্যাদাকে উচ্চ থেকে আরো উচ্চতর করে দিন।

তৃতীয় অধ্যায়

আক্বীদা ও অপবাদ খন্ডন

তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া ও ওয়াহাবী মতবাদ

মাওলানা মোঃ নূরুল ইসলাম

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (র.)-এর তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া এবং মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর ওয়াহাবী মতবাদ সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা ও মূল্যায়নের পূর্বে উভয়ের জীবনী ও কর্মধারা সম্পর্কে অবহিত হওয়া দরকার, তাই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাঁদের জীবন ও কর্মধারা প্রথমে আলোচনা করা হল।

মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নজদী

মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব ১১১৫ হিজরী মুতাবেক ১৭০৩ খৃ. আরবের নজদ প্রদেশের উয়াইনা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল ওয়াহাব। তিনি একজন বিখ্যাত আলেম ও উয়াইনা শহরের কাজী ছিলেন। ইবনে আব্দুল ওয়াহাব তার পিতার নিকট প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম ইবনে সাইফ, সোলায়মান কুর্দী, মুহাম্মদ হায়াত সিন্দি প্রমুখের নিকট হতে জ্ঞান লাভ করেন। তার মেধাশক্তি ভালোই ছিল। তাই গতানুগতিক লেখাপড়া না করে নিজে নিজে অধ্যয়ন করে অতি অল্প দিনের মধ্যেই শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ঘটান। তিনি অধিকাংশই স্ব-শিক্ষায় শিক্ষিত। অধ্যয়নরত থাকা অবস্থায়-ই তাঁর উস্তাদ সোলায়মান কুর্দী ও মুহাম্মদ হায়াত সিন্দি তাঁর আচরণ উপলব্ধি করে পরবর্তী সময়ে গোমরাহ হওয়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করেন। অধিকাংশ সময়ে তিনি দেশভ্রমণে রত থাকেন। প্রথমে বসরায় চার বছর অতিবাহিত করেন, তারপর বাগদাদে ৫ বছর, কুর্দিস্তানে এক বছর, হামদানে দুই

বছর ও ইস্তাম্বুলে অবস্থানের পর স্পেন চলে যান। সেখানে চার বছর অবস্থান করে এরিস্টটলের দর্শনে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর কোন বুযুর্গের সংস্পর্শ ছাড়া গতানুগতিকভাবে সুফীতত্ত্বে পারদর্শী হন। তখন পর্যন্ত তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। এরপর তিনি জন্মভূমি উয়াইনাহ প্রত্যাবর্তন করে পূর্ববর্তী বুযুর্গদের ও স্বীয় ইমাম হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর রীতিনীতি উপেক্ষা করে চার শ' বছর পূর্বের বিতর্কিত ব্যক্তি আবুল আব্বাছ তক্বী উদ্দীন আহমদ ইবনে আবুল হালিম ইবনে আব্দুছ ছালাম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবুল ক্বাছিম ইবনে তাইমিয়ার থেকে সংক্ষেপে বলা হয় ইবনে তাইমিয়াহ) অনুসরণে জমহুরের পরিপন্থী নতুন নতুন মাসআলাহ বর্ণনা করা আরম্ভ করেন। তাঁর পিতা আব্দুল ওয়াহাব, ভাই সোলায়মান ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ও অন্যান্য উস্তাদগণ এতে অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর বিরোধিতা আরম্ভ করেন। সোলায়মান ইবনে আব্দুল ওয়াহাব তাঁর বিরুদ্ধে একটি কিতাব রচনা করেন। মুশরিকদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহতায়ালা যে আয়াত নাযিল করেছেন ইবনে ওয়াহাব সে আয়াতসমূহকে মুমিনদের উপর প্রয়োগের চেষ্টা করেন। তার অনুসারী ছাড়া সকল মুমিনগণকে কাফির ফতওয়াদানে আত্মনিয়োগ করেন। যেমনঃ ওয়াসিলাকে শিরক প্রমাণ করতে-গিয়ে দলিল হিসেবে মুশরিকগণের উক্তি উপস্থাপন করেন। তাকলীদকে শিরক সাবিত করতে অপপ্রয়াস চালান।

অনুরূপভাবে মুসলমানদের উপর শিরকী ও কুফরী ফতওয়া লাগামহীনভাবে আরম্ভ করায় ইবনে তাইমিয়ার মত তারও বিরোধিতা আরম্ভ হয়। তখন তিনি তদানীন্তন নজদের মাশায়িখ গোত্রের সরদার মুহাম্মদ ইবনে সউদ যিনি আব্দুল আজিজ ইবনে সউদের পূর্বপুরুষ ছিলেন, তার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ইবনে সউদের সাথে নিজ কন্যাকে বিয়ে দিয়ে ক্ষমতা অর্জন করেন। তৎকালীন তুর্কী সরকার ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের ইসলামবিরোধী ফতওয়া ও অন্যান্য কাজের দায়ে তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। সউদ পরিবারের সাথে আত্মীয়তা করে তিনি এর প্রতিশোধ গ্রহণের প্রস্তুতি আরম্ভ করেন এবং বেদুঈনদেরকে একত্রিত করে একটি বাহিনী সৃষ্টি করেন। তখন থেকেই ইবনে ওয়াহাবের তথাকথিত ধর্মীয় সংস্কারের সাথে সাথে রাজনৈতিক আন্দোলনও আরম্ভ হল এবং তদানীন্তন তুর্কী সরকারের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধ হল। তার মৃত্যুর পরও এ আন্দোলন চলতে থাকলে এ আন্দোলনকে ওয়াহাবী আন্দোলন নামে অভিহিত করা হয়। ইবনে ওয়াহাব যদিও মূলতঃ নতুন কোন ধর্মীয় মত আবিষ্কার করেননি বরং চার শ' বছর আগেও ইবনে তাইমিয়ার মতবাদকে প্রচার করেছেন তদুপরি তার আন্দোলন রাজনীতিতে রূপান্তরিত হওয়ার দরুন তার দিকে সম্বোধিত হয়ে ওয়াহাবী আন্দোলন নামে পরিচিত লাভ করেছে। ইবনে ওয়াহাব ১২০৬ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।

শহীদ সায়্যিদ আহমদ বেরেলভী (র.)

জন্ম ও বংশ পরিচয়ঃ শহীদ সায়্যিদ আহমদ বেরেলভী (র.) ১২০১ হিজরীর সফর মাসের ৬ তারিখ মুতাবেক ১৭৯৬ খৃ. ২৯ শে নভেম্বর রোজ সোমবার এলাহাবাদ জেলার রায়বেরেলীর দুই নদীর তীরে "দায়রায়ে ইলমুল্লাহ" নামক মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সায়্যিদ মুহাম্মদ ইরফান এবং চৌত্রিশতম পিতামহের নাম আমিরুল মুমিনীন সায়্যিদুনা হযরত ইমাম হাসান শহীদ (রা.) ইবনে আমীরুল মুমিনীন সায়্যিদুনা হযরত আলী শহীদ (রা.)।

ওয়াহাবী মতবাদ ও মুহাম্মদী আন্দোলন ঃ

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নজদী ও আমীরুল মুমিনীন সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.)-এর জীবনী আলোচনা থেকে আমরা উভয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে জানতে সক্ষম হয়েছি। এরই সাথে ওয়াহাবী মতবাদ ও তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া আন্দোলনের উদ্ভব সম্পর্কেও জ্ঞাত হয়েছি। যেহেতু ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রবর্তক ১১১৫-১২০৬ হিজরী পর্যন্ত এবং তরীকায়ে মুহাম্মদী আন্দোলনের প্রবর্তক ১২০১-১২৪৬ হিজরী পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, একজনের ছয় বৎসর বয়সের সময় অপর জনের মৃত্যু বিধায় উভয়ের মধ্যে দেখা বা সাক্ষাত হওয়ার কোন যুক্তিই নেই এবং হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নজদীর কোন ছাত্র বা শিষ্যের নিকট দীক্ষাও গ্রহণ করেননি বরং তিনি হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.)-এর যোগ্য সন্তান ও খলীফা হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-এর খলীফা ও ছাত্র। বিশেষভাবে তিনি জিহাদের প্রেরণা হাসিল করেন উস্তাদ ওপীর হযরত শাহ আব্দুল আযীয (র.)-এর নিকট থেকে এবং শাহ আব্দুল আযীয তাঁর পিতা ও পীর শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-এর নিকট থেকে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেবের জন্ম ও ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের জন্ম একই বছর হলেও শাহ সাহেবের ইন্তেকাল ইবনে ওয়াহাবের ইন্তেকালের প্রায় ৩০ বছর আগে ১৭৬৩ ইং সনে হয়েছে। তাঁর জীবনকালে ইবনে ওয়াহাব নজদে পলাতক, আশ্রিত ও আত্মগোপনরত অবস্থায় ছিলেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) পবিত্র হজ্জ পালনে মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফ তশরীফ নিলেও ইবনে ওয়াহাবের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হওয়ার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। সর্বোপরি সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) এর আকীদা-বিশ্বাস ও আন্দোলন নীতি ইবনে ওয়াহাব বা তাঁর অনুসারীদের আন্দোলন নীতি ও আকীদা বিশ্বাসের পরিপন্থী ছিল। নিম্নে কয়েকটি তুলনামূলক পার্থক্য আলোচিত হলঃ

(১) মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নজদীর বিভিন্ন লেখায় পীর মুরিদীকে শিরক সমতুল্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ সায়্যিদ সাহেবের আন্দোলনের উৎপত্তি-ই পীর মুরীদীর মাধ্যমে। এমন কি তিনি তাঁর বিরাট বাহিনীকে আত্মসংশোধন করে ছিলেন পীর মুরিদীর মাধ্যমে।

(২) সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.)-এর যুগে ভারতে ওয়াহাবী আন্দোলন ফরায়েযী আন্দোলন নামে চলছিল। তাঁর জীবনী লেখকরা উল্লেখ করেছেন যে, সায়্যিদ সাহেব ফরায়েজি আন্দোলনের চরম বিরোধিতা করেছেন। এতে ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তাঁকে গণ্য করা হয়েছে।

(৩) যিয়ারতের নিয়তে সফর করাকে ইবনে ওয়াহাব হারাম ও কুফরী বিশ্বাস করেন। পক্ষান্তরে সায়্যিদ সাহেব মুস্তাহাব ও সওয়াবের কাজ মনে করতেন। রাসূল (সা.)-এর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে তিনি মদীনা শরীফ তাশরীফ নিয়ে যিয়ারত করেছেন।

(৪) ইবনে ওয়াহাব তাঁর সময় কালের মুমিনগণ শিরকী কাজে লিপ্ত মনে করে তাদেরকে মুমিন বানানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্মৃতি জড়িত ইসলামী চিহ্ন ভেঙ্গে ফেলতেন। কবরসমূহ নিশ্চিহ্ন করে কবরস্থানের বেহুরমতি করাকে জিহাদ মনে করতেন, এমন কি গম্বুদে খাদ্বরাকেও ভেঙ্গে ফেলার অপচেষ্টা করেছেন। এতে বাধাদানকারীকে মুশরিক এবং সহযোগিতা না করাকে শিরকী মনে করতেন। পক্ষান্তরে সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) কোন মুসলমানকে মুশরিক মনে করতেন না। আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে মানুষের আমল আকীদাহ সংশোধন করার চেষ্টা করতেন।

(৫) ইবনে ওয়াহাব ওয়াসিলাকে শিরক মনে করতেন, কিন্তু সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) জায়িয ও বরকতের কাজ মনে করতেন।

(৬) কোন বুযুর্গের কবরের নিকট মসজিদ নির্মাণ বা বরকত মনে করে আল্লাহর ওয়াস্তে নামায আদায় করাকে ইবনে ওয়াহাব শিরক মনে করতেন। পক্ষান্তরে সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) বৈধ মনে করতেন।

(৭) ইমাম বুসিরীর কাসীদা বুরদাহ বা এ রকম কাসীদাহকে ইবনে ওয়াহাব শিরক ফতওয়া দিয়েছেন; অথচ সায়্যিদ সাহেব এটি তবররক মনে করতেন।

(৮) মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব স্বীয় মতবাদ প্রচারে তুর্কী হুকুমত কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় মাশালিখ গোত্রের সউদ পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা করে তাদের সহযোগিতায় এক সন্ত্রাস বাহিনী গঠন করে লুঠতরাজ ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করেন এবং ইসলাম গর্হিত রাজতন্ত্র ও বাদশাহাত কায়েম করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হন। স্বীয় স্বার্থের পক্ষে না হওয়ার দরুন ইসলামী হুকুমত কায়েম করার চেষ্টা নিজেও করেননি এবং সমর্থিত সউদ পরিবারকেও ইসলামী হুকুমত কায়েমের পরামর্শ কখনও দেননি। ইবনে ওয়াহাবের মৃত্যুর পরও তার সন্ত্রাসী কর্মধারা চলমান থাকে। এমন কি ১৮০৩-১৮০৬ পর্যন্ত বাইরের দেশ থেকে এসে নিরাপদে হজ্ব পালন মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। পক্ষান্তরে সায়্যিদুল মুজাহিদীন হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়্যাত' কায়েম হবার উদ্দেশ্যে আন্দোলন করে স্বল্পকালের জন্য হলেও তা বাস্তবায়িত করেন এবং

ইসলামের স্বার্থে জিহাদ করে সদলবলে শহীদ হন। কিন্তু অন্যায়ের সামনে মাথা নত করেননি, অনৈসলামী কোন দল বা শক্তির আশ্রয় নেননি। এতে পরিষ্কার অনুমিত হয় যে ইবনে ওয়াহাবের আন্দোলন ও সায়্যিদ সাহেবের আন্দোলনের উদ্দেশ্য এক ছিল না। একটি ছিল ক্ষমতা অর্জনের জন্য, অপরটি ছিল আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য।

(৯) মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব তাকলীদকে শিরক মনে করতেন অপরদিকে সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) তাকলীদকে ফরয মনে করতেন এবং তিনি নিজে সম্পূর্ণ রূপে হানাফী মাযহাবের মুকাল্লিদ ছিলেন।

(১০) মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নজদীর সুযোগ্য পিতা, বড় ভাই ও উস্তাদগণ তাকে অভিশাপ দিয়েছেন এবং তার মূলনীতিকে ইসলাম বহির্ভূত বলেছেন। পক্ষান্তরে সায়্যিদ সাহেবের উস্তাদ তাঁর উপর খুশী হয়ে দোয়া করেছেন আল্লাহ যেন তাঁকে বেলায়েত আউলিয়া দান করেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সায়্যিদ সাহেবের মুকাবিলায় ইবনে ওয়াহাবের গুমরাহী ও ধর্মদ্রোহীতা প্রকাশ পায়। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ও হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.)-এর মধ্যে মূলনীতি হিসেবে আরও অনেক পার্থক্য রয়েছে যা উভয়ের ধর্মীয় বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই প্রকাশ পায়। ইবনে ওয়াহাবের মতবাদ অনুসারে সায়্যিদ সাহেব সম্পূর্ণ মুশরিক।

এমতাবস্থায় দু'জনের এক আন্দোলনে বিশ্বাসী হওয়ার যৌক্তিকতা নেই। উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কতিপয় ভাড়াটিয়া লোক এ ধরনের প্রলাপ বকে থাকে।

নবাব সিদ্দীক হাসান সায়্যিদ সাহেবের মুহাম্মদী আন্দোলন ইবনে ওয়াহাবের আন্দোলন থেকে পৃথক হওয়ার বর্ণনা নিম্নরূপ করেন ঃ

"আফগান সীমান্তে সায়্যিদ সাহেবের যুদ্ধ পরিচালনা দেখে কতিপয় লোকেরা তাঁর জিহাদী পদ্ধতিকে মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নজদীর আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত বলে লাগামহীন বক্তব্য ও ভিত্তিহীন লেখালেখি করেছেন। কিন্তু বাস্তবে তাঁর আন্দোলনের ধারা ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের আন্দোলনের সাথে মোটেই সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল না। জিহাদ দেখেই এরূপ ধারণা অত্যন্ত মূর্খতার পরিচায়ক, কারণ জিহাদ সব নবীদের সুন্নত, মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব জিহাদের প্রবর্তক নয়।"

কেন এই অপবাদ?

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর সুতীক্ষ্ণ ইনকিলাব, শাহ আব্দুল আযীয (র.)-এর সতর্কতামূলক ফতওয়া ও দিকনির্দেশনা এবং সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.)-এর সশস্ত্র জিহাদ-ছিল এদেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়নের সূচনা। তাই সুচতুর ইংরেজরা তা বুঝতে পেরে সায়্যিদ সাহেবের বিরুদ্ধে মুসলমানগণকে

ক্ষেপিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে তারা তাঁকে ওয়াহাবী বলে প্রচার করেছিল। কারণ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব তাঁর অনুসারীরা মুসলমানদের উপর এমন যুলুম চালিয়েছিল এবং তাদের ঈমান আকীদা নষ্ট করার অপচেষ্টায় আধাজল খেয়ে লেগেছিল যে, যার দরুন খাঁটি সুন্নী মুসলমানগণ ওয়াহাবীদের নাম শুনলেই তা প্রত্যাখ্যান করতেন। সায়্যিদ সাহেবও যাতে মুসলমানদের কাছে পরিত্যক্ত হন- এ কুমতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে তারা তাঁকে ওয়াহাবী নামে জনসমক্ষে পরিচিত করার অপচেষ্টা করেছিল এবং ইংরেজদের দ্বারা প্রভাবিত কেউ কেউ এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল।

ইবনে ওয়াহাব ছিলেন ভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত

ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রবর্তক মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নজদী সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে দারুণ মতভেদ রয়েছে। কোন কোন আলিম তাঁকে ধর্মদ্রোহী মুলহিদ, যিন্দিক হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। হানাফী ফিকহের বিখ্যাত গ্রন্থ রদ্দুল মুহতারের প্রণেতা আল্লামা শামী (র.) ইবনে ওয়াহাব সম্পর্কে উল্লেখ করেছেনঃ "আমাদের সময়ে ইবনে আবদুল ওয়াহাবের অনুসারীদের উদ্ভব ঘটেছিল, নজদ থেকে এসেছিল এরা, এরা মক্কা ও মদীনার উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। আপাতদৃষ্টিতে তারা হাম্বলী মাযহাবকে সমর্থন করেছিল, কিন্তু তারা দাবী করত যে, তারাই মুসলমান, তাদের বিরোধিতা যারা করবে তারা মুশরিক। এজন্য তারা আহলে সুন্নাত (সুন্নী) দেরকে হত্যা করা বৈধ মনে করেছিল। অনেক আলেমদেরকেও হত্যা করেছিল। পরিশেষে আল্লাহ তাদের বিষঁদাত ভেঙে দিয়েছেন। ছিন্নভিন্ন হয়েছিল তাদের আবাস। সাধারণ মুসলমান মুজাহিদরা তাদের উপর সফলতা লাভ করেছিল। ইহা ছিল ১২৩৩ খৃস্টাব্দের ঘটনা।"

ওয়াহাবী মতাদর্শী ছাড়া অন্য কাউকে তারা মুসলমান মনে করত না বিধায় কেবল তাদের অনুসারীদের জন্যই দোয়া করত। কিতাবুত তাওহীদ-এর শরাহ ফতহুল মজীদ শরহে কিতাবুত তাওহীদ এর ভূমিকায় বলা হয়েছে ঃ "অতঃপর বস্তুত তাওহীদের কিতাব যা ইমাম শায়খুল ইসলাম (শেখ নজদী) লিখেছেন।

আল্লাহ তাকে বিনিময় ও সওয়াব দান করুন এবং তাকে আল্লাহ ক্ষমা করুন যিনি তার দাওয়াত বা মিশনকে সমর্থন জানিয়েছেন, এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত যারা সমর্থন করবে তাদের জন্য এ দোয়া রইল।"

আল্লামা শামী (র.)-এর কথা কে ওয়াহাবীরা অতিরঞ্জন করে ব্যক্ত করলেও ফতহুল মজীদের লেখক আব্দুর রহমান ইবনে হাছানের দোয়া থেকে ইমাম শামীর কথার সত্যতা প্রমাণ হচ্ছে। তাই শামীর উক্তিকে অতিরঞ্জন বলে ফেলে দেওয়া যাবে না। তাছাড়া তৎকালীন বৃটিশ গোয়েন্দা কর্মকর্তা মিস্টার হেম্পার-এর

ডায়েরীতে ইংরেজদের পক্ষ হতে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবকে ছয়টি কর্মসূচী দেওয়ার উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে দুইটি বাস্তবায়িত করতে ইবনে ওয়াহাব দুঃসাহস না দেখালেও বাকী চারটি বাস্তবায়নে প্রাণপণে চেষ্টা করেন। সে চারটি কর্মসূচি হল :

১) ইবনে ওয়াহাবের মাযহাবে যারা শামীল হবে না তাদেরকে কাফির মুশরিক বলা এবং তাদের সম্পদ ও মান-ইজ্জত বিনষ্ট বৈধ বলে মনে করা।

২) আরব উপজাতীয়দেরকে ওসমানিয়া খলীফার আদেশাবলী পালন থেকে বিরত রাখা।

৩) রাসূল (সা.) ও তাঁর খলীফাদের এবং বিশেষ করে মহৎ ব্যক্তিদের সম্মান ক্ষুন্ন করা এবং শিরক ও মূর্তি পূজার দোহাই দিয়ে ইসলামের স্মৃতি বিজড়িত চিহ্নসমূহ বিশেষভাবে মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ এ অন্যান্য শহরে যতটুকু সম্ভব মাযার ও কবরগুলো ধ্বংস করা।

৪) যতটুকু সম্ভব বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে ফিতনা-ফাসাদ ছড়ানোর চেষ্টা করা। উপরোল্লেখিত কর্মসূচীগুলো ইবনে ওয়াহাব যথাসাধ্য বাস্তবায়িত করেছেন। তাঁর জীবনের তথাকথিত সংস্কারসমূহ এ চার মূলনীতির বহিঃপ্রকাশ বলে সর্বত্র দেখা যায়। যে দুটি কর্মসূচী তিনি বাস্তবায়িত করতে সাহস করেননি সেগুলি হল ঃ

১) আধুনিকতার নামে নতুন ব্যাখ্যার মাধ্যমে কুরআনে পরিবর্তন সাধিত করা।

২) মূর্তি পূজার প্রহসনে পবিত্র কাবা ঘর ধ্বংস করা।

এ দুটি কর্মসূচী পূর্ণ বাস্তবায়িত না হলেও হজ্জ থেকে বিভিন্ন দেশের মুসলমানদেরকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে এবং কুরআন শরীফেরও অপব্যাখ্যা করার অপচেষ্টা চলেছে। যেহেতু ইবনে ওয়াহাবের জীবনের কার্যাবলীর মাধ্যমে উপরোল্লিখিত কর্মসূচীর প্রতিফলন ঘটেছে তাই তাকে সন্দেহমুক্ত ও বিতর্কের উর্ধ্বে বলা যায় না।

ইবনে ওয়াহাবের ভ্রষ্টতার অন্যতম প্রমাণ তিনি নজদের বনী তমীম গোত্রের লোক। নজদ প্রদেশ ও বনী তমীম গোত্র সম্পর্কে রাসূল (সা.)-এর ভবিষ্যৎবাণী নিম্নরূপঃ

হুনাইনের যুদ্ধের পর রাসূল (সা.) গনীমতের মাল বন্টন করেছিলেন, সে সময় জুল খোইসারাহ তামীমী নজদী যার নাম হারকুস বিন জুহাইরা, দাঁড়িয়ে বলল ঃ 'হে মুহাম্মদ! তুমি ইনছাফ কর। আমি জানি তুমি ইনছাফ করতে পারবে না।' রাসূল (সা.) একথা শুনে বললেন ঃ আমি যদি ইনসাফ না করতে পারি কে ইনসাফ করবে? এরপর রাসূল (সা.) ফরমালেন ঃ আমার মেহমান এ লোক থেকে এক কওম অচিরেই বের হবে; যারা দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে যেমন ধনুক থেকে তীর বের হয়। আমি যদি পেতাম তবে অবশ্যই তাদেরকে হত্যা করতাম যেমন সামুদ জাতিকে হত্যা করা হয়েছে।

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় নজদের বনী তামীম গোত্র থেকে ইসলামের নামে ধোঁকাবাজ লোক বের হবে যাদেরকে প্রতিহত করা অত্যাবশ্যকীয়। অপর হাদীস দ্বারা বুঝা যায় নজদ প্রদেশের মানুষের মধ্যে ইসলামের স্থিতিশীলতা থাকবে না এবং শয়তানের স্ব-পক্ষে ও ইসলামের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠবে। আর বাস্তবিক তাই হল। কারণ মিথ্যা নবুওতীর দাবীদার মুছাইলামাতুল কাজ্জাব নজদের বনী তমীম গোত্রের লোক, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবও বনী তমীম গোত্রের লোক এবং তার দ্বারা যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তা সর্বযুগের জমহুর মুসলমানের আকীদাহ বিশ্বাসের পরিপন্থী এবং তার নেতৃত্বে অগণিত সুন্নী মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে যার প্রমাণ তার আন্দোলনের ইতিহাসে বিদ্যমান।

আজও তার আকীদা বিশ্বাস প্রচার করে তার অনুগামীরা বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহে বিভিন্ন ধরনের দল উপদল সৃষ্টি করছে, ফিতনা ফাসাদের প্রসার ঘটাচ্ছে।

ইমাম আবুল ফাত্তাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল করীম শাহরিস্তানী তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ নিশ্চয় পন্ডিতগণ মাযহাবের ক্ষেত্রে দিয়ানত (দ্বীন) ও প্রবৃত্তির অনুসারীগণের দিক থেকে বিভক্ত হয়েছেন, বস্তুত মানুষ যখন কোন আকীদার অনুসারী হয়, অথবা কোন কথা বলে তখন তার দুটি দিক থাকে-হয় তার থেকে অন্য কেউ উপকার পাবে, অথবা তার সিদ্ধান্তে নতুনত্ব বা মনগড়া কিছু পাওয়া যায়। যে উপকার পায় সে মু'মিন দ্বীনের অনুসারী। এটা ইতায়াত (অনুসরণ)। আর নতুনত্বের অনুসারী সে-ই বিদআতের অনুসারী।

ইবনে ওয়াহাবের ফতওয়াসমূহ এবং আকীদা বিশ্বাস সম্পূর্ণ সলফ ও খলক-এর পরিপন্থী। তাই সে অনুপাতে ইবনে ওয়াহাব ভ্রষ্ট ও বিভ্রান্তের অন্তর্ভুক্ত। সর্বোপরি মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব সম্পর্কে তার সময় থেকে এখন পর্যন্ত যারা দ্বিমত পোষণ করেছেন তাঁদের দলীল প্রমাণাদি অকাট্য। অধিকন্তু তার সকল কার্যকলাপও ইলহাদ ও যিন্দিকিয়তের দিকে ধাবিত। বিশেষ ভাবে লাগামহীন ভাষায় দুনিয়ার মুসলিমদেরকে কাফির ও মুশরিক সাব্যস্ত করে তিনি বিশ্ব মুসলিম ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করেছেন যা পূর্বেকার খারিজী, মুতাজিলা প্রকৃতি ভ্রান্ত দলসমূহের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। তাই কোন ক্রমেই তাকে ইসলাম ও মুসলমানের মিত্র বলা যায় না।

উপসংহারে বলা যায়, যেহেতু নবী (সা.) ফরমায়েছেন ঃ 'বস্তুত আমি গুমরাহ পথভ্রষ্ট জাতি থেকে ভয় করি'। অন্য বর্ণনায় আছে- 'তোমরা বক্র হাকীমের সংশ্রব থেকে দূরে থাক কেননা শয়তান বিজ্ঞ হাকীমের ভাষায় কথা বলে।'

অতএব মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব বা তার অনুসারীদের প্ররোচনা থেকে দূরে থাকা এবং তাদেরকে প্রতিহত করা সকল মুসলমানের জন্য অত্যাবশ্যকীয়

এবং সায়্যিদুল মুজাহিদীন আমীরুল মুমিনীন সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (র.)-এর আদর্শে বায়আত হয়ে ইসলামী হুকুমত কায়েম তথা-ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ-এর জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য করণীয়। (সংক্ষেপিত)

তথ্যসূত্রঃ

১. সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) - মাওলানা গোলাম রসূল মেহের
২. তারিখে দাওয়াত ও আজিমত- মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী
৩. কিতাবুত তাওহীদ- মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নজদী
৪. ফতহুল মজীদ শরহে কিতাবুত তাওহীদ-আবদুর রহমান
৫. বুখারী ও মিশকাত শরীফ
৬. মিরকাতুল মাতাফীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ- আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র.)
৭. ওয়াহাবী আন্দোলন -আব্দুল মওদুদ
৮. মজমুওয়াতুত্তাওহীদ

সংগ্রহ : বালাকোট-চেতনা উজ্জীবন পরিষদ, সম্মেলন স্মারক ২০১৬

হযরত সায়্যিদ আহমদ বেরেলভী (র.) ও উপমহাদেশের সুন্নিয়াত

ড. মাওলানা এ. কে. এম মাহবুবুর রহমান

ভারত উপমহাদেশের ইলমী মারকায বা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র দিল্লী এক সময় সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। আরব-আজম-ইরান-তুরানসহ বিশ্বের সকল দেশের ছাত্ররা ছুটে আসত দিল্লীতে। এ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, তরীকতের মহান মুর্শিদ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.)। এই মারকায যাঁর অবদানে বিশ্ব জোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে তিনি ছিলেন ইমামে আহলে সুন্নত, ইমামুল মুহাদ্দিসীন হযরত শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)। প্রিয় নবীর প্রেমের ফলগুধারা যার জীবনে ছিল সদা প্রবাহমান। শরীআত ও তরীকতে তাঁরই সুউচ্চ মাকামের ফয়েয ও বরকতে ধন্য হয়ে যে সকল ছাত্র, খলীফা, মুরীদ, মুজাহিদ শরীআত, তরীকত, হাকীকত ও মারিফাতের উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে সমগ্র দুনিয়ায় খ্যাতি অর্জন করেছেন হযরত সায়্যিদ আহমদ বেরেলভী (র.) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। বৃটিশ খেদাও আন্দোলনের মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জেহাদে যারা সিপাহসালারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন সায়্যিদ ছাহেব (র.) ছিলেন তাদের রাহবার ও সেনাপতি। হযরত সায়্যিদ আহমদ বেরেলভী (র.) ছিলেন আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত ও নূরনবীর নূরের ফয়েযে ইলমে লাদুন্নীর অধিকারী এক বিরল ব্যক্তিত্ব। যেমনিভাবে বিশ্ব বিখ্যাত ওলী হযরত আবুল হাসান খিরকানী (র.) কোনরূপ কিতাবের ইলমের সনদধারী না হয়েও ইলমে লাদুন্নীর ধারক বাহক হয়ে কুতুবে যামান ছিলেন। যার জুতা মুবারক কাঁধে নিয়ে ধন্য হয়েছেন দুনিয়ার সর্ব প্রথম শাইখুল ইসলাম লকবপ্রাপ্ত হযরত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর মত মহান ব্যক্তিত্ব।

হযরত সায়্যিদ আহমদ বেরেলভী (র.) ছিলেন হযরত শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-এর অন্যতম খলীফা। শরীআত, তরীকত, হাকীকত ও মারিফাতে সুউচ্চ মাকামে আরোহন করিয়ে বেলায়েতের মুর্শিদ হওয়ার জন্যই শাহ ছাহেব (র.) তাকে খিলাফত দান করেছেন। সায়্যিদ ছাহেব (র.)-এর সবচেয়ে

বিস্ময়কর দিক হল তার মুর্শিদের আত্মীয় স্বজনকে বায়আত করার অনুমতি লাভ করেন তিনি। হযরত শাহ আহলুল্লাহ (হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.)-এর ভাই) দৌহিত্র মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ (র.), হাকীম মুগীসুদ্দীন, কান্দালার মুফতী এলাহী বখশ, বিশ্ববিখ্যাত আলিম হযরত মাওলানা আবদুল হাই (র.) এর মত ব্যক্তিত্ব সায়্যিদ (র.) ছাহেবের মুরীদ হয়ে নিজেদের ধন্য করেছেন।

আবদুল ওহাব নজদীর নতুন ইসলামের তথা ওহাবী আন্দোলনের সাথে সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.)-এর জিহাদ আন্দোলনের কোন সম্পর্ক নেই। তাঁর সামগ্রিক কর্মকান্ডের কোথাও ওহাবী আকীদা বাস্তবায়নের নজীর খুজে পাওয়া যায় না। বালাকোটের ময়দানে শাহাদত বরণের পর তাঁরই সুযোগ্য খলীফা হযরত নূর মুহাম্মদ নেজামপুরী (র.) ও হযরত কারামত আলী জৌনপুরী (র.)-এর বিশ্বব্যাপী জিহাদ ও দাওয়াতেরও কোথাও ওহাবী আকীদার সামান্যতম সাজুয্য দেখা যায় না। সুফী নিজামপুরী (র.) এর সুযোগ্য খলীফা রাসূলেনোমা হযরত সুফী ফতেহ আলী ওয়াইসী (র.) এবং ফুরফুরা শরীফের হযরত আবু বকর ছিদ্দিকী (র.) সহ ৩৫ জন খলীফা, পরবর্তীতে ছারছিনার হযরত নেছার উদ্দিন (র.) এবং তার সিলসিলাভূক্ত লক্ষ লক্ষ আলিম ওয়াহাবী নজদী আকীদার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন এবং বর্তমানেও অনন্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন। অপরদিকে হযরত কারামত আলী জৈনপুরী (র.)-এর সিলসিলার হযরত বদরপুরী (র.) ও ছাহেব কিবলা ফুলতলী হযরত মাওলানা আবদুল লতীফ চৌধুরী (র.) সহ হাজার হাজার আলিম পীর, মাশায়িখ ওহাবী নজদী আকীদার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন এবং উভয় সিলসিলার প্রতিষ্ঠিত ৮ হাজারেরও অধিক মাদরাসার লক্ষ লক্ষ শিক্ষক পীর মাশায়িখ ওহাবী নজদীদের বিরুদ্ধে সদা সোচ্চার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের বাস্তব চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রতীয়মান হবে যে, ফুরফুরা, ছারছীনা ও জৌনপুরী খান্দানের অবদানে এখনো এদেশে রাসূল-প্রেম এবং তরীকতের কর্মতৎপরতা টিকে আছে।

এখন প্রশ্ন হল যারা সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.)-এর বিরোধিতা করছেন তাঁকে ওহাবী বলে অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্য আর যাই হোক না কেন, তারা বাংলাদেশে বিরাজমান সুন্নীয়তের স্বপক্ষে যারা কাজ করছেন, যারা তরীকতকে বিশ্বাস করছেন, মাযহাব মানছেন, মীলাদ কিয়াম করছেন, পীর বুযুর্গগণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছেন, তাদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করছেন। ইতিহাসের আয়নায় যদি আমরা বাস্তব অবস্থা অবলোকন করি তাহলে দেখতে পাই ইসমাঈল শহীদের লেখা তাকভীয়াতুল ঈমান গ্রন্থের বক্তব্যকে তার সমসাময়িক গুটি কতক লোক ছাড়া কেউ সমর্থন করেনি। পরবর্তীতে ওহাবী আকীদা ধারক-বাহকরাই উদোর পিন্ডি বুদোর ঘারে চাপিয়ে দেয়ার জন্য একজন মুরীদের লেখার উপর ভিত্তি করে পীরের উপর সব দোষ চাপানোর চেষ্টা

করেছেন। এর ঐতিহাসিক কারণ আছে। এ প্রসঙ্গে ইসলামী বিশ্বকোষ ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩০৭ এ বর্ণিত ভাষ্য নিম্নরূপঃ-"বৃটিশ ভারতের রায়বেরলী জিলার অধিবাসী সায়্যিদ আহমদ (র.) কর্তৃক ভারতে ইসলামী সরকার আন্দোলন পরিচালিত হয়। আরব দেশীয় ওয়াহাবী আন্দোলনের সহিত ভারতীয় সংস্কার ও আযাদী আন্দোলনের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আযাদী আন্দোলনকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার আরব দেশীয় সংস্কার আন্দোলনের সহিত যুক্ত করিয়া ইহাকে ওয়াহাবী আন্দোলন নামে অভিহিত করে। কারণ ওয়াহাবীগণ তখন ইসলামী দুনিয়ার খলীফা তুরস্কের সুলতানের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছিল। দিল্লীর বিখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) ও তাহার পুত্র- পৌত্র বংশের সংস্কারমূলক প্রচারে উদ্বুদ্ধ হইয়া সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এই আন্দোলন শুরু করেন।"

ইসলামী বিশ্বকোষের এ গবেষণামূলক বক্তব্যে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, ওয়াহাবী আন্দোলনের সাথে সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.)-এর আন্দোলনের কোন সম্পর্ক নেই। বরং হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (র.) শাহ আবদুল আযীয দেহলবী (র.) ঘোষিত বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনকে শাণিত করেছেন হযরত সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.)। সায়্যিদ আহমদ (র.) সে সময় যখন "তারগীবুল জিহাদ" নামীয় ঘোষণাপত্র জাতির সামনে উপস্থাপন করেন তখনই ইংরেজরা এ আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য নানামুখী ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে, অপর দিকে শিখ সম্প্রদায় মুসলমানদের উপর অত্যাচারের মাত্রা চরম সীমায় পৌঁছায়। এ সময় প্রথমে শিখদের শক্তি খর্ব করার জন্য শিখদের প্রবল প্রতিরোধ পর্যুদস্ত করে সায়্যিদ আহমদ (র.) ১৮৩০ খ্রী: এর শেষভাগে পেশওয়ার দখল করতে সমর্থ হন। বৃটিশ বেনিয়া গোষ্ঠীর কুটকৌশলে মুজাহিদ বাহিনীর মাঝে সুন্নী ওয়াহাবীর মানসিক দ্বন্দ্ব ও এক শ্রেণীর মুনাফীকের ষড়যন্ত্রের ফলে ১৮৩১ খ্রী. ৬ ই মে বালাকোটের ময়দানে সায়্যিদ ছাহেব (র.) শাহাদাত বরণ করেন।

সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.)-এর খলীফা মুরীদ ভক্তদের মধ্যে বিশেষ করে হযরত সুফী নেজামপুরী (র.) ও হযরত কারামত আলী জৈনপুরী (র.) এর সিলসিলার কেউই ওয়াহাবী আকীদা পোষণ করেন না। শুধু তাই নয় বরং তাদের সমগ্র জীবন এ সকল বাতিল আকীদার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অতিবাহিত হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে। পরিশেষে বলতে চাই, যারা শানে রিসালাতের আওয়াজকে বুলন্দ করছেন, মীলাদ কিয়াম করছেন, তরীকতের প্রচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, যারা প্রিয়নবী নূর নবী (সা.) কে হায়াতুন্নবী, শাফাতের কান্ডারী মনে করেন তাদেরকে ঢালাওভাবে ওয়াহাবীদের কাতারে ফেলে গুটি কতেক লোককে খাঁটি সুন্নী দাবী করার অর্থই হল সুন্নিয়্যাতের শক্তিকে দুর্বল করা আর ওয়াহাবীদের

বাতিল আকীদা প্রচারের সুযোগ করে দেয়া। তাই আসুন, বাস্তবতার আলোকে আমরা সুন্নী জগৎ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঈমান ও আকীদাকে সংরক্ষণ করি। আল্লাহ আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাওফীক দিন। আমীন।

[লেখক : অধ্যক্ষ, ফরিদগঞ্জ কামিল মাদরাসা, চাঁদপুর]
সংগ্রহ : বালাকোট-চেতনা উজ্জীবন পরিষদ, সম্মেলন স্মারক ২০১৬

হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহ.)

আহমদুল ইসলাম চৌধুরী

হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহ.) ২৯ নভেম্বর ১৭৮৬ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান এলাকায় একজন নবীর কবর রয়েছে বলে জানা যায়। তাঁর বংশ তালিকা আমিরুল মোমেনীন হযরত আলী (রহ.)'র সাথে মিলিত। ভারতবর্ষের মুসলমানগণের চরম প্রতিকূল অবস্থায় বর্তমান পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত আজাদ-কাশ্মীর বালাকোটে ধর্মীয় যুদ্ধে তিনি শহীদ হন ১৮৩১ সালে। মোঘল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের ইন্তেকালের সাথে সাথে দুর্বল শাসনের সূত্রপাত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর উত্থান। তারা সমস্ত অমুসলিমদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা করত। যত দিন গড়ায় মুসলমানরা ধর্মপালনসহ নানান দিক দিয়ে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে থাকে। যা সৈয়দ আহমদ শহীদকে দাহ করছিল। ফলে তিনি হজ্ব থেকে এসে ধর্মীয় যুদ্ধের দিকে ধাবিত হন।

তিনি ছিলেন হযরত শাহ আবদুল আজিজ দেহলভী (রহ.)'র খলিফা। তাঁর পীর ও আব্বা হচ্ছেন হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (রহ.); তাঁর পীর ও আব্বা হযরত শাহ আবদুর রহিম মুহাদ্দেস দেহলভী (রহ.)। দিল্লির প্রানকেন্দ্রে জামে মসজিদ থেকে মাত্র ২ কি.মি দূরত্বে মেহেদীয়ানে রহিমিয়া মাদ্রাসা কমপ্লেক্স। এখনকার মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানে এ মহান তিন দরবেশ, সংস্কারক এবং তাঁদের পরিবার পরিজন শায়িত।

হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহ.) কে কেউ কেউ ওহ্হাবী বলে নানা প্রচারণা চলতে থাকে।

বস্তুতঃ হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহ.) আমাদের এ উপমহাদেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে হযরত শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দেস দেহলভীর অন্যতম খলিফা। এক শ্রেণীর লোক ইংরেজ লেখক হান্টারের সুরে সুর মিলিয়ে হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহ.)'র আন্দোলনকে মুহাম্মদ ইবন আবদুল ওহ্হাব নাজদী কর্তৃক পরিচালিত ওহ্হাবী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করে তাঁর আন্দোলনকে কলুষিত করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে থাকেন। প্রফেসর ড. মঈন উদ্দিন আহমদ খান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক। তিনি ২৮ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দ ৯৫ বছর বয়সে চট্টগ্রামের ইন্তেকাল করেন। তাঁর পি, এইচ, ডি থীসিসে (History of the Faraidi Movement) ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যের আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করে যুক্তির কষ্টি পাথরে হান্টার ও তাঁর শিষ্যদের দাবীর মূলোৎপাটন করেছেন।

মূলতঃ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহ্হাব (১৭০৩-১৭৯২) মরমীবাদ (Mysticism) এর ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং হাম্বলী মাজহাবের ছদ্মাবরণে তাঁর আন্দোলন পরিচালনা করে গেছেন। অপরদিকে হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহ.) ছিলেন ইসলামী তাসাউফের ইমাম। শরীয়ত ও তরীক্বতের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। তিনি তরীকতের জন্য 'রাহ-ই বিলায়াত' এবং শরীয়তের জন্য 'রাহ-ই নুবুয়াত' পরিভাষাদ্বয় ব্যবহার করেছেন। তিনি তাঁর সংস্কার আন্দোলনকে 'তরিকা-ই মুহাম্মদিয়া' নাম প্রদান করে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (রহ.) (১৭০৩-১৭৬৩) এর আন্দোলনের আদলে পরিচালনা করেছেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষে ইংরেজদের দমন নিপীড়ন বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। সে সুযোগে কড়া সুন্নিরা হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহ.) আন্দোলনে তথা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে যারা জীবিত আছেন তাদের প্রতি অত্যাধিক তাচ্ছিল্য আচরণ শুরু করে।

১৮৭০ সালে কলকাতা হাইকোর্টে "গ্রেট ওহ্হাবী মামলা" পরিচালিত হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ যারা সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহ.) এর সংস্কার আন্দোলনের অনুসারী ছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে 'ওহ্হাবী পরিভাষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এবং আদালতে নিবেদন করেন যে, তারা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহ্হাবকে তাদের নেতা হিসেবে সম্মান প্রদর্শন করেন না। তারা আদালতের কাছে তাদেরকে সুন্নি হিসেবে আখ্যায়িত করার আবেদন রাখেন।

In the 'great Wahhabi case' of A.D 1870 In the calcutta high Court, the accused persons who were the follower's of the Sayyid's reform movement, protested against the term Wahhabi applied to them and submitted that they did not regard mohammad Ibn Abdul-Whhab as their leader. They appealed to the judge to refer to them as sunni, i.e. the followers of the tradition of the prophet, as distinguished from bid'ati or the follower of sinful innovation. (History of Fara'idi Movement, Dr. M. A. Khan-xxxix)

উল্লেখ্যযোগ্য, মুমতাযুল-ফুকাহা হযরত মাওলানা আবদুল আউওয়াল (রহ.) মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া দারুল উলুম চট্টগ্রাম এবং মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহ শর্ষিনা ১৯৩২ সালের ৫ ডিসেম্বর ১০টি বিষয়ের উপর একটি যুক্তিপূর্ণ ফতোয়া প্রদান করেন। এতে প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে গিয়ে হযরত আল্লামা আবদুল

আউয়াল (রহ.), হযরত ইমামে রব্বানী মুজাদ্দেদে আল ফেসানী (রহ.), হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (রহ.), শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দেস দেহলভী (রহ.), হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহ.), হযরত হাজী শাহ ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী (রহ.) প্রমুখের বেলায়াতে সন্দেহ নেই বলে উল্লেখ করেন।

উক্ত ফতোয়ায় চট্টগ্রাম অঞ্চলের সেই সময়কার প্রখ্যাত সর্বজনবিদিত ব্যক্তিগণ স্বাক্ষর রেখে গেছেন। যথা-হযরত সৈয়দ আবদুল হামিদ বাগদাদী (রহ.), হযরত মাওলানা আবদুল হামিদ ফখরে বাংলা (রহ.), হযরত শাহ মাওলানা নজির আহমদ (রহ.), হযরত মাওলানা সৈয়দ আজিজুল হক আল কাদেরী শেরে বাংলা (রহ.), মুফতিয়ে বাংলা হযরত মাওলানা সুফি আহসান উল্লাহ (রহ.), হযরত মাওলানা মীর মাসউদ আলী (রহ.), হযরত মাওলানা আবুল ফজল মুহাম্মদ ইদ্রিস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

উল্লেখিত চট্টগ্রাম অঞ্চলে মহান আরিফ ও অভিজ্ঞ ওলামায়েকেরাম হযরত সৈয়দ শহীদ আহমদ শহীদ (রহ.)'র বেলায়েতে ইতস্ততা নেই বলে আস্থা জ্ঞাপন করেন।

বস্তুতঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ে ব্রিটিশ ফ্রান্সের সহযোগিতায় উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্রগুলো নিজেরা রাজতন্ত্র লাভ করে। ১৯৩০ এর দশকে তেল প্রাপ্তি হয়: এতে অঢেল ধন সম্পদের মালিক হয়। তাদের হারানো ওহাবী আন্দোলন চাঙ্গা করতে সচেষ্ট। সে লক্ষ্যে তারা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় বই পুস্তক চাপিয়ে বিনামূল্যে বিলি বন্টন করতেছে। আমাদের দেশের উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ এবং ভারত থেকে শত শত আহলে হাদীসপন্থিরা সৌদি আরবসহ আরব রাষ্ট্রে গিয়ে সম্মানজনক পদে অসীন। ফলে আমাদের বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষে ১৯৮০ এর দশক থেকে আহলে হাদীসপন্থিরা দ্রুত বিস্তার লাভ করতেছে। এতে আমরা যারা সুন্নি, সুফি, তরিকত, মাজহাব নিয়ে আছি আমাদেরকে সচেতন জীবন পরিচালিত করতে হবে। পরিচালিত করতে হবে কুরআন সুন্নাহর আলোকে জীবন। আমাদের উঠতি বয়সী সন্তানেরা আমাদের সুফিজম, তরিকত মাজহাবকে ইসলামের পরবর্তী আর্বিভাব বলে মনে করতেছে। এর জন্য আমরা কতটুকু তা, দায়মুক্ত ভাবতে হবে। যে হারে বাংলাদেশে ওহ্হাবী বা আহলে হাদীস বা সালাফীর দ্রুত বিস্তার করছে, জানি না আমাদের অবর্তমানে এদেশের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহ.) একজন তরিকতের শাইখ, মুহাম্মদীয়া তরিকার ইমাম, তার উদার মতাদর্শের সুযোগে এক শ্রেণীর লোকেরা তাকে ও তাঁর অনুসারীগণকে ওহ্হাবী বলে মন্দ বলা তাদের জন্য দুর্ভাগ্যের বিষয়।

হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহ.) ও তাঁর সাথে বালাকোট যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মহান শহীদগণকে মহান আল্লাহ পাক জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুক। আমিন।

মোজাদ্দেদ সাহেব প্রসঙ্গে

মুহাঃ মুবারক আলী রহমানী

অপবাদ খন্ডন আজ থেকে ৮৫/৯০ বছর আগের কথা। পাক-ভারতের অদ্বিতীয় পীর ও মুর্শিদ মোযাহেদে আযম, মোজাদ্দেদ হযরত সৈয়দ আহমাদ বেরেলী শহীদ রহমাতুল্লাহ সম্বন্ধে রংপুরের মৌলভী শেহাবুদ্দীন সাহেব (রাঃ) তাহকিকাতে শেহাবিয়া নামে কেতাব লিখে মুসলিম জনমানসে অপপ্রচার করেছিল সে সময় ফুরফুরা শরীফের আলা হযরত মোজাদ্দেদে যামান পীর আবু বকর সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহির অন্যতম বিশিষ্ট খলিফা ফকিহ, মোহাদ্দেস, আল্লামা পীর মাওলানা রূহল আমীন (রাঃ) তার দাঁত ভাঙ্গা জওয়াবে 'রদ্দে-হাফায়াতে শেহাবিয়া (রদ্দে বেদয়াত ৪র্থ ভাগ) কিতাব প্রকাশ (১৩৩৭ সন) করেন এবং কারামতে আহমদীয়া লেখেন। অদ্যবধি মৌলভী শেহাবুদ্দীন প্রমুখেরা টুশব্দটি আর করেননি।

ইদানিং কতিপয় ব্যক্তি 'মোজাদ্দেদ' সৈয়দ আহমদ শহীদ রহমাতুল্লাহ সম্বন্ধে অতি নিম্নমানের পরিচয় দিয়ে মুসলিম জন মানসে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপকৌশলে লিপ্ত হচ্ছে।

"তিনি 'নিরক্ষর' যোদ্ধা ছিলেন, তার কাছে মানুষ জিহাদের বায়াআত গ্রহণ করেছিল প্রভৃতি। তারা মনে করেন, হাজীউল হারামাঈন হযরত মাওলানা শাহ সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (রাঃ) -এর পীর ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন যুদ্ধের সহচর বা সেনানী। তিনি হযরত সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভী (রাঃ) এর খলিফা ছিলেন না। বেরেলভী (রাঃ) পীরের উপযুক্ত ছিলেন না, তিনি ছিলেন মূর্খ।"

গত ২০১৬ সালের ২৮শে অক্টোবর (১৩ই কার্ত্তিক ১৪২৩) নিজামপুরে হযরত শাহ সুফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (রাঃ) এর বার্ষিক মাহফিলে হযরতের মাজার সংলগ্ন মসজিদে বাদ জুমআ অনুষ্ঠান শুরুতে সভা পরিচালক সুফীয়া মদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা যিনি ফুরফুরা শরীফের পীর, মোজাদ্দেদে যামান (রাঃ) এর বিশিষ্ট খলিফা। প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা আব্দুল গণি (রাঃ) এর পৌত্র মাহফিল পরিচালক (মাওলানা রেজাউল করিম সাহেব) সরাসরি ঘোষণা করেন, "সূফী নূর মহাম্মদ নিজামপুরী (রাঃ) হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলী (রাঃ)'র খলীফা ছিলেন না। তাঁর কাছে জেহাদের বায়াত নিয়েছিলেন। তিনি

নিরক্ষর ছিলেন ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে সভায় গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়। এমনকি প্রতিবাদ ওঠে। মাগুরার কাজলা নিবাসী জনাব গোলাম রসুল সাহেব তীব্র প্রতিবাদ করেন। সভা পরিচালকের ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ কল্পে আমি রহমানী মসজিদের ভিতর প্রবেশ করি। ইতি মধ্যে ২-১ জন মৃদু প্রতিবাদ করেছেন। অন্যান্য বছরের ন্যায় ঐ সময় আমাকে আর বলার জন্য সময় দিলেন না। সে সময় আমি বলেছিলাম। আজ কিছু বলার সুযোগ দিলেন না, খোদা চাহে তো আগামী মাহফিলে বই আকারে ইনশাআল্লাহ জওয়াব দেশবাসীদের খেদমতে পেশ করব। আল্লাহ পাকের শাহী দরবারে লাখো শুকরিয়া যে, সংক্ষেপ আকারে হলেও সুফী হযরত ওয়সী (রা:) এর পীর ও মুর্শিদ হযরত শাহ সুফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী (রা:) এর পীর হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রা:) এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলাম। আফসোস 'ঘর মে আগ লাগগ্যায়ী আপনা চেরাগ ছে।"

বঙ্গের হাদী, হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রা:) সাহেব 'মোকাশফাতে-রহমত' কেতাবের ২৫/২৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

"এই সময় সুন্নত জারি করিতে ও বেদায়াত লোপ করিতে সময়ের উপযোগিতা ইহা হচ্ছে যে, হযরত সাইয়্যেদ আহমদ (রা:) এর তরিকায় দাখিল হয়। কেননা উক্ত জনাব সাইয়্যেদ সাহেব উচ্চ বংশধর হানাফী মজহাবালম্বী মোজাহেদ, শহীদ, আলেমে রাব্বানী। এই জামানার মোজাদ্দেদ ও অতি সাহেবে তাছির। তার হাদিস, তফসির ও তরিকতের সিলসিলা সাইয়্যেদোল ওলামা, সুলতানুল আওলিয়া হুজ্জাতোল্লাহিল আলাল-আলামিন, ওয়ারেসোল আম্বিয়ায়েল মোরসালীন, হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল আযীয (রা:) মোহাদ্দেস দেহলবী (রা:) এর সহিত মিলিত হয়। আর এই সিলসিলা অতি প্রসিদ্ধ ও বিশ্বাসযোগ্য। এই দেশের সমস্ত মোহাদ্দেস ও মোফাচ্ছেরের সিলসিলা তার সাথে মিলিত হয় আর প্রশংসিত মোহাদ্দেস, হযরত সাইয়্যেদ আহমাদ (রা:) সাহেবকে নিজের সমস্ত জাহেরী ও বাতেনী নিয়ামত দান করে তাঁকে নিজের খাস খলিফা করেছিলেন। আরও সাধারণ লোকদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, সাইয়্যেদ সাহেব ইলম জানতেন না, ইহা ভ্রান্তিমূলক কথা।

এর মূল বৃত্তান্ত এই যে, সাইয়্যেদ সাহেব নিজ মোর্শেদ প্রশংসিত মোহাদ্দেস সাহেবের মাদ্রাসায় জাহেরী ইলম শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেছিলেন, এক দিবস উক্ত মোহাদ্দেস সাহেব হযরত সাইয়্যেদ সাহেবের ইলমে-লাদুন্নির যোগত্য দর্শন করে তাকে কেতাব পড়া বন্ধ করে দিলেন এবং বাতেনী ইলম শিক্ষা দিতে মনোনিবেশ করিলেন। ইহা প্রশংসিত হযরতের শিক্ষা প্রদানের বরকতে উল্লিখিত হযরত মোজাদ্দেদ সাহেব অবশিষ্ট সমস্ত জাহেরী ইলম শিক্ষা প্রাপ্ত হন।

রদ্দে হাফাওয়াতে সেহারিয়া বা রদ্দে-বেদয়াত ৪/১১২-১১৩ পৃষ্ঠা। সওয়ানেহে আহমদীর ৮ পৃষ্ঠায় আছে।

তিনি (সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভী সাহেব (রাঃ)) কোরআন ও হাদিসের অর্থ বুঝার উদ্দেশ্যে কিছু নাহু সরফ শিক্ষা করলেন এবং মেসবাহ কেতাব পর্যন্ত তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন, এক রাতে যখন তিনি উক্ত কেতাব পড়তে ছিলেন, উহার একটি অক্ষরও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। কেবল কেতাবের কাল পৃষ্ঠা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। তখন তিনি ধারণা করলেন যে দর্শন শক্তির হ্রাস হওয়া সংক্রান্ত কোন পীড়া সৃষ্টি হয়েছে। তখন তিনি প্রভাতে মাওলানা শাহ আবদুল আযীয সাহেবের (রাঃ) খেদমতে এ সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করলেন। তখন তিনি সাইয়্যেদ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কেবল কেতাব এরূপ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, কিম্বা সমস্ত বস্তু এরূপ অনুভূত হচ্ছে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, কেবল কেতাব সম্বন্ধে এরূপ অবস্থা হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য সমস্ত বস্তু যেরূপ আছে, সেরূপ দৃষ্টিগোচর হয়। তখন মাওলানা বললেন, কেতাব রেখে দাও, খোদাতায়ালা তোমাকে অন্যান্য কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমার লেখাপড়ার আবশ্যক নেই। খোদাতায়ালা নিজেই কোন জাহেরী শিক্ষকের শিক্ষা প্রদান ব্যতীত তোমাকে সমস্ত ইলম ও হিকমত শিক্ষা প্রদান করবেন। তিনি সমস্ত লোকের পূর্বে কোরআন মজিদের উর্দু তরজমা শিক্ষা করেছিলেন, তিনি আদর্শ স্বরূপ তোতা পাখির ন্যায় কোরআন মজিদ পড়া যেরূপ হিন্দুস্তানে প্রচলিত আছে (তাহা) ছাড়াতে চাইয়াছিলেন। "তাওয়ারিখে আজিবা" কেতাবের ৮ পৃষ্ঠায় অনুরূপ বর্ণনা আছে।

ইতিহাসে এ সাক্ষ্যই হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী সাহেবের কথার অনুমোদন করছে। এতৎ সত্ত্বেও হযরত সাইয়্যেদ আহমদ সাহেবকে নিরক্ষর বলা হিংসার প্রমাণ নয় কি?

এরূপ ঘটনার প্রমাণ পীরগণের জীবন চরিতে বিরল নহে। মোল্লা হোসাইন কাশেফী 'রশহত কেতাবের ২২৮-২২৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

"হযরত ওবায়দুল্লাহ আহরার ২২ বছর বয়সে উপনীত হলে, তার মামু খাজা ইব্রাহিম তাকে তাশকান্দ হতে সামারকান্দে ইলম শিক্ষা প্রদানের জন্য নিয়ে যান, কিন্তু শোগলে বাতেনীর প্রবণতা তাঁর জাহেরী ইলম শিক্ষার প্রতিবন্ধক হয়েছিল, এই হেতু পীরগণের সঙ্গ ও সাক্ষাৎ লাভে আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন।

২৩২-২৩৩ পৃষ্ঠা।

"হযরত পীর ওবায়দুল্লাহ বলেন, আমার মামু খাজা ইব্রাহিম ইলম শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমাকে তাশকান্দ থেকে সামারকান্দে নিয়ে গিয়েছিলেন, এবং বহু চেষ্টা চরিত্র করলেন। কিন্তু যতবার আমি ইলম শিক্ষাতে মনোনিবেশ করলাম, ততবার কোন না কোন পীড়া শিক্ষার প্রতিবন্ধক হয়, অবশেষে নিসবতে-বাতেনী প্রদান হল। আমি মামুকে বললাম, আমার একপ্রকার ভাব হচ্ছে যে, সেজন্য ইলম শিক্ষা করতে অক্ষম হচ্ছি। আপনি ছাড়েন না, যদি অধিক পীড়াপীড়ি করেন, তবে আমি নিজেই বিনষ্ট হওয়ার সন্দেহ করি। আমার এই কথায় বিস্ময়ান্বিত হয়ে

তিনি বললেন, আমি তোমার অবস্থা উত্তমরূপে জানতাম না, এরপর তোমাকে ছেড়েই দিলাম যে পথে তোমার অন্তর ধাবিত হয় তুমি তাতেই মনোনিবেশ কর। দ্বিতীয় বার ইলম শিক্ষা করার ইচ্ছা করলাম। তাতে আমার চোখে বেদনা আরম্ভ হল, ৪৫ দিন উক্ত পীড়া থাকলো, কাজেই আমি পড়া ত্যাগ করলাম। আমি নাহুর মেসবাহ পুস্তকের দু পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়েছিলাম। খাজা ফজলুল্লাহ বলেন তিনি জাহেরী ইলমের যৎসামান্যই পড়েছিলেন। হযরত সাইয়্যেদ আহমদ সাহেব (রা:) যে পরিমাণ ইলম শিক্ষা করেছিলেন, ইনিও তাহা অপেক্ষা কিছু কম ইলম শিক্ষা করেছিলেন। কিন্তু এতবড় পীর ও বুযুর্গ হলেন যে, হযরত খাজা বাকিবিল্লাহ সাহেবের পীর দাদাপীর ছিলেন।

নাফহাতুল উনছ, ৩৩১ পৃষ্ঠা।

"পীর আবু আলী ফারমাদী বলেছেন, আমি ইলম শিক্ষা করতে আত্মনিয়োগ করেছিলাম। এক দিবস দোয়াত হতে কলম তুলে দেখি যে কালি সাদা হয়ে গেছে, তখন আমি নিজ শিক্ষক ইমাম আবুল কাসেম কোশায়রির খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং উক্ত অবস্থা তার নিকট প্রকাশ করলাম। তিনি বললেন, যখন ইলম তোমা হইতে হস্ত সংকোচ করেছে, তখন তুমি তাহা হতে হস্ত সংকোচ কর। নিজের কাজে রত হও। আমি মাদ্রাসা থেকে আসবাব পত্র নিয়ে খানকাহে উপস্থিত হলাম। তার খেদমতে আত্মনিয়োগ করলাম। একদিন তিনি যে গোসলখানাতে গিয়েছিলেন, আমি কয়েক বালতি পানি ঢেলে দিলাম। তিনি বললেন, "হে আবু আলি, আমি যাহা ৭০ বছরে লাভ করেছি, তুমি এক বালতি পানি দ্বারা তাহাই লাভ করিলে।" রদ্দে বেদয়াত-৪১১১৫-১৭ পৃষ্ঠা।

"মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রা) 'মোকাশাফাতে রহমত কেতাবের ২৬পৃষ্ঠায় লিখেছেন মাওলানা আবুল হাই (রা) সাহেব ও হযরত শাহ আবদুল আযিয (রা) মোহাদ্দেস দেহলবীর কাছে বলেছিলেন, আমি সাইয়্যেদ (আহমদ মোজাদ্দেদ) সাহেবের আদেশ মতে তাহাজ্জুদ নামায পড়ায় সাহাবাগণের ন্যায় মিষ্টতা অনুভব করিয়া তাহার নিকট মুরীদ হইয়াছি। আমি অধিকাংশ তরীকাধারিদের তাওয়াজ্জোহ প্রদানের হালকাতে বসিয়াছি। কিন্তু সাইয়্যেদ সাহেবের আদেশমত যে উপকার পাইয়াছি, এইরূপ কখনও পাইনাই। এই সাইয়্যেদ সাহেবের শিক্ষা কোন তরীকার শিক্ষা ? তদুত্তরে হযরত শাহ সাহেব বলিলেন, মিয়া এইরূপ লোক যাহা মুখ দিয়া বলেন, তাহাই তরীকা, ইহারা সাহেবে -তরীকত হয়ে থাকেন।" রদ্দে-বেদয়াত-৪। ১২পৃষ্ঠা।

হযরত পীর হাবিবে আজমী, হযরত আবু এজিদ বাস্তামী, তার পীর শেখ আবু আলী, শায়খোল ইসলাম আহমদ নামেকি (রা), পীর আবুল হাসান খেরকানী (রা), বড় পীর সাহেবের পীর, পীর হাম্মাদ দাব্বাছ পীর আবুল আব্বাছ (রা) আমেলি, পীর আলি বেনে হাম্মাদ, পীর খায়েরচা, এরূপ অন্যান্য বহু পীর

মাশায়েখ ইলমে জাহেরী জানতেন না, কিন্তু তারা শ্রেষ্ঠ পীরত্বের আসন গ্রহণ করেছিলেন। প্রগুক্ত- ৪/১৬৫ পৃঃ

পীর আবুল আব্বাছ আমেলি, ইনি কসাই ছিলেন। আমেল ও তেবরেস্থানের পীর ছিলেন এবং তিনি জামানার গওস ছিলেন। তিনি উম্মি ছিলেন। আলাহি পীর মো'মাল জাচ্ছাজ সিরাজের প্রধান পীর ছিলেন, কিন্তু তিনি উম্মি ছিলেন। তিনি লিখতে জানতেন না।

পীর ইবরাহিম বেনে আহমদ এর পীর, পীর মোসলেম মাগরেবি উম্মি ছিলেন, সুরা ফাতেহা 'শুদ্ধ করে পড়তে পারতেন না। অথচ তিনি বাঘের কান মলে দিতেন। রাখাল শায়বান উম্মি ছিলেন কিন্তু ইমাম শাফেয়ী গ্রন্থ এর মহামান্য পীর ছিলেন। নবীপাক হযরত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশে তিনি মোজাদ্দেদ সাইয়্যেদ আহমদ (রা) দস্তে বায়অত/ ও সোহবত এখতিয়ার করেন। তদ্রুপ হযরত সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলী (রা) উম্মি ছিলেন কিন্তু ভারত উপমহাদেশও আরব আজমের পীরানে পীর ও মোজাদ্দেদ ছিলেন। নবীপাকের নির্দেশে হযরত সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী (রা) কোলকাতা গমন করে বায়অত হয়ে খিলাফত ও কামালিয়াত হাসিল করেছিলেন, যা দিবা লোকের ন্যায় সত্য।

হযরত সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী সাহেব (রা) জাহেরী বাতেনী তালীম সমাপ্ত করে নকশাবন্দীয়া মোজাদ্দেদীয়া তরীকায় কামিয়াবী হাসেল করতঃ এশায়াতে ইসলামে যখন রত ছিলেন। সে সময় তিনি একদিন স্বপ্নযোগে হযরত রিসালাতমায়াব ছরকারে দোআলম হযরত নবী পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাশারত হয়।"**আমার সন্তান সৈয়দ আহমদ কলিকাতা এসেছেন। তুমি তার হতে বায়াআত গ্রহণ কর।"**

অতঃপর সূফী সাহেব অতি সত্তর চট্টগ্রাম থেকে কোলকাতায় নবী পাকের নির্দেশমত আমীরুল মোমেনীন হযরত সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলীর (রাঃ) এর দস্ত মোবারকে বায়াআত গ্রহণ করেন এবং তার খেদমতে রত থাকেন। এ সময় হযরত বেরেলভী (রাঃ) তার প্রখ্যাত খলিফা ও আলেম হাফেয জামালুদ্দীন (রাঃ) এর সিন্দুরীয়া পট্রি মসজিদের (কোলকাতা নাখোদা মসজিদের সন্নিকট) কামরায় অবস্থান করছিলেন।

হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রাঃ) কোলকাতা থেকে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে জুলাই হিজরী ১২৩৬ সনের ২০শে শওয়াল ৪৩০ জন সাথী সহ হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ শরীফ রওয়ানা হন। পথিমধ্যে কাফেলার সংখ্যা ৭০০ জনে পৌছে, এ কাফেলায় পীরের সাথে সাথী ছিলেন হযরত সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (রাঃ), হযরত মাওলানা ইমামুদ্দীন সাদুল্লাহপুরী (রাঃ) হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ ওয়ারেস আলী (রাঃ) প্রমুখ। ১২৩৭ হিজরীর সফর মাসে

(১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে) হযরত সাইয়্যেদ আহমদ (রা:) কাফেলা সহ হজ্জ শেষে কোলকাতায় ফিরে আসেন এবং তিন মাসকাল অবস্থান করেন।

সূফী সাহেব কিবলা ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৩১ সালের ৬ই মে পর্যন্ত বুযর্গ পীর ও মুর্শিদ মোজাহেদে আযম হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রা:) এর সোহবত এখতিয়ার করেন। এ সুদীর্ঘ সময়ে পিছন ফিরে অর্থাৎ ঘরসংসারের দিকে আর তাকান নাই। পীরগতপ্রাণ হযরত সুফী সাহেব (রা:) অধিকাংশ জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি প্রধান সেনানীর দায়িত্ব পালন করেন। হযরত সাইয়্যেদ আহমদ (রা:) ১৮২৬ সালের ৭ই জানুয়ারী প্রায় ১২ হাজার মোজাহেদ সহ জিহাদে রওনা দেন। উত্তর পশ্চিম পাহাড় অঞ্চলে প্রবেশ করেন এবং কাবুল কান্দাহার হয়ে সিন্ধু নদীর মধ্যে দিয়ে ইউসুফ জাই এলাকায় প্রবেশ করেন। নওশেরার যুদ্ধে কোন সাফল্য পাননি। পরে পাঞ্জতন কেল্লা দখল করেন। এক্ষণে কতিপয় ব্যক্তি অপপ্রচার করছে "সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলী (রা:) মূর্খ ছিলেন। তিনি একজন যোদ্ধা বা সিপাহসালার ছিলেন। তিনি জিহাদের বায়াত নিয়ে ছিলেন। তিনি উপযুক্ত পীর ছিলেন না।"

হযরত মাওলানা শাহসূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী (রা:)তার কাছে জিহাদের বায়াত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর খলিফা নন। তাঁর পীর ছিলেন ঢাকার আজিমপুরের হযরত দায়েম (রা:)"

আমি ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি তিনি হযরত দায়েম (রা:) খলিফা ছিলেন। তদ্রুপ তিনিও হযরত মোজাদ্দেদ সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভী (রা:) এর খলিফা ছিলেন। আর হযরত সাইয়্যেদ আহমদ (রা:) সাহেব অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের বুজর্গপীর ও সাহেবে কাশফ, জামানার মোজাদ্দেদ ছিলেন।

তার বুযর্গ পীর হযরত শাহ আব্দুল আজীজ দেহলভী (রা:) তার উচ্চ প্রশংসা করেছেন এবং নিজ খান্দানের মাওলানা আব্দুল হাই সাহেব। (ইনি শাহ সাহেবের জামাতা)। মাওলানা আব্দুল গণি সাহেব (ইনি শাহ রফিউদ্দীন সাহেবের পুত্র)। মিয়াজী নূর মোহাম্মদ ঝানঝনাবী। (ইনি হাজী মাওলানা ইমদাদুল্লাহ সাহেবের পীর মোর্শেদ) শেখ মোহাম্মদ ওমর, মুফতীয়ে মক্কা, (ইনি শাইখুল উলামা আবদুর রহমান সাহেবের উস্তাদ) সৈয়দ আকিল ও সৈয়দ হামজা, এ দুই বুযুর্গ মক্কা শরীফের ওলি ছিলেন, কাশফের দ্বারা সৈয়দ সাহেবের দরজা অবগত হয়ে মুরীদ হন।

খাজা আলমাস, (ইনি মদীনা শরীফের গওস ও প্রধান অলি ছিলেন) শেখ শামসুদ্দীন শাত্তা মিসরী। (ইনি বায়তুল্লাহ শরীফের ওয়ায়েজ) শেখ মোহাম্মদ আলী হিন্দী, (ইনি মক্কা শরীফের মোদারের্স)। হাফেজ মাগরেবী শেখ আহমদ বেনে ইদরিস, (ইনি হাফেযে সহীহ বোখারী) ওমর বিন আব্দুর রাসুল, (প্রসিদ্ধ

ওলি ও মোহাদ্দেস)। শেখ বোখারামী (মদিনা শরীফের মোদারেস) মাওলানা হাফেয জামালুদ্দীন সাহেব কোলকাতার কুতুব।

এরূপ আরব রুম, শাম, মিসর, ভারতের হাজার হাজার আলেমও সূফী দরবেশ, তাঁর নিকট মুরীদ হয়েছিলেন। মোজাহেদে আযম, মোজাদ্দেদ, সাইয়্যেদ আহমদ ইলমে লাদুন্নি প্রাপ্ত উচ্চস্তরের কাশফ শক্তি সম্পন্ন বুযুর্গ পীর ছিলেন।

উল্লিখিত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, হযরত সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভী (রা:) পীরে মোকাম্মল, সাহেবে তরীকত এবং মোজাদ্দেদ ছিলেন।

হালাতে মাশায়েখে নকশাবন্দীয়া মোজাদ্দেদিয়া-১৪৭ পৃষ্ঠা।

খাজা বাহাউদ্দিন (রা:) বলেন তরিকত পন্থিগণ দুই প্রকার হইয়া থাকেন, এক প্রকার কঠোর পরিশ্রম সাধ্যসাধনা ও মোজাহাদা করিয়া থাকেন, এবং তদানুযায়ী উহার ফল প্রাপ্ত হন। আর এক প্রকার ফজলি হইয়া থাকেন, খোদার অনুগ্রহ ব্যতীত কিছুই জানেন না, এবাদত ও রিয়াজাত ও তাহার অনুগ্রহ জানেন, এই দল জলদি সফল মনোরথ হইয়া থাকেন।" রদ্দে বিদয়াত ৪/৯৫ পৃষ্ঠা।

হালাতে মাশায়েখে নকশন্দীয়া-১৭৪-১৭৫ পৃষ্ঠা।

"হযরত খাজা বাকিবিল্লাহ এক রাতে হযরত খাজা বাহাউদ্দিন (রা:) সাহেবের রুহানী ফয়েজ ও তিন রাতে হযরত মাওলানা খাজাকি আমকিনকি সাহেবের দ্বারা ফয়েজ প্রাপ্ত হয়ে এত বড় অলি হয়েছিলেন যে, হযরত ইমাম আহমদ সারহান্দীর পীর হয়ে ছিলেন।" রদ্দে বেদয়াত ৪/১০১ পৃষ্ঠা।

হযরত ইমাম রব্বানী সাহেব দুই মাস ও কয়েক দিবসে নকশাবন্দীয়া তরীকার সমস্ত নিসবত লাভ করেছিলেন। হালাতে মাশায়েখে নকশাবন্দীয়া-১৯০ পৃষ্ঠা।

হযরত পীর আবুবকর বেনে হাওয়ার একরাতে এবং পীর আবু মোহাম্মদ শাম্বাকী তিন দিবসে মহা অলি হয়ে ছিলেন। রদ্দে বেদয়াত ৪/১০১ পৃষ্ঠা।

এমাম গাজ্জালী এহইয়াউল উলুম-৩/১৫ পৃষ্ঠা

অন্তর সমূহের চক্ষু হতে পরদা সকল দূরীভূত হলে, লওহে মহফুজে যাহা লিখিত আছে, উহার কতক সংবাদ উক্ত চক্ষুগুলিতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। রদ্দে বেদয়াত-৪/১০৭ পৃষ্ঠা।

পীরগণ মোকাশাফা শক্তিতে লওহে মাহফুজের সংবাদ অবগত হয়ে থাকেন। আর দুনিয়ার কিতাবগুলোর সংবাদ অবগত হয়ে থাকেন, তা কেন অযৌক্তিক হবে?

হযরত মোজাদ্দেদ সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রা:) এর জলন্ত কারামত:

হযরত ইমাম রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফে সানি, রহমাতুল্লাহ আলাইহে মকতুবাত শরীফের ২২৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

"কোন কোন ওলি মোকাশাফা শক্তির বলে লওহে মাহফুজের লিখিত বিষয় দর্শন করিয়া থাকেন। উক্ত মোজাদ্দেদ সাহেব লওহে মাহফুজের কোন কোন অবস্থা জানিতে পারিয়াছিলেন।" এ তফসিরে রূহল মায়ানী - ৭, ৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা

"হুজ্জাতুল ইসলাম গাজ্জালী নিজের কেতাব আল-মেনকেজ মেনাদ্দালালে' এই নেতৃস্থানীয় পীরগণের প্রশংসা বর্ণনা উপলক্ষে বলিয়াছেন, নিশ্চয় তাঁহারা জাগরিত অবস্থায় ফেরেশতা ও নবীগণের রূহদিগকে দেখিয়া থাকেন এবং তাহাদের শব্দ শুনিয়া থাকেন এবং তাহাদের নিকট লাভ জনক বিষয়গুলি শিক্ষা করিয়া থাকেন।"

"তাহার একজন শিষ্য মালেকী মাজহাবলম্বী এমাম আবু বকর বেনে আরাবী নিজের কিতাব কানুনুত্তাবিলে বলিয়াছেন সূফীগণ এই মতাবলম্বন করিয়াছেন যে, মানুষের পক্ষে নফসের পবিত্রতা, অন্তরের শুদ্ধি, পার্থিব সম্বন্ধ সমূহ বর্জন, সম্মান, সম্পদ ও পার্থিব উপকরণগুলির মূলোচ্ছেদ, সমশ্রেণীর মিলন ত্যাগ এবং অবিরত জ্ঞান ও কার্য্যে আল্লাহতায়ালার দিকে মনোনিবেশ সহজসাধ্য হয়, তখন তাহার পক্ষে লতিফা সমূহ প্রকাশিত হয় এবং সে ফেরেস্তাগণকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিয়া থাকে এবং নবিগণের রূহ ও ফেরেশতাগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকে।"

ফুরফুরা শরীফের আলা হযরত পীর আবু বকর সিদ্দিকী (রা:) এর বিশিষ্ট খলিফা আল্লামায়ে হিন্দ, হযরত মাওলানা পীর মুহাম্মদ রূহল আমীন (রা:) ফিরিস্তাকে সালাম করে ছিলেন। বোড়লা গাড়ীর মাহফিলের নামাযের জামায়াতে কত লোক হয়েছে, তা পীরের জিজ্ঞাসায় তিনি লওহে মাহফুজের লেখা দেখে বলে দিয়ে ছিলেন। সীরাতে রুহুল আমীন-১৮৩পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আরও তিনি উক্ত কেতাবের ৬০/৬১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন।

"কেহ কেহ বলিয়াছেন, হযরত ইছা (আঃ) আসমান হইতে নাজেল হওয়ার পরে আমাদের নবী (সাঃ) এর সাক্ষাতে তাহার নিকট হইতে শরিয়তের আহকাম শিক্ষা করিবেন। আর ইহাও সম্ভব যে, রুহানী (আত্মিক) ভাবে নবী (সা:) এর সাক্ষাৎ করিয়া শিক্ষা করিবেন। ইহা কোন অভিনব মত নহে। কেননা হযরতের ওফাত শরীফের পরে, এই উম্মতের একাধিক কামেল পীরগণ উক্ত হারতের সহিত চৈতন্যাবস্থায় সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং তাহার নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

মোল্লা হোসায়েন কাশেফী কৃত 'রশহাত', শেখ তাজদ্দীন কৃত 'লাতায়েফুল মিনাল', শেখ সিরাজুদ্দীন কৃত 'তাজকেরাতুল আউলিয়া', বড় পীর কৃত 'বাহজাতোল আছরার', সিয়ারুল আকতাব কেতাবে বিস্তারিত দেখা যেতে পারে।

"শেখ সিরাজুদ্দিন তাবাকাতোল আওলিয়া কেতাবে লিখিয়াছেন শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রা:) বলিয়াছেন, আমি যোহরের নামাযের পূর্বে নবী সাক্ষাৎ এর

দর্শন লাভ করিয়াছিলাম। তিনি আরও বলিয়াছেন হে প্রিয় পুত্র, তুমি উপদেশ প্রদান কর না কেন? আমি বলিলাম, হে পিতা আমি একজন আজামী পুরুষ, বাগদাদের সহিহ (শুদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষাভাষী) দিগের নিকট কিরূপে উপদেশ প্রদান করিব? ইহাতে হযরত বলিলেন, তুমি নিজের মুখ খুলিয়া দাও। আমি মুখ খুলিয়া দিলে, তিনি উহাতে সাতবার থুথু দিলেন এবং বলিলেন, তুমি লোকদিগকে উপদেশ প্রদান কর হেকমত এবং উৎকৃষ্ট উপদেশ দ্বারা (তাহাদিগকে) তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান কর। আমি যোহর পড়িয়া বসিলাম এবং আমার নিকট বহু লোক সমবেত হইল এবং আমার শরীরে কম্পন উপস্থিত হইল। এমতাবস্থায় আমি মজলিসে আমার সম্মুখে হযরত আলী (রাঃ) কে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখিলাম তৎপরে তিনি আমাকে বলিলেন, হে আমার পুত্র, তুমি কেন ওয়াজ বর্ণনা করিতেছ না? আমি বলিলাম, হে পিতা, আমার শরীরে কম্পন উপস্থিত হইয়াছে। উহাতে তিনি বলিলেন, তুমি তোমার মুখ খুলিয়া দাও। আমি মুখ খুলিয়া দিলে, তিনি উহাতে ছয়বার থুথু দিলেন। আমি বলিলাম, কেন আপনি সাতবার পূর্ণ করিলেন না? তিনি বলিলেন, নবী সঃ এর সহিত আদব রক্ষার্থে (উহা পূর্ণ করি নাই)। তৎপর তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

আর ও তিনি শেখ খলিফা বেনে মুছা নহর মুলকির ইতিবৃত্তে লিখিয়াছেন, তিনি জাগতিক ও নিদ্রিক অবস্থায় হযরত নবী করিম (সা:) বহু সাক্ষাৎকারী ছিলেন, এমন কি বলা হয় যে, তিনি জাগতিক ও নিদ্রিত অবস্থায় নিজের অধিকাংশ কার্য্য হযরতের শিক্ষায় করিতেন। একরাত্রে তিনি হযরতকে ১৭বার দর্শন করেন, একবার হযরত তাহাকে বলিয়াছিলেন, হে খলিফা, তুমি আমার উপর বিরক্ত হইও না, অনেক অলি আমার সাক্ষাৎ না পাওয়া দুঃখে মরিয়া গিয়াছেন।

"শেখ তাজদ্দীন "আতায়েফোল মেনান" কেতাবে লিখিয়াছেন-এক ব্যক্তি শেখ আবুল আব্বাস মারছিকে বলিয়াছিলেন- হে আমার অগ্রণী, আপনি এই হাতের দ্বারা আমার সহিত মোসাফাহা করুন, কেননা আপনি বহুলোক ও বহু শহর দর্শন করিয়াছেন। ইহাতে তিনি বলিলেন, খোদাতায়ালার শপথ, আমি এই হস্ত দ্বারা কেবল রাসুলুল্লাহ (সা:) এর সহিত মোসাফাহা করিয়াছি। আরও তিনি বলিলেন, যদি রাসুলুল্লাহ (সা:) চক্ষের পলক মারা পরিমাণ আমা হইতে অন্তহিত হন। তবে আমি নিজেকে মুসলমনের মধ্যে গণ্য করি না।"

ফুরফুরা শরীফের পীর আবু বকর সিদ্দিকী (রা:) এর অন্যতম খলিফা আবদুল মোমেন (রা:) দীর্ঘ ছায়ের করে ফুরফুরা শরীফের দরবারে স্বীয় পীর কেবলার মজলিসে বসেছিলেন এমন সময় হিন্দুস্তানের একজন বড় আলেম দরবার শরীফে পীর কেবলার সাথে সালাম মোসাফাহা করেন। উপস্থিত সকলের সাথেও মোসাফাহা করেন। তিনি সূফী আবদুল মোমেন সাহেবের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেও তিনি মোসাফাহা না করে হাত গুটিয়ে নেন। পীর কেবলা বলেন- বাবা

আব্দুল মোমেন, মোসাফাহা করলেন না কেন? তিনি বিনীত ভাবে বল্লেন হুযুর বেআদবী মাফ করবেন এই মাত্র কয়েকদিন আগেও বিশ্বনবী হযরত (সা:) এর হাতে মোসাফাহা করেছি, সেই হাত একজন ধূমপানকারীর হাতে হাত দিই কি করে।

বাহজাতোল আসরার-২৬ পৃষ্ঠা

এক সময় হযরত নবী করীম দাঃ বড়পীর সাহেবের দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন, ইহাতে তিনি আলী বেনেল হিতি নামক একজন মুরীদের উপর এস্তেগরাকের ফয়েয নিক্ষেপ করে তাহার সাক্ষাৎ করিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের হযরত মাওলানা শাহ সূফী সাইয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়সী (রা:) সাহেব মাওলানা সায়াদাত হোসেন (রা:) সাহেবকে ঐরূপ করেছিলেন।

কারামতে আহমদীয়া, রদ্দে বেদয়াত-৪/১৩৭ পৃষ্ঠা।

নাফহাতোল উনস্-১৭৩ পৃষ্ঠা।

"শায়খোল ইসলাম বলিয়াছেন লোক (পীর) আবু বকর কাত্তানিকে হজরত নবী মুস্তফা (সা:) এর সাগরেদ বলতেন, যেহেতু তিনি বহুবার স্বপ্নে তাঁকে দেখতেন, তিনি জানতেন যে কোন দিন কিম্বা কোন রাতে হযরত (সা:) কে দেখবেন। লোকে তাঁর নিকট প্রশ্ন করতেন, তিনি উক্ত প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে নবী (সা:) এর কাছে জিজ্ঞাসা করতেন এবং জওয়াব শ্রবণ করতেন। উক্ত কেতাব ১৯৬ পৃঃ।

পীর আবুল আলী কাতেব মিসরী বলেন, যখন আমার উপর কোন বিষয় জটিল হয়ে পড়তো, তখন নবী (সা:) কে স্বপ্নে দেখতাম তার থেকে (উক্ত বিষয়) জিজ্ঞাসা করতাম। উক্ত কেতাব- ৪৫০ পৃষ্ঠা

ম্যাওলানা জালালুদ্দীন আবু এজিদ পুবানি বলেছেন, যখন আমার পক্ষে কোন সমস্যা উপস্থিত হয়, হযরত রাসুলুল্লাহ সুন্নাহ এর রূহ কোন মধ্যস্থ ব্যতীত উহা সমাধান করেন। রদ্দে বেদয়াত-২৩৮ পৃষ্ঠা।

আখবারুল আখইয়ার-১৫০পৃষ্ঠা

"পীর সাইয়্যেদ ইউসুফ জামাল হোসাইনি প্রত্যেক জুমার রাতে হযরত রাসুলুল্লাহ (সা:) কে স্বপ্নে দেখতেন। আখবারুল আখইয়ার-১৮৯পৃষ্ঠা

পীর আহমদ আবদুল হক রুইনা বলতেন যেরূপ সাহাবাগণের হজরত নবী সুন্নাহ সঙ্গলাভ ছিল। সেইরূপ হাল সম্পন্ন ও আল্লাহ তায়ালার প্রেমিকদিগের অবস্থায় (হযরত) নবী (সা:) এর সাথে এখনও রয়েছে। সুবহানাল্লাহ। নাফহাতুল উনস্ - ২০৭ পৃষ্ঠা

পীর এবরাহীম বেনে আহমদ বর্ণনা করেন-আমি আমার প্রথম অবস্থায় পীর ...ম মাগরিবী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছায় তার মসজিদে উপস্থিত

হলাম। উক্ত এমাম সাহেব ইমামতি করলেন, এবং সুরা ফাতেহাতে কয়েক স্থানে ভুল পড়লেন। আমি মনে বললাম আমার কষ্ট করে আসাই বৃথা হয়েছে। উক্ত রাতে আমি তথায় থাকলাম। দ্বিতীয় দিন পাক হওয়ার উদ্দেশ্যে ফোরাতের কুলে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। পথিমধ্যে একটি বাঘ নিদ্রিত ছিল, তদ্দর্শনে আমি প্রত্যাবর্তন করলাম, দ্বিতীয় একটি বাঘ আমার পশ্চাতে আসতে দেখলাম, আমি গমন করতে অক্ষম হয়ে চিৎকার করতে লাগলাম। পীর মোসলেম সাহেব ইবাদাতগাহ হতে বাহির হলেন, বাঘেরা তাকে দেখতে পেয়েই নম্রতা আরম্ভ করলো। পীর সাহেব প্রত্যেকের কান ধরে মলে বললেন হে খোদার কুকুরেরা। আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই, তোমরা আমার মেহমানদের প্রতি উপদ্রব করিও না। সেই সময় পীর সাহেব আমাকে বলনে, হে আবু ইসাহক, তোমরা বাহ্যভাব সংস্কার করতে ব্রতী হইয়াছ, এই হেতু সৃষ্টজীব হইতে আশঙ্কা করে থাক, আমরা অন্তর শুদ্ধ করতে সংলিপ্ত হয়ে থাকি। এ হেতু সৃষ্ট জীব আমাদিগকে দেখিয়া ভয় পেয়ে থাকে। হযরত মোজাদ্দেদ সাহেবের প্রতি ওহাবি হওয়ার মিথ্যা অপবাদ অতি অল্প সময়ের মধ্যে হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রা:) ও তাঁর খলিফাদের দ্বীনি খেদমত ব্যপকভাবে প্রসার লাভ করার ফলে সমাজে শরিয়ত বিরোধী কার্যকলাপ ও অসামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড লোপ পেয়ে যায়। হাজার হাজার মানুষ সাইয়্যেদ সাহেবের অনুগামী হতে দেখে, শরিয়তের দুষমনদের গাত্রদাহ হয়ে পড়ে। পীরি মুরিদীকে যারা ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে, মজহাব মান্যকারীদের যারা মোশরেক ধারণা করে, নবীপাক (সাঃ) কে যারা হায়াতুন্নাবীর আকীদা পোষণ না করে, অশান্তি প্রিয় প্রবঞ্চক ইত্যাকার কতিপয় মতাবলম্বীদের গাত্রদাহ করতে থাকে, তারাই সাইয়্যেদ সাহেবের জনপ্রিয়তা দেখে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরিতে থাকে। এমতাবস্থায় উক্ত হিংসুকেরা অপপ্রচার করতে থাকে, তিনি ওহাবী ছিলেন। বস্তুতঃ এ দাবি ছিল মিথ্যা এবং সারশূন্য। ইদানিং লামজহাবী, জামায়াতিদের চক্রান্ত কতিপয় পীরানা ঘরনার লোকদের মুখে ঐ রূপ অমুলক কথা শোনা যাচ্ছে।

হযরত মোজাদ্দেদ সাইয়্যেদ আহমদ (রা:) অন্যতম খলীফা। দ্বীনের হাদী, হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রা:) 'মোকাশাফাতে রহমত' কেতাবে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। হযরত আল্লামা রূহুল আমিন ই কারামতে আহমদিয়ার ১৩-১৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন।

(সংক্ষেপ) "অবশ্য লোকদিগের মুখে তাহাদের অবস্থা এতটুকু বুঝা যায় যে, তাহারা শেরেক হতে পাক থাকে, কিন্তু তাহারা এত হটকারি যে নিজেদের দল ব্যতীত অন্য লোকদিগকে মুসলমান বলিয়া ধারণা করে না, সমস্তকে মোশরেক বলিয়া থাকে, আর সমস্তের প্রতি কুধারণা করিয়া থাকে, এমন কি মক্কা ও মদিনার লোকেরাও তাহাদের মতে মোসলমান নহে। বেদাতিদিগকে অতিরঞ্জিত ভাবে

মোশরেক বলিয়া থাকে। এই ওহাবি দল সৈয়দ সাহেবের ঘোর বিরোধী, কেননা সৈয়দ সাহেব শেরক বেদয়াত বিশেষভাবে নিষেধ করিয়াছেন এবং শেরক ও বেদয়াত এতদুভয়ের পার্থক্য খুব বুঝাইয়া দিয়াছেন। যেরূপ তাহার দলের সমস্ত কেতাবে এই কথা প্রকাশ রহিয়াছে। উপরোক্ত প্রতারক ফাছাদিদল অবশ্য জেদে পড়িয়া সুন্নত জামায়াতকে অহাবি বলিয়া ও দ্বীনদারগণকে বেদ্বীন বলিয়া অহাবিদের অনুরূপ মতধারী হইয়াছে"

"উল্লিখিত মিথ্যা অপবাদের দ্বিতীয় কারণ এই যে, লা-মজহাবিদের মধ্য হইতে একদল লোক সৈয়দ সাহেবকে মন্দ বলিয়া থাকে, তকলিদ করা ও জল-খাবার আর খাবার-জল, যেমন এক নয়, তদ্রুপ জাময়াতে ইসলামি আর ইসলামি জামায়াত এক নয়। মুরিদ হওয়া নাজায়েজ। আর তাহাদের অন্য একদল প্রবঞ্চনা করতঃ লোকদিগকে ধোকা দিবার উদ্দেশ্যে নিজদিগকে সৈয়দ সাহেবের দলভূক্ত করিবার চেষ্টা করে, অথচ সৈয়দ সাহেব এইরূপ লোকদিগকে নিজের জামায়াত হইতে বহির করিয়া দিয়াছিলেন।

সৈয়দ ছাহেবের দলের "কুওয়াতোল ঈমান", "নেজামোল ইসলাম", "মেয়াতে মাছায়েল" প্রভৃতি কেতাবে উক্ত লামজহাবীদের খুর রদ লেখা হইয়াছে.................।"

. "কতক দাড়ি মুণ্ডনকারী, বেনামাজী, ফাছেক, গোর পুজক, কামরিপুর বশীভূত শরিয়তের বিরোধী, অত্যাচারীদের সহায়তাকারী মন্দ আলেম। নফছও শয়তানের উত্তেজনায় সৈয়দ সাহেবের মোজাদ্দেদ হওয়া অস্বীকার করিয়া বসিল। উল্লিখিত প্রবঞ্চক ফাছাদকারীগণের সহিত মিলিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন ফাছাদকারীদের কর্তৃক শত্রুতা প্রকাশ করিতে লাগিল এবং দুই জগতে লাঞ্ছিত হইতে লাগিল।"

আল্লামা রূহল আমিন (রা:) "কারামতে আহমদিয়া" পুস্তকে "সিরাতুল মোস্তাকিম" ১৪৯-১৫২ পৃষ্ঠা ও তাওয়ারিখে-আজিবা ১০-১১পৃষ্ঠা বরাতে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

"সৈয়দ সাহেব কামালাতে নবুওয়াতে ও কামালতে বেলায়েত এই দুই ছুলুক পূর্ণ করার পরে একদিবস মোরাকাবা অবস্থায় হজরত খাজা বখতিয়ার কাকির (রা:) রূহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, সেই সময় সৈয়দ সাহেব খাজা সাহেবের মস্তকের উপর একটি জ্যোতিষ্মান ছাত্র এবং তাহার মস্তকের উপর দুটি ছত্র ছায়া প্রদান করিতে দেখিলেন। হজরত সৈয়দ সাহেব নিজকে উক্ত খাজা সাহেবের সামান্য মুরিদ বলিয়া ধারণা করিতেন, কিন্তু ব্যাপারটি বিপরীত দেখিয়া তিনি নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। হঠাৎ মোরাকাবা শেষ করিয়া ভীত কম্পিত অবস্থায় মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ (রা:) সাহেবের খেদমতে হাজির হইয়া ভয় ও

লজ্জার সহিত এই ঘটনা তাহার নিকট প্রকাশ করিলেন। হজরত মাওলানা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া হাস্যমুখে বলিলেন, হে পুত্র! ইহা আশ্চর্য নহে, বেলায়েতে নবুয়তের এইরূপ লক্ষণ হইয়া থাকে। হে প্রিয়পাত্র! ইহাত! উহার প্রথম অবস্থা, সমুদ্রের এক বিন্দু সমান এখন তোমার উপর প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পরে দিন দিন ইহা অপেক্ষা সহস্র সহস্রগুণ বৃহৎ অবস্থা তোমার উপর প্রকাশিত হইবে।" আর ও উক্ত কেতাবের ১৫/১৬ পৃষ্ঠায় মখজেন লেখক বলেছেন- দ্বিতীয়বার সৈয়দ সাহেব পৌছাবার সাতদিন আগে হযরত মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ (রাঃ) স্বপ্নে দেখেন যে জনাব হযরত রাসুলুল্লাহ (সঃ) দিল্লীর জামে মসজিদে তশরীফ আনেন। চারিদিক থেকে তার জিয়ারতের জন্য দৌড়ে দৌড়ে আসছেন। প্রথমে শাহ সাহেব জিয়ারত করলেন। সে সময় নবীপাক (সঃ) শাহ সাহেবের হাতে একটি যষ্টি দিয়ে বললেন, তুমি যষ্টি হাতে নিয়ে মসজিদের দরওয়াজায় বসে থাক। যে ব্যক্তি আমার জিয়ারতে আসবেন তার অবস্থা আমার কাছে প্রকাশ কর। আমি যাকে আসতে অনুমতি দিব, তাকেই তুমি আমার সাক্ষাতে আনবে। আর আমি যাকে নিষেধ করব তাকে নয়। শাহ সাহেব হাতে যষ্টি নিয়ে মসজিদের দরওয়াজায় বসলেন এবং সেই নিয়মে অনুমতি প্রাপ্ত মানুষেরা নবী পাকের জিয়ারত নসীব পান। শাহ সাহেব এ স্বপ্ন দেখে সকালে হযরত শামসুদ্দীন শহীদ সাহেবের প্রধান খলিফা হযরত শাহ গোলাম আলি সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে, উক্ত সত্যস্বপ্ন তার কাছে প্রকাশ করে মর্ম জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত গোলাম আলি শাহ বললেন, কি আশ্চার্য্য যে আপনি দ্বিতীয় ইউসুফ হয়ে স্বপ্নের মর্ম আমার কাছে জানতে চান, শাহ সাহেব বললেন, এ আশ্চর্য জনক স্বপ্নের বৃত্তান্ত আপনার পাক জবান থেকে শুনতে ইচ্ছা করে। শাহ গোলাম আলি সাহেব বললেন আমার ধারণায় স্বপ্নের মর্ম বিবেচিত হয় যে, হযরত সৈয়দ হাসান (রাঃ) যিনি মুরিদগণকে হযরত রাসুল (সঃ) এর দর্শন লাভ করে দিতেন। অদ্য দেড় শত বছর গত হয়ে গেছে, সে হতে লোকদিগকে হযরত নবীপাক (সঃ) হেদায়েতের জন্য তাওয়াজ্জোহ রহিত হয়ে গেছে। এ স্বপ্নে বোঝা যায় যে আপনার কিম্বা আপনার কোন উপযুক্ত মুরিদের হস্তে যে হেদায়েতের দেড়শত বছর হতে বন্ধ হয়ে গেছে তা প্রসারিত হবে। মাওলানা তা শুনে বললেন, আমার ধারণায় এ স্বপ্নের মর্ম বিবেচিত হয়। এ স্বপ্নের পরে এক সপ্তাহ হতে না হতেই এমতাবস্থায় সৈয়দ সাহেব দ্বিতীয় বার দিল্লীতে উপস্থিত হয়ে পূর্বের ন্যায় আকবর আবাদি মসজিদে অবস্থানের স্থান স্থির করলেন। তিনি ছয় বছর কাল অরণ্যে নির্জন অবস্থায় দুপ্রকার সলুক সমাপন করে এরূপ পরিস্কৃত ও অলৌকিক হয়ে ছিলেন যে, তার প্রতিবিম্ব প্রত্যেক পবিত্র অন্তরে প্রতিফলিত হতেছিল। তখন লোক চারিদিক থেকে তাঁর দিকে ধাবিত হতে থাকে। আরও ১৬-১৯ পৃষ্ঠা কারামতে আহমদিয়া ২৩-২৫ পৃষ্ঠা।

"মাওলানা আবদুল কাদের সাহেব উক্ত আকবরাবাদী মসজিদে অবস্থান করতে ছিলেন, সে সময় তিনি একদিন মাওলানা আবদুল হাই সাহেবের সাথে দেখা করতে গিয়ে ছিলেন, কথা প্রসঙ্গে নামাজের নিগূঢ় তত্ত্ব ও হুযুরী কালবের সমালোচনা হয়। মাওলানা আবদুল কাদের সাহেব বললেন 'উক্ত বিষয়ের বিস্তারিত তত্ত্ব তাছাওয়োফ ও চরিত্র গঠন সংক্রান্ত পুস্তকে সুন্দর ভাবে বিবরণ আছে কিন্তু কামেল মোর্শেদের অসিলা ছাড়া উহা লাভ অতি সঙ্কট বরং অসম্ভব। যদি এই আগন্তুক যুবক সৈয়দ সাহেবের কাছে শিক্ষা করা যায়, তবে অতি উত্তম। তশ্রবণে মাওলানা আবদুল হাই সাহেব তৎক্ষণাৎ সৈয়দ সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হয়ে গেলেন এবং তার কাছে মতলব পেশ করলেন। তখন সৈয়দ সাহেব নামাজের নিগূঢ় মর্ম ও হুযুরী কলবের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করে বললেন"হে মাওলানা, কেবল মৌখিক শিক্ষায় এ শ্রেষ্ঠ নিয়ামত লাভ হতে পারে না। বরং আপনি আমার সাথে মোক্তাদি হয়ে দু রাকায়াত নামাজ পড়েন। সে সময় মাওলানা আবদুল হাই সাহেব দণ্ডায়মান হয়ে তার পশ্চাতে দুরাকায়াত নামাজ পড়লেন। ঐ দুরাকায়াত নামাজে নামাজের সমাপ্ত গুপ্ততত্ত্ব তাঁর পক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়লেন। তিনি বলেন- "আমি যা উক্ত দুরাকাত নামাজে পেয়েছি তা সমস্ত জীবনে ও সমস্ত কেতাবে পাই নাই। তাঁর দুরাকায়াত নামাজে সোবহে সাদেক হয়ে গেল বরং তিনি ঐ সময় চর্মচক্ষে কাবা ঘর সম্মুখে দেখিতে পেলেন। তখন তিনি তার প্রেমে বিভোর হয়ে তারই হস্তে বায়াআত হলেন। এ সংবাদ লোকেরা অবগত হলে, তন্মধ্যে অন্ত-অন্ধ লোকেরা মাওলানার দুর্নাম করে বলতে লাগলেন যে, ইনি এত বড় অদ্বিতীয় আলেম ও সুবক্তা ফাজেল হয়ে একজন সামান্য লোকের মুরীদ ও সেবক হয়ে গেলেন। অতঃপর এই অন্ধরা মাওলানা শাহ আব্দুল আজীজ সাহেবকে জানালে, তিনি সৈয়দ সাহেবের উচ্চ মর্যাদার কথা প্রকাশ করে তাদিগকে সৈয়দ সাহেবের কাছে মুরীদ হতে উৎসাহিত করেন। অনেক সৌভাগ্যবানেরা তওবা করে তার কাছে মুরীদ হয়ে গেলেন। এ সময় দূর দূরের শত শত আলেম ফাজেল ও ইমানদার পুরুষ তার কাছে উপস্থিত হয়ে মুরিদ হতে লাগলেন। মাওলানা শাহ আব্দুল আজীজ সাহেবের সমস্ত খান্দান, মৌলভী ওাজিমুদ্দিন, হাকিম মোঃ গিয়াছদ্দিন, হাফেজ মইনদ্দিন, মৌলুভী মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেবগণ ও তার শত শত মুরীদ হযরত নবী (স:) এর জিয়ারত লাভে ধন্য হলেন।

আরও ২১- ২২ পৃষ্ঠা

এবার সৈয়দ সাহেব দিল্লীতে অবস্থান করলেন। বহুলোক তার থেকে ফয়েজ লাভ করলেন। সে সময় পার্শ্ববর্তী কসবা ও শহর সমূহ হতে শত শত লোক পত্র সহ তাঁকে দাওয়াত দিতে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমরা দিল্লীতে এসে আপনার কাছে বায়াআত ফয়েজ লাভ করতে পারি কিন্তু আমাদের আত্মীয় স্বজন স্ত্রী পুত্রগণ আপনার ফয়েজ হতে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে। তখন সৈয়দ সাহেব ঐ সব পত্রগুলো

হযরত শাহ আবদুল আজীজ (রা:) সাহেবের কাছে পেশ করে উক্ত কসবা ও শহরগুলির দিকে রওনা হওয়ার অনুমতি চাইলেন। সে সময় মাওলানা সাহেব আনন্দিত ভাবে নিজের পরিধেয় একটি কালো পাগড়ী ও একটি শুভ্র (সাদা) পিরহান তাকে স্বহস্তে পরিয়ে বিদায় দিলেন। প্রথমে তিনি ফুপ্ত নামক পল্লীতে উপস্থিত হলেন, তথায় শাহ অলিউল্লাহ ও শাহ আহলোল্লাহ সাহেবদ্বয়ের আত্মীয় স্বজনেরা বাস করতেন। তারা সকলেই সৈয়দ সাহেবের নিকট মুরীদ হয়ে গেলেন। তৎপর মোজাফফরনগর, লোহারি, সাহারানপুর, গড়মুক্তির, রামপুর, বেরেলী শাহজাহানপুর ইত্যাদি বহু শহরে আগমন করে বহু সহস্র লোককে মুরীদ করে সত্য পথে আনয়ন করেন। আরও ৭৪ পৃষ্ঠা।

মৌলবী আবদুল আহাদ সাহেব বলেছেন, হযরত সৈয়দ সাহেবের পাক হস্তে চল্লিশ হাজারের অধিক হিন্দু ইত্যাদি অমুসলমান মুসলমান হয়েছিল। প্রায় ৩০ লক্ষ মুসলমান তার হস্তে মুরীদ হয়েছিল। আর তাঁর খলিফাগণ ও খলিফাগণের মুরীদের সংখ্যা কয়েককোটি হবে। তাওয়ারিখে আজিবা, ১৩৯-১৪১, ৬০-৬৫ পৃষ্ঠা সৈয়দ সাহেবের কয়েক হাজার খলীফা ছিলেন, তাঁর অধিকাংশ খলীফা কারামতধারী অলি ছিলেন। এখানে হিন্দুস্থানের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ৮০ জন খলীফার নাম আছে। সম্মানীয় পাঠক পাঠিকা এবার উপলব্ধি করুন শাহ সৈয়দ আহমাদ গ্রহ হাক্কানী রব্বানী পীর ছিলেন কি না। তিনিই ছিলেন গাজীয়ে বালাকোট, কুতবুল আলম হযরত শাহসূফী নূর মুহাম্মদ নিয়ামপুরী (যিনি মলিয়াসে বর্তমান মিঠানালা) শায়িত বুযুর্গ পীর ও মুর্শিদ। অস্বীকারকারীদের হেদায়েত করুন। তাদের প্রতি উপযুক্ত বিধান প্রদান করুন। ইয়া রব্বাল আলামীন। আমীন। ।

আল্লামা রূহল আমিন (রা:) কারামতে আওলিয়া পুস্তকে ৮১-৮৫ পৃষ্ঠা কোলকাতা মাদ্রাসা আলীয়ার মোদারেস সাহেবান কর্তৃক মূদ্রিত ফাতাওয়ার উল্লেখ করে লিখেছেন।

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি বলে যে, জনাব সৈয়দ আহমদ সাহেব মরহুম যিনি মাওলানা কারামত আলী মরহুম মর্গফুরের মোর্শেদ ছিলেন। মোহাম্মদী অহাবী ছিলেন। আর এক ব্যক্তি বলে যে, জনাব আমিরুল মোমেনীন মাওলানা গাজী সৈয়দ আহমদ সাহেব খাঁটি হানাফি ছিলেন। তিনি কিছুতেই লামজহাবী ছিলেন।

উত্তর ঃ মাওলানা সৈয়দ আহমদ সাহেব ছালেক ও অলিদিগের নেতা ছিলেন। তিনি সুন্নত অল জামায়াতভূক্ত ছিলেন। চারি মজহাব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, ইহা তাহার মলফুজাত হইতে প্রমাণিত হয়। তাঁহার শিষ্য মাওলানা কারামত আলী সাহেব কুওয়াতোল ঈমান ও নছিমমাল হারামাইনে অহাবি লামজহাবিদের প্রতিবাদ করিয়াছেন। আরব, আজম, হিন্দুস্থান ও বাঙ্গালার জাহেরী ও বাতেনী কামালত পূর্ণ বড় বড় অদ্বিতীয় আলেমগণ যাহাদের দ্বারা শেরক বেদয়াত দূরীভূত হইয়াছে, তাহারা উক্ত সৈয়দ সাহেবের মুরিদ ছিলেন।

তাহারা সকলেই মাজহাবলম্বী ছিলেন। আর হযরত সৈয়দ সাহেব, হজরত মাওলানা আবদুল আজীজ (রা:) সাহেবের খাস শিষ্য ছিলেন। যে ব্যক্তি এইরূপ তরিকত ও শরিয়তের হাদী, শহীদ, রাসুল (স:) এর বংশধর ও কামেল মোর্শেদের উপর অযথা অপবাদ প্রয়োগ করে সে ব্যক্তি গোনাহগার বদকার মিথ্যাবাদীও অপবাদকারী ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে ব্যক্তি এই ধ্রুব সত্যকে অস্বীকার করে, তবে সে ব্যক্তি ভ্রান্ত, সত্যপথ ভ্রষ্ট।

সৈয়দ আবদুর রসিদ
(ষষ্ঠ মোদাররেস মাদ্রাসা আলিয়া কোলকাতা)
বিচক্ষণ মুফতী যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সত্য, সৈয়দ সাহেবের সম্বন্ধে ইহার বিপরীত ধারণা করা ভ্রানিমশ ও (গোমরাহি)।

মোহাম্মদ আব্দুল গণি
(চতুর্থ মোদার্রেস মাদ্রাসা আলিয়া কোলকাতা)
আল্লাহতায়ালা জনাব সৈয়দ সাহেব রহমাতুল্লাহর দ্বারা বহু মুসলমানকে বেদয়াত হইতে মুক্ত করিয়া উজ্জ্বল সুন্নতের দিকে হেদায়েত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি তাহার অনুস্মরণ করিয়াছে, সত্যপথ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে একজন মাওলানা ক্বারী হাফেজ হাজী কারামত আলি জৌনপুরী। দ্বিতীয় হাফেজ হাজী গাজী মাওলানা জামালুদ্দীন সাহেব ছিলেন, যে ব্যক্তি তাহাদের বিরুদ্ধচারণ করিবেন এবং তাহাদের হেদায়েতের প্রতি ইনকার করিবে, সে ব্যক্তি মেধাহীন, গোমরাহ এবং হেদায়েত ও সত্য পথভ্রষ্ট।

মোহাম্মদ এছমাইল।
(অষ্টম মোদার্রেস মাদ্রাসা আলিয়া কোলকাতা)
"দ্বীনদারগণের শিরভূষণ, পরহেজগারগণের অগ্রণী, প্রবীন হাদী শ্রেণীর আদর্শ, প্রবীন অলিগণের নেতা সৈয়দ আহমদ (রহ.) হানাফি ধর্মভীরু, অলিউল্লাহ ও উজ্জ্বল শরিয়তের আলেম ছিলেন। ছোট বড় সকলেই তাহা কর্তৃক সত্য পথ প্রাপ্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি তাহার হেদায়েত গ্রহণ করিয়াছেন, সে ব্যক্তি তরিকত ও শরিয়তের নিগুঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়াছে।

আহমদুল্লাহ
(সপ্তম মোদার্রেস মাদ্রাসা আলিয়া কলিকাতা)
জনাব সৈয়দ আহমদ সাহেব ও মাওলানা কারামত আলি সাহেব ধর্মভীরু ও পরহেজগার ছিলেন, তিনি অহাবী ছিলেন না।

মোহাম্মদ আশরাফ

(নবম মোদাররেস, মাদ্রাসা আলিয়া কোলকাতা আলি জনাব মাআলি আলকব, জাহেরী বাতেনী কামালতের অধিকারী, দ্বীন ও দুনিয়াবী গুণাবলীর ভাণ্ডার, বেদয়াত ধ্বংসকারী, শরিয়ত প্রচারক, জামানায় গাওছ জামানার অদ্বিতীয় ও আল্লাহতায়ালা হইতে সাহায্য প্রাপ্ত জনাব হজরত সৈয়দ আহমদ ! ছুন্নি হানাফী ছিলেন, তাহার খলীফা আলেমে রব্বানী ও অদ্বিতীয় ফাজেল জনাব মৌলভী কারামত আলী মরহুম মগফুর ও হানাফী মাজহাবাবলম্বী ছিলেন, কখনও কেহ যেন উক্ত দুই বোজর্গের সম্বন্ধে বাতীল ধারণা না করেন।

বেলায়েত হোছাএন

(দ্বিতীয় মোদাররেস মাদ্রাসা আলিয়া কোলকাতা)

জনাব হজরত অলিগণের শিরোভূষণ সৈয়দ আহমদ (রহ.) বড় দরের অলি হানাফী মজহাবলম্বী ছিলেন। এই সমুজ্জ্বল সূর্য্য দ্বারা একটি জগত আলোকময় হইয়াছে, যে কেহ তাহার দূর্ণাম ও অপবাদ করে, সে ব্যক্তি গোমরাহ (ভ্রান্ত) ভ্রান্তকারী, অপবাদকারীকে এইরূপ কুধারণা হইতে তওবা করা উচিৎ।

গোলাম ছালমানী আব্বাসী

(চতুর্থ মোদাররেস, মাদ্রাসা আলীয়া কোলকাতা)

জনাব সৈয়দ আহমদ মরহুম ও মৌলভী কারামত আলী মরহুম অতিশয় ধর্মভীরু ও পরহেজগার ছিলেন। বহু সহস্র লোক তাহার সঙ্গলাভে সত্যপথ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেহ যেন কিছুতেই তাহাদের সম্বন্ধে কুধারণা পোষণ না করেন, নচেৎ নিজের ক্ষতি সাধন করিবেন।

ছায়াদাত হোছাএন

(তৃতীয় মোদাররেস মাদ্রাসা আলীয়া কোলকাতা)

ছালেকদিগের অগ্রণী ও অলিগণের নেতা, হজরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ রহমাতুল্লাহ আলায়হে কে অহাবী বলা একেবারে মিথ্যা অপবাদ। দ্বীনের বোজর্গগণের দুর্নাম ও অপবাদ করা অন্যায় আচরণ ও গোমরাহী। হজরত মাওলানা যে বড় দরের অলি ছিলেন, ইহা অতি প্রকাশ্য ও জ্বলন্ত সত্য কথা। প্রবীন প্রবীন আলেম ও ফকিহগণ উহার অনুসরণ (তাবেদার) করিয়াছিলেন। ইহাই উক্ত কথার প্রকাশ্য ও অকাট্য দলীল।

আহমদ

(প্রথম মোদাররেস, মাদ্রাসা আলীয়া কোলকাতা)

আরও ৮ জন মাওলানা ও এমাম উক্ত ফাতওয়া সমর্থনে স্বাক্ষর অস্বীকার করে।

তথ্যসূত্র: 'সীরাতে-ওয়সী', পরিশিষ্ট-২

চতুর্থ অধ্যায়

তাসাওউফ

মুহাম্মদীয়া তরীকা

আল্লামা শায়খ বোরহানুদ্দীন উয়েসী

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الْحُكْمِ وَالْحِكْمَةِ السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ الْمَخْصُوْصِ بِالْخُلُقِ الْعَظِيْمِ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَأَتْبَاعِهٖ السَّالِكِيْنَ عَلٰى مَنْهَجِهٖ الْقَوِيْمِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

হজরত ছাইয়েদ আহ্‌মদ শহীদ বেরেলবী (রঃ) মা'রেফাতের এত উচ্চ দরজায় উন্নীত হইয়াছিলেন যে "ওয়াহ্‌দাতে অজুদ' বা 'তওহীদে অজুদী'— এই জটিল ও বিতর্ক মূলক বিষয়ে তিনি যেই সঠিক সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা জগতকে দান করিয়াছেন তাহা পরে আর কেহ করেন নাই। কাদেরিয়া, চিশ্‌তীয়া, নক্‌শবন্দীয়া, মুজাদ্দেদীয়া—এই চারি তরীকার তজ্‌দীদ বা সংস্কার স্বরূপ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া প্রত্যেক তরীকার ছবকগুলি তিনি নতুন আকারে সাজাইয়াছেন। হয়ত রছুলুল্লার (দঃ) রূহানী ফয়েজ ও এজাজতে তিনি তাহা করিয়াছেন বিধায় তাহার নামকরণ হইয়াছে 'মুহাম্মদীয়া তরীকা। ' মুহাম্মদীয়া তরীকা বলিতে ভিন্ন কোন তরীকা ছবক আকারে নাই। —সংস্কারকৃত প্রত্যেকটি তরীকার ভিতরেই রহিয়াছে মুহাম্মদীয়া তরীকা, যেরূপ হানাফী মজহাবের ভিতরেই বিদ্যমান রহিয়াছে ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) ও ইমাম আবু ইউছুফ (রঃ) উভয়ের মজহাব। অতএব, উক্ত তরীকাসমূহ যুক্ত নামে পরিচিত — কাদেরিয়া-মুহাম্মদীয়া, চিশ্‌তীয়া-মুহাম্মদীয়া, নক্‌শবন্দীয়া— মুজাদ্দেদীয়া-মুহাম্মদীয়া, যেরূপ যুক্ত নামে পরিচিত 'নক্‌শবন্দীয়া-মুজাদ্দেদীয়া'। তাই তাঁহার ছিল্‌ছিলার পীরগণ বয়য়াত করাইবার সময় বলিয়া থাকেন-বিচ তরীকা কাদেরিয়া-চিশ্‌তীয়া - নক্‌শবন্দীয়া-মুজাদ্দেদীয়া মুহাম্মদীয়া।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّنْ اَشْرَقَ بِشُعَاعِ سِرِّهٖ الْاَسْرَارُ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ.

তথ্যসূত্রঃ হাদিয়াতুছ্-ছালেকীন

তাসাউফের মহান মুর্শিদ: ইমামুত তরিকত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ)

অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম

উনবিংশ শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ হযরত সায়্যিদ আহমদ বেরেলভী (রহ) মুহম্মদীয়া তরীকার ইমাম ছিলেন। মুহম্মদিয়া তরীকার ইমাম হযরত সায়্যিদ আহমদ বেরেলভী (রহ) ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ২৩ জুন পলাশী বিপর্যয়ের ২৮ বছর পর ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ২৮ নভেম্বর অযোদ্ধার রায়বেরেলীতে এক ঐতিহ্যবাহী সায়্যিদ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত ইমাম হাসানের (রা) বংশের ৩৫তম ধাপে তাঁর এক পূর্বপুরুষ সুলতান শামছুদ্দীন ইলতুতমিশের শাসনামলে ভারত বর্ষে এসে স্থায়ী বসত স্থাপন করেন। এ বংশধারা রায়বেরেলীর অত্যন্ত বুযুর্গ বংশধারা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। সায়্যিদ আহমদ বেরেলভী (র) ছোট বেলায় খুব ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। তিনি কিশোর বয়স থেকেই স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে ওঠেন। তিনি তখন থেকেই শরীর চর্চা করতেন। নানা ধরনের ব্যায়াম ও সাঁতারের নানাধরনের কসরতে তিনি পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তিনি ১৬ বছর বয়সে পিতৃহারা হন। তিনি জাহিরী ইলমে যতটুকু ব্যুৎপত্তি লাভ করেন তার থেকে বেশি ইলমে লাদুন্নী লাভে ধন্য হন। ২১ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দে হযরত সায়্যিদ আহমদ বেরেলভী (রহ) দিল্লিতে এসে সেই সময়কার মশহুর পীর হযরত মাওলানা শাহ আবদুল আযীয দেহলভীর (রহ) হাতে কাদিরীয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দীয়া তরীকায় বায়‘আত হন। এবং অল্প সময়ের মধ্যে পীরের তাওয়াজ্জুহ ও ফয়েযের তাসীরে কঠোর রিয়াযতের মাধ্যমে প্রত্যেক তরীকার উচ্চতর মকামে উন্নীত হয়ে কামালিয়াত অর্জন করেন এবং খিলাফতের সনদ ও খিরকা লাভ করেন। তিনি রুহানিয়াত ইলমে এতোই ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন যেন সামান্য ফয়েযেই রুহানী উচ্চ মাকাম উপলব্ধি করতে পারঙ্গম হন এবং দশ লতীফার সামগ্রিক নূর অবলোকন করেন। এই সামগ্রিকতায় তরীকাসমূহের ঐক্যবোধ জাগ্রত করে; যার থেকে বিন্যাসিত হয় তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া। এই তরীকার সব অনুশীলন অধ্যায় নকশবন্দীয়া তরীকার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। তবে কিছু

কিছু মুরাকাবা স্তরে বেশি অনুশীলন করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। মূলত হযরত সায়্যিদ আহমদ বেরেলভী (রহ) হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ) ও হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্‌র (রহ) সংস্কার আন্দোলনের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন এবং বিপ্লবী মনন দ্বারা উদীপ্ত ছিলেন। এই কারণেই সড়ক নির্মাণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি যে তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া বিন্যস্ত করেছিলেন তাতে কতকগুলো সবক রয়েছে, যা কলবকে সজীব করে তোলে। যেমন- হকীকতে সায়ফুল্লাহ্‌র ফয়েয, মাকামাতে শোহাদার ফয়েয, নিসবতে জামি আর ফয়েয, কুওয়তের ফয়েয ইত্যাদি। এই ধরনের ফয়েয বা প্রাচুর্য প্রবাহ ফয়েয অনুশীলনকারীর ভেতরে এক অনন্য শক্তি সঞ্চারিত করে। কুওয়তের ফয়েযের মুরাকাবা হালতে মনে মনে গভীর অনুধ্যানের সঙ্গে পড়তে হয়- ইন্নাল কুওয়াতা লিল্লাহি জামী'আ; নিশ্চয়ই সমস্ত শক্তি আল্লাহ্‌র। এছাড়া হকীকতে সায়ফুল্লাহ্‌র ফয়েযে কলবের দিকে গভীর মনোনিবেশ করে কমপক্ষে ১০১ বার এই দরূদ শরীফ পড়তে হয়: আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন সায়ফিল্লাহিল কাতিই ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিম।

তরীকায়ে মুহাম্মদীয়াতের তা'লিম তিনি তাঁর মুরীদানের মধ্যে বিস্তৃতি করেন ফলে বিপ্লবী চেতনায় সবাই উদ্বুদ্ধ হন। তিনি যে জিহাদের ডাক দেন তাতে সাড়া দিয়ে উপ-মহাদেশের শত শত লোক সাড়া দেন, তিনি চেয়েছিলেন স্বদেশ বিজাতীয় প্রভাব ও শাসন থেকে মুক্ত হোক, মুক্তি ও স্বাধীনতার আস্বাদন লাভ করুক দেশ। তাঁর সান্নিধ্যে এসে লক্ষ লক্ষ মুসলিম হিদায়াত প্রাপ্ত হন, অনেক অমুসলিমও ইসলামে দাখিল হন। সৈয়দ নিসার আলী তিতুমীরও তাঁর মুরীদ হন।

তিনি বিরাট কাফেলা নিয়ে মক্কা শরীফ গমন করেন। হজ্জ ও যিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারা সমাপন করে দুই বছর ১০ মাস পর। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৯ এপ্রিল তিনি ফিরে আসেন এবং জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ থেকে প্রায় ছয় হাজার লোক এই জিহাদে শরীক হয়। বাংলাদেশ থেকে যাঁরা এই জিহাদে নেতৃত্ব দেন তাঁদের উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন: চট্টগ্রামের মাওলানা সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী (র.), হযরত শাহ ওয়ারেছ আলী (র.), নোয়াখালীর ইমামুদ্দীন (র.) প্রমুখ। এরা সবাই হযরত সায়্যিদ আহমদ (র.) এর নেতৃত্বে যার যার বাহিনী নিয়ে লড়াইয়ে শরীক হন। পাঞ্জাতার মাটিতে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন যাঁরা তাদের মধ্যে চট্টগ্রামের শাহ ওয়ারেছ আলী অন্যতম। পাঞ্জাতার মাটিতেই হযরত সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) কে আমীরুল মুমিনীন লকবে ভূষিত করা হয় এবং সবাই নতুন করে তাঁর কাছে বায়াত হন।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৬ মে শুক্রবার চাশতের সালাতের ওয়াক্তে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জেলার উত্তর-পূর্ব কোণে হাযারা জেলার উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত মিথাকোটের নিকটবর্তী বালাকোট নামক স্থানে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে হযরত

সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (রহ) বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন। এই যুদ্ধ প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে চলে। তাঁর বাহিনীর প্রায় তিনশত সৈন্য শাহাদত লাভ করেন। শত্রুদের সৈন্যসংখ্যা কয়েক গুণ বেশি ছিলো। শত্রু বাহিনীর বহু সৈন্য নিহত হয়। বালাকোট যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী বহু গাযী হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ) মুহাম্মদিয়া তরীকার ধারণা বহন করে যার যার এলাকায় ফিরে আসেন। বাংলাদেশে ফিরে আসেন গাযীয়ে বালাকোট হযরত নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী (রহ) ও হযরত মাওলানা ইমামুদ্দীন (রহ)। হযরত নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী (র.) এর খলীফা হচ্ছেন হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়াসী, ফুরফুরা শরীফের পীর মুজাদ্দিদে যামান আমীরুশ শরীআত হযরত মাওলানা শাহ সূফী আবু বকর সিদ্দীক (র.) এবং তাঁর খলীফা হচ্ছেন বর্তমান লেখকের আব্বা হুজুর কিবলা হযরত মাওলানা শাহ সূফী আলহাজ্ব তোয়াজ উদ্দিন আহমদ (র.)। এখানে আরও উল্লেখ্য যে পাঞ্জাতার যুদ্ধে শহীদ ওয়ারেছ আলীর (র.) পুত্র হচ্ছেন সূফী ফতেহ আলী ওয়ায়সী (র.)।

নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া আলিয়া আওর মুহাম্মদীয়া তরীকার সাজরা হচ্ছে- হযরত শাহ সায়্যিদ আহমদ (র) তাঁর পীর মাওলানা আবদুল আযীয দেহলভী (র.), হযরত শাহ ওলী উল্লাহ দেহলভী (র.) তাঁর পীর শাহ আবদুর রহীম (র.) তাঁর পীর সায়্যিদ আবদুল্লাহ আকবরাবাদী (র.) তাঁর পীর হযরত আদম বিন্নুরী (র.), তাঁর পীর ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.) এমনি ভাবে যেতে যেতে হযরত জাফর সাদিক (র), হযরত কাসিম (র.), হযরত সালমান ফারসি (র.), হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (র.) হয়ে সরকারে দোআলম নূরে মুজাসসাম হযরত হযরত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে যেয়ে মিশেছে। এ এক মহা আলোর পথ, যে পথের আল্লাহর খাস বান্দা ও আল্লাহর বন্ধু হয়ে যায়।

লেখক : পীর সাহেব দ্বারিয়াপুর শরীফ, উপদেষ্টা, ইনস্টিটিউট অব হযরত মুহম্মদ (স) সাবেক পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূত্রঃ ১৩ মে ২০১৬, ধর্মচিন্তা, ইত্তেফাক।

খোদাপ্রদত্ত জ্ঞান

মাওলানা মো. গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী

প্রচলিত পদ্ধতিতে জ্ঞান অর্জন ছাড়াও আল্লাহর বিশেষ করুণাপ্রাপ্ত বান্দাহগণ আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে সরাসরি এক ধরনের বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন, যা আল্লাহ তার বান্দাহগণের অন্তরে ইলহামের মাধ্যমে ঢেলে দেন। তাসাওউফের পরিভাষায় এ জাতীয় ইলমকে ইলমে লাদুন্নী বা ইলমে আসরার বা ইলমে বাতিন বলা হয়। বিভিন্ন হাদীস শরীফে এ ধরনের জ্ঞানের কথা বিভিন্নভাবে উল্লেখিত হয়েছে। উবাই বিন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

يا أبا المُنْذِرِ أَتَدْرِي أيُّ آيَةٍ مِن كِتابِ اللهِ معكَ أَعْظَمُ؟ قالَ: قُلتُ: اللهُ ورَسولُهُ أعْلَمُ. قالَ:يا أبا المُنْذِرِ أَتَدْرِي أيُّ آيَةٍ مِن كِتابِ اللهِ معكَ أَعْظَمُ؟ قالَ قُلتُ: اللهُ لا إلَهَ إلَّا هو الحَيُّ القَيُّومُ. (البقرة:٢٥٥). قالَ: فَضَرَبَ في صَدْرِي، وقالَ: واللهِ لِيَهْنِكَ العِلْمُ أبا المُنْذِرِ.

-হে আবুল মুনযির! তুমি কি জানো, আল্লাহর কালামের কোন আয়াতটি তোমার কাছে সবচেয়ে বড়? আমি বললাম, আয়াতুল কুরসী (اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ)। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) আমার বুকে আঘাত করলেন এবং বললেন, তোমার এই জ্ঞান বরকতময় হোক। (মুসলিম, আবূ দাউদ, মুসলিমের ভাষ্য)

এই হাদীসে প্রমাণিত হলো, সবচেয়ে ফদীলতসম্পন্ন আয়াত কোনটি তা ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা উবাই ইবন কাবের অন্তরে ঢেলে দেন। আর নবী করীম (স) তাকে মুবারকবাদ দেওয়ার মাধ্যমে উক্ত ইলম বা ইলমে লাদুন্নীর ফদীলত প্রমাণিত হলো।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي خَلَّادٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْعَبْدَ يُعْطِي زُهْدًا فِي الدُّنْيَا وَقِلَّةَ مَنْطِقٍ فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يلقى الْحِكْمَةَ (رواه البيهقي في شعب الإيمان)

-হযরত আবূ হুরাইরা এবং হযরত আবূ খাল্লাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যখন তোমরা এমন ব্যক্তিকে দেখতে পাও যাকে 'দুনিয়ার

প্রতি অনাগ্রহ' ও 'কম কথা বলার' বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে, তবে তোমরা তার নিকটবর্তী হও। কেননা তাকে হিকমত বা প্রজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। (ইমাম বাইহাকী শুআবুল ঈমানে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন)

হাদীসে যাকে 'হিকমত' বলা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তা-ই ইলমে লাদুন্নী বা খোদা প্রদত্ত জ্ঞান।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخْلَصَ لِلّٰهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ظَهَرَتْ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ-(أخرجه رزين)

مسند الشهاب: ورواه أبو نعيم في الحلية من جهة مكحول عن أيوب مرفوعا وسنده ضعيف وهو عند أحمد في الزهد مرسل بدون أيوب وله شاهد عن أنس رضي الله عنه

(المقاصد الحسنة:٣٩٥)

-হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার জন্য একনিষ্ঠভাবে (ইবাদত করে) চল্লিশটি প্রভাত অতিবাহিত করে, তার অন্তর থেকে জিহ্বায় হিকমত বা প্রজ্ঞার ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। (আল মাকাসিদুল হাসানাহ)

উল্লেখিত হাদীসের আলোকে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় বান্দাহদের বিশেষ কিছু ইলম দান করেন; যা ইতিপূর্বে কখনও বর্ণিত হয়নি বা তা অর্জন করাও সম্ভব নয়। এ ধরনের ইলমকে ইলমে লাদুন্নী বা ইলমে আসরার বা ইলমে বাতিন বলা হয়। আর আল্লাহর খাস বান্দাহর মাধ্যমেই এ ধরনের ইলমের প্রকৃত তত্ত্ব ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় বর্ণিত হয়; যে বিষয়ে ইতিপূর্বে কেউ কিছুই বর্ণনা করেনি। বর্ণিত হাদীস এ ধরনের জ্ঞানকে সমর্থন করে।

আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) তাফসীরে মাযহারীতে

وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ- البقرة:١٥١

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বুখারী শরীফে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে-

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَاءَيْنِ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ فِيكُمْ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ يَعْنِي مجْرى الطَّعَام (رواه البخاري)

-হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স) এর নিকট থেকে দুই পাত্র জ্ঞান সংরক্ষণ করেছি। এর একটি আমি তোমাদের কাছে বর্ণনা করেছি। অপরটি যদি বর্ণনা করি তাহলে এই কণ্ঠনালী কর্তিত হবে। (সহীহ বুখারী, হাদীস-১২০)

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) বলেন,

قلت إطلاق الوعاء على علم بجزئيات معدودة غير مستحسن ولايتصور جعله قسيما ونظيرا لعلوم الشريعة بل المراد العلم اللدني فإن قيل فما معنى قوله فلو بثثته لقطع هذا البلعوم، قلت معناه أنه لو بثثته باللسان لقطع هذا البلعوم لأن تلك العلوم والمعارف لا يمكن تعليمها ولا تعلمها بلسان المقال بل إنما تدرك بالانعكاس ولسان الحال–

(المظهري–١/١٤٩)

-আমি বলি, ইলমের একটি পাত্রকে শরীআতের কতিপয় বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সমীচীন নয় এবং একে ইলমে শরীআতের খণ্ডিত অংশ বা উদাহরণ দেওয়ার মতো কতিপয় বিষয় হিসেবে চিন্তা করাও যায় না। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইলমে লাদুন্নী। যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) এর বক্তব্য 'যদি আমি উহা বর্ণনা করি তাহলে এই কণ্ঠনালী দ্বিখণ্ডিত হবে' এ বাক্যের মর্মার্থ কী? আমি বলব এর অর্থ হচ্ছে, আমি যদি তা জিহ্বার দ্বারা বর্ণনা করি তবে এই কণ্ঠনালী দ্বিখন্ডিত হবে। কেননা এই জ্ঞান বা মারিফত জিহ্বার বর্ণনার দ্বারা শিখা যায় না এবং শিখানোও যায় না। বরং এ জ্ঞান অর্জন করা যায় প্রতিফলন ও অভিব্যক্তির মাধ্যমে। (তাফসীরে মাযহারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৯)

শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) أشعة اللمعات কিতাবে আল্লামা তিবীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, উক্ত ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সুরক্ষিত বাতিনী ইলম। আর একেই প্রকৃতপক্ষে ইলমে লাদুন্নী বলা হয়।

ইলমে লাদুন্নী বা খোদাপ্রদত্ত জ্ঞান সম্পর্কে পাঠকদের উদ্দেশ্যে মাওলানা রূমী (র.) এর মসনবী শরীফে উল্লেখিত কতিপয় কবিতা উল্লেখ করছি-

رومیاں آں صوفیاند اے پسر
রূমীয়া আঁ সূফীয়ান্দ আয় পেসার
نے ز تکرار کتاب و نے ہنر
নায় যে তাকরারে কিতাবো নায় হুনার

অর্থ: প্রিয় বৎস! রূমীগণ এমন সূফীদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের কিতাব পাঠ ও শিল্প-বিজ্ঞান শেখার প্রয়োজন নাই।

لیك صیقل کرده اند آں سینا
লেকে ছায়কাল করদা আন্দ আঁ সীনা
پاك ز آز وحرص وبخل وکینہ ہا
পাক যে আযও হিরছো বোখলো কীনাহা

অর্থ: কিন্তু তারা নিজেদের বক্ষকে পরিশুদ্ধ করে নিয়েছে, লোভ-লালসা, কৃপণতা ও হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পবিত্র থেকেছে।

آں صفائے آئینہ وصف دل است
আঁ ছাফায়ে আঈনা ওয়াছফে দেলাস্ত
صورت بے منتہا را قابل ست
সূরতে বেমুনতাহা রা কাবেলাস্ত

অর্থ: অতঃপর তাদের দিল ঐ আয়নার ন্যায় স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হওয়া তাদের অন্তরের বৈশিষ্ট্য হয়ে যায়, ফলে তারা অনন্ত জ্ঞান হাসিলের যোগ্য হয়ে যায়।

عکس ہر نقشے نتابد تا ابد
আকসে হার নকশে নাতাবাদ তা আবাদ
جز ز دل ہم با عدد ہم بے عدد
জুয যেদিল হাম বা আদদ হাম বে আদদ

অর্থ: অন্তর ব্যতীত এমন কিছুই নাই যাতে নকল বিষয়ের নকশা অঙ্কন করা যায়, আর ঐ চিত্র গণনাযোগ্য হোক আর না হোক।

اہل صیقل رستہ اند از بو ورنگ
আহলে ছায়কাল রাস্তাআন্দ আয বূ ও রাঙ্গ
ہر دمے بینند خوبی بے درنگ
হার দামে বীনান্দ খুবী বে দারাঙ্গ

অর্থ: যাদের অন্তর পরিষ্কার তারা মেহনত করে ইলম হাসিল করা থেকে মুক্তি লাভ করেছেন, তারা সর্বদা প্রশংসনীয় ইলম বিনা দ্বিধায় প্রত্যক্ষ করেন।

তথ্যসূত্র : মাসিক পরওয়ানা, ডিসেম্বর ২০২১

পঞ্চম অধ্যায়

বুক রিভিউ

মোহাম্মদ রুহুল আমীন বশীরহাটি র. প্রণীত কারামতে আহমদীয়া : সত্যের অদম্য উচ্ছ্বাস

মোহাম্মদ মঈন উদ্দিন আলম

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্যঃ মাওলানা রুহুল আমিন বশীরহাটি (র.) প্রণীত 'কারামাতে আহমদিয়া' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় বাংলা ১৪০৬ সালে বশীরহাট "নবনূর প্রেস" থেকে। মোট পৃষ্টা সংখ্যা ১০২। ইমামুত তরিকত সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরলভী (র.) বিপক্ষে প্রচারিত একটি বিজ্ঞাপন রদ করে বিভিন্ন অপবাদের জবাব দেওয়া হয়েছে গ্রন্থটিতে। অর্থাৎ গ্রন্থটি প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য ছিল সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরলভী (র.) এর মুজাদ্দেদিয়াত প্রমান ও তাঁর বিরুদ্ধে আরোপিত বিভিন্ন অপবাদ খন্ডন করা। গ্রন্থটি ফুরফুরা শরীফের আলা হযরত মুজাদ্দিদে জামান আবু বকর সিদ্দিকী আল কুরাইশী (র.) এর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় প্রনয়ণ করা হয়।

লেখক পরিচিতি ঃ- মুজাদ্দেদে জামান আবু বকর সিদ্দিকী (র.) এর অন্যতম প্রধান খলিফা, যুগশ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন, সূফি, মুনাযেরে আযম ও হাফিজুল হাদিস 'আল্লামা রুহুল আমিন বশীরহাটি (র.) প্রজ্ঞার গভীরতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায় তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে যা তাঁকে ইতিহাসের পাতায় চির অমর করে রেখেছে। তিনি প্রায় দেড় শতাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তাঁর রচিত কিতাবের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে ডঃ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ "রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা" (ই.ফা.বা প্রকাশিত) গ্রন্থের ২৩৫ পৃষ্ঠায় বলেন-বাংলা - আসামের উলামাদের মধ্যে ইসলামী গ্রন্থ রচনায় তাঁর দান সর্বাধিক। তাঁর রচনার কলেবর বারো হাজার তিনশত তিরাশি পৃষ্ঠা। মূলত এর সংখ্যা আরো অনেক বেশী।

মাওলানা রুহুল আমীন বশীরহাটি (র.) প্রায় দুই লক্ষ হাফিজের হাফেজ ছিলেন। মুম্বাইয়ের জামে মসজিদের তৎকালীন ইমাম সাহেব, আল্লামা রুহুল আমীন বশিরহাটি (র.)-এর ওয়াজ শুনে বিস্মিত হয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, আপনারা কোরআনের হাফেজ অনেক দেখেছেন কিন্তু হাদিসের হাফেজ দেখেন নাই। । আজ হাদিসের হাফেজ দেখুন।

বিখ্যাত আলেম, হযরত মাওলানা মোয়েজদ্দিন হামিদী সাহেব (র.) বলেন, ১৩২৩ সালের ৮ই চৈত্র পীর হযরত মাওলানা গোলাম সালমানী (র.)-এর ঈছালে ছওয়াবের মহফিলে ফুরফুরা শরীফের মুজাদ্দেদে জামান, পীর কেবলা আবু বকর সিদ্দিকী (র.) এরশাদ করেন, -"আমার খান্দানে এলমে লাদুন্নির ফয়েজ আছে, আমি উহা মাওলানা রুহুল আমিন বশীরহাটি (র.)-কে দিয়েছি। ফুরফুরার পীরসাহেব তাঁকে "বড় মাওলানা" লকব দিয়েছিলেন এবং ভূয়সী প্রশংসা করতেন।

পবিত্র মক্কা-মদিনা সহ দেশ বিদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে তিনি কিতাব সংগ্রহ করেন। মাওলানা আবুল হুসাইন নোমানী সাহেব বলেন- আমি বসিরহাটের লাইব্রেরী দেখতে যেয়ে কিতাবের নামের তালিকায় দেখলাম, অভিধানের সংখ্যা'ই চল্লিশখানা, আমি এ দেখেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, যাঁর সংগ্রহশালায় ৪০ খানা অভিধান, তিনি কোন ধরণের প্রজ্ঞাবান কিতাবী ছিলেন। কিতাবের নামের তালিকার জন্য ৪২ দিস্তা কাগজ লেগেছিল।

মাওলানা রুহুল আমিন (র.) সংগৃহীত কিতাবের সংখ্যা সঠিক ভাবে না পেলেও অসংখ্য কিতাবকে অবলম্বন করে তিনি যে অমূল্য গ্রন্থাবলী রচনা করে গেছেন সে সময় সে দৃষ্টান্ত বাংলা-আসামের কোন আলেমের পক্ষে সম্ভব হয়নি। হাফিজ মুবারক আলী রহমানী সাহেব বলেন, 'আল্লামার প্রণীত প্রায় ৮০/৮৫ খানা কিতাব পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, উনার প্রণীত গ্রন্থে তিনি যে সব কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সে সব কিতাবের নাম বর্তমান আলেমদের জানা নাই বলিলে ভুল হবে না।

'কারামতে আহমদীয়া' গ্রন্থের প্রধান প্রধান আলোচ্যে বিষয় সংক্ষেপে তুলে ধরা হলঃ

গ্রন্থের সূচী দশটি বিষয়ে বিন্যস্ত হয়েছে যথা-

১. মোজাদ্দেদ হওয়ার মর্ম।

২. হযরত ছৈয়দ আহমদ বেরিলি ছাহেবের মোজাদ্দেদ হওয়ার দলিল।

৩. মোজাদ্দেদের আবির্ভাব।

৪. হযরত মোজাদ্দেদ সাহেবের প্রতি অহাবি হইবার মিথ্যা অপবাদ।

৫. ছৈয়দ মোজাদ্দেদ ছাহেবের এলমের অবস্থা।

বিশ্ববিখ্যাত কিতাব "মিরকাতের"-এর ১/২৪৭/২৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন- প্রত্যেক শতাব্দীর প্রথমে কিম্বা শেষ ভাবে যখন ইলম ও সুন্নাত কমিয়া যাইবে এবং অজ্ঞতা ও বেদআত বৃদ্ধি হইবে, তখন এইরূপ লোক পয়দা হইবে, তাহারা বেদআত হইতে সুন্নাতকে পৃথক করিয়া প্রকাশ করিবেন, ইলমের উন্নতি সাধন ও আলেমগণের সমাদর করিবেন, বেদআত ধ্বংস ও বেদআত প্রচারকগণকে পরাজিত করিবেন।

উপরিউক্ত দলিল সমুহের ভিত্তিতে স্পষ্ট'ই প্রমানিত হয় যে, সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরলভী (র.) ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ছিলেন, কারণ তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে ১২০২ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ধর্মহীনতা ও শিরিক-বিদ'আত থেকে মুক্ত করে মুসলিম জাতির মাঝে রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর সুন্নাত ও শরিয়তের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে প্রমানিত রয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে হাদিসের আলোকে এই আপত্তির জবাবও প্রদান করা হয়েছে যে, মুজাদ্দিদ হওয়ার জন্য শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত থাকিয়া সংস্কার সাধন করা আবশ্যক নয় বরং শতাব্দীর শুরুতে বা শেষে জন্মগ্রহণ করে শতাব্দীর যে কোন ভাগে সংস্কার সাধন করলেই, কর্তব্য পালন হয়ে যায়।

২। ওহাবী হওয়ার অপবাদ সহ আরো বিভিন্ন অপবাদের অকাট্য যুক্তি দ্বারা জবাব আলোচ্য গ্রন্থে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী র. বিরুদ্ধে আনিত ওয়াহাবী হওয়ার মিথ্যা অপবাদ আরোপের কারণ ও অপবাদ সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করে তা খন্ডন করা হয়েছে।

প্রধানত দুইটি কারণে হযরত সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরলভী (র.)-কে ওয়াহাবি অপবাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

প্রথম কারণ- তিনি সকল ধরনের শিরক-বিদআত ও ভণ্ডামী চিহ্নিত করে এসবের পরিণাম সম্পর্কে মুসলিমদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, তাদেরকে সেই পথ থেকে ফিরিয়ে সঠিক ইসলাম ও রাসূল (দ.)-এর সুন্নাতের পথে এনেছিলেন, যার ফলে ভন্ডদের ধোকাবাজীর ব্যবসা বন্ধ হতে থাকে তাই তারা পরবর্তীতে একত্রিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

দ্বিতীয় কারণ- লা-মাজহাবীদের একটি দল প্রবঞ্চনা করতঃ লোকদেরকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে সায়্যিদ আহমাদ বেরলভী (র.) সাহেবের দলের বলে প্রচার করার চেষ্টা করে, অথচ সায়্যিদ আহমাদ বেরলভী (র.) এই লা-মাজহাবীদেরকে নিজ জামাত থেকে তাদের মন্দ আকিদার কারণে প্রকাশ্য ভাবে বের করে দিয়েছিলেন। সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরলভী (র.) ছিলেন একজন বিশিষ্ট সূফি ও ইমামুত তরিকত এবং হানাফি মাজহাবের অনুসারী একজন সুন্নি ব্যক্তিত্ব। যিনি উপমাহাদেশের প্রখ্যাত অলি ও আলিমে দ্বীন হযরত মাওলানা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (র.)-এর সুযোগ্য সন্তান ও

৬. ছৈয়দ ছাহেবের খলিফাগণের তালিকা।
৭. হযরত মোজাদ্দেদ ছৈয়দ ছাহেবের এলমে লাদুন্নির অবস্থা।
৮. হযরত মোজাদ্দেদ ছাহেবের কারামত।
৯. এজহারোল হক (মৌলবী শাহাবুদ্দিন ছাহেবের বিজ্ঞাপন রদ)।
১০. মাওলানা মোহম্মদ আলি ছাহেবের উক্তি খণ্ডন।

উক্ত সূচীর আলোকে গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নের পাচটি বিষয়কে গ্রন্থের মূল উপজীব্য বলা যেতে পারে।

১। সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী র. মুজাদ্দেদ হওয়ার দলীল।
২। ওহাবী হওয়ার অপবাদ সহ আরো বিভিন্ন অপবাদের অকাট্য যুক্তি দ্বারা জবাব।
৩। সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী র. ইলমে লাদুন্নীর বিশ্লেষণ।
৪। সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী র. শান ও কারামতের বর্ণনা।
৫। অপবাদ খন্ডন।

উপরোক্ত পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোকপাতঃ

১। মুজাদ্দিদ হওয়ার দলীল-গ্রন্থের প্রথমদিকেই আলোচনা করা হয়েছে হযরত সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরলভী (র.)-এর মুজাদ্দিদ হওয়ার প্রমান সম্পর্কে। অত্যন্ত যৌক্তিক ও তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে তাঁর মুজাদ্দিদ হওয়ার দলিল পেশ করা হয়েছে। সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী র. এর সময়কাল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তৎকালীন সময়ে ব্রিটিশ শক্তির কাছে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ও দ্বীনি এবং সামাজিক কুসংস্কার ও নানারকম শিরক, বিদ'আত ইত্যাদিতে নিমজ্জিত মুসলিম উম্মাহকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে কুর'আন সুন্নাহ'র দিকে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয়তায় একজন মুজাদ্দিদের আগমন আবশ্যক ছিল। সেই ক্রান্তিলগ্নে মুজাদ্দিদ হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন আওলাদে রাসূল হযরত সায়্যিদ আহমাদ বেরলভী (র.)। তাঁর তাজদীদি কর্মসূচিগুলোর দিকে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে এটা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে নিঃসন্দেহে তিনি একজন মুজাদ্দিদ ছিলেন।

তাঁর মুজাদ্দিদ হওয়ার প্রমান সম্পর্কে আলোচ্য গ্রন্থে হাদিস শরীফের আলোকে যে আলোচনা করা হয়েছে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো-

রাসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- নিশ্চয় মহিমান্বিত আল্লাহ তায়ালা উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর প্রথম ভাগে বা শেষ ভাগে এইরূপ লোক পয়দা করিবেন যিনি (বা যাহারা) তাহাদের জন্য তাহাদের দীনকে সঞ্জিবিত (তাজা) করিবেন। (হযরত আবু দাউদ (র.) এই হাদিসটি রেওয়াইয়াত করিয়াছেন) # মোল্লা আলি কারি তার

খলিফা শাহ আব্দুল আজিয মুহাদ্দেসে দেহলভী (র.)-এর প্রধান খলিফা ছিলেন। অন্যদিকে আরবের মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নামক ব্যক্তিটি মাজহাব ও তাসাউফের ঘোর বিরোধী এবং এইগুলোকে হারাম হিসেবে সাব্যস্তকারী ছিলেন। পরস্পর বিপরীত মতাদর্শের হওয়ার পরও সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী র. কে মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের বিকৃত আকিদার সাথে মিলিয়ে ওয়াহাবি বলে অপবাদ দেওয়া গভীর ষড়যন্ত্র ও অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়।

ওয়াহাবি মতবাদ খণ্ডন সম্পর্কে গ্রন্থটিতে যেসব দলিল পেশ করা হয়েছে সংক্ষেপে তা তুলে ধরা হলঃ

১। সৈয়দ সাহেবের দলের আলেমগণের মধ্যে সেহাহ সেত্তা, তফছির, হানাফি মজহাবের আকায়েদ, ফেক্‌হ ও ওছুলে ফেক্‌হ শিক্ষা দেওয়া দিবারাত্র প্রচলিত রহিয়াছে। সেই আলেমগণই সেহাহ সেত্তা, সুন্নি মজহাবের তফছিরগুলি, আকায়েদ ও ফেকে্হর কেতাবগুলির মতন ও অনুবাদ ছাপাইয়াছেন। উক্ত আলেমগণই কোরাণ মজিদ, হাদিছ শরিফ, ফেক্‌হ ও তাছাওয়ফের কেতাবগুলির অনুবাদ (তর্জ্জমা) করিয়াছেন। তাঁহাদের দলের মধ্যে পরহেজগারি, খোদার উপর তাওয়াক্কোল (আত্মনির্ভর) করা, তাছাওয়ফ অনুযায়ী সুন্নতের পয়রবি করা, এলমে - তজবিদ ও কেরাতের সুক্ষ্ম আলোচনা করা, তদনুযায়ী কোরাণ শরিফ পাঠ ও শিক্ষা দেওয়া, কোরাণ শরিফ কণ্ঠস্থ করা, বালকদিগকে কণ্ঠস্থ করান, সুন্নতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জেকর মোরাকাবা করা, দরুদ শরিফ দালা-এলোল-খয়রাত ও হেজলোল-আ'জম অধিক পরিমাণ তারাবিহ খতম করা, সমস্ত সুন্নত জারি করা ও বেদয়াত কার্যগুলি ত্যাগ করা যেরূপ ভাবে জারি রহিয়াছে, এরূপ অন্য কোন দলে নাই। ইহা সূর্য্যের ন্যায় সকলের নিকট প্রকাশ্য রহিয়াছে। এই সমস্ত কার্য আহলোল্লাহ, সুফি ও হানাফিদলের নিদর্শন বলিয়া স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। উপরোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে কোনটি ওহাবী হওয়ার চিহ্ন, ইহা কি কেহ বলিতে পারেন ? সত্য কথা এই যে, ওহাবিদের মজহাব প্রাচীন কালে ছিল না, তাহাদের মজহাবের কোন কেতাব দৃষ্টিগোচর হয় নাই যাহাতে উক্ত মজহাবের অবস্থা বুঝা যাইতে পারে।

২। লা-মজহাবিদিগের মধ্য হইতে এক দল লোক সৈয়দ ছাহেবকে মন্দ বলিয়া থাকে, তকলিদ করা ও মুরিদ হওয়া নাজায়েজ বলিয়া থাকে। আর তাহাদের অন্য এক দল প্রবঞ্চনা করত: লোকদিগকে ধোকা দিবার উদ্দেশ্যে নিজদিগকে সৈয়দ সাহেবের দলের বলিয়া প্রচার করিত অথচ সৈয়দ সাহেব এইরূপ লোকদিগকে নিজের জামায়াত হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন।

৩। সৈয়দ ছাহেবের দলের কুওয়াতোল ইমান, নেজামোল- ইসলাম ও মেয়াতো- মাছায়েল প্রভৃতি কেতাবে উক্ত লা-মাজহাবিদের খুব রদ লেখা

হইয়াছে। এই দুইদল লা-মাজহাবি সুন্নতের পয়রবি করার দাবি করার সত্ত্বেও যখন অনভিজ্ঞতা বশতঃ অনেক সুন্নত বরং ওয়াজেবকে বেদয়াত বলিতে লাগিল, তখন মোজাদ্দেদ ছাহেবের দলেরা তাহাদিগকে নিজেদের দল হইতে প্রকাশ্যে ভাবে বাহির করিয়া দিলেন।

৪। হিন্দুস্তানের দুনিয়াদার ও বেদয়াতিরা প্রকাশ্য ভাবে সৈয়দ সাহেবকে আদব করিত এবং অন্তরে তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট ছিল, উক্ত মন্দ আলেমরা এই দলের সহিত মিলিত হইল, নিজেদের বেদয়াত দলিল কে মিথ্যা বাতীল দলীল দ্বারা সপ্রমাণ করিতে লাগিল, সৈয়দ ছাহেবের বেদয়াত প্রতিবন্ধক খলিফা ও সহায়তাকারিদেরকে ওহাবী বলিতে আরম্ভ করিল, হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেবের দলকে ওহাবী বলিতে সপ্রমাণ করার ধারণায় উল্লিখিত লা-মজাহিবিদিগকে সৈয়দ ছাহেবের দলভুক্ত করিয়া দেখাইবার ছলনা করিতে লাগিল এবং তাহাদের বাতীল মত ও কথা উল্লেখ করিতে লাগিল। যদিও সৈয়দ সাহেবের দলেরা উক্ত লা-মজহাবিদের প্রতি নারাজ এবং তাহাদের মতের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন, অথচ উক্ত ভন্ড আলেমগণের প্রতারণায় পড়িয়া দুনিয়াদারগণ ও মূর্খগণ বিনা তদন্তে সৈয়দ ছাহেবের দলকে ওহাবী বলিতে আরম্ভ করিল, অথচ কেহ অদ্যাবধি হজরত সৈয়দ আহমদ ছাহেবকে ওহাবি বলিতে পারে নাই।

৩। সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী র. ইলমে লাদুন্নীর বিশ্লেষণ-আলোচ্য গ্রন্থে সায়্যিদ আহমাদ বেরলভী রহ. এর ইলমে লাদুন্নী বিষয়ে যে দলীল ভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে তা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

১। সাধারণ লোকের মধ্যে প্রকাশ আছে যে, সৈয়দ ছাহেব এলম শিক্ষা করিতে ছিলেন। এক দিবস উক্ত হজরত মোহাদ্দেছ ছাহেব হজরত সৈয়দ ছাহেবের এলমে লাদুন্নির যোগ্যতা দেখিয়া তাঁহার কেতাব পড়া বন্ধ করিয়া দিয়া বাতেনি তা'লিম দিতে মনযোগী হইলেন। উক্ত হজরতের তা'লিমের বরকতে হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেবের অবশিষ্ট সমস্ত জাহেরি এলম হাছেল হইয়া গেল। (মোহাদ্দেস সাহেব বলতে শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী র. কে বুঝানো হয়েছে)

২। যে সময় হজরত মাওলানা আবদুল হাই ছাহেব হজরত ছনদোল আওলিয়া শাহ ছাহেবের খেদমতে আরজ করিয়াছিলেন যে, হজরত সৈয়দ ছাহেবের হুকুমে আমি তাহাজ্জোদের নামাজে ছাহাবাদিগের ন্যায় লজ্জত (শান্তি) পাইয়াছি এবং তাঁহার নিকট বয়য়ত করিয়াছি। আরও তিনি বলিলেন, ইয়া হজরত, আমি অনেক তরিকতপন্থীদিগের তাওয়াজ্জোহের হালকায় বসিয়াছি, অদ্য রাত্রীতে সৈয়দ ছাহেবের কথায় আমার যেরূপ উপকার হইয়াছে, অন্য কোন স্থানে এরূপ উপকার হয় নাই, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সৈয়দ ছাহেবের তা'লিম কোন তরিকার তা'লিম ? তখন হজরত শাহ ছাহেব বলিলেন, মিঞা, এইরূপ লোক যাহা

মুখে বলিয়া দেন, তাহাই তরিকা। এইরূপ লোক নিজেই তরিকার সৃষ্টিকারি হইয়া থাকেন। এত বড় জামানার শেখ মোহাদ্দেছ যাহার এত প্রশংসা করেন তাঁহার মকবুল ও কামেল হওয়াতে কি সন্দেহ আছে ?

৩। হজরত সৈয়দ সাহেবের মধ্যে তাঁহার পয়দা হওয়ার সময়ে আল্লাহ তায়ালা কামালাতে-নবুয়ত নিহিত করিয়া রাখিয়া ছিলেন, ইহার চিহ্ন এই যে, মোনাজাত বিশেষত: নামাজের মিষ্টতা অনুভব শরিয়তের সম্মান করা, সুন্নতের পয়রবি করিতে অতিশয় আগ্রহ, বেদয়াতের সংশ্রব হইতে নিতান্ত ঘৃণা এবাদতের দিকে অন্তরের আকর্ষণ ও অপকর্ম ও কুকার্য্যে স্বাভাবিক ঘৃণা বাল্যজীবনে তাঁহার মধ্যে প্রকাশ্য ছিল, মূলকথা এই যে, প্রাকৃতিক পবিত্রতা (পাকি) তাঁহার স্বভাবে প্রকাশিত ও সৌভাগ্যের জ্যোতিঃ তাঁহার ললাটে আলোকিত ছিল।

৪। হজরত সৈয়দ সাহেব উক্ত উপকরণগুলি শিক্ষা করার পুর্বেই কাদেরিয়া, চিশতিয়া ও নকশবন্দীয়া এই তিন তরিকার নেছবত লাভ করিয়াছিলেন। কাদেরিয়া ও নকশবন্দীয়া তরিকা লাভের বিবরণ এই যে, উক্ত মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ সাহেবের তাওয়াজ্জোহ ও বয়য়তের বরকতে (গুণে) জনাব হজরত গওছোছ ছাকালাএন পীরানপীর আবদুল কাদের জিলানী ও হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দী এই বোজর্গদ্বয়ের রুহ উক্ত সৈয়দ সাহেবের শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রকাশিত হইল এবং এক মাস অবধি উক্ত এমামদ্বয়ের প্রত্যেকে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে নিজের তরিকার দিকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টাবান হইলেন, উভয় পাক রুহের মধ্যে এ সম্বন্ধে বিরোধ চলিতে থাকিল, অবশেষে উভয় রুহের মধ্যে এইরূপ সন্ধি স্থাপিত হইল যে, তাঁহারা উভয়ে একত্রিত ভাবে উক্ত সৈয়দ সাহেবের উপর তাওয়াজ্জোহ দিলেন। তৎপরে এক দিবস উভয় রুহ তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া এক প্রহর পর্য্যন্ত তাঁহার নফছের উপর সজোরে তাওয়াজ্জোহ দিলেন। ইহাতে দুই খান্দানের নেছবত তিনি প্রাপ্ত হইলেন।

চিশতিয়া তরিকার বিবরণ এই যে, এক দিবস হজরত সৈয়দ সাহেব হজরত খাজায়খাজাগণ কোৎবোল-আকতাব বখতিয়ার কাকি (রঃ) সাহেবের কবর শরিফের নিকট মোরাকাবা করিতে বসিলেন, এমতাবস্থায় সৈয়দ সাহেব উক্ত কোৎবোল-আকতাব সাহেবের রুহের সহিত সাক্ষাৎ পাইলেন। উক্ত হজরত সাহেব সৈয়দ সাহেবের উপর এরূপ প্রবল তাওয়াজ্জোহ প্রদান করিলেন যে, উহাতে তাঁহার মধ্যে চিশতিয়া তরিকার নেছবতের প্রথম ভাগ আরম্ভ হইল। এই ঘটনার কিছুকাল পরে এক দিবস উক্ত সৈয়দ সাহেব দিল্লীর আকবর আবাদী মছিজদে একদল মুরিদের সঙ্গে বসিয়াছিলেন। লেখক উপরোক্ত মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত লোকেরা মোরাকাবা করিতেছিলেন; তিনি মুরিদদিগকে তাওয়াজ্জোহ দিতেছিলেন। মজলিশের শেষাংশে তিনি আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, অদ্য খোদাতায়ালা অন্য মধ্যস্থ ব্যতীত চিশতিয়া তরিকার নেছবত

সম্পূর্ণরূপে আমাকে দান করিয়াছেন। ইহার পরে তিনি চিশতিয়া তরিকা শিক্ষা দিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, এই কেতাব লিখিত আইন কানুন আবিস্কার করিলেন। এইরূপ মোজাদ্দেদিয়া, শাজেলিয়া ইত্যাদি তরিকার নেছবত লাভ করিলেন।"

৪। সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী র. শান ও কারামতের বর্ননা-

কারামতে আহমদীয়া গ্রন্থে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী র. এর সুমহান মর্যাদা বুঝাতে তাঁর কিছু কারামত বর্ণনা করা হয়েছে। কারামত সংখ্যা ১৮ টি। নিম্নে কয়েকটি বর্ননা দেওয়া হল।

১) তাওয়ারিখে আজিবা ৫৩ পৃষ্ঠা---" মাখজনে-আহমদিয়া প্রণেতা লিখিয়াছেন, কলিকাতা শহরে এক মহা অর্থশালী লোক ছিল, কিন্তু সর্বদা মদপানে রত থাকিত। সেই লোকটি এক দিবস সৈয়দ সাহেবের খেদমত শরিফে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, হুজুর, আমি মদপানে এইরূপ অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, আমি উহা পান করা ব্যাতিত বাচিয়া থাকিতে পারি না। আমি আপনার নিকট সমস্ত গুনাহ হইতে তওবা করতে পারি কিন্তু মদ পান ত্যাগ করতে পারিব না। তিনি বলিলেন, আচ্ছা বাবা তাহাই করিও, কিন্তু আমার সাক্ষাতে মদ পান করিওনা। সেই ব্যক্তি শর্ত শিকার করিয়া, তাহার নিকট অন্যান্য গুনাহ সকল হইতে তাওবা করিয়া বায়াত হইল। বাড়িতে উপস্থিত হইয়া তার মদ পানের ইচ্ছা প্রবল হইলে, চাকরের নিকট মদ চাহিল। চাকর পিয়ালায় মদ ঢালিয়া তাহার নিকট আনয়ন করিল। যখনই সে ব্যক্তি পিয়ালাটি মুখের নিকট আনয়ন করিল তখনই দেখিতে পাইল যে, হজরত সৈয়দ সাহেব দাতে আঙ্গুলি ধরিয়া তাহার সম্মুখে দাড়াইয়া রহিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ সে ব্যক্তি পিয়ালাটি নিক্ষেপ করিয়া তওবা তওবা করিয়া দাড়াইয়া পড়িল, কিন্তু তৎপরে আর হজরত সৈয়দ সাহেবকে তথায় দেখিতে পাইল না। ইহাতে সে বুঝিল যে, হয়ত তাহার ভ্রান্তি হইয়াছে। হজরত সৈয়দ সাহেব এখানে কীরূপে আসিবেন? দ্বিতীয় বার সে ব্যক্তি চাকরকে হুকুম দিল যে, অন্য একটি পিয়ালা করিয়া মদ আনয়ন কর। চাকর মদ আনিলে, সে ব্যক্তি পিয়ালা হাতে লইয়া উহা পান করার ইচ্ছা করিল। অমনি পূর্বের ন্যায় এবারও হজরত সৈয়দ সাহেবকে দন্ডায়মান দেখিয়া পিয়ালাটি ফেলিয়া দিল ও হজরত হজরত বলিয়া সেই দিকে ধাবিত হইল, কিন্তু তথায় কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তৎপরে সে ব্যক্তি একটি কামরায় প্রবেশ করিয়া দরওয়াজা বন্ধ করিয়া মদের পিয়ালা মুখের নিকট লইয়া যাওয়া মাত্রই হজরত সৈয়দ সাহেবকে সম্মুখে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পিয়ালাটি ফেলিয়া দিল এবং তাহাকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। অবশেষে নিরূপায় হইয়া পায়খানার মধ্যে মদ পান করার ইচ্ছা করা মাত্র উক্ত হজরতকে সম্মুখে দন্ডায়মান দেখিয়া মদ পান হইতে তওবা করিল এবং সমস্ত শরাবের পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিল।"

২) উক্ত কিতাবের ৫৯ পৃষ্ঠাঃ---হজরত সৈয়দ সাহেবের হজ্জে যাওয়া কালে সমুদ্রের মধ্যে স্টিমারের মিষ্ট পানি শেষ হইয়া গিয়াছিল। জাহাজের পরিচালকগণ উক্ত হজরতকে ইহা অবগত করাইয়া দেন। তিনি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিতে বসিয়া গেলেন। দোয়ার সময় তাহার প্রতি এলহাম হইল যে, আল্লাহ তায়ালা এই স্থানের সমুদ্রের পানি মিষ্ট করি দিয়াছেন। যে পরিমান ইচ্ছা হয় পানি জাহাজে পূর্ণ করিয়া লও। তখন হজরত জাহাজের পরিচালকগণকে এই সুসুংবাদ শুনাইয়া দিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ আবশ্যক মত মিষ্ট পানি সমুদ্র হইতে তুলিয়া জাহাজে পূর্ণ করিয়া লইলেন। সেই পানি অতি মিষ্ট ও পরিষ্কার ছিল।

৩) আরও উক্ত কিতাবের, ৬৬ পৃষ্ঠা ঃ-- হজরত সৈয়দ সাহেব হজ্জ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কলিকাতার একজন নামজাদা আলেম সৈয়দ সাহেবের প্রতি অভক্তি প্রকাশ করিত। এক দিবস মৌলভি আশরাফ আলী সাহেব তাহাকে উক্ত হজরতের নিকট লইয়া গেলেন, তিনি সে সময় কোন দাওয়াত আহার করিতেছিলেন। উক্ত সাহেবদ্বয়কে দেখিয়া কিছু ভক্ষণ করিতে অনুরোধ করেন এবং উক্ত নামজাদা আলেমের হাত ধরিয়া বলিলেন, আপনি হাত ধুইয়া শরিক হইয়া যান। হাত ধরা মাত্র উক্ত আলেম সাহেব অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন। তৎপরে তিনি চৈতন্য লাভ করিয়া তওবা করতঃ ভক্তির সহিত তাহার হাতে মুরিদ হইয়া গেলেন। তিনি বলিতেন যে, সৈয়দ সাহেব যখন আমার হাত ধরিয়াছিলেন, তখনই খোদাতায়ালার রহমতের ফয়েজ পতনের প্রতিবন্ধক স্বরূপ মানতেক, হেকমত ইত্যাদি নাপাক এলমগুলি আমার অন্তর হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল এবং খোদা প্রাপ্তির পথ আমার পক্ষে উন্মুক্ত হইয়া গেল। সৈয়দ সাহেব তাহাকে একটি পিরহান দিয়েছিলেন। কলিকাতার উচ্চ আদালতের মুফতি পদ খালি হইলে, তিনি উক্ত পিরহান দুই হস্তে ধরিয়া খোদাতায়ালার নিকট এইরূপ দোয়া করেন "খোদাতায়ালা তুমি ইহার বরকতে উক্ত পদ আমার নামে নির্ধারিত করিয়া দাও।" তাহার এই দোয়া খোদাতায়ালার দরবারে মকবুল হয় এবং তিনি উক্ত পদের অধিকারী হন।

৪) উক্ত কেতাব, ৩৮/৩৯ পৃষ্ঠা, -- হজরত সৈয়দ সাহেব আপন ভগ্নিকে একটি টাকা বরকতের জন্য দিয়াছিলেন, তিনি উক্ত টাকাটি সিন্দুকে রাখিয়া দিয়াছিলেন, তাহার যত টাকার দরকার হইত, উক্ত সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া ব্যয় করিতেন, কখনও তাহার টাকার অভাব হইত না। এক দিবস তিনি সৈয়দ সাহেবকে ইহা অবগত করাইলেন। তিনি ইহা শ্রবণ করিয়া সেজদায় পড়িয়া আল্লাহ-তায়ালার শোকর আদায় করিলেন "

৫) উক্ত কিতাব, ৭৩ পৃষ্ঠা ---সৈয়দ সাহেব পানিপথে পৌছিয়া একজন পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত লোককে চৈলৎশক্তি রহিত অবস্থায় শয্যাশায়ী দেখিয়া বলিলেন হে যুবক, উঠিয়া দাড়াও, আমাদের সহিত জেহাদ করিতে চল। ইহা বলা

মাত্র সে ব্যাক্তি এইরূপ দূরারোগ্য ব্যাধি হইতে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গেল, যেন ইতিপূর্বে কোন ব্যধি ছিল না, তৎপরে সে ব্যক্তি তাহার সঙ্গী হইয়া গেল।"

৬) উক্ত কিতাব, ৩৯/৪০ পৃষ্ঠা---"অনেক আত্মহারা (মজজুব) ফকির, উন্মাদ ও পাগল, সৈয়দ সাহেবের সামান্য দৃষ্টিপাতে চৈতন্য লাভ করিয়া ছালেক ফকির বা সুস্থ হইয়া যাইত। তিনি যাহাকে দোয়া করার জন্য হাত উঠাইতেন যাহার শরীরে হাত বুলাইতেন, বা কিছু পড়িয়া যাহার শরীরে ফুঁক দিতেন, সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সুস্থ হইয়া যাইত।

কারামত বর্ণনার শেষে আল্লামা রুহুল আমীন বশীরহাটি র. মন্তব্য করেন- হজরত সৈয়দ ছাহেবের কারামত গুলি উল্লেখ করিতে একখানা বৃহৎ কেতাব লেখার দরকার, এস্থলে এই কয়েকটি কারামত লিখিয়া প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।

৫। অপবাদ খন্ডন

সর্বশেষ এই গ্রন্থে সায়্যিদ আহমাদ শহিদ বেরলভী (র.)'র বিরুদ্ধে রচিত মৌলবি শাহাবুদ্দিন সাহেবের "এজহারুল হক" বিজ্ঞাপন রদ করা হয়েছে এবং মাওলানা মোহাম্মাদ আলি সাহেবের অভিযোগ খন্ডন করা হয়েছে।

মূল্যায়ন : কারামতে আহমদীয়া গ্রন্থের মাধ্যমে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)-এর বিরুদ্ধে আনিত সকল অভিযোগের জবাব অত্যন্ত সুন্দর ও দালিলিক ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যার ফলে পরবর্তীতে অদ্যাবধি আর কেও আনুষ্ঠানিকভাবে এর প্রতিউত্তরে কোনো বিজ্ঞাপন ও কিতাব রচনা করার সাহস দেখায়নি।

উইলিয়াম হান্টারের "দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস" ও সায়্যিদ আহমাদ বেরলভী রহ. এর ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনঃ একটি বিশ্লেষণ

মুহাম্মাদ ফাহিম মুন্সী
মুহাম্মাদ নাহিদ সারোয়ার

ভূমিকা

"দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস" উইলিয়াম হান্টার রচিত একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ। গ্রন্থটি ১৮৭১ সালে সর্বপ্রথম ও ১৮৭৬ সালে সর্বশেষ মুদ্রিত হয়। এরপর "The Comrade Publishers" কর্তৃক ১৯৪৫ সালে বইটি পুনঃমুদ্রিত হয়। লর্ড মেয়ো কর্তৃক নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে উইলিয়াম হান্টার এই গ্রন্থটি রচনা করেন। এটি মূলত একটি রিপোর্ট। রিপোর্টের বিষয় বস্তু হলো তৎকালীন ভারতীয় মুসলমানরা মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ধর্মত বাধ্য কি না সেই বিষয়ের প্রতিবেদন। এটি মূলত ৪ টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে আলোচ্য বিষয় উত্তর পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত সিত্তানা ও মুলকার সংগ্রাম সংঘাত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বিদ্রোহী সংগঠন সমূহের বিবরণ। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই জিহাদ করা জায়েয কি না এবং এই বিষয়ে আলেম সমাজ ও নব্য শিক্ষিতদের আলোচনা সমালোচনা। পরিশেষে চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে মুসলমানদের উপর অন্যায় অবিচারের বিবরণ এবং শাসক মনোভাবসুলভ প্রতিকারের উপায়।

এই লেখাটির শীর্ষ সর্বপ্রথম আমাদের মনে যে প্রশ্নগুলো জাগায় সেগুলো হলো উইলিয়াম হান্টার কে? সাইয়্যিদ আহমাদ ব্যক্তি হিসেবে কে? ও উইলিয়াম হান্টারের গ্রন্থের সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা কি? এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সাথেই বা তিনি কিভাবে জড়িত? চলুন একে একে সমস্ত প্রশ্নের উত্তরের দিকে আগানো যাক। তবে মনে রাখা ভালো যে, সকল প্রশ্নের উত্তর আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ থেকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো।

উইলিয়াম উইলসন হান্টারঃ উইলিয়াম উইলসন হান্টার ১৮৪০ সালের ১৫ জুলাই গ্লাসগো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার নামে পরিচিত।

উইলিয়াম হান্টার খাস ইংরেজ নন, তিনি ছিলেন স্কটিশ। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে (আইসিএস) যোগদান করে তিনি ভারতবর্ষে আসেন। দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে কাজ করেছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস, অবস্থা নিয়ে অনেক বইও লিখেছেন। তার মধ্যে A Comparative Dictionary of the Languages of India and High Asia: With a Dissertation. Based on the Hodgson Lists, Official Records, and Mss। Trübner and Company-1868, The Indian Musalmans, A Brief history of the Indian peoples। Oxford: Clarendon Press-1880, ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া [৩] (২৬ খন্ডে), Williams Jackson, A. V., সম্পাদক (১৯০৬)। History of India: From the first European settlements to the founding of the English East India Company। History of India| 6। London: Grolier Society, Williams Jackson, A. V., সম্পাদক (1907)। History of India: The European struggle for Indian supremacy in the seventeenth century, History of India-7 London: Grolier Society বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সায়্যিদ আহমাদ বেরলভীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ সায়্যিদ আহমাদ বেরলভী রহ. ১২০১ হিজরীর মুহররাম মাসে ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রায় বেরেলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. এর ফরজন্দ ছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকেই খেলাফত প্রাপ্ত। বংশীয় দিক থেকে তিনি রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ আ-লিহী ওআ সাল্লামার বংশধর। এখানে একটি কথা উল্লেখ না করলেই নয়। রসূলের বংশধর হিসেবে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা আর সকলকে যে সম্মান, শ্রদ্ধাভরে জেনে ও মেনে থাকেন সায়্যিদ আহমাদ রহ. এর বিষয়েও সকলে তেমনটি কি না বিবেকের কাছে একটি প্রশ্ন ছুড়েই দেয়া যায়। কথায় আছে বিবেক মানুষের সবচেয়ে বড় আদালত। কম কথাই অনেক কথা। চলুন সামনে আগাই।

"দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস" গ্রন্থে সায়্যিদ আহমাদ প্রসংগের স্বরূপঃ এই প্রশ্নটির জবাব আমি এক কথায় দিতে চাই। আর সেটা হলো উইলিয়াম হান্টারের সমগ্র রিপোর্টের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলেন "সায়্যিদ আহমাদ"। এই কথাটি যে কোনো পাঠক সহজেই উপলব্ধি করতে পারবে। উইলিয়াম হান্টার কোনো কোনো জায়গায় সায়্যিদ আহমাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন আবার কোথাও তার বিপরীত। প্রশংসা আর অপ্রশংসা উভয় বিষয়েই আমরা ধীরে ধীরে আলোচনা করবো ও তার মোক্ষম জবাব প্রদান করবো।

সায়্যিদ আহমাদ বেরলভীর আন্দোলন ও একটি প্রশ্নঃ লেখক উইলিয়াম হান্টারের মতে সায়্যিদ আহমাদ বেরলভীর আন্দোলন হলো শিরক ও বেদাত বিরোধী আন্দোলন। তিনি যখন পবিত্র হজ্জব্রত পালন করে স্বদেশে ফিরে আসেন তখনই

এই আন্দোলনের সূচনা। সেই সময়ে ইংরেজদের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও লাহোর সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় শাসন পরিচালনা করছিলো শিখরা। শিখরা জুলুমের সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করেছিলো। হাজার হাজার মুসলমান তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। তারা মসজিদে আযান দিতে দিতো না, গো জবেহ করা ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের নিষিদ্ধ কাজ। এহেন অত্যাচারে যখন মুসলমানরা অতিষ্ঠ তখনই মুসলমানদের অধিকার রক্ষায় ও দ্বীনের নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ হিসেবে সায়্যিদ আহমাদ আন্দোলনের ডাক দেন। ১৮২৬ সালের ২১শে ডিসেম্বর শিখদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা। একের পর এক আন্দোলনের পর ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই মে বালাকোটের প্রান্তরে সায়্যিদ আহমাদ রহ. শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন। এই ছিল সায়্যিদ আহমাদ বেরলভীর আন্দোলনের সার সংক্ষেপ। তবে এখন নির্দ্বিধায় পাঠক মহলে একটি প্রশ্ন উঁকি দিতে পারে। সেটি হলো সায়্যিদ আহমাদ বেরলভীর আন্দোলন ছিল শিখদের সঙ্গে। তবে কেনো তাঁর আন্দোলনকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়? যেহেতু আমরা দাবী করেছি তাই এই প্রশ্নের কৈফিয়ৎ দিতেও আমরা বাধ্য। এই প্রশ্নের উত্তর পর্বে ধন্যবাদ জানাতে হয় উইলিয়াম হান্টারকে। কারণ আমাদের পক্ষ হতে তিনিই বেশ চমৎকারভাবে প্রশ্নটির উত্তর দিয়ে দিয়েছেন। ব্যাপারটি হলো এরকম যে, ১৮৩১ সালে সায়্যিদ আহমাদ শাহাদাত বরণ করেন। তারপর একটা সময় যেয়ে শিখদের আধিপত্যও শূন্যের দিকে চলে আসে। তখন আধিপত্য বিস্তার হয় ইংরেজদের। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিত্তানা ও মুলকার আন্দোলনকারী মুসলান সম্প্রদায় কত বৃহৎ আকারে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তার জ্বলন্ত প্রমাণ উইলিয়াম হান্টারের এই গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েই লেখক সেই বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। ১৮৫০ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ইংরেজরা ১৬ বার যুদ্ধ পরিচালনা করেছে এবং এর জন্য ৩৩ হাজার স্থায়ী সৈন্যের দরকার পড়েছিলো। আর ১৮৫০ থেকে ১৮৬৩ সালের মধ্যে এই যুদ্ধের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০ এ। আর এর জন্য প্রয়োজন হয়েছিলো ৬০ হাজার স্থায়ী সৈন্যের। এই বিশাল অস্ত্রসজ্জিত ধনী ইংরেজ সামরিক বাহিনীর বিপক্ষে কিভাবে এ অঞ্চলের নেহায়েত বিদ্রোহী মুলমানরা এত দীর্ঘ আন্দোলন চালিয়ে যেতে সক্ষম হলো। এই প্রশ্নের উত্তর উইলিয়াম হান্টার দিয়েছেন এভাবে যে- "সায়্যিদ আহমাদ বেরলভীর পদ্ধতি বা তন্ত্রই ভারতীয় ইতিহাসে সবচেয়ে বৃহৎ ধর্মীয় উজ্জীবন আনয়ন করেছে এবং গত পঞ্চাশ বছর ধরে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উত্তেজনা জাগিয়ে রেখেছে"। এই কথা বিনা সন্দেহে প্রতীয়মান যে শিখদের বিরুদ্ধে সায়্যিদ আহমাদ বেরলভী রহ. যে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন তা মূলত ব্রিটিশদের বিরুদ্ধেই আন্দোলন।

হান্টার লিখেছেন -Sayyid Ahmad wisely suited himself to the times, gave up robbery, and about 1816 went, to studz the Sacred Law under a

Doctor of high repute at Delihi. After a three years' noviciate he started forth as a preacher, and by boldly attacking the abuses which have crept into the Muhammadan faith in India, obtained a zealous and turbulent following. The first scene of his labors lay among the descendants of the Rohillas, 4 for whose extermination we had venally lent our troops fifty years before, and whose sad history forms, one of the ineffaceable blots on Warren Hastings' career. (The Indian Musalmans, Page-3)

"তিনি (সায়্যিদ আহমদ) দস্যুবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর একজন মশহুর আলেমের (শাহ আব্দুল আজীজের) নিকট শরীয়তি শিক্ষা গ্রহণ করতে উপস্থিত হলেন। তিন বৎসর সেখানে শিক্ষা গ্রহণ করার পর সায়্যিদ আহমদ ইসলাম প্রচার করতে শুরু করেন এবং ভারতীয় ইসলামে যেসব অনাচার বা বিদআত ঢুকে পড়েছে, সেগুলির প্রতি কঠোর আক্রমণ পরিচালনা করে একদল গোঁড়া ও হাঙ্গামাবাজ অনুচর সংগ্রহ করলেন। তাঁর প্রথম কর্মব্যাস্ততা ছিল রোহিলাদের বংশধরদের নিয়ে, যাদের নির্মূল করতে আমরা পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বেতনভূক বাহিনী ধার দিয়েছিলাম এবং প্রসঙ্গটা ওয়ারেন হেস্টিংসের জীবনে একটা অমোচনীয় কলঙ্ক হিসাবে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। তাদের উত্তর পুরুষেরা গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে আমাদের উপর অশেষ প্রতিশোধ নিচ্ছে এবং এখনও বিদ্রোহী বসতির সবচেয়ে সাহসী অস্ত্রধারী হচ্ছে তারাই।" (The Indian Musalmans, Page-3) হান্টারের এই স্বীকারোক্তি থেকে বুঝা যাচ্ছে যে সায়্যিদ আহমদ তাঁর পীর শাহ আব্দুল আজীজের নিকট থেকে শিরক বিদআতের বিরুদ্ধে আন্দোলনের শিক্ষা করেন এবং এর পাশাপাশি ইংরেজ বিরোধীতায় তৎপর হয়ে উঠেন। অর্থাৎ সায়্যিদ আহমদ একদিকে শিরক-বিদআত বিরোধী ও ইংরেজ বিদ্বেষী দুটোই।

হান্টার আরও লিখেছেন, His Deputies continued therefore to levy money and men, but especially money, in the chief towns along the valley of the Ganges where the Prophet had preached on his journey to Calcutta in 1820-22. A perennial stream of malcontents thus flowed from our territory to the Fanatic Colony. (The Indian Musalmans, Page-8)

"বিশেষতঃ ইমাম সাহেব ১৮২০-২২ সালে কলকাতা যাওয়ার পথে গঙ্গানদীর উপত্যকায় অবস্থিত যে সব বড় শহরে প্রচার কার্য চালিয়েছিলেন, সে সব শহরে টাকা পয়সা সংগ্রহ করতে লাগল। এভাবে আমাদের রাজ্য থেকে অজস্র ধারায় অসন্তুষ্টের দল জিহাদী বসতিতে জামায়েত হতে লাগল।" (The Indian Musalmans, Page-8)

হান্টারের এই বক্তব্য থেকে পরিস্কার বুঝা যায় যে সায়্যিদ আহমদ অনেক আগে থেকে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করে আসছেন। তিনি কট্টর ব্রিটিশ বিরোধী বলেই হান্টার সায়্যিদ আহমদকে দস্যু দরবেশ বলে কটাক্ষ করেছেন।

আর উইলিয়াম হান্টার নিজের লেখনীতেই অকপটে স্বীকার করেছেন শিখদের কিভাবে ইংরেজরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছেন। এমনকি ইংরেজরা আড়ালে থেকে শিখদের দিয়ে ইসলাম বিরোধী আইন পরিচালনা করেছে। শিখরা সায়্যিদ আহমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। এই প্রসঙ্গে মাওলানা মুহাম্মাদ মিঁয়া (রহঃ) লিখেছেন,

"কতই না ভাল হত, যদি শিখ ইংরেজের স্বরূপ উপলব্ধি করত এবং সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে নিজ সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হত! কিন্তু ওঁরা সৈয়দ সাহেবের পতন ঘটিয়ে ১০/১৫ বছরের মধ্যে শিখ হুকুমতেরই মৃত্যুঘন্টা বাজিয়ে দিল।" (শানদার মাযি, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২০৯)

আবার মুসলমান এবং হিন্দুদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কথা হান্টার এইভাবে উল্লেখ করেছেন-The Musalmans of India are, and have been for many years, a source of chronic danger to the British Power in India. For some reason or other they hold aloof from our system, and the changes in which the more flexible Hindus have cheerfully acquiesced, are regarded by them as deep personal wrongs. (Indian Musalman, Page –2)

"ভারতীয় মুসলমানেরা হচ্ছে এদেশে ব্রিটিশ শক্তির জন্য চিরন্তন বিপদ। কোন না কোন কারণে তারা আমাদের শাসন প্রণালী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। শিষ্ট ভাবাপন্ন হিন্দুরা যেখানে আমাদের প্রবর্তিত পরিবর্তনগুলি আনন্দের সঙ্গে মেনে নিয়েছে, সেখানে মুসলমানেরা যেগুলিকে তাদের ভীষন অবিচার হিসেবেই ধরে নিয়েছে।" (Indian Musalman, Page – 2)

তাহলে বুঝাই যাছে যে হিন্দুরা পুরোপুরিভাবে ব্রিটিশদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন। সেজন্য তাঁরা সায়্যিদ আহমদের বাহিনীকে সমর্থন করতে পারেন নি। এটা সায়্যিদ আহমদের আন্দোলনের বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হিসাবে ধরা যায়। আর ইংরেজরা প্রথমেই ইসলাম বিরোধী কোনো পদক্ষেপও গ্রহণ করেনি যা পরবর্তীতে ধীরে ধীরে গ্রহণ করেছে একথাও লেখক স্বীকার করেছেন। এমন সাহসী বক্তব্যের জন্য লেখককে অশেষ সাধুবাদ জানাতেই হয়।

মহরাণী তথা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে মুসলানরা ধর্মত বাধ্য কি না? একটি বিশ্লেষণঃ পাক ভারতীয় সুন্নী মুসলমানরা সম্প্রতি সজোড়ে ঘোষণা করতে শুরু করেছিল যে, মহারাণীর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতে মুসলমানরা ধর্মত বাধ্য নয়। এই উদ্দেশ্যে তারা দুইটি পৃথক ফতোয়া সংগ্রহ করেছিল এবং তৎকালীন কোলকাতা সোসাইটি এই প্রশ্নের জবাবে বলিষ্ঠ ভাষায় একটি পুস্তিকায় এগুলো সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেছে। কিন্তু এই ফতোয়ার শুরুতেই ছিল পরস্পর

বিরোধী প্রতিজ্ঞা। উত্তর ভারতের আলেমরা ফতোয়া দিলেন যে ভারত শত্রুর দেশ তাই জিহাদ অপ্রাসঙ্গিক। আর কোলকাতার আলেমরা ফতোয়া দিলেন ভারত ইসলামের দেশ তাই এখানে জিহাদ বে-আইনী। উইলিয়াম হান্টারের মতে এই ফতোয়াতেই বরং জিহাদের যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করেছে। উইলিয়াম হান্টার এখানে বিষয়টি পর্যালোচনা করার জন্য দ্বারস্থ হয়েছেন শরীয়তের বিধানের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্ডিত ইমাম আযম হযরত আবু হানীফা রহ. এর। একটি দেশ দারুল হারব (লড়াইয়ের ঘর) নাকি দারুল ইসলাম এই ক্ষেত্রে ইমামে আযমের আরোপিত ৩ টি শর্ত আছে। যা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

একটা দেশ যে জন্য দারুল ইসলাম থেকে দারুল হারব বা শত্রুর দেশ হয়ে যায়, তার তিনটি প্রধান শর্ত :

ইশতেহারটির তৃতীয় পাতায় উল্লিখিত ফতোয়া-ই-আলমগীরী অনুসারে -

১। যখন কাফেরের হুকুমাত প্রকাশ্যে চালু হয় এবং ইসলামের বিধি-বিধান প্রতিপালিত হয় না।

২। যখন দেশটি এমন দেশের সীমানায় পড়ে, যেটি দারুল - হুরব এবং দারুল-ইসলামের কোনো শহর সেই দেশ ও দারুল - হুরবের মাঝখানে পড়ে না।

৩। যখন কোনো মুসলমানের ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকে না; কিংবা যিম্মী (যে বিধর্মী স্থায়ীভাবে হুকুমাতের বশ্যতা স্বীকার করেছে) ইসলামী হুকুমাতের যে-সব শর্ত-সুবিধা ভোগ করতো, সে-সবও আর থাকে না। ফতোয়া-ই-আলমগীরী ব্যতীত ইমাদীয়া প্রভৃতি পুরাতন গ্রন্থ অনুসারে -

১। যখন কাফেরের হুকুমাত প্রকাশ্যে চালু হয়।

২। যখন দেশটি এমন দেশের সীমানায় পড়ে, যেটি দারুল - হুরব এবং সে দেশের ও দারুল - হুরবের মাঝখানে কোনো দারুল-ইসলাম পড়ে না এবং দারুল ইসলাম থেকে সে দেশে সাহায্য আনা যায় না।

৩। যখন মুসলমান কিংবা যিম্মী কারও 'আমান-ই-আওয়াল' থাকে না।

তৎকালীন সময়ে ইংরেজদের হুকুমাতের সাপেক্ষে দেশে কাফিরদের হুকুমাত পরিপূর্ণ রূপে চলছিল। তাই প্রথম শর্ত মেনে নিতে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই। আর সেই সময়ে ভারত ও ইংল্যান্ডের মাঝে এমন কোনো দেশই ছিল না যেটি ছিল দারুল ইসলাম এবং ভারতে সাহায্য পাঠাতে পারে। আর মাঝে যে জলরাশি বা দড়িয়া পড়ে "হামাবী" ও "তাহতাবীর" মতানুযায়ী স্পষ্টত দড়িয়া হলো দারুল হারব। তাই দ্বিতীয় শর্ত মেনে নিতেও কোনো বাঁধা রইলো না। সেই সময়ে প্রকাশিত ইশতেহার সবচেয়ে বেশি জল ঘোলা করেছিলো তৃতীয় শর্তে উল্লিখিত "আমান-ই-আউয়াল" শব্দের ব্যাখ্যা। ইশতেহারটি এই শব্দের অনুবাদ করেছিল "ধর্মীয় স্বাধীনতা" হিসেবে। কিন্তু আমান শব্দের সোজাসাপটা অর্থ দাঁড়ায়

নিরাপত্তা আর "জামিউর রুমুয" নামক গ্রন্থ যা মুসলমানরা অস্বীকার করতে সাহসও করতে পারে না সেই গ্রন্থে এই "আমান-ই-আউয়াল" শব্দের পরিষ্কার ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। ব্যাখ্যাটি হলো এরূপ যে একটা দেশ তখন দারুল হারব হয়ে ওঠে যখন ১) মুসলমানরা ও তাদের জিম্মীরা ততটুকু মাত্র আমান ভোগ করে যতটুকু বিধর্মীরা তাদেরকে স্বেচ্ছায় দান করে ২) এবং যে ধর্মীয় পূর্ণ মর্যাদা নিজেদের হুকুমতে তারা ভোগ করতো এবং শাসকের জাতি হিসেবে যে মর্যাদা তারা বিধর্মীদেরকে ভোগ করতে দিতো, যখন সে সবের আর অস্তিত্ব থাকে না। লেখকের মতে তৎকালীন ভারতে ২ টি শর্তই খাটে। তাই অবশ্যই ভারত তখন দারুল ইসলাম থেকে দারুল হারবে পরিণত হয়েছিল। আর আলেমদের ও মুসলমানদের জারী করা ফতওয়া ভিত্তিহীন হয়ে দাড়িয়েছিল। বরং তৎকালীন পরিস্থিতি অনুযায়ী ধর্মত জিহাদ করাই আবশ্যক ছিলো।

তাই ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে উপমহাদেশের সর্বজন স্বীকৃত আলেম 'শাহ আব্দুল আযীয এক ফাতওয়া জারি করে ইসলামী আন্দোলনের দ্বার উন্মোচিত করেন। ফাতওয়াটি হলঃ "ইংরেজ অফিসাররাই এখন দেশের শাসন পরিচালনা করছে। তাদের শাসন চলার অর্থ হলো- তারা দেশরক্ষা জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রণ, রাজস্ব, ট্যাক্স, ওশর, খারাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচার ব্যবস্থা প্রভৃতিতে একচ্ছত্র ক্ষমতার মালিক। ভারতীয়দের এ সব বিষয়ে কোন কর্তৃত্ব নেই। যদিও তারা জুমু'আর নামায আযান, গরু জবাই এসব ইসলামী রীতিনীতিতে কোন প্রতিবন্ধকতা বা বাঁধার সৃষ্টি করছে না, কিন্তু এগুলো হলো শাখা-প্রশাখা। তবে যে সব বিষয় - উপরিউক্ত বিষয়সমূহের এবং স্বাধীনতার মূল বিষয় যেমন- মানবীয় মৌলিক অধিকার, নাগরিক অধিকার জনগণের বাক স্বাধীনতা, সে সবের প্রত্যেকটি ছিনিয়ে নিয়েছে এবং পদদলিত করছে। মসজিদ ধ্বংস করা হচ্ছে। তাদের পূর্ব অনুমতি তথা পাসপোর্ট -পারমিট ব্যতীত হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে কারো শহরে গমনাগমনে বাধা দেওয়া হচ্ছে। সাধারণ প্রবাসী ও ব্যবসায়ীদের শহরে আগমন ও প্রত্যাগমনের অনুমতি দান দেশের স্বার্থরক্ষার্থে কিংবা নাগরিক অধিকারের ভিত্তিতে প্রদান করছে না, বরং তাদের স্বার্থ বিবেচনায়ই করা হচ্ছে। যদিও বা হায়দারাবাদে, লক্ষ্ণৌ এবং রামপুরের শাসকগণ ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়ার কারণে সেখানে সরাসরি তাদের শাসন প্রচলিত নেই, তবুও সমগ্র দেশের উপরই 'দারুল হরব' -এর হুকুম প্রযোজ্য হবে।"

এ 'ফাতওয়া' সম্পর্কে মাওলানা 'উবায়দুল্লাহ সিন্ধী বলেন, "ইমাম 'আব্দুল আযীয সর্বপ্রথম ফাতওয়া দিয়েছিলেন যে, উপমহাদেশে মুসলিম অধিকৃত এলাকায় যদিও নামে মাত্র দিল্লীর সম্রাটের কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া হয়, কিন্তু কার্যত, সে সব এলাকা দারুল হরবের অন্তর্গত। লেখক একজন মুসলমান না হওয়া সত্ত্বেও এই সত্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। পুনরায় তার সাহসী সিদ্ধান্তের কারণে তাকে সাধুবাদ জানাতেই হয়।

সায়্যিদ আহমাদ বেরলভীর প্রসঙ্গে উইলিয়াম হান্টারের বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতাঃ একটি পর্যালোচনাঃ

পর্যালোচনার এই ক্ষেত্রে যদি শুধু সায়্যিদ আহমাদ বেরলভীর বিষয়ে উইলিয়াম হান্টারের করা প্রশংসার দিক গুলোই মেনে নেই তাহলে এটা হবে পক্ষপাতিত্ব। বরং উভয় দিক আলোচনায় এনে সত্য উদঘাটনের প্রচেষ্টাই করবো। তবে এর আগে উইলিয়াম হান্টার লেখক হিসেবে কোথাও কোথাও অত্যন্ত সতর্কতার সাথে দ্বিমুখী নীতি পোষণ করেছেন সেই দিকে কিছু আলোকপাত করা যাক। তিনি প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন মুসলমানরা শিখদের উপর অন্যায় হামলা অত্যাচার করেছেন। পরবর্তীতে যদিও তিনি শিখদের কিছু অন্যায়ের দিক তুলে ধরেছেন তবে এ কথা একটুও স্বীকার যান নি যে মুসলমানরা নিজেদের অধিকার রক্ষায় আন্দোলন করতে বাধ্য হয়েছিল। এমনকি ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনগুলোকেও তিনি দেখেছেন জাতিগত স্বার্থের দিক থেকে। তবে কেনো এই আন্দোলন মুসলমানরা করছে সেটা পরে আলোচনা করলেও যৌক্তিকতা স্বীকার করতে চান নি। বরং ইংরেজরা বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করেছে এটাই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তিনি ইংরেজদের পদক্ষেপকে যুদ্ধ হিসেবে এবং মুসলমানদের আন্দোলন বা যুদ্ধকে জিহাদে আখ্যায়িত করে কলুষিত করার অপচেষ্টা করেছেন। ইংরেজদের হঠকারিতা, অন্যায়, অত্যাচার সম্পর্কে শুধু মুসলমানরা নয় সমগ্র ভারতের মানুষ একমত। কিভাবে তারা নবাব সিরাজউদ্দৌলার সাথে হঠকারি করে ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে সে কারোই অজানা নয়।

সায়্যিদ আহমাদ বেরলভী সম্পর্কে উইলিয়াম হান্টার প্রধানত যে অপবাদগুলো দিয়েছেন সেগুলো হলোঃ

১) সায়্যিদ আহমাদ দস্যু ছিলেন ও লুটতরাজ করে জীবন যাপন করতেন।

২) সায়্যিদ আহমাদ ওহাবী ছিলেন।

৩) সায়্যিদ আহমাদ অপ্রাসঙ্গিক জিহাদ ডেকেছেন এবং মুজাহিদগণকে ভুল পথে পরিচালিত করেছেন।

উইলিয়াম হান্টার প্রথমেই অকপটে সত্য স্বীকার করেছেন যে সায়্যিদ আহমাদ রসূলের বংশধর। কিন্তু নিজের মনগড়া রিপোর্টে কলমের খোচায় কাউকে দস্যু প্রমাণ করা যায় না লেখক হয়তো তা ভুলেই গিয়েছিলেন। সমগ্র বইয়ের কোথাও সায়্যিদ আহমাদের দস্যুবৃত্তি সম্পর্কে কোনো রেফারেন্স হান্টার দিতে পারেন নি। এটি সম্পূর্ণই তার নিজের বানোয়াট বক্তব্য। উইলিয়াম হান্টার জন্মগ্রহণ করেছেন ১৮৪০ সালে আর মারা যান ১৯০০ সালে। অর্থাৎ স্পষ্ট যে তিনি সায়্যিদ আহমাদের সমসাময়িক নন। বরং তাঁর শাহাদাতের আরও ৯ বছর পর হান্টারের

জন্য। তাহলে নিশ্চয়ই হান্টার সায়্যিদ আহমাদ সম্পর্কে দস্যু হওয়ার যে মন্তব্য করেছেন সেটা কোনো ইতিহাস থেকে নেয়া। অন্যথায় সায়্যিদ আহমাদ সম্পর্কে জানার কোনো উপায় লেখকের ছিলো না। কোন ইতিহাস থেকে তিনি এই মন্তব্যটি করলেন উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বরং সায়্যিদ আহমাদ সম্পর্কে আরও যত শত বায়োগ্রাফি রচিত হয়েছে সেখানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে সায়্যিদ আহমাদ বেরলভী রহ. এর পরিবার রায় বেরেলীর সম্ভ্রান্ত পরিবার ছিলো। তৎকালীন লোকেরা নামে নামেই তাদের পরিবারকে চিনতে পারতো। শুধু তাই নয় যখন সায়্যিদ আহমাদ শাহ আবদুল আযীয রহ. এর সান্নিধ্যে শিক্ষা অর্জনের নিমিত্তে গমন করেন তখন শাহ সাহেব তাঁর পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। যখন সায়্যিদ আহমাদ তাঁর পিতা ও চাচাদের নাম জানালেন শাহ সাহেব সাথে সাথেই তাদেরকে শনাক্ত করলেন। তিনি শাহ সাহেবের তত্ত্বাবধানে সেখানে অবস্থান করেছেন। তিনি শাহ আবদুল কাদেরের সান্নিধ্যে অবস্থান করেছেন এমনকি শাহ রফীউদ্দীনের সাথে দিল্লীর আকবর আবাদী মসজিদে ছিলেন যেটা ব্রিটিশরা ১৮৫৮ সালে গুড়িয়ে দেয়। ২০১৫ সালে দিল্লীর মেট্রোর সাথে সংশ্লিষ্ট লোকেরা মাটির নিচে এই মসজিদ খুঁজে পান। একটি সম্ভ্রান্ত সায়্যিদ পরিবারের সন্তান ও শাহ আবদুল আযীযের ফরজন্দকে আর যাই হোক দস্যু বলে অন্ধও মেনে নিবে না এ কথা বলার দাবী রাখে না।

সায়্যিদ আহমাদ বেরলভী রহ. এর বিষয়ে উইলিয়াম হান্টার যে বক্তব্য দিয়েছেন তাকে ওহাবী চিহ্নিত করে; সেই বক্তব্যের সাপেক্ষে কোনো তথ্য প্রমাণাদী উপস্থাপন করেন নি। যতটুকু বোঝা যায় তিনি এই পুরো বক্তব্যটা শাহ ইসমাইল দেহলভীর রচিত গ্রন্থ "সিরাতাল মুস্তাকীমের" উপর ভিত্তি করে দিয়েছেন। আরও কিছু গ্রন্থের তালিকা যদিও উল্লিখিত হয়েছে তবে সেখান থেকে কিছু উদ্ধৃত করেন নি। সিরাতাল মুসতাকীম গ্রন্থের ব্যাপারে ইতিহাস ঘাটলেই দেখা যায় যে এটি যখন ফার্সি ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয় তখন সায়্যিদ আহমাদ বেরলভী মক্কায় যানও নি। যখন এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল তখন সর্বজন স্বীকৃত শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দেস দেহলভী রহ. হায়াতে ছিলেন। এবং শাহ সাহেব এই গ্রন্থের ব্যাপারে কোনো বিপরীত ফতোয়া দেন নি। এমনকি তাঁর কোনো বিপরীত বক্তব্যও এই পর্যন্ত কেউ প্রমাণ করতে পারে নি। মীর জাফর চরিত্রের জনক ইংরেজরা পরবর্তীতে ওহাবীদের মতবাদ নিজেরা বইয়ের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে শাহ আবদুল আযীয ও শাহ ইসমাইলের ইন্তেকালের পর সিরাতাল মুসতাকীম বই পুনরায় প্রকাশ করে। জ্ঞান পিপাসু সত্যান্বেষী পাঠকদের প্রতি উদার আহ্বান এই যে, সিরাতাল মুসতাকীম বইয়ের প্রথম সংখ্যা যা শাহ সাহেবের বর্তমানে ফার্সি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল সেই সংখ্যা দিয়ে কেউ ওহাবী মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে কি না ঘেটে দেখুন। বরং সায়্যিদ আহমাদ

বেরলভী রহ. এর আদর্শের বিষয়ে সত্যের অপপ্রলাপ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা হয়েছে। আমি আপনাদের উইলিয়াম হান্টারের বই থেকেই এই বক্তব্যের ছোট প্রমাণ দেখিয়ে দিচ্ছি। নিচে একটি চিঠির একাংশ উল্লেখ করা হলোঃ

"সংক্ষেপে বলতে চাই, ভাইসব! আমাদের বর্তমান অবস্থার জন্য ক্রন্দন করা উচিত, কারণ আমরা কাফেরের দেশে বাস করছি বলে আল্লাহর রসূল আমাদের উপর বিরূপ হয়েছেন। যখন খোদ্ রসূলুল্লাহ আমাদের উপর বিরূপ হয়েছেন, তখন আমরা কার শরণাপন্ন হবো? যাদের আল্লাহ সামর্থ্য দিয়েছেন, তাদের উচিত হিজরত করা, কারণ এদেশে আগুন জ্বলে উঠেছে। আমরা যদি সত্য কথা বলি, তাহলে আমাদের ফাঁসি যেতে হয়, আর আমরা যদি চুপ করে থাকি, তাহলে আমাদের ধর্মচ্যুতি হয়।"

এই চিঠিতে আলোচ্য বইয়েই উল্লিখিত ওহাবী মতবাদের বিরুদ্ধচারিতা পাওয়া যায়। ওহাবীরা আল্লাহর এবং নিজের মাঝে কাউকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে না। এমনকি মৃত্যুর পর কোনো নবি রসূল ওলীরা কোনো সাহায্য কোনো দোয়া কোনো সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির বিষয়ে এখতেয়ার রাখেন না। অথচ এই চিঠিতেই দেখা যাচ্ছে সায়্যিদ আহমাদ বেরলভীর অনুসারীরা আল্লাহর রসূলের অসন্তুষ্টির বিষয়ে নিজেদের আক্ষেপ বর্ণনা করছেন। এই আকীদা সরাসরি ওহাবী মতবাদ বিরোধী। আর ওহাবীরা আল্লাহ ছাড়া কারও শরণাপন্ন হয় না। লেখকের গ্রন্থেই এই কথা উল্লেখ আছে। অথচ সায়্যিদ আহমাদ বেরলভীর অনুসারীরা রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ আ-লিহী ওআ সাল্লামার শরণাপন্ন হচ্ছেন। আর কত সত্যের অপপ্রলাপ? লেখক নিজেই উল্লেখ করেন সায়্যিদ সাহেবের হাতে কত অগণিত মুসলমান বিভিন্ন শহরে বায়্যাত গ্রহণ করেছেন। এমনকি এমনও ঘটনা ঘটেছে যে মানুষের আধিক্যতায় পাগড়ি ছুঁয়ে বায়্যাত করাতে বাধ্য হয়েছেন। ওহাবীরা কি পীর মুরিদী মানে? পাঠক মহলের কাছে প্রশ্ন রইলো। আরও একটি জায়গায় উইলিয়াম হান্টার উল্লেখ করেছেন সায়্যিদ আহমাদ বেরলভী রহ. পবিত্র নগরী মক্কায় যেয়ে আবদুল ওহাব নজদীর আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হন। লেখকের দ্বিমুখী নীতি ও বানোয়াট মিথ্যা বক্তব্য এই ঘটনায় আবারও প্রমাণিত। ঐতিহাসিক Philip K. Hitti তাঁর History of the Arabs গ্রন্থে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর মৃত্যুকাল নির্ণয় করেছেন ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে। তারিখ হিসাবে দেখা যায় সায়্যিদ আহমাদ হজ্বে যাওয়ার প্রায় ৩০ বছর আগে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী মারা যান। সুতরাং হান্টার সাহেবের মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাবের নিকট সৈয়দ আহমদ শহীদের মুরীদ হওয়ার ঘটনা নিতান্তই জাল ও বানোয়াট। এখন যদি বলেন, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর কট্টর শিষ্যদের কাছে ওহাবিয়তের পাঠ গ্রহণ করে, সুতরাং উনি শিষ্যের শিষ্য। হান্টার সাহেবের ঐ বক্তব্য থেকে তাও প্রমাণিত হবে না। কারণ নিজে গর্ত করে লেখক

অসতর্কতার দরুণ মনেই রাখতে পারেন নি যে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন কিভাবে ওহাবীদেরকে নিঃশেষ করা হয়েছিল। এই মর্মে হান্টার তার বইয়ে লিখেছেন- "সর্বশেষ মিশরের মুহাম্মাদ আলী পাশা ওহাবীদেরকে বিধ্বস্ত করতে সমর্থ হলেন। ১৮১২ সালে পাশার পুত্রের অধীনস্ত সেনানায়ক টমাস কীথ গোলার মুখে মদিনা দখল করলেন। ১৮১৩ সালে মক্কাও ওহাবীদের হস্তচ্যুত হল। আর পাঁচ বছর পরে অলৌকিকভাবে উত্থিত বিরাট শক্তি মরুভূমির বালুর পাহাড়ে বিলীন হয়ে যাবার মত কোথায় লুপ্ত হয়ে গেল।" এই ভাষ্য হতে স্পষ্ট ঐ সময়ে ওহাবীদেরকে সম্পূর্ণ রূপে দমন করা হয়েছিল। যেখানে ওহাবীদের অস্তিত্বই নেই সেখানে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া রূপ কথার গল্প ব্যতীত কিছুই নয়।

জাস্টিস আব্দুল মওদুদ লিখেছেন, "জিহাদী আন্দোলনকে ইংরেজরা 'ওহাবী' বলে আখ্যায়িত করেছে পাক ভারতীয় মুসলমানদের সহানুভূতি নষ্ট করে তাদের প্রতি বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষ জাগাবার দুরভিসন্ধি মূলে। এবং ইংরেজরা এ প্রয়াসে এক শ্রেণীর মোল্লা-মওলবীকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যাবহার করেছিল প্রচারণা কার্যে।" (ওহাবী আন্দোলন, পৃষ্ঠা-১৪৬)

ঐতিহাসিক শান্তিময় রায় লিখেছেন, " 'ওয়াহাবি' কথাটি একটি ভুল প্রয়োগ। অনেক মুসলমান এদের অমুসলমান বলে গণ্য করেন। আসলে বৃটিশরাই তাদের দূরভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য তাঁদের 'ওয়াহাবী' বলে যেমন তারা পরবর্তীকালে সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্কে বলত।" (ভারতের মুক্তি আন্দোলনে মুসলমানদের অবদান, পৃষ্ঠা-৪)

ঐতিহাসিক সত্যেন সেন লিখেছেন, "দীর্ঘ শতাব্দী ব্যাপি এই বৃটিশ বিরোধী জিহাদের স্রষ্টা, পরিচালক ও মূল প্রাণশক্তি যিনি, সেই সৈয়দ আহমদের নাম আজকাল কজনই বা জানে? অথচ এই আন্দোলন ওয়াহাবী আন্দোলন নামে দেশের শিক্ষিত সমাজ বিশেষ করে রাজনৈতিক মহলে সু-পরিচিত, কিন্তু এ কথাটি সত্য নয়। বৃটিশ সরকার ও বৃটিশ ঐতিহাসিকদের দ্বারা এই বিচিত্র নাম করণের ফলে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে তা আজও আমরা এতকাল ধরে সেই আন্দোলনকে অযথা 'ওয়াহাবী আন্দোলন' বলে আখ্যা দিয়ে আসছি।" (বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের ভূমিকা, পৃষ্ঠা-১১/১২)

ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "ভারতবর্ষ যে অনুরূপ (ওহাবী আন্দোলন) হয়, তাহার সহিত ওহাবীদের কোন সম্বন্ধ ছিল, এমন কোন প্রমাণ নাই। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রায়বেরেলীর সৈয়দ আহমদ বেরলভী যখন ভারতে এ আন্দোলন প্রবর্তন করেন, তখনও তিনি আরব দেশে যান নাই। ইহার সহিত ওহাবী মতের কোন সম্বন্ধ নাই। ধর্মমূলক হইলেও ইহার সহিত বিনষ্ট মুসলমান রাজশক্তি উদ্ধারের আশা-আকাঙ্খা ছিল না, তাহা বলা যায় না। সুতরাং

এই আন্দোলনকে এক হিসাবে বৃটিশ রাজত্বে মুসলমানদের প্রথম মুক্তি-সংগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।" (History of Freedom Movement. iii)

এম. মুনিরুজ্জামান লিখেছেন, "আরবের আব্দুল ওহাব প্রবর্তিত সংস্কার আন্দোলনের সাদৃশ্য থাকায় বৃটিশরা এবং এ আন্দোলনের বিরোধীরা এই 'ওহাবী' লেবেল এঁটে এ আন্দোলনকে জনসমক্ষে হেয় করতে চেয়েছিলেন।" (উপমহাদেশের মুসলমান, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬২)

গোলাম আহমদ মোর্তজা লিখেছেন, শাহ সাহেবের শিষ্য সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভী হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করলে ইংরেজরা খুব চতুরতার সাথে প্রচার করল "স্বাধীনতা আন্দোলনের নামে যারা আপনাদের ধর্মের বাণী শোনাচ্ছে, আসলে তারা ইসলামের শত্রু এবং নবী ও সাহাবাদের অবমানকারী দল, এদের নাম ওহাবী। এরাই আপনাদের প্রিয় রাসূলের বংশধরদের ধ্বংস করে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছে আর হিন্দুস্তানের রায় বেরেলীর মাওলানা সাইয়্যেদ আহমদ হজ্জ করতে গিয়ে সে দলের এজেন্ট নিযুক্ত হয়েছে এবং এরা সব ওহাবী। তাই এরাও আপনাদের শ্রদ্ধেয় পীর বুযুর্গ ও পূর্বপুরুষদের করব ভাঙ্গতে চায়। এ কথা কিছু ইংরেজদের টাকা খাওয়া দালাল প্রচার করতে লাগলো। সাধারণ মানুষও বিশ্বাস করলেন অনেকে। সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় আজও শিক্ষিত মুসলমান হিন্দু এমনকি যারা লেখক বা ঐতিহাসিক তারা সকলেই ওহাবী আন্দোলন কথাটা লিখতে বা বলতে দ্বিধা করেন না। অথচ নজদের মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব জন্মগ্রহণ করেন ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দে আর তার মৃত্যু হয়েছিল ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে। অর্থাৎ ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে সৈয়দ আহমদ হজ্জ করতে যান এর অনেক আগেই তিনি ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে মারা যান। আর তার দলের প্রভাবও এই সময় অর্থাৎ ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে কমে যায়। অথচ শত শত নয়, সহস্র দলীল পেশ করা যাবে যে, ১৮২৩ সালের আগেই ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লব শুরু হয়ে যায়। (ইতিহাসের ইতিহাস, পৃ-২৫৬)

এবার আসা যাক তৃতীয় পয়েন্টে। সায়্যিদ আহমাদের জিহাদকে লেখক ভুল হিসেবে সকলের কাছে তুলে ধরেছেন। এটি সায়্যিদ আহমাদের মনগড়া জিহাদ এমন বোঝাতে বারংবার চেষ্টা করেছেন। লেখকের জানা উচিৎ ছিলো যে সায়্যিদ আহমাদ নিজের ফতওয়াতে জিহাদের ডাক দেন নি। এটা গবেষণায় কমতি অথবা ইচ্ছা করে সত্যকে আড়াল করার লুকোচুরি খেলা খেলতে চাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা। শাহ আবদুল আযীয ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন জীবনের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত। ব্রিটিশদের বিরোধিতায় শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভীর সংস্কার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় তিনি যুবকদের নিয়ে পরিষদ গড়ে তুলেছিলেন। এই পরিষদে শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী রহ. এর আর বাকি ৩ পুত্র তথা শাহ আবদুল আযীযের ৩ ভাই শাহ রাফীউদ্দীন, শাহ আবদুল কাদির, শাহ আবদুল

গণী অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর এই পরিষদ থেকে আরও একটি পরিষদ তিনি তৈরি করেছিলেন। এখানে যোগদান করেছিল শাহ ইসমাইল শহীদ, মাওলানা আবদুল হাই, মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ও মাওলানা ইয়াকুব। এই পরিষদেই যোগ দিয়েছিলেন সায়্যিদ আহমাদ বেরলভী। তৎকালীন একজন আলেম বলেন যে পুরো ভারতীয় উপমহাদেশ ঘুরে তিনি এমন একজন আলেমও খুজে পান নি শাহ আবদুল আযীযের যিনি ছাত্র নন (সাইয়েদ মাহবুব রিযবী, তারীখে দারুল উলুম দেওবন্দ, ইদারায়ে ইহতিমাম, ভারত-১৯৯২, ১ম খন্ড, পৃ. ৯৪)। স্বয়ং শাহ আবদুল আযীয রহ. ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ফতওয়া জারী করেছিলেন এই মর্মে যে - "ইংরেজ অফিসাররাই এখন দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করছে। তাদের শাসন চলার অর্থ হলো - তারা দেশরক্ষা জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রণ, রাজস্ব, ট্যাক্স, ওশর, খারাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচার ব্যবস্থা প্রভৃতিতে একচ্ছত্র ক্ষমতার মালিক। ভারতীয়দের এসব বিষয়ে কোনো কর্তৃত্ব নেই। যদিও তারা জু'মুআর নামাজ আযান, গরু জবাই এসব ইসলামী রীতি নীতিতে কোনো প্রতিবন্ধকতা বা বাঁধার সৃষ্টি করছে না, কিন্তু এগুলো হলো শাখা প্রশাখা। তবে যে সব বিষয় - উপরিউক্ত বিষয় সমূহের এবং স্বাধীনতার মূল বিষয় যেমন- মানবীয় মৌলিক অধিকার, নাগরিক অধিকার, জনগণের বাক স্বাধীনতা, সে সবের প্রত্যেকটি ছিনিয়ে নিয়েছে এবং পদদলিত করছে। মসজিদ ধ্বংস করা হচ্ছে। তাদের পূর্ব অনুমতি তথা পাসপোর্ট - পারমিট ব্যতীত হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে কারো শহরে গমনাগমনে বাধা দেয়া হচ্ছে। সাধারণ প্রবাসী ও ব্যবসায়ীদের শহরে আগমন প্রত্যাগমনের অনুমতি প্রদান দেশের স্বার্থরক্ষার্থে কিংবা নাগরিক অধিকারের ভিত্তিতে প্রদান করছে না। বরং তাদের স্বার্থ বিবেচনায়ই করা হচ্ছে। যদিও বা হায়দারাবাদে, লক্ষ্ণৌ এবং রামপুরের শাসকগণ ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়ার কারণে সেখানে সরাসরি তাদের শাসন প্রচলিত নেই। তবুও সমগ্র দেশের উপরই 'দারুল হরব'-এর হুকুম প্রযোজ্য হবে।" (ফাতওয়ায়ে আযীযিয়্যা, ফার্সি) জিহাদের মূল ফতওয়া শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দেস দেহলভী রহ.-এর। সায়্যিদ আহমাদ বেরলভী হলেন সেই ফতওয়ার বাস্তবায়নকারী মাত্র। তাই যারা সায়্যিদ আহমাদের জিহাদের বিরুদ্ধে আঙুল তুলতে চেষ্টা করে থাকেন সেই আঙুলটি আসলে শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দেস দেহলভী রহ.-এর দিকে তাক হয়ে আছে। যেখানে ফতওয়ার ব্যাপারে গোটা বিশ্বের আলেমগণ শাহ আবদুল আযীযকে সম্মানিত আসনে আসীন করে রাখেন সেখানে শাহ আবদুল আযীযের ফতওয়া অস্বীকারকারী এই ভারতবর্ষে কে আছে এটি প্রশ্ন রেখে গেলাম।

প্রথমেই উইলিয়াম হান্টারের ভ্রান্ত কিছু অপ্রশংসার দিক আলোচনা করলাম এবং সেগুলোর দাঁত ভাঙা জবাবও দেয়া হলো। যাতে পাঠক কোনো মতেই

পক্ষপাতী পর্যালোচনা হিসেবে এটিকে না দেখেন। এবার আসা যাক উইলিয়াম হান্টার সায়্যিদ আহমাদের যে প্রশংসা করেছেন সেই দিকে।

১) সায়্যিদ আহমাদ মনে প্রাণে তাঁর দেশবাসীর মুক্তির জন্য সমস্ত অন্তর দিয়ে বেদনা অনুভব করতেন।
২) সায়্যিদ আহমাদের তনু-মন শুধু আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট ছিলো।
৩) তাঁর ভাব ছিলো শান্ত-প্রশান্ত।
৪) সায়্যিদ আহমাদ তাঁর অন্তদৃষ্টির দ্বারা সুদূর অতীতের ধর্ম প্রচারকদের দেখতে পেতেন।
৫) তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী ভদ্র প্রকৃতির মানুষ।
৬) তিনি মানুষকে শিক্ষা দিতেন তার বাস্তব জীবন উন্নত করতে।
৭) তিনি তর্ক থেকে দূরে থাকতেন ইত্যাদি।

সায়্যিদ আহমাদ বেরলভী রহ. ছিলেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. এর সংস্কারী আন্দোলনের মানসপুত্র। মূলত তাঁর সমস্ত সংস্কার শাহ ওয়ালীউল্লহ রহ. এর সংস্কার আন্দোলনের আদলে। শাহ আবদুল আযীয রহ. সর্বজন স্বীকৃত অথচ দুঃখের বিষয় এই যে তাঁর আদেশেই যে পদক্ষেপ সায়্যিদ আহমাদ বেরলভী রহ. গ্রহণ করেছিলেন তা কেউ কেউ মানতে নারাজ। ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে হাকীম মানি অথচ হুকুম মানি না। এই আচরণ মোনাফেকীর শামিল। সায়্যিদ আহমাদ রহ. এর কায়েম করা খেলাফত নিয়ে যদি কেউ গবেষণা করেন তাহলে দেখতে পারবেন একটি খেলাফত ব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য যত নিয়ম নীতি, সংস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল তার কোনোটিরই ব্যত্যয় ঘটে নি। গবেষণায় পাওয়া যায় সায়্যিদ আহমাদ বেরলভী রহ. এর খেলাফত ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণরূপে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের হুবহু প্রতিচ্ছবি। তাইতো সায়্যিদ আহমাদ বেরলভী রহ. ছিলেন যথার্থই আমীরুল মু'মিনীন। আর একজন আমীরই পারেন দ্বীনের হেফাজতে আন্দোলনের ডাক দিতে।

বালাকোট আন্দোলনের পর উপমহাদেশের অবস্থাঃ সায়্যিদ আহমদ বালাকোটের প্রান্তরে শহীদ হওয়ার পর তাঁর অনুসারীরা ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচার কার্যে লিপ্ত ছিলেন। সায়্যিদ আহমদের অনুসারীরা বালাকোটের লুণ্ঠিত পতাকাকে আবার উচ্চে তুলে ধরেন এবং মুজাহিদ বাহিনীরা উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঝড়ের মত ছড়িয়ে পড়েন। পাটনাতেও সায়্যিদ আহমদের খলিফারা নতুন উদ্যম নিয়ে এই আন্দোলনের তৎপরতা শুরু করেন। এই উদ্যমকে উইলিয়াম হান্টার প্রশংসা করে লিখেছেন,

Again the fanatic cause seemed ruined. But the missionary zeal of the Patna Khalifs, and the immense pecuniary resources at their

command, once more raised the sacred banner from the dust. They covered India with their emissaries, and brought about one of the greatest religious revivals that has ever taken place(Indian Musalman, Page – 26)

এইভাবে এই আন্দোলনের গতি সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। এই আন্দোলনের ধারা সারা ভারতীয় উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। হান্টার লিখেছেন,

The minor missionaries were innumerable, and a skilful organization enabled them to settle in any place where the multitude of converts made it worth their while. In this way, almost every one of the fanatic Districts had its permanent preacher, whose zeal was sharpened from time to time by visits of the itinerant missionaries, and whose influence was consolidated and rendered permanent by the Central Propaganda at Patna. How great a power for evil these preachers have now become in Bengal, I shall afterwards show. In Southern India they raised such a hurricane of enthusiasm, that even the women cast their jewels into the common purse. From the North-West Provinces they sent company after company of recruits to the Fanatic Camp. Everywhere they stirred the Muhammadan population to its depths; and although the keen intellect of the Bengali eventually gave its present tone to the movement, the revival burst forth with equal heat for a time in all the Provinces of India. They have, wrote the Magistrate of Patna, under the very nose and protection of Government authorities, openly preached sedition in every village of our most populous districts, unsettling the minds of the Musalman population, and obtaining an influence for evil as extraordinary as it is certain(Indian Musalman, Page – 26)

"তারা এরূপ নিপুণতা সহকারে এবং সুপরিকল্পিতভাবে প্রচার কার্য চালিয়েছিলেন যে যে সমস্ত লোক একবার তাদের সংস্পর্শে এসেছে তারা জিহাদে যোগদানপূর্বক প্রাণোৎসর্গ করার জন্য পাগলপারা হয়ে উঠেছে। এইভাবে প্রতি জেলার জন্য এক একজন করে দায়িত্বপূর্ণ প্রচারক নিযুক্ত ছিল। এবং তারা জনসাধারণের মধ্য দিয়ে ধর্মোন্মাদনা জাগিয়ে জিহাদে যোগদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করে তুলতো। এই সকল প্রচারক আপনাপন জীবনের সুখ আরামের কথা ভুলে গিয়ে স্বার্থলেশশূন্য অবস্থায় বিরামহীন গতিতে প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। পাটনায় কেন্দ্রীয় প্রচার সমিতি হতে তাঁদেরকে সর্বদা সর্বপ্রকারে সাহয্য ও উপদেশ যোগান দিচ্ছিল। ষড়যন্ত্রকারীগণ বাংলায় কিরূপ বিস্ময়কর শক্তি অর্জন করেছিল সে কথা নিয়ে পরে আলোচনা করব। এই জিহাদী প্রচারকবৃন্দ দক্ষিণ ভারতে জনসাধারণের মধ্যে যে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিলেন তার ফলে পর্দার ভিতরের স্ত্রীলোকগণও জিহাদের ব্যয় নির্বাহে নিজ নিজ অঙ্গ হতে হীরা জওহর জড়িত মূল্যবান গহনা খুলে দেওয়ার জন্য পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিলেন। উত্তর পশ্চিম

প্রদেশ হতে তারা অসংখ্য রংরুট সংগ্রহ করে মুজাহিদ ক্যাম্পে প্রেরণ করেছিলেন। তারা প্রতিটি মুসলমান অধ্যুষিত স্থানে গিয়ে আপামর জনসাধারণকে জিহাদের নামে উন্মত্ত ও উত্তেজিত করে তুলেছিলেন। যদিও বাঙালী মুসলমানের অফুরন্ত সাহয্য ও অসীম ত্যাগ এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তুলেছিল। তবুও অন্যান্য প্রদেশবাসী মুসলমানগণও অনেকদিন পর্যন্ত একইভাবে আন্দোলনকে শক্তি জুগিয়েছে। পাটনার ম্যাজিষ্ট্রেট বলেছেন যে, 'এই সমস্ত প্রচারকবৃন্দ আমাদের জেলাসমূহের ঘন বসতি সমন্বিত শহর ও গ্রামসমূহে গিয়ে সরকারী কর্মচারীদের চোখের উপর বিদ্রোহের বিষ ছড়িয়ে এই প্রকার ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে (১৮৬৫ সালের পাটনার সরকারী দস্তাবেজ)।

হান্টারের মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাবঃ হান্টারের বইটি একটি পরিপূর্ণ ঔপনিবেশিক ও ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ। উল্লেখ্য, হান্টার পুরো বইয়ে সায়্যিদ আহমদ ও তাদের অনুসারীদের ধর্মান্ধ বলে দাবি করেছেন। এমনকি সায়্যিদ আহমদকে দস্যু দরবেশ বলেও কটাক্ষ করেছেন এবং সায়্যিদ আহমদের শিষ্য মহাবীর শহীদ তিতুমীর, যার অত্যাচারী জমিদার ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখা রয়েছে, তাকেও হান্টার গুন্ডা প্রকৃতির লোক বলে বিদ্বেষী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। হান্টার মোরাকাবা মোশাহাদাকে মৃগি ব্যারামের সাথে তুলনা করেছেন। অন্যদিকে শিখদের সুশিক্ষিত বলে অভিহিত করেছেন। আবার নিজেই তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিপদে পড়ছেন। কেননা পুরো মিথ্যাশ্রয়ী হতে পারেন নি। বাঙালি মুসলমান পিছিয়ে পড়েছে তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু বুঝেও না বোঝার ভান করেছেন এর জন্য দায়ী ব্রিটিশদের একচোখা নীতি।

উপসংহারঃ হান্টার তথা ব্রিটিশ লেখকের অনুকরণে ভারতের অধীকাংশ ঐতিহাসিক সায়্যিদ আহমদকে 'ওয়াহাবী নেতা' বলেই চিহ্নিত করেছেন। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে হান্টার তথা ইংরেজ লেখকদের সায়্যিদ আহমদ তথা তাঁর দলবলকে 'ওহাবী' রূপে চিহ্নিত করে তাঁদের কি লাভ হয়েছিল? এতে তাঁদের স্বার্থই বা কি ছিল? উত্তর একটাই ইংরেজরা Divide and Rule policy নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। এই জঘন্য নীতির অনুসরণ করেই ইংরেজরা ভারতে প্রায় দুই শত বছর রাজত্ব করেছে। সায়্যিদ আহমাদ বেরলভীকে শিখরা, ইংরেজরা যত দমন করতে চেয়েছে তত তিনি প্রজ্জ্বলিত হয়েছেন আপন মহিমায়। তাঁর আন্দোলণের চেতনা ধরেই আজ গোটা ভারতবর্ষ স্বাধীন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস ও অবদান

উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী'র অবদান

মোহাম্মদ সাইফুল হক সিরাজী

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলবী র. মৃত্যুর পর তাঁর সংস্কার ও রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার সুযোগ্য পুত্র শাহ আবদুল আজীজ মুহাদ্দেসে দেহলবী র. (১৭৪৭ খৃঃ- ১৮২৪ খৃঃ) তিনি পিতার প্রতিষ্ঠিত ওলামা কমিটি ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা মওলানা শাহ রফীউদ্দিন (রহঃ), মওলানা শাহ আবদুল কাদের ও মওলানা শাহ আবদুল গণি (রহঃ) এর সহযোগিতায় গ্রন্থ প্রণয়ন, বক্তৃতা দান এবং জন সংগঠন প্রভৃতির মাধ্যমে শাহ ওয়ালীউল্লাহর নীতি ও আদর্শ মুসলিম জনসাধারণের নিকট প্রচার করতে থাকেন। তাঁর সাহচর্যে এসে সৈয়দ আহমদ বেরলভী (রহঃ) (১৭৮৬- ১৮৩১ খৃঃ) সংস্কার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেরণা লাভ করে দাওয়াতে দ্বীনের মাধ্যমে ইসলামী প্রেরণা ও জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর প্রাণ সঞ্চার করেন এবং একটি বিরাট জনমতকে প্রচার রূপী ও মুজাহিদসুলভ বুনিয়াদের উপর সংগঠিত করেন এবং ভারত বর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে নিজের বিপ্লবী দাওয়াত ও জিহাদের কেন্দ্র রূপে গড়ে তোলে গোটা উপমহাদেশ থেকে ইংরেজদেরকে বিতাড়িত করে আল-কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে একটি ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে প্রয়াসী হন। (আ. ক. আবদুল কাদের, বালাকোট আন্দোলনের ইতিকথা)

এ সময় পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের সার্বিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। পূর্বদিকে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ পঙ্গু করে নিজেদের শাসন কায়েম করে। অপর দিকে

পাঞ্জাব থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত শিখ সম্প্রদায় প্রবল প্রতাপে মুসলমানদেরকে পরাভূত করে তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করে। দাক্ষিণাত্য থেকে দিল্লি পর্যন্ত পুরো মারাঠাদের করুণার উপর বেঁচে ছিল। দিল্লি ও তার আশে পাশের এলাকা ছিল শিখ ও মারাঠাদের ধ্বংসযজ্ঞের কেন্দ্রস্থল। দেশীয় রাজণ্যবর্গ নিজেদের শান্তির রাজ্যগুলো ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়ে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। এমতাবস্থায় মুসলমানদের না ছিল কোন নেতা আর না ছিল কোন সুশৃঙ্খল বাহিনী। এই দূর্বলতার সুযোগে অসংখ্য দূর্বলতা ও ফিতনা তাদের মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। মুসলমানদের কৃষ্টি-সভ্যতা, আচার-আচরণ এবং ধর্মীয় বিধি বিধান ও আকিদা-বিশ্বাসে ইসলাম বিরোধী বিজাতীয় সংস্কৃতি এবং শিরক ও বিদআত নিজেদের জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে ঢুকে পড়ে।

এমতাবস্থায় শাহ্ আব্দুল আজিজ মনে করলেন যে, এ ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বিপর্যয়ের হাত থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র পথ হচ্ছে জিহাদ। আর এই জিহাদের পূর্বে প্রয়োজন সামরিক প্রস্তুতি ও শক্তিশালী মুজাহিদ বাহিনী গঠন। তাই তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য দায়িত্ব অর্পণ করেন তার বিশ্বস্ত সহযোগী সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর উপর। শাহ আবদুল আজীজের নির্দেশ ক্রমে তিনি সামরিক কলাকৌশলে দক্ষতা অর্জনের জন্য ১৮১১ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ১২২৬ হিজরী (যব ঈমান কি বাহার আয়ী, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদ্‌ভী, পৃষ্ঠা ১৮) মতান্তরে ১২২৭ হিজরী টংকের নবাব আমীর খানের সেনাদলে ভর্তি হন এবং সাধারণ যোগ্যতা বলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর সেনাবাহিনীতে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্র পরিচালনাসহ অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নবাব আমীর খান সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর সাথে পরামর্শ করতেন। সেনাবাহিনীতে থাকাকালে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনা ও সামরিক কসরতের সাথে সাথে সংস্কার ধর্মী তৎপরতা এবং শিক্ষামূলক উপদেশ দানে ব্যাপৃত থাকেন।

শাহ আবদুল আজীজ ও সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর উদ্দেশ্য ছিল টংককে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ইসলামী আন্দোলন পরিচালনা করা। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশতঃ উত্তর ভারতের পিন্ডারী নামক স্বাধীনচেতা মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর যুদ্ধ শুরু হলে পিন্ডারীদের নেতা নবাব আমীর খান প্রতাপশালী বৃটিশদের ভয়ে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে পড়ে ১৮১৭ খৃঃ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাথে এক অধীনতামূলক সন্ধিতে স্বাক্ষর করেন। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী এই চুক্তির বিরোধিতা করে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য টংক থেকে দিল্লীতে শাহ আবদুল আজীজের নিকট চলে আসেন। এ সময় শাহ ওয়ালী উল্লাহর পরিবারের দু'জন সদস্য শাহ আবদুল আজীজের জামাতা মওলানা মুহাম্মদ আবদুল হাই ও ভ্রাতুষ্পুত্র মওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসমাইল তার সংস্পর্শে এসে তার হাতে বায়আত হন।

শাহ্ আবদুল আজীজ ও সৈয়দ আহমদ বেরেলভী উভয়ে ভারতের মুসলিম জনসাধারণকে প্রত্যক্ষ জিহাদের আহবান জানান এবং সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী তাহরীকে মুজাহিদীন নামে এক মুসলিম গণআন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যকে সফল করার লক্ষ্যে শাহ আবদুল আজীজ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

প্রথমত ঃ ভারতবর্ষে ইংরেজ ও শিখ শাসনের স্বরূপ আলোচনা করে সমগ্র ভারতবর্ষকে দারুল হারব ঘোষণা করে সকল মুসলমানকে জিহাদ করার আহ্বান জানান।

দ্বিতীয়ত ঃ মুসলিম জনসাধারণকে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা, শাহ ওয়ালি উল্লাহর কর্মসূচী এবং মওলানা শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুবকে নিয়ে একটি শক্তিশালী প্রচারক দল নিযুক্ত করেন।

তৃতীয়ত ঃ সামরিক প্রস্তুতির জন্য সৈয়দ আহমদ বেরেলভীকে সভাপতি এবং মওলানা মুহাম্মদ আবদুল হাই ও মওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসমাইলকে সদস্য করে একটি সামরিক পরিষদ গঠন করেন। শাহ আবদুল আজিজের নির্দেশক্রমে তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও শিষ্যবর্গ স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর নেতৃত্ব মেনে নেন।

অতঃপর মুসলিম জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে সৈয়দ আহমদ বেরলভী **১৮১৮** সালে মুজাফফর নগর, সাহারানপুর, নিজগড়, মুক্তেশ্বর, দোয়াবা, রামপুর, শাহাজাহানপুর ইত্যাদি স্থান সমূহ ভ্রমণ করেন।

(যব ঈমান কি বাহার আয়ী, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদ্ভী, পৃষ্ঠা ১৯)

১৮১৯ সালে তিনি স্বীয় জন্মস্থানে ফিরে আসেন। সেখানকার জনগণকে ইসলামী জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে যুদ্ধবিদ্যায় প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। এরপর তিনি এলাহাবাদ, বেনারস, কানপুর ও সুলতানপুর সফর করে অসংখ্য লোকজনের নিকট থেকে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। অতঃপর অযোধ্যার নবাবের সহকারী আমীর কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে লক্ষ্মৌ চলে যান।

১৮২১ সাল মোতাবেক **১২৩৬** হিজরীতে তিনি {লক্ষ্মৌ থেকে রায়বেরেলী ফিরে এসে} শিষ্যদেরকে নিয়ে পবিত্র হজ্ব পালনে রওয়ানা হন। **[(ক) ইযা হাব্বাত রাঈহুল ঈমান, আবুল হাসান আলী হোসাঈনী নদ্ভী, পৃষ্ঠা ৩১: (খ) যব ঈমান কি বাহার আয়ী, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদ্ভী, পৃষ্ঠা ২২) (গ) সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ-২য় সংস্করণ-প্রথম খন্ড-৯৬ পৃষ্ঠা]** হজ্ব পালন শেষে **১৮২৪** সালে দেশে ফিরে এসে দেখতে পেলেন যে, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা শাহ আবদুল আজিজ (রঃ) আর বেঁচে নেই। অপর

দিকে গোটা ভারতবর্ষের মুসলমানগণ করুণ দুর্দশার মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করছে। অমুসলিমরা শুধু নির্যাতন করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং তারা মুসলমানদের আচার অনুষ্ঠানের উপরও বিধি-নিষেধ আরোপ করে। এমনকি তারা লাহোরের বিখ্যাত শাহী মসজিদের হুজরাগুলোকে শাহী আস্তাবলে পরিণত করে। শাহ আবদুল আজিজের অবর্তমানে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর নির্দেশে মওলানা আবদুল হাই মুসলমানদেরকে জিহাদে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে দারুল হারব পাক ভারতকে দারুল ইসলামে পরিণত করার দায়িত্ব পুনঃ স্মরণ করিয়ে দেন।

সৈয়দ সাহেবের এই জিহাদের উদ্দেশ্য ছিল, বৃটিশ ও শিখ এই উভয় ইসলাম বিরোধী শক্তি নির্মূল করা। তার মতে দারুল হারবে প্রতিটি মুসলমানদের জিহাদ করা কর্তব্য। যেসব মুসলিম এই কর্তব্য উপলব্ধি করেনা তাদের এবং অমুসলিমদের মাঝে তেমন কোন তফাৎ নেই। তিনি শিখ শাসিত এলাকা জয় করার চাইতে বৃটিশদের জন্যই বেশী চিন্তান্বিত ছিলেন। কারণ বৃটিশরা পুরো ভারতই গ্রাস করছিল। তবে একই সাথে উভয় শক্তিকে নির্মূল করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। এজন্য প্রথমে তিনি শিখশক্তি খর্ব করে উত্তম পশ্চিম সীমান্ত ও পাঞ্জাব অধিকার এবং তথা হতে ক্রমে সমস্ত পাক-ভারতে মুসলমানদের আধিপত্য প্রস্তুতিকালে একটি নিয়মিত সংঘ গঠন করেন এবং দেশের প্রধান প্রধান শহরগুলোতে বিশ্বস্ত খলীফা নিযুক্ত করেন। বিভিন্ন এলাকা থেকে সংঘের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়। বৃটিশরা এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে থাকলে সংঘের যাবতীয় কার্যাবলী গোপনীয়তার সাথে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা হয়। এমনকি সাংকেতিক ভাষায় নিজেদের কাজকর্ম চলতে থাকে।

১২৩৯ হিজরীর রমজান মাস মোতাবেক ১৮২৪ সালের ৩০ শে এপ্রিল থেকে ১২৪১ হিজরীর ৭ই জমাদিউল আখের মোতাবেক ১৮২৬ সালের ১৭ই জানুয়ারী প্রায় এক বৎসর দশমাস তিনি রায়বেরেলীতে অবস্থান করেন। আর ইহাই তার রায়বেরেলীতে শেষ অবস্থান। **(যব ঈমান কি বাহার আয়ী, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদ্‌ভী, পৃষ্ঠা ২৪)**

১৮২৬ সালের ১৭ই জানুয়ারী তিনি রায়বেরেলীকে খোদাহাফেজ জানান এবং ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে রাজপুতানা, মারওয়াড, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, আফগানিস্থান এবং সীমান্তের বিভিন্ন মাঠ, পাহাড়, জঙ্গল ও নদ-নদী অতিক্রম করেন। যা অতিক্রম করাও একটা স্বতন্ত্র জিহাদ ছিল। কোন জায়গায় পানির স্বল্পতা, কোন জায়গায় খাদ্যের অভাব, রাস্তার কষ্ট, যাত্রা বিরতির কষ্ট, গুপ্তচরের ভয়, খাদ্য ও পিপাসার কষ্ট, অপরিচিত জাতি, দেশ, ভাষা এবং বিভিন্ন মেজাজের লোকের সাথে সাক্ষাত হয়। এগুলো ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ভয়, আশংকা ও সন্দেহ দেখা দেয়।

তার কাফেলাতে দিল্লী, রাউত এবং দোয়াবা অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ ওলামা, মাশায়েখ, টগবগে যুবক এবং জিহাদের জন্য আত্ম উৎসর্গকারী লোক ছিলেন। এ কাফেলাতে প্রায় ৬০০ লোক অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি দিলমু, ফতেপুর, বানদহ, জালুন, গোয়ালিয়র ইত্যাদি হয়ে টংক এ উপস্থিত হন। **(যব ঈমান কি বাহার আয়ী, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদ্‌ভী, পৃষ্ঠা ২৭)**

সেখানে নবাব আমির খানের উষ্ণ সংবর্ধনা লাভ করে হায়দরাবাদ পৌছেন। এখানে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস পেয়ে পীরকোট ও শিকারপুর চলে যান। তিনি পত্র দ্বারা ভাওয়ালপুরের নবাব ও সিন্দুর আমীরদেরকে জিহাদের আহবান জানালে তারা তাতে সম্মত হয় এবং হাশ্‌ত নগরের শাসনকর্তা সৈয়দ মুহাম্মদ খান তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করলে সেখানকার পাঠানগণ দলে দলে মুজাহিদ বাহিনীতে ভর্তি হয়।

অতঃপর সৈয়দ আহমদ বেরেলভী নওশেরা এসে রনজিৎ সিংহকে ইসলাম গ্রহণ নতুবা জিজিয়া কর প্রদানের মাধ্যমে আনুগত্য প্রকাশ অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার হুমকী দিয়ে এক পত্র লিখেন। পত্রে আরো উল্লেখ ছিল যে, মদও তোমাদের নিকট এতখানি প্রিয় নয় যতখানি প্রিয় আমাদের নিকট শাহাদাত লাভের গৌরব অর্জন। পত্রের জবাবে রনজিৎ সিংহ বিশাল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু মুজাহিদ বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। শিখদের বিরুদ্ধে এই বিজয়ের ফলে মুজাহিদ বাহিনীর মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের খান, সর্দারগণ এবং অনেক অভিজাত গোত্রের লোকজন সৈয়দ সাহেবের হাতে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।

সৈয়দ সাহেবের অনুগামীদের সংখ্যা আশাতীত হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের মাঝে পারস্পরিক সংহতি, শৃঙ্খলা ও ভ্রাতৃত্ববোধ রক্ষা করা দুরূহ হয়ে পড়ে। তাই সেনাবাহিনীতে অবস্থানরত ওলামায়ে কেরাম সম্মিলিত কর্মপন্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জানুয়ারী মোতাবেক ১২ই জমাদিউস সানী ১২৪২ হিজরী সৈয়দ সাহেবকে খলীফা ও প্রধান সেনাপতি ঘোষণা করেন **(যব ঈমান কি বাহার আয়ী, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদ্‌ভী, পৃষ্ঠা ৩১)** এবং স্থানীয় খান ও সর্দারগণ স্ব স্ব এলাকার শাসনভার গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৈন্য ও অর্থ দিয়ে সৈয়দ সাহেবকে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী আমীর নির্বাচিত হওয়ার পর গোটা এলাকায় শরিয়তী শাসন ব্যবস্থা চালু করে দেন এবং সকল বিচার ফয়সালা ও যাবতীয় বিধি-বিধান শরীয়তের আলোকে সম্পন্ন করতে থাকেন। এমনকি তিনি সকল মুসলমানের জন্য নামায পড়া বাধ্যতামূলক করে দেন।

সৈয়দ সাহেবের ইমামত ও খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে গোটা এলাকা একটি অখন্ড রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এতে স্থানীয় সর্দারদের কর্তৃত্ব হ্রাস পাওয়ায়

তাদের অন্তর্জগতে হিংসাও বিদ্বেষ দানা বেঁধে উঠে। তাই তারা গোপনে শিখদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সৈয়দ সাহেব কাবুলের আমীর দোস্ত মুহাম্মদ খান, হিরাতের শাহ মুহাম্মদ দুররানী, কান্দ্রেজের মুরাদ বেগ, হায়দরাবাদের নিজাম সিকান্দার শাহ, রামপুরে নবাব আহমদ আলী, বাওয়ালপুরের নবাব মুহাম্মদ ভাওয়াল খান প্রমুখের নিকট জিহাদের আহ্বান জানালে তারা তাতে সাড়া দেয়নি। অতঃপর টংকের নবাবের পুত্রকে স্বেচ্ছাসেবক ও অর্থ সাহায্য প্রেরণের আহবান জানালে তিনি তা মঞ্জুর করেন। তাছাড়া সৈয়দ সাহেবের অনুচর ও শিষ্যগণ পাক-ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে স্বেচ্ছাসেবক এবং অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। হায়দরাবাদের সৈয়দ মুহাম্মদ আলী ও মওলানা বেলায়েত আলী, বোম্বাই প্রদেশে মাওলানা মুহাম্মদ কাশেম, বাংলায় মাওলানা এনায়েত আলী, উত্তর প্রদেশে মাওলানা সাইয়েদে আওলাদ হাসানও মাওলানা হামিদুদ্দিন প্রমুখ স্বেচ্ছাসেবক ও অর্থ সংগ্রহ করে সীমান্তে প্রেরণ করার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।

সীমান্তের যেসব খান ও সর্দার সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর সাথে যোগদান করেছিল তারা শিখদের বিরুদ্ধে একটি সংঘবদ্ধ যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য পরামর্শ দিলে সে অনুযায়ী ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে সাইদু নামক স্থানে শিখ সৈন্যদের উপর সংঘবদ্ধভাবে প্রচন্ড আক্রমণ চালানো হয়। **(যব ঈমান কি বাহার আয়ী, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদ্ভী, পৃষ্ঠা ৩২)**

যুদ্ধের ফলাফল মুজাহিদ বাহিনীর পক্ষেই যাচ্ছিল, এমনি মুহূর্তে পেশোয়ারের সর্দার ইয়ার মুহাম্মদ খান দলবল সহ ষড়যন্ত্রমূলকভাবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে শিখ সেনাদের দলে ভিড়ে যায়। এই ষড়যন্ত্রের ফলে মুজাহিদ বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। এই ঘটনার পর সৈয়দ সাহেব খান বা সর্দারদের সৈন্যদের চাইতে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর উপর নির্ভরশীল হতে চাইলেন এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে আরো শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। কারণ তখন তাকে ত্রিমুখী শত্রু তথা ইংরেজ, শিখ ও বিশ্বাসঘাতক সর্দারদের মোকাবিলা করতে হচ্ছিল।

মুজাহিদগণ সব প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ডিভ, খালাবাত, খান্ডাকোই, কাহাহ এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ শিখ শাসন মুক্ত করতে সমর্থ হয়। এ সময় খুবী খান সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর সাথে প্রকাশ্যে শত্রুতা শুরু করে এবং রনজিত সিংহের ফরাসী জেনারেল ভেন্টোরা মুজাহিদ বাহিনীর ওপর হামলা চালালে খুবী খান জেনারেল ভেন্টোরাকে সহযোগিতা করে। বার বার আক্রমণ করেও তারা মুজাহিদ বাহিনীর তীব্র প্রতিরোধের মুখে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। হিন্দের শাসনকর্তা খুবী খান পারস্পরিক সমঝোতা সত্ত্বেও শত্রুপক্ষের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার কারণে সৈয়দ সাহেব ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে হিন্দ ক্রির ওপর আক্রমণ চালিয়ে তা দখল করে নেন। এ হামলায় খুবী খান নিহত হয়। খুবী

খানের মৃত্যুর পর তার ভাই আমীর খান ইয়ার মুহাম্মদ খানের সাথে মিলিত হয়ে ষড়যন্ত্র করতে থাকলে পেশোয়ারের নিকটবর্তী মায়দা নামক স্থানে মুজাহিদ বাহিনী তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যুদ্ধে ইয়ার মুহাম্মদ খান নিহত হয় এবং তার সেনাবাহিনী অস্ত্রশস্ত্রসহ মুজাহিদ বাহিনীর হস্তগত হয়।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে আশারা ও আম্বের উপর মুজাহিদ বাহিনীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে কৌশলগত কারণে সৈয়দ সাহেব ফুলড়ে হস্তগত করার জন্য স্বীয় ভাতিজা সৈয়দ আহমদ আলীর নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনীর একটি দল প্রেরণ করেন। রনজিৎ সিংহের জেনারেল হরি সিং মাওলা এবং জেনারেল এলাডকের নেতৃত্বে শিখদের প্রচন্ড আক্রমণে মুজাহিদ বাহিনী পরাস্ত হয়। এতে সৈয়দ আহমদ আলী সহ বহু মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। অতঃপর সৈয়দ সাহেব আম্বে অবস্থান নেন।

ইতিমধ্যে ইয়ার মুহাম্মদ খানের ভ্রাতা ও পেশোয়ারের শাসনকর্তা সুলতান মুহাম্মদ খান রনজিৎ সিংহ কর্তৃক প্রেরিত শিখ সেনাদের সহযোগিতায় হিন্দ এলাকা পুনর্দখল করলে সুলতান মুহাম্মদ খানের সাথে তুর্দ ও হোতীর মধ্যবর্তী মায়ার নামক স্থানে মুজাহিদ বাহিনীর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল ও শেখ ওয়ালী মুহাম্মদের নেতৃত্বে পরিচালিত এই যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনী জয়লাভ করে। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী বুঝতে পারলেন যে, শিখদের বিরুদ্ধে সফলতা অর্জন করতে হলে পেশোয়ারের সুলতান মুহাম্মদ খানের শক্তি খর্ব করা প্রয়োজন। লাহোর ও কাবুলের উত্তর-পশ্চিম এলাকার বৃহত্তম শহর পেশোয়ার। প্রাচীনকাল থেকে এটি সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী। মুজাহিদ বাহিনী আগমণে সুলতান মুহাম্মদ খান পরিবার-পরিজন নিয়ে পেশোয়ারের বাইরে চলে যায়। অবস্থা বেগতিক দেখে সে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে আনুগত্যের অঙ্গীকার করে এবং পেশোয়ার তার নিকট সোপর্দ করলে সেখানে সে শরিয়তী শাসন ব্যবস্থা চালু করবে এ মর্মে হলফ করে। যেহেতু সৈয়দ সাহেবের উদ্দেশ্য রাজ্য শাসন করা নয়, বরং ইসলামী হুকুমত কায়েম করা সেহেতু অনুচরবৃন্দের পরামর্শ উপেক্ষা করে পেশোয়ার সুলতান মুহাম্মদ খানের হাতে প্রত্যার্পণ করে তিনি পাঞ্জেতার চলে যান।

সৈয়দ সাহেব পেশোয়ার ত্যাগ করার পর সুলতান মুহাম্মদ খান তথায় শরিয়তী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ নিলে কায়েমী স্বার্থবাদী গোত্র প্রধানগণ এবং স্বার্থান্বেষী আলেমগণ এর বিরোধিতা করলে চাপের মুখে সে সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে। এমনকি তারা একথা বলতে শুরু করে যে, সৈয়দ সাহেব ও মুজাহিদরা ভ্রান্ত আকীদায় বিশ্বাসী। **(যব ঈমান কি বাহার আয়ী, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদ্‌ভী, পৃষ্ঠা ৩৭)**

ইতিমধ্যে সুলতান মুহাম্মদ খান ও তার সহযোগিরা সীমান্তের মুজাহিদ বাহিনীর নয়টি সামবিক ঘাটিতে অতর্কিত হামলা চালিয়ে সবকটি ঘাটি দখল করে

নেয় এবং ইসলামী হুকুমতের কর্মচারী, তহশীলদার, কাজী, পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ফলে সৈয়দ আহমদ ভেঙ্গে পড়েন এবং কাশ্মীরে হিজরত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

কারণ কাশ্মীর হলো একটি সুরক্ষিত উপত্যকা, যাতে রয়েছে প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যূহ। এখান থেকে পুরো ভারতবর্ষের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে এবং মধ্য এশিয়ার অতীতের সুদৃঢ় ইসলামী সুলতানাতগুলোর সাথেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হবে।

কাশ্মীর যাওয়ার পথে পড়ে পাখলী ও কাগান উপত্যকা। সেখানকার শাসন কর্তৃত্ব শিখদের হামলা ও পারস্পরিক তিক্ততার কারণে অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় পৌঁছেছিল। এখানকার অধিবাসীরা এই সংকটময় অবস্থা উত্তরণের জন্য সৈয়দ সাহেবের সহযোগিতা কামনা করলে তিনি এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলেন না।

তাদেরকে সহযোগিতা দান এবং কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হওয়ার সবচাইতে উপযুক্ত স্থান ছিল বালাকোট। এটি কাগান উপত্যকার দক্ষিণমুখে অবস্থিত। কুনহার নদীর উৎসমুখ ছাড়া বালাকোটে প্রবেশের দ্বিতীয় কোন পথ নেই। পাহাড়ের দুধারে প্রাচীর সমান্তরাল রেখায় এগিয়ে গেছে। মাঝখানে উপত্যকাভূমি, যার প্রশস্ততা প্রায় অর্ধ মাইল। এর মাঝ দিয়েই কুনহার নদী প্রবাহিত। বালাকোটের পূর্ব দিকে কালখানের চুঁড়া আর পশ্চিমে মাটি কোট পর্বত শিখর অবস্থিত। সৈয়দ সাহেব পাহাড়-পর্বত আর গিরিপথ মাড়িয়ে পাঞ্জেতার থেকে সচুন হয়ে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল মোতাবেক ১২৪৬ হিজরীর ৫ই যিলকদ বালাকোটে প্রবেশ করেন। **(যব ঈমান কি বাহার আয়ী, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদ্‌ভী, পৃষ্ঠা ৪০)**

রনজিৎ সিংহের পুত্র শের সিংহ সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ও মুজাহিদ বাহিনীর বালাকোটে অবস্থানের খবর জানতে পেরে এক বিরাট শিখ সেনাদল নিয়ে কুনহার নদীর পূর্ব তীরে বালাকোট থেকে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে ছাউনী ফেলে এবং অতি সন্তর্পনে বালাকোটের নিকট গিয়ে পৌছে। যুদ্ধ ক্ষেত্র মুজাহিদ বাহিনীর অনুকূলে ছিল বিধায় শের সিংহ হতাশ হয়ে ফিরে যাওয়ার মনস্থ করে। এ সময় স্থানীয় কিছু সর্দার শিখদের অর্থলোভ সংবরণ করতে না পেরে বিশ্বাসঘাতকতা করে সৈয়দ সাহেবের দলত্যাগ করে এবং শিখ সেনাদের পক্ষ নেয়। তারা শিখ সেনাদের পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে। শের সিংহের সেনাদল এই সুযোগ কাজে লাগায়। ফলে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে বালাকোট প্রান্তরে ঐতিহাসিক বালাকোটের যুদ্ধ সংগঠিত হয়। মুজাহিদ বাহিনী সৈয়দ সাহেবের নেতৃত্বে শিখ সৈন্যদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এতে অসংখ্য শিখ সেনা নিহত হয় এবং বাকীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যেতে থাকে।

কিন্তু সৈয়দ আহমদ ও শাহ ইসমাঈল তাহরীকে মুজাহিদীনের এ দুজন শীর্ষস্থানীয় নেতার শাহাদাত বরণের ফলে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় মুজাহিদ বাহিনী নেতৃত্ব শুণ্য হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। এ সুযোগে শিখ সেনাদের পাল্টা আক্রমণে যুদ্ধের ইতিহাসও পাল্টে যায়। উক্ত যুদ্ধে অসংখ্য মুজাহিদ, ওলামায়ে কিরাম ও বুজুর্গানে দ্বীন শাহাদাত বরণ করেন।

লেখকঃ প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মীরসরাই কলেজ, চট্টগ্রাম।

ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র বিপ্লব ও আমিরুল মোমিনীন সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ

মুহাম্মাদ রবিউল হক

শিল্পবিপ্লবের ফলে ইউরোপের বিভিন্ন পুঁজিবাদী গোষ্ঠী ইংরেজ, ডাচ, ওলন্দাজ, স্পেন প্রভৃতি দেশে কাচাঁমাল সংগ্রহ ও নতুন বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে।

সাম্রাজ্য বিস্তার ও উপনিবেশ স্থাপনে পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। বণিকবেশি এই সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গের পরস্পর কলহ ও দুর্বলতার সুযোগে প্রথমে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা দখল করে নেয়।

পরবর্তীতে মুঘল সম্রাটদের দুর্বলতা ও অযোগ্য নেতৃত্বের ফলে ইংরেজ-বেনিয়াগোষ্ঠী দিল্লির মসনদ দখলে নিয়ে নেয়।

ইংরেজরা ক্ষমতা দখলে নিয়ে এদেশের জনসাধারণ বিশেষ করে মুসলিমদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়নের বিভীষিকা কায়েম করে। দস্যু বাহিনীর মতো এ দেশের ধন-সম্পদ শোষণ করে বিলেতে পাচার করে।

মুসলমানের শিক্ষা সংস্কৃতি, তাহযীব-তামাদ্দুনের ওপর আগ্রাসন চালায়। একদিকে মানবতার ওপর জুলুম-নির্যাতন, অপরদিকে দ্বীন-ধর্মের ওপর বিভিন্ন রকম আক্রমণ। ফলে পৃথিবীর ইতিহাসে জঘন্যতম, লোমহর্ষক নির্যাতনের শিকার হয় ভারতবর্ষের মানুষ।

এ পরিস্থিতিতে ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবির সুযোগ্য সন্তান মুসনাদে হিন্দ শাহ আব্দুল আযীয ভারতবর্ষকে 'দারুল হারব' (শত্রুকবলিত দেশ) ঘোষণ করলেন। এই ফতোয়া দিশেহারা মুক্তিকামী মানবতাকে সঠিক সিদ্ধান্ত ও কর্মপন্থা গ্রহণের রাহনুমায়ী করে।

শাহ আব্দুল আযীযের আদর্শিক চেতনা ও জিহাদী অনুপ্রেরণায় ময়দানে আগমণ করলেন শহীদে বালাকোট আমিরুল মুমিনীন সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ.)।

ইলম, আমল আর যোগ্যতায় তিনি এমন একজন কামেল ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যিনি সঠিক লক্ষ্যে আঘাত হানতে সক্ষম হোন।

তরবিয়াত ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি এমন একটি দল তৈরি করেন, যারা ইমানি চেতনা, আমল আর ত্যাগ-কোরবানির জন্য ছিলেন সাহাবাগণের পদাঙ্ক অনুসারী। 'ফুরসান ফিন নাহার ওয়া রুহবান ফিল লাইল' এর বাস্তব নমুনা।

সাইয়্যিদ আহমদ ইবন ইরফান ১৭৮৬ সালের নভেম্বর মাসে ভারতের উত্তর প্রদেশের রায়বেরলী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। চার বছর বয়সে তাকে মক্তবে পাঠানো হয় কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি তার সবিশেষ আগ্রহ ছিল না।

যখন তিনি শাহ আব্দুল আযীযের দরবারে আগমণ করেন তখন শাহ আব্দুল আযীয বুঝতে পারছেন এই যুবকের স্বভাব ও প্রকৃতি লেখাপড়ার প্রতি নাই বরং প্রয়োজনীয় ইলম তাকে ঐশীভাবেই সরবরাহ করা হবে।

তিনি সাইয়্যিদ আহমদ শহীদকে তরবিয়াতের মাধ্যমে খোলফত প্রদান করেন এবং দাওয়াত, ইরশাদ ও জিহাদের মিশনের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলেন।

শাহ আব্দুল আযীয সাইয়্যিদ আহমদকে আমীর এবং আপন ভাতিজা মাওলানা শাহ ঈসমাইল ও জামাতা মাওলানা আব্দুল হাইকে উপদেষ্টা মনোনীত করে সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলেন। দাওয়াত, তরবিয়াত ও ইসলাহী মিশন নিয়ে সায়্যিদ আহমদ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন।

তার রুহানী প্রভাবে দেশব্যাপী ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তিনি স্বদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে জিহাদী চেতনা তৈরি ও মুজাহিদ সংগ্রহ করতে থাকেন।

এভাবে দাওয়াত ও ইসলাহের মাধ্যমে মুজাহিদ সংগ্রহ করে সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ ইংরেজ-বেনিয়াদের জুলুম-নির্যাতন থেকে উপমহাদেশের জনসাধারণকে মুক্তি দিতে সীমান্ত প্রদেশের দিকে আগ্রসর হোন।

সিন্ধু, কান্দাহার ও কাবুল হয়ে সীমান্ত অঞ্চলে তিনি স্বাধীনতার ঘাটি স্থাপন করেন। ১৮২৭ সালের ১০ জানুয়ারি সেখানে তিনি অস্থায়ী সরকার গঠন করেন। এই সরকারে প্রশাসন, অর্থ, সমর ও বিচার ইত্যাদি পৃথক পৃথক বিভাগ গঠন করেন। সায়্যিদ আহমদ অস্থায়ী সরকারের আমীর মনোনীত হোন।

তিনি সকল মুরিদদের থেকে বায়আত নেন। স্থানীয় পাঠান সরদারগণও তার হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। বিজিত অঞ্চলে তার নামে খুতবা দান শুরু হয় এবং নিজস্ব মুদ্রা চালু করা হয়।

সাইয়্যিদ আহমদ শহীদের অস্থায়ী সরকারের ক্রমবর্ধমান জয়যাত্রা ব্রিটিশ সরকার, শিখ সম্প্রদায় ও স্বার্থান্বেষী পাঠান সরদারগণ তার গতিরোধ করার চেষ্টা করে। শিখ ও পাঠানদের পরাজিত করতে পারলেও ইংরেজদের পরাজিত করা সম্ভব হয়নি।

কারণ ইংরেজরা কখনো মুজাহিদদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে আসতো না। দূর থেকে স্বদেশী অন্য কোন শক্তিকে লেলিয়ে দিত। আবার তাদের অনুগত বিদআতি আলেমদের দ্বারা সাইয়্যিদ সাহেব ও তার মুজাহিদদেরকে 'ওহাবি' অপবাদ দিয়ে পাঠানদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেয়।

এভাবে ইংরেজরা সুজাউদ্দৌলার দ্বারা রোহিলাদের এবং নিযামদের দ্বারা সুলতান টিপুকে যেভাবে দমন করেছিল সেভাবে শিখদের দ্বারা মুজাহিদদের দমন করার সিদ্ধান্ত নেয়।

অবশেষে ১৮৩১ সালে বালাকোট যুদ্ধে ইংরেজদের অনুগত রণজিৎ সিংয়ের বাহিনীর সাথে সাইয়্যিদ সাহেব ও মুজাহিদদের তুমুল লড়াই হয়। যুদ্ধে সাইয়্যিদ সাহেব, শাহ ঈসমাইলসহ অসংখ্য মুজাহিদ শাহাদত বরণ করেন।

বালাকোট যুদ্ধে বীরত্ব ও সাহসিকতা, শাহাদাত লাভের তীব্র বাসনা, দুনিয়ায় প্রতি চরম ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা, ইমামের প্রতি মহব্বত ও আনুগত্যের এমনিই সব আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রকাশ পায়, যা ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীগুলোর স্মৃতিকে আবার জীবন্ত করে তোলে।

সাইয়্যিদ আহমদ শহীদের পরে এই আন্দোলন দিল্লি ও সাদিকপুরের দুটি কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হতে থাকে। দিল্লি কেন্দ্রের দায়িত্বে শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক দেহলবি আর সাদিকপুর কেন্দ্রের দায়িত্বে মাওলানা বেলায়েত আলী এবং তার পরে মাওলানা ইনায়েত আলী হিজরত ও জিহাদ এবং বিপ্লব ও যুদ্ধের ধারাবাহিতা অব্যাহত রাখেন।

মাওলানা ইনায়েত আলী আজিমাবাদীর খলিফা আমীর আব্দুল্লাহ, আমীর আব্দুল করীমের জামানা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। মাওলানা ইয়াহইয়া আলী, মাওলানা আহমদউল্লাহ, মাওলানা আব্দুর রহীম সাদিকপুরী এবং মাওলানা জাফর থানেশ্বরীর নাম ইতিহাসে চির ভাস্বর হয়ে আছে।

পরবর্তীতে জালেম ইংরেজ সরকার এই সকল মহান বিপ্লবীদের অনেককে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে অনেককে কালা পানির দ্বীপ আন্দামানে দ্বীপান্তর করে।

সাইয়্যিদ আহমদ শহীদের পরবর্তীতে ইংরেজবিরোধী যত বিপ্লব, আন্দোলন ও সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে সবাই বালাকোটের শাহাদাতগাহ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছে।

শামেলির ময়দান, ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম (সিপাহী বিপ্লব), দেওবন্দ আন্দোলন, রেশমি রোমাল আন্দোলনসহ সকল সংগ্রামীদের কাছে সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ ছিলেন আদর্শ।

এই মুবারক জামাত মুসলমানদের মধ্যে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন যারা পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র জীবনযাপন, তাকওয়া ও পরহেজগারি, ইসলামী শরীয়ত ও রাসূলের সুন্নতের পাবন্দি এবং ধর্মীয় অনুভূতি ও বীরত্বের অনন্য নজির স্থাপন করে গেছেন।

সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ ও তার সাথীরা যদিও ইংরেজদের থেকে ক্ষমতা নিতে সক্ষম হয়নি কিন্তু তারা এদেশে নির্ভেজাল তাওহীদ, শিরিক-বিদআত বিরোধিতা, ধর্মীয় নবজাগরণ ও অন্যায় অবিচার, জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে

সংগ্রামের যে পতাকা উত্তোলন করে গেছে তা ইংরেজবিরোধী সকল সংগ্রামে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

ভবিষ্যতে যারা বিপ্লব সংগ্রাম ও শরীয়তের পুনর্জাগরণের জন্য কাজ করবে তাদের জন্য সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ, শাহ ইসমাইল শহীদ ও বালাকোটের শহীদদের প্রতিটি সদস্যের পয়গাম তাই যা মহান আল্লাহ সূরা ইয়াসিনে উল্লেখ করেছেন, হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত কী কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত করেছেন। (আয়াত:২৬, ২৭)

তথ্যসূত্র: আবুল হাসান আলী নদভী- সীরাতে সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ, ইয়া হাব্বাত রীহ'উল ঈমান, W.W. Hunter- Indian Mussalmans, শান্তিময় রায়- ভারতের মুক্তি সংগ্রাম ও মুসলিম অবদান, ড. মুশতাক আহমদ- তাহরীকে দেওবন্দ।

সংগ্রহ: দৈনিক যুগান্তর, ১০ আগস্ট ২০২০ ইং

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সিংহপুরুষ সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহ.)

এম এ বাছিত (আশরাফ)

সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহ.), যাকে ব্রিটিশরা জমের মতো ভয় পেত সেই মর্দে মুজাহিদকে রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ তার কালজয়ী কবিতায় 'রায় বেরেলীর জঙ্গি পীর' আখ্যা দিতে গিয়ে লিখেন :

সবাই যখন আরাম খুঁজে
ছুটে ঘরের পানে
জঙ্গী পীরের ডাক শোনা যায়
জঙ্গের ই ময়দানে।
সবাই ভাবে পীরের কথা
শুনেছি তো ঢের
এমন পীরের কথা তো ভাই
পাইনি কভু টের।

সত্যিই সেদিন সেই পীর শুধু তাসবিহ হাতে মুরিদানকে নিয়ে খানকায় বসে নিজের সুখ শান্তি ত্যাগ করে যুদ্ধের ময়দানে এসে সিংহের মত গর্জন উঠেছেন। পরাধীন ভারতবাসীদেরকে কেউই তখনো ব্রিটিশদের শাসন ও থেকে রক্ষার স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেনি। সাধারণ মানুষ কখনই ভাবতো না ব্রিটিশদের জুলুম, নির্যাতন এবং শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পারবে। তাদের ...ং এমন একটি স্বপ্ন ছিল আঁধারে হারিয়ে যাওয়া আলোর মতই। কখনই তা চিন্তা শক্তিতে স্বচ্ছ হয়ে ধরা দিতো না। কিন্তু তারপরও কিছু মানুষ দৃপ্ত শপথে সেই স্বপ্ন দেখতেন আবার অন্যকে দেখাতেন। অন্যের চোখে সেই স্বপ্নের বীজও বুনে দিতেন। পরাধীন ভারতবাসীর চোখে মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়ে আঁধারকে দূর করার আলো জ্বালাতেন। যেই সব মহামনীষী প্রতিবাদের আগুন জ্বালিয়ে ভারতবাসীকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহ.)। এই ক্ষণজীবী মহান পুরুষ ৬ সফর, ১২০১ হিজরী মোতাবেক ১৭৮৬ ঈসায়ী সালের ২৯শে নভেম্বর সোমবার ভারতের উত্তর প্রদেশে

এলাহাবাদের রায় বেরেলীর সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে (সাইয়্যিদ বংশে) জন্মেছিলেন। যার নাম সকল মুক্তিকামী মানুষেরই জানা।

জন্মসূত্রে সাইয়্যিদ বংশের উজ্জ্বল নক্ষত্র, আওলাদে রাসুল এই মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক, ইসলামের খাদেম, নিবেদিত প্রাণ ইসলাম প্রচারক এবং মাক্ববুল সিলসিলার উত্তরাধিকারী, তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে রয়েছে খেদমতে ইসলাম, খেদমতে খলক্বের অনুপম নিদর্শন। মজলুম মানব জাতির মুক্তির ক্ষেত্রে, মানুষের ইসলাহ-তাযকিয়া ও তরবিয়াতের ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক কার্যক্রমে তাঁর অবদান ভারতবাসী তথা বিশ্বের মজলুমদের জন্য অনুকরণীয়। আখলাকে নববীর অনুপম আদর্শের সৈনিক সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহ.) ছিলেন সময়ের শ্রেষ্ঠ সাহসী সন্তান, তরিকতের উচু মার্গের বুজুর্গ, যামানার মুজাদ্দিদ, আদর্শ নবী প্রেমিক, ওয়ারিছে রাসুল (সা.)। বাতিলের বিরুদ্ধে আপোষহীন ব্যক্তিত্ব, মানব দরদী এই মহান ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে দেশ বিদেশের অসংখ্য বনি আদম তরিকতের উচ্চ মাক্বাম হাসিলের পাশাপাশি নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করে ইহ ও পরজগতে কামিয়াবি হাসিল করতে সক্ষম হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতার কিছুটা নিদর্শন আমরা দেখেছি মুরশিদে বরহক্ব আল্লামা সাহেব ক্বিবলাহ ফুলতলী (রহ.) এর মধ্যে।

সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (রহ.) ইসলামের ইতিহাসে অপরাজেয় সৈনিক, রাসুল (সা.)-এর প্রেমের অনলে পোড়া আল্লাহর তরবারি (সাইফুল্লাহ) হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)'র যোগ্য উত্তরসুরি পরিচয় দিয়ে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য প্রজ্ঞাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক কর্মসূচী সম্বলিত যে আধুনিক কলা-কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন, মুক্তিকামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে আজও তা বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দেয়। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক ও সশস্ত্র সংগ্রামের পাশাপাশি পূর্ণাঙ্গ সমাজ-বিপ্লবের উদ্দেশ্যে ইসলামী আন্দোলন গড়ে তোলার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি অনাগত ভবিষ্যতের জন্য রেখে গেছেন। ভারত উপমহাদেশের মুক্তিকামী মুসলমানদের ঈমানী প্রাণ প্রবাহ অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহ.)'র রেখে যাওয়া কর্মসূচী অনুকরণ করেই হযরত সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (রহ.) ও তাঁর সঙ্গী সাথীরা পরবর্তী সময়ে একটি ইসলামী আন্দোলন পরিচালিত করেছিলেন। সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব, প্রখর দূরদৃষ্টি, তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দ্বারা হযরত সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহ.) উপমহাদেশে প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টিকারী এক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা কিনা উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক এবং ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায়ের সূচনা করেছে। সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (রহ.) তাঁর বাস্তব সাংগঠনিক কাঠামো ও কর্মসূচী, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

কর্মীবাহিনী এবং রণচাতুর্যের মাধ্যমে যে বিপ্লবের জোয়ার এনেছিলেন, তা ছিল আধুনিক সমাজ বিপ্লবেরই এক নবতর প্রক্রিয়া। সে বিপ্লব তদানীন্তন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের মসনদ যেমনিভাবে প্রকম্পিত করেছিল তেমনিভাবে আজকের আধুনিক প্রযুক্তির যুগেও তাঁর কর্মকৌশল বর্তমান সময়ের ইসলামী আন্দোলনের যে কোন কাফেলার জন্য হতে পারে অনুপ্রেরণার এক সাবলীল উৎস ধারা। একটি স্বাধীন, সার্বভৌম, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহ.) যে সব কর্মসূচী ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তা সকল মুক্তিকামী মানুষের জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।

বালাকোটের জিহাদ; ব্রিটিশদের চতুরি এবং পাঠানদের মোনাফিকী

বনি আদমের উপর জুলুম নির্যাতন দেখলেই সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহ.)-এর প্রতিবাদী মন জেগে উঠতো। আর উঠবেইনা কেন, যার পূণ্যময়ী জননী গর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় স্বপ্নে দেখেন যে, "রক্তে লেখা একখানি কাগজ পত পত করে উড়ে বেড়াচ্ছে"। ভারতের জমিনে যখন অসহায় মজলুমদের জীবন জুলুম আর নির্যাতনের আঘাতে জর্জরিত হচ্ছিল তখনই মেঘলা আকাশে প্রতিবাদের উল্কাপিন্ড রূপে আবির্ভূত হয়ে দেখা দিয়েছিলেন সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহ.)। সাইয়্যিদ সাহেবের জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত হয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন, কেমন করে এ দেশের বিরাট মোঘলসাম্রাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ ও ধ্বংস হয়ে গেছে। তার ধ্বংসস্তুপের উপর যে দু'চারটি মুসলমান রাষ্ট্র মাথা তুলেছিল, তাও শেষ হয়ে গেছে। ব্রিটিশ ইংরেজ গোটা ভারতের উপরে তার আধিপত্য বিস্তার করে থাকলেও ভারত উপমহাদেশের এক বিরাট অঞ্চল শিখ রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে উঠেছিল। মুসলমানরা শুধু রাজ্য হারায় নাই, আপন দ্বীন ও 'সিরাতে মুস্তাকীম' থেকে বহু দূরে সরে পড়েছে। তাদের আকীদা বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও আচার অনুষ্ঠান, অনৈসলামিক চিন্তাধারা ও ধর্মকর্মের দ্বারা প্রভাবিত। মুসলমান আমীর-ওমরা যারা অবশিষ্ট ছিলেন, তারাও ভোগবিলাসে লিপ্ত এবং তাদের জীবনের লক্ষ্য এ ছাড়া আর অন্য কোন কিছু ছিল না। মুসলমানদের এই অবস্থা দেখে ব্রিটিশ জালিমদের ছত্রছায়ায় ভারতের মারাঠা ও পাঞ্জাবের সীমান্ত এলাকায় সুযোগ সন্ধানি শিখদের অত্যাচারের মাত্রা সীমাতিক্রম করেছিল। সে সকল এলাকাগুলোতে মুসলমানদের জন্য বসবাস করা সম্পুর্ণরূপে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। জুলুম নির্যাতন এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে এই জালিম শিখ হায়েনারা মুসলিম নারীদেরকে দাসীরূপে ব্যবহার করত। সীমান্তে মুসলমানদের ঘর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিত, ফল-ফসলাদি বিনষ্ট করত। মুসলমানদেরকে তাদের ধর্মীয় দায়-দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান করত। মসজিদগুলোতে ঘোড়া বেঁধে রাখত। মিনারে উঁচু আওয়াজে আজান দিতে বাঁধা প্রদান করত। মানবতা যখন দ্বারে দ্বারে

কাঁদছিল, তখন ভারত উপমহাদেশের মজলুম মুসলমানরা একজন মুক্তির দিশারীর অপেক্ষায় চিৎকার করছিল। এমনি সঙ্কটময় মুহূর্তে জিহাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে ব্রিটিশ জালিমদের জুলুম থেকে মুক্ত করে ভারতে একটি প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্রের সপ্নদ্রষ্টা হযরত সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রাহ.) জিহাদের ডাক দিলেন। তাঁর ডাকে ঘুমিয়ে পড়া মুসলমানদের মনে আবারও জিহাদের প্রেরণা জেগে উঠে, ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে উঠে, ঘর-বাড়ী ছেড়ে মুক্তিকামী মানুষেরা প্রস্তুতি নিতে থাকেন। যুদ্ধ যাত্রার পূর্বে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে অর্থ, যুদ্ধের হাতিয়ার- সরঞ্জাম, ঘোড়া, রসদ প্রভৃতি আনা শুরু হলো। আল্লাহর পথে জান কুরবান করার জন্যে হাজার হাজার মুজাহিদ তাঁর ঝান্ডার নীচে জমায়েত হতে লাগলেন। এভাবে যাত্রাকালে তাঁর মুজাহিদ বাহিনীর সংখ্যা দাঁড়ালো বারো হাজার। মুজাহিদরা ১২৪১ হিজরী সনের ০৭ই জমাদিউস সানি মোতাবেক ১৮২৬ ঈসায়ী সনের ১৭ই জানুয়ারী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েন। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে অত্যাচারী শিখদের এলাকায় উপনীত হন। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে শিখদের সাথে মুসলিম বাহিনীর আরোও বেশ ক'টি যুদ্ধ হয়েছিল। যেমন-নওশেরার যুদ্ধ, সিদুর যুদ্ধ, আকুড়ার যুদ্ধ, পানজতারের যুদ্ধ, মায়ার যুদ্ধ, মর্দান যুদ্ধ ইত্যাদি।

সবকটি যুদ্ধেই শিখ'রা মোজাহিদ বাহিনীর সাথে পরাজিত হয়।

১২৪৬ হিজরী সনের ২৪ জিলক্বদ মোতাবেক ১৮৩১ ঈসায়ী সনের ০৬ই মে ঐতিহাসিক বালাকোটের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

বালাকোটের ময়দানে উপস্থিত হয়ে সাইয়্যিদ সাহেবের জ্ঞানচক্ষু খোলে গেল। তিনি দেখলেন তাঁর সম্মুখে মাত্র তিনটি পথ উন্মুক্ত রয়েছে।

(১) পুরুষোচিত সাহস ও শৌর্যবীর্য সহকারে বাতিলের মুকাবিলা করে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করার আপ্রাণ চেষ্টা করা, যাতে করে হকের জন্যে বিজয় সাফল্য সূচিত হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

(২) হককে পরিত্যাগ করে বাতিলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা।

(৩) হককে পরিত্যাগ না করা। বরঞ্চ হকের সংগে জড়িত থাকতে গিয়ে যেসব বিপদ আপদ ও দুঃখ কষ্ট আসবে, তা নীরবে সহ্য করা।

প্রথম পথটিই হলো জাতীয় আত্মমর্যাদার পথ, বীরত্ব ও সৎ সাহসের পথ। নবজীবন লাভ করে আত্মমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ।

দ্বিতীয়টি হলো মৃত্যুর পথ, জীবনের পথ নয়।

তৃতীয়টির পরিণাম এই হতে পারে যে ক্রমশঃ ধুঁকে ধুঁকে এবং যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার ভিতর দিয়ে জাতির জীবন প্রদীপ নিভে যাবে। সাইয়্যিদ সাহেব প্রথম পথটিই অবলম্বন করেছিলেন। এ পথে চলার সকল যোগ্যতা ও গুণাবলী তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

রণকৌশল এবং যুদ্ধ পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে বীর সেনানী সাইয়্যিদ সাহেব (রহ.) তাঁর মুজাহিদ বাহিনীসহ বালাকোটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন্ডিত ভরপুর উপত্যকা ছাউনি স্থাপনের জন্যে বেছে নিয়েছিলেন। পূর্ব দিক দিয়ে কুনহার বা কাগান পাহাড়ি নদী অবিরাম কুল কুল তানে বয়ে চলেছে। উত্তর পশ্চিম দিক থেকে সংকীর্ণ পাহাড়ি ঝর্ণা বড় বড় শিলা খন্ডের ভেতর লুকোচুরি খেলা করছে, ঝর্ণার উত্তর দিকে ছিল প্রশান্ত নূরী এক ময়দান। প্রকৃতির এ লীলা ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে মনে হয় কে যেন জীবন নদীর পরপার থেকে হাতছানি দিচ্ছে। রণক্লান্ত মুজাহিদগণ বিশ্রামের জন্যে এখানে ছাউনি পাতলেও পরপারের হাতছানি হয়তো তাঁদের দৃষ্টির অগোচর হয়নি। তাই বিশ্রাম তাঁদের ভাগ্যে ঘটেনি, বরং বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা।

যুদ্ধপূর্ব দিক নির্দেশনায় সেনাপতির দ্বায়িত্বে থাকা বীর খালিদের উত্তরসুরি হযরত সাইয়্যিদ সাহেব (রহ.) মোজাহিদ বাহিনীকে বললেন, শিখ বাহিনী যতক্ষণ পর্যন্ত পাহাড় অতিক্রম করে সমতল ভুমিতে না পৌঁছে ততক্ষণ আমরা তাদের উপর আক্রমণ করব না, এবং আমরা কখনই তাদের উপর অতর্কিত হামলা করব না।

শিখ বাহিনীর বারবার পরাজয় পক্ষান্তরে ব্রিটিশদেরই পরাজয়, তাই সুযোগ সন্ধানি ব্রিটিশরা শিখদের পক্ষ নেয়। যেহেতু সাইয়্যিদ সাহেব (রহ.) ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে জড়িত তাই চতুর-মোনাফিক ব্রিটিশরা এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চায়নি। এদিকে তারা সীমান্তবর্তী মোনাফেক পাঠান সর্দারদেরকে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে খরিদ করে ফেলল এবং শিখদের সহযোগীতার জন্য পাঠিয়ে দিল। ইতিহাস সাক্ষী মোনাফিকরাই সব ধ্বংসের মূল, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি! মুসলমান নামধারী মোনাফেক পাঠান সর্দারেরা মোজাহিদ বাহিনীর বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তিতে লিপ্ত হয়। মোনাফিক পাঠান সর্দারদের গুপ্ত খবরের উপর ভিত্তি করে যৌথ বাহিনী অর্থাৎ শিখ, ব্রিটিশ এবং মুসলমান নামদারি পাঠান মোনাফিকরা মোজাহিদ বাহিনীর উপর প্রস্তুতি নেয়ার পুর্বেই অতর্কিত হামলা করে বসে। মরনপণ এই যুদ্ধে রায় বেরেলীর পীর, কারবালার বীর সেনানীদের উত্তরসুরি সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহ.) সহ ভারত মহাদেশে ইসলামী সম্রাজ্যের স্বপ্নদ্রষ্টা বীর মোজাহিদ সেনারা বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদতের পেয়ালা পান করেন, এ যেন ছিল উহুদ যুদ্ধেরই পুনরাবৃত্তি।

সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ.) যে খুনরাঙা পথে চলার দুর্বার প্রেরণা দিয়ে গেলেন ভারতীয় মুসলমানদেরকে, বাঙালি, বিহারী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পাঠান নির্বিশেষে ভারতীয় মুসলমানগণ সে খুনরাঙা পথে অবিরাম চলেছে প্রায় শতাব্দীকাল পর্যন্ত। জেল-জুলুম, ফাঁসি, দ্বীপান্তর, স্থাবর, অস্থাবর সম্পদের

বাজেয়াপ্তকরণ, অমানুষিক ও পৈশাচিক দৈহিক নির্যাতন ক্ষণকালের জন্যেও তাদেরকে এ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তথাপি এ আন্দোলনের নেতা স্বয়ং নিজের জীবদ্দশায় কেন এ সাফল্য দেখে যেতে পারেননি, তার কারণও আমাদের চিহ্নিত করা দরকার। প্রধান কারণগুলি নিম্নরূপ বলে অনেকেই অভিমত প্রকাশ করেছেন।

১. ইসলামী আন্দোলন তথা আল্লাহর পথে জেহাদ পরিচালনার জন্যে যে কর্মীবাহিনীর প্রয়োজন, যেমন উত্তম চরিত্র, আদর্শ, আল্লাহর পথে উৎসর্গীকৃত। এই ধরণের মুজাহিদের সংখ্যা এক থেকে দু'হাজারের মধ্যেই সীমিত ছিল। কিন্তু সীমান্তের পাঠানদের সংখ্যা ছিল বেশি (প্রায় তিন লক্ষ), তাদের সত্যিকার কোন ইসলামী চরিত্র ছিল না। শুধু ছিল প্রেরণা ও জোশ। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ছিল দরিদ্র, অজ্ঞ, অর্থলোভী এবং বহুদিনের পুঞ্জীভূত কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ। এদের অর্থলোভে বিশ্বাসঘাতকতা এবং চরম মুহুর্তে প্রতিপক্ষ শিখ সৈন্যদের সঙ্গে যোগদান বালাকোটের যুদ্ধের পরাজয়ের অন্যতম কারন।

২. স্বয়ং সাইয়্যিদ সাহেব বীরযোদ্ধা ও রণকৌশলী থাকা সত্ত্বেও গোটা মুজাহিদ বাহিনীকে তৎকালীন যুদ্ধবিদ্যায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি।

৩. বিশ্বাসঘাতক ও চরিত্রহীন পাঠানদের প্রতি পূর্ণমাত্রায় আস্থা স্থাপন এবং সুলতান মুহাম্মদ খাঁ এবং তার ভ্রাতৃবৃন্দ, "যারা ছিল সাইয়্যিদ সাহেব বিরোধী" তাদের উপরে পেশাওরের শাসনভার অর্পণ ও অন্যতম একটি কারণ। কারণ সুলতান মুহাম্মদ খাঁই শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের উপর চরম আঘাত করে এবং একই রাতে এক সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সাইয়্যিদ সাহেবের কয়েক'শ বীরযোদ্ধা ও রণকৌশলী মুজাহিদের প্রাণনাশ করে।

উপসংহারঃ

ইতিহাসের অন্যতম মহানায়ক সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহ.) শাহাদাতের স্বাদ গ্রহণ করলেন। তাঁর সাথীদের অনেকেই শাহাদাতবরণ করলেন। আহত হলেন অনেকে। বন্দী হলেন আরোও অনেক। আপাতত এক মহান বিপ্লবের পতন ঘটল। এভাবেই মর্দে মুজাহিদ সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহ.)-এর বালাকোট অধ্যায়ের শেষ হলো। সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহ.) ছিলেন আপোষহীন নেতা। ইসলামের একনিষ্ঠ এই সাধক দ্বীন কায়েমের সংগ্রামে ছিলেন অটল-অবিচল। তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শাহাদাতের পথ বেছে নিলেন, কিন্তু অন্যায়ের কাছে মাথা নত করলেন না। জীবনের বিনিময়ে তিনি সত্যের পথে লড়াই করলেন। তাঁর এই দৃঢ়তা ও অনবদ্য প্রেরণা আজও বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমানকে অনুপ্রাণিত করে, আবেগতাড়িত করে। সত্যপথের যাত্রীরা সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহ.)'র আদর্শ নিয়ে আজও

কাজ করছে। দুনিয়ার দেশে দেশে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে তারা জীবন উৎসর্গ করছে। রায় বেরেলীর জঙ্গী পীরের সেই বিপ্লবের আগুন নির্বাপিত হয়নি, বরং সে আগুন ছড়িয়ে গেছে সারা বিশ্বে। যেখানেই অন্যায়, সেখানেই আছে সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহ.)'র মতো সাহসী ও আপোসহীন সৈনিক। কেউ এদের শেষ করতে পারবে না। কেননা, আল্লাহর পথে সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহ.)'র মৃত্যু নেই। সাইয়্যিদ সাহেব (রহ.)'র এই ত্যাগের মূল্যায়ন করতে গিয়ে কবির ভাষায় বলতে হয়: "যুগ যামানা পাল্টে দিতে চাইনা অনেকজন এক মানুষই আনতে পারে জাতির জাগরণ"

তথ্যসুত্রঃ

(১) তরিকায়ে মোহাম্মদিয়া, মুজিবুর রহমান।
(২) সাইয়েদ আহমদ শহীদ, গোলাম রসূল মেহের
(৩) স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, আবু জাফর।
(৪) তাওয়ারিখে আজমিয়ার, গোলাম রসূল মেহের।

সংগ্রহ: মাসিক অভিযাত্রিক, সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী র. সংখ্যা

সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)-এর আন্দোলন

মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) উপমহাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন একাধারে 'রুহবানুল লাইল ওয়া ফুরসানুন নাহার'-রাতের তাপস আর দিনের ঘোড় সওয়ার (মুজাহিদ)। তিনি জীবনের মূল্যবান সময়কে দীন ইসলামের জন্য কুরবান করে গেছেন। উপমহাদেশে ইলমে নববী তথা ইলমে দীনের সার্থক উত্তরাধিকার ও যথাযথ প্রচারক শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-এর সুযোগ্য ছাহেবজাদা ও খলীফা হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-এর স্নেহধন্য শাগরিদ ও খলীফা হিসেবে তিনি যে সংস্কার ও বিপ্লব সাধন করে গেছেন এর কোনো তুলনা হয় না। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য যে, কিছু স্বার্থান্বেষী মহল তাঁর জীবনেতিহাস নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত। তিনি বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানের ফলে তৎকালীন বৃটিশ শাসক গোষ্ঠীর রোষানলে পতিত হন। শাসকগোষ্ঠীর মদদপুষ্ট লেখক ও ঐতিহাসিকরা তাঁর প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত করে উপস্থাপন করে। ফলে তিনি বিকৃত ও ভুল ইতিহাসের শিকার হন। সে বিকৃত ইতিহাসের সূত্র ধরে আজো অপপ্রচার চলছে। অবশ্য, সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরতে অনেক লেখক ও গবেষক ইতোমধ্যে কলম ধরেছেন। সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)-এর আন্দোলন সামগ্রিক বিবেচনায় যে একটি সংস্কার আন্দোলন ছিল তাও তাঁরা প্রমাণ করেছেন। সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.)-এর তরীকতের অধস্তন সিলসিলার কার্যধারা থেকেও তাঁর আন্দোলনের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রমাণিত। ভারত উপমহাদেশ বিশেষ করে বাংলাদেশে জৌনপুর, ফুরফুরা, ফুলতলী, ছারছীনা, নারিন্দা, মৌকরাসহ যত হক সিলসিলা রয়েছে সকলেরই পূর্বসূরী হলেন হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)। হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) ছিলেন এক বিস্ময়কর প্রতিভা। তিনি ছিলেন একটি তরীকার প্রতিষ্ঠাতা, একজন মুরশিদে কামিল। তাঁর ব্যক্তিত্ব, স্বভাব-চরিত্র, দাওয়াত ও তাবলীগ সমকালে যেমন অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল তেমনি এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব আজও বিদ্যমান। তাঁর চারিত্রিকি বৈশিষ্ট্য ও দ্বীনী দাওয়াতের

প্রভাব কেমন ছিল এর সম্যক ধারণা লাভ করা যায় আবুল হাসান আলী নদভী'র তারীখে দাওয়াত ও আযীমত' (সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস) গ্রন্থ থেকে। তিনি লিখেছেন : "শাহ সাহেব (শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী র.) এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এমন কতিপয় উচ্চ যোগ্যতা, সাহসিকতা ও বিস্ময়কর ইচ্ছাশক্তির অধিকারী আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের পৃষ্ঠপোষকতার কাজ নিয়েছেন যারা হাজার হাজার মানুষের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং এক পূর্ণ শতক সামলে রেখেছেন। এই দাবীর সত্যতার জন্য কেবল তার একান্ত খলীফা সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র) (১২০১-১২৪৬ হি.)-এর নাম নেওয়াই যথেষ্ট। যিনি এই উপমহাদেশে এই মহান ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, যার স্বয়ংসম্পূর্ণতা, প্রভাব শক্তি এবং ইসলামের সুমহান দাওয়াত, নববী আদর্শের নৈকট্য ও সাদৃশ্যতা না কেবল এই তের হিজরী শতকে দৃষ্টিগোচর হয় বরং বিগত কয়েক শতকেও এ ধরনের ঈমানী চেতনা সৃষ্টিকারী আন্দোলন এবং নেককার বুযুর্গদের এমন সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল জামাতের কোনও খোঁজ পাওয়া যায় না। তিনি আকাইদ ও আমলের সংশোধন, মানুষের তরবিয়ত, ওয়াজ-নসীহত, তাবলীগে দীন, জিহাদ ও নির্ভীকতার বিশাল বিস্তৃত রণাঙ্গণে যেভাবে কর্মতৎপর ছিলেন, এর প্রভাব কেবল তার কর্মময় স্থান ও তার সমসাময়িক বংশধর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তা ভবিষ্যত প্রজন্ম, তৎপরবর্তীকালে আগত আহলে হক, দীনের দাঈ, ঝান্ডাবাহী ও খাদেমদের উপর গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে। ক্রমবর্ধমান ইংরেজ শক্তির মোকাবেলায় ভারতবর্ষ ও তার প্রতিবেশি মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর হেফাজত, খোলাফায়ে রাশেদার আদর্শে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা-সংগ্রামের সূচনাও তিনিই করেছেন। এই আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া শিক্ষা-সাহিত্য, ইসলামী চিন্তাধারা, ভাষা ও বাচনভঙ্গি বর্ণনায়ও পড়েছিল। এ আন্দোলন সমাজ সংস্কার, জাহেলী রীতিনীতির ভ্রান্ততা প্রমাণ, হিন্দু ধর্মের প্রভাব দূরীভূত করা এবং সঠিক ইসলামী জীবনের প্রতি প্রত্যাবর্তনের মহান কাজ আঞ্জাম দিয়েছে। (শাহ আবদুল হালীম হুসাইনী অনূদিত, সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২৫৭-২৫৮)

আবুল হাসান আলী নদভী তার পূর্বোক্ত গ্রন্থে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র) এর দাওয়াত ও তরবিয়তের প্রভাবের ব্যাপকতা, শক্তি, গভীরতা ও কার্যকারিতা প্রসঙ্গে বিভিন্ন লেখক ও চিন্তাবিদের রচনাবলি থেকে কিছু উদ্ধৃতিও পেশ করেন। তিনি লিখেন- "ভারতবর্ষের বিখ্যাত লেখক ও ঐতিহাসিক নবাব সিদ্দীক হাসান খান, গভর্নর, ভূপাল (মৃত্যু ১৩০৭ হি.), যিনি সাইয়িদ (র)-এর শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাব স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তাকে প্রত্যক্ষকারীদের এক বিরাট দলের যুগ পেয়েছিলেন, তিনি 'তিকসারু যুযূদিল আহরার' গ্রন্থে লিখেন, 'সৃষ্টিজীবের পথ প্রদর্শন এবং আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনা ও প্রত্যার্পণে তিনি

ছিলেন আল্লাহর একটি নিদর্শন। এক বিরাট মানবগোষ্ঠী ও এক পৃথিবী তার আত্মিক ও শারীরিক তাওয়াজ্জুহে বেলায়েতের মর্যাদায় পৌঁছে গেছে। তার খলীফাগণ ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে ভারতের মাটিকে শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কারের খড়কুটো থেকে পবিত্র করে দিয়েছে, কুরআন-সুন্নাহর বিশ্বরোডে এনে দাঁড় করিয়েছে। আজও তাদের ওয়াজ-নসীহতের বরকত যথারীতি চালু আছে'। তিনি আরো লিখেছেন, 'মোটকথা এ যুগে পৃথিবীর কোনও রাষ্ট্রে এমন সুযোগ্য ব্যক্তিত্বের কথা শোনা যায়নি। যে ফয়েয-বরকত এই হকপন্থী দলের মাধ্যমে সৃষ্টিজীবের হয়েছে, তার দশ ভাগের একভাগও এ যুগের উলামা মাশায়িখের দ্বারা হয়নি।" (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৫৮)

হযরত শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)-এর শাগরিদ মাওলানা হায়দার আলী রামপুরী টোঙ্কী (মৃত্যু ১২৭৩ হি.) 'সিয়ানাতুন নাস' গ্রন্থে লিখেছেন, 'তার হেদায়াতের নূর সূর্যের মত পূর্ণ ক্ষিপ্রতার সাথে বিভিন্ন শহর-নগর ও মানুষের অন্তরে উদ্ভাসিত হয়। চতুর্দিক থেকে ভাগ্যবান লোকজন পরকালের প্রতি মনোযোগী হয়ে শিরক-বিদ'আত ইত্যাদির নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে (রীতিমত যুগ যাতে অভ্যস্ত ছিল) তাওবা করে তাওহীদ ও সুন্নাতের শাশ্বত পথ অবলম্বন করতে থাকে। আর প্রায়ই হযরতের পুণ্যাত্মা খলীফাগণ নানা স্থান সফর করে করে লাখ লাখ মানুষকে দীনে মুহাম্মদীর সরল সঠিক পথ বাতলে দেন। যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ছিল এবং আল্লাহর অনুগ্রহ যাদের সাহায্য করেছে তারা এই পুণ্যের পথে চলে'। (প্রাগুক্ত)

বিখ্যাত আলেমে দীন মাওলানা আবদুল আহাদ সাহেব, যিনি এই মুবারক জামাতের অনেক সদস্যের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন, যার সময়কাল সাইয়িদ (র)-এর হাতে নিকটতর ছিল, তিনি লিখেন, 'হযরত সাইয়্যিদ সাহেব (র.)-এর হাতে চল্লিশ হাজারের অধিক হিন্দু প্রমুখ কাফির মুসলমান হয়েছে। ত্রিশ লাখ মুসলমান তার হাতে বায়আত গ্রহণ করেছেন। আর বায়'আতের যে ক্রমধারা তার খলীফাগণের খলীফাদের মাধ্যমে গোটা বিশ্বে চালু রয়েছে, এই সিলসিলায় তো কোটি কোটি মানুষ তার বায়আতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে'। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৫৯)

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে পাঠকবৃন্দ চিন্তা করে দেখুন, হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)-এর দাওয়াত ও আন্দোলনের প্রভাব কতটুকু। যে আন্দোলনের বদৌলতে তিনি ভারত উপমহাদেশ ছাড়াও বহির্বিশ্বে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রেখেছিলেন তাঁর সে আন্দোলন পর্যালোচনা করলে আমরা একে তিনটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি। যেমন :

১. দ্বীনী সংস্কার আন্দোলন।

২. আধ্যাত্মিক আন্দোলন (তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া)।

৩. জিহাদ (সশস্ত্র সংগ্রাম)।

আলোচনার সুবিধার্থে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)-এর আন্দোলনকে তিনভাগে বিভক্ত করলেও মূলত এ তিনটির উদ্দেশ্য ছিল এক ও অভিন্ন অর্থাৎ ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা, মানুষকে আল্লাহর পথে নিবিষ্ট করা এবং মুসলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ট কুসংস্কার ও বিদ'আতের মূলোৎপাটন।

দ্বীনী সংস্কারঃ সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) নানাবিধ দ্বীনী সংস্কার সাধন করেছেন। ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ইসলামী জীবনাচারের বিভিন্ন দিক বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এগুলো পুনরুজ্জীবিত করেন। তাঁর সংস্কারের মধ্যে রয়েছে সালামের পুনঃপ্রচলন, ইসলামী পোশাক-পরিচ্ছদ পুনঃপ্রবর্তন, কবরপূজাসহ নানা ধরনের শিরক-বিদআত উচ্ছেদ করা, হজ্জের ফরযিয়ত সম্পর্কে প্রচলিত অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধে অবস্থান এবং সদলবলে হজ্জ পালন, বিবাহ প্রথা সংশোধন এবং বিধবা বিবাহ পুনঃপ্রচলন, হিন্দুয়ানী বেশ-ভূষা ও রীতি-নীতি থেকে মুসলিম সমাজকে রক্ষা, তা'যিয়ার বিলোপ সাধন ইত্যাদি।

আধ্যাত্মিক আন্দোলন (তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া)ঃ সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) মুসলমানদের আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য 'তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া' নামে একটি সমন্বিত তরীকা প্রতিষ্ঠা করেন। এটি হলো চিশতিয়া, কাদরিয়া, নকশবন্দিয়া ও মুজাদ্দিদিয়া তরীকার সার নির্যাস। অধ্যাপক এইচ. রহমান সম্পাদিত 'ভারত-উপমহাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)-এর প্রতিষ্ঠিত তরীকায়ে মুহাম্মদিয়াকে 'সংস্কার আন্দোলন' হিসেবেই আখ্যায়িত করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে আছে : "ভারতের মুসলমানদের জাগরণ ও স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা রক্ত দিয়াছেন তাহাদের মধ্যে শাহ সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন যখন তমসাচ্ছন্ন, তখন সৈয়দ আহমদের জন্ম হয়। মুসলমানদের বিশাল সাম্রাজ্য মারাঠা, ইংরেজ ও শিখেরা ছিনাইয়া লইয়াছিল। ফলে ঐ যুগে তাহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিয়াছিল। শাহ সৈয়দ আহমদ ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে যুক্ত প্রদেশের রায়বেরেলী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দিল্লীর বিখ্যাত আলেম শাহ আব্দুল আজিজের নিকট অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রথমে সংস্কার আন্দোলনে শুরু করেন। শাহ সৈয়দ আহমদ শহীদের প্রচলিত সংস্কার আন্দোলন 'মুহাম্মদী আন্দোলন' নামে পরিচিত। ভারতের মুসলমানদের কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতিনীতি দূর করিয়া ইসলামের নির্দেশিত সমাজ ও রাষ্ট্র পুনঃ প্রতিষ্ঠা করাই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল।" (অধ্যাপক এইচ. রহমান সম্পাদিত, ভারত-উপমহাদেশের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৩৩৯-৩৪০)

জিহাদ (সশস্ত্র সংগ্রাম)ঃ ভারতবর্ষে ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)-এর নির্দেশনায় ও তাঁর নেতৃত্বে বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম বাহিনী সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম জিহাদ সংগঠিত হয় শিখদের বিরুদ্ধে, যা আকুড়ার যুদ্ধ নামে পরিচিত। ১৮২২ খৃস্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর, ১২৪২ হিজরীর ২০ জমাদিউল আউয়াল তারিখে এ জিহাদ সংঘটিত হয়। পরবর্তীতে আরো অনেক জিহাদ সংঘটিত হয়েছে। সর্বশেষ ১৮৩১ সালের ৬ মে ঐতিহাসিক বালাকোট প্রান্তরে শিখ ও ইংরেজ মিত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদ করে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) শাহাদত বরণ করেন। সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) সারাজীবন দ্বীনের খিদমতে, দ্বীনী আন্দোলনে অতিবাহিত করেছেন। তাঁর জীবন ও সংগ্রাম আমাদের জন্য প্রেরণার উৎস।

সংগ্রহ : সম্মেলন স্মারক ২০১৬, বালাকোট-চেতনা উজ্জীবন পরিষদ

সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (রহ.) ও বালাকোটের যুদ্ধ

এবাদত আলী

বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সিপাহশালার, শহীদে বালাকোট, আওলাদে রাসুল (সা.), সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী (রহ.) ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা জেলায় এক প্রসিদ্ধ বংশে ১৭৮৬ সালের ২৯ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশ তালিকা চতুর্থ খলিফা হজরত আলী (রা.) এর সাথে মিলিত হয়েছে। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা জীবন রায় বেরেলিতেই শুরু হয়। মাত্র ১৩ বছর বয়সে পিতার ইন্তেকালের পর ভারতের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শাহ ইসহাক দেহলভী (র.) এর কাছ থেকে ইলমে শরীয়তের পান্ডিত্ব অর্জন করেন। পরবর্তিতে অনেক দুর্গম পাহাড়ি পথ পাড়ি দিয়ে দিল্লীতে এসে ইমামুল মুহাদ্দিসিন শায়খুল মাশায়েখ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। তিনি অতি অল্প দিনেই এলমে তাসাউফের সু-উচ্চ মাকামে আরোহন করেন এবং শাহ সাহেব তাঁকে খেলাফত দান করেন।

খিলাফত লাভের পর বেরলভী (রহ.) কঠিনভাবে রিয়াজত, মুশাক্কাতে আত্মনিয়োগ করায় ইলমে বাতেনের সকল মাকামই অতি সহজে তার আয়ত্ব হয়েছিলো। তাঁর পীর হজরত শাহ সাহেবের নিকট কোন লোক মুরিদ হতে আসলে তিনি তাদেরকে হজরত বেরলভী (রহ,) এর নিকট পাঠিয়ে দিতেন এবং বলতেন আমার কাছ থেকে ১২ বছরে যা হাসিল করতে পারবেনা, বেরলভীর কাছ থেকে তা ১২ দিনে আয়ত্ব করতে পারবে। তাঁর তরিকার নাম ত্বরিকায়ে মোহাম্মাদিয়া। এই তরিকা মানুষকে দেখিয়েছে একটি আলোকজ্জোল পথ। তিনি ১৮২২ সালে ৭৫৩ জন যাত্রি নিয়ে পবিত্র মক্কা নগরীতে হজ পালন এবং মদীনা শরীফে মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সা.) এর রওজা শরীফ জিয়ারত করেন। ১৮২৪ সালে তিনি রায়বেরেলিতে ফিরে আসেন।

পরাধীন ভারতবাসির কেউ তখনো বৃটিশদের শাসন ও শোষণ থেকে রক্ষার স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেনি। সাধারণ মানুষ কখনোই ভাবতোনা তারা বৃটিশদের জুলুম নির্যাতন ও শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পারবে। এমনই এক সময় বেরলভীর আবির্ভাব ঘটেছিলো যখন ভারতের মুসলমানদের ওপর ইংরেজ, শিখ ও হিন্দুদের

অত্যাচারের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। জুলুম-নির্যাতন এতই বৃদ্ধি পেয়েছিলো যে, জালিমরা মুসলিম নারীদের দাসী রূপে ব্যবহার করতো। ফসলাদি নষ্ট ও ঘর-বাড়িতে আগুন দেওয়াসহ সিমান্তের মসজিদগুলোকে মন্দির ও ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত করেছিলো। সর্বোপরি একদিকে মুসলমানরা বিধর্মীদের হাতে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত হচ্ছিলো, অন্য দিকে বৃটিশ, হিন্দু ও শিখদের প্রতিপত্তির ফলে নিজস্ব তাহজিব তামাদ্দুন তথা মূল আদর্শ, সংস্কৃতি ভুলে গিয়ে পাশ্চাত্য ও হিন্দুয়ানি আদর্শ, সংস্কৃতি গ্রহণ করা শুরু করেছিলো। এমনকি বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানরা হিন্দুদের পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করাসহ তাদের নামের পূর্বে শ্রী শব্দ পর্যন্ত ব্যবহার করতো।

ঠিক সেই মূহূর্তে আজাদী আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সিপাহশালার, শহীদে বালাকোট, আওলাদে রাসুল সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহ.)। রেঁনেসার কবি ফররুখ আহমদ তাই সৈয়দ আহমদ বেরলভী সম্পর্কে তার কালজয়ী কবিতায় রায় বেরলভীর জঙ্গি পীর আখ্যা দিয়ে লিখেছিলেন, ' সবাই যখন আরাম খুজে/ ছুটে ঘরের পানে। জঙ্গি পীরের ডাক শোনা যায় / জঙ্গেরই ময়দানে। সবাই ভাবে পীরের কথা/ শুনেছিতো ঢের। এমন পীরের কথা তো ভাই পাইনি কভু টের' গভীর রাতে প্রকৃত আল্লাহওয়ালাদের দুচোখে যেমন অশ্রু ঝরে, ঠিক তেমনিভাবে দিনের আলোতে তার তরবারিতে ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমনদের রক্ত ঝরে। তিনি শুধু মুরিদানদের নিয়ে তসবিহ হাতে জায়নামাজে খানকায় বসে থাকেন নি। নিজের সুখ-শান্তি ত্যাগ করে যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে একদল বিশুদ্ধ আত্মার নিবেদিত প্রাণকর্মী বাহিনী নিয়ে সিংহের মত গর্জে উঠেছেন। তিনি ১৮৩১ সালের ৬ মে ঐতিহাসিক বালাকোট প্রান্তরে ইংরেজ ও শিখ মিত্র বাহিনীর সাথে জিহাদ করেছিলেন। সৈয়দ আহমদ বেরলভী (রহ.) এর বাহিনীর সাথে ইতোপূর্বে কয়েকটি যুদ্ধে শিখ ও বৃটিশ বাহিনী পরাজিত হয়। বীর মুজাহিদ বাহিনীর সাথে কোনমতেই টিকে ওঠা সম্ভব নয় ভেবে বৃটিশ ও শিখ নরপতিগণ কুটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে। মুসলমান সামাজে বিশ্বাসঘাতক তথা মুনাফেকদের অভাব কোনকালেই ছিলোনা। সীমান্তের প্রধান জমিদার ও গোত্রপতিগণকে ইংরেজ ও শিখ শাসকেরা বিভিন্ন প্রকার লোভ দেখিয়ে বশীভূত করে ফেলে। তারা মুজাহিদদের যাবতীয় তথ্যাদি ইংরেজ ও শিখদের নিকট গোপনে সরবরাহ করতে থাকে।

মুজাহিদ বাহিনী এই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। তাদের বাহিনীতে মাত্র ৭শ সৈন্য এবং শিখ সৈন্য সংখ্যা ছিলো ১০ হাজার। ১৮৩১ সালের ৬ মে তারিখে বালাকোটের যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনী যে জায়গায় অবস্থান নিয়েছিলেন সেখানে পাহাড়ি গিরিপথ মাড়িয়ে শিখ বাহিনী এতসহজে তথায় পৌঁছতে সক্ষম হতোনা। কিন্তু স্থানীয় মুসলমান মুনাফেকদের কারণে বালাকোট

পর্যন্ত পৌছার রাস্তা পেয়ে যায় শিখ বাহিনী। এই যুদ্ধে শিখ বাহিনীর প্রায় ১ হাজার সৈন্য নিহত হয়। ঐতিহাসিক এই বালাকোটের যুদ্ধে সৈয়দ আহমদ বেরলভী (রহ.) শাহাদত বরণ করেন। তার সাথে প্রায় ৩শ বীর মুজাহিদও শাহাদত বরণ করেন।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট
সদস্য: পাবনা প্রেসক্লাব

তথ্যসূত্র: অনাবিল সংবাদ, ৫ মে ২০২১

বিভ্রান্তি অপনোদনে তাঁহার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান

মাওলানা মুহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দীক্ব ফারুক্বী

ইমামুত ত্বরীকত হযরত সাইয়িদ আব্দুল বারী শাহ (রহঃ) এর ছিলছিলার উনত্রিশ তম মুর্শিদ ছিলেন আমীরুল মু'মিনীন হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহঃ) (১৭৮৬-১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দ) তার অবদান অবিস্মরণীয়। তার ফয়েজ বরকতে সারা বিশ্ব আলোকিত। কিন্তু এক শ্রেণীর লোক ইংরেজ লেখক হান্টারের সুরে সুর মিলিয়ে বিভ্রান্তি বশতঃ হযরত সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহঃ) এর আন্দোলনকে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব নজদী কর্তৃক পরিচালিত ওহাবী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করে সাধারণ মানুষকে গোমরাহীর মাঝে নিপতিত করার চেষ্টা চালায়। এহেন দুর্যোগ মুহুর্তে চট্টগ্রামের হালিশহর দরবার শরীফের, প্রতিষ্ঠাতা কুতবুল ইরশাদ, সুলতানুল আউলিয়া সাইয়্যিদ হাফেজ মুনির উদ্দীন নুরুল্লাহ (রহঃ) হালিশহরী ছাহেব এগিয়ে আসেন। এরূপ চরম বিভ্রান্তি নিরসন কল্পে, মমতাজুল ফুকাহা মাওলানা আবদুল আউয়াল (রহঃ) প্রাক্তন মুদাররিস, মাদ্রাসা-ই-আলীয়া দারুল উলুম, চট্টগ্রাম এবং মাদ্রাসা-ই-দারুস সুন্নাহ, ছারছীনা। সুলতানুল আউলিয়া, সাইয়্যিদ হাফেজ মুনির উদ্দীন (রহঃ) এর ইরশাদ ও হুকুম মুতাবিক ০৫/১২/১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে দশটি বিষয়ের উপর কোরআন, হাদীস ভিত্তিক যুক্তিপূর্ণ ফাতওয়া প্রদান করেন। উল্লেখিত ফাতওয়ার প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে গিয়ে মাওলানা আবদুল আউয়াল ছাহেব, ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদ-ই-আলফেছানী (রহঃ), শাহ ওয়ালী-উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ), হযরত সাইয়্যিদ শহীদ আহমাদ বেরলভী (রহঃ), হযরত হাজী শাহ ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী(রহঃ) প্রমুখের বিলায়তে সন্দেহ নেই বলে উল্লেখ করেন। উক্ত ফাতওয়ায় তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ শীর্ষস্থানীয় আলীমে দ্বীনগণ স্বাক্ষর করেন। উলামায়ে কেরামগণের নাম, সন তারিখ সহ নিম্ন উপস্থাপন করা হইল।

(১) আওলাদে রাসুল, হযরতুল আল্লামা গাজীয়ে দ্বীনও মিল্লাত সাইয়্যিদ আবদুল হামিদ বাগদাদী (রহঃ)। (যিনি চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদের খতীব ও মহান সংস্কারক ছিলেন।)

(২) আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আলিমে দ্বীন ওলিয়ে কামেল হযরতুল আল্লামা ফখরে বাংলা আব্দুল হামিদ (রহঃ), (যিনি চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়াতে অধ্যাপনা করেছিলেন। -তারিখ-৮/১২/৩২)

(৩) পীরে কামেল, হযরতুল আল্লামা নজীর আহমদ (র.), (যিনি চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়াতে অধ্যাপনা করেন। চুনতিতে মাওলানা আব্দুল হাকীম (র.)-এর নামানুসারে ১৯৩৭ইং সালে মাদ্রাসাটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। যাহা বর্তমানে চুনতি হাকিমীয়া আলীয়া নামে পরিচিত। তিনি কুতবুল আলম, শেখে তরিক্বত হযরত হাফেজ হামেদ হাছান আলাভী আজমগড়ী (রহঃ)-এর অন্যতম খলিফা ছিলেন। ১৩৫২ হিজরী)

(৪) ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম মুফতীয়ে বাংলা হযরতুল আল্লামা মাওলানা ছুফী আহছানুল্লাহ (রহঃ), যিনি চট্রগ্রাম দারুল উলুম আলীয়াতে অধ্যাপনা করেন। শীর্ষ স্থানীয় মুফতী হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। ৪০ বৎসর যাবৎ তিনি ফতওয়া বিভাগে কৃতিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। হযরত হাফেজ হামেদ হাছান আলাভী (রহঃ) চট্রগ্রামে তশরীফ আনিলে তিনি তাঁহার নছীহতের বাংলা অনুবাদ করিয়া দিতেন। তারিখঃ- ২৭/০৮/১৩৭৫ হিঃ

(৫) হজরতুল আল্লামা মাওলানা ছফীরুর রহমান হাশেমী (র.)-মুহাদ্দিস দারুল উলুম আলীয়া, চট্টগ্রাম। (১৯/০৫/৭২হিঃ)

(৬) হজরতুল আল্লামা সাইয়্যিদ আজিজুল হক আল-কাদেরী (শেরে বাংলা) চট্টগ্রাম। তারিখঃ-১৯/০৫/৭২ হিজরী।

(৭) হজরতুল আল্লামা মাওলানা আফাজ উল্লাহ (রহঃ)-মুদাররিস, দারুল উলুম আলীয়া, চট্টগ্রাম। ০৯/১২/১৯৩২ইং।

(৮) হজরতুল আল্লামা মাওলানা ফয়জুল করীম (রহঃ)। মুদাররিস, দারুল উলুম আলীয়া। ১৫/১২/৩২।

(৯) হজরত মাওলানা, আব্দুল মজীদ (রহঃ), চট্টগ্রাম। ১০/১১/১৯৩৫।

(১০) হযরত ছৈয়দ আব্দুল করীম (রহঃ) আল মাদানী। ১০/১১/৩৫।

(১১) হজরত মাওলানা মুনীর আহমদ (রহঃ) মুদাররিস, দারুল উলুম আলীয়া। ১৫/১২/৩২।

(আরো অনেক ওলামাগণ এই ফাতওয়ায় দস্তখত করেন।)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আমীরুল মু'মিনীন ফিত ত্বরীকত- অর্থাৎ হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত সাইয়্যিদ আহমদ বেরলভী (রহঃ) এর প্রায় ১০০ জন খলীফা ছিলেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন খলীফা ব্যতীত অন্যরা বিভিন্ন মতবাদে জড়িত হয়ে গিয়েছিল। যার অপবাদ আমীরুল মু'মিনীন সাইয়্যিদ আহমদ (রহঃ) এর উপর পড়েছিল। কিন্তু তিনি ঐ অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। মূলতঃ

তাঁর আক্বীদা ছিল আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত অনুযায়ী। রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তাঁর ইশক মুহব্বত ছিল প্রশ্নাতীত। তার মাকাম ছিল অনেক উর্ধ্বে। খলীফাগণের মধ্যে ছিলছিলার কাজ করেন হযরতুল আল্লামা আব্দুল হাই লখনৌভী (রহঃ), হযরতুল আল্লামা ইমাদুদ্দিন বাংগালী (রহঃ), হযরতুল আল্লামা কেরামত আলী জৈনপুরী (রহঃ), হযরত মিয়াজী নূর মুহাম্মদ (রহঃ), হযরতুল আল্লামা ছুফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী(রহঃ), হযরতুল আল্লামা বেলায়েত আলী নিজামাবাদী (রহঃ), এই মহান পীরে কামেলের মাধ্যমে ত্বরীকার ধারাবাহিকতা অদ্যাবধি চালু রয়েছে, তাদের ফয়েজ বরকতে ত্বরীকতের ছিলছিলার হক্কানীয়ত প্রমাণিত, এই ত্বরীকার পীরগণ পথহারা মানুষদেরকে পথ দেখাচ্ছেন। তাদেরকে হুজুর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌছে দিচ্ছেন। আরও কয়েকজন খলীফা ছিলছিলার কাজে রত ছিলেন- হযরত মিয়া ফজল (রহঃ) তাদের মধ্যে অন্যতম। হযরত সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহঃ) ছিলেন ১৩০০ হিজরির মোজাদ্দিদ। তারা যদি সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ(রহঃ) কে প্রকৃত জাহের-বাতেন অর্থাৎ শরীয়ত ও ত্বরীকতের মোশাহেদা দিয়ে নজর করিতে সক্ষম হত তাহলে সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ) এর উপর এত অপবাদ দিতেন না। আমাদের ছিলছিলার ওজীফা দেখলে বুঝতে পারবেন, আমাদের ছিলছিলা কুরআন ছুন্নাহর বিপরীত কি না। আমাদের ছিলছিলা কুরআন সুন্নাহর বিপরীত কেহ দেখাইতে পারবে না। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) যাকে বিজ্ঞ ছুফীয়ায়ে কেরামগণ শেখে শুয়ুখ জাহেদে কামেল ছৈয়দুত্‌তায়িফা লেছানুল কওম, তাজুল ওলামা সুলতানুল মোহাক্কেকীন ইত্যাদি তাঁর গুনবাচক নামে স্মরন করতেন। বেশীরভাগ ছুফীয়ায়ে কেরাম তার ত্বরীকা এখতিয়ার করিয়াছেন। সেই জমানার হিংসুক ওলামাগণ তাকে কাফের ফত্‌ওয়া দিয়েছেন। সুলতানুল মারেফাত, বাহারে তৌহীদ হযরত জুন্নুন মিসরী (রহঃ) কে ও কাফের ফাত্‌ওয়ার অপবাদ সহ নানা রকমের কষ্ট দিয়েছে। তার এন্তেকালের পর মিসরবাসী শরমিন্দা ও অনুশোচনা করেছে।

তথ্যসূত্র: মুরীদ ও মুরাদ, পৃঃ ৭৬-৭৭। বারীয়া হামেদীয়া মুনীরীয়া খেদমত কমিটি

ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানের ভূমিকা

সত্যেন সেন

উনবিংশ শতাব্দীতে উপমহাদেশে মুসলিম জাগরণ ও আন্দোলন (১)

উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক পূনর্জগরণ কোন একক ঘটনা বা ব্যক্তির অবদানপ্রসূত ফল নয়। কারো কারো মতে[১] মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে মুসলমানদের আত্মশুদ্ধিভিত্তিক যে সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয় বস্তুত তা থেকেই এ উপমহাদেশে আধুনিক কালের মুসলিম সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতার প্রক্রিয়া শুরু হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দিল্লির শাহ ওয়ালিউল্লাহর নেতৃত্বে সূচিত এই শান্তিপূর্ণ সংস্কার আন্দোলন পরবর্তীকালে তার সুযোগ্য পুত্র শাহ আবদুল আজিজের শিষ্য সৈয়দ আহমদ বেরলভী শহীদের অধিনায়কত্বে শিখ ও ইংরেজবিরোধী সশস্ত্র সংঘর্ষে রূপ নেয়। সৈয়দ আহমদ বেরলভীর শাহাদাতের মধ্য দিয়ে এ আন্দোলনের প্রথম পর্যায় শেষ হয়। প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে এই আন্দোলনের বিস্তৃতি ঘটে।

সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকা থেকে পূর্ব প্রান্তে বাংলায়ো এর সজোর ধাক্কা লাগে। তৎকালীন বাংলার পূর্বাঞ্চলে (বর্তমান বাংলাদেশ) হাজী শরিয়তুল্লাহ ও তার পুত্র দুদুমিয়া (মোহসেন উদ্দিন) এর নেতৃত্বে ফরায়েজি আন্দোলন এবং পশ্চিমাঞ্চলে (বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে) তিতুমীর (নেসার আলী) এর অধিনায়কত্বে যে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন গড়ে ওঠে আংশত তারও আনুপ্রেরণা আসে শাহ ওয়ালিউল্লাহ এবং সৈয়দ আহমদ বেরলভীর অনুসৃত পথ থেকে। বাংলার এ দুটি আন্দোলন অচিরেই ভূম্যাধিকারী এবং স্থানীয় প্রাশাসনবিরোধী কৃষক প্রতিরোধ আন্দোলনের রূপ লাভ করে। হাজী শরিয়তুল্লাহ আদর্শগতভাবে শাহ ওয়ালিউল্লাহর অনুসারী ছিলেন না বটে, কিন্তু বাস্তবে সমাজ ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলন তিনি শাহ ওয়ালিউল্লাহর নির্দেশিত পথকেই অনুসরণ করেন। দুদুমিয়া এবং তিতুমীরের প্রতিরোধ আন্দোলনের পাশাপাশি সৈয়দ

আহমদ শহীদের অনুসারীরা ১৮৪০ এর দশকে নতুনভাবে সজ্জিত হয়ে ১৮৫০ এর দশকে তুমুল ইংরেজবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধেও এ আন্দোলনের জোর পরোক্ষ প্রভাব ছিল।

আওরঙ্গজেব মৃত্যুর পর (১৭০৭) মুঘলদের কার্যকর শাসনক্ষমতার অবসান ঘটে। তার দুর্বল ও অযোগ্য উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রতিদ্বন্দিতা, অভিলাষী আমীর-ওমরাহদের মধ্যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির জন্য দলগত কোন্দলের ফলে এক আসহনীয় অরাজক অবস্থা এবং অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।[২] এহেন পরিস্থিতিতে অমুসলিম মারাঠা ও শিখ শক্তি মুঘলদের কাছ থেকে স্থানে স্থানে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রয়াস পায়। মারাঠাদের অতর্কিত আক্রমন ও লুণ্ঠন[৩] প্রতিহত করার মতো সামরিক ও নৈতিক বল মুঘলদের আর ছিল না। ১৭৬১ সালে ৩য় পানিপথের যুদ্ধে আহমাদ শাহ আবদালীর হাতে মারাঠা শক্তির পরাজয় সাময়িকভাবে মারাঠাদের অত্যাচার ও লুণ্ঠনের অবসান ঘটালেও আবদালীর আফগানিস্তানে প্রত্যাবর্তনের পর সৃষ্ট রাজনৈতিক ক্ষমতার শূন্যতার সুযোগ ১৭৮০ সালের মধ্যে মারাঠাগণ গুজরাট ও মালব অধিকার করে নেয়। প্রায় একই সময়ে শিখ নেতা রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে পাঞ্জাবে শিখ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। আপরদিকে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে এবং ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের পর ইংরেজগণ বাংলা ও বিহারে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করে ক্রমে ভারতে তাদের রাজ্য বিস্তার করে।

১৮০৩ সালে ২য় ইংরেজ-মারাঠা যুদ্ধে ইংরেজগন জয়লাভ করে দিল্লি দখল করে নেয় এবং মুঘল সম্রাট শাহ আলমকে ইংরেজ বৃত্তিভোগী শাসকে পরিণত করে।

ভারতে মুসলমান রাজশক্তি ও শাসকগোষ্ঠীর এই রাজনৈতিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি সামাজিক ও ধর্মীয় অবক্ষয় সামগ্রিকভাবে ভারতীয় মুসলমানদেরকে অতি শোচনীয় অবস্থায় নিক্ষেপ করে। দীর্ঘ সময় ধরে ভারতের স্থানে স্থানে মুসলিম সমাজের বিভিন্ন স্তরে নানা বিদআত বা শরীয়তবিরোধী অনৈসলামিক আচার-আচরণ অনুষ্ঠানের অনুপ্রবেশ এবং ভ্রান্ত সুফি মতবাদ এর প্রভাবের ফলে এই অবক্ষয় ঘটে। বাংলার মুসলমান সমাজের বিভিন্ন স্তরে হিন্দু দেবদেবীর পূজা ও স্তুতি ও ওলিদের কবর জিয়ারত-পূজা, কামেল পীর- দরবেশের রওজায় মানত, তাবিজ-কবজ মাদুলি ও কুলজীতে বিশ্বাস, হোলি উৎসব উদযাপন প্রভৃতি যেমন অনুপ্রবেশ করে,[৫] তেমনি পাঞ্জাব ও তৎকালীন যুক্ত প্রদেশের স্থানে স্থানে নারীর উত্তরাধিকারের শরীয়ত-আইন লংঘিত হয় এবং মালাবার উপকূলের মুসলমান মোল্লারা শরীয়ত পরিপন্থী প্রচলিত মাতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকারের রীতি মেনে চলে। অপরদিকে চিরাচরিত স্থানীয় রীতির প্রতি দুর্বলাহেতু বিধবা -বিবাহ মুসলিম সমাজের স্থানে স্থানে গর্হিত নিন্দনীয় এবং আভিজাত্যের পরিপন্থী বলে গণ্য হতে থাকে।

ক. তরিকা ই মুহাম্মদিয়া বা তথাকথিত ওহাবী আন্দোলন

(১)

তথাকথিত ওহাবী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে এ উপমহাদেশে মুসলমানদের জাগরণের সূচনা হয় বলা যেতে পারে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে উনিশ শতকের ইংরেজদের বিরুদ্ধে ওয়াহাবি মুসলমানদের যুদ্ধ প্রচেষ্টা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পলাশীর বিপর্যয়ের পর থেকে ভারতে বিভিন্ন স্থানে ইংরেজ বিরোধী যে প্রতিরোধ দেখা দিয়েছিল সাধারণত তা ছিল কোন রাজা বা জমিদারকে কেন্দ্র করে। ইংরেজদের সাথে টিপু সুলতানের যুদ্ধ, ইংরেজ মারাঠা সংঘর্ষ এবং বহুলাংশে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ রাজা বা জমিদারের স্বার্থে বা নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল। ওহাবী আন্দোলন কিন্তু এর ব্যতিক্রম।[৬] কোন রাজা বা রাজ পুরুষের স্বার্থে বা নেতৃত্বে এ আন্দোলন পরিচালিত হয় নি। বিধর্মী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমান সমাজের প্রতিক্রিয়া থেকে এর জন্ম। এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভারতের বিভিন্ন অংশের উচ্চ নিচ ধনী-দরিদ্র মুসলমান এবং এসব সংগঠন পরিচালনা করেছিল ধর্মশাস্ত্রবিদ মুসলিম আলেম সমাজ। ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য রাজবংশের কয়েকজন এতে যোগ দিলেও আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাসের কোন সময়েই এর শক্তি কোন রাজা নবাবের স্বপক্ষে কেন্দ্রীভূত হয়নি।[৭] কাঙ্খিত সফলতা লাভে ব্যর্থ হলেও এ আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানদের কে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলে। ১৮৫৭ সালের পর মুসলমানদের এক অংশ ক্রমশ ওহাবী অনুপ্রেরণা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও ভারতের অন্যান্য সংগ্রামীদের কে এই সচেতনতা প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করে।

এই অনুপ্রেরণাই পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সশস্ত্র আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় যা ধীরে ধীরে ব্রিটিশবিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে পর্যবসিত হয় বলে মনে হয়। রাজনৈতিকক্ষেত্রে এটা একটি সর্বভারতীয় সংগঠনের গোড়াপত্তন করেন এবং বৃটিশ বিরোধী সংগ্রাম অব্যাহত রাখে।[৮] কারো কারো মতে, ভারতের জনসাধারণের দ্বারা সংগঠিত ও পরিচালিত সর্বপ্রথম আন্দোলন ওহাবীদেরই।[৯] ভারতে পরিচালিত এই আন্দোলনকে ওহাবী আন্দোলন হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় কিনা তা আলোচনা সাপেক্ষ। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচারিত ইসলাম ধর্মে ফিরে যাওয়াই লক্ষ্য বিধায় এ আন্দোলনের নাম তরিকা-ই- মুহাম্মদিয়া আন্দোলন। আঠারো শতকে হিজাজে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাবের সংস্কারমূলক কার্যাবলীকে ইংরেজরা ভারতবর্ষের মুসলমানদের কাছে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে এবং এদেরকে ইসলাম ধ্বংসকারী ওহাবী সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করে যাতে ভারতের মুসলমানদের মনে আরবের

ওহাবীদের সম্পর্কে ঘৃণার ভাব সৃষ্টি হয়। তাই ভারতের তরিকা-ই-মুহাম্মদিয়া আন্দোলনকে এদেশের মুসলমানদের কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য তরিকা-ই-মুহাম্মদিয়া আন্দোলনের নেতা ও অনুসারীদের ইংরেজরা ওহাবী হিসেবে চিহ্নিত করে। ভারতে সংস্কার আন্দোলনের সূচনাকারী শাহ ওয়ালীউল্লাহ যখন কয়েক বছর মক্কায় বিদ্যা শিক্ষার্থে অবস্থান করছিলেন, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাবও সেসময় মক্কায় পড়াশোনা করছিলেন। এদের সাক্ষাৎ যোগাযোগের কোন নজীর পাওয়া যায় না তবে মক্কায় বিদ্যা উৎসাহী সমাজের যে চিন্তা ধারা ওহাবী নেতাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তার সাথে ওয়ালিউল্লার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। তার রচনাবলীতে তার আভাস পাওয়া যায়। [১০] অধ্যাপক হাবিবুল্লাহ বলেন নেহায়েত সুবিধার জন্য এই আন্দোলনকে ওহাবী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। হান্টার ও তার গ্রন্থে মুসলমানদের এই প্রতিরোধ আন্দোলন কে ওহাবী নাম দেন। [১১] আসলে আঠারো শতকে শেষভাগে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব যে নীতিনিষ্ঠ আন্দোলনের সূত্রপাত করেন তার সাথে ভারতীয় মুসলমানদের এই আন্দোলনের অনেক পার্থক্য রয়েছে। [১২] ভারতীয় আন্দোলনকারীরা নিজেদের কখনোই ওহাবী বলে পরিচয় দেননি। সৈয়দ আহমদ শহীদ ও তার অনুগামীরা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব কে তাদের নেতা বলে স্বীকার করেন না এবং তারা নিজেদেরকে সুন্নি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসারী হিসেবে আখ্যায়িত হতে আগ্রহী। [১৩] পীর ফকির ও আস্তানা পূজার বিরুদ্ধাচারণ করা আরবের ওহাবীদের প্রধান নীতি, ১৮০২ সালে এই ওহাবীরা মদিনায় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওদ্বা পর্যন্ত ভাঙতে কুণ্ঠিত হয়নি। ভারতীয় ওহাবী নেতারা অনেকেই পীর এবং কবর- আস্তানার প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো কে ঘোর পৌত্তলিকতা বলে ঘোষণা করেননি। অকৃত্রিম ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় ফিরে যাবার জন্য আরব ও ভারতের ওহাবী আন্দোলন আপোষহীন ও অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যায়। অনেকের ধারণা আধুনিক মুসলমান সমাজের বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনের সূচনা হয় ওহাবী আন্দোলনের মাধ্যমে শুধু তাই নয় ভারতের কৃষক আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ওই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। [১৪]

(২)

১৭০৭ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর এর মৃত্যুর পর এই উপমহাদেশের সাধারণ মুসলমানদের জীবনে এক নিদারুন অমানিশার যুগ আরম্ভ হয়। আওরঙ্গজেব এর মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীরা সিংহাসন নিয়ে নিজেদের মধ্যে কলহে লিপ্ত হন। এই সুযোগে মারাঠারা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং উপমহা[illegible] এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়।

তথ্যসূত্রঃ

১. মাওলানা ওবায়দুল্লাহ ও গোলাম রসূল মেহের এর মতানুযায়ী।

২. ১৭০৯-১৭১৯ সালের মধ্যে দুটি উত্তরাধিকারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৭৫৪ সালে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীর এর হত্যাকান্ড ঘটে এবং পরবর্তী সম্রাট শাহ আলমকে অযোধ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। ১৭৭২ সালে শাহ আলম পুনরায় দিল্লি তে ফিরে সিংহাসন পুনরুদ্ধার করলেও ১৭৮০ এর দশকে তিনি সিন্ধিয়ার বৃত্তিভোগী আশ্রিত সম্রাটে পরিণত হন।

৩. গোলাম হোসেন তাবতাবায়ী, সিয়ারে মুতাখখিরীন (বাংলা অনুবাদ এম আব্দুল খালেক) পৃ ৩১৮-32 Walter Wallbank, A Short History of India and Pakistan, পৃ. ৬০

৪. L.H. Qureshi, A Short History of Palistan, Vol IV pp 105 108 শিখ মিশনসমূহের মুসলমানের প্রতি বৈরিতা এবং তাদের অত্যাচার ও লুটতরাজের কথাও বিভিন্ন পুস্তকে বিধৃত রয়েছে। যেমন Zafrul Islam, "The End of the sikh Rule" History of the Freedom movement vol 2 part 1 (Pakistan Historical Society) page 72 ; সিয়ারে মুতাখখিরিন পৃ ২০, গোলাম রসূল মেহের, হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (বাংলা অনুবাদঃ আব্দুল জলিল ও মতিউর রহমান নূরী) পৃ ২৪৮

৫. মুর্শিদাবাদের মতিঝিল প্রাসাদে শাহমত জং ও শওকত জং এবং মনসুরগঞ্জ প্রাসাদে সিরাজউদ্দৌলা আনন্দ সহকারে 'হোলি' উৎসব পালন করেন মীরজাফরও এতে অংশগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুর মুহূর্তে দেবী কৃত্তিশ্বরীর পদদোক পান করতেও সংকোচ বোধ করেননি। আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ ১৫

৬. আবু মহমেদ হাবিবুল্লাহ, সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস, পৃ ১১৭

৭. হাবিবুল্লাহ, প্রাগুক্ত পৃ ১১৭

৮. Santimoy Roy, Freedom Movement and Indian Muslims, p. 20.

৯. হাবিবুল্লাহ, প্রাগুক্ত পৃ ১১৮

১০. হাবিবুল্লাহ, পৃ ১২১, ১২২

১১. ডব্লিউ. হান্টার, দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস (বাংলা অনুবাদ, আব্দুল মওদুদ) পৃ ৫৩।

১২. হাবিবুল্লাহ, প্রাগুক্ত পৃ ১১৭

১৩. মইনুদ্দীন আহমদ খান, Faraizi Movementin Bangal p. XXXVIL

১৪. হাবিবুল্লাহ, প্রাগুক্ত পৃ ১১৯

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা (২)

১৮০৩ সালে মুঘল পতন ঘটল। ভারতের রাজধানী দিল্লী শহর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অর্থাৎ ব্রিটিশ কর্তৃত্বাধীন এসে গেল, আসলে এটা একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়। বহুদিন আগে থেকেই ভারতের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা তাকে এই অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছিল। যাদের দেখবার মত চোখ ছিল তারা দেখতেও পাচ্ছিলেন যে তার সর্বদেহে ক্ষয়রোগের লক্ষণগুলি ফুটে উঠেছে। এ এক বিরাট মহীরুহ, যার ভিতরকার সমস্ত সার পদার্থ একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাহলে সাধারণের দৃষ্টির সামনে এতদিন সে তার প্রভূত্বব্যঞ্জক মহিমা নিয়ে দাঁরিয়ে ছিল, অবশেষে সেই মহীরুহের পতন ঘটল; চমকিত হয়ে উঠল সবাই। দিল্লীশ্বরেরা জগদীশ্বরেরা শেষকালে এই হলো তার পরিণতি।

মুঘল সাম্রাজ্য সত্য কথা বলতে গেলে একেবারে বিনা বাধায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের খাস তালুকে পরিণত হয়ে গেল। বহুকাল আগে থেকেই ভারতের অপরিমিত ধনসম্পদের সত্য কল্পিত কাহিনী সারা বিশ্বময় প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। তার মধুর গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ইউরোপীয় জলদস্যু ও বণিকের দল একের পর এক উন্মাত্তের মত ছুটে আসছিল এবং তাদের পরস্পরের হানাহানির ফলে সমুদ্রের জল ও স্থলভূমি রক্তরাঙ্গা হয়ে উঠেছিল- অবশেষে তার চুড়ান্ত অবশেষে তার চুড়ান্ত অবসান ঘটল। ভাগ্যের নির্দেশে যারা আগে এসেছিল তারা পিছনে পড়ে গেল। আর ভাগ্যলক্ষী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কণ্ঠে তাঁর জয়মালা পরিয়ে দিলেন।

চমকিত হয়ে উঠল সবাই। যারা ঘুমিয়ে ছিল তার জেগে উঠল, যারা বসে ছিল তারা উঠে দাঁরিয়ে পড়ল, কিন্তু এই পর্যন্তই, এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মত শক্তি তাদের ছিল কি? হয়তো তা ছিল, কিন্তু এই উন্নততর মরণাস্ত্রে সুসজ্জিত শক্তির বিরুদ্ধে কে তাদের সংগঠিত করবে, কে তাদের নেতৃত্ব দেবে? তাদের নেতৃত্বস্থানীয় অভিজাত শ্রেণীর প্রভুরা তখন মধুপানে মত্ত হয়ে বিলাস বাসনে ডুবে আছেন। কে জানে হয়তো তখনও তারা নিশ্চত মনে সুখ-স্বপ্ন দেখছিলেন- দিল্লী অনেক দূর।

প্রতিরোধ কি একেবারেই আসেনি? বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ কি ক্রমেই জমে উঠেছিলো না? কিন্তু বিক্ষোভ যতদিন পর্যন্ত চাপা দেওয়া আগুনের মত ধুমায়িত হয়ে উঠতে থাকে, ততদিন ইতিহাসের দৃষ্টিতে তাধরা পড়ে না। প্রথম প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ এল মুসলমান উলেমা সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে।

মূলত ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই বিদেশী ও বিধর্মীদের শাসন অসহনীয় বলে তাদের কাছে মনে হয়েছিল। কিন্তু যে কোন ধর্মই হোক, ধর্মীয় জীবন বৈষয়িক জীবন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। ইসলাম ধর্মের

ক্ষেত্রে এ কথা আরো বেশী প্রযোজ্য। প্রথম প্রতিবাদ তুললেন বিখ্যাত ধর্মীয় নেতা শাহ ওয়ালিউল্লাহ। মুসলমানদের হাত থেকে বাদশাহী শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, কাজেই আঘাতটা মুসলমানদের বেশী করে বাজবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। তাই তাদের এই বিরোধিতা হয়তো এই ধর্মীয় নেতার অভিমতের মধ্য দিয়েই রূপ নিয়েছিল।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ স্পষ্টই রায় দিলেন যে, ইসলাম তাঁর ধর্মীয় বিধান ও রাজনৈতিক ক্ষমতা, এই দুটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, কাজেই এই পরাধীন পরিবেশে ইসলাম কখনোই সজীবতা ও স্ফূর্তি লাভ করতে পারে না। তার এই সূত্রটির যুক্তিযুক্ত রূপায়ণ ও অনুসরণের মধ্য দিয়ে তার শিষ্য প্রশিষ্যবর্গ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এই দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম করে এসেছিলেন। সেই দীর্ঘায়িত সংগ্রামের অতি সামান্য অংশই আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আর তা খণ্ডে খণ্ডে ও বিক্ষিপ্তভাবে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ধরে পরিচালিত হয়ে এসেছিল। তাঁদের চরিত্র ও ভূমিকা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট নয়। এই জেহাদকে স্বাধীনতা সংগ্রাম আখ্যা দেওয়া চলে কিনা এ বিষয়ে রাজনৈতিক পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ-এর পুত্র ও তার পরবর্তী ধর্মগুরু আবদুল আজিজ তাঁর পিতার এই সূত্রটিকে কার্যকরী রূপে সম্প্রসারিত করলেন। তিনি বললেন, ভারতীয় মুসলমানরা এই পরাধীন অবস্থাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। এই পরিবেশের মধ্যে কোন প্রকৃত মুসলমানের পক্ষে যথাযথভাবে ধর্মাচরণ করে চলা সম্ভব নয়। তাঁর দৃষ্টিতে ভারত হচ্ছে 'দার-উল-হরব' অর্থাৎ 'যুদ্ধরত দেশ'। তিনি বললেন এদেশের মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে এক ফতোয়া জারী করলেন। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জেহাদে শরীক হওয়া তাদের সকলের কর্তব্য। আর ব্রিটিশ শক্তিকে যদি তারা তুলনায় অনেক বেশি বলে মনে করে অথবা এই সংগ্রামে যদি জয়লাভের আশা না থাকে, তবে তারা যেন অন্যান্য স্বাধীন মুসলমান দেশে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকলে চলবে না। বাইরের সেই সমস্ত শক্তির সাহায্য নিয়ে নতুন বলে বলীয়ান হয়ে এ দেশ থেকে ইংরেজদের বিতারিত করতে হবে। বাইরের মুসলমান রাষ্ট্রগুলি যে এ বিষয়ে তাদের অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করবে এ সম্পর্কে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

শাহ আবদুল আজিজের এই ফতোয়া ভারতের মুসলমানদের এক অংশের মনে সংগ্রামী প্রেরণা জাগিয়ে তুলেছিল এবং তাঁর এই আহ্বানে তারা বিপুলভাবে সাড়া দিয়েছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও মুসলমান রাষ্ট্রগুলির বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ধর্মগুরু আবদুল আজিজের কেনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। আর যারা তাঁর এই ফতোয়াকে মান্য করে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জেহাদে নেমেছিলেন এবং এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে যে সাহস, সংগঠনশক্তি ও আত্ম-ত্যাগের পরিচয় দিয়েছিলেন

... মাথায় বহন করি। এই ইতিহাসকে অবহেলা করে অন্ধকারের তলায় চাপা দেওয়া এক জাতীয় অপরাধ।

দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী-ব্যাপী এই ব্রিটিশ বিরোধী জেহাদের সৃষ্টি, পরিচালক ও মূল প্রাণশক্তি যিনি, সেই সৈয়দ আহমদের নাম আজকাল ক'জনেই বা জানে? অথচ এই আন্দোলন ওহাবী আন্দোলন নামে দেশের শিক্ষিত সমাজে বিশেষ করে রাজনৈতিক মহলে সুপরিচিত। কিন্তু এ কথাটা সত্য নয়। ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের দ্বারা এই বিচিত্র নামকরণের ফলে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে তা আজও আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি নি। আবদুল ওয়াহাবের প্রচারিত ধর্মমতের সঙ্গে সৈয়দ আহমদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কোনো সংযোগ ছিল না। তবুও আমরা এতকাল ধরে সেই আন্দোলন অথবা 'ওহাবী আন্দোলন' বলে আখ্যা দিয়ে আসছি।

সৈয়দ আহমদ উত্তর প্রদেশের বায়বেরেলিতে জন্মগ্রহণ করেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও তাঁর অনুবর্তী ইসলামের পুনরুজ্জীবন ও স্বাধীনতার আদর্শ থেকে তিনি তাঁর আন্দোলনের প্রেরণা পেয়েছিলেন। ১৮০৮ সালে তিনি তার শিক্ষা সমাপ্ত করে ঘরে ফিরে আসেন এবং বিবাহ করেন। তিনি যে আদর্শ নিয়ে পথে বেরিয়ে এসেছিলেন, তাকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে তিনি "টঙ্ক" রাজ্যের আমীরের কাছে এসে তাঁর সৈন্য বিভাগে যোগদান করেন।"টঙ্ক" তখনও স্বাধীন রাজ্য ছিলো। তার ভবিষ্যৎ সংগ্রামী জীবনের পক্ষে এটা খুবই কাজে লেগেছিলো। এখানেই তিনি যুদ্ধবিদ্যা লাভ করেন। রণনীতি ও রণকৌশল সম্পর্কেও তিনি পারদর্শী হয়ে উঠেন। কিন্তু ১৮১৭ সালে "টঙ্ক" রাজ্যের আমির যখন ব্রিটিশের অধীনতা স্বীকার করে নিলেন, তখন তিনি তার সম্পর্কে বিতৃষ্ণা হয়ে কাজ থেকে ইস্তফা দিয়ে চলে এলেন।

"টঙ্ক" রাজ্য থেকে ফিরে এসে তিনি উত্তর প্রদেশের উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে ভ্রমন করলেন এবং মীরাট, মজঃফরনগর ও সাহরানপুর জেলার উল্লেখযোগ্য শহর ও গ্রামগুলিতে পরিভ্রমণ করলেন। দ্বিতীয়বারের ভ্রমণে তিনি এলাহাবাদ, বারানসী, কানপুর ও লক্ষ্ণৌ জেলাগুলি এবং তৃতীয়বারের ভ্রমণে রোহিলাখণ্ড অঞ্চলটি পরিদর্শন করেন।

তিনি যেখানেই গেছেন সেখানকার জনসাধারণ তাকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানিয়েছেন। তাঁর উপদেশ শোনার জন্যে বহুলোক এসে জমায়েত হতো। ... ব্যাপারে তাঁর মূল উপদেশ ছিলো দুটি- প্রথমতঃ খোদার কোনো শরিক নেই, একেশ্বর, একচ্ছত্র এবং ফেরেস্তা, ধর্মগুরু, পয়গম্বর বা পীর যেই হোক না খোদা আর মানুষের কেউ মধ্যবর্তী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না। ... সরাসরি খোদার সংঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ সত্যিকারের ... বৃহৎ ব্যাপারেই হোক বা সামান্য ব্যাপারেই হোক কোরান কর্তৃক ...

থেকে বিচ্যুত হয়ে নতুন কোনো ও বিধান গ্রহণ করতে পারে না। সৈয়দ আহমদের সরল অনাড়ম্বর জীবন, তাঁর জ্বলন্ত আদর্শ নিষ্ঠা, গভীর আন্তরিকতা ও নিঃস্বার্থ চরিত্রের জন্য যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন তারাই মুগ্ধ অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে তিনি যেখানেই হাত দিয়েছেন সেখানেই সফল ফলেছে। তাঁর বহু ভক্ত তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে চলাকে তাদের জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু করবার আগে তিনি মক্কায় তীর্থযাত্রা করার সংকল্প করলেন। এক বছর বাদে ১৮২২ সালে তিনি যখন মদিনায় গিয়ে পৌঁছালেন, তখন দেখা গেল তাঁর পিছন পিছন ৮০০ জন ভক্ত চলে এসেছে। তিনি যখন রায়বেরেলী থেকে যাত্র করেন তখন তাঁর সঙ্গে একটি কর্ণপদকও ছিলো না। অথচ এই দীর্ঘ যাত্রাপথে তাদের ৭০ হাজার থেকে ৮০ হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়েছে। আর্থিক সম্পদ বলতে তার নিজের কিছুই ছিলোনা। এই সমস্ত টাকা তার অনুরাগী ও ভক্তরাই যুগিয়েছিলো। এর দুবছর বাদে তিনি স্বদেশে ফিরে এলেন। এই দুবছর আরবে বাস করে কি শিখে এলেন তিনি? এখানে এসে তার সারা বিশ্বের মুসলমানদের দুর্গতি ও লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটল। আরও দেখতে পেলেন যে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি কি দ্রুত গতিতে প্রাচ্যের দেশগুলিকে একের পর এক গ্রাস করে চলেছে। এই কঠিন অভিজ্ঞতা ভাবাবেগ সম্পন্ন স্বপ্নালু সৈয়দ আহমদকে বাস্তববোধসম্পন্ন নির্ভীক যোদ্ধায় পরিণত করল। স্বদেশে পদার্পণের সাথে সাথেই তিনি তার ব্রিটিশ বিরোধী সংগঠিত করে তোলার কাজে লেগে গেলেন। এই আন্দোলনকে সহজে দমন করে দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই বিদ্রোহের আগুন প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে অনির্বাণভাবে জ্বলেছিল।

এই জেহাদের প্রস্তুতি হিসেবে তিনটি প্রাথমিক কাজে হাত দেওয়া হয়ে ছিলো: ১. শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে চালিয়ে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক যোদ্ধা ও উপযুক্তপরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা। ২. এই বাহিনীকে পরিচালিত করার জন্য একজন যোগ্য নেতা মনোনিত করা। ৩. এই যোদ্ধাদের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করার জন্যে মুসলমান শাসিত কোনো অঞ্চল নির্বাচিত করা।

প্রথম দুটি কাজ সম্পন্ন করতে বেশি সময় লাগলো না। জেহাদের জন্য ভারত থেকে কয়েক শত যোদ্ধা সংগ্রহ করা হলো এবং সৈয়দ আহমদ তাদের ইমাম হিসেবে মনোনীত হলেন। কিন্তু তৃতীয় কাজটির ব্যাপারে সমস্যা দেখা দিল। তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতের সীমার মধ্যে কোনো মুসলমান শাসিত স্বাধীন অঞ্চল ছিলো না। কাজেই বাধ্য হয়ে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তাঁদের ঘাঁটি।

তথ্যসূত্র: ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানের ভূমিকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ

জেহাদ আন্দোলনে বাংলার ভূমিকা

মাওলানা এ.এস.এম. আতহার উদ্দীন মোল্লা

রায়বেরেলীর সৈয়দ আহমদ শহীদ (রাহঃ) কর্তৃক পরিচালিত 'জেহাদ আন্দোলন' উপমহাদেশের মুসলিম জনগণের সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপকভিত্তিক এক গণঅভ্যুত্থানরূপে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এ আন্দোলন ছিল প্রধানতঃ পারিপার্শ্বিক নানা অপপ্রভাবে কলুষিত মুসলিম জনগণের ঈমান-আকীদাকে শেরেক, বেদাত, বিজাতীয় অনুকরণ প্রভৃতি নানা জঞ্জাল থেকে মুক্ত করে পূর্ণ ঈমানী জৌলুস ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে পরিচালিত।

মোগল সালতানাতের পতন যুগ শুরু হওয়ার সাথে সাথে জাঠ, মারাঠা, শিখ প্রভৃতি মুসলিম বিদ্বেষী শক্তিগুলোর ব্যাপক অভ্যুত্থান শুরু হয়। পূর্বদিকে বাঙলার শাসনক্ষমতা ইংরেজ বণিকেরা দখল করে নেয়। শিখ সামন্ত রাজা রঞ্জিত সিং ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সমগ্র পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দখল করে লাহোর কেন্দ্রিক একটা শক্তিশালী শিখ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে বসে। নবউত্থিত এই শিখ শক্তির আগ্রাসী থাবায় পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের মুসলিম জনগণ পর্যায়ক্রমে পর্যুদস্ত হতে থাকে।

অপরদিকে সমগ্র উপমহাদেশব্যাপী মুসলমানদের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনে নেমে আসে মারাত্মক অধঃপতন। ঈমান-আকীদার স্থান দখল করে বসে নানা কুসংস্কার ও বিজাতীয় ধ্যান-ধারণা। মুসলিম জনগণ পরিণত হয় নামসর্বস্ব মুসলমানে। সমাজের উচ্চবিত্তদের ধ্যান-ধ্যারণায়, পীরপূজা, গোরপূজাসহ অগণিত শেরেক বেদাত স্থায়ীভাবে শিকড় গেড়ে বসে। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নেমে আসা ক্রমবর্ধমান অধোগতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হয়ে এ স্তরের লোকেরা ভোগ-বিলাসের আত্মঘাতী পথে গা ভাসিয়ে দেয়।

অপরদিকে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মুসলিম জনগণ হিন্দু সমাজের নানা আচার-আচরণে ব্যাপকভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। অনেক এলাকার মুসলিম জনগণ নামের সাথে হিন্দু পদবী গ্রহণ করাকে গৌরবজনক কৌলিন্যের লক্ষণ বলে বিবেচনা করতে শুরু করে। পাঞ্জাব এবং সীমান্ত প্রদেশের বহু লুণ্ঠিত পরে মুসলিম নারীদিগকে শিখেরা বাদীরূপে ব্যবহার এবং প্রকাশ্য হাট-বাজারে এ বিক্রয়।

থাকে। মসজিদে আযান এবং জুমা-জামাত বন্ধ হয়ে যায়। ইমামুল-হিন্দ শাহ ওলীউল্লাহর সুযোগ্য সন্তান এবং স্বার্থক উত্তরাধিকারী শাহ আবদুল আজীজ তখন জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত হয়েছেন। হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানীর যে সংগ্রামী উত্তরাধিকার তাঁর ধমনীতে প্রবাহমান ছিল, সে উত্তরাধিকারের দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে তিনি একটা ব্যাপক সংস্কার আন্দোলন শুরু করার আকাংখা ব্যক্ত করেন। সাংগঠনিক শক্তি সঞ্চয়ের মাধ্যমে তিনি আগ্রাসী শিখ ও মারাঠাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করারও পরিকল্পনা গ্রহণ করেন কিন্তু বার্ধক্যের কারণে মাঠে ময়দানে এ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তিনি তাঁর প্রিয় শাগরেদ রায়বেরেলীর মাওলানা সৈয়দ আহমদ এর উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেন। ঐতিহ্যবাহী এক বুযুর্গ পরিবারের সন্তান সুঠামদেহী যুবক সৈয়দ আহমদের অসীম মনোবল এবং আধ্যাত্মিক শক্তি লক্ষ্য করে এ গুরুদায়িত্ব বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্র শাহ ইসমাঈল, জামাতা মাওলানা আবদুল হাই লাখনৌভী এবং অন্য এক প্রিয় শাগরেদ মাওলানা ইমামুদ্দীন বাঙালীকে যুক্ত করে দেন।

বলাবাহুল্য, সৈয়দ আহমদ শহীদের এ মহৎ আন্দোলন পরিচালনা এবং প্রাণপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণে বাংলার বীর সন্তান মাওলানা ইমামুদ্দীনের দুঃসাহসী ভূমিকা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

সৈয়দ সাহেব প্রথমে মুসলিম জনগণের ধর্মীয় সংস্কারের লক্ষ্যে ব্যাপক তবলিগী সফর শুরু করেন। এক পর্যায়ে তিনি অনুধাবন করেন যে, বৈরীশক্তির মোকাবিলা করার মত বাস্তব পদক্ষেপ ব্যতীত শুধু ওয়ায নসীহতের দ্বারা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছা সম্ভব হবে না। তখন তিনি শিখদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জেহাদ শুরু করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হন। জেহাদ শুরু করার আগে নিবেদিতপ্রাণ একদল মোজাহেদ তৈরী করা এবং জনগণের মধ্যে এ ব্যাপারে ব্যাপক সাড়া জাগানোর প্রয়োজনী অনুভব করেন। পর্যাপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন মোজাহেদ তৈরী করার পর বাস্তবায়নের একটা অংশ হিসাবেই সদলবলে তিনি হাজ্বের সফরে রওনা হওয়ার সংকল্প ঘোষণা করেন। তখনকার দিনে এ সফর ছিল কষ্টসাধ্য, তেমনি সময়সাপেক্ষ। সৈয়দ সাহেব অন্ততঃ তিন বছরে এইসফর সমাপ্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।" আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, সৈয়দ আহমদ শহীদ তাঁর আন্দোলন শুরু করার সূচনাতে স্বীয় উস্তাদ শাহ আবদুল আজীজের যে কয়জন শাগরেদকে তাঁর উপদেষ্টা এবং সার্বক্ষণিক সঙ্গীরূপে পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন মাওলানা ইমামুদ্দীন বাঙালী। এ ছাড়া জেহাদ আন্দোলনের আর একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা ও সংগঠন ছিলেন সূফী নূর মুহাম্মদ নেজামপুরী রাহঃ নামক আর একজন বিশিষ্ট সাধক আলেম। এরা উভয়েই ছিলেন সৈয়দ সাহেবের বিশিষ্ট খলীফা এবং জেহাদ আন্দোলনের প্রথম

কাতারের নেতা ও সংগঠক। এ দুই মহান সাধক বীর পুরুষের মাধ্যমেই জেহাদ আন্দোলনের সাথে বাংলার জনগণের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে মাওলানা ইমামুদ্দীন ছিলেন নোয়াখালী বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার হাজীপুরের অধিবাসী এবং সূফী নূর মুহাম্মদ ছিলেন চট্টগ্রামের লোক। এ ছাড়া হজ্বের সফরে রওনা হয়ে কলিকাতায় দীর্ঘ তিনমাস অবস্থান করেও সৈয়দ সাহেব বাংলার বহু লোককে প্রত্যক্ষভাবে এ আন্দোলনের সাথে যুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

সৈয়দ সাহেব হিজরী ১২৩৬ সনের ১লা শাওয়াল (১৮২০ খৃঃ) ঈদের নামায বাদ রায়বেরেলী থেকে চারশো সঙ্গীসহ নৌকাযোগে কলকাতার পথে রওনা হন। উদ্দেশ্য, কলকাতা থেকে জাহাজ ভাড়া করে জিদ্দায় যাওয়ার ব্যবস্থা করা। পথে পথে বিভিন্ন স্থানে মনযিল এবং তবলীগী সমাবেশ করার পর দীর্ঘ চারমাসের মাথায় রাজমহলের পথে এই কাফেলা বাংলার যমিনে এসে প্রবেশ করে। বাংলার সীমান্তে কাফেলার অভ্যর্থনার বর্ণনা দিতে গিয়ে ওয়াকায়ে-এ আহমদীর লেখক বলেন রাজমহল থেকে মুন্সী মুহাম্মদী আনসারী নামক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হযরত সৈয়দ সাহেবকে দশ-বারো কোশ দূরবর্তী তাঁর গ্রামে নিয়ে যান। সেখানে মুন্সী মুহাম্মদী আনুসারীর পিতা মুন্সী রউফউদ্দীন, মুন্সী মখদুম বখশ, মুন্সী হাসান আলী, মুন্সী ফযলুর রহমান এবং মুন্সী আযীবুর রহমান প্রমুখ সৈয়দ সাহেবের হাতে বায়আত হন। এদের মধ্য থেকে মুন্সী রউফউদ্দীন ও মুন্সী ফযলুর রহমান কাফেলার সংগে শরীক হন।

রাজমহল থেকে রওনা হয়ে ৫ই সফর কাফেলা মুর্শিদাবাদ পৌঁছে। মুর্শিদাবাদের বিশিষ্ট লোকদের অধিকাংশই ছিলেন তখন শিয়া মতের অনুসারী। তাযিয়া এবং বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কারপূর্ণ অনুষ্ঠান ছিল তাদের প্রধান ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম সৈয়দ সাহেব মাওলানা আবদুল হাইকে ওয়ায করার নির্দেশ দিলেন। ওয়াযের প্রভাবে শত শত লোক সৈয়দ সাহেবের হাতে বায়আত হয়ে সকল কুসংস্কার মুক্ত হন। মুর্শিদাবাদ থেকে রওনা হয়ে কাফেলা একরাত কাটোয়ায় অবস্থান করে। সেখানে থেকে হুগলী বন্দরে এসে সাতদিন অবস্থান করে কয়েক হাজার লোককে মুরীদ করা কাফেলা হুগলী বন্দরে থাকতেই কলকাতার বিশিষ্ট আইনজীবি মুন্সী আমিনুদ্দীন নৌকাযোগে এসে হযরত সৈয়দ সাহেবের সংগে সাক্ষাত করেন এবং কাফেলার সব লোককে তাঁর মেহমান হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

মুন্সী আমিনুদ্দীন ছিলেন কলকাতার একজন প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য ব্যক্তি। মুন্সী সাহেবের আন্তরিক ভক্তি এবং আগ্রহ লক্ষ্য করে সৈয়দ সাহেব তাঁর মেহমানদারী কবুল করতে সম্মত হন। মুন্সী আমিনুদ্দীন হযরত সৈয়দ সাহেবের কাফেলার মেহমানদারীর জন্য শহরের উপকণ্ঠে (সম্ভবতঃ বর্তমান নারকোলডাঙ্গা এলাকায় একটা সুপ্রশস্ত বাগানবাড়ী ক্রয় করে রেখেছিলেন। কাফেলার নারী-পুরুষ সকলের

জন্যেই এই বাড়ীতে ভালভাবে স্থান সংকুলান হয়ে গেল। পথে পথে যারা কাফেলায় এসে শরীক হয়েছিলেন, তাঁদের নিয়ে তখন লোকসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল পাঁচশতের মতো। সৈয়দ সাহেবের কাফেলা দীর্ঘ তিনমাস কলকাতায় অবস্থান করেছিল। এই সময়কালের মধ্যে প্রতিদিন বাদ ফজর কাফেলার অবস্থান স্থলে ওয়ায-মাহফিল অনুষ্ঠিত হতো। ভক্তদের অনুরোধে সৈয়দ সাহেব বিভিন্ন লোকের বাড়ীতে আয়োজিত মজলিসে শরীক হতেন। বাংলার মোজাহেদীনদের জামাত এখান থেকেই সংগঠিত হতে শুরু করে।

ওয়াকায়ে-এ আহমদীর বর্ণনা অনুযায়ী প্রতিদিন শত শত লোক এসে মুন্সী আমিনুদ্দীনের বাগানবাড়ীতে সমবেত হতো। সৈয়দ সাহেবের ওয়ায নসীহত শুনত এবং বায়আত গ্রহণ করে শেরেক-বেদাত থেকে তওবা করতো।

বাংলার প্রত্যন্ত এলাকার সৈয়দ সাহেবের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য মাওলানা ইমামুদ্দীন তাঁর জন্মভূমি নোয়াখালী এবং সূফী নূর মুহাম্মদ চট্টগ্রাম ও সিলেট এলাকায় রওনা হয়ে যান। মাওলানা ইমামুদ্দীনের সংগে নোয়াখালী, কুমিল্লা এবং মোমেনশাহী এলাকার অর্ধশত বিশিষ্ট ব্যক্তি এসে উপনীত হন। সূফী নূর মুহাম্মদ নিয়ে আসেন সিলেট ও চট্টগ্রামের কিছু বিশিষ্ট লোক। সূফী সাহেবের এই কাফেলার সংগেই এসেছিলেন বাংলার অন্যতম মোজাহেদ সংগঠক মাওলানা আবদুল হাকীম চাটগামী, মোমেনশাহীর মুন্সী ইবরাহীম ও সৈয়দ হামযা আরাকানী প্রমুখ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।

কলকাতার সফরে মৌলভী বরকতুল্লাহ এবং মৌলভী এনায়েতুল্লাহ ওরফে কাজী মিয়াজান নামক আরও দু'ব্যক্তি হযরত সৈয়দ সাহেবের খেলাফত লাভ করেছিলেন বলে জানা যায়।

দীর্ঘ দু'বছর হজ্বের সফরে কাটানোর পর সৈয়দ সাহেব বোম্বে হয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। ফেরার পথেও সৈয়দ সাহেব কলকাতায় কিছুকাল অবস্থান করে বাংলার জামাতকে সুসংঘবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেন। মাওলানা ইমামুদ্দীন পূর্ব বাংলার নোয়াখালী, কুমিল্লা, ঢাকা ও মোমেনশাহী এলাকায় প্রেরিত হন। মৌলভী বরকতুল্লাহ উত্তরবঙ্গে এবং সূফী নূর মুহাম্মদ কলকাতার আশেপাশে প্রচার ও সংগঠনের কাজ শুরু করেন। আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল মুসলিম জনসাধারণের আকীদা ও আমলের সংস্কার।

প্রথম পর্যায়ে জনসাধারণের মধ্যে ইসলামী জীবনধারা: সম্পর্কে তীব্র অনুভূতি সৃষ্টি করা। দ্বিতীয় পর্যায়ে সর্ব প্রকার বৈরীশক্তির মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার মত মনোবল সৃষ্টি করা। তৃতীয় পর্যায়ে জানমাল দিয়ে কেন্দ্রীয় মোজাহেদ আন্দোলনকে সহযোগিতা দান করার অঙ্গীকার গ্রহণ করা।

মাওলানা ইমামুদ্দীন, সূফী নূর মুহাম্মদ মৌঃ বরকতুল্লাহ এবং মাওলানা আবদুল হাকীমের নেতৃত্বে বাংলার মাটিতে আন্দোলনের চারটি পর্যায়েই ব্যাপক

সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। ইংরেজ আমলা হান্টারের ভাষায় বাংলায় এমন কোন জনপদ ছিল না, যেখানকার মুসলমানদের মধ্যে সৈয়দ সাহেবের সংস্কারের বাণী ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। প্রতিটি ধার্মিক পরিবারের যুবকরা সীমান্তে গিয়ে জেহাদ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতো। বৃটিশ সরকারের গোয়েন্দাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে হঠাৎ করে একদিন তারা সীমান্তের মোজাহেদ কাফেলায় যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে যেত। জমির খাজনা পরিশোধ করতে অসমর্থ কৃষকরাও জেহাদের জন্য নিয়মিত অর্থ প্রদান করতে কুণ্ঠিত হতো না।

দু'বছর এগারো মাসে হজ্বের সফর সমাপ্ত করে সৈয়দ সাহেব রায়বেরেলী পৌছেন। ততদিনে বার্মা সীমান্ত থেকে শুরু করে দিল্লী পর্যন্ত তাঁর দাওয়াত পৌছে গিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টার ফলে শেরেক ও বেদাতের সকল জঞ্জাল থেকে মুক্ত হয়ে খালেস তওহীদের মন্ত্রে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল।

সৈয়দ সাহেবের সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল উপমহাদেশের প্রতিটি জনপদের মুসলিম জনগণের জন্য মুক্ত-স্বাধীন পরিবেশে আল্লাহর বন্দেগী করার মত মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। হজ্ব থেকে ফিরে যখন তিনি শুনতে পেলেন যে, আগ্রাসী শিখ সামন্ত শাসকেরা পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের সর্বত্র মসজিদে আযান এবং জামাত বন্ধ করে দিয়েছে, স্বাধীন ভাবে ধর্মকর্ম করার সকল সুযোগ রুদ্ধ করা হয়েছে, অনেক এলাকায় মুসলিম নারী-শিশুদের জবরদস্তি করে ধরে এনে গোলাম বাদীতে পরিণত করা হচ্ছে, তখন আর কালবিলম্ব না করে তিনি শিখ শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার দৃঢ়সংকল্প ঘোষণা করলেন। মাওলানা ইসমাঈল শহীদ, মাওলানা আবদুল হাই, মাওলানা ইমামুদ্দীন বাঙালী ও সূফী নূর মুহাম্মদ প্রমুখ প্রধান সারির খলীফাগণকে জেহাদের কাফেলায় লোকজন সমবেত করার উদ্দেশে প্রেরণ করা হলো। উর্দূ সাহিত্যের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কবি 'মোমেন দেহলভী' ছিলেন সৈয়দ সাহেবের একজন বিশিষ্ট মুরীদ ও খলীফা। তিনি জেহাদের গীত রচনা করলেন। মুরীদগণের মুখে মুখে তা সমগ্র উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়লো।

সৈয়দ সাহেবের হজ্ব থেকে ফেরার পথে এনায়েতুল্লাহ নামক ভাগিরথী তীরের এক নওজোয়ান তাঁর কাফেলায় শরীক হয়ে খেলাফত লাভ করেছিলেন। তিনি বাংলার গ্রামে-গঞ্জে মোমেন দেহলভীর জেহাদী কাসীদা পাঠ করে লোকজনকে উদ্দীপিত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন বলে উল্লেখ সৈয়দ সাহেব তাঁর আসন্ন জেহাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করে একটা ইশতেহার রচনা করলেন। ইশতেহারের বক্তব্য ছিল নিম্নরূপঃ

"শিখ জাতি বেশ কিছুকাল যাবত লাহোর এবং আশপাশের এক বিস্তীর্ণ এলাকার উপর জবরদখল কায়েম করে বসে আছে। এদের অত্যাচার-নির্যাতন সভ্যতার সকল সীমা অতিক্রম করেছে। এরা হাজার হাজার নিরপরাধ মুসলমানকে

হত্যা করেছে। অগণিত মুসলমানকে লাঞ্ছিত করেছে। মসজিদে আযান দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গরু জবেহ করা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছে। অত্যাচার-নির্যাতন সীমাতিক্রম করার পর সংশ্লিষ্ট মুসলিম জনগণকে জাগ্রত ও সুসংগঠিত করে আগ্রাসী শিখ শক্তির মোকাবিলায় দাঁড়ানোর জন্যে জেহাদ ঘোষণা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে কয়েক হাজার মোজাহেদ জেহাদে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে সীমান্ত প্রদেশের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছেন। ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্রই সশস্ত্র জেহাদ শুরু হচ্ছে। প্রত্যেক মুসলমানকে স্ব স্ব সাধ্যানুযায়ী এই মহৎ কাজে অংশ গ্রহণ করার জন্য দাওয়াত দেয়া হচ্ছে।" মোজাহেদীনের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাজানো মোকদ্দমার নথিপত্র অনুযায়ী সশস্ত্র জেহাদ ঘোষণা করার সে দিনটি ছিল ১৮২৬ খৃস্টাব্দের ২১ শে ডিসেম্বর। সেদিন থেকেই সীমান্ত এলাকায় সশস্ত্র মোজাহেদগণ সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

মাওলানা জাফর থানেশ্বরী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন "মাওলানা সৈয়দ আহমদ যখন শত শত মাইল দূরে গিয়ে শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার সংকল্প ঘোষণা করেন, তখন অনেকেই তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, দেশের অভ্যন্তরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু না করে সুদূর সীমান্ত এলাকায় গিয়ে শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অর্থ কি?

সৈয়দ সাহেব জবাবে বলেছিলেন, "প্রথমতঃ ইংরেজরা এখনো মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর সরাসরি হস্তক্ষেপ করেনি। শিখেরা ধর্মকর্মে হস্তক্ষেপ করছে। দ্বিতীয়তঃ এদেশে ইংরেজ আধিপত্য মজবুত করার পিছনে শিখদের সক্রিয় সহযোগিতা সর্বজনবিদিত। তৃতীয়তঃ সীমান্তে মুসলিম আধিপত্য কায়েম হলে পরবর্তী পর্যায়ে সমগ্র উপমহাদেশ সর্বপ্রকার শত্রুর কবলমুক্ত করা সহজ হবে।" উপরোক্ত সুনির্দিষ্ট কতকগুলো লক্ষ্য সামনে নিয়ে হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ হিজরী ১২৪১ (১৮২৫ খৃঃ) সনের প্রথমদিকে জন্মস্থান রায়বেরেলী থেকে যাত্রা শুরু করলেন। তাঁর সঙ্গী-সাথীর সংখ্যা ছিল পাঁচ থেকে ছয় হাজার। এর মধ্যে কাফেলার 'রোজনামচা' লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী বাংলার মোজাহেদগণের সংখ্যা ছিল এক হাজারের কাছাকাছি। তন্মধ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত নেতৃ-স্থানীয় লোক ছিলেন চল্লিশ জনের মত।

পাঞ্জাব ও সীমান্ত এলাকার মুসলমানদের হৃত ধর্মীয় অধিকার পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে অগ্রসরমান এই দ্বীনি কাফেলা যাতে যাত্রাপথে বাধাপ্রাপ্ত না হয়, সে জন্য পাঞ্জাবের পথ পরিহার করে তাঁরা সিন্ধুর পথে অগ্রসর হতে থাকেন। পথে পথে হায়দারাবাদ সিন্ধু, বাহওয়ালপুর হয়ে বোলান উপত্যকা অতিক্রম করে প্রথমে কান্দাহার ও পরে কাবুলে গিয়ে উপনীত হন। পথিমধ্যে হায়দারাবাদ ও বাহওয়ালপুর এলাকার মুসলমানদের মধ্যে জেহাদের দাওয়াত চলতে থাকে। ইসমাঈল শহীদ, আবদুল হাই, মাওলানা ইমামুদ্দীন বাঙালী, সুফী নূর মুহাম্মদ

প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় আলেম বুযুর্গগণ স্থানে স্থানে ওয়ায-নসীহত করে জনগণকে জেহাদের মন্ত্রে উদ্দীপিত করতে থাকেন। হিন্দুস্তান থেকে কাবুল পর্যন্ত নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা এবং নতুন লোক ও অর্থ পৌছানোর সুব্যবস্থাও সম্পন্ন করা হয়।

কাবুলে কিছুকাল অবস্থান করে বারবার গিরিপথ হয়ে কালো এসে পেশোয়ার পৌছে। পেশোয়ারে তখন রঞ্জিত সিং এর তরফ থেকে একজন সুবেদার নিয়োজিত ছিলেন। তিনি রাজস্ব আদায় করে লাহোরে প্রেরণ করতেন। শিখ সেনাদের ছাউনী ছিল আটক দরিয়ার পূর্ব পারে পাঁজার সীমান্তে অবস্থিত একটি দুর্গ। দুর্গ থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত নিয়মিত সশস্ত্র প্রহরায় ডাক চলাচল করতো। কোনো কসবা বা শহরের লোকেরা অবাধ্যতা শুরু করলেই দুর্গ থেকে সৈন্য প্রেরণ করা হতো। চালানো হতো অবাধ লুণ্ঠন এবং অগ্নিসংযোগ। নির্বিচারে হত্যা করা হতো সে এলাকার লোকজনকে।

হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ সীমান্ত প্রদেশের কেন্দ্রস্থল পেশোয়ারের সাথে শিখদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্য নিয়ে কাফেলাসহ পেশোয়ার উপত্যকা পিছনে রেখে নওশেরায় গিয়ে উপনীত হলেন। এখানে দরিয়া আবাসীনের তীরে অবস্থান গ্রহণ করে নিজস্ব একজন দূতের মারফত রঞ্জিত সিং এর লাহোর দরবারে একটা বিস্তারিত পত্র প্রেরণ করলেন। পত্রে তাঁর এই অভিযানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে মুসলিম জনগণের সংগে এ পর্যন্ত যেসব জুলুম করা হয়েছে তা বন্ধ করার নিশ্চয়তা বিধান এবং জবর-দখলকৃত মুসলিম এলাকাগুলো যুক্ত করে দেয়ার দাবী জানানো হলো।

উদ্ধত লাহোর-দরবার একজন সংসারত্যাগী ফকীরের এ পত্রের কোনো জবাব না দিয়ে বরং মোজাহেদীনের এ কাফেলাকে শায়েস্তা করার হুকুম দিয়ে সরদার বুধসিং এর নেতৃত্বে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দিল। মোজাহেদগণের সংগে বুধসিং এর মোকাবেলা হয় নওশেরা থেকে সাত-আট মাইল দূরে আকোড়া-খটক নামক স্থানে। প্রথম এই মোকাবেলায় সরদার বুধসিং এর বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়।

আকোড়াখটকের যুদ্ধে বুধসিং এর পরাজয়ের ফলে পেশোয়ারের সাথে শিখদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পেশোয়ারের সুবেদার ইয়ার মুহাম্মদ খান এবং তার ভাই পীর মুহাম্মদ খান এ খবর শোনার পর পত্র মারফত মোজাহেদগণের সংগে যোগাযোগ করতে শুরু করেন।

সরদার বুধসিংকে তাড়িয়ে দেয়ার পর থেকেই মোজাহেদগণ শিখদের তরফ থেকে একটা বড় ধরনের আক্রমণের আশংকা পোষণ করে আসছিলেন। তাঁরা নওশেরার পূর্বদিকে সিদোতে সম্ভাব্য সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুতি শুরু করলেন। ইতিমধ্যে হাযরো নামকস্থানে শিখদের একটা সমাবেশের খবর

আসলো। 'মনযুরা' নামক রোজনামচার বর্ণনা অনুযায়ী বাংলার মোজাহেদগণ দ্বারা গঠিত একটা নৈশ অভিযানকারী দল অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে সে সমাবেশটা সম্পূর্ণরূপে পর্যদুস্ত করে দেয়। এ অভিযানে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র এবং রসদপত্র মোজাহেদগণের হস্তগত হয়।

পরপর দুইটি সংঘর্ষে জয়লাভ করার পর মোজাহেদগণের মনোবল বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে এলাকার জনগণের আস্থাও অনেকটা বর্ধিত হলো। এলাকার বিশিষ্ট আলেম এবং গোত্র সরদারগণের এক সমাবেশে ১৮২৭ সনের ১১ই জানুয়ারী হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদকে "আমিরুল মো'মেনীন"-রূপে ঘোষণা করে তাঁর হাতে জেহাদ এবং ইমামতের বায়আত গ্রহণ করা হলো। পেশোয়ারের আমীর সরদার ইয়ার মুহাম্মদ খান দূত মারফত পত্র প্রেরণ করে 'আমীরুল মোমেনীন' এর প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করলেন। হযরত সৈয়দ সাহেব ইয়ার মুহাম্মদ খানকেই শাসন কর্তৃত্বে বহাল রেখে বিশিষ্ট আলেমগণের একটি পরামর্শ মজলিস কায়েম করে সমগ্র সীমান্ত প্রদেশে ইসলামী আইন-কানুন জারী করার সুব্যবস্থা করেন। 'মনযুরার' লেখকের বর্ণনা আনুযায়ী পেশোরার-কেন্দ্রিক ইসলামী হুকুমতের পরামর্শ সভায় যাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মাওলানা ইমামুদ্দীন বাঙালী। পাঠান গোত্রপতিদের একটা অংশ প্রথম থেকেই হযরত সৈয়দ আহমদের কর্মতৎপরতার সাথে ঐক্যমত পোষণ করতে পারছিল না। শিখদের সাথে এদের নানা ধরনের বৈষয়িক স্বার্থ জড়িত ছিল। তাছাড়া দীর্ঘকালের নানা কুসংস্কারের ভাগাড়ে নিমজ্জিত মন-মানসিকতায় সৈয়দ সহেবের কঠোর সংস্কার আন্দোলন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে শুরু করেছিল। পাঠানেরা সাধারণতঃ পীরভক্ত জাতি। এদের এই স্বাভাবিক প্রবণতার সুযোগ নিয়ে প্রতি এলাকায় গড়ে উঠেছিল অসংখ্য পীরের গদী। এসব পীরের অধিকাংশই ছিল শরীয়তের অনুশাসনের সাথে সম্পর্কহীন এবং নানা কুসংস্কার নিমজ্জিত সৈয়দ সাহেবের সংস্কারক আন্দোলন তাদের গদিভিত্তিক স্বার্থ বিপন্ন করার উপক্রম করেছিল। তাই তারা তাঁর বিরুদ্ধে নানা ধরনের অপপ্রচার শুরু করলো। লাহোর দরবারের ইংরেজ উপদেষ্টারা এ বিরোধিতার আগুনে নানাভাবে ঘৃতাহুতি দেয়ার সুযোগ হাতছাড়া করলো না। পাঞ্জাব ও সীমান্তের এক শ্রেণীর পেশাদার আলেমকে দিয়ে মোজাহেদ আন্দোলনের বিরুদ্ধে নানা ধরনের ফতোয়াবাজী শুরু করানো হলো। শিখদের কিছু অনুচরকে কৌশলে মোজাহেদগণের কাফেলার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করানো হলো। ফলে সিদুর যুদ্ধ যেদিন শুরু হয়, তার আগের রাত্রে হযরত সৈয়দ সাহেবের খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দেয়া হলো। সকাল বেলায় মাওলানা মুঃ ইসমাঈল সৈয়দ সাহেবের শয়নকক্ষে গিয়ে দেখতে পেলেন, তিনি অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছেন। তাঁর মুখ থেকে ফেনা বের হচ্ছে। তড়িৎ চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে

কিছুটা উপশম দেখা দিল। ইতিমধ্যে সিদুর ময়দানে বিরাট শিখ বাহিনীর হামলা শুরু হয়ে গিয়েছিল। আধুনিক অস্ত্র বা লোকবল মোজাহেদগণের ছিল না। স্বয়ং সৈয়দ সাহেব ছিলেন বিষক্রিয়ায় মৃতপ্রায়। এ অবস্থার মধ্যেই মোজাহেদগণ যুদ্ধ শুরু করলেন। সৈয়দ সাহেব একটু সুস্থ বোধ করলে কয়েকজন লোকের কাঁধে ভয় করে তিনি ঘোড়ার উপর সওয়ার হলেন এবং ময়দানে চলে গেলেন। তুমুল যুদ্ধেরপর মোজাহেদগণের আংশিক পরাজয় হলো এবং ময়দান ছেড়ে তাঁরা কিছুটা পিছু হটতে বাধ্য হলেন। কিন্তু শিখ সৈন্যরাও সামনে অগ্রসর হতে পারলো না। সিদুর যুদ্ধের ফলাফল প্রতিকূলে যাওয়ার পর থেকে মোজাহেদগণের সামনে একের পর এক নানা সংকট ঘনীভূত হয়ে আসলো। শিখ এবং ইংরেজদের নিয়োজিত অনুচরদের নানা অপপ্রচারের তাণ্ডবের মুখে আন্দোলনের গতি মূল হিন্দুস্তানে অনেকটা শ্লথ হয়ে পড়লো। কাফেলার খাদ্য এবং অন্যান্য রসদ মূলতঃ হিন্দুস্তানের সরবরাহ থেকেই আসতো। শিখেরা এ সরবরাহ-ব্যবস্থা বিঘ্নিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো। ইতিমধ্যে এমন কয়েকটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল, যার ফলশ্রুতিতে মূল আন্দোলন মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হলো। মৌলবী মাহবুব আলী নামক একজন মোজাহেদ নেতার নেতৃত্বে বিহার এবং বাংলার একদল মোজাহেদ পেশওয়ারের পথে রওনা হয়ে সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশ করার পর দুররানী পাঠানদের দ্বারা আক্রান্ত এবং লুণ্ঠিত ও সর্বস্বান্ত হয়ে মূল কাফেলা পর্যন্ত এসে উপনীত হন। পাঠানদের দুর্ব্যবহারে মৌলবী সাহেব এতই মর্মাহত হয়েছিলেন যে, কাফেলার লোকজনকে তিনি দেশে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য তুমুল প্রচারণা শুরু করেন। ফলে কিছুলোক মনঃক্ষুন্ন হয়ে তাঁর সাথে দেশে ফিরে আসে। এতে মোজাহেদ বাহিনীর অপূরণীয় ক্ষতি হয়। ইতিমধ্যে প্রচণ্ড শীতে ও খাদ্যভাবে মোজাহেদগণ চরম দুর্দশার সম্মুখীন হন। অনেক সময় দিনের পর দিন তাঁরা গাছের পাতা সিদ্ধ করে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করতেন। এ সংকটময় অবস্থার মধ্যেই হযরত সৈয়দ সাহেবের অন্যতম প্রিয় সাথী এবং সর্বপেক্ষা প্রাজ্ঞ উপদেষ্টা বলে পরিচিত মওলানা আব্দুল হাই লাখনৌভী ইন্তেকাল করেন। (২৪শে ফেব্রুয়ারী-১৮২৮ খৃঃ)

ওয়াকায়ে-এ আহমদীর লেখকের মতে মৌলভী মাহবুব আলীর ক্ষুব্ধ প্রচারণায় যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল, বাংলার মোজাহেদ সংগঠকগণের প্রাণপণ চেষ্টায় তা অনেকটা দূরীভুত হয়। ফলে আন্দোলনের এই চরম দুর্দিনে সর্বপ্রথম নতুন লঙ্কর এবং অর্থ সাহায্য এসে পৌছে বাংলাদেশ থেকে। ঢাকার মোজাহেদগণের দ্বারা প্রেরিত এই সাহায্য পৌঁছার পর থেকে একটানা উপবাসের অবসান হয়। দুর্যোগকবলিত মোজাহেদীনের কাফেলা নতুন করে উদ্দীপনা লাভ করে।

জন্মভূমি এবং পরিবার-পরিজন থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে অপরিচিত অনভ্যস্ত দুর্গম পার্বত্য এলাকায় প্রতিকূল পরিবেশে সীমাহীন আপদ-বিপদের

মধ্যেও মোজাহেদগণ শিখদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে যেতে লাগলেন। মাওলানা ইসমাঈল শহীদের নেতৃত্বে পরিচালিত এসব অভিযানের প্রতিটিতে বিপুল সাফল্য অর্জিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত রাজা রঞ্জিত সিং সৈয়দ সাহেবকে আবাসীন দরিয়ার বাম দিককার সমগ্র এলাকা ছেড়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গে আপোষ মীমাংসা করার প্রস্তাবসহ হাকীম আজীজুদ্দীন ও সরদার ওজীর সিং নামক দু'ব্যক্তিকে দূতরূপে প্রেরণ করে। সৈয়দ সাহেব মৌলভী খায়রুদ্দীন শিরকুটী ও হাজী বাহাদুর খানের মাধ্যমে সন্ধির শর্তাদি লিখে পাঠান। তাঁর দাবী ছিল, সীমান্তের যেসব এলাকায় ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়ে গেছে, সেসব এলাকায় শিখেরা আর আক্রমণ করবে না। শিখ শাসিত অবশিষ্ট এলাকায় মুসলমানদিগকে পূর্ণ ধর্মীয় আজাদী দিতে হবে। দখলীকৃত মসজিদগুলো ছেড়ে দিতে হবে।

রঞ্জিত সিং এসব শর্ত মেনে নিয়েই মোজাহেদগণের সঙ্গে একটা সম্মানজনক সন্ধি করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু লাহোর দরবারের ইংরেজ উপদেষ্টা জেনারেল ভিন্টোরা সন্ধির প্রস্তাবে একমত না হয়ে নানা কুটকৌশলের পথে অগ্রসর হওয়ার পরামর্শ দিল। এরা এমন একটা ষড়যন্ত্রের নীলনকশা তৈরী করলো, যদ্বারা পাঠান সরদার এবং মোজাহেদ বাহিনীর মধ্যে হানাহানি সৃষ্টি করে দেয়া যায়। ফলে দেখা গেল কিছুদিনের মধ্যেই শিখদের পরিবর্তে মোজাহেদগণ পাঠান সর্দারদের আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। পেশোয়ারের আমীর, সরদার বাহাদুর খান জেনারেল ভিক্টোরার উস্কানীতে মোজাহেদগণের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করলো। কিন্তু প্রথম হামলাতেই বাহদুর খান নিহত এবং তাঁর সৈন্যবাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে গেল। তার কনিষ্ঠ সহোদর সরদার সুলতান মুহাম্মদ খান আরবাব ফয়জুল্লাহ এক ভক্তের মাধ্যমে সৈয়দ সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং পেশেয়ারের আমীর পদে তাঁকেই বহাল করা হয়। মাওলানা সৈয়দ মাঝহার আলী আজিমাবাদীকে প্রধান কাজ নিযুক্ত করে শাসন ও বিচার বিভাগের। সর্বক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত জারী করা হয়। কিন্তু ব্যাপক ষড়যন্ত্রের মুখে এ ব্যবস্থা বেশিদিন টিকে থাকতে পারলো না। ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত পাঠান সর্দারদের মধ্যে শরীয়তের স্বচ্ছ জীবন ব্যবস্থা নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। তারা তাদের বল্গাহীন জীবন যাপনের পথে মোজাহেদ আন্দোলনকে সর্বাপেক্ষা বড় অন্তরায় মনে করতে শুরু করলো। এ সুযোগে লাহোর দরবারের উপদেষ্টা জেনারেল ডিন্টোরা পাঠান সর্দারদের মধ্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ কটন করে সৈয়দ সাহেবের তরফ থেকে নিয়োজিত ওশর আদায়কারী মোজাহেদ নেতৃবৃন্দকে একই রাতে হত্যা করার ব্যবস্থা করে। বার্মা সীমান্ত থেকে শুরু করে সমগ্র হিন্দুস্তান থেকে আগত আল্লাহর পথে নিবেদিতপ্রাণ মোজাহেদ নেতৃবৃন্দ, যারা বাড়ীঘর পরিবার-পরিজন ত্যাগ করে সীমান্তের জনগণকে শিখ নির্যাতনের যাতাকল থেকে উদ্ধার করার জন্য ছুটে

এসেছিলেন, তাঁদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে একই রাতে এশার নামায রত অবস্থায় অভ্যস্ত নির্মমভাবে হত্যা করা হলো।

এই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের খবরে সৈয়দ সাহেব এমন মর্মাহত হয়েছিলেন যে, পাঠানদের মধ্যে কাজ করার সকল উৎসাহ তিনি হারিয়ে ফেললেন। মোজাহেদগণকে ডেকে স্ব স্ব জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুমতি দিলেন। কিছুলোক তাঁর অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে দেশে ফিরে এলো, কিন্তু অন্যান্য অনেকের সংগেই বাংলার মোজাহেদগণ সৈয়দ সাহেবের সংগত্যাগ করতে প্রস্তুত হলেন না। ওকায়ে-এ আহমদীর লেখকের মতে এই সংকটজনক অবস্থায় মাওলানা ইমামুদ্দীন বাঙালীর সার্বক্ষণিক উপস্থিতি এবং মৌলভী এনায়েতুল্লাহ ওরফে মিয়াজান কাজীর উদ্দীপনা মোজাহেদগণের মধ্যে নতুন মনোবলের সৃষ্টি করেছিল এবং মোজাহেদীনের কাফেলাকে বালাকোটের ময়দান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, বালাকোটের আত্মদানের ফলেই সমগ্র উপমহাদেশে ঈমানের নতুন প্লাবন সৃষ্টি হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত ব্রহ্মদেশ থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত ঈমানের যে জাগরণ দেখা যায় তা বালাকোটেরই বরকতে সম্ভব হয়েছিল। বালাকোটের ময়দানে আমীরুল মু'মেনীন হযরত সৈয়দ আহমদ (রহঃ), হযরত মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) সহ মোট চল্লিশজন বিশিষ্ট আলেম শহীদ হয়েছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে বাংলার শহীদানের সংখ্যা ছিল আটজন।

তথ্যসূত্র: গাজী মাওলানা ইমামুদ্দীন বাঙ্গালী (রহ.)

পাক-ভারতে ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

ইংরেজদের ভারত বিজয়ের পরক্ষণে মুসলমানদের মধ্যে এক প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যে জাতি কয়েক শতাব্দী যাবৎ ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে, তাঁদের পক্ষে এ এক কঠোর আঘাতের সামিল হয়ে দাঁড়ায়। মুসলমানদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া হল মধ্যে অসহযোগিতা বা অন্য যেকোনো প্রকারে বিদেশী শাসন উৎপাটন করার এক প্রবল ইচ্ছার মাধ্যমে আত্ম-প্রকাশ করা। অল্প সংখ্যক লোক, বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজ বিদেশীদের সাথে সমঝোতায় আসবার পক্ষে ছিলেন যে, এরূপ বন্ধুত্ব শেষ পর্যন্ত মুসলমান রেনেসাঁর পক্ষে ফলপ্রসু হবে। কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের জীবনে এ প্রতিক্রিয়া এক ক্ষীণ স্রোতের মতো কাজ করছিল। নবাব আবদুল লতীফ এই সমঝোতা সৃষ্টির অগ্রে ছিলেন এবং ১৮৬৩ খ্রীঃ অনেক চেষ্টার পর কলিকাতায় মুসলিম সুধী সমাজ স্থাপন করতে সক্ষম হন। কিন্তু এ-সময় এবং তার পরক্ষণে মুসলমান এক জাতি হিসেবে ইসলামের প্রধান নীতিগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য ফ্রাঙ্কদের (যেহেতু তাদের এরূপ বলা হত) বিরুদ্ধে এক মিলিত প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করছিলেন। বাস্তবিকই ইহা একটি ইসলামিক আন্দোলন ছিল এবং সৈয়দ আহমদ বেরলভী এবং ইসমাইল শহীদ এর অগ্রে ছিলেন।

যদিও ওহাবী আন্দোলনের সাথে এর কিছুটা মিল ছিল, তথাপিও প্রকৃত পক্ষে তা' বলা যায় না এবং হান্টার সাহেব নিজেই খামখেয়ালীর বশবর্তী হয়ে এর মধ্যে নজদের আবদুল ওহাব কর্তৃক গঠিত আন্দোলনের পরমাণু দেখতে পান। এসব আন্দোলনের মধ্যে যে সাদৃশ্য ছিল, হান্টার সাহেব শুধুমাত্র তাই দেখেন। গরমিলের অঙ্গটা তিনি লক্ষ্য করেন নি। যদিও এ আন্দোলন সফলতা অর্জন করিতে পারেনি, তথাপিও মুসলমানদের জীবনে এর প্রতিফলন বয়ে যায়। এ রদবদলের সময়ের মধ্যে এদেশের উৎখাত জমিদারগণ জনসাধারণের মধ্যে বৃটিশ প্রতিকূল ভাব সৃষ্টি করেন এবং দেশীয় সিপাহীদের যারা আগে থেকেই তাদের উচ্চশ্রেণীর বৃটিশ কর্মচারীদের পক্ষপাতিত্বে অসন্তুষ্ট ছিল, তাদের নিজেদের পক্ষে আনতে সক্ষম হন। এর ফলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। যদিও হিন্দু মুসলমান

মিলিতভাবে এ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন, তথাপিও শেষ পর্যন্ত কেবলমাত্র মুসলমানদেরকেই এ জন্য দায়ী করা হয়। অতএব, এ উপমহাদেশ থেকে মুসলমানদের স্থায়িত্ব একেবারে মুছে ফেলাই বিদেশী বিজেতাদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠে। এ কাজের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বাজেয়াপ্ত আইন পাশ করা হয়। যার ফলে পাঠান ও তুর্কীদের শাসনকালে মুসলমানদের দেয়া আয়মা ও জায়গীর বাজেয়াপ্ত হয়। পরক্ষণেই এ জমিতে তৎকালীন বিজেতাদের চাকুরীতে নিয়োজিত অনুগ্রহ ভাজন হিন্দুদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। বাস্তবিকপক্ষে মুসলমানদের জীবন খুবই সংকটাপন্ন হয়ে উঠে এবং তারা জীবন রক্ষাকল্পে অন্য কোথাও বিশেষ করে মিসরে হিজরৎ করার বিষয় বিবেচনা করছিলেন। এ সঙ্কটময় মুহূর্তে স্যার সৈয়দ আহমদ আশার আলো নিয়ে কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত হন। এ মহাদেশে মুসমানদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তবে তিনি যে সফলতা লাভ করেন নি- এ নিঃসন্দেহই বলা যেতে পারে।

তিনি যে আন্দোলন শুরু করেন ইতিহাসে তা' আলিগড় আন্দোলন' নামে অভিহিত এবং এর উদ্দেশ্য ছিল, এ দুরবস্থায় মুসলমানদেরকে সমঝোতার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়া। এ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য লক্ষ্য করলে একে প্রকৃত ইসলামিক আন্দোলন বলা যায় না! তৎকালীন উৎখাত মুসলমানদের মূলনীতিগুলো প্রতিষ্ঠা করা কোনোমতেই এই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না। এ উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য এ আন্দোলন পাশ্চাত্য কৃষ্টি ও দর্শনের মাধ্যমে ইসলামের মূলনীতিগুলো পুনঃপরীক্ষা করতে চেয়েছিল। এ অবস্থা প্রমাণ করবার জন্য এখানে উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। সর্বপ্রথম স্যার খ্রীস্টান ও ইসলাম ধর্মের সামঞ্জস্যগুলো দেখাতে চেষ্টা করেন। দ্বিতীয় চেষ্টা ছিল কোরানের তাৎপর্য বের করা। তিনি কোরানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং রসূলের (দঃ) হাদীসকে পেছনে ফেলে রাখেন। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের বিজ্ঞানগত শিক্ষা প্রচার করা এবং তিনি বিজ্ঞানকে ইসলামের উপর স্থান দেন। এ অতিরিক্ত মনোভাবাপন্নতার ফলে তিনি কোরানের ঐ নীতিগুলো প্রত্যাখ্যান করেন, যেগুলো তৎকালীন বিজ্ঞান মতবাদের বিরুদ্ধে ছিল। এতে প্রকৃত ধর্মীয় নীতিগুলোর খুবই বরখেলাপ হয়।

কিন্তু আলিগড়ে একটা কলেজ স্থাপন করা বাস্তবিক পক্ষে তাঁর আশ্চর্য সফলতা। তাঁর এবং ইসলামিক ঐতিহ্যধারী অনেক লোক তাঁর সাথে যোগ দেন। এদের মধ্যে সৈয়দ মেহদী আলী এবং শেখ মেহদী আলতাফ হোসেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সৈয়দ মেহদী আলী পরে নবাব মহসিন-উল-মূলক সরলতার সহিত সৈয়দ আহমদ কর্তৃক প্ররোচিত হন এবং এ উপমহাদেশের মুসলমানদের আধুনিক যুগের সহিত খাপ খাইয়ে নেয়াই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এ আশাতেই তিনি 'তাহজিব' নামক পত্রিকায় রীতিমত লিখতে আরম্ভ করেন। কিন্তু

কতকগুলো পুরাকালীন ধারণা এবং ইসলামের মূলনীতির সহিত পার্থক্য থাকা বিধায় তিনি মাঝে মাঝে সীমাতিক্রম্য মত পোষণ করতে থাকেন। তিনি যে ফ্রাঙ্কদের সহিত একটি বোঝাবুঝিতে আসতে চেয়েছিলেন তা এতেই প্রমাণিত হয় যে, তিনি ইসলামিক মতবাদের পক্ষে থেকে তুর্কী সুলতানদের অস্বীকার করেন নি। তিনি তাদের অস্বীকার করেছিলেন, যেহেতু তারা বৃটিশ স্বার্থের অন্তরায় ছিলেন। স্যার সৈয়দ এবং তাঁর পথগামীদের দ্বারা এ-নীতি বিস্তারের সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল তাঁর ধর্মীয়দের দুনিয়াভাবান্ন করা। ধর্মকে দুনিয়ার সকল কাজ-কর্ম থেকে সরিয়ে রাখা হয় এবং একে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে মনে হয়। বর্তমানে অধ্যাপক খুদা বখস এবং আল্লামা ইউছুফ আলীকে এ গোত্রের প্রতিনিধি হিসাবে ধরা যেতে পারে।

খুদা বখস এমনকি এও বলেন যে, "প্রকৃত পক্ষে বুঝিতে গেলে কোরান আধ্যাত্মিক জীবনেরই পরিচালক। রাজনৈতিক জীবন-পদ্ধতির সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।" এবং আল্লামা ইউছুফ আলী তাঁর সহধর্মীদের কোরানের আদর্শের পরিবর্তে সুইস-নীতি অথবা নেপোলিয়নের নীতি অনুসরণ করতে উপদেশ দেন। এদের মধ্যে হায়দরাবাদে স্যার আহমদ হোসেন (সাধারণতঃ নবাব আজিজ নামে অভিহিত) দুনিয়াবী ব্যাপারে সকল হেরোভদেরও (ইহুদী) উপরে যায়। তিনি মন্তব্য করেন, "প্রকৃত ইসলাম খ্রীস্টধর্মের কাট-ছাট সংস্করণ।" কিন্তু একটা অন্ধকার মেঘখণ্ডের মতো এ আন্দোলনের মধ্যে এক রূপালি শিখার আলো লুকায়েছিল। এরূপ মতবাদের বিরুদ্ধে আলিগড়ের ধর্মভাবাপন্ন শেখ আলতাফ হোসেন হালি এগিয়ে যান। যাকে ভুললে এ উপমহাদেশের মুসলমানগণ মারাত্মক অন্যায় করবেন।

হালির মুছাদ্দাস একটি পরিস্কার দৃষ্টি সৃষ্টি করে এবং মুসলমানদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে। তিনি মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ দেখিয়ে দেন এবং বাঁচবার জন্যে তাদের কোরানের নীতি আঁকড়িয়ে ধরতে উপদেশ দেন। তথাকথিত পাশ্চাত্য সুধীসমাজের বিরুদ্ধে তাঁর নীতি শুধুমাত্র আত্মরক্ষামূলক ছিল না। ইহা ছিল ইসলামের বাণীর দিকে একটি সরাসরি আহবান ও সরল বিশ্বাস। তিনি তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে সর্বপ্রথম এ সরল সত্যের দিকে মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, ইসলাম পাশ্চাত্য মতবাদের ধর্ম নহে। এ জগতেও জীবনকে সুখী করার জন্য সকল দিক থেকে এর নীতি অবলম্বন করা উচিত। অতএব, তিনি সোজাসুজি স্যার সৈয়দ ও তাঁর মতবাদীদের সমঝোতার নীতি পরিহার করেন এবং ইসলামী আদর্শের উপর ভিত্তি করে একটি ইসলামিক সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। হালির সমসাময়িকদের মধ্যে দু'জন যথা-আকাউল্লা এবং নাজির আহমদ তাঁকে অনুসরণ করেন। এদের মধ্যে আকাউল্লা তৎকালীন বৈজ্ঞানিক আবিস্কারসমূহ উর্দূতে প্রকাশ করেন এবং বিজ্ঞানের প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

কিন্তু শেষোক্ত জনের (নাজির আহমদ) দান অনেক বেশী। বলতে গেলে তিনি স্যার সৈয়দের শিক্ষার একটি বিতর্কমূলক নীতি প্রচার করেন। তিনি শাহ ওয়ালী উল্লার ন্যায় ইসলামের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন এবং তিনি এদেশের যুবকদের অবিশ্বাসী মতবাদ পরিহার করে এ জগতে একটি সৎ জীবনযাপন করবার জন্যে ইসলামের আদর্শ আঁকড়িয়ে ধরতে আহবান করেন। হালি ও নাজির আহমদ এবং শিবলী নোমানীর চিন্তাধারা ও শিক্ষার মধ্যে আরও অগ্রগতি পাওয়া যায়। তিনি স্যার সৈয়দের চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেন এবং মুসলিম জীবনে ইসলামকে অভিষিক্ত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পূর্ব থেকেই আব্বাসীদের শাসনের প্রতি আসক্ত থাকায় তিনি আব্বাসী শাসনের উপর ভিত্তি করে একটি ইসলামিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিলেন। এ শাসনের প্রতি আপত্তি থাকা ছাড়াও ধর্মীয় ব্যাপারে ন্যায়-নীতিকে সর্বোচ্চ স্থানে ধরে রাখার ক্ষেত্রে তাঁর দান কোনোমতেই কম নহে। অনুন্নত যুগের উলেমাদের যেভাবে তিনি ধর্মীয় ব্যাপারে ন্যায়নীতিকে সর্বপ্রধান উপকরণ বলে মনে করেন, তাই বলে তিনি ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উপকরণের মূল্য ও গুরুত্ব অস্বীকার করেন নি।

তাঁর বর্ণনায় ন্যায়নীতি ধর্মের একটি পদ্ধতি, যা এর সৎকাজে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু অসৎকাজে নয়। ন্যায়নীতির প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি ইলমূল-কালাম নামে একখানা কেতাব লিখেন এবং এর মাধ্যমে ন্যায়নীতি ব্যবহারের একটি জড়িত ইতিহাসের অবতারণা করেন। তিনি নিজে দর্শনশাস্ত্রে খুব পারদর্শী ছিলেন এবং এ ইতিহাসের প্রথম সংখ্যায় দেখান যে, পুরাকালের সকল ভাল উলেমাই দর্শন শাস্ত্রে উচ্চ-শিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু আলিগড়ের প্রচলিত নীতিবাদ তাঁর মতের পক্ষে অনুকূল ছিল না। অতএব, এখানেই তিনি ক্ষান্ত হন এবং ১৯০৮ সালে লক্ষ্ণৌতে নবপ্রতিষ্ঠিত নাদওয়াতুল উলেমার অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। এমনকি সেখানেও তিনি গোঁড়া সম্প্রদায়ের জন্যে সুখে ছিলেন না। এবং শেষ পর্যন্ত "দারুল মুসান্নিফীন" নামক লেখকদের একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করবার জন্যে আজিমগড়ে স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হন।

সৈয়দ আমীর আলী প্রকৃতপক্ষে শিবলী নোমানীর জ্ঞানী শিষ্য ছিলেন। শিবলীর আগে থেকে তৈরী করা পথ অনুসরণ করে আমীর আলী স্যার সৈয়দ আহমদের বিপরীতার্থক নীতি প্রত্যাহার করেন এবং প্রচার করেন যে, মুসলমানদের ইতিহাস গৌরবময় এবং এমনকি বর্তমানেও অতীতকাল মুসলমানদের প্রেরণা দিতে পারে। মুসলমানদের ইতিহাস এবং 'ইসলামের তেজ' এ উদ্দেশ্য ছিল অতীতকালে সম্পন্ন পূর্ণপুরুষদের কাজ দ্বারা মুসলমানদের প্রেরণা দেয়। স্যার সৈয়দ আহমদের নীতির সহিত গরমিলের দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করে বলতে হয় যে, এক পক্ষে সৈয়দের মতে স্ত্রী-জাতির অধঃপতনের জন্য ইসলাম দায়ী নহে; অন্য পক্ষে সৈয়দ আমীর আলীর মতে ইসলামই সর্বপ্রথম ধর্ম যা স্ত্রী-

জাতিকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয় এবং ইসলামই তাদের জন্য একটি স্থান অনুমোদন করে; ইসলাম যে স্ত্রী-জাতিকে শুধুমাত্র দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয় তা নহে, ইহা পরোক্ষভাবে দাসত্ব প্রথা বন্ধ করে। যদিও ইসলামের উন্নতি লাভ করবার যথেষ্ট পথ রয়েছে, তথাপিও ইজতিহাদের অপব্যবহার একে ধ্বংসের দিকে টেনে নেয়। এ দেখে তিনি খুবই মর্মাহত হন। যা হোক, দুর্ভাগ্য-বসতঃ তিনিও তার পূর্ববর্তী শিবলী নোমানীর মতো আব্বাসীদের শাসনকে ইসলামী-শাসনের সর্বোচ্চ এবং আগত বংশধরদের অনুকরণীয় বলে মনে করেন। তথাপিও আমীর আলীর ইসলাম সম্বন্ধে এ জগতে সম্পন্ন করার উপযুক্ত সম্মতিসূচক মূল্যের মিলগত অভিমত একটি গৌরবময় মহৎ অবদান।

ইকবালের মধ্যে আমরা এ পর্যন্ত অজ্ঞাত চিন্তাধারার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এবং মনোভাবের মানবাচক পরিবর্তন দেখতে পাই। ইসলামের সত্যিকার প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর কাজ ছিল জগতের মুসলমানদের জ্ঞান-ভাণ্ডারে জমায়েত কতগুলো আদর্শকে পরিষ্কার করে করে দেয়া। এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তিনি 'নিয়ন্ত্রিত ভাগ্য-মতবাদে'- ভিত্তিকে আক্রমণ করেন। তাঁর মতে মুসলমানদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন নীতিই প্রধানতঃ তাদের মধ্যে এই অপছন্দনীয় মতবাদের মূল কারণ। অতএব, তাঁর কর্তব্য ছিল পরিবর্তনশীল জীবনের প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং কাজের জন্যে তাদের আহবান করা- যাতে তারা বাঁচতে পারে, বাড়তে পারে ও উন্নতি করতে পারে। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের আদর্শ হিসেবে আব্বাসী সাম্রাজ্যের রূপকে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর মতে কেবলমাত্র রসূল (দঃ) কর্তৃক স্থাপিত এবং খোলাফায়ে রাশেদীন অথবা ন্যায়তঃ পরিচালিত খলিফাদের রাজ্যেই ইসলামী রাষ্ট্রের সত্যিকার আদর্শ পাওয়া যেতে পারে। তাঁর আদর্শগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ধর্ম ও রাষ্ট্রের মিলান্তক অভিমত, যার প্রতি অবজ্ঞা করার জন্যেই আধুনিক জীবনে এতসব উদ্ভব হয়েছে। তিনি নিজকে সন্দেহহীন বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেন।

ইসলামে আধ্যাত্মিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপার দু'টি পৃথক ক্ষেত্র নহে এবং একটি কাজ মূলতঃ যতটুকু রাষ্ট্রীয়ই হউক না কেন, ইহা মনোগত ধারণা দ্বারাই নির্ণয় হয়- যার সহিত মিল রেখে উৎস কাজটি করে। মনোগত অভিরুচিই শেষ পর্যন্ত একটি কাজের রূপ দেয়। একটি কাজ ইহকালীন বা অপবিত্র, জীবন বৈচিত্রতার থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে সম্পন্ন করা হয়। ইহা আধ্যাত্মিক, যদি ইহা ঐ বিচিত্রতার দ্বারা উৎসাহিত হয়। ইসলাম ইহা একই বাস্তবতা যা একদিক থেকে দেখলে মনে হয়- ধর্ম এবং অন্যদিক থেকে মনে হয়- রাষ্ট্র। ধর্ম এবং রাষ্ট্রকে একই জিনিসের দু'দিক বা দু'টি সত্য মনে করা ঠিক নয়। ইসলামই একমাত্র অভিশ্লেষণীয় বাস্তবতঃ যা' দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সাথে হয় এটা, নতুবা ওটা বলে মনে হয়। প্রকৃত পক্ষে ইসলাম ব্যক্তিগত জীবনকে আদর্শ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শের মধ্যে কোনো বিভেদের স্থান দেয় না।

ইসলামী মতে ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শ হল সমস্ত বিচিত্রতার মিলগত অগ্রগতি এবং তাদের মধ্যে একটি সাদৃশ্য- যাতে কোনো বিভেদের সৃষ্টি না হয়। এ উদ্দেশ্য সফল করার পথ হল আল্লাহর বিচিত্র গুণাবলীর অধিকারী হওয়া। রসূল (দঃ) আগেই তাঁর শিষ্যদের গুণাবলির অধিকারী হতে উপদেশ দেন। ইসলামী সমাজের আদর্শ হলঃ- মানব জাতির মধ্যে একতা সৃষ্টি করা যাতে প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পূর্ণতার জন্য অনুভব করে। ইসলামে ইসলামী রাষ্ট্রের আদর্শ হল সমাজতন্ত্রবাদের কাঠামোর মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অর্জন করা। আল্লাহকে কেবলমাত্র জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করা ছাড়াও যদি তাঁকে জগতের সার্বভৌমিক শক্তি বলে মনে করা যায়, তবে এসব আয়ত্ত করা যায়। কাজেই ইসলামী-দর্শন মতে- যা অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অন্যসব দর্শনের সমষ্টি সমস্ত অধিকারই আল্লাহর। এর কারণ অতি পরিস্কার, কারণ ব্যক্তিগত জীবনে উন্নতির জন্য আল্লাহর গুণাবলির একান্তই প্রয়োজন। সমাজ-জীবনেও একতা ও ভ্রাতৃত্বের মনোভাব সৃষ্টির জন্যে আল্লাহর আদর্শ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও কেমলমাত্র স্বাধিকার আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিলেই সমাজের সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ কাজ চলতে পারে, যেখানে ব্যক্তি বিশেষ অথবা সামাজিক স্বার্থের মধ্যে বিভেদের আশংকা খুবই কম থাকবে। অতএব ইকবাল ইসলামের এই প্রথম আদর্শকে ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনের অগগতির জন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব গ্রহণ করলে কেবলমাত্র যে মুসলমানদের উন্নতি হবে তা নয়, এতে সকল দিক থেকে মানবজাতিরও অগগতি হবে।

কিন্তু আমরা যে তত্ত্বের অবতারণা করছি, তার ন্যায়গত ফল হিসেবে এ সময়ে এ উপমহাদেশে মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনার অনুশীলন করা প্রয়োজন, যেহেতু সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মতামত একে অন্যের উপর ক্রিয়া করে। একটি ভালভাবে বুঝতে হলে অন্যটি ভালোভাবে অনুশীলন করা প্রয়োজন।

পাক-ভারতে ইসলামী রাজনৈতিক আন্দোলন (১৮৫৭-১৯০৬)

পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম দেশের মতো এখানেও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ধর্মের চারিদিকে ধূমায়িত হয়। অতএব ন্যায়গতভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মুসলিম জীবনে ধর্ম ও রাষ্ট্রের একত্ববোধের একটি প্রাথমিক জাগরণ দেখা দেয়। আমরা পূর্বেই সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ও ইসমাইল শহীদ কর্তৃক পরিচালিত আন্দোলনের বিষয় উল্লেখ করেছি এবং বিদ্রোহের কথাও বলেছি। উভয় রকমের আন্দোলনই কতকগুলো নির্দিষ্ট কারণবশতঃ অকৃতকার্য হয়। প্রথমটি ইসলামী রাজনৈতিক জীবনে কোনো নূতন প্রচলিত জিনিস ব্যবহারের বিপক্ষে ছিল এবং এমনকি নতুন আবিষ্কৃত হাতিয়ার ব্যবহারেও অনিচ্ছুক ছিল। যাজকদের মধ্যে এরূপ কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব ছিল। এবং বর্তমান যুগের

কৌশলীদের একেবারেই অপরিচিত ছিল। তাছাড়া স্বদেশবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা ও অকৃতকার্যতাই মুসলমানদের বিপত্তির কারণ। তদানিন্তন বিজেতাগণ মুসলমানদের উপরই প্রতিশোধ লইতে দৃঢ়সংকল্প করল। স্যার সৈয়দের সময়মত বাধা তৎকালীন মুসলমানদের সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করল। যদিও প্রকৃতপক্ষে ইহা ইসলামিক আন্দোলন ছিল না, তথাপিও একে ন্যায়তঃ মুসলিম আন্দোলন বলা যেতে পারে।

আয়মা এবং জায়গীর বাজেয়াপ্ত করা হয়। অনেক মুসলমানকে ভিক্ষুকে পরিণত করা হয়। কিন্তু মুসলিম সভ্যতা মুছে ফেলেই সবচেয়ে কঠোর আঘাত হানা হয়। স্যার সৈয়দ ভবিষ্যদ্বক্তার মতোই বললেন যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের আগেই ধ্বংস করা হয়েছে। ১৮৬৭ খ্রীঃ কাশীতে উর্দুকে অফিস-আদালতে ভাষা হিসেবে উঠিয়ে দেবার বিরুদ্ধে এক প্রবল গণ্ডগোল হয়। যদিও স্যার সৈয়দের সময়মত কার্যদক্ষতার দরুন যুক্ত প্রদেশের ইহা প্রশমিত হয়। তথাপিও বিহারে ইহা প্রবল আকার ধারণ করে, যার ফলে উর্দু ভাষা ও দলীলপত্রের লোপ সাধিত হয়। অতি অল্প সময়ের ভারতীয় কংগ্রেস গঠিত হল। একটি পৃথক জাতি হিসেবে তাদের স্থায়িত্ব বজায় রাখার জন্যে স্যার সৈয়দ একজন দূরদৃষ্ট রাজনীতিবিদ হিসেবে মুসলমানদের কংগ্রেস থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দিলেন। তাঁর ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে মিরাট এবং ডিসেম্বর মাসে লক্ষৌতে বক্তৃতাগুলো এমনকি অনুগ্রহে কংগ্রেসের মনোবৃত্তি সমন্ধে যথেষ্ট লক্ষ্য দান করে, যদিও নিয়মতান্ত্রিক সংস্করণের দাবীতে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। তথাপিও তাঁর মতে মুসলমানদের স্বায়ত্তশাসন স্থাপন করা এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না।

কংগ্রেসের যুক্ত-নির্বাচনের জন্য কোলাহলে তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী বাস্তবে পরিণত হল। ১৮০৯ খ্রীঃ যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে সমগ্র ভারতে এক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যাতে পূর্বের শরীফ গোষ্ঠীর কেউ মনোনীত হতে পারেন না। ইহাই শেষ নহে। ১৮৯৩ খ্রীঃ স্বর্গীয় বলগঙ্গানিধি তিলকের নেতৃত্বে গো-জাতি রক্ষার্থে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় ব্যাপারে মুসলমানদের গো-যবেহ বন্ধ করা। ১৮৯৮ খ্রীঃ স্যার সৈয়দ মৃত্যু মুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যু পর ১৯০০ খ্রীঃ তদানীন্তন যুক্তপ্রদেশীর শাসনকর্তা তাঁর আদালত থেকে উর্দু ভাষা উঠিয়ে দিয়ে তৎস্থলে দেবনাগরীর প্রবর্তন করেন। এসময় জাতীয় কর্ণধার হলেন প্রাতঃস্মরণীয় নবাব মহসিন-উল-মূলক ও ভিকারুল মূলক। যদিও উভয়েই হায়দরাবাদের নিজামের অধীনে উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তথাপিও এ ঘৃণ্য অভিসন্ধির বিরুদ্ধে লড়বার জন্য চাকুরি ছাড়তে বাধ্য হন। তাঁরা সভা-সমিতি করলেন এবং যুক্ত প্রদেশের শাসনকর্তার এরূপ স্বেচ্ছাচারীতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করলেন কিন্তু এতে কোনো ফল হল না।

মুসলমানগণ তাঁদের অধিকার রক্ষার্থে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের জরুরী প্রয়োজন অনুভব করলেন। নবাব ভিকারুল-মূলকের অসীম চেষ্টার ফলে ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে আলিগড় 'মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান' নামে এক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক জাগরণের প্রাতঃকাল ১৯০৫ খ্রীঃ তদানীন্তন রাজ প্রতিনিধি লর্ড কার্জন কর্তৃক পূর্ব বাংলা ও আসাম নামে দুটি নূতন প্রদেশ সৃষ্টির দ্বারা অনুবর্তিত হয়। পাঁচ বৎসর যাবৎ ইহা বিবাদের কারণ হয়ে থাকে। উহা স্বর্গীয় স্যার সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতার দ্বারা খুব একটি জোরালো মঞ্চ থেকে আক্রান্ত হয়। ইতিহাসে ইহা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নামে অভিহিত। বঙ্গভঙ্গের পূর্বে তদানীন্তন ভারতের রাজ-প্রতিনিধি লর্ড মিন্টো বিশেষভাবে অনুভব করছিলেন যে, মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষিত না রাখলে কোনো মুসলমানের পক্ষে প্রাদেশিক অথবা কেন্দ্রীয় আইন সভায় মনোনীত হওয়া অসম্ভব হবে। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের অভিজ্ঞতা তাঁর মনে এত সতেজভাবে জাগরিত ছিল যে, তিনি একে অবহেলা করতে পারলেন না। অতএব, তিনি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা পরিবর্ধনের জন্যে একটি উপদেষ্টা সংঘ স্থাপন করলেন।

অতএব, মুসলমানদের তাঁর সম্মুখে তাদের দাবী দাওয়া পেশ করার প্রয়োজন ছিল। ১৯০৬ সালের অক্টোবর মাসে মহামান্য আগা খানের নেতৃত্বে তাঁর সহিত দেখা করার জন্য এক প্রতিনিধি সংঘ গঠিত হয়। এই প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্য ছিল পৃথক নির্বাচনের প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন ভারতের সুধীবৃন্দ নিখিল ভারত শিক্ষা সমিতিতে যোগদান করার জন্যে ঢাকায় আগমন করেন। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে একে উপযুক্ত সময় বলে মনে করেন।

প্রকৃত স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি

আল্লামা গোলাম আহমাদ মোর্তজা

দিল্লির হযরত শাহ ওলিউল্লাহ (রহঃ) ছিলেন সে যুগের ভারতের শ্রেষ্ঠতম আলেম। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। তিনিই প্রথম চিন্তানায়ক, আলেম যিনি ইংরেজ ভারত থেকে তাড়িয়ে দেয়া জরুরি মনে করে সংগঠনের বীজ ফেলে গেছেন। তাঁর পুত্র, ছাত্র ও শিষ্যগণ তার এ সুপরিকল্পিত সংগঠনের সভ্য ছিলেন।

সৈয়দ আহমদ বেরেলী (রহঃ) ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি উপরোক্ত এ সংগঠনেরই সভাপতি ছিলেন। ইংরেজ বিতাড়ন পরিকল্পনা তার মাথায় এমন গাঢ় হয়ে বসে গেল যে, তিনি বিখ্যাত আলেম হওয়ার সময় আর পেলেন না। তবে চরিত্র মাধুর্য ও আধ্যাত্মিকতার উন্নতির চরম সীমায় পৌছে ছিলেন। দৈহিক ক্ষমতাও তার সাধারণ মানুষের থেকে বেশি ছিল। তিনি ছোটবেলা থেকেই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা করতেন। যুবক হবার পরেও মনের অঙ্কুরিত ইচ্ছা যেন ফুলে ফলে বড় হয়ে উঠল। তাই তিনি যোগ দিলেন এক ক্ষুদ্র সামন্ত প্রভুর সেনাবাহিনীতে, শিখলেন সামরিক কলাকৌশল। এর সাথে অন্যদের সাহায্য করার বিনিময়ে শিখলেন প্রশাসনিক কাজকর্ম। কিন্তু এ মুসলমান সামন্ত প্রভু ইংরেজদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করল। সাথে সাথে ঘৃণাভরে চাকরি খতম করে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরলেন বাড়িতে। পরপর শিষ্য সংখ্যা বাড়াতে লাগলেন ও সারা ভারত ঘুরে ফেললেন। পরে তিনি হজ্ব যাত্রা করলেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের সাথে মুসলমানদের সাথে সশস্ত্র সংগ্রাম ও করতে চাইলেন। তাই সর্বভারতীয় প্রচারে জানিয়ে দিলেন যে, কোরআন ও হাদীস বিরোধী কাজ মুসলমানদের করা চলবে না। অবশ্য অনেকাংশে সফল হয়েছিলেন। পরে বিরাট একটি দল নিয়ে যখন ভারত পরিক্রমা সহ মক্কা থেকে হজ্ব করে ফিরলেন, তখন দেখা গেল এ ভ্রমণে তার দু'বছর দশ মাস পার হয়ে গেছে। সে বিপুল সংখ্যক লোকের খাওয়া দাওয়া ও খরচের সব অর্থটুকু তার ভক্তদের কাছ থেকে উপহার হিসেবেই তিনি পেয়েছিলেন। জানা যায়, শুধু হজ্ব যাত্রীদের টিকিট কিনতেই লেগেছিল তখনকার ১৩৮৬০ টাকা, আর হজ্ব যাত্রার প্রাক্কালে রেশনের মাল কিনেছিলেন ৩৩৯১ টাকায়।

আলিগড়ের সৈয়দ আহমদ ও বেরেলীর সৈয়দ আহমদ দুজনেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ মানুষ। তবে আলিগড়ী আহমদ সাহেব পেয়েছেন ইংরেজের পক্ষ থেকে 'স্যার' উপাধি, প্রচুর সম্মান, চাকরির পদোন্নতি প্রভৃতি। আর বেরেলীর আহমদ সাহেব ইংরেজের পক্ষ থেকে পেয়েছেন অত্যাচার ও আহত হওয়ার উপহার। আর সব শেষে শত্রুদের চরম আঘাতে তাঁকে শহীদ হতে হয়েছে ভারতবাসীকে শেষ উপহার হিসেবে দিয়ে গেছেন তিনি তার রক্তমাখা কাঁচা কাটা মাথা।

এ বিরাট আধ্যাত্মিক বিপ্লবী শহীদ বীরকে মিঃ উইলিয়াম হান্টার The Indian Musalmans পুস্তকে ডাকাত, ভণ্ড ও লুণ্ঠনকারী বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর চাপা পড়া ইতিহাসকে আজ কিন্তু কিছু বাস্তববাদী ঐতিহাসিক প্রকাশ করার জন্যে নতুন সাধনায় নিয়োজিত হয়েছেন। ঐতিহাসিক রতন লাহিড়ী তাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর লেখা অন্তত এটা প্রমাণ করে যে, সত্য তথ্য প্রকাশে তিনি সুস্পষ্টবাদী। তাই তাঁর লেখা ভারত পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সত্যিকারের ইতিহাস থেকে সৈয়দ আহমদ বেদে সম্বন্ধে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি-

"যার জীবনস্মৃতি প্রেরণা জুগিয়েছিল যুগে যুগে এ দেশের মহাবিপ্লবীদের। যার জীবনাদর্শ, বৃটিশ সম্রাজ্যবাদের আওতার বাইরে থেকে বৃটিশ সাম্রাজাবাদকে আক্রমণ করা, স্বাধীন সরকার গঠন করা, আবার সে সাথে সাথে দেশের মধ্যে থেকেও সাম্রাজ্যবাদকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করা ইত্যাদি পথ দেখিয়েছিল পরবর্তীকালের মহেন্দ্রপতল, বরকতুল্লা, এমন এন, রায়, রাসবিহারী এমনকি নেতাজীকেও। কে এ মহাবিপ্লবী, যার আদর্শে উদ্বোধিত হয়ে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছিল ১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহে-শত হাজার মানুষ বরণ করেছিল দ্বীপান্তর, সশ্রম কারাদণ্ড, কঠোর যন্ত্রণাময় মৃত্যু। কে ইনি? বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আর তার দালালদের লেখা ইতিহাসে এর নামোল্লেখ থাকলেও এর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখা থাকা স্বাভাবিকও নয়। আর আজও স্কুল-কলেজে যে ইতিহাস পড়ান হয়, সে সব এ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রাচীন গলিত বিকৃত ইতিহাসের আধুনিক সংস্করণ মাত্র। তাই কি করে জানবে এ মহাপুরুষের নাম? এ মহান মহাবিপ্লবী মহাবিদ্রোহীর নাম হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ বেরলভী।" (পৃষ্ঠা ৭-৯) রতন লাহিড়ী আরও বলেন, "বিপ্লবীরা না পিছিয়ে মরণপণ সংগ্রাম করতে লাগল।

তারপর যুদ্ধ হল শেষ। বিপ্লবী বাহিনী হল ধ্বংস। তাকে সকলে দেখেছিল বীরের মত লড়াই করতে একটার পর একটা শত্রু সৈন্য কচুকাটা করতে।"যদিও নিজেরা একে মৃত বলে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করল কিন্তু কেহ এর শেষ পরিণতি দেখেনি।" শ্রী লাহিড়ীর ঐ পুস্তক পৃষ্ঠা ৭-৮)

এবার উইলিয়াম হান্টারের লেখা 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস" গ্রন্থের বিচারপতি আবদুর মওদুদের বঙ্গানুবাদ থেকে বেশ কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তার পূর্বে বলে রাখি, মিঃ হান্টার হচ্ছে মিঃ হডসনের অন্তরঙ্গ বান্ধব। যেহেতু তিনি পুস্তকের উৎসর্গ

পৃষ্ঠায় ১৮৭১ খৃস্টাব্দের ২৩ শে জুন তারিখ দিয়ে পুস্তকটি বন্ধু মিঃ হডসনের নামেই উৎসর্গ করেছেন। যে হডসন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের দু'জন পুত্রসহ রাজবাড়ির কচিকাচা ২৯ জন শিশুকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন। সে যাহোক, লেখক যে একজন বিখ্যাত তথ্য সংগ্রহকারী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যদিও তাঁর লেখায় কোরআন হাদীসের বিরুদ্ধে, মাওলানাদের বিরুদ্ধে, বিপ্লবী মহামনীষীদের বিরুদ্ধে অনেক অশ্লীল কথা লেখা আছে। এ বইটি লিখতে সরকারি তথ্যসমূহ সংগ্রহ করা তার পক্ষে সহজ ছিল, যেহেতু তিনি ছিলেন সরকারি সিভিলিয়ান। তবে ১৮৭০ খৃস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত Calcutta Review. এর C.C.l ও C । সংখ্যায় “Wahabis In India’ শিরোনামে যে তিনটি বিরাট বিরাট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, যার লেখকের বিচিত্র ছদ্মনাম ছিল ‘Anonymous -সে তিনটি প্রবন্ধই মিঃ হান্টারের পুস্তকের রক্ত, মাংস ও অস্থি বলা যায়।

হান্টার লেখেন, “অপেক্ষাকৃত গোড়া মুসলমানেরা যখন এভাবে প্রকাশ্যে রাজদ্রোহে জড়িয়ে পড়েছে, তখন সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ই প্রকাশ্যে আলোচনা করছে, জিহাদে যোগ দেয়া তাদের পক্ষে ফরয কি না।” “পাঞ্জাব সীমান্তের বিদ্রোহী বসতি স্থাপন করেন সৈয়দ আহমদ।” (পৃষ্ঠা ৩)

হান্টার সৈয়দ আহমদ সম্পর্কে আরও বলেন, “একজন মশহুর দুস্যু। সর্দারের অধীনে অশ্বারোহী সিপাহী হিসেবে তার জীবন আরম্ভ। বহু বছর তিনি মালব প্রদেশের আফিম উৎপাদনকারী গ্রামগুলোর উপর লুটতরাজ করেন। উদীয়মান শিখ শক্তির নায়ক রণজিৎ সিংহ পার্শ্ববর্তী মুসলমান অঞ্চল সমূহে যে কঠোর নীতি অবলম্বন করেন, তার ফলে কোন মুসলমান দুর পক্ষে পেশা চালিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। বুদ্ধিমানের মত নিজেকে সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে নিলেন। তিনি দস্যুবৃত্তি ছেড়ে নিয়ে ১৮১৬ খৃস্টাব্দে দিল্লির একজন মশহুর আলেম শাহ আবদুল আজিজ-এর কাছে শরিয়তী শিক্ষা গ্রহণ করতে উপস্থিত হলেন। তিন বছর সেখানে সাগরেদী করার পর সৈয়দ আহমদ ইসলাম প্রচার করতে শুরু করেন এবং ভারতীয় ইসলামে যে সব অনাচার বা বিদয়াত ঢুকে পড়েছে, সেগুলোর প্রতি কঠোর আক্রমণ পরিচালনা করে একদল গোড়া ও হাঙ্গামাবাজ অনুচর সংগ্রহ করলেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ ধীরে ধীরে দক্ষিণ অঞ্চলে সফর করে ফিরলেন। তখন তার মুরীদান তার ধর্মীয় মাহাত্মা স্মরণ করে সাধারণ নফরের মত তার দ্বিমত করত এবং দেশমান আলেম খিদমতগাবের মত খালি পায়ে তার পারি দু পারে দৌড়ে দৌড়ে যেতেন। ১৮২২ সনে তিনি মক্কায় হজ্ব করতে যান এবং এভাবে তার পূর্বতন দস্যুবৃত্তিকে হাজীর পবিত্র আলখেল্লায় বেমালুমভাবে ঢাকা দিয়ে তিনি পরবর্তী অক্টোবর মাসে বোম্বাই শহরে উপস্থিত হন। (শিখরা লাহোরে ও অন্যান্য স্থানে বহুদিন ধরে হুকুমত চালাচ্ছে।

তারা মসজিদে আযান দিতে দেয় না এবং গো-জবেহ একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। যখন তাদের অপমান-অত্যাচার সহ্যের সীমা অতিক্রম করল, তখন হযরত সৈয়দ আহমদ (তার সৌভাগ্য ও প্রশংসা অক্ষয় হোক) একমাত্র দ্বীনের হিফাযত করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে কয়েকজন মাত্র খাদিম সাথে নিয়ে কাবুল ও পেশোয়ারের দিক দিকে রওনা হলেন .....কয়েক হাজার ঈমানদার মুসলমান তার আহ্বানে আল্লাহর রাহে চলতে তৈরি হয়েছে এবং ১৮২৬ সনের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে বিধর্মী শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ আরম্ভ করা হয়েছে) * ১৮৩০ সালের জুন মাসে একবার পরাজিত হয়ে ও মুজাহিদ সৈন্যরা অকুতোভয়ে সমতলভূমি দখল করে ফেলে আর সে বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই পাঞ্জাবের রাজধানী পেশোয়ার তাদের হস্তগত হয়। ...তার প্রকৃত মুজাহিদ বাহিনী ছিল হিন্দুস্তানী ধর্মান্ধদের নিয়ে গঠিত। ইমাম আহমদ সাহেবের প্রধান খলিফাদের মধ্যে দু'ভাই ছিলেন। তারা হচ্ছেন জনৈক নামজাদা নরঘাতকের দুই পৌত্র। তাদের হামলার হাত শিখ গ্রামগুলোর উপর পড়তে লাগল বটে, কিন্তু বিধর্মী ইংরেজদের উপর আঘাত হানতে পারলেই তারা তীব্র উল্লাস উপভোগ করত। যতদিন আমরা জিহাদের দিকে নজর দিইনি, ততদিন তারা দলে দলে হামলা করে আমাদের প্রজা ও মিত্রদের ধরে নিয়ে গেছে কিংবা খুন করে ফেলেছে; আর যখন শক্তি প্রয়োগে তাদের নির্মূল করতে আমাদের সৈনাদেরকে মারাত্মকভাবে পরাজিত করছে এবং অনেককাল ধরে বৃটিশ ভারতের সীমান্ত বাহিনীকে অবজ্ঞাভরে দূরে ঠেলে রেখেছে।

আমাদের সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রদ্রোহী ও ধর্মান্ধ প্রজাদের সাহায্যপুষ্ট একটা বিদ্রোহী ও নির্বাসিতের বসতি তীব্র হিংসার বশবর্তী হয়ে কিভাবে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ জানাতে সাহসী হতে পারে, এটা বোঝা মোটেই শক্ত ব্যাপার নয়। কিন্তু এটা বোঝা খুবই শক্ত যে, একটা সুসভ্য দেশের সেনাবাহীনির সুকৌশল ও সমরনীতির বিরুদ্ধে কিভাবে তারা বহুকাল টিকে থাকতে পারে। ...শেষ পর্যন্ত ১৮৩১ সনের উনি (আহমদ সাহেবের) পতন ও মৃত্যু হল।" (দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস পৃষ্ঠা ১২১)

পূর্ণ বিদ্বেষ নিয়ে যদি ও হান্টার এসব তথ্য পরিবেশন করেছেন, যদি ও বিপ্লবী সৈয়দ আহমদের চরিত্রে মিথ্যার কালি মাখিয়েছেন, তবুও প্রমাণ হয় তার বীরত্ব, বাহাদুরি, সংগঠন ও আত্মত্যাগের কথা।

সৈয়দ আহমদ ও তার অনুসারীরা প্রায় সকলেই কোন যুদ্ধে এবং কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহীদ হন-সে সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া যায় তা এ রকম: বালাকোটের শেষ যুদ্ধে পূর্বেও সৈয়দ আহমদ সাহেব নির্দেশ দিয়েছিলেন, বিপক্ষ সৈন্য পাহাড় থেকে নীচে না নামা পর্যন্ত বা তারা আক্রমণ না করা পর্যন্ত আমাদের আক্রমণ বন্ধ থাকবে। পাতিয়ালার সৈয়দ চেরাগ আলী বিপ্লবী যোদ্ধাদের জন্য পায়েস রান্না করছিলেন আর বিপক্ষ সৈনাদের ঘাটির দিকে লক্ষ্য রাখছিলেন।

হঠাৎ তার ভাবান্তর হয়-যে লাঠি দিয়ে তিনি ফুটন্ত পায়েস নাড়াচাড়া করেছিলেন তা দিয়ে তিনি এ তামার হাড়ির গায়ে জোরে জোরে আঘাত করতে লাগলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললেন, 'ভাইসব, স্বর্গ হতে লাল পোশাক পরেসুন্দরীরা দল বেঁধে নামছে।' এ বলে অস্ত্র হাতে তিনি কারও পরামর্শ না নিয়ে ছুটতে লাগলেন শত্রু সৈন্য খাটির দিকে।"এ ঘটনা এমনই ক্ষিপ্রতার সাথে হইয়া গেল যে, কিসে কি হইল কেহ বুঝিবার পূর্বেই সৈয়দ চেরাগ আলী গুলি লাগিয়া শহীদ হইলেন। তিনিই বালাকোটের প্রথম শহীদ।" (দ্রষ্টব্য 'হঃ সৈয়দ আহমদ শহীদ, পৃষ্ঠা ৫৯৮)। বাধ্য হয়েই পরিকল্পনা বিরোধী কাজ মোজাহেদ বাহিনীকে করতে হল, অর্থাৎ এলোমেলোভাবে অপ্রস্তুতির সাথে ঝাপিয়ে পড়তে হল। এ অতর্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং শেষ পরিণতিতে প্রায় সকলকেই নিহত হতে হয়েছিল।

বিখ্যাত লেখক ও বিচারপতির উদ্ধৃতি দিয়ে প্রসঙ্গ শেষ করতে চাইছি-১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে এ যুদ্ধ হয়। এটাকে ঠিক যুদ্ধ বলা চলে না। এক পক্ষে বিশ হাজার সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত সৈন্য....(আর এক পক্ষে) ভগ্নোৎসাহ প্রায় ৯০০ মোজাহিদ। এ ছিল মৃত্যু অভিসারীদের বাহ্নিবন্যার মুক্তিন। দুর্দম বেগে তারা ঝাপিয়ে পড়লেন জীবন মৃত্যু মিশেছে যেথায় মত্ত ফেনিল স্রোত'। শাহাদত বরণ করলেন সঙ্গী সহ সৈয়দ আহমাদ ও শাহ ইসমাঈল।" (দ্রষ্টব্য ওহাবী আন্দোলন, পৃষ্ঠা ১৯৫)।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে হযরত আহমদ সাহেব শহীদ হলেও তার সংগঠন ও আন্দোলন কিন্তু শহীদ বা শেষ হয়নি। পরবর্তীকারে তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহ এবং ১৯৪৭ সনের পূর্ব পর্যন্ত যারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন, তারা এবং তাদের আন্দোলন সৈয়দ আহমদ বেরেলীর (রহঃ) অঙ্কুরিত বীজের সফল বৃক্ষ বলা যায়। (দ্রষ্টব্য ভারত পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সত্যিকারের ইতিহাসঃ শ্রীরতন লাহিড়ী, পৃষ্ঠা ১)

প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামের চাপা দেয়া ইতিহাস

বেরেলীর সৈয়দ আহমদ শহীদের (রহঃ) নিহত হওয়ার পর যেসব আন্দোলন, বিদ্রোহ বা সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল, সেগুলোকে বিকৃত করে তাদের নাম পাল্টে কোনটাকে বলা হয়েছে সিপাহী বিদ্রোহ, কোনটাকে বলা হয়েছে ওহাবী আন্দোলন, ফারায়েজী আন্দোলন, মহম্মদী আন্দোলন, আবার কোনটাকে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে।

ওহাবী নেতাদের 'ওহাবী' বলা মানে তাদের শ্রদ্ধা করা তো নয়ই বরং নিশ্চিতভাবে গালি দেয়াই হয়, যেহেতু সে মহান বিপ্লবীরাই তাদেরকে 'ওহাবী' নামে আখ্যায়িত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। 'বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও

বিচ্ছিন্নতাবাদ' পুস্তকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমলেন্দু দে-ও একথা উল্লেখ করেছেন (পৃষ্ঠা ৯৫)। সেজন্য আমরা আমাদের আলোচনায় 'সিপাহী বিদ্রোহ' এবং 'ওহাবী' বা ফারায়েজী আন্দোলনের পরিবর্তে 'স্বাধীনতা সংগ্রাম', 'মহাবিপ্লব মহাবিদ্রোহ' এবং ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে 'ওহাবী, ফারায়েজ' ও 'মুহাম্মদী' শব্দের পরিবর্তে 'বিপ্লবী সংগ্রামী' প্রতি সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করা ভাল মনে করি। এমনকি সংস্কৃতির কোন কোন ক্ষেত্রেও আমরা এ শব্দগুলো বাদ দিয়ে মূল শব্দের প্রথম অক্ষর বন্ধনীর মধ্যে রাখব-যেমন ওহাবী বা অহাবীর ক্ষেত্রে (ও. বা অ.) ফারায়েজীর ক্ষেত্রে (ফ.) ইত্যাদি। উদ্দেশ্য হল, ভবিষ্যতে যাতে এ কল্পিত, মিথ্যা শব্দগুলোর বহুল প্রচার না হয়।

এ প্রসঙ্গে আরও জানিয়ে রাখছি যে, অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, অনেকের একাধিক নাম থাকে। যেমন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের, অপর নাম ছিল 'গদাধর। এখন ইতিহাসে যদিতাকে গদাধর বলে প্রকাশ করা হয়, তাহলে তা অনিচ্ছাকৃত হলে অসাবধানতা এবং ইচ্ছাকৃত হলে অসভ্যতা বলে মনে করা যেতে পারে। তেমনি, স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বনাম ছিল নরেন্দ্রনাথ। তার আগের নাম ছিল বীরেশ্বর। সে বীরেশ্বরের সংক্ষিপ্ত 'বীরে' থেকে ক্রমে 'বিলে' বলেই তাকে ডাকা হত (মনীষীদের ছোটবেলা ঃ বিমল ঘোষ, পৃষ্ঠা ৮৯)। এখন তাঁর স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস যদি 'স্বামী বিলে' বরে আরও ও শেষ করা হয়, তাহলে তা হবে অতীব দুঃখের। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, বিখ্যাত বিখ্যাত নেতাদের আসল নামের পরিবর্তে, জানিনা কোন উদ্দেশ্যে ছেলেবেলার সেকেলে আজেবাজে নাম ব্যবহার করা হয়েছে-যেমন তিতুমীর, নোয়ামিঞা, দুদু প্রভৃতি। এ ঐতিহাসিক ভুলটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমরা তাই তাদের আসল ও সুন্দরতম নাম ব্যবহার করার পক্ষপাতি।

প্রথমে 'ওহাবী' জিনিসটা কি সে সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করছি। আরবদেশে ১৭০৩ খৃস্টাব্দে আবদুল ওহাবের ছেলে মুহাম্মদের জন্ম হয়। আর দেশের নিয়মানুযায়ী এ নাম 'মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব' বলে বর্ণিত হয়। জন্মস্থানের নাম ছিল নজ্‌দ। এ ওহাবী আন্দোলনের নায়কের নাম আসলে মুহাম্মদ। ইংরেজদের কারসাজিতে ছেলেদের পরিবর্তে বাপের নামেই ইতিহাস তৈরী হয়েছে, তাদের রাখা এ নাম হল ওহাব।

আরবদেশ যখন শিরক, বিদআত ও অধর্মীয় আচরণে ছেয়ে গিয়েছিল, তখন তা রুখতে এ ওহাবের পুত্র মুহাম্মদ প্রতিবাদী দল গড়ে তোলেন। ক্রমে ক্রমে তা রাজনৈতিক সংঘর্ষের রূপ নেয়। ১৭৪৭ সনে রিয়াদের শেখের সাথে সংঘর্ষ হয়। ১৭৭৩ সনে রিয়াদের শাসন দাহহাম আবদুল ওহাবের পুত্র মুহাম্মাদের কাছে ভীষণভাবে পরাজিত হন। আরববাসীরা এ ঘটনার পর দলে দলে তাঁর পতাকাতলে সমবেত হয়। অবশেষে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মারা যান। ওহাবী

আন্দোলনের ১১৬ পৃষ্ঠায় আছে-"আবদুল ওহাবের ধর্মীয় শিক্ষা ও মতবাদের আলোচনায় প্রথমেই বলে রাখা ভাল, আরবদেশে 'ওহাবী' নামাঙ্কিত কোন মযহাব বা তরিকার অস্তিত্ব নেই। এ সংজ্ঞাটির প্রচলন আরবদেশের বাইরে এবং এ মতানুসারীদের বিদেশী দুশমন, বিশেষতঃ তুর্কীদের ও ইওরোপীয়দের দ্বারা "ওহাবী" কথাটির অর্থ এবং তাদের মধ্যেই প্রচলিত। কোনও কোনও ইউরোপীয় লেখক, যেমন নীবর (Niebuhr) আবদুল ওহাবকে পয়গম্বর বলেছেন। এসব উদ্ভট চিন্তারও কোনো যুক্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে আবদুল ওহাব কোনও মাজহাবও সৃষ্টি করেননি, চার ইমামের অন্যতম ইমাম হাম্বলের মতানুসারী ছিলেন তিনি, এবং তার প্রযত্ন ছিল, বিশ্বনবীর এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইসলামের যে রূপ ছিল, সে আদিম সহজ সরল ইসলামে প্রত্যাবর্তন করা" (জাস্টিস আঃ মওদুদ)। তারিখ হিসেব করে দেখা যায়, আরবের মুহম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের যখন মৃত্যু হচ্ছে তখন সৈয়দ আহমদ বেরেলীর বয়স মাত্র এক বছর। তার সাথে যে এর কোন যোগাযোগ ছিলনা, তা সুস্পষ্টই প্রমাণ হয়।

কিতাবুত তাওহীদে হাম্বল মাজহাব অনুযায়ী আবদুল ওহাবের পুত্র মুহাম্মদ যা যা নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা বিস্তারিত উল্লিখিত হয়েছে। তবে তার সংক্ষেপ হচ্ছে : আল্লাহ ছাড়া কাব্য ও উপাসনা করা এবং পীর ও ওলীদের কবরে গিয়ে তাদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ; মাধ্যম ব্যতিরেকে সরাসরি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে। আল্লাহ ছাড়া কারও নামে মাত কর। শিরক। কোরআন হাদীসের সরল অর্থকে বেঁকিয়ে ব্যাখ্যা করা নিষিদ্ধ। তাছাড়া জামাতের সাথে নামায পড়া তার সময় ছিল জরুরী। ধুমপানকারীদের শাস্তি ছিল বেত্রাঘাত। মুসলমান দাড়ি কামালে ৫ শাস্তির উপযুক্ত। যাকাত ঠিকমত না দিলে সেও শাস্তিরযোগ্য। শুধু কলেমা পড়ে আল্লাহ নাম নিয়ে কোন হালাল পশু জবেহ করলেও তা হালাল বাদ্য হবে না, যদি তার চরিত্র মোটামুটি কলঙ্কমুক্ত না হয়। তাছাড়া তিনি কবরের উপর সৌধ নির্মাণ, কবরকে ইট ও পাথর দিয়ে বাঁধান প্রভৃতির উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন। এগুলো শুধু তার মুখের কথাই ছিলনা, বাস্তবে রূপ দিতে মক্কা ও মদীনার অনেক নামজাদা মনীষীর কবর তিনি ভেঙে দিয়েছিলেন।

অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, দিল্লীর শাহ ওলিউল্লাহ থেকে শুরু করে তাঁর পুত্র, শিষ্য ও ছাত্রগণ এমনকি শহীদ সৈয়দ আহমদ এবং তার অনুগামীদের সকলেই মুসলমানদেরকে শরীয়তের উপর প্রত্যাবর্তন করার তাগিদ দিয়েছিলেন। ফলে কবর বাধান বা কবরের উপর সৌধ নির্মাণ করা থেকে ক্রমে মুসলমানরা বিরত হতে থাকে। ইংরেজরা মুসলমান বিপ্লবীদের মতিগতি লক্ষ্য করে, এ আন্দোলন যে তাদের বিরুদ্ধে অব্যর্থ আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি করছে তা বুঝতে পেরেছিল। তাই তারা কতকগুলো দরিদ্র ও দুর্বলমনা আলেমকে টাকা দিয়ে ঘুরিয়ে

তাদের মুখ দিয়ে বলিয়েছিল নিল-তোমরা যুগ যুগ ধরে যাকরে আসছি, তা করতে থাক। এ বিপ্লবীরা আসলে ওহাব; ওরা নবী, সাহাবী ও ওলীদের কবর ভাঙার দল। ইংরেজ তাদের প্রচারে যোগ দিয়ে বলল, ১৮২২ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ মক্কায় যান, ওখানে গিয়েই তিনি ওহাবী মতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অথচ এটা একেবারে মিথ্যা কথা। প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের জীবনে একবার মক্কায় গিয়ে হজ্ব করা অবশ্য কর্তব্য। হিসেবেই তিনি গিয়েছিলেন। তাঁর হজে যাওয়ার পূর্বের এবং পরের কার্যাবলীর সাথে আরবের 'ওহাবী' আন্দোলনের কোন যোগাযোগই ছিলনা।

তথ্যসূত্র: চেপে রাখা ইতিহাস, পৃঃ ১৭৬-১৮১।

ইতিহাসের এক উপেক্ষিত বীর শহিদ শের আলী খান আফ্রিদি

আকতারুল ইসলাম

ইতিহাস ও ইতিহাসের উপাদান নিছকই জড় বস্তু, যা ঐতিহাসিকদের কলমের খোঁচায় কখনো বা প্রাণ লাভ করে, কখনো বা তা নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে। কালের পরিক্রমায় কোন ঘটনা ইতিহাসের মনোযোগের বিষয়ে পরিণত হবে, আর কোন ঘটনা ইতিহাসের জড় বস্তু হিসেবে উপেক্ষিত হবে, তা সম্পূর্ণ রূপে ইতিহাস প্রনেতাদের ইচ্ছের উপরে বেশি নির্ভর করে। তাদের কলমের খোঁচায় কখনো কখনো কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বেশি করে আলোচিত হয়, আবার তাদের বিরাগভাজন হয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো হয় ইতিহাসের পাদটীকায় মাথা গুঁজে মরে নয়তো কালের গর্ভে চিরতরে বিলীন হয়ে যায়। আজকে এমন একজন বীর শহিদের কথা বলব যার নাম ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রপথিকের তালিকায় প্রথমেই উচ্চারিত হবার কথা, পাঠ্য পুস্তকে স্থান পাওয়ার কথা, অথচ ইতিহাস প্রণেতাদের প্রহসনের বলি হয়ে তার নামটা ইতিহাসের পাদটীকায় চাপা পড়ে রয়ে গেছে।

আমাদের কাছে ক্ষুদিরাম বসুর নামটা যতটা পরিচিত ও জনপ্রিয়, শহিদ শের আলী খান আফ্রিদি নামটা ততটাই অজ্ঞাত ও অপরিচিত। অথচ দুজনই আপাদমস্তক ব্রিটিশ শাসন বিরোধী বিপ্লবী হওয়া সত্ত্বেও একজন ইতিহাসের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেলেও অপরজন বরাবরই উপেক্ষিত হয়েছেন।

শের আলী খান আফ্রিদি (তিনি শের আলী নামেই সমধিক পরিচিত) ছিলেন ব্রিটিশ ভারতে জন্মগ্রহণকারী মুসলিম তরুণ বিপ্লবী ও শহিদ। ক্ষুদিরাম বসুর মতো তিনিও ছিলেন ঘোর মাত্রার ব্রিটিশ শাসন বিরোধী তরুণ বিপ্লবী এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য আপ্রাণ লড়াই চালিয়ে যাওয়া এক দেশপ্রেমিক। তিনি আফগানিস্তান পাকিস্তান সীমান্তবর্তী খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের জামরুদ নামক এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

শের আলী খান আফ্রিদি তৎকালীন ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের পুলিশ প্রসাশনে ১৮৬০ সালে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি মেজর হিউ জেমসের

অধীনে পেশোয়ারের অশ্বারোহী বাহিনীর যোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। তার সাহসীকতা ও বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে ব্রিটিশ কর্মকর্তা রেনেল টেলর তাকে একটি ঘোড়া, পিস্তল ও সনদপত্র প্রদান করেন। শের আলী খান আফ্রিদি তাঁর সততা, সরলতা ও কর্মনিষ্ঠার জন্য সকলের প্রিয় পাত্রে পরিণত হন। জনাব টেলর শের আলীকে তার ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার দায়িত্ব প্রদান করেন।

শের আলী একসময় ভারতের শীর্ষস্থানীয় বিপ্লবী নেতা মৌলানা জাফর থানেশ্বরী, ইয়াহিয়া আলী, মৌলভী আহমেদুল্লা সহ আরো বেশ কিছু ব্রিটিশ শাসন বিরোধী নেতাদের সংস্পর্শে আসেন এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন- সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। ব্রিটিশ সরকার তাদের আন্দোলন দমন করার জন্য উঠেপড়ে লাগেন এবং তাদের বিপ্লবী কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে হায়দার আলী নামক এক গুপ্তচরকে তাদের পেছনে লেলিয়ে দেন। হায়দার আলী মৌলানা জাফরসহ বেশ কিছু নেতাকর্মীকে ধরিয়ে দিলে শের আলী তাকে হত্যা করেন। খুনের ঘটনায় তাকে ১৮৬৮ সালে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করলেও কলকাতা হাইকোর্টের এক রায়ে তাকে মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতি দিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হয় এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কারাগারে আজীবন সাজা ভোগ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সে সময় আন্দামান ও নিকবর দ্বীপপুঞ্জ ছিল আটককৃত ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবীদের জন্য মূর্তিমান আতঙ্কের নাম। চারদিকে জল বেষ্টিত দ্বীপপুঞ্জ, ভারতের মূল ভূমি থেকে অত্যন্ত দূরবর্তী এক মৃত্যুপুরী। সেসময় এই দ্বীপে যাদের নির্বাসনে পাঠানো হতো তারা হয় অনাহারে দিনাতিপাত করে মারা গেছেন নয়তোবা পালাতে গিয়ে গভীর সাগরে তাদের সলিল সমাধি হয়েছে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে কোন সেলুলার জেলখানার ব্যবস্থা ছিল না। শের আলীকে অন্যান্য বন্দীদের সাথে পোর্ট ব্লেয়ার দ্বীপের হোপ টাউন অঞ্চলের পানি ঘাটায় বন্দি করে রাখা হয়। ১৮৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমেছে। দ্বীপের নান্দনিক সৌন্দর্য ও সানসেট পয়েন্টে সূর্যাস্ত দেখতে এসেছেন ব্রিটিশ ভারতের বড়লাট লর্ড মায়ো। চারদিকে কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনী। তাতে কী! এমন ই এক মোক্ষম সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন শের আলী। যেকোন মূল্যে এই অত্যাচারী ব্রিটিশ অধিপতিকে পরোপারে পাঠাতে হবে। ভারতকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে হবে। ডানহাতের মুঠোয় পুরে রাখা ধারালো ছুরিটা পেছনে আড়াল করে প্রহরীদের বাঁধা উপেক্ষা করে পৌঁছে গেলেন বড়লাটের কাছে, ছুরিটা পিঠ বরাবর সমূলে ঢুকিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল বন্দী বিপ্লবীদের জন্য মূর্তিমান আতঙ্ক, ভারতের স্বাধীনতার পথের অন্তরায় অত্যাচারী বড়লাট লর্ড মায়ো। একজন পঁচিশ বছর বয়সী ছিপছিপে গড়নের এক তরুণ বিপ্লবীর হাতে তিরোধিত হলেন সর্ব ভারতীয় উপমহাদেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম কারী এক জালেম শাসক। লর্ড মায়োর মৃত্যু ভারতে ব্রিটিশ শাসনের জন্য

অনেক বড় এক ধাক্কা কারণ বড়লাট বা ভাইসরয় সরাসরি ব্রিটিশ রাজ দরবার কর্তৃক মনোনয়ন প্রাপ্ত ভারতীয় উপমহাদেশে শাসন কার্য পরিচালনায় সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তি। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে শের আলী খান একমাত্র ব্যক্তি যিনি কোন বড়লাটকে হত্যা করতে সক্ষম হন। শের আলী মূলত সমস্ত ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে ধ্বংস করে ভারতকে পরাধীনতার শিকল থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। অথচ ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস আধুনিক ভারতে শের আলী খান আফ্রিদি নামটা বড় ই অবহেলিত। সাম্প্রদায়িকতার চশমা পরিধানকারী ইতিহাস প্রনেতাগন শের আলীর অবদানকে ইতিহাসের পাদটীকায় চাপা দিতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। ক্ষুদিরাম বসু কিংসফোর্ড নামক এক ব্রিটিশ বিচারককে মারার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েও ইতিহাসের এক আলোচিত ব্যক্তিত্ব। অথচ ব্রিটিশ ভাইসরয়কে সফলতার সাথে হত্যা করেও শের আলী খান আফ্রিদি এক অপাঠ্য ইতিহাস।

তথ্যসূত্র: বরেন্দ্র বার্তা, ৩ অক্টোবর ২০২০ ইং

সপ্তম অধ্যায়

বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ

Tariqah-i-Muhammadiyah Movement: An Analytical Study

Prof. Dr. Muin-ud-Din Ahmad Khan

Tariqah-i-Muhammadiyah movement was launched by Sayyid Ahmad Shahid Brelavi in C.E. 1818 from Delhi with the blessings of Shah 'Abd al-'Aziz Muhaddith Dehlavi. Taking its start as a campaign for religious reform, it quickly assumed the form of a socio-political movement and after a short while, flared up into a *jihad* movement against the anti-Muslim aggressive Sikh regime of the Panjab. Indeed it became most popular in this militant phase and was popularly called *jihad* movement or *Tahrik-i-Mujahidin.* The Indo-British administrators and European writers designated it Indian Wahhabism or Wahabi fanaticism, most probably, owing to their suspicion of its political aspirations on the one hand and due to its resemblance with the so-called Wahhabism[1] of Arabia on the other. Many conservative '*Ulama*' and *Pirs* who detested its uncompromising puritanism and radical reform ideas also termed it *Wahhabiyat* or *Wahhabiyah* by way of reproach. Sayyid Ahmad Shahid himself however called his movement *Tariqah-i-Muhammadiyah.* But the propriety of this term was questioned as early as C.E. 1829 by an opponent, Mir Muhammad 'AH of Madras, who asserted that Sayyid Ahmad had no right to designate his own *Tariqah* as "the Tariqah of Muhammad ".[2] This controversy makes it clear that originally the movement was indeed known as *Tariqah-i-Muhammadiyah.*

A close examination reveals at least four historical strands, which made up this movement. In the first place, Sayyid Ahmad Shahid was a disciple of Shah Abd al-Aziz who initiated him into the popular mystic

orders of *Qadiriyah, Chishtiyah, Suhrawardiyah* and *Nakshbandiyah* as well as into the *Mujaddidiyah Tariqah* or reformed branch of the last one founded by the great *Sufi* reformer Shaykh Ahmad Sarhindi[3]. In addition, Sayyid Ahmad himself had introduced a further reformed mystic order which he called *Tariqah-i-Muhammadiyah** This *Tariqah,* in fact, was the logical

culmination of the spirit of reform introduced into Indo-Muslim mysticism two centuries earlier by Shaykh Ahmad Sarhindi. Shaykh Ahmad's *Tariqah-i-Mujaddidiyah* aimed at guiding the steps of mysticism back to *Shari'ah* and Sayyid Ahmad's *Tariqah-i-Muhammadiyah* stood for nothing less than taming the *leviathan* of Sufism with the loop of *Shariah"*.[5]

Shah Ismail Shahid who became a co-sponsor of *Tariqah-i-Mithammdiyah* movement, wrote in his '*Abaqat:* "those people [who have over-stepped the limits of *Shari'ah* in their mystic path] have themselves untied the loop of *Shari'ah* from their necks, so they cannot be regarded as *AM al-Sunnah* by any means though some of them claim to be so. Rather, the *Ahl al-Sunnah,* in reality are the Companions [of the Prophet] and those who followed them".6 Moreover, while Sayyid Ahmad was undergoing training in mysticism under the guidance of Shah Abd *al-Aziz* and had reached the stage of *Tasawwur-i-Shaykh* or *Shughl-i-Barzakh* which is the highest object of love, he entreated Shah Abd al-Aziz to absolve him of this idolatrous performance and got exemption from it [7]. It can thus be called, in the terminology of Dr. Fazlur Rahman, a type of neo-Sufism *par excellence* * which was indeed, a concomitant of the Islamic revivalism of the 18th and 19th centuries A.C. and on account of its uncompromising stance, it also became suspect with many conservative *Ulama* and *Pirs* who regarded it as a veiled attempt to sabotage Sufism altogether.

In fact, *Tariqah-i-Muhammadiyah* was not merely a mystic order but a complete way of life, Sayyid Ahmad was often heard to say that *Tariqah-i-Muhammadiyah* was "the path of Muhammad which required its votaries to do everything they could for the sake of the pleasure of Allah alone, whether staying at home or travelling on the road, sitting or walking, sleeping or keeping awake, eating or drinking, one ought to aim at obeying the command of Allah and winning His pleasure, one ought to maintain himself and his family with lawful earning, perform his prayers, keep the fasting, go for the pilgrimage to Makkah and so on and so forth.[9]

Secondly and thirdly, *Tariqah-i-Muhammadiyah* proved a concourse of two somewhat analogous religious revivalist trends, both

arising from the reformist tradition of Shah Wali Allah Muhaddith Dehlavi and his son and successor Shah 'Abd al-'Aziz. One of the two trends was carried on by Shah Wali Allah's grandson Shah Ismail, [10] in collaboration with Mawlana 'Abd al-Hayy Phulti," which emphasized the uncompromising monotheism of Islam, revival of the *Sunnah* or pristine Prophetic tradition, and the principle of preferring *Hadith* or Prophetic tradition to the prescriptions of *Fiqh* or schools of Law. It further advocated the revival of *Ijtihad* or fresh systematic thinking for deciding all problems facing the Muslim community, opposed *Taqlid* or blind imitation of Imams, and called for purging Muslim society of *Shirk* or polytheistic accretions and *Bid'at* or sinful innovation [12]. There is reason to believe that Shah Isma'il had begun preaching these reformist ideals at the Jami Masjid of Delhi as early as C.E. 1810.[13] These ideals later crystallized in his *Taqwiyat-ul-lman* [u] whose close resemblance to Shah Wali Allah's *Tuhfat al-Muwahhidin,* coupled with its radicalism and vehemence in denouncing *Shirk* and *Bid'at* and, at the same time, the absence of warlike ideas of Sayyid Ahmad in it, [15] make it evident that the ideas expressed in it were Isma'il's own. According to one report, on the completion of this work, Isma'il submitted it to a gathering of 'Ulama' including Sayyid Ahmad and 'Abd al-Hayy for approval [16] which lends support to our contention.

The above standpoint was fully shared by Mawlana 'Abd al-Hayy Phulti with Shah Isma'il and both of them conscientiously maintained it to the end of their lives. Interogated by a group of '*Ulama*' in C.E. 1824, as to whether they were followers of *Hanafi* school or not, 'Abd al-Hayy replied on behalf of both: "I am in the fold of *Hanafi* school like Tahawi and Karkhi in point of fact which is proved by a reliable Prophetic tradition *(Hadith)* and do not act blindly like the nightly wood-gatherers (who cannot distinguish the dry from the raw). ''

It is interesting to note further that the above reformist ideas of Shah Ismail corresponded in toto to the classical creed of *Ahl-i-Hadith,* which were in fact resuscitated from the Quran and by Shah Wali Allah in his *Hujjat Allah al-Balighat.*[18] This trend was, thus, a theoretical elaboration or further development of the puritanical aspects of Shah Wali Allah's reformist tradition, which was

separated by Shah Ismail from the concourse in order to make it emerge independently as the *Ahl-i-Hadith* movement in Indo-Pak Bangladesh subcontinent.[19]

The other trend of the concourse was developed by Sayyid Ahmad Shahid [20] himself, partly by taking advantage of his close association

with Shah 'Abd al-Aziz son of Shah Wali Allah, and partly by exercising his own inborn genius for mystic perception. By exerting his *intuitive* faculty to the fullest extent under the guidance of Shah Abd al-Aziz and through hard striving and good faith, he also arrived at a position similar to that of Ismail and Abd al Hayy as expressed in a brief epistle, which was widely circulated among his disciples. Sayyid Ahmad says:" The main purpose of becoming a disciple of a mystic guide is to win the pleasure of God and the pleasure of God cannot be had but by following the *Shari'ah* of Prophet Muhammad (may peace and blessings of Allah be upon him). And the *Shariah* of Prophet Muhammad (may peace and blessings of Allah be upon him) is based on two things: first -abstention from polytheism *(shirk)* and second - abstention from sinful innovations *(bid'at)"*.

The explanation of the 'abstention from polytheism' is that, any one whether he be angel, a jinnee, mystic guide, disciple, teacher, student, prophet or saint, must not be looked upon as having the power to remove your difficulties and woes or as able to bestow benefit (upon you). Rather, all of them must be considered weak and impotent like yourself before the power and knowledge of Allah. And one should never seek to satisfy one's wants by votive offerings to the prophets, saints, and men of piety or angels. Of course, one may believe in their acceptability [or nearness] to Almighty Allah. But the advantage that accrues therefrom in the path of winning the pleasure of Allah, they [or their example] might be humbly followed. They must be regarded as guides in the path of faith, but not as able to control the calamities of the time and the forces of nature, known and unknown. To do this is sheer infidelity and polytheism.

"As regards 'abstention from sinful innovations', it means that in all lypes of worship and in all dealings pertaining to the worldly affairs as well as that of the Hereafter, one ought to hold on to the path of Muhammad, the seal of all prophets (may peace and blessings of Allah be upon him) with all the power and courage one has in one's command. And the (bad and superstitious) customs and usages invented by the people after the Prophetic age, such as those of merry-making, wailing, decorating graves and erecting tombs over them, extravagant spending on '*Urs* (or death anniversaries of *Pirs),* or preparing

Ta ziyah (or the effigy of Husayn's tomb at the time of *Muharram)* and the like, must not be practised. One ought to strive to the utmost to abolish them; first, one ought to keep oneself away from them and then one should try to persuade one's fellow Muslims to do the same.

Because, it is obligatory to obey the *Shari'ah*, as such to command the good and to resist the evil is also obligatory.

While around C.E. 1810, Shah Ismail waged a relentless war against superstitious beliefs and idolatrous practices of his co-religionists, Sayyid Ahmad tuned his gaze inwards to the depth of his own mind in mystic contemplation; then from 1810 C.E. onwards he laboured hard in the army of Amir Khan, and finally in 1818 C.E. they crossed each other's road at Delhi. But Ismail and Abd al-Hayy, though much more learned than Sayyid Ahmad in the theoretical sciences of religion, yet soon both became his disciples, which brought the two trends, one theoretical or academic *(ilmi)* and the other practical *(amali)* flow into a concoufse that gave birth to the *Tariqah-i-Muhammadiyah* movement.

It may also be noted that Shah Ismail and Mawlana Abd al-Hayy were by all standards top ranking *Ulama* of the time and their conversion to Sayyid Ahmad 's discipleship captivated the popular imagination and was largely responsible for the meteoric popularity of the movement. *Al-Sirat-ul-Multaqin* is regarded as the most authentic exposition of *Tariqah-i-Muhammadiyah,* which was composed jointly by Ismail and Abd al-Hayy by way of elaborating the reformist ideas of Sayyid Ahmad Shahid as dictated to them. As such, it is an eloquent testimony to the high degree of integration between the two trends. In this work, Sayyid Ahmad explains the process of initiation or *bay' ati-i-tawbah* thus: "First of all, the seeker of this path *(rah-i-nabuwwat)* ought to attend to the prohibitions of the *Shari ah* relating to faith, action, morality,

instinct, desire and prayer. He must seek and find out (the rules) from the Qur'an and Prophetic tradition *(Hadith)*. If he possesses knowledge of the Quran and *Hadith,* he must find them out himself; or else, he must enlighten himself by the opinions of the learned scholars of *Hadith."*

The forth strand, which soon became the dominant passion of Sayyid Ahamad Shahid and his followers, was religio-political in nature. The process of the growth and development of this trait is quite instructive. *Tariqah-i-Muliammadiyah* movement had taken its birth as a form of neo-Sufism aimed at bringing the Muslims back to the true path of Islam and purging Muslim society of un-Islamic customs and usages. In the beginning, Sayyid Ahmad and his followers remained absorbed in preaching, prayers and meditation in pursuance of the above goals. But during the second and third phases when Sayyid Ahmad was staying at Rai Bareilly, it underwent a series of

developments. At first, Sayyid Ahmad embarked upon a programme of *Ihya-i-Sunnat* or revivification of prophetic tradition. Addressing a gathering on one occasion, he said :'It is not Islam to profess by word that I am a Muslim or to eat beef, practise circumcision or (even) to participate in the customs and ceremonies of the Muslims; but Islam is to carry out the commands of Allah with a sincere heart".

In this context he launched a mass campaign for the remarriage of widows which was regarded as sacrilegious by the Muslims of the subcontinent (with the exception of Bengal) due to the influence of Hinduism. Then he drew the- attention of his followers to the Islamic injunctions for waging *jihad* and ordered them to pass the greater portion of their time in learning the tactics of war. Asked about the relevance of militant exercises to his avowedly *Sufi Tariqah* or mystic path, he explained: "the time for that task comes after this task has been accomplished".

Thus, the initial religio-moral action had attained the momentum of a political activism, which lies inherent in the pristine doctrine of Islam. An eminent Muslim scholar has recently pointed out that the revival of interest in *Hadith* and orthodox teachings of Islam is bound to accentuate the spirit *of jihad* and Islamic activism, not only because of the fact that, the doctrine of *jihad* lies permanently enshrined in both, but also on account of the fact that, the actual example of the Prophet and the early community teaches a positive participation in the affairs of life as well as effecting changes in the existing state of affairs.

Under almost suffocating despondent social, political and religious circumstances of the Muslims obtaining at the time, the *elan* of this Islamic activism got directed into political channels and sought to create an ideal political state as a paradigm of the classical Islamic state of Madinah. Stray materials at our disposal also suggest that the growth of this political aspect of *Tariqah-i-Muhammadiyah* was partly encouraged by the general economic depression, which enveloped the Muslims of the subcontinent during the 18th and 19th centuries C.E.

The intents and purposes of *Tariqah-i-Muhammadiyah* movement being rooted in the reformist tradition of Shah Wali Allah and Shah Abd al Aziz, we may look further into that tradition to ascertain the precise relationship between the two. It may be recalled that as early as C.E. 1732 Shah Wali Allah dreamt a sombre dream at Makkah wherein he found himself as Director of the Epoch (Qaim- uz-Zaman) who reflected the mood of the Creator and through whom Allah's guidance descended on the destiny of the universe. The decadence of the Mughal empire in the Indo-Pak-Bangladesh subcontinent and the consequent

threat of depredation of the centres of Muslim power by the Jat and Maratha hordes, had so much overwhelmed his mind that in that vision he saw many Muslim towns and cities, including Ajmer, fall into the hands of the marauding infidels and their acts of sacrilege incurred the wrath of Allah, which flashed into the countenance of Shah Wali Allah and through him it flashed into the faces of the mammoth gathering in the midst of which he was standing:

'What is the command of Allah at this moment?'

They inquired of him.

"Destroy all order', [32] he replied.

"Till when?" They cried.

Until no wrath is visible in my face," he cried back.

They rushed at one another's throat and there ensued a mutual fight. Shah Wali Allah then, followed by the mob, which included Turks,

Uzbeks and Arabs, sallied forth in a holy war[33] against the infidels, overtook and vanquished them and liberated the country up to Ajmer.[34]

Although this was a fantasy, the spirit of revolution and *jihad* (the former directed towards the rank and file of the Muslims themselves and the latter against the enemies of the Muslim community), that is discernible therein, continued to be a strong undercurrent in his thought for the three more decades that he lived under extremely agonising circumstances which then obtained in Delhi. The misfortunes and calamities that overwhelmed the Mughal capital during this period (C.E. 1732-1762) had made life unbearable, [35] which according to Klialiq Ahrnad Nizami, lacerated Shah Wali Allah's heart and seared his soul. [36] "The stars, twinkling in the darkness," he wrote in a couplet, "appear to me (like) the eyes of serpents and stings of scorpions."[37]

But in actuality, Shah Wali'Allah found the Muslim society of this subcontinent incapable of waging *jihad.* Because, on the one hand, the seed of degeneration, decay and disintegration had gone so deep into the Mughal society that he suspected it to have been suffering from *Akilat,* [38] a disease that corrodes the bones; and on the other, the Delhi Badshahi, and for that reason, the powerful Nawabdoms and Ministerships which were the repository of actual power, were a far-cry from the "just and balanced society" based on '*adl* and *tawazun,* which, in his opinion, was demanded by Islam and which alone could provide a strong political structure capable of waging *jihad?*[9] He, therefore, endeavoured without rest to awaken the slumbering Muslims and to enthuse them to build up a "healthy society free from all moral abuses

and economic distemper" in order to overcome the Jat and Maratha perils, which he not only dreamt of but was also able to sensibly visualize. ^

In this context, being disgusted with the imitative habits *(taqlid)* of the *Ulama,* he asked them not to get lost in Greek sciences, and grammar and rhetoric; but to pay due attention to the Qur'an and *Sunnah,* which were the real base of religion. [41] Addressing the kings, he advised them to unsheathe their swords and not to put them back into the scabbard until Allah decided the affairs between the believers and the polytheists and until they had implemented the laws of Islam.[42] He urged upon the Ministers to introduce economic reform and to check chaos and confusion with a view to ensuring peace and prosperity of the people. [4^] Turning to the administrators *(Umara),* he reminded them that the power wielded by them "is meant for reforming the conditions of the territories put under their charge and not meant for gaining selfish ends or for rebelling against the Sultan. ** He then goes on to say: "O, the administrators! Don't you fear Allah? You remain busy in fleeting objects of enjoyment and leave the people to devour one another! Drinking of wine goes on openly and you don't stop it! Dens and quarters are being set up for prostitution, drinking and gambling, and you feel no qualms of conscience! How is it that the criminal laws *(hudud)* were never implemented in the big cities (of this country) for the last six hundred years or more; whomsoever you found weak you exploited him and whomsoever you found strong you left him and his arrogance alone! Your minds remain engrossed in the thought of delicious food, delicate women, luxurious dress and palatial buildings! You never raise your hands towards Allah nor mention His name except in tell-tales as a mere word of your mouth, as if you intend to bring a great revolution (simply) by invoking His name![45]

Addressing the soldiers, he declared that Allah has brought them forth for *jihad:* so that, they might raise the truth aloft and put polytheism and the polytheists down. "But you put aside the cause for which you were brought forth" and take to soldiery as a profession and as a means of amassing wealth. He advised them to immerse themselves in the spirit *of jihad,* to acquire Islamic values and Islamic habits and to become dedicated soldiers of Allah [46]. He asked the artisans to shun corruption, to be honest in their dealings with their fellow beings and to be dutiful towards Allah. Likewise, he advised the Muslims in general to reform their character, to keep up sexual morality, to cultivate fear of Allah and to follow the commands of Islam .[47]

But failing to rouse them sufficiently enough to the gravity of the situation even when the Marathas struck in full force and overran Delhi in August -September 1757, [48] Shah Wali Allah invited the Afghan king Ahmad Shah Abdali to come to the help of Indo-Pak

Muslims .[49] The Panjab was wrested earlier by the Sikh chief Jassa Singh from the hands of Ahmad Shah's son Taimur Shah in C.E. 1756-57.[50] But now having brought Najib-ud-Dawlah to his knees and placing Delhi in the friendly hands of Imad ud-Dawlah, the Maratha chiefs, Raghunath Rao and Malhar Rao marched to the Panjab and conquered it from the Sikhs up to Attack in April 1758; and thereafter expelling the Sikhs also from Lahore they made the wily chief Adina Beg Khan its governor by whose treacherous activities first the Sikhs and then the Marathas had greatly benefited. But on Adina Beg's sudden death a few months later in October 1758, a Maratha, Sabaji Sindhia, was appointed in his place [51] and the Panjab became a part of the Hindu *pad-padshahi* of the Marathas. It gave added reason to Ahmad Shah Abdali to march on India for the fifth time and to crush the Marathas in the third Battle of Panipatin 1761.

Some scholars view the Battle of Panipat as the fulfilment of Shah Wali Allah's dream at Makkah. But the victory won by Abdali at this battle, though crucial and historic, proved a shallow one in the long run. It resulted neither in the consolidation of his own power over India nor in the recuperation of the strength of the Mughal. Rather the long presence of his troops on the side of the rickety throne of Delhi caused serious disruption in the rank of the dissident and intriguing Mughal nobility at the semi-independent provinces, which precipitated the fall of Bengal into the hands of the East India Company [52] and helped the rise of British and Sikh powers in this subcontinent.[53]

The above trend of Shah Wali Allah's thought, which revolved round the idea of *jihad* conceived narrowly as a war against the infidels, represented only a speculative undercurrent in his mind, which was caused more by the instinct of survival than by ratiocination. In his reasoned and systematic thinking, he viewed *jihad* in the pristine Qur'anic sense as "exertion in the way of Allah" which according to him takes "divers forms" depending on changing circumstances. "The major and most significant part of it," he says, "is right guidance of the people *(hidayat al-nas)* in their inner and outer life," for the accomplishment of which Prophets had been sent. "And every *jihad* involves utmost endurance and fortitude before Allah's help is expected."[54] Moreover, he believed in a theory of the "spirit of the age" which changes from era *(dawrah)* to era in accordance with the

universal moral principle of "salutary purposiveness" *(maslahah)* and the demand of the age.[55] In this perspective, he further believed that the spirit of the era in which he was living did basically demand neither fighting *(harb)* nor cultivation of physical sciences, such as astrology, astronomy *(al-najum wa'l-hai'ah)* etc, nor even researches in the technology or engineering and architecture *(al muhindisah wal-mi-mariyah)* but a moral regeneration on the bedrock of the knowledge of realities *(asrar)* underlying the creation and development of the universe and mankind .[56] He therefore laid the utmost emphasis on the acquisition of true knowledge and revival of the spirit of inquiry or *ijtihad*[57] and he saw the right guidance which constitutes the means to the attainment of the *summum bonum* of human life poised in a healthy balance between the two poles *of jihad* and *ijtihad,* that is to say, between physical and intellectual exertion. In *Tafhimat-i-Ilahiyah,* he says that if he were to live at a time when circumstances demanded warfare for the reformation of the humanity, he would have done it with utmost care .[58]

This poise or equilibrium was scrupulously maintained by Shah Wali Allah and his son and successor Shah Abd al-Aziz even to the point of rupture. Under what precarious circumstances and mental agony Shah Abd al Aziz passed his latter life is depicted in his Arabic poetry:

"But I see the infidels masters of affluence (Who) disrupted (the country) from Delhi to Kabul. They have raised the evil- doers over the good soul among us; And every evil person got the gut of a challenger." ' May Allah turn upon the Sikhs and Marathas With quick requital for their evil deeds. In our behalf."

This country has become desolate and devoid of justice. After this, is there any giver of refuge to the seekers? And is there any just and Allah-fearing person to come to their rescue?"[59]

The position of the Muslims east of Delhi had become equally precarious. Replying to a question as to whether a *Dar-ul-lslam (*abode of Islam) can change into *Dar-ul Harb* (abode of war) Shah Abd al-Aziz deemed it fit to make the following supplemetary remarks: "And the ordinance and laws of *shari'ah* are not in force in this country (Hindustan); rather the Law of the English Government is in force; that, the running of the administration, settlement of the peasantry, collection of land revenues, imposition of custom duties, punishment of robbers and thieves, settlement of disputes etc. are carried DII by the ruler of the infidels in accordance with their own laws It matters little if they make no objection to holding (congregational) prayers of *Juin'ah*

and *Ids* and to the prayer call and slaughtering of cows etc; because the government administration (deliberately) overlook things. But under the protection of their laws they also demolish mosques as they please. Nc traveller can enter this country without obtaining Passport and permission from these present rulers of this country. And for their *own* interest they do not object to the entry of travellers and merchants, but such important personages like Shuja-ul-Mulk and Velayeli Begum cannot enter this country without the permission of the English Government. Rather the control of the English Government extends from here (Delhi) to Calcutta."[60]

Thus, by the early decades of the 19th century, the rotten fabric of the Mughal Empire had crumbled down throughout the Indo-Pak subcontinent under the weight of its own vices.[61] The course of events had made it impossible for the Muslims to recover their power by means of the usual internal revolution. The movement of *ijtihad* and moral regeneration launched by Shah Wali Allah fell on the deaf ears of a blind folded conservative society. No alternative was, therefore, left before the tiny groups of enthusiasts for reform that gathered around Sayyid Ahmad Shahid except to carry on war, if they wanted to rehabilitate the Muslim society on its original footing. Little wonder, therefore, that the final appearance of Sayyid Ahmad before Shah 'Abd al-Aziz in C.E. 1818 as a "soldier of Islam," was considered Providential. In a letter, Shah 'Abd al-Aziz (d. 1823 C.E.) commended Sayyid Ahmad to Munshi Na'im Khan as Godsend and as one of the blessed and chosen mediums through whom the regeneration of mankind is to be effected by the Providence. "May Allah shower benefits on the Muslims through him!" he prayed.[62]

The *Tariqah-i-Muhammadiyah,* which shaped itself into an Islamic revivalist movement emphasizing the need of (i) reviving the Prophetic tradition, (ii) socio-religious reform, (iii) *jihad* and (iv) *ijtihad,* was, therefore, a revolutionary outcome of the reformist tradition of Shah Wali Allah.

References

1. In fad, the followers of Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab disliked the epithet 'Wahhabi' and called themselves 'Muwahhidun' or Unitarians and nowadays they call themselves 'Salafi'.
2. See *History of the Fara'idi Movement in Bengal* by the present writer, Karachi, 1963 pp. XXXI-XLI, for a detailed discussion.
3. He lived from C.E. 1564 to 1624 and was popularly known a *Imam Rabbani Mujaddid-i-Alf-Thani,* i.e., the great reformer of the second millennium of Islam.

4. For a detailed discussion, see our *History of the Fara'idi Movement, op. cit.*, p. XXXVII.
5. See below.
6. Abu Yahya Imam Khan Nawshahrawi: *Tarajim-i-'Ulama'-i-Hadith-i-Hind,* voL.I, p.105
7. Ghulam Rasul Mehr: *Sayyid Ahmad Sliahid,* Lahore, 1652, part I, pp. 76-77.
8. Dr. Fazlur Rahman: *Islam,* Weedenfeld and Nicolson, 1966, p.206.
9. Ghulam Rasul Mehr: *Sayyid Ahmad Shahid, op. cit,* part I, p. 130.
10. Shah Muhammad Isma'il, son of Shah 'Abd al-Ghani, son of Shah Wali Allah. He was born in C.E. 1718 and fell as a martyr at Balakot, in the modern district of Hazara in C.E. 1831 along with Sayyid Ahmad Shahid. See a *Bibliographical Introduction to Modern Islamic Development in India and Pakistan,* by the present writer, Asiatic society of Pakistan, Dacca, 1955, and p.SOff.
11. Mawlana 'Abd al-Hayy Phulti was a student, disciple and son-in law of Shah 'Abd al-Aziz, son of Shah Wali Allah. See Ghulam Rasul Mehr: *Jama 'at-i-Mujahiddin,* Lahore, 1955, pp. 111-118.
12 The distinction made by some scholars between Shah Isma'il and Mawlana, 'Abd al-Hayy claiming that the former maintained a negative.attitude towards Ihe idea of following any particular school or *madhhab* and the latter clung to the *Hanafi* school would prove untenable in view of the evidences produced below.
13. Mirza Hayrat Dehlawi: *Hayat-i-Tayyiba,* Lahore, 1940, p. 61 ff. Mirza Hayrat has greatly romanticised the achievements of Shah Isma'il. But we have other evidence 10 support the point as would be seen below.
14 I or particulars about this work, see *A Bibliographical Introduction to Modern Islamic Development in India and Pakistan, op. cit.*, pp. 54-55.
15. *Ibid.*
16. Hafiz Aziz al-Din Muradabadi, *Akinal-ul-Bayan fi'Ta'id-i-Iman,* Lahore, 1965, p. 10.
17. *Ibid.*, p. 13.
18. See also article of the present writer "Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad," *Journal of the Pakistan Historical Society,* Karachi, vol. VII. part III. 1959, pp. 165-94 reprinted in Chapter 3 above.
19. For an analysis of this process see our *History of the Fara 'idi Movement, op. cil.*, pp. LHff.

20. Sayyid Ahmad Shahid was born at Rai Bareilly in C.E. 1786 and fell a martyr at Balakot in C.E. 1831. See *A Bibliographical Introduction to Modem Islamic Development in India and Pakistan, op. cit.,* pp. LII. ff.
21. Hafiz ʻAziz al-Din Muradabadi: *Akmal-ul-Bayan, op. cit.,* pp. 842-45.
22. Ghulam Rasul Mehr: *Sayyid Ahmad Sliahid, op. cit..* Part I, pp. 82-113. ʻ
23. *Ibid.,* pp. 116-118.
24. *Ibid.,* p. 142.
25. *History of the Fara'idi Movement, op. cit.,* p. XLI.
26. From June 1819 to August 1821. See Ghulam Rasul Mehr: *Sayyid Ahmad Shahid, op. cil.* Part I, pp. 127-32.
27. *Ibid.,* p. 143.
28. *Ibid.,* p. 146.
29. Widow remarriage never posed a problem among the Muslims of Bengal.
30. Ghulam Rasul Mehr: *Sayyid Ahmad Shahid, op. cil.,* Part I, p. 140.
31. Dr. Fazlur Rahman: *Islam,* op. cit., p. 211.
34. Shah Wall Allah: *Fuyuz al-Haramayn,* ʻ44th *Mushahida':* see Urdu edition by Prof. Muhammad Sarwar, Lahore, 1947. pp. 297-99; and Arabic edition, p.89 quoted by Ghulam Husayn Jalbani: *Shah Wall Allah ki Ta'lim,* Hyderabad-Sind, 1963, p. 110.
35. *Tarikh-i-Mashaykh-i-Chishti,* p.331, quoted by Khaliq Ahmad Nizami in *History of Freedom Movement,* Pakistan Historical Society, Karachi, 1957, Vol.1, p. 515.
36. *History of the Freedom Movement, op. cit., p.* 515.
37. *Ibid.,* ft. n. 4 for Arabic text.
38. *Ibid.,* pp. 526-27; see also p.520.
39. *Ibid.,* pp. 519-21.
40. *Ibid.*
41. Shah Wali Allah: *TaJhimat-i-Ilahiyah.* Vol. I, pp. 214-15.
42. *Ibid.,* pp. 215-16.
43. See IChaliq Alimad Nizami in *History of the Freedom Movement., op. cit.,* Vol. I, pp. 527-28. See also, *Sliah Wali Allah Dihlavi ke Siyasi Maktubat,* ed. Khaliq Ahmad Nizami, Aligarh, 1950, pp. 58-89.
44. Shah Wali Allah: *Tafhimat-i-llahiyah,* Vol. I, p. 216.
45. *Ibid.*
46. *Ibid.,* pp. 216-17.
47. *Ibid.,* pp. 217-18.

48. Dr. R.C. Majumdar *et al: Advanced History of India,* p. 548.
49. Khaliq Ahmad Nizami ed.: *Shah Wali Allah Dihlvi ke Siyasi Maktubat.* Aligarh, 1950, pp. 45-58, Persian text, 97-114 Urdu translation.
50. Syed Muhammad Latif: *Lahore,* published in 1892. p. 78.
51. *Ibid.,* and Majumdar: *Advanced History of India, op. cit., p.* 548.
52. Dr. M. Mohar 'Ali, "The Background of the Battle of Plassey". *Journal of the Asiatic Society of Pakistan, Vol.* XI, No. 3. Dec. 1966, pp. 37-70. (Dhaka)
53. Majumdar: *Advanced History of India, op. cit.,* p. 542.
54. Shah Wali Allah: *Tafliimat-i-llahiyah,* Vol. II. p. 103.
55. *Ibid,* Vol. I, p. 101: see also the article of the present writer: "Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad," *Journal of the Pakistan Historical Society,* Vol. VII, Part III, 1959, p. 165 ft", reprinted in Chapter III above.
56. See our article "Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad," op. cit., p. 165 ff.
57. See Shah Wali Allah's *Tafhimat-i-llahiyah,* Vol. I, p. 152; *Hujjat Allah al-lialighah.* the Muqaddamahs; and '*Iqd al-Jid* (the whole treatise is on this subject). For a detailed discussion, see our article: "Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad," op. cit., p. 165 ff. (Reproduced above)
58. *TafhimatIlaltiyah,Vo\.l,* p. 101.
59. Abu Yahya Imam Khan Nawshahrawi: *Tarajim-i-'Ulama'-i-Hadith-i-Hind,* p. 58.
60. *l-'atawa-al-'Aiiiiyah* (Urdu translation), Hyderabad-Deccan, 1313 Hijri., pp. 51-55.
61. See *History of the Freedom Movement, op. cit.,* p. 575.
62. *Risalah-i-Jihad* (MS. Persian), collected by Islamic Research Institute, Islamabad, Pakistan, pp. 16-17

Source: Islamic Revivalism, Chap-4, Page-100-115.

Sayyid Ahmad Shahid's Campaign Against the Sikhs

Prof. Dr. Muin-ud-Din Ahmad Khan

Sayyid Ahmad Shahid, the founder of the *Tariqah-i-Muhammadiyah* movement, was born at Rai Bareilly in U.P. in India, in H.1201, C.E. 1785.[1] In his early boyhood he showed little attachment to the rigors of academic discipline; rather, he found more interest in games, sports and physical exertion.[2] Nevertheless, through conscious and repeated efforts in his youth, he succeeded in acquiring some amount of proficiency in Persian as well as Arabic languages under the guidance of Shah 'Abd al-Qadir, son of Shah Wali Allah Muhaddith Dehlavi.[3] "This was followed by training in mysticism which he received at the hands of Shah 'Abd al-Aziz Muhaddith Dehlavi, the eldest son of Shah Wali'Allah, who initiated him into the mysteries of all the fourth populer *Sufi Tariqahs* of the time, namely, *Qadiriyah, Chishtiyah, Suhrawardiyah,* and *Nakshbandiyah.* He later founded a new mystic order, which he called *Tariqah-i-Muhammadiyah* or the path of Muhammad in which he attempted to effect a combination *ofShari'at* and *Tariqat.*[4]

After his education and training at Delhi, he return to his native town, Rai Bareilly, about C.E. 1809 (H. 1222 -1223)[5] where he remained three and a half years. Then he joined the army of Amir Khan [6] and passed about six years in millitary survice as the Imam, but parted company with him on the latter's acceptance of the Nawabship of Tonk under British suzerainty in December 1817.[7] From Tonk he proceeded to Delhi and arriving there in the middle of 1818, presented himself before Shah 'Abd al-Aziz, with whose blessings he soon started his *Tariqah-i-Muhammadiyah* movement.

To begin with, it was a campaign for introducing religious reform in the Muslim society. Soon, however, it assumed a socio-political character and after a short while flared up into *Jihad* movement for liberating in the Muslims from the tyranny of the Sikh ruler, Ranjit [illegible] of the Punjab.[9]

From November 1818 to May 1819, he toured different parts of U.P. and Delhi and people came out in surging waves to welcome him and hundreds of thousands became his disciples.[10] Then returning to Delhi, he took leave of Shah 'Abd al-'Aziz and proceeded to his native town Rai Bareilly. He arrived there in June 1819 C.E. and made it the headquarters of his reform movements." In August 1821, he went on a pilgrimage to Makkah accompanied by about 400 followers *via* Calcutta, visiting different places of Bihar and Bengal on the way."[12] Indeed, at Patna and Calcutta people flocked around him in such a vast number that the religious aspect of his reform movement may be said to have reached its zenith there.[13] Finally, in February 1822 C.E., the pilgrim party set out from Calcutta *via* Bombay to Jiddah and having spent about one year in Arabia sailed back through the same route and arrived at Calcutta in October 1823 and reached Rai Bareilly in April 1824 C.E. [14]

After returning from *hajj,* he remained at Rai Bareilly for one year and nine months before setting out once again on a *hijrat* or migration in January 1826 C.E.[15] It is said that even before going for the pilgrimage to Makkah, Sayyid Ahmad decided to migrate from Hindustan, which was then under the occupation of the British, to some independent Muslim land as a first step towards waging a *jihad* or holy war against the usurpers of Muslim territories.[16]

In his famous letter to the ruler of Bukhara, despatched in the middle of 1827 from the North-West Frontier, he says that he was so pained to see "the evil-natured Christians and bad-intentioned polytheists" usurping this subcontinent from end to end and to witness the humiliation of the Muslims, destruction of their political authority, suppression of the rules of the *Shari'ah* etc., that his heart became filled with a longing for migration *(hijrat)* from Hindustan. At this point, however, he says that his attention was diverted and he went on a pilgrimage to Makkah; and he would not have returned from the tranquillity of mind and the blessedness of the holy places of Makkah and Madinah to this country but for the divine beckoning bidding him to wage *jihad* in order to eliminate infidelity and anarchy. "I have been commanded", he further asserts, "to raise aloft the Word of Allah, to revive the *Sunnah* (or tradition of the holy Prophet), and to eliminate the (power of) rebellious infidels". He then claims that with these objects in view, he bade farewell to his native land and took to the path of *hijrat;* and travelling through Hind, Sind and Khurasan, preaching the true doctrines of religion and spreading the good tidings *of jihad* and also followed by a large number of sincere believers, he finally

arrived at the lands of Yusufzai in the North-West Frontier of India and planted the flag of *jihad therein."*

As noted above, his journey of *hijrat* began in January 1826 C.E. Leaving his family behind [18] and accompanied by about 500 or 600 patriots, [19] Sayyid Ahmad first proceeded to Gwalior and thence to Tonk where the party stayed for one month.[20] From there he moved through Ajmer, Pali, Suraha, Jodhpur and Khathiawar to the independent Muslim principalities of Sind.[21] Most unexpectedly, Sayyid's party came under the suspicion of the Mirs of Umarkot and Mirpur, but was well received at Hyderabad and Pirkot. At Shikarpur, the party again faced hostilities of the local Muslim Princes but later reconciliation was effected.[22] Then braving the terrible heat of the summer, the party inarched through Jagan, Khangarth, Bhag, Dhadar and Bulan Pass to Quetta. From Quetta, the party entered into Qandahar and, passing through Ghazni and Kabul, arrived at Peshawar about the 10[lh] November 1826. For going to the Frontier from Rai Bareilly, Sayyid Ahmad had to take to this round-about way and cover a distance of about 2, 500 to 3, 000 miles;[23] because his intention to wage a holy war against the Sikhs of the Panjab, which was also the motive behind his *hijrat,* having been alreadz known, it was not possible for him to pass through the shorter route *via* Lahore and Rawalpindi, through which the distance between Rai Bareilly and Peshawar would have been reduced to about 800 miles only.

Still denying to himself and his followers the comforts of rest, he moved out of Peshawar after four days' stay in order to take position at a more strategic point at Charsadda.[24]

Within a few days of his arrival at Charsadda, it however became known that Budh Singh, a Sikh General, sent by Maharaja Ranjit Singh for intercepting Sayyid's party, was marching with a large army towards the place. Moreover, Amir Khan Khattak, the Chieftain of Akora Khattak, came to Sayyid Ahmad simultaneously with the intriguing news that his nephew (brother's son) Kliwas Khan had alreadz gone over to the Sikhs. He counselled quick action in order to restrain the local people from joining hands with the enemy, and on his advice, Sayyid Ahmad decided to proceed at once to Nowshera with the object of blocking Budh Singh's way across the Kabul river. On his arrival there, on the 19th December 1826, he found that the Sikhs had alreadz entered through Khairabad into Akora and pitched their camp on the western bank of Kabul river (where the river is locally called Londe), at a distance of about 8 miles from Nowshera. Thus was set, most abruptly, the stage for the first encounter between the two parties.[25]

The above evidence leaves us in little doubt as to the targets of Sayyid Ahmad's *jihad.* The excerpts from his letter quoted above take away all the force from the controversy created by Sir Syed Ahmad Khan and Mawlana Ja'far Thanisari that Sayyid Ahmad's sole aim was to fight the Sikhs and not the British Government or the East India Company. [26] Rather, it clearly points out that he had decided seriously to wage a holy war against "Christian" as well as the Sikh usurpers of Hindustan at the time of his pilgrimage, and on his return from Makkah, he made the Sikhs of the Panjab his first target. This is not to deny that he had entertained the idea *of jihad* somewhat vaguely since long before. During his stay at Rai Bareilly from June 1819, he laid considerable emphasis on the necessity of acquiring the art of warfare, and towards the close of this period, he declared that the waging *of jihad* against the enemies of Islam was a supreme duty of every Muslim, so much so that, the accomplishment of the aims *of jihad* was the prerequisite of the peaceful spiritual meditation of the mystic.[27]

Aims of War

We have seen in the preceding section that Sayyid Ahmad Shahid not only decided to wage *a jihad* against the enemies of Islam in the Indo-Pak sub-continent but had also traversed thousands of miles to reach the North-West Frontier for the purpose of fighting the Sikhs, who had usurped the Muslim power in the Panjab under the leadership of Maharaja Ranjit Singh. One may, however, be reminded that *jihad* or war is not a child's play. Beside willingness of the warriors to fight, it requires expensive equipments, proper organisation, a constant source of supply of food, men and material, a thorough preparation, sustained practice, acquisition of tactical know-how and, above all, a careful planning and a well-formulated war-strategy. Again, war is a means and not an end in itself. Of all the means generally resorted to for the achievement of an object or resolving strife, war is an extreme measure, which by its very nature transforms a social, religious m into a political one. In the last analysis, war thus turns out, to be a political act; hence it is also legitimately guided by political principles. Moreover, the accumulated experience of war-lords ami generals in the history of mankind shows that to wage a war is very easy, but to win a victory is most difficult.

It may also be noted that initially Sayyid Ahmad was neither a military leader nor a general. He came out of the arm}' of Amir all alone and as more or less unimportant military persso reason to believe thai while serving Amir Khan, he passed his time more in

religious meditation than in mastering political manoeuvres and military strategy.[28] Moreover, materials at our disposal do not entitle us to make absolutely sure as to whether he was determined to fight the Sikhs of the Panjab before he left the army of Amir Khan or he decided upon such a course slightly later on.[29]

While Sayyid Ahmad Shahid was staying at Rai Bareilly before going on the pilgrimage, he had introduced some war-like exercises among his disciples, which received more emphasis until he left for Makkah in 1821.[30] After returning from the *hajj*, he passed a period of one year and nine months again at Rai Bareilly before he left for the *hijrat* in 1826.[31] Unfortunately, the paucity of data relating to this period leaves us almost completely in the dark regarding any military developments which might have taken place there at this time. In so far as Ghulam Rasul Mehr's meticulous efforts to collect data could uncover, we come across the first regularly organised military set-up of his followers at Gwalior where Sayyid Ahmad and his party stayed for about 10 days on the first leg of *hijrat* in C.E. 1826. Here the party of the *Mujahidin* were divided into companies and were put under the command of different leaders.[32]

But during his long stay at Hindustan following the hajj, the idea of *jihad* was widely propagated; so that the Sayyid's decision for *hijrat* was correctly understood by all as heralding a *jihad* against the Sikhs of entire Panjab. As a result, only such people came forward to accompany him as were both willing and able to fight. They numbered about 500 or 600 persons belonging to Hindustan, Bihar and Bengal, many of whom really were *Moulavis* or theologians. This whole lot of *Mujahidin*, however, came to be known as Hindustanis or *Hindustani* followers of Sayyid Ahmad, especially during their sojourn in the North-West Frontier. Beside the 500 or 600 Hindustanis, Biharis and Bengalis, Sayyid Ahmad also recruited about 270 Pathan patriots from Qandahar. These combined forces numbering about 800 or 900 men proved again and again the sole strength of Sayyid's party in times of field operations. Fortunately for Sayyid Ahmad, fresh arrivals from Bengal, Bihar and Hindustan continued to replace the martyrs and the disabled and kept the above size of the inner circle of the *Mujahidin* more or less constant with an occasional tendency towards slight increase.

Ghulam Rasul Mehr has drawn up an interesting account of Sayyid's experience at Qandahar. At his approach to the outskirts of the town on 1st December 1826, Sayyid Ahmad and his party were greeted by a small group of mounted guards headed by a representative of its

ruler, who escorted them to a garden lying at a distance of about a mile from the town of Qandahar. As Sayyid Ahmad was alreadz in correspondence with the rulers of Afghanistan, arrangement for his encampment there seems to have been made beforehand, and prominent citizens, renowned theologians as well as a large number of common men came out several miles from the town to greet the *Mujahidin*. Purdil Khan, the ruler of Qandahar, was not in a position to receive Sayyid Ahmad personally as his brother Sherdil Khan had died three days before. Hence, on the next day, Sayyid Ahmad paid a visit to Purdil Khan with a view to offering his condolences. Purdil Khan met him "with great love and expressed much surprise at his firm resolve *for jihad* in spite of the lack of men and material at his disposal".

Nevertheless, the masses began to flock around him in such numbers that Purdil Khan was taken aback. At first, he tried to restrain the people at the gates of the town; but this having proved ineffective, he sent an urgent message to his honorable guest requesting him to hurry away at the earliest opportunity. He informed Sayyid Ahmad that his people were preparing for *jihad* with so great an enthusiasm as to throw the peace and order of the realm into jeopardz. "You had better leave for Kabul without losing any time", he then entreated; "lest disaffection should grow between you and me". For this reason, the Sayyid had to leave Qandahar on the sixth day. Ghulam Rasul Mehr regretfully comments, "had Purdil Khan created no obstacles, a great army could have been raised by Sayyid Ahmad Shahid from among the Qandaharis". Yet a good many Qandaharis followed him to the next station entreating him to admit them into his party and they ultimately compelled him to recruit a few hundreds of them, as we have noted above, with the special leave of Purdil Khan.[34]

The contrast between the rousing enthusiasm with which Sayyid Ahmad was greeted by the masses everywhere in Bengal, Bihar and Hindustan on the one hand, and the cautious diplomatic welcome accorded to him by the independent Muslim rulers of Sind and Afghanistan on the other, was too conspicuous to scape his notice. Even regarding the native Princes of India, Dr. Mahmud Husain observes, "with the exception of Tonk no one of the Muslim principalities came forward to help him to any appreciable degree" in spite of the fact that these Princes did not hesitate in expressing their admiration for the sincerity and enthusiasm of Sayyid Ahmad and his followers."

An explanation for the poor response of the Princes, Mirs and Khans, sought to be gathered by different scholars in the inadequacy of their equipment for such an ambitious war, [36] seems rather

unconvincing. A close examination of available materials, on the other hand, points to the natural fear of the potentates towards the rise of a 'popular voice' as a more basic reason for their 'cautious indifference'. Taking a lesson from his experience at Qandahar. Sayyid Ahmad thought it prudent not to accept the invitation of the chieftains of Ghilzai clan, which had earlier extended its sway over the whole of Afghanistan and Iran, but was later vanquished by Nadir Shah, and had, at that time, fallen into disfavour with the ruling Barekzai clan of the Durrani tribe," which was not otherwise normally expected of him.

At Kabul, Sayyid Ahmad also got acquainted with the intricacies of power-politics and is reported to have said:

"This humble person stayed for about 45 days in that city with the hope that my endeavours might succeed in removing dissension and effect ing agreement (among the ruling Barekzai brothers of Afghanistan); but at the end, I gave up this pursuit and left the city."[38]

At the end of his long journey, no sooner did he set his foot on Charsadda than he stepped upon deception. Ghulam Rasul Mehr holds that, but for the co-operation of Khwas Khan, Budh Singh could not have advanced so easily to Akora Khattak, and that Amir Khan joined hands with Sayyid Ahmad not so much for his love of *jihad* as on account of his enmity towards his nephew, Khwas Khan. [39] Moreover, Yar Muhammad Khan, the Barekzai ruler of Peshawar, is said to to have clandestinely sent intelligence to the commander of Sikh garrison of Attock about the movement of Sayyid Ahmad. So did also the Muslim Thanadar or Police in charge of Khairabad. 40

As a matter of fact, the Bengali, Bihari and Hindustani followers of Sayyid Ahmad, who had left everything behind for the sake of spiritual happiness, were in complete accord with him and were sincerely eager to sacrifice their lives in the path of Allah and taste (he felicity of martyrdom. The concept of *jihad* not only as a religious duty but also as a means for achieving solely a religious end, had been a common theme of Sayyid's numerous letters despatched to various Muslim Kings, Princes and leaders belonging to Central Asia and the Indo-Pak subcontinent. In one of them, he writes:

"The real position of this servant of Almighty Allah is that I am neither a king *(Shah)* nor son of a king; nor am I a Prince *(Amir)* or son of a prince. Neither do I seek a kingdom nor do I want a government. I am a recluse *(Faqir)* son of a recluse. I regard simple living (in poverty and hardship) as a good fortune. I have only repulsion for the laws of the kings. Neither do I aspire to possess political power nor shall I ever endeavor to acquire it. I have tightened my belt only (i) for the

performance of (my) religious duties *(fara'id)*, and (ii) (in quest of) goodwill for all mankind, as well as (iii) for the sake of keeping the word *(kalima)* of Allah aloft, and (iv) for serving the laws (set forth) by Prophet Muhammad (sm). Anyone who joins hands with me only for the sake of his faith would be happy; and one who parts company with me, woe may overtake him!"[41]

There is a strong indication that Sayyid Ahmad had developed non-political concept *of jihad* at the time of his pilgrimage to Makkah. He possessed a heart, throbbing with sincerity and goodwill, which was thoroughly roused by his spectacular success in taking hundreds of people to the *hajj* whom he invited in the name of Allah; and thus assured of divine help, he *viewed jihad* like the *hajjl* from a purely religious angle. Hence in the selfsame manner, he sought to prosecute *his jihad* campaign by means of "a prayerful dependence on the help of Allah." [42]

This religious dialogue for buttressing the campaign for *jihad* was well appreciated by the Muslims of Bengal, Bihar and Hindustan. Sayyid Ahmad Shahid seems to have been aware of the fact that the Princes of Afghanistan and North-West Frontier viewed it in a different light. In his letter to Faqir Muhammad Khan of Lucknow (C.E. 1827), [43] which was meant for circulation, Sayyid Ahmad felt no need of holding out any assurance that he had no political ends in view, whereas in his letters to Sultan Muhammad Khan, ruler of ' Kohat, [44] Dost Muhammad Khan, [45] ruler of Kabul, and to numerous tribal chieftains, [46] the denial of any political intentions, as quoted above, was prominently displayed.

One can also argue from another angle that Sayyid Ahmad Shahid sought to win the support of the people for his reform movement as well as for the *jihad* campaign by means of *bay'at,* which means 'swearing allegiance'. To begin with, the *bay'at* offered to him was purely religious and was generally described as *bay'at-i-tawbah* or a pledge of penitence. But it gradually developed a militant aspect and acquired a semi-political character. Hence during this middle period it was often capitalized as *bay'at-i-jihad* or 'pledge for a holy war'. Finally, soon after his migration to the North-West Frontier, it developed into *bay'at-i-iinamat* [47] or 'allegiance to leadership' which indeed meant 'political allegiance' par excellence.

This created no problem for his Bengali, Bihari and Hindustani followers, who had neither any political axe to grind in the prospective war against the Sikhs in the North-Western India nor did they belong to any tribal structure carrying with it an immediate political stake.

Different was, however, the case with the tribal people of North-West Frontier, where people belonged to compact tribes and clans, and where seeking 'individual allegiance' of the people over the head of their rulers and chieftains, was impolite and the mass popularity of any revolutionary movement, whetner Islamic or otherwise, would cause deep apprehensions in the minds of the tribal leaders, whose authority it would jeopardize.

It was this implication of the *bay'at* which made the ruler; and chieftains of Afghanistan and North-West Frontier suspicious of the ultimate aim of Sayyid Ahmad or, at least, of the ultimate consequence of his aim. It made them deeply apprehensive of their own future.

Moreover, although the masses of the North-West Frontier were exceedingly vocal in professing their faith in and allegiance to Islam, they belonged to innumerable tribes and clans, which were, more often than not, mutually hostile to one another; and their lives from the cradle to the grave were governed primarily by tribal customs and usages.

No doubt, they were mostly ignorant and superstitious and could hardly have grasped the full significance either *of jihad* or Sayyid Ahmad's struggle. Yet in their allegiance to him, they showed great enthusiasm and they may have been quite sincere. They could not, however, throw away their tribal structure and were bound by the rules of their tribes. Consequently, they had to place their tribal interest above all other interests. These were indeed facts of life which neither Sayyid Ahmad himself nor his chief lieutenants ever tried to understand. Even when critical circumstances compelled them time and again to turn attention to these traits of tribal life, they frowned at them, saw only deception and infidelity in the hearts of the tribesmen and dismissed the whole affair as downright treachery. Strategy in the North-West Frontier had frequently alienated the tribesmen from his party; and the more he tried to strengthen his hold over tribesmen by imposing on them the authority of the *Shari'ah,* enforcing widow remarriage, or levying *zakat* and *'ushr,* the more he roused the suspicions of the tribal leaders. It ultimately proved fatal to the *jihad* movement in that region.

Strategy Pursued at the Frontier

To appreciate the strategy of war pursued by Sayyid Ahmad Shahid a reference to the existing circumstances, which conditioned his war efforts, appears to be necessary. One may surmise, that Sayyid's intention to wage a *jihad* against the Sikhs of the Panjab, having been known since long, the Sikh ruler Maharaja Ranjit Singh and his agents

kept the track of his movements and, as we have noticed above, they received timely intelligence of his arrival at Peshawar. They, therefore, allowed him no time to studz the local situation and to devise a suitable plan of war. He had selected the strategic place of Charsadda before hand for his headquarters, and no sooner did he arrive there than he was drawn into a snare of tribal intrigue, on the one hand, and was confronted by a large Sikh army, on the other, for none of which he was fully prepared.

He had under his command approximately a good number of patriots who were joined by about 600 or 700 local Pathans, being supporters of Amir Khan Khattak. Thus, marching at the head of about 1600 men, when he entered Nowshera from Charsadda on the 19th December 1826 C.E., he found himself face to face with a well trained Sikh army under the command of Budh Singh numbering about 7, 000 strong and lying in wait for him at Akora Khattak. The first serious problem was thus posed before him arose out of the gross disparity between his men and those of Budh Singh.

Ghulam Rasul Mehr maintains that the selection of North-West Frontier for the operation of *jihad* was decided upon by Sayyid Ahmad Shahid in accordance with a larger plan for occupying the Panjab first and then for dealing with the British power in India using the Panjab as the base of operation.[48] In the first place, the North-West Frontier was inhabited by warlike Muslim tribesmen. They were especially well known for their love of freedom, which was, at the moment, seriously threatened by the aggressive policy of Maharaja Ranjit Singh. In fact, the whole tribal belt comprising the modern districts of Peshawar, Mardan, Hazara, Muzaffarabad,

Jammu and Kashmir was tightly drawn by the Sikhs into the front-line of their expansive occupation policy. They had alreadz gone Ihrough these areas with sword and fire and had set up many fortresses and out-posts at different strategic points. 49 Whether the Sayyid was aware of this whole situation before or not, or whether he had a preconceived plan to take the Panjab for the purpose stated above, or not, on his arrival on the spot he certainly set his mind upon bolstering the fighting spirit of the tribal people and using it as fully as possible for the cause of Islam. In one of his lectures delivered just a few months before his martyrdom in C.E. 1831, he said:

"Brothers! I have come to this mountainous region of yours, taking so many servants of Allah with me and braving so much suffering and hardship on the way with the sole intention of vanquishing Ihrough Allah's help those infidels who have subjugated your country and are

subjecting you to trouble and dishonor; so that, the political power of your States remain in your hands and the religion of Islam is thereby strengthened."

Had I sought comfort and luxury, I could have plenty of it in Hindustan and would never have intended to come to this mountainous region (of wilderness). So, all I want to say to you brothers! Stand apart from the government of the infidels and join me with your life and wealth!"[50]

While planning for the migration, he had probably thought that once he arrived at the Frontier and'preached the doctrine *of jihad* to the tribesmen with open heart, they would cluster around him. In the army of Amir Khan he must have observed the religious susceptibilities of the Pathan and their uncommon courage and fidelity in warfare. Indeed, the Pathan has the capacity to become one of the finest soldiers in the world, provided they received appropriate training in military discipline outside of their tribal environment, but not probably within the free atmosphere of his nibe. Sayyid Ahmad blundered in equating the Pathan alike under lioih the situations. He began to be disillusioned in the first place, of the falsity of his notion about Muslims living still in freedom from I he time he entered into the Muslim principalities of Sind; secondly, he felt utterly disappointed at the treatment meted out to him by the Muslim rulers of Qandahar and Kabul; and finally, left alone with about 1, 600 volunteers to fight against the Sikh army of 7, 000 strong at Nowshera, he could do no better than take recourse to guerilla tactics.

A close examination of the meticulous details about the war efforts of Sayyid Ahmad, patched together by Ghulam Rasul Mehr, [51] makes it evident that, unable to give a frontal battle to the Sikhs at Akora Khattak with a handful of men, he adopted the policy of 'developing a holy war' against the Sikhs under his leadership. He sought to accomplish this objective on the one hand by keeping the Sikhs at an arm's length through *shabkhun* or daring night attacks on their camp, and on the other, by thoroughly rousing the warlike spirit of the tribesmen in the name of Islam and freedom and gaining their active co-operation in the *jihad* movement through preaching and persuasion from the pulpit and platform as well as by means of staging frantic display of bravery and heroism in the battle-field. As a matter of fact, since the Sayyid's arrival at Nowshera on the 19th December 1826 C.E., until his martyrdom at Balakot on the 6th May 1831 C.E., his thoughts and activities were actuated by this single motive more than anything else. Indeed, the courage of conviction in their ideals,

dedicated devotion to the cause *of jihad*, contempt of death and a deep sense of prayerful dependence on the will of Allah had combined together in Sayyid Ahmad and his followers, to make each of them extraordinarily bold and heroic. In their night attacks on enemy camps they brought to bear these qualities so vigorously that the very thought of Sayyid's *shabkhun* began to throw the Sikhs into terror. No wonder, therefore, that the intrepidity of Sayyid's followers was often judged by the hostile European writers as 'fanaticism'.

Sayyid Ahmad's endeavour to 'develop a holy war' began right from Nowshera. Being confronted by a large Sikh army which outnumbered his men by nearly five times, as we have noted above, he decided to resort to guerilla tactics, and without waiting further to be harassed by the enemy, sent a party of about 900 men (consisting of approximately 136 Hindustani, 80 Qandaharis and nearly 700 local Pathans) to make a night attack or *shabkhun* on the enemy camp at Akora on the 20th December 1826. 52 The party did its work so well that on the next morning, instead of preparing for a frontal attack, the Sikh Commander, Budh Singh, thought of retreat ;is the better part of valor and fell back to Shaidu, about 6 or 7 miles in the direction of Attock, with his whole army. It is said that he might have even retreated to the Fort of Attock had he not been warned by the Commander of the garrison that such a course would expose the Fort to the attack of the enemy.[53] In a letter written soon afterwards, Sayyid Ahmad claimed that this initial success at Akora opened up one door of victory for the *Mujahidin.* [M] It opened up, at any rate, a flood-gate of enthusiasm among the local Pathans for *jihad* and people came in surging waves to pay their allegiance to Sayyid Ahmad and become his disciples. Influential chieftains, who were so long sitting on the fence, also came forward and swore allegiance to Sayyid Ahmad. Finally, on the insistence of the powerful chieftain, Khade Khan of Hund, he moved thither and set up his headquarters at the Bazur area situated on the outskirt of the old fortress of Hund.[55] It was a landmark in the history of the movement as by this act the *jihad* movement became, so to say, a part and parcel of the life of Frontier tribesmen and here in the second week following the night of Akora, two brief skirmishes took place between the two parties.

The first was occasioned by a raiding expedition undertaken by the Pathans and the Qandaharis to Hazru, a rich centre of tobacco business in Campbellpur, and the second was caused by a retaliatory action of the Sikhs, who appeared in a considerable number on the other side of the Indus river near Hund, two or three days after the above incident.[56]

Sayyid Ahmad, having an entirely different aim in view, did not approve of the raid and kept aloof from it. The tribesmen still proceeded with the project and "organised a typical tribal raid". [57] But when they were chased out by the Sikhs, the local Pathans ran pell-mell towards the river leaving the Qandaharis behind to fight it out alone.[58]

In this encounter as well as in the following counter-attack, the Bengalis, according to Ghulam Rasul Mehr, showed great valor 59 and the followers of Sayyid Ahmad were able to maintain their superiority both over the Sikhs and local tribesmen. The heroic way in which a handful of Sayyid's followers fought and drove away the Sikhs made a deep impression on the tribesmen and bolstered up their morale so much so that in the third week following the night attack of Akora, that is, on the 11th January 1827, the chieftains and religious leaders of the area decided to acclaim Sayyid Ahmad as the *Imam for jihad* and swore allegiance to his leadership in the war *(bay 'at-i-imamat-i jihad).*

Next day, his *Itnamat* was proclaimed in the Friday Sermon from the pulpit and he came to be addressed by the inner circle of his followers as *Amir-ul-Mu'minin,* and by the Pathans as "Sayyid Badshah", and by the Sikhs as "Khalifah Sahib". [61] Within two months from the date of *bay'at-i-imamat-i-jihad,* 80, 000 warriors rallied round him ; and towards the close of the first week of March 1827 C.E., he proceeded in full force, from Hund to Akora Khattak, for giving battle to Budh Singh who still remained in waiting at Shaidu. At Akora, he was also joined by the Barekzai brothers, Yar Muhammad Khan, the ruler of Peshawar and Sultan Muhammad Khan, the ruler of Kohat as well as by their third brother, Pir Muhammad Khan with 20, 000 Peshawari followers, thus enhancing the number of the *Mujahidin* to 1, 00, 000. [62]

As against this huge concourse of volunteers and commandos, there were 33, 000 Sikhs under Budh Singh in the village of Shaidu and 20, 000 reserves under Hari Singh lying in wait on the bank of Attock River. [63] In fact, the Sikhs had advanced against Sayyid Ahmad from the Fort of Attock, which was strongly fortified by Maharaja Ranjit Singh and which constituted a most important rampart in the defensive system of his gradually expanding Panjab kingdom. Nay, as a fort, it was large and impregnable. In its mountainous awesome environment it also symbolised strength and stood as a sentinel over the North-West Frontier. Sayyid Ahmad had fully realised the strategic importance of the Attock Fort and the impossibility of advancing towards Lahore from the NorthWest Frontier without capturing it. Hence, all his attempts to strike a contact with the Sikhs from Peshawar and Hoti

Mardan were directed primarily to Attock in order to clear the way, as it were, to the Muslim reconquest of the Panjab.

This most fantastic growth *of jihad* movement in the Frontier, which rallied hundreds and thousands of people under its banner in the short span of two or three months' time, had also another side of the uirclal. We have alreadz noticed that the first move, which Sayyid Alunad took in that region, met with deception. In the night attack of Akora, Amir Khan Khattak's followers formed the bulk of the party and when in the midst of the operation (around 4 a.m.) they saw the Sikhs running pell-mell in all directions they at once took to inhering spoils leaving the burden of fighting to the handful of Hindustanis and Qandaliaris, and anyone who could lay his hand on some thing, silently slipped out of the field and went straight to his home; so that, in about an hour very few of them were left in the field. When the Sikhs lighted flares they found only a handful of enemies engaged in the operation. This helped them in rallying themselves and mounting a fierce attack on the intruders. As a result 36 Hindustanis, 46 Qandaharis and no Pathan were killed.

Secondly, the grand success at Akora, while it bolstered up the morale of the Bengali, Bihari and Hindustani *Mujahidin,* it fomented the raiding spirit of the tribesmen including the Qandaharis resulting in the raid of Hazru. Even so, when chased by the Sikhs the local Pathans ran with their spoils and jumped into the river leaving the 10 Qandaharis,, in the lurch, who had accompanied them.

Thirdly, following this incident when Khade Khan ordered for gathering all the spoils at one place for equitable distribution, they defied his command and created almost a riotous situation, compelling Sayyid Ahmad to instruct for leaving off the spoils in the hands of the captors. Subsequent events extending to the day of Ualakot, proved that the local people, who joined hands with Sayyid Ahmad, with few respectable exceptions, primarily aimed at making hay while the sun shone. [65]

On the day of Shaidu, which fell in the second week of March 1827, the battle array of Sayyid's party was formed, according to nhulam Rasul Mehr, in the shape of a 'crescent' extending from the foot of Khattak Hills right up to the Kabul river. At the extreme right stood Yar Muhammad Khan, at a little distance to his left was Sultan Muhammad Khan and on further left, Pir Muhammad Khan. The rest of the line extending up to the riverbank was occupied by the tribesmen commanded by Path Khan Panjtari, Khade Khan of Hund, Ashraf Khan of Zaida, Amir Ahmad Khan Bajori and others. The followers of

Sayyid Ahmad stood somewhere in this area. Gudri Shahzada, who came from Sind, took his place on the other extreme inside the village of Shaidu.[67]

The whole party appears to be facing to the east. In the front of them there lay a dry canal bed and across it was the Sikh encampment. The enemy had mounted a number of guns at different points and set up a few advance posts in the canal area.[68]

As the fighting began, the Sikhs started raining ball and fire on the *Mujahidin*. But defying the barrage of bullets. Sultan Muhammad Khan, Pir Muhammad Khan and Path Khan Panjtari made a swift and fierce cavalry charge which broke through the front line of the Sikh army. The valiant Gudri Shahzada even spearheaded his way into the main bodz of the enemy. By and by as the whole party of the *Mujahidin* came into action, the Sikhs began to be pushed back.[69] The leader of the Barekzai, Yar Muhammad Khan, however; chose this opportune moment to strike his nefarious blow to the *jihad* movement. All of a sudden, he raised a hue and cry and ran with all his men out of the field.[70] Seeing him go, his younger brothers Sultan Muhammad Khan and Pir Muhammad Khan followed suit and in the midst of the confounding fright created by the anomalous running to and fro of their 20, 000 followers, the great crowd of the tribesmen also chose the flight as the better part of valor and hurriedly ran out of the field. Only Gudri Shahzada and his Sindhi followers stood the ground and, true to their salt, fought to the last till the battlefield became strewn with their dead bodies.[71]

The greatest misfortune, however, had fallen on Sayyid Ahmad himself. In the previous night Yar Muhammad Khan supplied sumptuous but poisoned food to him which he took in good faith and fell seriously ill. Since then, he remained most of the time unconscious and was not fully cured until about a month or two had passed. Yet probably to ensure the presence of Sayyid Ahmad in the battlefield and to make easy his capture by the Sikhs, Yar Muhammad had despatched an elephant to him in the morning. Seeing disaster, Shah Ismai'll personally took charge of the Sayyid and mounting him on the elephant howdah, he prudently kept the animal at a safe distance

from the centre of operation. At the critical moment, seeing a party of the Sikhs coming in pursuit of the elephant, he hurriedly transferred the ailing leader to horseback and sent him to a different direction. With great difficulty he was carried by Ashraf Khan of Zaida and some others to Chinglai in the modern district of Mardan.[72] The life of the leader was saved though the *jihad* movement suffered a crushing defeat.[73] The Barekzai family, which had recently succeeded in

establishing its rule over Kohat, Qandahar, Ghazni, Kabul and Peshawar under most intriguing political circumstances, [74] had little or no reason to curry favour with the *jihad* movement of Sayyid Ahmad. The latter, of course, had tried to win over the Barekzai brothers to his side since long: first through correspondence from Hindustan and latterly through direct negotiation. It appears from a number of letters written to them that he continued to cherish high hopes of receiving their active cooperation in conducting the *jihad* until his actual meeting with them.

However, evidence is not lacking to show that among them, at least, Sultan Muhammad Khan had taken considerable interest in *the. jihad* movement in the beginning; he, however, remained carefully cautious and at the end turned hostile. In fact, they appear to have viewed Sayyid's activities in their realm as a disturbing element. But, it may be that if they did not like to associate themselves with his movement, they could neither keep aloof from it in view of the growing mass popularity of his *jihad* campaign.[75] Moreover, Yar Muhammad had accepted the overlordship of Maharaja Ranjit Singh since long and was carrying in confidence of him.[76] These facts may explain partly, if not wholly, the conduct of Yar Muhammad Khan in sabotaging the position of the *Mujahidin* at the battle of Shaidu.

The defeat at Shaidu brought to an end the first and meteoric phase of the *jihad* movement in the Frontier. The shock of defeat and dispondency begotten of the fatal illness of Sayyid Ahmad might have crushed the movement altogether; but boundless energy, courage of conviction and dedicated attachment of his Bengali, Bihari, Hindustani and Qandahari followers towards him, turned this mortal occasion into the birth-pang of a more humble and sober phase of I he *jihad* movement in the Frontier which, however, can be dealt with only cursorily in the short space of the present studz.

Second Phase of the Jihad

This second phase of the *jihad* campaign consisted of exploratory mass-contact tours in the fashion of those undertaken earlier in Hindustan. This phase lasted for about ten months from April to December 1827, in the course of which Sayyid Ahmad himself toured Bonir, Swat, Ismailia, Lundkhor, Malakand, Khar and other places, [77] and sent Shah Ismail to Pakhli and Hazara. It is evident from the materials at our disposal[78] that the main objective of Shah Ismail's mission was to explore the prospect of striking a contact with the Sikhs from that side of the Province with a view to avoiding conflict with the Barekzais of Peshawar, [79] who had come out with open hostilities

against the *Mujahidin* after the battle of Shaidu and had blocked the way to Attock, on the one hand, and cut off the Sayyid's retreat to Hindustan, on the other. As a matter of fact, during the whole period of his campaign in the Frontier, owing to his weak and infirm position, the Sayyid's. interest remained oscillating between Attock and Hazara with the rise and fall of the prospect of developing a holy war on one side or the other.

Of course, he aimed primarily at taking the Fort of Attock, from where he wanted to advance towards Lahore; and Hazara, which formed his second best objective, through which he wanted to pass on to Jammu and Kashmir for the purpose of establishing a secure foothold in the area. The above-mentioned phase was, thus, prompted by the Sayyid's anxiety to avoid the shedding of Muslim blood and by his quest for a policy of non-belligerency towards the Barekzai rulers of Peshawar.

This phase was brought to an end especially by the failure of Shah Isma'il either to forge unity among the quarrelling Sardars of Pakhli and open a second front against the Sikhs with their help at Hazara or to open the way to Jammu and Kashmir. Consequently, he returned in disgust in October 1827 C.E.[80] Because of the failure of Isma'il's mission to Hazara, Sayyid Ahmad was left with no other alternative except to make a renewed attempt to contact the Sikhs once again from the side of Attock. This was not, however, possible without an armed conflict with the Barekzais first. As a result, the third phase of *the jihad* movement, which began with the arrival of

Sayyid Ahmad at Khar in December 1827 C.E., centered round the policy of 'containment of the Barekzais', to which Sayyid Ahmad was driven out of desperation.

Third Phase of the Jihad

The third phase lasted for about three years from the time of his arrival at Khar in December 1827 C.E. to his second *hijrat* from Peshawar and Hoti Mardan to Pakhli and Hazara in December IK M).[M] The policy of 'containment', however, took different shapes at different times with the change of attending circumstances. In the In-ginning, specially during the Sayyid's stay at Khar, it took the form of a 'diplomatic offensive' against the Barekzais which occasionally tended to break into an undeclared war as it happened at Utmanzai about May 1828 C.E.[82] From February 1829 C.E., i.e., during the second year, it became galvanized with its natal energy for socio-religious reform.

To start with, it assumed an evangelical and persuasive character, but the campaign for introducing reform in the local society gradually

became more and more militant especially under the leadership of Qazi Habban.[83] Finally, the policy of 'containment' irsiillcd in the conquest of Peshawar in the middle of C.E. 1830.[84]

UK' campaign for introducing socio-economic reform was launched mi I ho 6th February 1829 C.E. following a huge conference at I'linjlar, at the end of which thousands of tribal chiefs and "*Ulama*| ilrdf.al on the hand of Sayyid Ahmad to enforce *Shari'ah* in the" *bay'at-i-iqamati-shari'at,* in course of time, developed into the 'ideology' of the *jihad* movement which Shah Kiiu'il sought to elaborate in his *Mansah-i-Imamat.* [86] The main.inns of this campaign were (1) dispensation of Islamic justice, (ii) t ollortion of *zakat* and '*Ushr,* (iii) implementation of the rules of *Miiiri'tih* and (iv) abolition of un-Islamic local customs which were ini|)Miilontly dubbed as *Afghaniyat.*[81]

As we have quoted above from a letter of Sayyid Ahmad, he rypiessly denied to have any personal political motive behind his movement; rather, he intended that "the political power of VOID Males remain in your own hands and the religion of Islam is strengthened."[ss] But the manner in which these measures were implemented looked apparently coercive: the imposition of a superstructure of Islamic administration on the tribesmen, as it were, over the heads of their chieftains and rulers in the fashion of a contemporary 'suzerain'. This naturally provoked grave apprehension in the minds of the ruling class and eventually turned three most powerful rulers of the Frontier, namely Sultan Muhammad Khan of Kohat and Peshawar, Khade Khan of Hoti Mardan and Painda Khan of Amb in Hazara, into desperate enemies who were formerly, at least nominally, his allies. The policy of 'containment', in fact, got him entangled into an intriguing game of tribal politics, the complexity of which became accentuated with the conquest of Peshawar; yet he tried, all in good faith, to play on and win it by means of the simplicity of a religious divine." 89

It is, indeed, this naivety in politics that first led to the massacre of *Mujahidin* at Peshawar 90 in November 1830 and ultimately led to the disaster of Balakot in May 1831.[91]

With what amount of disgust and disillusionment he was heading towards his martyrdom at Balakot is amply reflected in the following observation, which he is reported to have made in the previous night (the 5th May 1831 C.E.):

"For so many years have I endeavored in very many ways to promote this goodly task (i.e., *jihad),* and no stones have I left unturned. I sent my deputies to Hindustan, Khurasan and Turkistan,

who did all in their power to attract people towards the path of Allah; and I myself made ceaseless efforts through preaching and admonition to make the people conscious about its significance wherever I went. Yet, none but some strangers joined hands with me; and the bulk of them invented calumnies against me. Such was perhaps the will of Allah. Our scribe has now got tired of writing letters and we have got fed up with despatching them. Nothing positive developed out of it." [92]

References

1. Ghulam Rasul Mehr: *Sayyid Ahmad Shahid,* Vol. I, p.51, Dr. Mahmud Husain:"Sayyid Ahmad Shahid" in *History of the Freedom Movement,* Pakistan Historical Society, Karachi, Vol. I, p. 556.
2. Dr. Mahmud Husain in *History of the Freedom Movement, op. cit.,* Vol. I, p. 558
3. Mehr: *Sayyid Ahmad Shahid, op. cit..* Vol. I, pp. 71-72; Sir Syed Ahmad Khan: *Athar-us-Sanadid,* Ch. Ill, pp.18-19 andCh. IV, pp.26-28.
4. See article of the present writer, 'Tariqah-i-Muhammadiyah Movement: An Analytical Studz", *Islamic Studies,* Islamic Research Institute, Islamabad, Vol. VI, No. 4, Dec. 1967, pp.375-88 reproduced herein in Chapter 4,
5. Mehr: *Sayyid Ahmad, op. cit.,* Vol. I, p.79.
6. *Ibid., p. 91.*
7. Mehr: *Sayyid Ahmad, op. cit.,* Vol. I, p. 106.
8. *Ibid.* p. 106 ff. Mehr's calculation of the date is more accurate than that of Dr. Mahmud Husain's irf *History of the Freedom Movement, op. cit.,* p. 562, who putitatC.E. 1817.
9. See our article: "Tariqah-i-Muhammadiyah Movement" in *Islamic Studies,* op. cil., Dec. 1967, pp. 375-88
10. Mehr: *Sayyid Ahmad, op. cit..* Vol. I, p. 124.
11. *Ibid., Vol.* I, pp. 130-32
12. *I bid., p.* 186ff.
13. *Ibid.,* p. 169 ff.; and W. W. Hunter: *Our Indian Mussulmans,* London 1870, I964ed. p.4.
14. Mehr: *Sayyid Ahmad, op. cit..* Vol. I, pp. 238-41
15. *Ibid.,* pp. 282-86. Mehr calculated 1 year 10 months in terms of lunar calendar.
16. *Ibid.,* p. 178.
17. Risalah-i-Jihad (MS. Persian) recently collected by Islamic Research Institute, Islamabad, Pakistan pp. 27-29. Also compare with Mehr. *op. cit.,* Vol. I, pp. 432-35.

18. Mehr: *Sayyid Ahmad, op. cit.,* Vol. I, p. 284. Sayyid's family was later on taken to Tonk at the request of Nawab Amir Khan *(Ibid., p.* 290) and thence to Pirkot in Sind, to be under the care of Sibghatullah Shah in H.I242 / C.E.1827(//bW., p. 394).
19. *Ibid.,* 412; see also Mehr: *Jamalat-i-Mujahidin.* p. 23.
20. Mehr; *Sayyid Ahmad. op. cil..* Vol. I, pp. 287-90.
21. *Ibid.,* pp. 293-95 .
22. *Ibid., pp.* 299-312.
23. *Ibid.,* pp. 282-329.
24. *Ibid.,* pp. 339-43.
25. *Ibid.,* pp. 345-48.
26. Dr. Mahmud Husain in *History of the Freedom Movement,* for the description of the controversy.
27. Mehr: *Sayyid Ahmad,* op. cit., Vol. 1, pp. 40-41.
28. Mehr: *Sayyid Ahmad,* op. cit., Vol 1, pp. 92-112.
29. See our discussion above and excerpts from his letter to the ruler of Bukhara.
30. Mehr: *Sayyid Ahmad,* op. cit., Vol. I, pp. 132-178.
31. *Ibid.*
32. Mehr: *Jama'at-i-Mujalridin,* p. 23.
33. *Ibid.,* pp. 24-25 and Mehr: *Sayyid Ahmad, op. cit..* Vol. I, pp. 282 ff. 358 ff., 412ff., Vol. II, pp. 22 ff.
34. Mehr: *Sayyid Ahmad,* op. cit., Vol. 1, pp. 324-25 and Dr. Mahmud Husain : *History of the Freedom of Movement, op. cit,* . Vol. 1, p. 534,
35. Dr. Mahmud Husain, *op. cit.,* p. 584.
36. *Ibid.*
37. Mehr: *Sayyid Ahmad, op. cit..* Vol. 1, p. 325.
38. *Ibid., p.* 328, referred to *Manzitra,* p. 310, sec ft. n. 1 therein .
39. *Ibid., p.34'/.*
40. *Ibid.*
41. Hafiz 'Aziz al-Din Muradabadi: *Akmal al-Bayan ft Ta'id-i-Taqwiyat al-Iman,* Lahore, 1965, p. 833, referred to *Tawarikh-i-Ajib,* p. 16.
42. *Risalah-i Jihad* (MS. Persian) Islamic Research Institute, p. 28.
43 *Ibid.,* pp. 19-20; see also Mehr: *Sayyid Almiad, op. cit..* Vol. I, p. 374 for the date.
44 Risalah -MS., *op. cit., pp.* 20-23
45. *Ibid., pp.* 23-25.
46. See the addressees in Mehr: *Sayyid Ahmad. op. cit..* Vol. I, pp. 433-35

47. See description of different types of *bay'at* in Ghulam Rasul Mehr: *Sayyid Ahmad Slmhid.*
48. Mehr: *Sayyid Ahmad Shahtd, op. cit..* Vol. 1, pp. 276-81.
49. *Ibid., pp.* 250-81, especially pp. 276-79.
50. *Ibid.,* Vol. II, p. 358. The lecture was delivered at Sachchun in March 1831.
51. ll may be noted that the meticulous details mustered by Ghulam Rasul Mehr about the battles of Sayyid Ahmad Sliahid in his different works still remain the main source of information in this field, on which all the subsequent writers on this subject have largely depended for their data with or without acknowledgement. Recently Dr. Qiyam-ud-Din Ahmad of Patna University has added a few important points and modified and corrected a number of earlier notions on the basis of more reliable evidence.
52. Mehr: *Sayyid Ahmad, op. cit..* Vol. I, pp. 352 and 358; and Dr.Qiyam-ud-Din Ahmad: *Wahhabi Movement,* Calcutta, 1966, p. 47.
53. Mehr: *Sayyid Ahmad. op. cit..* Vol. 1, p. 363.
54. *Ibid., p.* 362.
55. *Ibid., pp.* 364-65. Hund was a place of considerable antiquity situated about 17 miles east of Attock on the right bank of river Indus. It was a ferry ghat for crossing the river (see Qiyam-ud-Din, *op. cit., p.* 61, ft. n. 79).
56. Mehr: *Sayyid Ahmad, op. cit..* Vol. I, p. 366 ff.
57. Qiyam-ud-Din, *op. cil.,* n. 47.
58. Mehr: *Sayyid Ahmad, op. cit.,* Vol, I, pp. 356-58. .'•9. *Ibid., p.* 362.
60. *Ibid., p.* 372-74. Ghulam Rasul Mehr and Qiyam-ud-Din Ahmad have suggested that the formal adoption of the *linamat* of Sayyid Alimad Shahid at Hund was due to the realisation that the tribesmen were not really steadfast in thei: resolve to participate in *[he jihad* and that, they were actually motivated by their lust for plunder; so they were called upon to give their express allegiance to the leader. Judging from a purely historical perspective, his *Imamat,* however, appears to us as a natural and logical growth, to which the above realisation may have been a concomitant fact rather than an efficient cause.
61. Mehr: *Sayyid Abmad, op. cit..* Vol. I, pp. 372-75.
62. Ibid., pp. 357-89.
63. *Ibid.,* pp. 388-98.
64. *Ibid.,* pp. 368-70.
65. Compare Sayyid Akbar Shah's counsel to Shah Isma'il Shahid in Mehr's *Sayyid Abmad Shahid, op. cit..* Vol. II, p. 7.

66. According to a Sikh source, the date was 14th Phagun, see *ibid.* Vol. 1, p. 395 referred to *'Umdat al-Tawarikh.*
67. *Ibid.,* p. 392 ff.
68. *Ibid., p.* 393.
69. *Ibid.,* pp. 393-94.
70. *Ibid.,* pp. 394-97. Reasons put forward for this strange conduct are mere surmises of different writers.
71. *Ibid.,* pp. 394-96.
72. *Ibid., pp.* 392, 402 and 407.
73. *Ibid., p.* 401. According to Sikh sources 6, 000 followers of Sayyid Ahmad Shahid were killed in this battle.
74. *Ibid.,* p. 323 ff. This family consisted of Sherdil Khan, Kohandil Khan, Rahamdil Khan and Mohardil Khan ruling over Qandahar, and Mir Muhammad Khan, Pir Muhammad Khan, Sultan Muhammad Khan and Sayyid Muhammad Khan ruling over Ghazni, Kabul. Kohat, Peshawar and Hasht Nagar. They were progeny of one father and two mothers.
75. See also *Ibid., p.* 382-83; and ft. note, on p.383 in which Munshi Amar Nath's *J'afarNama,* p. 175 has been cited.
76. *Ibid.,* p.335, referred to *'Umdat al-Tawarikh,* Vol. II, p.35.
77. /&</., Vol. I. pp. 418-31, Vol. II, pp. 32-34.
78. *Ibid., Vol.* II, pp. 1-20.
79. This anxiety of Sayyid Ahmad affected Mawlawi Mahbub Ali, see *Ibid.,* Vol. II, p. 23 ff.
80. Mehr: *Sayyid Ahmad, op. oil..* Vol. H, pp. 19-20.
81. *Ibid.,* Vol. II, pp. 34-323.
82. *Ibid., Vo*\. II, pp. 34-54.
83. *Ibid.,* Vol. II, p. 55-65, 78 ff. and 211 ff.
84. *Ibid., p.* 26 Iff.
85. *Ibid.,* p.55ff.
86. Shah Muhammad IsmaMl: *Mansab-i-Imamat* has been published in original Persian and recently also in Urdu translation from Lahore.
87. Mehr: *Sayyid Ahmad, op. cii.* Vol. II, p. 57 ff. 88. See above.
89. Mehr: *Sayyid Ahmad, op. tit.,* Vol. II, pp. 267-73.
90. *Ibid.,* pp. 290-322.
91. *Ibid.,* pp. 368-434 .
92. *Ibid.,* pp.383

*Reprinted with thanks from ISLAMIC STUDIES, Journal of the Islamic Research Institute of Pakistan, Islamabad . Vol. VII, No. 4, . December 1968.

Source: Islamic Revivalism, Chap-5, Page-116-140.

Sayyid Ahmad Shahid & Structural Review of His Islamic Khilafat (State)

Dr. Shah Ebadur Rahman
Former professor of English Umm Al-Qura University, Makkah

2. STATE DEPARTMENTS

The state defined its aim in clear terms in accordance with the guidelines set by the Islamic Shariah - to take Allah as Sovereign and to guarantee people their rights and make them responsible of their duties in accordance with the Islamic Law. The state thus took upon itself the responsibility to ensure peace and justice to all in its jurisdiction. For functional purpose, three main departments were established to make the state run efficiently: the Legislature, the Executive, and the Judiciary. All these departments identified their areas of work in the light of the teachings of the Shariah and in a short time started functioning, as we will see below, in full-fledged form.

A. THE LEGISLATURE .

The legislative bodz was responsible for providing laws to the state to conduct its regular functions and meet emergent legal situations.

General Structure

The sources of directives were the Qur^an and the teachings of the Prophet. For this purpose the Islamic scholars were given the responsibility to draft laws for the state to function and to ensure that nothing was ever done contrary to the Shariah. Luckily, a good number of Islamic scholars, both from Sayyid Ahmad's Indian associates and local Ulema, were available in the Frontier to guide this newly-born Islamic state in this matter.

Civil and Criminal Laws

In general, the laws provided by the Islamic Shariah served as the backbone of the judiciary. The well-known Islamic laws were adopted as they were. But as the local society fostered some traditional customs

which were un-Islamic, laws had to be made to control them. Accordingly, such un-Islamic practices were declared as illegal and, therefore, punishable. For example, to delay the marriage of girls practiced by parents for getting dowries from the bridegrooms, to run away from one area to another after committing a crime and thus becoming safe by seeking refuge there, to forcibly capture the property of others arad drive them out of their areas, to bathe naked in the river, and to mourn the death of a person in an un-Islamic way were declared illegal and were forbidden.

It is to be noted that in order to avoid any masumterstamding regarding the nature of a custom traditionally practiced by the local people, Qari Mohahmmad Habban, who was an Islamic scholar from the Frontier, was appointed as *Q&ziul Quz&t* (the Chief Justice). He prepared a set of laws for the area with the help of the local as well as Indian scholars about punishments for different kinds of transgression. He also made laws for the people to pay Ushr and Zakah and developed guidelines for the officials and the public to meet other practical situations.*[37]

In the beginning, a person found guilty of bathing naked in the river was fined, but the punishment was later changed from fine to flogging. In the beginning a person grazing Ms cattle in the fields of others was fined on the basis of the number of the cattle, but later such a person was asked to pay an amount of money that justifiably compensated the loss of the property. The male members deliberately missing obligatory prayers received lashes; Amaan Khan Kunjpuri was responsible for flogging them. Women received punishment inside family quarters; Sayyid Ahmad himself punished them. Records, show that two women were punished this way, one for neglecting obligatory prayers and the other for falsely declaring herself a widow. A report shows that in the beginning a landlord had to pay the fine of two rupees for deliberately missing obligatory prayers, a cultivator who owned some land *(Matik)* one rupee, and a commoner half-a-rupee.[438]

In a war situation the Mujahideen were instructed to foHlow certain males: they were allowed to fight with those who fought with them and grant peace to those who asked for peace.*[39] It was declared illegal in a battle to take as booty the property of anyone except of those Muslims who rebelled against the Imam, or of the non-Muslims who took arms against him."[0] Looting and plundering in a battle was declared illegal. In the Battle of Hooti, Mardan, a group of the local people defending the fort sought peace and protection. All of them were escorted to a safe area and were allowed to take their personal

belongings and arms with them. lit the same battle Rasool Khan, brother of the ruler of Mardan Ahmad Khan, surrendered with the rest of the fighters and asked for amnesty. AH of them were given full protection of life and property. Later, a few of the residents of Mardan complained that some local Muslims from the Muslim army had taken their property after they were granted amnesty. Maulana Ismail immediately investigated the matter and returned all such articles to the owners.[441] To indulge in tribal feuds and unjustly side with one's own tribesmen was also declared un-Islamic and therefore illegal.[442]

The Islamic Law remained the main source of legal guidance and even the Head of the state was not above it. On more than one occasion, Sayyid Ahmad himself revised his decisions when it jvas pointed out to him that the Islamic Law required a different verdict on the issue. For example, as stated earlier, he once allowed the residents of an area at their request not to pay Ushr for the time-being so as to let them gradually accept and obey the laws of Islam. When it was pointed out to him that even an Imam was not entitled to do that, he immediately took back his decision.[4*3]

For the distribution of the booty acquired in a war, the Islamic injunction was followed. For example, the booty earned in the Battle of Zaida, which was fought against Yar Muhammad Khan, was divided into five parts: one part was deposited in the Baitul- Maal (Public Treasury) and four parts were distributed among the soldiers. An un-mounted soldier received one share while a mounted soldier was given two shares, in accordance with the well-known Islamic injunction, *lir rtjjalc seham wa til farts sehamaan.* ***

B. THE EXECUTIVE-

In order to implement the laws of the Shariah and make the Islamic state function effectively, a strong and full-fledged executive bodz was developed at Panjtar. It gradually grew into separate departments to perform all practical functions of the state. We shall discuss them separately below to assess their efficiency on one hand and their adherence to the Shariah on the other.

The Advisory Council *(Majlise Shoura)*

There was an Advisory Council (Majlise Shoura) to assist Sayyid Ahmad as the Amirul Momineen, It consisted of people of wisdom, experience, knowledge, and piety. Mehr mentions the names of twenty-two persons who served as members of the Shoura on different occasions.*"*[5] All important matters were discussed in the Shoura and

decided on the basis of the teachings of Islam. Sayyid Ahmad consulted the members of the Shoura before taking any decision relating to matters of administrative nature. As Mehr writes, "On all important occasions the persons available from the group mentioned above were called for consultation and a decision was taken after seeking their opinion."**[6]

Other responsible persons among the companions of Sayyid Ahmad also followed the practice of consulting their advisors before taking a decision on matters of import. Shah Ismail, for example, used to consult his advisors in important matters. He once wrote in a letter that he sent from Amb to Sayyid Ahmad: "I have strong hope that my associates in general and advisors in particular will fully agree witli this proposal."[4]*[7] Similarly, Risaldar Abdul Hameed Khan, the Commander of the cavalry, always consulted responsible companions in important matters of administration. He was posted at Shewa and was responsible for touring the area under the jurisdiction of the Islamic state to maintain law and order. At times he had to take a decision on the spot about an urgent issue. Sayyid Ahmad had appointed a group of eleven advisors (Shoura) to help him, whose names have been researched and recorded by Mehr.***

The Treasury *(Baitul Moot)*

In order to meet the financial needs of the Islamic state, a Baitul Maal (Public Treasury) was established along the directives of the Shariah which was responsible for managing practically all incomes and expenditures of the state.

Every soldier in the army was given at least three pairs of clothes and two pairs of shoes annually; in case of a special need, a Mujahid received additional clothes (or another pair of shoes). In winter additional warm clothes were provided to them. Every Thursday they received soap to wash their clothes. The sick were provided-with medicine. Small amounts of money were also sent to the families of such Mujahideen who did not have any source of income back home to support their dependents.*** The Baitul Maal also helped the Muslims in India who wanted to join the Mujahideen in the Frontier but did not have money to meet travel expenses.

The Baitul Maai was also responsible for providing rations to the Mujahideen. In the early stage, grain was bought and distributed among the Mujahideen. Later, when grain was collected in Ushr, it was sent to a place called Munai, where it was ground to flour under the supervision of Sayyid Hamid Ali Jhanjhanwi and a small group of the

Mujahideen deputed under him there for this purpose. They sent the flour to Panjtar where it was distributed among the Mujahideen according to a fixed measure. In the beginning Sheikh Muhammad Yusuf Phulati was in-charge for the distribution of daily rations. After him Meer Amanat Ali was made responsible for it. Then Sheikh Abdul Wahhab Lakhnawi was entrusted with this duty. Two to three other Mujahideen helped him when the load of work increased.

Other expenditures of the state were also met with the Baitul Maal. The main heads of expenditure were maintenance of the Office of the Records and Correspondence, buying and manufacturing ammunitions, travels of the Mujahideen for different purposes and hosting the guests. On two occasions, when about 2, 000 to 2, 50O scholars and chiefs assembled at Panjtar for consultation, the expenditure of the feast was paid from the Baitul Maal.[453] For a few months the salary of the soldiers who were hired due to special circumstances was also paid from the Baitul Maal.*[6]* Also, there was a regiment of the cavalry in the army and there were camels as well. The expenses for feeding these animals were also borne by the Baitul Maal.

Sayyid Ahmad had set up centers in India for collecting money for his mission. The largest of such centers was at Delhi which was managed by Shah Mohammad Ishaque and Shah Yaqoob. Money was generally sent to Sayyid Ahmad through *Hundt.**[5]* Trustworthy messengers of Sayyid Ahmad also transacted money in person.*'*[3] Money was also sent with the group of the Mujahideen who traveled from India to the Frontier. A great care was taken to make sure that the system of money transaction remained a secret. For this purpose Sayyid Ahmad wrote letters about it mostly in Arabic. Also he mentioned in such letters neither his name nor the name of the addressee and never mentioned the money or the amount in clear words. Sometimes he wrote the whole letter in code words which were incomprehensible to a stranger.[4]*[6]

The Baitul Maal was supported by l) donation, 2) war booty, 3) Ushr, 4) and Zakah. The presents in cash or kind offered to Sayyid Ahmad by his followers for his personal use or for the support of his mission fall in the first category. Such donations were sent mainly from India by the persons of means among the followers of Sayyid Ahmad. Donations also included the financial help offered by the common Muslims in India. An appeal for donations was made to Muslims in general, especially in the mosques, in response to which the devotees gave money to help the Mujahideen in the Frontier. At workplaces Muslim workers gave regular donations on monthly basis. Also, clay

pots were kept in the houses of the Muslims in which a handful of grain was put every day at the time of cooking. After a week or so, the grain was sold and the money earned by it "was given to the person responsible for collection in that locality to send it to Sayyid Ahmad in the Frontier.*[37]

But because this mode of income was inconsistent and uncertain and was, due to the cumbersome exchange system at that time, delayed in reaching the Mujahideen, they sometimes suffered great financial difficulties in the Frontier. At one time, only a handful of barley was the daily provision that each Mujahid received. When even that small quantity of grain was not avilable, they lived on the boiled leaves of the trees. Once they worked on wages in the local sugarcane fields with the permission of Sayyid Ahmad. On one such occasion of hardship, the wives of Sayyid Ahmad, who were staying in Sindh then, sent a sum of ten thousand rupees to support the Mujahideen in the Frontier.*[58]

The second source of income for the Baitul Maal was the booty. One-fifth of the booty was deposited in the Baitul Maal according to the injunctions of the Shariah and the remaining four parts were distributed among the Mujahideen. For instance, after the battle of Zaida the booty collected was estimated to be worth 25, 000 rupees, out of which the booty worth 5.0OO rupees was deposited in the Baitul Maal. Most of the Mujahideen also deposited their share in the Baitul Maal.*[5S]

The third source of income to the Baitul Maal was Ushr.*[6]" When the chiefs in the Frontier elected Sayyid Ahmad as Amirul Momineen, they decided to pay Ushr to him so that he could meet the expenses of the Center at Panjtar and dispose oft" its financial obligations smoothly This system, however, remained quite loose in the beginning. After sometime, Qazi Sayyid Mohammad Habban made a tour of the area and regularized the collection of Ushr and Zakah. Collectors of Ushr and Zakah were then deputed at important places who sent grain, or money earned by selling it, to the Baitul Maal at Panjtar. This made the income of the Baitul Maal steadz.

The collection of Ushr was managed in an efficient way. Mehr mentions the names of seven persons who were deputed in different areas to organize this work. These are the names, however, that Mehr could recover from the documents avilable. As he mentions, there must have been many more persons responsible for the collection of Ushr. They kept an account of the Ushr that they collected. Each of them had several Mujahideen to assist him, ranging from two to ten, depending on the need.[1*1]

Zakah was also collected by the.Mujahideen and deposited in the Baitul Maal. Although details about it are not available in the source books, there are, however, references to it. For example,

When Qazi Habban made a tour of the area to regularize the implementation of the Islamic Law, he made an arrangement for the collection of Zakah along with Ushr. As indicated, the Mujahideen responsible for the collection kept separate accounts of Zakah and Ushr.[40]*

The Secretariat *(Munshi Khana)*

There was a well-developed and well-organized secretariat located at Panjtar that managed and maintained official records and correspondence. It was headed by Munshi Muhammadi Ansari. According to Mehr, there were at least seven persons who officially held the *qalamdan* (regular official status); two additional helpers worked there without the *qalanidan.* On occasions, others were called for help; Mchr mentions names of four such Mujahideen.*™ The number of persons working in the Secretariat shows the importance of this office. This office discharged the following services:

1. It was responsible for writing letters for Sayyid Ahmad and Shah Ismail to the chiefs and rulers of the area relating to an issue or for Da'wah purpose. Letters containing important information and necessary instructions about state affairs were also written to persons responsible for work in the Frontier as well as in India. Also, Sayyid Ahmad wrote personal letters to his associates and family members. Probably, this office helped other Mujahideen to write letters to their families in India as well.
2. The Secretariat was also responsible for writing government circulars, and making as many copies of them as needed.- For making additional copies of circulars, additional hands from the Mujahideen were temporarily engaged.
3. At least one secretariat official accompanied each army which was sent for Jihad. He helped the commander in establishing written communication with the enemies, allies, and the headquarters at Panjtar. He also sent regular reports containing necessary details of the battle to the headquarters to keep it posted.
4. All important details related to the Movement, such as information about battles, dispatch of emissaries, visitors to the headquarters, income and expenditure, and in-coming letters and their replies, were recorded in a register with dates on a monthly basis. The register was changed every month.

5. In the record room were also kept copies of the sermons delivered by Maulana Shah Ismail. These sermons were about one hundred and were delivered usually in Friday and Eid prayers. Quite obviously, a staff of the Secretariat recorded these sermons. Some religious books were also kept in the record room simply because such books were not easily available in the Frontier: a hand-written copy of Shah Waliyullah's Tafliimate llahiya and a copy of Mishkat, the famous book of lladith, were among them.

Correspondence was handled with extreme care and caution. Every letter was carefully checked by Munshi Muhammadi Ansari, in-charge of the Secretariat, and then stamped and dispatched. If a letter was urgent, Sayyid Ahmad wrote on it in his handwriting *Kalimatullah Kafi* (Sufficient is the name of Allah). Sayyid Ahmad's seal was kept under the custodz of Shah Ismail If Sayyid Ahmad directly dictated a letter, the word *Huzoor* was written in a corner of it to differentiate it from those letters that were dictated by Maulana Shah Ismail. Shah Is mail's letters carried the symbolic word *Maulana* in a corner. Letters containing state secrets were written in code words, examples of which may be seen in Mehr's *Jania'ate Mujahirleen,* on pages 54-55. There were official seals of Sayyid Ahmad and Shah Ismail There was also a record room;

Ghazi Khan, Shahamat Khan and some other Mujahideen were deputed to guard it.[1]**

Department of Calling to Virtue and Forbidding from Evil (Amr bil ma'ruf wa nahi ʻanil munkar)

After the Islamic state was established in the Frontier under the leadership of Sayyid Ahmad, this department received due share of his attention. Mulla Qutbuddeen Nangarhari was made in-charge of this department. Thirty gunmen were put under his command. He toured the area with his soldiers to make sure that nothing forbidden in Islam was being practiced anywhere in the society. As Mehr writes, "In a very short time the whole area witnessed a radical change, people started following the etiquettes of the Shariah and feuds and clashes came to an end. All disputes were settled in accordance with the injunctions of the Shariah. If ever a soldier of Mulla Qutubudeen went to a village for any work, the villagers rushed to inform him'that there was nobody there who missed regular prayers."*[05]

The Army

The Mujahideen who joined Sayyid Ahmad at his call for Jihad soon formed an organized army. When he set out for the Frontier, Sayyid Ahmad formally distributed them at Gwalior into five units. This order was maintained during the journey to the Frontier and afterward as well. Details about these divisions of the army are as follows:

1. Special Battalion: *(Jama'ate Khaas)*

This battalion stayed in the middle of the army and was considered as the main part of it. Sayyid Ahmad used to stay in this division. Maulana Muhammad Yusuf Phulati was the first commander of this unit. After his death Maulvi Mohammad Hasan took over. When he met martyrdom, Mian Ziauddeen Phulati was appointed as its commander.

2. Front Battalion: *(Muqaddamatuj Jaish)*

This unit used to stay in the front while the Muslim army was on the move. Maulana Shah Ismail was its commander. On the eve of encounters Shah Ismail rarely stayed with this battalion, as on such occasions he was usually given the command of the whole army. In his absence, Sayyid Rustam Ali took the charge.

3. Right-wing Battalion *(Maimana)*

In a battle this unit fought from the right side. Its first commander was Amjad Khan who later returned to India for some work. As Mehr writes, it is not known who was appointed as the commander of this unit after him.

4. Left-wing Battalion *(Maisara)*

Sayyid Mohammad Yaqoob, nephew of Sayyid Ahmad, was the first commander of this unit. It fought in the battle from the left side. Sheikh Buddhnn took the command "of this unit when Mohammad Yaqoob was asked by Sayyid Ahmad to stay at Tonk. Sheikh Buddhan laid his life in the Battle of Akawra. After him Mian Salahuddeen became the commander. Finally, Maulana Ahmadullah Nagpuri took the charge and remained in command until the Battle ofBalakot.

5. Rear Battalion *(SaaqatuIJaisli)*

This unit used to move with carriages which transported luggage. Its first commander was Allah Baksh Mawranwi. It used to start first and usually reached the destination last. Peer Khan, Sheikh Hasan Ali, Mohammad Khan Khaitabadi, and Ibtahim Khan Khairabadi remained the commanders of this unit successively.*[60]

6. Unit of the Cavalry (Ghursawaar Dasta)

There was also a small battalion of the cavalry in the army which was given under the command of Abdul Hameed Khan. For this reason he was known as *Risaldar* in the army. After his martyrdom, Hamza Ali Khan became the commander of this unit.

In the beginning, there were about 550 Mujahideen in the army, who were divided into five units. Later on, a large number of Qandharis joined Sayyid Ahmad during his journey to the Frontier. They were divided in three new units which were given under the command of Lal Muhammad Lal, Mulla Qutubuddin Nangarhari, and Jafar Khan Qandhari. The ninth unit of the army consisted of forty soldiers. These were from the 200 paid soldiers who were relieved of their duties after two months, forty of whom decided to stay with the Islamic army without any remuneration. This unit was given under the command of Mirza Ahmad Beg Punjabi.[407] And then, as mentioned aljove, there was a battalion of the cavalry, thus bringing the number of the divisions to ten.[468]

The number of the Mujahideen increased as new people kept on coming from India to the Frontier to join Sayyid Ahmad. However, their number in the Frontier never became more than 2, 500 at any time[1459]. But committed, disciplined, and selfless as they were, they prevailed over their opponents who were superior to them in number and resources.

The arms commonly used in the Islamic army were guns which were used those days in the battlefield. Other weapons used by the Muslim army were Qarabeen, Zamburak, and Shaheen. Qarabeen was a short gun with relatively wide opening. Zamburak was a small cannon and was, therefore, easy to move from one place to another. Shaheen was a firearm larger than a gun and smaller than a cannon.*[70] The Islamic army captured large cannons in the battles of Zaida and Mayar which became an important addition to their stock of arms. After settling down at Panjtar, the Islamic army established a factory there in which ammunition was manufactured for cannons. The Mujahideen also used swords, spears, sharp-edged sickles with wooden handles called *Gandasa,* and daggers Long wooden ladders were also prepared to climb the walls of a fort in a battle.*[71]

There were different physical fitness centers in which the Mujahideen were given military training. They did different kinds of physical exercise and practiced military skills in those centers. Occasionally, horse races were also organized. Sayyid Ahmad himself attended the training centers and participated in the exercises. For

weeks he practiced a duel with Risaldar Abdul Harneed Khan in which both were on horseback and used spears. It was magnificent and was watched with admiration by the Mujahideen. Nawwab Wazeerud Dawla writes: "Horse racing, fencing, spear handling, using cannons and guns, practicing martial games, [learning tactics of] conquering forts and subjugating enemies: with this aim, all kinds of«arms were gathered."[47]* In order to keep the spirit of God-consciousness strong in the Mujahideen, a poem by Khurram Balhowri, *Jihadiya,* was sung right in the heat of the battle.

The Flags

There were three main flags and on all of them the verses of the Our in were beautifully embroidered in silk thread. These flags were named as *Sibgliaiullali, Moti'ullali,* and *Fathullah. Sibghatullah* was the flag of the Special Division on which were embroidered the last verses *(ruku)* of the first book *(para)* of the Qur'an in red silk thread. Abul Hasan Nascerabadi carried it in the battle. This flag was taken out only in a battle in which Sayyid Ahmad participated. *Moti'ullah* was carried by Ibrahim Khan Khairabadi. On it was embroidered the last portion *(fuku')* of *Surah Al-Baqara* in red silk thread. *Fat/mlla/i* was carried in the battle by Mohammad Arab and later by Farjallah Shaidi. On it were embroidered verses from *Surah al-Saf.* There must have been some other flags. These three, however, were the main flags.*[73] When the flags of the army were unfurled, the Qur'anic verses embroidered on them reminded the Mujahideen of their sublime aim, strengthened their faith and enhanced their enthusiasm.

The Medical Center *(Sliafa Khana)*

There was a well-developed Medical Center in the army. Professionals well experienced in medicine and surgery worked in it. These persons also fought in the battle, if the occasion allowed. That is why some of them achieved martyrdom in the battlefield. Some persons who were experts in surgery - performing different kinds* of operation, taking out bullets from the bodz, and stitching wounds - had joined Sayyid Ahmad from India.[474] Mehr mentions the names of Kareem Baksh, Noor Baksh, Abdur Rahim, Haji Jani Amethwi, Jan Mohammad Jarrah Rampuri, and Abdur Rahim Jarrah Jansthi who worked in this center. He mentions that more persons must have been working in this center, but their names are not known. Some other Mujahideen provided post-surgical nursing services. They also treated the sick Mujahideen in normal situations. Mehr mentions the names of the persons who were responsible for nursing. Medicines were prepared locally, but some special medicines were imported from India.*[75]

The Store *(Tosha Khana)*

There was a store in the army to keep grain for ration, arms, clothes, and other necessary articles for the Mujahideen. It was called *Tosha Khana.* It was from here that daily rations for the Mujahideen were distributed. The Mujahideen were given clothes for daily use, clothes for winter, shoes on an annual basis, and soap for washing clothes on a weekly basis. These articles were stocked in the store. This store was also used to keep arms. The followers of Sayyid Ahmad sent different kinds of arms, such as dagger, sword, pistol, and gun through the Mujahideen who came to the Frontier to join him. The local chiefs also presented arms to Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad also bought different kinds of arms. As Mehr writes, "Arms were kept in the *Toslia Kfutna* of Sayyid Saheb QSayyid Ahmad]]. When needed, these arms were distributed [[among the MujahideenJ."[476] The Mujahideen also collected different articles as booty in the battles that they won, a part of which was deposited in Baitul Maal. All such things, again, were kept in the store.

The Stable *(Astabaf)*

The Islamic army also had a stable to keep horses. As there was a unit of the cavalry in the Islamic army, there were a number of horses to take care of, which required a separate arrangement: accommodation and attendants. Camels were also used in the army to transport luggage, especially in the sandz areas, and there must have been a proper place to keep them. When the Mujahideen went back to Panjtar after Sayyid Ahmad's martyrdom, the camels were an important part of the Army. Maulana Wali Muhammad, the then Amir of the Mujahideen, ordered that the camels be brought to Panjtar from Nandheyar as the climate of Nandheyar. was quite cold and therefore not suitable for the camels. At the time of the Battle of Zaida the number of the camels had reached up to eighty. Later several of them died and only ten to twelve survived.*[77] At one time there was also an elephant in the army. Several Mujahideen were responsible to look after the animals.

Water Porters *(Saga)*

There was a group of the Mujahideen who performed the duty of water porters *(saqa).* As it is obvious, they were responsible for supplying water to the Mujahideen in the battlefield [47]

C. THE JUDICIARY

The Judiciary held a revered positiqn in the Islamic state at Panjtar and resolved legal issues in the light of the guidelines of the Islamic Law

Important details relating to its structure and way of functioning are as follows.

General Structure

The Islamic judges *(Qtizaat,* plural of *Qazi)* were deputed by the state at different places and their jurisdictions were specified People with legal issues approached these judges who helped them resolve their disputes in the light of Islamic injunctions. There was then a Chief Justice *(Qaztul Quzaat]* who supervised the work of the Judges and kept the judiciary organized under the Islamic judicial system. As mentioned earlier, first Sayyid Habban was appointed as Oaziul Quznt, but after his martyrdom in the Battle of Mardan this position was given" to Maulvi Muhammad Ramadan.[479] If a party was not satisfied with the verdict of a judge, the Chief Justice (Qaziul Quzat) was to be approached The whole system was, finally, under the supervision of Sayyid Ahmad for administrative purposes because he was the Head of the State and was responsible to make sure that each part of the state was functioning properly. It is relevant to mention here that Maulana Abdul Hai Budhanwi was the first person to be appointed as the Qazi of the Islamic army who was also given the responsibility of assigning different duties to the Mujahideen.[480] *Mtlflts* (the Islamic Jurists) were also appointed at suitable places to guide Muslims in matters relating to Islamic laws.

Guidelines

After his election as the Amirul Momineen, Sayyid Ahmad organized the Judiciary in a more formal way. In an announcement of general nature, he gave a guideline to the people of the area how ' the Judiciary would function. He wrote in a circular:

1. If there is a dispute between two parties, people should not try to settle it themselves. The matter should be referred to the Qazi of the area. Also, it is not proper for anybodz to interfere in legal matters.

2. Whatever a person has to say about his case, he should say it clearly in front of the Qazi. If he does not do so, there is a possibility that the Qazi makes a mistake and, thus, injustice is unknowingly done to a party. Such a situation will be very unpleasing to Allah and His Prophet.[481]

3. If a soldier of the Islamic army gives an unjust order to anybodz without the approval of the Qazi of the area, the Qazi will punish him. If the Islamic judges *(Quzat)* commit a mistake,

Sayyid Ahmad as the Head of the state will do the reprimanding. Whoever wants an order to be passed and circulated as law should do so through the Qazi.[482]

The Judiciary was duly empowered to discharge its duties and ensure that justice was granted to one and all. It was manned by capable and God-fearing people who worked in full accordance with the injunctions of the Shariah.

The Islamic state established by Sayyid Ahmad was unfortunately destroyed by the local chiefs of the Frontier and their allies, which has been covered in Chapter One of this book, but it is very heartening to see that Sayyid Ahmad was successful in establishing an Islamic state which so closely followed in structure and spirit the model of the early Islamic state established by the rightly-guided Caliphs. It should also be appreciated that even after his martyrdom his followers worked tirelessly to implement the Islamic Law in the areas under their influence. This effort, as a matter of fact, continued for more than a century in spite of fierce opposition.

Reference: Life, Mission and Contributions
Academy of Islamic Research and Publications Lucknow, India

Struggle For Islamic State And Society: An Analysis Of Syed Ahmad Shaheed's Jihad Movement

Dr. Sultan Mahmood *
Hafiz Nasiruddin **
Dr. Muhammad Rizwan ***

Abstract

Syed Ahmad Shaheed's Jihad Movement is an important episode of Khyber Pakhtunkhwa's history. It played the role of fore-runner of Pakistan Movement in Indian subcontinent. This movement became the source of inspiration to Muslims of India in their struggle for preservation of Muslim culture, protection of their separate identity and establishment of an independent Islamic state in this region of the World. Those Muslims who later struggled for Pakistan saw Syed Ahmad and his followers as role-models fighting bravely against domination of non Muslim rule and scarifying their lives for the cause of Islam. This studz aims to critically examine objectives of Jihad Movement, its achievements and failures and role of people of Khyber Pakhtunkhwa in it. Studz will contribute significantly to understand problems and prospects of Islamization in this region.

Keywords: Islam, Jihad Movement, India, NWFP, Culture

Introduction

Jihad Movement of Syed Ahmad is inevitable and significant component of History of Khyber Pakhtunkhwa. Due to his sincerity and commitment with the cause of Islam, Syed Ahmad received great respect and love of the people of this region during his stay in this

region of Pakistan and is still remembered with respect and reverence. Dr. Jehanzeb Khalil, who belongs to the area of struggle of Syed Ahmad, observes in his doctoral research on *Mujahideen* Movement: æthe purpose behind his struggle was not worldly gain, fame and popularity, but the purpose was to submit to the will of Allah and to follow the Sunnah of the Prophet (PBUH).[1] Muslims of different tribes of the area; Arbabs, Yousafzais,

Afridis, Khattaks, Mohmands and Khalils and people of Swat, Buner and Pakhli joined Syed Ahmad's struggle against Sikhs. In the battle of Shaidu about 100, 000 Muslims of the present Khyber Pakhtunkhwa were fighting under Syed Ahmad's leadership. Many of them embraced martyrdom along with him in his last battle at Balakot.

Political, social, economic and religious decay of Muslim society in the Indian sub-continent that started in the eighteenth century widely spread through the early ninetieth century. Political supremacy of Muslims had practically come to an end and the military power completely incapacitated itself to protect life and property of the people. In a letter, Syed Ahmad portrays declining conditions of the Muslim community and decay of the Mughal Empire in these words: æLarge part of the India has been captured by foreigners. They have adopted the policy of brutality and injustice. Government of Indian (Muslim) rulers has been vanished. No one has courage to challenge them. Everyone has started to consider them his master." [2] The simple monotheistic teachings of Islam had been polluted and ignored. Many innovations and un-Islamic traditions had been introduced and sanctified. Mughal rule in India had almost ceased to exist and political scene was dominated by British Empire, represented by East India Company, which controlled most of northern India, the Marhattas in southern and central India, Sikhs in north-west and hundreds of powerless rulers of princely states"[3]. Present Punjab, Kashmir and Khyber Pakhtunkhwa of Pakistan were being ruled by Maharaja Ranjit Singh, who was considered a tyrannical autocrat. Sikh militia took the control of Lahore on 7 July 1799 and consequently Ranjit Singh was crowned on 12 April 1801. The Muslims heavily suffered under his oppressive rule. They were denied liberty and freedom to perform and practice their religion. After the capture of Lahore, Badshahi Mosque was severely damaged when Ranjit Sigh used its vast courtyard as stable for his army's horses and its 80 *Hujras* as quarters for his soldiers, while the Huzuri Bagh, the enclosed garden next to the Mosque was selected as Maharaja's official royal court of audience."[4] James Abbott observed:

> Any Mussalman praying in Public was liable to be slain on the spot by any armed Sikh…The calls to worship and attendance at the *Masjid* (mosque) were forbidden. while the slaughter of a cow or a bullock was punished by death.[5]

Remaining India was under direct or indirect rule of British.

Early Life

Syed Ahmad was born on November 29, 1786 AD at Rai Bareli, a small town near famous cities of Lukhnow and Allahbad.[6] His father, Muhammad Irfan belonged to a respected family of Audh, ærenowned for its holiness and religious learning. His great-great-grandfather, Syed Ilmullah, who lived in the reign of Emperor Aurangzeb, was a celebrated saint of his age. He also had the distinction of initiating others into the spiritual path of mystics."[7] Ancestral Khanqah of his family '*Takiyah-i-Ilmullah*' was a centre of guidance for the people of area and this is the place where Syed Ahmad was born. His grandfather was patron of this Khanqah.

Syed Ahmad possessed outstanding mental and physical capabilities. Formal system of religious education failed to attract him. Due to his nature and temperament famous scholar of that time æShah Abdul Aziz concluded that Syed Ahmed would learn little through formal education and that his knowledge would come through spiritual means".[8] He could not show much interest in formal religious education but æon many occasions in latter life he surprised more learned men by his understanding and exposition of complicated problems.[9] He delivered effective and impressive sermons. It was the strength of his spiritual knowledge, character and commitment to the cause of Islam, on the basis of which he was widely respected by the people and distinguished scholars of that time like Shah Ismail, Mawlana Abdul Haiy and Maulana Mohammad Yousaf of Phulat accepted Syed Ahmad as their spiritual preceptor and entered into his discipleship.[10] Thousands of people including prominent intellectuals of that time expressed their confidence in his leadership through oath of allegiance on his hand.[11] According to analysis of a scholar of that time 40 thousand Hindus embraced Islam on his hand and three Million Muslims took oath and swore allegiance to him.[12] Wilayat Ali Azeemabadi observed that thousands of religious scholars and hundreds of Hafiz and Muftis took oath and swore allegiance on his hand.[13]

He was greatly impressed by the teachings and doctrines of Shah Waliullah regarding reformation and emancipation of Muslim society. Shah Wiliullah's ideas emphasizing establishment of Islamic state and sprit of *Jihad* had greatly influenced Syed Ahmad Shaheed and he sincerely played the role of executor of the philosophy of Islamic revivalism which had been propounded by Shah Waliullah and his son Shah Abdul Aziz. Due to his natural inclination towards Jihad, at the age of seventeen, he joined the army Nawab Amir Khan, the ruler of Tonk as Sawar. During his service Syed Ahmad learnt military techniques, strategy and discipline. This experience played important role to make him a great military commander in the years to come. Syed Ahmad believed on struggle against foreign domination of non-Muslim forces. So he left the army of Tonk when Nawab Amir Khan reconciled with British and refrained to fight for freedom after Tonk fell to the British.[14]

Preparation for *Jihad*

Syed Ahmad sincerely desired to see the restoration of supremacy of Islam. When he analyzed the causes of dominance of no-Muslim forces in India, he came to the conclusion that basis of the situation was the absence of the spirit of *Jihad* and the spirit of sacrifice for the cause of Islam. æThe sub-continent had alreadz been declared Dar-ul-Harb by Shah Abdul Aziz; therefore, it was religious obligation upon every Muslim to wage *Jihad* against the non-Muslim foreign forces".[15]

He was extremely dismayed to see the decline of the Muslims, but he realized that neither Mughal emperor of Delhi, nor Muslim rulers of Indian states were capable and enthusiastic of waging Jihad for establishment of an Islamic state. They were not prepared to scarify their luxurious lives and material benefits for it. He was convinced that he would have to take practical steps and play leading role in this respect. For this purpose he started a movement of mass contact to create spirit of *Jihad* among Muslims. He toured long way in the subcontinent, villages and towns, meeting all sections of people to urge them for Jihad. A letter of Syed Ahmad written to Sadozai ruler of Afghanistan, Shah Mehmood reflects Syed's sentiments. He wrote æTo uphold Jihad and to crush rebellion, at any time and at any place, has been the cardinal commandment of God, particularly, at such a time when the criminal acts of non-believers have gone to such an extent that all the religious practices (of Islam) are being destroyed, political disturbances are created in the Islamic governments, and the seed of dissention is sown among the Muslims all over India, and adjoining countries. In this situation the apathy on the part of the

Muslims is tantamount to a great sin. For this purpose the scholars of Islam have come out of their homes and are inviting Muslims for *Jihad*".[16]

In 1821 AD he left for Hajj along with his 753 companions.[17] Muslims of India had forgotten their responsibility to perform Hajj, which is obligatory for every Muslim who can afford it. In this perspective Syed Ahmad had decided to revive the performance of Hajj. After Hajj, he took the oath of Jihad from his companions at the place of Haqba in Mina, where Holy Prophet (PBUH) had taken the oath of allegiance from Ansars of Madina.[18] When he returned from Haj after three years, he devoted himself to two major tasks: reformation of Muslim society and æpreparing his followers for *Hijrat* (migration) to trans-Indus tribal areas (North West Frontier) for *Jihad*."[19]

Selection of Khyber Pakhtunkhwa as Battle Field

Syed Ahmad had chosen the area of present Khyber Pakhtunkhwa as his center for waging *Jihad* because of the warrior nature of the Pashtoons and their bravery, love and devotion for Islam; qualities unparalleled anywhere in the sub-continent. He was deeply concerned over decline of Muslims in India. In a letter to Shah Salaiman of Chitral he writes that æI am greatly grieved over this situation and these feelings have urged me for migration and *Jihad*".[20]

Although whole Muslim population was under the domination of non Muslims; British in the East and Sikhs in the west, but condition of Muslims under the rule of Sikhs was worst. æSyed Ahmad used to say that when a Muslim state has been occupied by Non-Muslims, then *Jihad* becomes obligatory, both for the Islamic Ummah (Muslims)".[21]In a letter to Shahzada Kamran, the son of Sadozai ruler of Afghanistan Shah Mehmood, Syed wrote:

> Jihad has become inevitable as the non-believers have spread all over India. I said good-bye to my country and came to Khhurasan to invite
>
> and organize all the people for Jihad. I settled in the Yousafzai territory, and the Afridis, Khattaks, Mohmands and Khalils, also the people of Kashmir, Swat, Buner and Pakli have joined me. My mission is not to establish my government or gain power but to work for the rule of Islam. Moreover, I want to free the Islamic territories from the usurpers and when the areas are freed from the non-believers and hypocrites, I would hand them over to their rightful owners,

> provided they promise that they would not give up *Jihad* and would refrain from injustices, and un Islamic practices. [22]

The letter reflects that he equally disliked the domination of British who had deprived the Muslims of their sovereignty in the sub-continent. But he selected frontier to begin his struggle. Syed Ahmad was disciple of Shah Abdul Aziz who had declared the subcontinent to be Dar-ul-harb because the region was dominated by British. Mentioning the reason to declare India as *Dar-ul-Harb*, Shah Abdul Aziz stated æthe writ and decree of Imam-ul-Muslimeen is not established, on the contrary the injunctions of powerful Christians are followed without any impediments."[23] Syed's *Jihad* movement was based upon the ideas of Shah Abdul Aziz. These facts prove that Syed's ultimate aim was independence of whole India, not only the area under Sikhs. Syed's decision to quit the army of Tonk after the reconciliation between Nawab of Tonk and British also confirms his mindset regarding the domination of British. Ishtiaq Hussain Qureshi writes when Nawab æAmir Khan made peace with the British, Saiyid Ahmad did not attach any importance to the need of earning a livelihood and returned to Delhi".[24]

Syed Ahmad was a great statesman and he was guided by reason and circumstances. He realized that it was not feasible to fight against the British forces that were better equipped and organized and were in firm control of most of northern India. On the other hand æthough Ranjit Singh had built up an effective and large army, yet his government was not as securely established as was British rule in Indian territories."[25] Initiating Jihad in the region surrounded by British controlled area was not achievable task. In this perspective Syed Ahmad decided to start his *Jihad* against Sikhs. Due its strategic location, geography and demography, pukhtun area of present Khyber Puhktunkhwa could serve as most suitable base for military operation against the Sikhs. After beating Sikhs in Punjab and Kashmir, he could be in position to challenge the British. He writes in a letter:

> After it (Success in jihad against Sikhs) I, along with my companions, will leave for India-- to purify it from infidelity and hypocrisy. Because my real aim is Jihad in India, not to permanently live in Khurasan (Pukhtun areas under Sikhs and Afghanistan).[26]

In his book, *Hayat-i-Syed*, Mohammad Jafar Thanesari argued that æthere was no intention of turning the movement against the British".[27]

But Syed Ahmad's above mentioned letter refutes this argument. Activities of Syed Ahmad's followers after his martyrdom at Balakot confirm that Jihad movement was not confined against Sikhs. Syed's companions did not give up their struggle for freedom of Muslims and supremacy of Islam and continued to fight against Sikhs and later against the British when they captured the Sikh territories. Their resistance against British was so strong that æin 1863, the British had to send two European and six native regiments" to their æstronghold of Sithana in the north western hills, which was bravely defended and the British force was held at bay."[28] In the words of an analyst æafter the British conquest of the Punjab, the movement should have come to end, if the Sikhs alone were the target" but his companions æremained active against the British".[29] Thanesari was companion of Syed Ahmad. So in this context his view according to I.H. Qureshi æwas obviously an afterthought put forward when the movement against the British had been ruthlessly crushed and motive seem to" save them æfrom British vindictiveness".[30]

He selected the area of present Khyber Pakhtunkhwa as his battlefield. Syed Ahmad was sure that as the Muslim government of Afghanistan was at his back and the people of whole area were enthusiastic Muslims having reputation of being good warriors, his call for Jihad would attract a large number of Muslims. Most people of the area æwere Afghans by race and so the *Mujahideen* would find sanctuaries against the Sikhs and later the British, in the tribal territories and Kabul".[31]

Another cause of his selection of NWFP was large-scale resentment, frustration and unrest among Pukhtoons against brutalities of Sikh rulers. During his stay at Rampur, Syed came into contact with certain Afghans coming from Kabul. They narrated Sikh atrocities towards Muslims of North-Western India. On this occasion, he decided to wage Jihad against to liberate Muslims from the clutches of brutal rule of Sikhs.[32] There was extreme mistrust and hatred between Sikh rulers and Muslim population of the area.[33] Such circumstances of widespread discontent always provide fertile soil for uprising in any society.[34] Muslims of this area æhad suffered and thus they could be easily organized to fight against their tormenters."[35]

Keeping in view whole struggle of Syed Ahmad Shaheed we can summarize that there were three major aims of his movement:

1. Establishment of Islamic state.
2. Reformation and purification of society from un-Islamic traditions and practices.

3. Restoration of *Jihad* and raise awareness of *Jihad* amongst Muslims of the region.
4. To free the Muslims of Punjab from the clutches of Sikhs.

He started his journey along with his 500-600 companions on 17th January 1826. It was not possible to reach the Pakhtun areas directly through Sikh territories. Therefore he had to choose a circuitous route through Gwalior, Tonk, Ajmer, Rajputana, Marwarr, Sind, Baluchistan, Qandahar, Ghazni and Kabul. In

Sindh he arrived Pir Kot on 24 June 1826, where he was warmly welcomed by Pir Sibghatullah Shah Rashdi [36] In Shikarpur 20, 000 people of the city and adjoining area offered prayer under the leadership of Syed Ahmad. Ruler of Shikarpur, Agha Mohammad Kazim Shah expressed his desire to join Syed Ahmad for *Jihad* but Syed advised him to stay and promised that he would be called whenever required. [37] It reflects extent of respect of Syed Ahmad among the people of that area. During his stay at Afghanistan, Syed Ahmad Shaheed tried to unite Amir Dost Mohammad Khan and his brother for the cause of Jihad, but he could not succeed in his efforts. Consequently he left the Kubul on 15 November 1926. He arrived Peshawar in the end of November 1826. [38]

People of the area realized that Syed Ahmad's aim was to make this area centre for their struggle of Dahwa and *Jihad* for the establishment of Islamic state, initially against Sikh rulers of Punjab and then against dominant power of British.[39] So he was received with warmth in Chamkani and Charsadda and large number of Muslims vowed to support him against Sikhs. After a short stay at Chamkani and Charsadda, he along with his followers left for Nowshera Kalan.

Before starting armed struggle against Sikhs, Syed Ahmad sent a message to Ranjit Singh to accept Islam but received no positive response from Ranjit Singh.[40] Syed Ahmad Shaheed's increasing strength alarmed the Sikh rulers of Lahore. Consequently they ædispatched well-armed force of 7000 men under the command of Budh Singh" [41] Syed Ahmad Shaheed decided to attack Sikh forces at night. He detailed the squad of 900 *Mujahideen* under the command of Allah Bakhsh Khan. [42] Muslim forces won the battle. In this battle 82 *Mujahideen* martyred and 30 to 40 were wounded, while 700 Sikh soldiers were killed and one thousand horses huge amount of war material had ceased to the *Mujahideen*.[43]

Achievements of *Mujahideen* impressed Muslim population of the area. Consequently large number of people started to join the squad of Syed Ahmad Shaheed. Various Sardars and Khans also swore

allegiance to Syed Ahmad and announced their support for him. Fateh Khan Panjtari, Raees of Khadokhel and Ashraf Khan, Raees of Zaida were significant personalities among them. Khadi Khan, Raees of Hund was most prominent and influential person who vowed to support and obey Syed Ahmad. On the invitation of him Syed Ahmad decided to set up his headquarter at Hund which was considered a prominent centre of power at that time due to strong fortress and well-equipped force of chief of Hund.[44]

Consecutive achievements of Syed Ahmad Shaheed's forces made a deep impression on the minds of tribesmen and reinforced peoples' confidence in his leadership. Consequently he was elected as *Imam-ul-Mujahideen* in a large gathering on 11 January 1827.[45] On the occasion various Pathan notables, mystics, and common people pledged themselves to jihad under Sayyid Ahmad's leadership.[46] Within next two months, 80, 000 people joined his squad. Realizing popularity and new status of Syed Ahmad Shaheed, Barakzai Sardars of

Peshawar Sardar Yar Muhammad Khan and Sultan Muhammad Khan sent him letter of goodwill acknowledging his leadership. æWary of the Sayyid's rising stock among Pathan tribesmen, the Durrani brothers calculated that joining the assemblage carried fewer dangers than outright opposition.[47]

To avenge their defeats at Attock and Hazro, Sikhs started to gather their force with more than 35000 fully equipped soldiers at Shaidu. Syed Ahmad Shaheed also reorganized his forces to combat Sikhs. In the first week of March 1827, he proceeded from Hund to fight against Sikh forces, stationed at Shaidu under the leadership of Budh Singh. Barakzai sardars Yaar Mohammad Khan, the ruler of Peshawar, Sultan Mohammad Khan, ruler of Kohat and their third brother Pir Mohammad Khan also joined the squad with their 20, 000 men thus enhancing the number of fighters under the leadership of Syed Ahmad to 100, 000. Forces of Barakzai sardars were stationed at left bank of river Kabul. There were 33, 000 Sikh soldiers under Budh Sing in the village of Shaidu and 20, 000 reserve soldiers under Hari Singh waiting near Attock river.[48]

On the eve of the battle, Yaar Muhammad Khan made Syed Ahmad sick by poisoning him in the evening meal.[49] Despite severe illness and critical condition Syed Ahmad lead his squad in the battlefield. *Mujahideen*'s initial attack was very successful and they killed large number of Sikh soldiers. At the time when battle was in the final stage and *Mujahideen*'s success was certain, Sardar Yaar Muhammad Khan who was apparently supporting Syed Ahmad,

withdrew his men from the battle. He shouted at once ædefeat, defeat" and run away from the battleground. [50] Yaar Muhammad's this trick changed the whole scenario. Soldiers lost their morale and started to retreat. In this situation of disarray only a few people who were sincere to their cause stayed to fight. One such person was Godhri Shahzada. The question arises why Yaar Muhammad Khan betrayed Syed Ahmad? Syed Abul Hassan Ali Nadvi thinks that Sardar Budh Singh had achieved the clandestine support of Yar Mohammad Khan before the battle of Shaidu and it had been decided that Yaar Mohammad Khan would run out of the battlefield along with his men. [51] About 6000 Mujahihideen embraced shahadat in this battle. Yaar Mohammad Khan's betrayal was major reason of this heavy loss of lives. 52

Syed Ahmad was seriously ill due to poisoning and required rest. He left for Swat and Buner. There he stayed at the Chinglai, Koga, Takhta Band, Barikot, Ouch and other places. During his stay in the area, æhe visited and preached to the people in the surrounding areas of Buner and Swat, so as to reform them, and to persuade them to join his mission". [53] During this visit according to Syed's own estimate, about 400000 people pledged the oath of allegiance on his hand.[54]

He also wrote letters to the Muslim rulers to seek their support for *Jihad*. Prominent names of such rulers are:

1. Amir Dost Mohammad Khan Barakzai, Ruler of Kabul
2. Yar Mohammad Khan Ruler of Peshawar
3. Sultan Mohammad Khan Ruler of Kohat and Bannu
4. Said Mohammad Khan, Ruler of Hasht Nagar
5. Shah Mahmood Durrani, Ruler of Hirat
6. Nasrullah, Ruler of Bukhara
7. Sulaiman Shah, Ruler of Chitral
8. Painda Khan Taoli, Ruler Amb and Darband (now part of Hazara Division of Khyber Pakhtunkhwa)

He also wrote letters to influential Khans and Maliks of different tribes explaining to them that when Non-Muslims usurp the land of Muslims, it is obligatory for Muslims; especially leaders and rulers to engage in battle with infidels till their freedom is restored. If this is not done, then we would have sinned and thus will not have the blessings of Allah in anything that we do.[55] He also started to plan for liberation of the Muslims of Hazara from tyrannical rule of Sikhs.

After staying at different places in Swat and Buner, Syed Ahmad finally selected Panjtar at his permanent base and headquarter. Panjtar is a central place in Khadu Khel territory and is situated in the north-

west corner of Mardan District. It is naturally secure and defensible place, being surrounded by mountains. Panjtar means a place covered from five sides, as this place is surrounded by five mountains.[56] On 6 February 1829, at a special meeting at Panjtar, tribal chiefs and ulema agreed on establishment of Islamic government under the leadership of Syed Ahmad. They took the oath of allegiance on the hands of Syed Ahmad, willingly accepting the enforcement of *sharia*. After another meeting of tribesmen on 20 February 1829, Sayyid Ahmad began appointing judges in different parts of the frontier. Maulvi Sayyid Muhammad Haban was selected as the chief judge *(qazi-ul-qaza)*.[57]

Occupation of Peshawar

Syed Ahmed and his forces occupied Peshawar in 1830 but against the advice of many sincere fellows, he decided to forgive Sultan Mohammad Khan. In November, 1831, after nearly two months of occupation of Peshawar, Syed Ahmed withdrew from Peshawar in favour of Sultan Muhammad Khan on the conditions that he will remain obedient and implement Islamic law in the area. Consequently Moulvi Syed Mazhar Ali was appointed as Qazi of Peshawar. He, according to directions of Syed Ahmad, enforced commandments of *Shariat* in the city. Due to his measures, shops of wine and hashish and opium got closed.[58] But ultimately Syed Ahmad's decision to forgive Sultan Mohammad Khan and appoint him sardar of Peshawar again was proved wrong as Sultan Mohammad Khan later took revenge of his brother's death and not only killed Moulvi Syed Mazhar Ali but also conspired and encouraged the tribal chiefs to kill 150 aamirs of Syed in one night.

Balakot Fight and Martyrdom of Syed Ahmed

Being greatly disappointed with the treachery and betrayal of the Khans of Peshawar, Syed Ahmad and his followers decided to leave the area and æconcentrate their efforts against the Sikhs in Hazara and Kashmir".[59] So after relinquishing the Panjtar base, Syed Ahmad migrated to Hazara. He stationed at Balakot, a small town in Kaghan valley of Hazara, considering it safe for *Mujahideen*.

The *Mujahideen* were attacked by the Sikh army under the command of General Sher Singh. æHere too, the local Muslims spied for the Sikhs and led them through a secret route in close proximity to the *Mujahideen*'s camp."[60] A fierce battle was fought between the Sikhs and the Muslims. The *Mujahideen*

fought bravely but could not stand the much stronger and superior forces. The *Mujahideen* were defeated in the battle in which Syed

Ahmed Shaheed, Shah Ismail Shaheed and many other followers of Syed Sahib embraced martyrdom while fighting for the cause of Islam.

With the death of Syed Ahmed the Jihad movement could not be carried out with the old enthusiasm. Some of his disciples struggled to continue the movement and were successful to a certain extent. But the movement extremely lacked in organized leadership after Syed's death and, therefore could not be conducted for a long time.

Conclusion

Although Jihad Movement was a sincere effort for the restoration of Islamic glory in the Sub-Continent yet it could not achieve its immediate objectives due to various factors. Lack of funds, equipment and proper training of *Mujahideen* was a major factor. On the other hand Sikh Army was well equipped and large in number. On the other hand Sikh army possessed modern weapons, was well organized and had been given quality training by the British and the French officers. Ranjeet Singh acquired the military services of the experienced French General Jean Baptiste Ventura and General Fracois Allard in 1922. They imparted training upon the soldiers of Sikh Army. On the other hand *Mujahideen* lacked in training and modern weapons. While selecting this area for Jihad, Syed Ahmad Muslim expected cooperation of government of Afghanistan at his back. But his expectations remained unfulfilled. 61

Selfishness and consequent deception of Pathan Chiefs especially betrayal of Sardar Yaar Mohammad Khan and Sultan Mohammad Khan also jeopardized the movement. They time and again played a double game with the *Mujahideen*. According to Dr. Jehanzeb Khalil æchieftains of the area were neither sincere to Syed Ahmad nor to Islam".[62] While analyzing the reasons of failure of the movement Ishtiaq Husain Qureshi observes that æthe main reason was the narrow selfishness of the tribal chiefs. Many of them did not understand the full implications of the establishment of the non-Muslim rule in such proximity to their homeland." [63] For them Sikh's domination æseemed to be still some distance anyway whereas the Saiyid's domination was an immediate and palpable reality. So they supported Sikhs against Syed Ahmad. While analyzing the alliance between Sikhs and selfish Pathan sardars, K.J. Ahmad observes:[64]

> He (Ranjit Singh) sowed the dissentions among Pathan supporters of the Syed through bribery and intrigue. He made secret approaches to some of the influential tribal chiefs supporting the Syed, including Yar Muhammad, the Chief of Peshawar, asking them to withdraw their support on promise

> of concessions. He even warned them that the Syed's victory in the area would mean the domination of Indian Muslims over the Pathans. Thus a task which could not be achieved by Sikh arms, was accomplished through treachery of Muslims themselves.

Jealousy and rivalry among tribal chieftain of the area also played important role to undermine the movement.[65] There was lack of unity among local Khans and Maliks who never remained united on a single platform against the enemy. It was extremely difficult to keep such men together for any common cause. æThere were so many feuds among them that if one sided with the Saiyid, the other decided to oppose him. There was so much jealousy even among those who supported the movement, that if one was commended in any way for some service, the other resented it.[66] Khadi Khan, Raees of Hund is prominent example of this fact. He initially supported Syed Ahmad, but due to jealousy against the Khan of Panjtar, he æconsidered the shifting of the *Mujahideen* base from Hund to Panjtar as a personal affront" and started to support Sikhs against *Mujahideen*.[67]

Local controversies on implementation of tax after the establishment of Islamic government undermined the movement. Pakhtuns were unused to organized Islamic government. For them Islam was merely a set of rituals.[68] In this perspective enforcement of Islamic law and consequent observance of Islamic commandments in economic and social spheres created resentment and alienation.[69] I. H. Qureshi observes that enforcement of Shariat laws was in conflict with their customary laws. People were ænot used to the observance of any law beyond what was approved by tribal usage and custom".[70] Many people considered it their disrespect to marry their daughter without receiving handsome amount from the families of the bridegrooms. But this tradition served as an instrument of injustice for women. Many families of bridegroom were unable to pay the money after Nikah. So the girl could neither join her husband nor could marry another. Families of such girls were urged to æwaive the demand for money and attempts were made to get older girls married without any financial gain to girl's family".[71] Those like Khadi Khan initially supported Sayyid Ahmad became hostile when the repercussion of the Islamic government adversely affected their exploitation of common people. A major reason of Khadi Khan's resentment was Syed Ahmad's action to help the residents of Manairi to overpower Khadi Khan's men, who had usurped their territory.[72] æDefections now came

thick and fast. From the front Khadi Khan took the lead by striking a deal with the Sikhs.- 73

Most of *Mujahideen* were untrained to run an Islamic government. They did not prepare the mind of people. æ*Mujahideen* were very few and it was difficult for them to establish effective control over an immense tract of territory".[74] Traditionally *ushr* (a tenth of the yield of the land) was collected by Ulema. It was major source of their subsistence. After the establishment of Islamic state under the leadership of Syed Ahmad Shaheed, his government started to collect the *ushr*. It created resentment among Ulema who had been deprived of their privilege.[75] They were, therefore, in the forefront to oppose the Mujahidin and some mullahs began preparing for an uprising.[76]

Although Jihad Movement of Syed Ahmad Shaheed remained unsuccessful to finish Sikh rule in Punjab but it affected the Muslims' frame of mind on a large scale. *Mujahideen* fought for the cause of Islam even without proper training and sufficient equipment. Their struggle kindled a flame of freedom and quest for Islamic state in the minds of Indian Muslims. Greatly inspired by the valiant struggle of *Mujahideen*, Pakhtuns continued the struggle for freedom against the British. *Mujahideen* Movement paved the way for the Muslim struggle for freedom. The spirit of freedom led to the war of independence in 1857. Sacrifices of Syed Ahmad Shaheed and his companions inspired the Muslims to think about the renaissance of Islam which ultimately led to the establishment of Pakistan.

References

1. Jehanzeb Khalil, *Mujahideen Movement in Malakand and Mohmand Agencies 1900-1940* (Peshawar: Area Studz Centre, University of Peshawar), 2000, 29.
2. Syed Abul Hassan Ali Nadvi, *Tareekh-i-Dahwat-o-Azeemat*, Vol.I (Karachi: Majlas-i-Nashriat-i-Islam, nd.), 404.
3. Abad Shahpoori, *Syed Badshah Ka Qafla* (Lahore: Al-badar Publications, 1982), 17.
4. K. K. Khullar, *Maharaja Ranjit Singh* (New Delhi: Hem Publishers, 1980), 7.
5. Quoted by Jehanzeb Khalil, 29.
6. Hafeez Malik, *Moslem Nationalism in India and Pakistan* (Washington, DC.: Public Affairs Press, 1963), 154.
7. Aslam Siddiqi, æSyed Ahmad Shahid", *Islamic Culture*, XIX (1945), 124.
8. Ishtiaq Husain Qureshi, *Ulema in Politics* (Karachi: Ma'arif, 1974), 141.

9. *Ibid.*
10. Ishtiaq Husain Qureshi, *Ulema in Politics,* 145.
11. Syed Abul Hassan Ali Nadvi, *Tareekh-i-Dahwat-o-Azeemat*, Vol.I, 149-182.
12. Syed Abul Hassan Ali Nadvi, *Tehqeeq aur Insaf Ki Adalat Main* (Lahore: Syed Ahmad Shaheed Academy, 1979), 60.
13. *Ibid.*, 60-61.
14. Abad Shahpoori, 17.
15. http://www.stretchgo.com/index.php/info-center/students help/415-syed-ahmad shaheed-1786-1831 (Accessed 26 November 2012)
16. Jehanzeb Khalil, 28.
17. Ghulam Rasool Mehr, *Syed Ahmad Shaheed*, reprint (Lahore: Sheikh Ghulam Ali & Sons, n.d.), 212.
18. Syed Abul Hassan Ali Nadvi, *Tareekh-i-Dahwat-o-Azeemat,* Vol.I, 368.
19. Jehanzeb Khalil, 28.
20. Syed Abul Hassan Ali Nadvi, *Tareekh-i-Dahwat-o-Azeemat*, Vol.I, 403. 21. Jehanzeb Khalil, 28.
22. *Ibid.,* 28-29.
23. *Fatawa-e-Azizi*, Vol.1, p.16, *http://www.sunniforum.com/forum/ showthread. php? 62474-First-Indian-Fatwa-of-Darul-Harb.*
24. Ishtiaq Husain Qureshi, *Ulema in Politics,* 142.
25. *Ibid,* 146.
26. Syed Abul Hassan Ali Nadvi, *Tareekh-i-Dahwat-o-Azeemat*, Vol.I, 423.
27. Mohammad Jafar Thanesari, *Hayat-i-Syed* (Karachi, 1968), 170-71.
28. Ishtiaq Husain Qureshi, *Struggle for Pakistan* (Karachi: University of Karach)i, 1984, 306.
29. Ishtiaq Husain Qureshi, *Ulema in Politics,* 144.
30. *Ibid.*
31. Jehanzeb Khalil, 30.
32. K.J. Ahmad, *Hundred Great Muslims* (Des Plains IL (U.S.A): Library of Islam, 1987), 308-9.
33. Ghulam Rasool Mehr, 240.
34. R. D. Hopper, æThe Revolutionary Process: A Frame of Reference for the Studz of Revolutionary Movements", *Social Forces*, 28:3, 270-280. See also J. J. Macionis, *Sociology* 8th Edition (New Jersy: Prenteice Hall, 2001).
35. Jehanzeb Khalil, 29.
36. Ghulam Rasool Mehr, 290.

37. Syed Abul Hassan Ali Nadvi, *Tareekh-i-Dahwat-o-Azeemat*, Vol.I, 480.
38. Ghulam Rasool Mehr, 324.
39. Syed Abul Hassan Ali Nadvi, *Tehqeeq aur Insaf Ki Adalat Main*, 19.
40. Ghulam Rasool Mehr, *Syed Ahmad Shaheed* (Lahore: Sheikh Ghulam Ali & Sons, n.d), 333.
41. http://for-knowledge.blogspot.com/p/*Mujahideen*-movement-in-nwfp.html (Accessed on 26 November 2012).
42. Ibid.
43. Ibid.
44. Syed Abul Hassan Ali Nadvi, *Tareekh-i-Dahwat-o-Azeemat*, Vol.I, 528.
45. Ghulam Rasool Mehr, 353.
46. Ayesha Jalal, *Partisans to Allah: Jihad in South Asia* (Harvard: Harvard University Press, 2008), 89.
47. Ibid.
48. Mu'in-ud-din Ahmad Khan, æSayyid Ahmad Shahid's Campaign Against the Sikhs", *Islamic Studies,* Vol.7, No.4 (1968), 330.
49. Ishtiaq Husain Qureshi, *Ulema in Politics, Op. Cit.*, p.147. See also, Ayesha Jalal, 91.
50. http://for-knowledge.blogspot.com/p/*Mujahideen*-movement-in-nwfp.html (Accessed on 26 November 2012.
51. Abul Hassan Ali Nadvi, *Tareekh-i-Dahwat-o-Azeemat*, Vol.II (Karachi: Majlis-i Nashriat-e-Islam, n.d.), 11.
52. Ghulam Rasool Mehr, 377.
53. Jehanzeb Khalil, 29.
54. Mohammad Jaafer Thanesari, *Maktoobat Syed Ahmad Shaheed* (Karachi: Nafees Academy, 1969), 195.
55. Ghulam Rasool Mehr, 403-6.
56. Jehanzeb Khalil, 35.
57. Ghulam Rasool Mehr, 461-63.
58. Sheikh Mohammad Ikram, *Mouj-i-Kousar* (Lahore: Idara-i-Saqafat-i-Islamia, 1995), 29.
59. K.J. Ahmad, 311.
60. Ibid.
61. Sheikh Mohammad Rafique, Syed Masood Bukhari and Nisar Ahmad Choudhry, *Tareekh-i-Pakistan* (Lahore: Standard Book House), 1983, 152.
62. Jehanzeb Khalil, 37.
63. Ishtiaq Husain Qureshi, *Ulema in Politics*, 149.
64. K.J. Ahmad, 310.
65. Ibid., 309.

66. Ishtiaq Husain Qureshi, *Ulema in Politics,* 149.
67. Jehanzeb Khalil, 35.
68. Syed Abul Aala Moudodi, *Tajdeed-o-Ahya-e-Deen* (Lahore: Islamic Publications, 1989), 123-24.
69. Ishtiaq Husain Qureshi, *A Short History of Pakistan* (Karachi: University of Karachi, 2006), 626.
70. Ishtiaq Husain Qureshi, *Ulema in Politics,* 149.
71. Ibid., 150.
72. Ghulam Rasool Mehr, 465-66.
73. Ayesha Jalal, 94.
74. Jehanzeb Khalil, 37.
75. Sheikh Mohammad Ikram, 30.
76. Ayesha Jalal, 99.

* Assistant Professor & Head of the Department, Department of Pakistan Studies, Hazara University, Havelian Campus.

** Lecturer Islamic Studies Hazara University, Havelian Campus

*** Assistant Professor, Department of Pakistan Studies, Hazara University, Mansehra

Source: Pakistan, Annual Research Journal, Vol. 50, 2014

Mysticism, Religious Mobilization and Islamic Revivalism in British India: An Assessment of Mujahideen Movement after 1831

Waqar Ahmad
Ajaz Khan

Abstract

Mujahidin movement was a comprehensive endeavour turning mystic ideologies of social reformation to open fields of confrontation against the Sikhs and British invaders in India. Imprinted with the philosophy of Shah Waliullah and mysticism of Shah Abdul Aziz the movement worked intensively for religious revivalism in Muslim society in the early nineteenth century. The mujahidin fought several wars and were, in fact, in a constant war with the invader British forces. During this constant situation of war, they managed to recruit men and money from the British India and extended their channels to the settled areas. In the independence struggle of India this movement have a very significant role which is much extended and wide. This paper is an attempt to get an overview of the extended struggle of the movement after the war of 1831 in Balakot, their relationship with the Saadath of Sithana, their role in the war of independence in 1857, the war of Ambela in 1863 and their role in the independence struggle which culminated in the partition of India.

*Graduate Student at Department of Political Science University of Peshawar. **Lecturer Department of Political Science, Hazara University, Mansehra.

Introduction

"As a fighting force the Mujahidin do not constitute a danger. As an enemy in the field they may safely be ignored. They remain however a

source of constant annoyance as the colonies are hot-beds of intrigue, safe asylum for murderers, ghadrites and disaffected Indians, and centres from which emissaries are sent to incite the tribes whenever occasion offers"[1]. (A Government Report 1937).

Mujahidin is an Islamic term (sing, mujahid) and it signifies those who struggle for the cause of God. This struggle has various forms, including "*Qital*", the physical war with anyone who become a threat to the lives, property, religiosity and faith of Muslims. In Islam's modern history in South Asian context, the euphemism "*Mujahidin*" refers to the followers of Sayyid Ahmad Barailve (1786-1831). The struggle of Mujahidin, however continued after the martyrdom of Sayyid Ahmad Barailve and his successors carried on the tradition of fighting the invader Britishers and striving to establish an Islamic state in the north west region of the subcontinent. In addition, they also struggled for religious and social reforms in the society. Sayyid Ahmad Barailve got concepts of social development and reformation from mysticism as inspired from Shah Abdul Aziz, the grandson of Shah Waliullah. He however, was of the view that these concepts can be applied and practiced by any Muslim in his individual and collective life. They are dubbed as "Hindustani Fanatics." in the official British documents.

"The Mujahidin were the followers of Sayyid Ahmad Shahid (1786-1831), a native of Rai Bareilly in Awadh and a spiritual disciple of Shah 'Abdul 'Aziz of Delhi. Their aim was the establishment of a Muslim State as conceived by Shah WalliUllah (1703-62), a renowned Muslim scholar and reformist, and to deliver the Muslims from the bondage of the infidels"[2]. In Mujahidin movement this idea found a physical and armed struggle for the establishment of a Muslim society reflexive of orthodox divinity in the subcontinent. "They faced formidable opponents; the Marathas in the south, the Sikhs in the Punjab and the British who were to overthrow all"[3]. This armed struggle fought Sikhs and Marhattas to relieve Muslims of the time from their cruelty till 1831 when Sayyid Ahmad along with his companions become martyrs in the valley of Balakot on the bank of river Kunhar. It's a long story of brilliance, bravery, sacrifice and courage of this movement till Balakot incident but here in this

essay our focus is on the struggle of followers and successors of sayyid ahmad shaheed for social reformation in the society and armed struggle against the British invaders.

Much have been written over the struggle, ideology, political philosophy, diplomacy and journalistic efforts of mujahidin movement. Ghulam Rasul Mehr's studz "*Sarguzasht-i-Mujahidin*" (Lahore: Kitab

Manzil, 1965) is pioneering and encyclopaedic in conception and analysis; but he could not lay his hands on the original British record--the enemy version of the story. Mehr, however, over magnified the negative character of pashtuns in this movement[4]. It is true that Nawab Yar muhammad khan Durrani and Sultan Muhammad Khan became enemy to sayyid Ahmad Shaheed but Arbab Behram Khan of Tehkal Peshawar died with him in the battle of 1831. Khadi Khan of Hund was against Sayyid but Fatah Khan Zaida and Fatah Khan Panjtar were with him along with their tribes and forces[5]. Dr. Lal Bacha (THE ACTIVITIES OF THE MUJĀHIDĪN 1900Í1936) has utilized these untapped sources and has added to our knowledge of this period. His attempt at giving a penetrating account of the Mujdhidm is fresh in outlook and critical in conception. The appendices are of great historical value. Abdul Rauf (THE BRITISH EMPIRE AND THE MUJĀHIDĪN MOVEMENT IN THE N.W.F.P. OF INDIA, 1914Í1934) is an effort to studz the activities of the Mujahidin not only on the battlefront but also their political, diplomatic and journalistic efforts for the freedom of India and the nature and ways of their encounter with the British Indian Government. The period on which this paper is focused is 1914-1934. Sayyid Mir Badsha Bukhari (Tehrik-E Mujahidin Jang Balakot Kay Baad) is a comprehensive work on the struggle of successors of Sayyid Ahmad. This essay gives a view of how these mujahidin remain a source of constant threat to the British rulers and how they maintained centres from which emissaries are sent to incite the tribes whenever occasion offers. Abad Shah Puri (Sayyid Badsha Ka Qafla) work is an inspirational essay on the movement of mujahidin, role of elders of the society at that time and general condition of the society. Current essay will focus on the movement of mujahidin after the battle of 1831 and will highlight the important events in the discourse, taking into account all the above-mentioned sources.

The Movement After 1831: Mujahideen And Sa'daat Of Sithana In a fierce battle at Balakot with Sikhs, supported by some local men who spied for them, Sayyid Ahmad and some of his most eminent lieutenants such as Mawlana Shah Ismail, Arbab Bihram Khan of Peshawar, and Mawlana Khair al-Din lost their lives in Dhil-Hijjah 1246/May 1831. It is interesting that for quite some time it was believed by a group of the Mujahidin and their sympathisers that Sayyid Ahmad had not died and that he would reappear and lead jihad against the infidels[6]. After this setback in Balakot, the successors of Sayyid Ahmad Shahid who were about two and a half thousand reached

Takhta Band in the area of Buner. they were leaded by two brothers Maulana Walayat Ali Khan and Maulana Inayat Ali Khan from Patna[7]. Latterly, on the invitation of Saadaath of Sithana they left Takhta Band and consolidated their position at Sathana [Sathanah] in the Buner area. Now they were about three hundred and this reduction in their number was due to grievous differences among them due to which most of the mujahidin left for central India. This parted faction was headed by Maulawi Kiramat Ali Junpuri, who along with his followers worked a lot for preaching of Islam and social reconstruction. The sadaath of sathana have strong links with the mujahidin movement since the establishment of consolidated state at Peshawar. Syed Akbar Shah, a prominent figure in saadath of sathana, worked as finance minister and latterly as Prime Minister in the state established by sayyad Ahmad shaheed in Peshawar. Syed Akbar Shah was a decendent of Pir Baba, Sayed Ali Termizi, of Buner and thus have a very strong position in the religious society of Buner. Syed Akbar Shah latterly become ruler of the state of Swat in 1849 and headed the state till his death in May 1857. The conflict with the Sikhs met with varying fortunes; but thenceforward the Mujahidin on the North-West Frontier had regularly kept the spirit of jihad alive against the non-Islamic rulers of India, and no period of political stress ... [had] passed without attempt on their part, attending with varying success, to engender religious excitement among the border tribes[8]. In the nineteenth century, they had several armed conflicts with the British troops. Maintaining secret communication with their supporters and

sympathisers in India, they had always been able to get men and money for their activities.

The Mujahidin established a state at sathana headed by sayed akbar Shah which was considered as a parallel one by the British rulers and was attacked many times by them. In 1847 Agnew and Lumsden headed the British army but was repelled by mujahidin with great losses. Another contingent was headed by Abbot but faced the same fate. This attack was followed by Aderson but he also did not succeeded in any achievement to be mentioned.

As mentioned earlier leaders of mujahidin at the time were Maulana Walayat Ali Khan and Maulana Inayat Ali Khan from Patna, Bengal they effectively managed to recruite men and money from Bengal and presented a serious threat to the British rule in the province. W.W. Hunter mentioned it as" The Bengal Muhammadans are again in a strange state. For years a Rebel Colony has threatened our frontier; from time to time sending forth fanatic swarms, who have attacked our

camps, burned our villages, murdered our subjects, and involved our troops in three costly wars. Month by month, this hostile settlement across the border has been systematically recruited from the heart of Bengal. Successive State trails prove that a network of conspiracy has spread itself over our provinces and that the bleak mountains which rise beyond the Punjab are united by a chain of treason depots with the tropical swamps through which the Ganges merges into the sea. they disclose an organization which systematically levies money and men in the Delta and forwards them by regular stages along our high-roads to the Rebel Camp two miles off. men of keen intelligence and ample fortune have embarked in the plot, and a skilful system of remittances has reduced one of the most perilous enterprises of treason to a safe operation of banking. The Rebel camp on the Punjab frontier owes its origin to Sayyid Ahmad, one of those bold spirits whom our extermination of the Pindaric Power scattered over India half a century ago".[9]

Mujahideen and the Black Mountain Expedition

In November 1852 two British officers Mr. Carne and Mr. Tapp went for inspection of the borders with Hasan Zai Tribe. Both of these officers belong to

Customs department and were prohibited by the administration department because in those days looming of any British personal on borders of any tribe was considered spying on part of the British. These two officers were considered spies and killed by the Hasan Zai tribesmen in the area of Jahandad Khan, Wali of Amb who was then issued a show cause notice by the British Authorities. Nawab of Amb gave some members of the Hasan Zai tribe to British in their custodz. Hasan Zai's attacked the Nawab of Amb and get control of two forts; Chanbheri and Shinglai. Mujahidin have also occupied a fort named "Kotla" and British have previously issued warning to mujahidin for liberation of this fort. The British, therefore, decided to side with Jahandad Khan and sent an expedition against the joint force of Hasan Zai and Mujahidin. This British contingent was headed by Lt. Col. F. Mackson. The Hasan Zai tribe was headed by Sardar Hasan Ali Khan and mujahidin by Maulwi Inayat Ali Khan during this expedition. Both the Hasan Zai and mujahidin fought valiantly and Lt. Col. F. Mackson wrote in his report," It was true, the enemy were but peasantry, but peasantry that were inured to war and masters in the hill warfare"[10]. The British forces due to their modern weaponry, disciplined army and scientific planning finaly managed to win the expedition. In 1853 Hasan Zai and Mujahidin attacked the British again but in vain this

time also, but Lt. Col. F. Mackson got serious injury in this wa and finally died of it. His grave stone in company Bagh Peshawar holds the following writing, ...

Here Lies The Body

Of

Frederick Mackson

Lt: Col. of the Bombay Army, companion of the Bath, and commissioner of Peshawar who was born in September 2nd, 1807 and died September 14th, 1853 of a wound inflicted by a religious fanatic.

Mujahideen and The War of Independence 1857

Mujahidin played a very important role in the whole movement which led to the war of independence. Many heroes of this war were members of this organization. General Bakht Khan, the hero of this war was a member mujahidin and he was named "Wahabi" in the case of Bahadur Shah Zafar and this title was used for followers of

Sayyad Ahmad Shaheed in those times. Similarly, Maulna Inayat Ali Khan, Maulana Abdul Jalil Aligari, Azeemullah Khan, Wazir Khan, Maulana Ahmadullah, Haji Imdad ul llah muhajir makki, maulana Faiz Ahmad Badauni, Maulana Rasheed Ahmad Gangohi, Maulana Qasim Nanutwi, Maulana Fazal Haq Khair Abadi etc were followers of Sayyad Ahmad Shaheed and members of mujahidin who played very important role in the war of independence. After the war of Ambela they were tried, and the trials were named "Wahabi Trials"[11]. Mujahidin were headed by Maulana Inayat Ali Khan in the days prior to the war of independence. He preached intensively to the Yousafzia Tribe and the 55th infantry in Nowshehra and wrote many letters to the army men for this purpose. some of these letters were intercepted by the British authorities. Punjab Government mutiny reports states such about these letters "The most rancorous and seditious letters had been intercepted from Mohammadan bigots in Patna, Thanisar to Naik Karimullah and other soldiers of 64 infantry. The Letters alluded to a long series of correspondence that had been going on through those men of 64 native infantry with the Hindustani fanatics in Swat and Sithana mentioned in para 8 of this letter"[12]. It is interesting to be mentioned here that information about mutiny of the 55th native infantry was given by Fatah Khan Khatak due to which many soldiers were relieved of their weapons but some managed to flee along with their weapons. Fatah Khan was given the title of Khan Bahadar by Lord Delhozi and he was awarded with land of Tehsil Jehangira Swabi.

Mutiny of the 55th native was a very planned activity and every step was specified. It was planned that 55th native infantry after mutiny

will come to Swat and a collective re-attack of 55th infantry and the people and forces of Swat along with mujahidin of Swat and Sithana on the British forces will inflict severe consequences for them at this border. Swat state at that time was ruled by Sayed Akbar Shah, a member of mujahidin who remained Finance minister and Prime minister with Sayed Ahmad Shaheed in his Peshawar State. War of independence was to be started on 12th May 1857 but Sayyed Akbar Shah died one day before the war to be started, i, e. 11 May 1857. Swat state after Sayed Akbar have the second influential person called Swat Sahib or Akhund of Swat. Akhund of Swat deported Sayyed Mubarak Shah, elder son of Sayyed Akbar Shah and also manage to deport the 55th infantry from

Swat. It has been reported that "Had these two (i.e. Sayyid Akbar Shah and Akhund) been united in harbouring the 55th Native Infantry and at that moment proclaimed a jihad against us, there can be no doubt that it would have set fire to the valley of Peshawar and placed us in considerable difficulties. But Sayyid Akbar Shah died".[13]

Mujahideen And the Ambela War 1863

Ambela war was fought in October and November 1863 at Ambela pass Buner. this was the most striking and most significant of the wars ever fought between mujahidin and the British after the battle of Balakot in 1831. After the battle of Mangal Thana mujahidin were determined to fight the British valiantly. It has been reported that" The Sayyids and Maulvi Abdullah were now acting with their Hindustani followers in the bitterest spirit against the British Government; the leaders of the colony expressly declared they were embarked in determined opposition to the infidels and join the martyrs of the faith. A letter to this effect was sent to the chief of Amb"[14]. At the time of this war Amir Abdullah was chief of mujahidin. Mujahidin inflicted serious attacks and the British forces were in their grip supported by the geography of the battle field, but finally the British succeeded in creating drifts between mujahidin and the people of Buner. This leaded to defeat of Mujahidin and they withdraw from their position.

Mujahidin Intrusion into the Settled Areas

In 1920, the Mujahidin, especially seriously considered that the British should also be harassed in the settled areas of British India. In early 1920, Mawlana Muhammed Bashir planned to send bombs, ammunition and arms to the down side of the british india and store it in various places so that it could be utilised in times of need. a memeber of the mujahidin (a mujahid), Ahmad alias Khan Bahadar,

exposed the plan to the british authorities due to a small mistake. The Mujahidin sent a truck of bombs, ammunition and arms to a village named Kot Kazi near District Gujranwala. This trunk was unloaded, and the bombs, ammunition and arms were stored in the house of a mujahid Qazi 'Abdul Rauf[15]. One mujahid named Ahmad was looming or going to some target with some bombs and was arrested in Ferozpure as he fired with his pistol towards a policeman. In fact, Ahmad was frightened and ran away instead of answering to the query of the policeman when the policeman only asked him about his identity. The policeman followed him to arrest him. Ahmed fired at the policeman, but he failed to hit the target. He was arrested by the policeman with the pistol he was having. The police investigated him and succeeded to reach the storage of the bombs and other ammunitions. The storage was found to be in the house of Qazi Abdul Rauf. The police found and recovered two rifles, eight bombs and a large amount of ammunition from the house. A case was filed of this serious incident and decided in the Sessions Court of District Gujranwala. Decision was given on 21 April 1921, and the court gave fourteen years imprisonment each to Ahmad alias Khan Bahadar and Qazi Abdul Rauf[16]. An appeal was filed by the accused in the Punjab High Court, but the honourable court dismissed the appeals of the accused and the decision was retained[17]. This incident instigated the British authorities and they felt intrusion of anti-government actors in settled areas of the British India. Police department started investigation in other areas of India and soon after the Gujranwala case, succeeded in recovery of five bombs from the house of Ghulam Qadir at Tarbella. These were significant similarities in these recovered bombs to the bombs found in the house of Qazi Abdul Rauf at Gujranwala. These bombs were also similar to those thrown at British officers in various places. One of these bombs was also thrown to target the Assistant Commissioner of Charsadda. Another one of the same patterns was also found in the Gurki Picket in district Peshawar. one bomb was thrown at the Rawalpindi railway station and another at Pabbi railway station. One bomb was thrown at the city church of Peshawar and two at Risalpure, one at the Dean's Hotel Peshawar and another one at the Namak Mandi market (Salt Market) in Peshawar[18]. This was an alarming situation for the British authorities as they felt serious assaults in the settled areas. The British authorities activated their agents and the government of N.W.F.P obtained descriptions of the Mujahidin through these agents and sent all these information to other provinces of the British India. The police department in N.W.F.P

sent on of its agent as Mujahid to the colony of Chamarkand who remained there for several months[19]. Mujahidin never got it noticeable. in fact, the mujahidin don't care to establish a department of intelligence agency. This has also previously harmed the movement very much in 1863 in Ambella. The mujahidin used to send someone or other from among themselves for shopping of commodities for themselves. This time Muhammad Hussain Alias Muhammad Omar was assigned with the duty. He was accompanied by this agent and when they completed their shopping the agent said to Hussain to wait for him while he was going to meet someone for just ten to fifteen minutes. Hussain waited for him, but he didn't come even in an hour. After some time, Hussain found himself surrounded by policemen. Resultantly, Muhammad Hussain Alias Muhammad Omar was arrested[20]. An arrest order was issued by the British government to arrest any one of the Mujahidin found anywhere in the country. "The government succeeded in arresting the following persons: 1. 'Umar; 2. 'Abd al-Qadir; 3. Siraj Din; 4. Saadat Allah; 5. 'Abd al-Sattar; 6. 'Abd al-Rahim; 7. Salih; 8. Bilal; 9. 'Abd al-Rauf; 10. 'Abd al-Qadir (alias Jalal al-Din); 11. Muhammad Hussain; 12. Ilahi Bakhsh; 13. Mawlvi Ahmad; 14.Abd Allah; 15. Haji Ataullah; 16.Abd al-Razziq; and 17. Gul Rahman"[21]. All the above were litigated in the British courts and eight of them were sentenced to two to seven years of rigorous imprisonment by the additional session judge of Peshawar division[22]. While giving decision of imprisonment of all the accused the judicial commissioner ruled that ... "the very existence of the Chamarkand Colony depended upon a 'conspiracy' to wage war against the King to overawe the Government of India, and that every member of the colony was, by reason of his membership, a party to that 'conspiracy'"[23]. It is further stated that ordinary communities derive their origin from natural ethnological or economic causes. In such communities it is perfectly open for any member to say that he has no part in an illegal conspiracy, though it may be one for which community as a whole is notorious, and in which the great majority of its members play a part. But the Chamarkand Colony is not an ordinary community of this nature. It has been created artificially by a number of persons who have no other bond except the conspiracy itself. Its continuance and existence depend solely upon that 'conspiracy'. No person could voluntarily become a member of that community unless he definitely intended to be a member of that 'conspiracy, ' and to play such part in it as might be required of him. The only defence open to a

person who is a member and kept a member against his will, and that he had categorically repudiated the objects for which the colony exists[24].This ruling of the court was never reversed and was relied on for the arrest of members of the Chamarkand Colony found anywhere in British India.

The Mujahidin and the Independence Struggle

The Mujahidin movement, in such a situation, continued its struggle for the independence of India against the British. After the death of Sayyid Ahmad, the Mujahidin were led by Shaykh Wali Muhammad Phulti. When he left for Sind in 1253/1837, Mawlavi Nasir al-Din Manglawri headed the movement but he was soon killed in an encounter with a local chieftain, Fateh [Fath] Khan of Panjtar in 1254/1838. Mawlavi Sayyid Nasir al-Din Dihlvi (d. 1256/1840) organized the activities of the movement first in Sind and then in Baluchistan. He had many encounters with the Sikhs and their local collaborators in Sind. Unfavourable conditions, however, forced him to shift his contingent to Baluchistan and thereafter he entered into Afghanistan. He fought alongside Amir Dost Muhammad Khan against the British in the first Anglo-Afghan War in 1255/1839. Sayyid Nasir al-Din Delhavi finally reached the centre of the Mujahidin at Sathana and was chosen the amir of Mujahidin. He, however, breathed his last soon after that in 1256/1840[25].

In the coming years the 'ulama' of Sadiqpur [Sadiqpur] played a very important role in keeping the torch of jihad ablaze. At this stage Mawlana Walayat Ali (d. 1269/1853) became the amir of the Mujahidin, followed by his brother Mawlana Inayat Ali (d. 1275/1858). Mawlana Nur Allah (d. 1277/1860) and Mawlana Maqsud 'Ali (d. 1279/1862), Mawlana 'Abdu Allah (d. 1320/1902), Mawlana' Abd al Karim (d. 1333/1915), Mawlana Ni'mat Allah (d. 1339/1921) and Mawlana Rahmat Allah (d. ca. 1375/1956) became amirs one after the other. The Sadiqpur group espoused what is popularly known as the Wahhabi doctrine which does not identify itself exclusively with any of the four Sunni Muslim schools of thought. They were not committed to an unquestioning adherence to the teachings of any of the four juristic schools. The so-called Wahhabis were also present in the ranks of the Mujahidin during Sayyid Ahmad's period, one of the most prominent among them being Mawlana Shah Isma'il (d. 1246/1831), on the other hand, Mawlana 'Abd al

Hayy (d. 1243/1828) was a Hanafi. Sayyid Ahmad took a middle of the road position and was thus successful in keeping the ranks of the

Mujahidin united. The dominance of the Mujahidin movement by Wahhabis during the leadership of the Sadiqpur 'ulama' and the resultant schism in their ranks adversely affected their support in India. However, the Sadiqpur group emerged as the centre of the Mujahidin movement, gradually eliminating Delhi where the idea of the movement had originated and where it had matured. The migration of Shah Muhammad Ishaq (d. 1262/1846) and his family to Hijaz nearly ended the role of Delhi in the movement. However, the school of Shah Waliu Allah and later on the Deoband School extended all possible support to the Mujahidin camp especially during and after the First World War. Mawlana Mahmud al-Hasan (d. 1339/1920) made efforts to reactivate the Mujahidin and their sympathisers. He sent his emissaries to the area for bringing about unity among the tribes and to remove their misunderstandings about these Mujahidin. For this purpose, his pupils in Deoband from N.W.F.P. and other students from the same madrasah played an important role as they enjoyed the trust of the local population. In fact, the persistent strudel of the Mujahidin earned them a good reputation even among the non-Muslim lovers of India's freedom. The British forces launched several expeditions against the Mujahidin in every corner of the region including Buner, Black Mountain, Hazara, Mohmand and Waziristan. These Mujahidin sided with the local people in their incursions. The British government adopted a policy of creating mistrust between the Mujahidin and the locals particularly on religious questions, on the pretext that the Mujahidin were Wahhabis and were fanatical in their beliefs which sometimes created problems for them among the local people who were predominantly Hanafis. On the other hand, the British also tried to alienate these Mujahidin from their bastions in Bengal, Bihar, and Punjab by spreading false and negative stories about them. Towards the end of the 19th century, the number of Mujahidin diminished and their supplies considerably divided. It was also reported that the British worked on the idea of alienating the supporters of the Mujahidin movement from among the 'ulama' who were considered a potential political force in India. Allan Octavian Hume, founder of the Indian National Congress, appears to have thought that the 'Wahhabis' would support Sir Sayyid Ahmad Khan's (d. 1315/1898) stand against the Congress on the grounds that a constitutional movement with Hindu participation would shatter all hopes of overthrowing the British rule by force. On the other hand, in October 1305/1888 a fatwa by Rashid Ahmad Gangahwi (d. 1323/1905) had alreadz been delivered in favour of Muslim participation in politics under the banner of the Indian

National Congress. Theodore Beck (1859-99) letter to Badrudin Tayabji considered it as digging a mine under the so-called Wahhabis, the supporters of the Mujahidin 'traitors'.[26]

Conclusion

Mawlana Shaukat paid his tributes to these Mujahidin in the following words:

When India was asleep, this party only was awake. When all leaders and gentlemen of the new light were surpassing one another in proving themselves more faithful and loyal to the government, the object of their life was to render services to the British government, only this party was busy in uprooting the Englishmen. By God, these are the people who reminded us of our duty to human beings. By God this party awakened us from lethargic sleep[27].

The battle of 1831 at Balakot, which resulted into the death of Sayyed Ahmad Shaheed and his top leadership seems to be the end of the movement to many scholars, but later events have proved that this movement continued till the independence of India and even later till the 1848 war of Kashmir. In 1848 war mujahidin were headed and leaded by Shehzada Barkatullah. Even the present days religious fanatics link themselves to these Mujahidins of nineteen and twentieth century. In short, these mujahidin worked a lot for social reformation and religious reconstruction in the Muslim Society of that time. They also gave a very tough time to the Sikhs and British forces in many expeditions like the black mountain expedition, the war of independence, the battle of Narangi and the battle of Ambela. The present studz unveils avenues for theoretical studz of social discourses and concludes that social discourses when created on solid grounds cannot be killed through physical forces/wars but continues through the societal fabric till a significant transformation of the society in social milieu takes place, which again will only burry, but not kill, such discourses.

References

1 BAHA, LAL. (1979). *The Activities of the Mujāhidīn 1900İ1936.* Islamic Studies, Vol. 18, No. 2 (Summer 1979), pp. 97-168: Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad: http://www.jstor.org/stable/20847099 Accessed: 06/02/2014 01:26

2 RAUF, ABDUL. (2005). *The British Empire and the Mujāhidīn Movement in the N.W.F.P. of India, 1914İ1934.* Islamic Studies,

Vol. 44, No. 3 (Autumn 2005), pp. 409-439: Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad. http://www.jstor.org/stable/20838980 Accessed: 06/02/2014 01:26AM.

3 MALIK, HAFEEZ. (1963). *Moslem Nationalism in India and Pakistan*. Washington (DC): Public Affairs Press. Page. 141.

4 BUKHARI, S, M, B. (1992) Mujahideen Movement after the battle of Balakot. Urdu *(Tehrik E-Mujahidin Jang Balakot Kay Baad)*. Taj Kutab Khanah, Peshawar. P:29

5 Ibid: p:29

6 Qureshi I, H. (1972). *Ulama in Politics: A Studz Relating to the Political Activities of the Ulama in South Asian Subcontinent from 1566-1947*. Ma'arif Publishers. Karachi. PP. 215-16.

7 BUKHARI, S, M, B. (1992) Mujahideen Movement after the battle of Balakot. Urdu *(Tehrik E-Mujahidin Jang Balakot Kay Baad)*. Taj Kutab Khanah, Peshawar. P:31.

8 BAHA, LAL. (1979). *The Activities of the Mujāhidīn 1900Í1936*. Islamic Studies, Vol. 18, No. 2. pp. 97-168: Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad: http://www.jstor.org/stable/20847099 Accessed: 06/02/2014 01:26

9 Hunter. W, W. (1876). *The Indian Musalmans*. TRUBNER AND COMPANY. London. PP. 09-10. Accessed on http://www.sanipanhwar.com/The%20Indian%20Musalmans%20by%20W.%20W.%20Hunter %20-%201876.pdf

10 BUKHARI, S, M, B. (1992) Mujahideen Movement after the battle of Balakot. Urdu *(Tehrik-E-Mujahidin Jang Balakot Kay Baad)*. Taj Kutab Khanah, Peshawar.P:38

11 BUKHARI, S, M, B. (1992) Mujahideen Movement after the battle of Balakot. Urdu *(Tehrik-E-Mujahidin Jang Balakot Kay Baad)*. Taj Kutab Khanah, Peshawar. P:41

12 Punjab Govt. Records: Mutiny reports VOL viii Part II: P. 141

13 Expeditions P:84: cited in BUKHARI, S, M, B. (1992) Mujahideen Movement after the battle of Balakot. Urdu *(Tehrik-E-Mujahidin Jang Balakot Kay Baad)*. Taj Kutab Khanah, Peshawar. P:45.

14 Punjab Govt. Records: Mutiny reports VOL viii Part II: P. 08.

15 RAUF, A. (2005). *The British Empire and the Mujāhidīn Movement in the N.W.F.P. of India, 1914Í1934*: Islamic Studies, Vol. 44, No. 3 pp. 409-439. Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad. http://www.jstor.org/stable/20838980 Accessed: 06/02/2014 01:26

16 RAUF. A. (2005). *The British Empire and the Mujāhidīn Movement in the N.W.F.P. of India, 1914Í1934*: Islamic Studies, Vol. 44, No. 3, pp. 409-439. Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad. http://www.jstor.org/stable/20838980 Accessed: 06/02/2014 01:26

17 Ibid

18 Ibid

19 Puri, A, S. (1981). The Convoy of Syed Badshah. *Urdu (Syed Badsha ka Qafila*). Albadar Publications Lahore: P:392

20 Ibid

21 RAUF. A. (2005). *The British Empire and the Mujāhidīn Movement in the N.W.F.P. of India, 1914Í1934*: Islamic Studies, Vol. 44, No. 3, pp. 409-439. Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad. http://www.jstor.org/stable/20838980 Accessed: 06/02/2014 01:26.

22 Ibid

23 BUKHARI, S, M, B. (1992). Mujahideen Movement after the battle of Balakot. Urdu *(Tehrik-E-Mujahidin Jang Balakot Kay Baad)*. Taj Kutab Khanah, Peshawar. P:45.

24 Extract Copy, Court of the Judicial Commissioner, N.W.F.P., Criminal Appeal No. 137 of 1922 in Chamarkand Colony, S. No. 1441, pp. 108-9.

25 Mahr. G, R. (1957). *Sarguzasht-i Mujahidin*. Kitab Manzil Publishers, Lahore. PP. 40-45.

26 Hardz P. (1927). *The Muslims of British India* Cambridge University Press, Cambridge. Page. 174

27 Chamarkand Colony, S. No. 1441, p. 182. cited in RAUF. A. (2005). *The British Empire and the Mujāhidīn Movement in the N.W.F.P. of India, 1914Í1934*: Islamic Studies, Vol. 44, No. 3, pp. 409-439. Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad. http://www.jstor.org/stable/20838980 Accessed: 06/02/2014 01:26.

Source: vol 2, Issue 2 A Primer on Islamic Law of Insolvency (July. December 2019)

Sayyid Ahmad Shahid's Role in Islamic Revivalism: A Critique

Dr. Abdullah Khan

Abstract

The emergence of Sayyid Ahmad Shahid on the political horizon of Muslim India in the early 19th century synchronized with the loss of Muslim political power. This loss led to departure of the Muslim community from Islam in its pristine purity. Sayyid Ahmad Shahid embarked upon the gigantic task of reviving Muslim enthusiasm toward the pristine Islam. The overbearing theme of what Sayyid Ahmad Shahid stood for amounted to the saying 'back to the Qur'an and 'back to the traditions of the Prophet (s.a.w.)'. By that time the Mughal rulers were too weak to effect any meaningful change. Muslim religious scholars like Sayyid Ahmad rose to the occasion. Sayyid Ahmad, like other scholars, devoted his energy to diagnose the malaise of the Indian Muslims, on the one hand and tried to identify solution to the problems in Islam, on the other. He came to conclusion that changes could be brought about if Muslims reformed their ways. For that matter he preferred social Jihad, which was originally intended to purify or purge Islam of accretions from

' Associate Professor, Pakistan Studz Centre, University of Peshawar.

without. However, very soon the social Jihâd assumed a military nature, targetting first the Sikhs and later the British. The Jihâd movement of Sayyid Ahmad was not a success during his life time but its theoretical and practical impact could be seen in later period.

Sayyid Ahmad of Ra 'e Bareli, son of Sayyid Muhammad 'Irfan was born in 1786 in Ra 'e Bareli.[1] He was the 36th direct descendent of *Imâm Hasan,* son of the 4th Caliph 'Ali Ibn Abi Talib.[2] Since early he inclined to Sufi tendencies which were reinforced by his upbringing. At the age of four, he was admitted to a school where as a student he was

an unpromising child. He attended the school for three years but gained nothing except the acquisition of a few chapters of the Qur'an by heart; it is said that it took him three days to memorize the first easily graspable poetic verse of *panj kitâb* (a small book in Persian taught to children) and then he kept forgetting again.[3] When the father saw this helpless condition of his son, he remarked, æ... leave the matter of his education to God, He will provide whatever He thinks better for him. The apparent compulsion is of no use" .[4]

Shah Isma'il and Ja'far Thanesari, disciples and biographers of Sayyid Ahmad explain the illiteracy of Sayyid Ahmad in terms of his relationship to the family of the Prophet.[5] According to these two scholars, Sayyid was not only a direct descendent from the family of the Prophet but in his physical features, Sayyid also resembled the Prophet Muhammad (SAW).[6] It should be noted that apart from the fact that Sayyid Ahmad belonged to the family of the Prophet; other credulous stories have been woven around his personality. As a case in point, it has een said that in a dream the Prophet fed him three dates: that C Ali gave

him a bath and that Fatima clothed him a nice garment.[7] These stories reflect the Sufi inclinations of Sayyid Ahmad. On the other hand, the story that he resembled the Prophet in his features is perhaps based on a legend.

When Sayyid Ahmad was seventeen years old, his father died. The problem he faced at that time was to find a job to support his family. He went to the nearest city, Lucknow, accompanied by his friends. After four months being unable to find a job, he then went to Delhi to studz under Shah 'Abdul 'Aziz, the famed traditionalist of his time. 'Abdul 'Aziz welcomed Sayyid and entrusted him to the care of his younger brother Shâh 'Abdul Qadir. 'Abdul Qadir admitted Sayyid Ahmad to his seminary; again Sayyid showed his lack of interest in books, and the story has it that the letters on the page vanished from his sight when the book was put before him.[8]

It should be indicated here that although Sayyid Ahmad was not a great alim (religious scholar) as far as 'ilm-i-zahiri (exoteric knowledge) was concerned, it seems, nonetheless, that he was an expert in 'ilm-i-batini (esoteric knowledge). This became clear when 'Abdul 'Aziz, the teacher of Sayyid Ahmad, initiated him into three renowned Sufi orders, the Qadiriyah, Chishtiya, and Naqshbandiya. When the stage of teaching him shugul-i-barzakh (concentration on the image of one's Murshid) arrived, Sayyid

Ahmad protested against this practise and queried 'Abdul 'Aziz about the difference between idolatry and shugul-i-barzakh. In the former, Sayyid pointed out, the image worshiped was made of stone or paper whereas in the latter the image was imaginary; yet in each case it was an image which was being worshipped. 'Abdul 'Aziz could not nswer that question and instead recited the following couplet from the Persian poet Hafiz:

æColour your prayer-carpet with wine if your religious guide so orders because the salik is not unaware of the formalities of the path".[9]

The Sufi cult of Sayyid Ahmad is evident from *Sirât-i-Mustaqim,* the only book attributed to Sayyid Ahmad. Sayyid is said to have written it with the help of his two learned disciples, Shah Isma'il Shahid and Mawlana 'Abdul Hayy.' [10] The book begins with a discussion of two ways of loving God; one being *ıubb-* 'ishqi (Loving Love), the other being *hubb-i* imani (love on account of faith or reason). The former leads to *râh-i Wilayah* or the path of sainthood and the latter leads to *râh-i nubuwwah* or the path Prophethood. According to Shah Isma'il, one of the two editors of the book, the love of a prophet for God is superior to a mystic's love for God, because the former is concerned with creating a good society on earth whereas the latter is concerned only with the betterment of his soul; however the two are complementary. [11] As the Sufi thoughts of Sayyid Ahmad could not be discerned by the common people, Shah Isma'il had to render them into simple words so as to make them intelligible to the common people. When the book got completed, it was read over to, and corrected by, Sayyid Ahmad. [12]

II

Sayyid Ahmad Khan says that in order to keep his Sufi experiences secret from people so that they might not disturb him and that he could have sufficient time to complete his esoteric knowledge, ***Sayyid Ahmad joined the army of Amir Khan Pindâri of Tank.[13] Be that as it may, Sayyid was again facing an economic problem, and as he was not eligible for any other job such as that of* qâdi *or a clerk because of***
the fact that he was not a highly educated person, he had no choice but to work in the army. He was first recruited as a trooper, [14] then he was assigned the duty of leading people in prayer.[15] Mawlana ʿUbaidullah Sindhi claims that Sayyid Ahmad had joined the army of Amir Khan

according to a programme which his mentor Shah 'Abdul 'Aziz had in mind, i.e. it was the desire of Shah 'Abdul 'Aziz that Sayyid should get military training in the army of the Amir prior to launching the *jihad.*[16] Sayyid Ahmad remained in the army of the Amir for seven years. The army of the Amir is said to have been influenced morally by the presence of Sayyid.[17] The piety and high moral character of Sayyid led to his promotion to the rank of advisor and special bodzguard of the Amir who consulted him on every matter.[18] During this period, Sayyid developed his spiritual potential to such a degree that the desire to preach in public and initiate people into his Sufi order became very strong. He could no longer stay in the army of Amir and thought it appropriate to withdraw from the Amir's service in order to initiate a general calling (da'wah). Incidentally, the time of his departure from the Amir's army coincided with the signing of a treaty between the British and the Amir and, as a result, some biographies of Sayyid have suggested that he deserted the army as a signal of protest against the decision of the Amir.[19]

It was in 1817 that Sayyid left the army and returned to Delhi. By this time his former teacher Shah 'Abdul Qadir had died, and his seat of *ifta'* any interest in *'ilm-i-batini,* having been more interested in *'ilm -i* zahiri.[21] Among the early converts of the new reformer were Shah Isma'il, Shah Muhammad Ishaq, the grandson and successor of Shah 'Abdul 'Aziz and Mawlana 'Abdul Hayy, the scions of the family of Shah Waliullah, as 'Aziz Ahmad calls them.[22] Shah Isma'il was eight years older[23] and more knowledgeable than Sayyid, and the same was true of 'Abdul Hayy; yet Sayyid Ahmad seems to have held these *'ulamâ'* and a host of others in such a spellbound condition that they rendered menial services to him and ran, with their shoes off, by the side of his palanquin, wherever Sayyid would go.[24]

After having made a considerable number of proselytes, Sayyid, then aged 38, intended in 1820 to go on pilgrimage to Mecca. It is said that it was Shah 'Abdul 'Aziz, the mentor of Sayyid Ahmad, who had advised him to go to Mecca for Hajj'[25] in any case, Sayyid, accompanied by one thousand followers, [26] set out for the Hijaz. The party first went to Calcutta where they boarded a ship for Mecca. During his brief stay at Calcutta, he continued his preaching, initiating people into his own Sufi order called the *Tariqah Muhammadiyah,* telling people to cling to the Sunnah of the Prophet and shun all types of innovations (Bid'at). It is said that at Calcutta the number of his converts became so huge that it was impossible for him to take individual bai'ah from the people. Consequently, at times like these he

would spread his turban and tell the people that any one who would touch any part of the turban would automatically become his disciple. He continued this practice throughout his journey to Mecca. After performing Hajj, Sayyid Ahmad stayed in Arabia and then returned to India in 1824. William Hunter, however, gives the date of Sayyid's return as Oc:ober 1822.[27] Garcin de Tassey, a French historian, also mentions the story of Sayyid's going to Constantinople, increasing the number of his disciplines and getting a

present, the value of which was 9 lakhs in rupees.[28] This story, however, cannot be confirmed by other sources.

The journey to Mecca intensified the religious feelings of Sayyid, and now he began to compare the religious condition of India with that of Arabia and other Muslim countries he had visited. Thus far he had been a reformer of abuses, but now he took it upon himself to undertake an active *Jihâd* against non Muslims. About this change in the outlook of Sayyid, Sir Sayyid maintains that Sayyid Ahmad had had a vision that he would die as martyr along with a group of Muslims, and his eagerness in a *Jihâd* was a fulfilment of that vision.[29] When Sayyid Ahmad, as a Sufi and reformer, appeared on the scene, it was the time when the Sikh rule was predominant in the Punjab. The Sikh rule was notorious for its oppression of Mus1ims, [30] and the tyranny of the Sikhs was put forward as a reason for the waging of *Jihâd* against them. The exact date of *Jihâd* can be known from the following extract from *Targhib al-Jihâd* (Incitement to religious war), a treatise written by a certain *mawlavi* from Qanuj. According to this Mawlavi,

The tribes of Sikhs have long held sway in Lahore and other places. Their operations have exceeded all limits. Thousands of Mohammedans [sic] they unjustly killed, and on thousands have they heaped disgrace. The Azan or the summons to prayer, and the killing of cows, they have entirely prohibited. when at length their insulting tyranny could no longer be born, Hazrat Sayyid Ahmad (may his fortunes be permanent) having for his single object the protection of the faith, took with him a few true Musalmans, and going in the direction of Kabul and Peshawar, succeeded in rousing the Mohammedans [sic] of those countries from their slumber of indifference and nerving their courage for action ---- Praise be to God---- some thousands of believers became readz at his call to tread the path of God's Service; and on the 20th Jumadi-ul-ula', . 1242 Hijri (or the 21st December, 1826) the *Jihâd* against the kñfir Sikhs began.[31]

Sayyid Ahmad was successful in crushing this rebellion and now he marched towards Peshawar in 1830. The ruler of Peshawar Sultan Muhammad khan, brother to Yar Muhammad Khan must have been shocked by the sudden appearance of the *mujahidin*. He decided to give in: after a brief negotiation which took place in Hazarkhani, a town in the suburbs of Peshawar, the Sultan swore allegiance to Sayyid Ahmad and thus Peshawar capitulated. Sayyid then decided, against the wishes of his disciplines, to hand Peshawar to its previous chief, Sultan Muhammad khan; the latter was aided by a Qazi and a few other persons who would promulgate the *shariah* law in the city. Thus, after laying the foundations of a *hukumat-i muwaqqatah* or provisional government as 'Ubayd Allâh Sindhi likes to call it, [39] Sayyid left the administration in the hands of Sultan Muhammad Khan, and shifted his headquarter to Panchtar in Buner.

The handing over of Peshawar to Sultan Muhammad Khan proved disastrous for Sayyid Ahmad and the *mujâhidin*. His victory over the local chiefs had only increased their jealousy and resentment, and they now were waiting for an opportune time to break into rebellion. They had never accepted his leadership wholeheartedly, nor were they happy with the abrupt social reforms he introduced.[40] Moreover, in one of the wars Yar Muhammad Khan, the Sultan's brother, had been killed by Sayyid's army. The Sultan had never forgiven Sayyid for the death, and it appears that the opportunity of revenge, a prominent feature in the Pathan tribal code, was being awaited. The above factors all contributed to a general conspiracy against Sayyid Ahmad and his deputies. A nefarious plan was hatched by the Sultan and the rest of the chiefs to put to death all the deputies of Sayyid who were assigned various duties such as colleting tithes from people, working as moral- sensors and so on. It was, in fact, implemented in a most grim fashion. The tragic news of the death of his associates shocked Sayyid very deeply. Disillusioned and disappointed with the local populace, he now decided to leave the area and migrate to Kashmir with his followers and establish his base there. In Balakot, on his way to Kashmir he was surprised by a huge Sikh army of 20000 under the command of Sher Singh who had come there to collect his annual (*qalang)* tax from the people of that area.[41] Someone, purportedly a local Gujar, made espionage on the *Mujahidin*, and showed the secret entry point to Balakot to the Sikhs. Consequently, the Sikh army surrounded Balakot from all sides. A clash resulted: the night before the actual fighting began, Sayyid Ahmad dreamt

Sayyid Ahmad, followed by his band, reached the frontier through a detour passing through Gwaliar, Tank, Ajmer, Sind, Hyderabad, Baluchistan, Qandahar, Ghazni, Kabul and Peshawar. Ultimately he chose Nowshera as his headquarter.[32] According to the story, Sayyid Ahmad sent an ultimatum to Ranjit Singh, the Sikh ruler of the Punjab, informing him of his intentions.[33] Ranjit Singh ignored the ultimatum as a result of which Sayyid Ahmad 'girded his lions' to initiate a series of skirmishes against the Sikh army. When *mujâhidin,* the followers of Sayyid Ahmad, left Ra'e Bareli, they were five or six hundred in number; in Qandahar the number reached one thousand. When various bands arrived from India, the total number swelled to 2500.[34] The Sikhs were so much intimidated by the *mujâhidin* that they were willing to relinquish the upper part of the Indus to Sayyid Ahmad, but the latter refused to accept the offer because, as he stated, his intention was only to "carry out the order of God".[35] The lack of discipline which was surfacing in Sayyid's band was more than compensated for by the zeal and enthusiasm with which they fought. Initially Sayyid Ahmad's followers were victorious, despite the huge number and more sophisticated weaponry of the Sikh army. However, it was not long before problems both internal as well as external arose for the *mujâhidin.* Internally, a small group of *mujâhidin* headed by a certain Mahbiib 'Ali challenged the authority of Sayyid Ahmad as a leader and deserted eventually.[36] Externally, the local tribal chiefs who had enthusiastically welcomed the new reformer and had allied themselves with him started intrigues against him. They came to look upon the success of Sayyid Ahmad as a threat to their position and, as 'Ubayd Allah Sindhi put it, they came to regard the leadership of Sayyid as a death-news 'piyam-I *marg*' for their chieftainship.[37] Thus they started conspiring against him: in the middle of a war against the Sikhs, Yar Muhammad khan, one of the three Barakzai brothers who were the chiefs of Peshawar at that time, deserted from the army of Sayyid and sided with the Sikhs. Apparently Yar Muhammad khan went so far as to administer poison to Sayyid Ahmad in an attempt to get rid of him.[38] It may be pointed out that Rangit Singh knew fully well that he could not defeat the *Mujahidin* in the battlefield keeping in view the initial victories that were accrued to Sayyid. Therefore, he launched a diplomatic offensive by visiting Peshawar and bribing the chiefs of Peshawar and thereby weaning them from Sayyid. These events naturally occupied Sayyid Ahmad and his military advisor Shah Ismail in putting down this local rebellion engineered by local chiefs.

There was also a controversy as to where Sayyid was buried. Nawab Wazir-ud-Dawlah, a disciple and biographer of Sayyid relates the following anecdote about the tomb of Sayyid Ahmad. Someone said to Sayyid Ahmad, "You criticize tomb-worship. After your death, your followers will worship your tomb". Sayyid replied, "I will pray to God to make my tomb disappear". The Nawab remarked, "lo and behold, the prayer of Sayyid Ahmad was answered, and up to this day nobodz knows the exact place where Sayyid is buried".[53] According to one story, the head was buried at one place and the bodz at another.[54] Another story has it that the head and the bodz were floating in a stream, then somebodz recognized them and buried them together.[55] There is also a story that Sher Singh engaged a boy to identify the dead bodz of Sayyid Ahmad and then buried it with respect following the Muslim ritual.[56] All these stories sound baseless and preposterous. The anecdote told by the Nawab was closer to the truth. The truth of the matter is that "Sayyid's bodz was identified and burnt by the Sikhs."[57] This being the case, the tomb attributed to Sayyid Ahmad at Balakot is not real. The story that Sher Singh had the bodz of Sayyid buried with respect sounds unfounded, for, and that the *khaltsa darbnr* at Lahore celebrated the occasion with much jubilation.[58]

IV

In this section we will address the question as to whether the *Jihad* movement was against the Sikhs only or whether it included the British also. 'Ubayd Allah Sindhi (1872-1944) claims that the movement was sponsored by Shñh 'Abdul 'Aziz who had declared India to be *dâr- ul-harb* (the country of war), and was now looking for a young and energetic man to spearhead the movement. Such a person he found in Sayyid Ahmad.[59] Sindhi also mentions that ᶜAbdul ᶜAziz has setup two committees which would operate under his own supervision; one was administrative in nature and was comprised of Shah Muhammad Ishaq and Shah Muhammad Yᶜaqub whose function was to collect funds at Delhi and then send them to the frontier; the other was a military committee consisting of Shah Ismail and Mawlana 'Abdul Hayy, the son-in-law of Shah ᶜAbdul ᶜAziz whose duty was to make preparation of military endeavours.[60]

The most outstanding biographer of Sayyid who wrote on the latter in post-1947 era is Ghulam Rasul Mihr whose voluminous biography of Sayyid fills close to two thousand pages. The recurrent theme of Mihr's book is that Sayyid was principally against non-Muslim ruler in India,

be it that of the British or the Sikhs or the Jats. Mihr faults the earlier biographers for concentrating on two objectives of Sayyid only, that is, *i^C lâ Kalima Rabb al-'Alamin* (the Elevation of the word of God) and *Ihyâ-i sunnat-t Say yid al-Mursalin* (the revivification of the Prophetic *sunnali);* while losing sight of a third objective, namely, *Istikhlâs bilad al-muslimin az dast-i kafara mutamarridin* (deliverance of the Islamic lands from the hands of rebellious infidels).[61]

According to Mihr, when Sayyid Ahmad was busy on *Jihad,* an Englishman by the name Mason was touring the country and described the following as the goal of Sayyid Ahmad: the elimination of the Sikh rule and the seizure of the Punjab, and then the conquest of India and China.[62] Among the non-Muslim writers on the *Jihad* Movement, the person who wrote extensively on Sayyid is W.W. Hunter who holds that the 'Apostle' was hostile to the British. R.C. Majumdar in his *History of the Freedom Movement* maintains that Sayyid Ahmad ædeliberately conceived the project of reviving Muslim rule in India by fighting infidel rulers, particularly the Sikhs and the British. [63] Freeland Abbot opines that Sayyid Ahmad believed that the condition of Muslims could be improved by force.[64] On the question of why Sayyid chose the Sikhs as his first target, Abbot expresses the following opinion: "Sayyid Ahmad Shahid, of course, raised his *Jihad* against the Sikhs rather than against the British, but he looked upon the matter only as one of putting first things first, and first he thought he could defeat the Sikhs".[65] Furthermore, it may be pointed out that when Sayyid appeared on the scene it was a time that the British had not fully established themselves in India, rather their power was growing; therefore, at this early stage the British must naturally have welcomed the trouble between Sayyid and the Sikhs despite the fact that the Sikhs were the allies of the British. Sayyid Ahmad has been described as an 'adventurer', [66] a 'visionary'[67] and a 'dreamer of dreams'.[68] He had actually envisioned the supremacy of Islam and Muslims in India, but as Mihr has rightly pointed out, Sayyid's purpose was not to prop up the decadent and corrupt Mughal Empire. His goal was rather to strike a new moral order for Muslims which would eventually lead, as he put it, to *khilafah' alâ 'minhâj al Nubuwwah* (caliphate on the pattern of Prophethood).

Sayyid Ahmad was a Sufi, but his *Tasawwuf* was not characterized by an escape from the world as is generally believed about the Sufis. On the contrary, he was a pragmatic person and

consequently very much alive to the needs of his community. Like common Sufis on his day, he would teach *tawajjuh* (concentration) which has been likened by some to the bellows of a blacksmith.[69] However, unlike them, he would get his arms and shoulders massaged, practice push ups, and devote some time to archery.[70] This was indeed a preparation of some kind for his militant intentions. He wanted to be strong in both bodz and spirit.

A few words are in order on the question of 'Wahhabism' in India, which has been associated with the name of Sayyid Ahmad.

Many western scholars are of the view that during his religious journey to Mecca Sayyid Ahmad came into intact with Wahhabi professors, imbibed their views, and on his return to India brought their doctrines with him.[71] There is also a story that Sayyid Ahmad was expelled from Mecca because of the similarities of his doctrines to those of the Wahhabis, [72] and that he returned to India as a fanatical disciple of ᶜAbdul Wahñb. According to Freeland Abbot, the 'path of Muhammad', the Sufi order initiated by Sayyid Ahmad was identified by some Muslims as an Indian version of the puritanical Wahhabi movement. [73]

J.R.C. expresses the same opinion that Sayyid's movement maybe regarded as an imitation of the 'Arabian Wahhabi movement'. [74] It has also been asserted that the literature produced by Shah Ismail breathes the spirit of Wahhabi ideology.[75]

It may be pointed out also that the reform movement of Sayyld Ahmad has been described as "Wahhabi" in the British Indian government documents.[76] However, certain facts run counter to such claims. During the period when Sayyid Ahmad travelled to Mecca, the Wahhabi movement had been suppressed in the Hijaz by Ottomans.[77] The mere fact that Sayyid Ahmad was interrogated and expelled reveals that Wahhabi influence must have died out politically as well as historically. [78] As for the question of similarity between the two movements, Masᶜud Nadwi holds that it was because of their common origins, namely the Qur'an and the Hadith. Both movements emphasized the unity of God and condemned all types of associationism (shirk) and innovations.[79] The same author holds that Sayyid's movement was dubbed as Wahhabi because of a certain British propaganda;[80] that is, the British were responsible for the name, and giving it such a name was a way of fighting the "Wahhabis".

At the same time there were dlfferences between the two movements. The Arabian Wahhabis show their affiliation with the school of Ahmad B. Hanbal whereas Indian Wahhabis describe

themselves as *ghayr inuqallids* or 'non-conformists', meaning that they do not follow any one of the four medieval canonical schools. The Indian *Wahhabis* sometimes call themselves Muhammadis, [81] that is, 'the followers of Muhammad **(PBUH).'** Another point of difference between the two is that the Arabian Wahhabis were entirely inimical to Sufism where as Sayyid Ahmad and his disciples maintained their Sufi practices. As a matter of fact, Sayyid's movement was started through the use of the Sufi practice of *bay^{c}ah* or showing allegiance to ones *Pir*. In the initial stage Sayyid' s disciples used to go into the jungles for long meditateions.[82]

Conclusion

In this article, an attempt has been made to highlight various dimensions of the life and career of Sayyid Ahmad Shahid. The Jihad movement initiated by the latter constitutes an important phase of the politico- religious history of Muslim India. The *Jihâd* movement has been dubbed as the precursor of the Pakistan Movement and Sayyid Ahmad Shahid has been portrayed as the first founder of Pakistan. It is true that the *jihad* movement did not realize the stated objectives of the movement in the lifetime of its founder, however, the fact remains that it accentuated the political consciousness of the Indian Muslims. After the massacre of Bala kot in May 1831, the *Mujahidin* Movement died out temporarily. However, very soon the successors of Sayyid Ahmad Shahid rearranged themselves and kept the spirit of the *Jihâd* alive. First they established themselves at Sethana and when that centre was destroyed by the British, the Mujahidin shifted to Malka situated at Chamla valley in Buner. Latter, they shifted their headquarters to Smast also situated at Buner. Fin-ally, the *Mujahidin* shifted their centre to Chamarqand, situated at the confluence of the Mohmand and Bajaur political agencies. The choice of Chamarqand was due to the fact that the Mujahidin wanted to stay closer to the border of Afghanistan so that they could solicit help from that country in their struggle against the British. The struggle of the Mujahidin against the British virtually continued till 1947 when partition took place and an armed resistance against the British became redundant.

References

1. (Mihr, 1954) p.56; (Nadwi, 1948) p. 69; Mirza; (Dihlaw, 1993) p. 285. This book is mainly a biography of Shah Isma'I1, although at the end of the book a short biography of Sayyid

Ahmad is also given; (Thanesari 1968) p.50. This book was originally published in 1891 with the title *Tawârikh-i 'A jibah mawsum bih Sawânih Ahmadi* and divided into five pans. The Karachi edition has dropped the fifth part which contains the letters of Sayyid Ahmad; (Azad 1968) p.460; (Manglori 1945), p. 105; (Sindhi 1952) p.91; (Hunter 1871) p. 3.

2. (Thanesari 1968) p. 51; *(Encyclopaedia of Islam),* p. 282.
3. Mirza Hayrat, p. 287. However, Sindhi mentions that Sayyid Ahmad had learnt the basic Arabic and Persian books from Shah Muhammad Ishaq and Shâh Isma'il (Sindhi 1952) p. 91. Sir Sayyid also mentions that Sayyid Ahmad learnt *sarf* and *nahw,* i.e., Arabic grammar and syntax., part 4, (Sir Sayyid Ahmad Khan 1947) p.
26. Mihr casts doubt on the complete illiteracy of Sayyid Ahmad. According to Mihr, Sayyid was not a '*âlim* in the sense that Shah 'Abdul 'Aziz and Shah Isma'il were, but he knew the do's and don'ts of *shari'ah,* and also he understood Arabic and Persian (Mihr, 1954) p. 58.
4. Mihr, 1954) p.57; (Thanesari 1968), p. 53; (Nadwi, 1948), vol. 1, p. 70.
5. (Ismail 1916) p. 16; (Thanesari 1968) p. 53.
6. Ibid.
7. (Ismail 1916) p. 369; (Nadwi, 1948), vol. 1, p. 58; (Thanesari 1968), p. 54; (Rizvi 1968) p. 94.
8. (Mihr, 1954) p. 58; Nadwi, *Sirat,* vo1. 1, p. 82.
9. Thanesari 1968), p. 61; (Nadwi, 1948), vo1. 1, p. 79; (Mihr, 1954), p. 76.
10. (Ikram 1966) p. 441. The book is divided into four chapters, with a *muqaddimah* (introduction) and a *khatimah* (conclusion). The first and last chapters were written by Shah Isma'il while the 2 d and 3" were written by 'Abdul Hayy, who translated the whole book into Arabic when Sayyid journeyed to Mecca; (Ismñ'il 1916) p.1 6; (Siddiqi 1945) p. 131; (Ikram 1966) p. 12. According to S.M. Ikram, the 2'd chapter of *Sirât-i Miistaqim* is the soul of the book from the point of view of reform. *Ma wj-i Kausar,* p. 13.
11. (Ismaail 1916) p. 58-60, 67-8 as quoted in (Hardz 1972) p. 53.
12. (Ismail 1916) p. 17; J.R.C., æNotice of the peculiar Tenets held by the followers of Syed Ahmad, taken chiefly from the '*Sirat-i Mustaqim*' (Ismail 1832), p. 498.
13. (Sir Sayyid Ahmad Khan 1947) part 4, p. 26.
14. (Qureshi 1962), p. 196. About the early life of Sayyid Ahmad, Hunter writes, æHe began life as a horse soldier in the service of a

celebrated freebooter, and for many a year harried the rich opium-growing villages of Malwa," ; (Hunter 1871), p. 4. Obviously, this is a very prejudiced and tendentious view. It is true that war-fare and military aggrandisement was the fashion of the day but there is no evidence that Sayyid Ahmad Shahid, a mystic of myriad attainments, participated in the unlawful activities of the Amir, as Hunter would make us believe.

15. (Qureshi 1962) p. 196; (Ali 1971), p. 60.
16. (Mihr, 1954), p. 91.
17. (Nadwi, 1948), vol. 1, p. 86 (Dihlaw 1993) p. 301; IThanesari 1968) p. 72.
18. (Dihlaw 1993) p. 301.
19. (Mihr, 1954), p. 109; (Sindhi 1952), p. 93; (Nadwi, 1948)" vol. 1, p. 88; (Malik 1963) p. 161; (Qureshi 1962) p. 197.
20. (Sir Sayyid Ahmad Khan 1947) part 4, p. 27; (Alawi 1951) p. 4.
21.Ibid.
22. (A. Ahmad 1969) p. 20.
23. (Manglori 1945), p. 106.
24. (Hunter 1871) p. 4; (Titus 1959) p. 189; (Rehatsek 1878-1880) p. 352; (Nadwi, 1948), vol. 1, p. 113.
25. (Tassy 1839) p. 32; (Alawi 1951) p. 4.
26. (Sir Sayyid Ahmad Khan 1947) part 4, p. 27.
27. (Hunter 1871) p. 5.
28. (Tassy 1839) p. 32. The story of Sayyid's visit to Constantinople is mentioned also by (Latif 1891) p. 437. However, according to Mahmud Husayn, the story lacks evidence and therefore seems to be unfounded. (M. Husayn 19554 p. 563.
29. (Sir Sayyid Ahmad Khan 1947), Part 4, p. 27. It may be pointed out that Sir Sayyid had confused the vision with the one which Sayyid experienced one night before the battle of Balakot. However, Sir Sayyid had dropped part four of his Athar-us-Sanadid, which contains the stories of Shah 'Abdul 'Aziz and his disciples, from the second edition. The explanation for this, according to Hafeez Malik and Morris Dembo, in their translation of Sir Sayyid's History of the Bijnore Rebellion (Michigan: Asian Studies Centre, Michigan University, n.d.), p. VI, appears to be Sir Sayyid's æimpolitic eulogy" of Sayyid Ahmad in which the latter has been depicted as a man of superhuman qualities in bravery, in popular appeal, and in æcommand of spiritual power."
30. The details of Sikh oppressions of Muslims can be seen in (Dihlaw 1993), (Thanesari 1968), and S.M. Ikram's *Mawj-i Kaivsar*. Jafar

Thanesary relates the story that when Sayyid was on a visit to Rampur, some Pathans came to him and related to him the following tragic story. æWhlle passing through a certain village in the Punjab, we went to a will to drink water. There we saw certain Sikh women filling their utensils with water. Since we did not know the local language, therefore, we told those women with a language of gesture to give us some water. The women looked around and then started speaking in Pashto. They told us æthey were basically Pathans belonging to such and such areas. The Sikhs brought us here forcibly, converted us into Sikhism and made us their wives." We were shocked to hear that Muslim women were converted in such a way. O Sayyid. you are a saintly person, think about a scheme that these women are liberated from infidelity". Sayyid replied that very soon he was going to launch Jihad agalnst the Sikhs. S.M. Ikram, Mawj-i Kausar. p.21.

31. (Hunter 1871) p. 6-7; (Rizvi 1968), p. 99.
32. (Slndhi 1952) p. 99; (Siddiqi 1945) p. 138; (M. Husayn 1957), p. 584.
33. (M. Husayn 1957›p. 585; (Siddiqi 1945)p.132
34. (Mihr, 1954), p 76.
35. (Nadwi, 1948), Nadwi says Ranjit Singh offered 9 lakhs rupees to Sayyid Ahmad for the area of the right bank of the river Indus if he would give up the idea of warfare with Ranjit Singh, but Sayyid refused. (Nadwi, 1948), p. 219.
36. (Sir Sayyid Ahmad Khan 1947) Review, p. 15.
37. (Sindhi l952)p. 110.
38. (Ikram 1966) p. 436; (Thanesari 1968) p. 227; (Mihr, 1954) p. 396; (Sindhi 1952)p.110; (Shahjahanpiiri 1971) p. 89; (Tassy 1839) p. 34; (Qureshi 1962) p. 201.
39. (Sindhi 1952) p. 122.
40. For example, there was the custom still practised in certain parts of Afghanistan and the Frontier province of melmastia, or hospitality which includes, among other things, giving shelter to criminals. This custom was also practised by the pagan Arabs of the time of Prophet Muhammad (SAW) (Nadwi, 1948), vol. 2, p. 87. According to Nadwi, parallel to Islamic shari"ah another ædivine law" was being practised for centuries in Afghanistan and the Frontier province, and the tribesmen were not willing to give up that ædivine law" (Nadwi, 1948), vol. 2, p. 319. Secondly, the tribesmen married off their daughters to the highest bidders (Ibid.). Sayyid Ahmad explained this evil custom, and his agents are

reported to have taken strong measures to eradicate it. Qazi Mazhar 'Ali, the promulgator of shari'ah law in Peshawar issued a strict order that all the widows and those engaged women whose prospective husbands were present should be married within three days (Ibid, p. 322; (Dihlaw 1993a, p. 211. Some Pathan women were married off by force (Nadwi, 1948), vol. 2, p. 307. For example, Sindhi relates the story that the daughter of the Khan of Khwashgi was married forcibly to an Indian (Sindhi 1952)p. 115. Third, the imposition of taxes upon the tribesmen was another source of trouble. Prior to the appearance of Sayyid in the area, the chiefs were the recipients of half of the income from the crops. The introduction of '*ushr* by Sayyid put an end to the existing system. These causes led to the consternation of the chiefs.

41. (Sindhi 1952) p. 118; (Thanesari 1968) p. 284.
42. (Shâhjahanpuri 1971), p. 243.
43. (Nadwi, 1948), vol. 2, p. 439.
44. (Mihr, 1954)vol.2, p. 414;(Dihlaw 1993), p. 314; (Sindhi 1952) p. 118; (Manglori 1945) p. 1 16; (Nusharawi 1938) Vol.1, p. 92; (Mawdudi 1960) p. 114; (Latif 1891), p. 443; (Ikram 1966) p. 442; (Rizvi 1968), p. 103; (Qureshi 1962) p. 201; (M.Husayn 1955) p. 597; (Caroe 1960) p. 305; (Malik 1963) p. 183; (Cunningham 1966) p. 172. At the time of death Sayyid Ahmad was forty six and Shah Isma'il fifty three (Sindhi 1952) p. 118.
45. (Nadwi, 1948), vol. 2, p. 444; (M. Husayn 1957), p. 167; (Mihr, 1954)vol. 2, p. 445. Another version of the story goes like this: I am going for Jihad. I will have to fight many wars with the hypocrites and infidels. God has promised me that he will not kill me until the schism of Iran, the hypocrisy of Afghanistan, and the infidelity of India is eliminated through my hands. If somebodz, while putting the Qur'an on his head, comes and says to you, æI have buried your brother, never believe him." (Ms. From the library of the Amir of Tonk.)
46. (Nadwi, 1948), vol. 2, p. 444.
47. (Rehatsek 1878-1880) p. 370.
48. Yahya Ali used to recite the following *rubâ'i* from Dard: Give this much message from Dard When the morning breeze passes through the streets of the beloved Which night will you come? Many days have we spent in your waiting? (Nadwi, 1948), vol. 2, p. 445.
49. (Mihr, 1954) p. 103.
50. (Nadwi, 1948), vol. 2, p. 446.

51. (Sindhi 1952) p. 130.
52. Ibid, p. 132.
53. (Nadwi, 1948) vol. 2, p. 516.
54. (Mihr, 1954) vol. 2, p. 439. According to Sindhi, Sayyid was beheaded and the head was taken to Lahore so that Ranjit Singh could see it (Sindhi, p. 117).
55. (Mihr, 1954) vol. 2, p. 438.
56. Ibid, p. 437.
57. (M. Husayn 1957), p. 132; Ishtiaq Husayn Qureshi. p. 207.
58. (Qureshi 1962) p. 208.
59. (Sindhi 1952) p. 91.
60. Ibid, p. 95.
61. (Mihr, 1954) p. 254.
62. Ibid. p. 258.
63. (Majumdar 1962 p. 276.
64. (Abbot1960)p100
65. Ibid, p. 106.
66. (Titus 1959), p. 188.
67. (Ram Gopal 1960) p. 22.
68. (J. Ahmad 1971) p. 442.
69. (Mihr, 1954) p.18.
70. Ibid, pp. 18-19.
71. See for example, (Titus 1959) p. 189; (Wilson 1916) p. 56; (M.S. Zaharaddin 1979)p. 148; (Rehatsek 1578-1880), p. 353.
72. (Manglori 1945) p. 250.
73. (Abbot 1960), p.89.
74. J.R.C., p. 481.
75. *(Encyclopedia of Islam),* p. 76.431. (A. Ahmad 1969) p. 9.
77. (Rahman 1968) p. 78.250. Ibid.
79. (Nadwi, 1948).
80. (Salafi 1969) p. 244.
81. (Mihr, 1954) p. 20.

Bibliography

Abul Kalam Azad, T. e. (1968). New Delhi: Sahtiya Academy.

Ahmad, A. (1969). *An Intellectual History of Islam in India* . Edinburgh: Edinburgh Univ. Press.

Ahmad, A. (151). *Islamic Modernism in India and Pakistan.* Lahore:

Oxford Univ. Press.

Ahmad, *I.* 197 I). *Hundred Great Muslims.* Lahore: Ferozsons Ltd. Alawi, M. A. (1951). *Hazrat Ismâc7l Shahf°d.* Lucknow: Tamir.

Ali, M. I. (1971). Muslim Riyasaton awr Sardaron say Ranjit Singh ke

Tacalluqat. *Journal of the Research Society of Pakistan, 3.*

Azad, A. K. (1968). *Tazkirah.* New Deldi: Sahtiya Academy.

Caroe, 0. (1960). *The Pathans 550 B.C. Í A.D. 1957.* London: MacMillan and Co. Ltd.

Cunningham, *I.* 1966). *History of the Sikhs.* Calcutta: S. Chand and Co.

Dihlaw, M. H. (1993). *kayak-i Ta yibah.* Amratsar: Thana'i barqi Press.

Hardz, P. (1972). *The Muslims of British India.* Cambridge: Cambridge Univ. Press.

Hunter, W. (1871). *The Indian Musalmatis: Are They Bound* UJ

Conscience to Rebel Against the Queen?

London: Tribune and Co.

Husayn, M. (1957). *æSay yid Ahmad Shahid (II), "Histoy of the Freedom Movement* (Vol. l). Karachi: Dar u1 Taqaafa.

Husayn, M. (1955). æThe Mystery of Sayyid *Ahmad* Shahid's Death, .

Journal of the Pakistan Historical Socie ', 3, 167.

Ikram, S. (1966). *Muslim Rule in India and Pakistan.* Lahore: Star Book

Depot.

Ismail, M. M. (1832). A principal Treatise of that Sect. *Journal of the Asiatic Society of Bengal,* 498.

Ismail, S. (1916). *Sirât-* i MDsiaqfm. Lahore: Shaykh Muhammad Ashraf.

Latif, S. (l 891). *History of the Punjab.* Calcutta: Central Press Ltd.

M.S. Zaharaddin, X. (1979). Wahhabism and Its Influence Outside Arabia. *Islamic Quarterl y, XXIII.3,* 353.

Majumdar, R. (1962). *History of the Freedom Movement.* Calcutta: Firma K.L. Mukhopadhyay.

Malik, H. (1963). *Moslem Nationalism in India and Pakistan.*

Washington D.C.: Public Affairs Press.

Manglori, T. A. (1945). *Musalmanon kâ rawshan Mustaqbil.* Delhi: Kutubkhana Aziziyah.

Mawdudi. (1960). *Tajdid-o-lhyâ'-i Din.* Lahore: Maktaba ilmiya.

Mihr, G. R. (1954). *Sa yyid Ahmad Sliahi°d: Ycani Mujâliid-i Kabir Hadrat Say yid Ahmad Barelewi ki Mufassil Sawânih Hayat awr unki Tahr!k Ihyây-i Din ki Mukammil Sarguzasht.* Lahore: Kitab Manzil.

Nadwi, S. A. (1948). *Sirat-i Say yid Ahmad Shahid* (3rd ed.). Lucknow: Darul Ulfim Nadawat al- Ulmñ'.
Nusharawi, A. Y. (1938). *Tarâjim cUlamâ'Íi Hadith-i Hind.* Delhi:

Jayyid barqi Press.
Qureshi, I. H. (1962). *The Muslim Coinmiiniy of the Indo-Pakistan Subcontinent (610-1947)* . S-Gravenhage: Mouton and *Co.*

Rahman, F. (1968).* Islam. *New York: Doubleday.
Rehatsek, E. (1878-1880). The History of the Wahhabys in Arabia and in India. *Journal of the Ro yal Asiatic Society oj Great Britain and Ireland, XIV.*
Rizvi, S. (1968). *œIdealogical Back ground o)' the Wahhabi Movement in India* ill *XVIII and XIX Centurie.s," in Ideas in History.* London: Asia Publishing House.
Salafi, M. I. (1969). *Tahrik-i Azadi-i Fikr.* Qusur: Maktabah Naziriyah.
Shahid, S. A. (1957). *A history of the Freedom Movement* (Vol. l). Karachi: Maktabah.
Shñhjahanpfiri, P. (1971). *Shahâdatgâh-i Balakot.* Lahore: Idara Tarikh-o-Tahqiq.
Siddiqi, A. (1945). Sayyid *Ahmnd* ShahTd. *Islamic Culture, XIX,* 131.
Sindh, U. A. (1952). *Shnh Wnliullâh nwr unki° st yñsi° Tnhrik.* Lahore: Sind Sagar Academy.
Sir Sayyid Ahmad Khan, A.-u.-S. B. (1947). Athar-us-Sanadid. *Bihnr Research society,* 26.
Tassy, G.d. (l 839). *Historie de ln litternture hindouie et hindoustanie.*

Paris: The Press.
Thanesari, M. *I.* (1968). *Hayât-i Say yid Alimnd Shnhid.* Karachi: Nafis Academy.
Titus, M. T. (1959). *Islnm in Indin rind Pakistan.* Calcutta: Y.M.C.A. Publishing House.
Wilson, S. G. (1916). *Modern Movements Among Muslims.* New York: Fleming Co.

অষ্টম অধ্যায়

বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ

খিলাফত ও খুলাফায়ে রাশেদিন

ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান

'খিলাফত' শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রতিনিধিত্ব করা, অন্য কারো স্থানে স্থলাভিষিক্ত হওয়া। আর 'খলিফা' শব্দের অর্থ প্রতিনিধি, স্থলাভিষিক্ত। 'খলিফা' শব্দের বহুবচন 'খুলাফা' এবং 'খালাইফ'। ইসলামে 'খিলাফত' এমন একটি শাসনব্যবস্থার নাম যা মহান আল্লাহর বিধান ও মহানবী সা:-এর সুন্নাহ দ্বারা পরিচালিত। এই শাসনব্যবস্থায় সার্বভৌমত্বের অধিকারী একমাত্র মহান আল্লাহ। তিনিই বিশ্বজগতের স্রষ্টা এবং সর্বোচ্চ শাসক। মানুষের মর্যাদা হলো, সে সর্বোচ্চ শাসকের প্রতিনিধি বা খলিফা এবং তার রাজনৈতিক ব্যবস্থা হবে সর্বোচ্চ শাসকের বিধানের অধীন। খলিফার কাজ হলো, সর্বোচ্চ শাসক আল্লাহর আইনকে তাঁর প্রকৃত লক্ষ্য অনুযায়ী কার্যকর করা এবং তাঁর নির্দেশিত পথে রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা।

খিলাফত সম্পর্কে খুলাফায়ে রাশেদিন এবং রাসূলুল্লাহ সা:-এর সাহাবিদের সর্বসম্মত অভিমত ছিল, খিলাফত একটি নির্বাচনভিত্তিক পদমর্যাদা। মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শ এবং তাঁদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের মাধ্যমেই তা কায়েম করতে হবে। বংশানুক্রমিকভাবে বা বল প্রয়োগের দ্বারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া কিংবা নেতৃত্ব দেয়া তাদের মতে খিলাফত নয়, বরং তা রাজতন্ত্র। খিলাফত ও রাজতন্ত্রের যে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ধারণা সাহাবিরা পোষণ করতেন, হজরত আবু মূসা আল-আশ'আরি রা: তা ব্যক্ত করেছেন এভাবে 'খিলাফত হচ্ছে তাই, যা প্রতিষ্ঠা করতে পরামর্শ নেয়া হয়েছে। আর তরবারির জোরে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হচ্ছে বাদশাহী বা রাজতন্ত্র।'

ইসলামের এই খিলাফত ব্যবস্থা সর্বজনীন। আল্লাহর এই প্রতিনিধিত্বের অধিকার বিশেষ কোনো ব্যক্তি, পরিবার কিংবা বিশেষ কোনো শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট

বা সংরক্ষিত নয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী এবং তাঁদের বিধান ও আইন মান্যকারী সব মানুষই আল্লাহর দেয়া এই প্রতিনিধিত্বের সমান অধিকারী। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল আল্লাহ তাঁদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। (সূরা আন নূর : ৫৫)। ইসলামে নবুওয়াতের পদমর্যাদার পর এই খিলাফত ব্যবস্থাই সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন এবং এ পদটি পবিত্র দায়িত্বপূর্ণ পদ। বস্তুত ইসলামে খিলাফতের দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত ব্যাপক ও সর্বাত্মক। যাবতীয় বৈষয়িক, ধর্মীয় ও তমদ্দুনিক উদ্দেশ্যের পূর্ণতা বিধান এরই ভিত্তিতে হয়ে থাকে। রাসূলের কার্যাবলিকে চালু ও প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং যেকোনো প্রকার মিশ্রণ বা ভেজাল থেকে তা সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধন করা খিলাফতের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন ও হাদিস হতে খলিফার যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা কিছু জানা যায়, সে আলোকে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, 'খুলাফায়ে রাশেদিনই ছিলেন মুসলিম জাহানের খলিফা হওয়ার সর্বাধিক উপযুক্ত। কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত গুণ ও বৈশিষ্ট্য তাঁদের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

খুলাফায়ে রাশেদিনের মর্যাদা

মহান আল্লাহ মানব জাতির হেদায়াতের লক্ষ্যে পৃথিবীতে যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। মহানবী মুহাম্মদ সাঃ তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। তিনি তাঁর আনীত আদর্শ দ্বারা জগতের শ্রেষ্ঠ একদল মানুষ বিশ্ববাসীকে উপহার দিতে পেরেছিলেন। 'খুলাফায়ে রাশেদিন' অর্থাৎ চারজন সাহাবি তাঁদের অন্যতম। মহানবী সাঃ-এর পর এই চারজন সাহাবির বিশেষ মর্যাদা সংরক্ষিত। তাঁদের সুমহান মর্যাদা সম্পর্কে কিছু পবিত্র বাণী উদ্ধৃত করা হলো।

* আবদুল্লাহ ইবন 'উমর রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ-এর জামানায় আমরা লোকদের মধ্যে পরস্পরকে প্রাধান্য দিতাম। আমরা হজরত আবু বকর রাঃ কে সবার উপরে প্রাধান্য দিতাম, তারপর হজরত 'উমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ কে এবং অতঃপর হজরত 'উসমান ইবনে আফফান রাঃকে। (সহিহ বুখারি)।

* আনাস ইবন মালিক রাঃ বলেন, 'নবী সাঃ একদা হজরত আবু বকর, হজরত 'উমর ও হজরত 'উসমান রাঃ-সহ উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করলে পাহাড় তাঁদের নিয়ে (আনন্দে) দুলতে থাকে। তখন নবী সাঃ বললেন, 'হে উহুদ! স্থির থাক। কেননা তোমার উপরে একজন নবী, একজন সিদ্দিক ও দু'জন শহীদ আছে।' (সহিহ বুখারি)।

* হজরত উকবা ইবন আমের রাঃ বলেন, মহানবী সাঃ বলেছেন, আমার পরে যদি কেউ নবী হতো তাহলে উমর ইবনুল খাত্তাবই নবী হতো (তিরমিজি)।

* হজরত 'আলী রাঃ বলেন, মহানবী সাঃ বলেছেন, 'হজরত আবু বকর এবং হজরত 'উমর রাঃ নবী-রাসূলগণ ছাড়া পৃথিবীর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত জান্নাতবাসী বয়স্ক লোকদের নেতা হবেন।' (জামে তিরমিজি)।

* হজরত সাদ ইবন আবু ওয়াক্কাস রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ 'আলী রাঃ কে লক্ষ্য করে বলেছেন, হজরত মূসা আঃ-এর কাছে হজরত হারুন আঃ-এর যে মর্যাদা ছিল, তুমিও আমার কাছে সেই মর্যাদায় অভিষিক্ত। তবে আমার পরে কোনো নবী নেই। (সহিহ বুখারি)।

খিলাফতে রাশেদার বৈশিষ্ট্য

খিলাফতে রাশেদার ৩০ বছর শাসনকাল (পঞ্চম খলিফা হিসেবে ইমাম হাসান রা. এর ছয়মাস খেলাফতের দায়িত্বের মাধ্যমে পঞ্চম ত্রিশ বছর পূর্ণ হয়।)* (৬৩২-৬৬১ খ্রি.) পর্যালোচনা করলে যে বৈশিষ্ট্যগুলো মানবজাতিকে বিমোহিত করে তা হচ্ছে :(ক) খুলাফায়ে রাশেদিনের আমল মহানবী সাঃ-এর পবিত্র জীবনাদর্শ উজ্জ্বল প্রদীপে পরিণত হয়েছিল এবং তা সমগ্র পরিমণ্ডলকে নির্মল আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত করে রেখেছিল। খলিফাগণের প্রতিটি কাজে ও চিন্তায় তার গভীর প্রভাব বিদ্যমান ছিল। চারজন খলিফাই মহানবী সাঃ-এর একান্ত প্রিয়পাত্র ও বিশিষ্ট সাহাবি ছিলেন। তাঁরা ছিলেন তাঁর সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত এবং তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। হজরত 'আলী রাঃ ছাড়া আর তিনজন খলিফাই মহানবী সাঃ-এর দ্বিতীয় কর্মকেন্দ্র ও শেষ শয্যাস্থল মদিনায় রাজধানী রেখেই খিলাফতের প্রশাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেছিলেন। (খ) তাঁরা ছিলেন মুসলিম উম্মাহর সর্বাপেক্ষা অধিক আস্থাভাজন। আধুনিককালের পদ্ধতিতে নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচন হলেও তখন কেবল তাঁরাই যে সর্বাধিক ভোটে নির্বাচিত হতেন তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। (গ) খিলাফতে রাশেদার আমলে আইন প্রণয়নের ভিত্তি ছিল কুরআন ও সুন্নাহ। যে বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশ পাওয়া যেত না, সে বিষয়ে ইজতিহাদ করে সুষ্ঠু সমাধান বের করার চেষ্টা করা হতো এবং এ ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ পারদর্শী প্রত্যেক নাগরিকেরই মতামত দেয়ার সমান অধিকার স্বীকৃত ছিল। (ঘ) খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলে রাজকীয় ভোগবিলাস, জাঁকজমক ও শান-শওকতের কোনো স্থান ছিল না। খলিফাগণ একান্তই সাধারণ নাগরিকদের মতো জীবনযাপন করতেন। তাঁদের কোনো দেহরক্ষী ছিল না। লোকজন যখন ইচ্ছা খলিফার কাছে উপস্থিত হতে পারত। (ঙ) খুলাফায়ে রাশেদিন বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রের সরকারি কোষাগারকে জাতীয় সম্পদ ও আমানতের ধন মনে করতেন। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মঞ্জুরি ছাড়া নিজের জন্য একটি কপর্দকও কেউ ব্যয় করতেন না। (চ) তাঁরা নিজেদেরকে জনগণের খাদিম মনে করতেন। কোনো ক্ষেত্রেই তাঁরা নিজেদেরকে জনসাধারণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধারণা

করতেন না। তাঁরা কেবল রাষ্ট্রীয় পর্যায়েই জননেতা ছিলেন না, নামাজ ও হজ প্রভৃতি ধর্মীয় ব্যাপারেও যথারীতি তাঁরাই নেতৃত্ব দিতেন।

মোটকথা, ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণ এবং ধর্মীয় কাজ ও রাষ্ট্রীয় কাজে দ্বৈতবাদ যেমন আধুনিক পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, অনুরূপভাবে এতদুভয়ের একত্রীকরণ ও সর্বতোভাবে একমুখীকরণই ছিল খিলাফতে রাশেদার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

হজরত আবু বকর রা: খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর জাতির উদ্দেশে যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন তাতে তিনি বলেন, 'হে মানবমণ্ডলী! আমি আপনাদের খলিফা নির্বাচিত হয়েছি, অথচ আমি আপনাদের কারো অপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি নই। আমি ভালো কাজ করলে আপনারা আমার সহযোগিতা করবেন এবং বিচ্যুত হলে সহজ সরল পথে দাঁড় করিয়ে দেবেন। সত্য হলো আমানত এবং মিথ্যা হলো খিয়ানত। আপনাদের মধ্যকার দুর্বল ব্যক্তি আমার কাছে সবল যতক্ষণ আমি তার অধিকার পৌঁছে দিতে না পারি। আর আপনাদের মধ্যকার সবল ব্যক্তি আমার কাছে দুর্বল যতক্ষণ আমি তার কাছ থেকে অপরের অধিকার আদায় করে দিতে পারি। আপনাদের কেউ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজ ছেড়ে দেবেন না, এরূপ করলে সে জাতিকে আল্লাহ অপছন্দ করবেন। কোনো সম্প্রদায়ের ভেতরে অশ্লীলতার প্রসার ঘটানো যাবে না, তাহলে সবার ওপর আল্লাহ বিপদ চাপিয়ে দেবেন। আমি যতক্ষণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করি ততক্ষণ আমার আনুগত্য করবেন। আর যদি আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হই, তবে আমার আনুগত্যের প্রয়োজন নেই। আপনারা নামাজ আদায় করবেন। আল্লাহ আপনাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। 'আমাদের উচিত তাদের আদর্শে আদর্শবান হওয়া।

* সম্পাদনা পর্ষদ

তথ্যসূত্র: দৈনিক নয়া দিগন্ত-২৪ জানুয়ারি ২০২০ ইং

আওলাদে রাসূলের মর্যাদা

আহমাদ আমিন

মাস্টার্স, এম ফিল, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: প্রত্যেক রক্তের সম্পর্ক ও আত্মীয়তার সম্পর্ক কেয়ামতের আগে কেটে যাবে একমাত্র আমার রক্তের সম্পর্ক ও আত্মীয়তার সম্পর্ক টিকে থাকবে (কেয়ামত পর্যন্ত)। হাদীসটি বর্ণনা হয়েছে মুসনাদ আহমাদ ইবনে হাম্বলে হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রা: থেকে ১৭/২২০। এছাড়াও সহীহ সনদে বর্ণনা হয়েছে তাবরানী মুজামুল ও মুস্তাদরাকুল হাকিমে। হযরত ফাতেমাতুজ জাহরা (আ:) এর বংশধরগনকেই রাসূল (সা:) নিজ বংশ বলে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন তা প্রমানসিদ্ধ। এবং এই বংশ থেকেই ইমাম মাহদি (আ:) শেষ জামানাতে আবির্ভূত হবেন বলে উল্লেখ্য।

আওলাদে রাসূল বা রাসুলের বংশধরদের পরিচয়ে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) এবং তাবেঈ হযরত মুজাহিদ, হযরত ক্বাতাদাহ (রা:) সহ অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেন- "আহলে কাসা" অর্থাৎ চাঁদরাবৃত। চাঁদরাবৃত প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে এসেছে- হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদা নবী পাক (সা:) প্রত্যুষে বের হলেন, তখন তাঁর শরীর মুবারক কালো নকশা বিশিষ্ট চাদার দ্বারা আবৃত ছিল। অতঃপর ইমাম হাসান (রা:) আসলে নবীজী তাকে চাঁদরের মধ্যে শামিল করে নিলেন। এরপর ইমাম হুসাইন (রা:) আসলেন তাঁকেও নবীজী চাঁদর মুবারকে অর্ন্তভুক্ত করে নিলেন। অতঃপর আসলেন হযরত মা ফাতিমা (রা:) আল্লাহর রসূল তাঁকেও চাঁদরের অভ্যন্তরে নিয়ে নিলেন। সর্বশেষ আসলেন শেরে খোদা আলী (রা:) নবীজি তাঁকেও তাঁর নুরানী চাঁদর মুবারকে প্রবেশ করিয়ে নিলেন। অতঃপর তিলাওয়াত করলেন- হে আহলে বাইত নিশ্চয় আল্লাহ পাক চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে"। অতঃপর রব্বুল আলামীনের দরবারে এই দোয়া করলেন-

اللهم هولاء أهل بيتي وخاصتي فاذهب عنهم الرجس

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! এরাই আমার আহলে বাইত এবং ঘনিষ্টজন। আপনি এদের থেকে অপবিত্রতা দূরীভূত করুন আর এদেরকে পরিপূর্ণভাবে পবিত্র করুন।

অপর এক হাদীসে এসেছে হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রা:) বর্ণনা করেন, 'আমি নবীজীর খিদমতে উপস্থিত হয়ে দেখলাম নবীজী এমনভাবে কম্বল জড়িয়ে বসে আছেন মনে হলো তার ভিতরে তিনি কিছু লুকিয়ে রেখেছেন। আমি আবেদন করলাম, হুজুর কম্বলের ভিতরে কী যেন লুকিয়ে আছে মনে হচ্ছে? সাথে সাথে নবীজী কম্বল খানা খুলে দিলেন তখন দেখা গেল নবীজীর নূরানী কোলে বসে আছেন ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা। অতঃপর নবীজী ইরশাদ করলেন-

اللهم إني احبهما فاحبهما واحب من يحبهما

অর্থাৎ-হে আল্লাাহ! আমি এই দু'জনকে ভালবাসি সুতরাং তুমিও এদেরকে ভালবাস। এবং ভালবাস তাদেরকে যারা এদেরকে ভালবাসে।

উল্লেখ্য, আরবী ভাষায় ঘরকে বাইত বলা হয়। ঘর তিন প্রকার। যথা- ১. বংশীয় ঘর (সম্পর্ক) ২. অবস্থানগত ঘর (সম্পর্ক) ৩. জন্মগত ঘর (সম্পর্ক)।

বংশগত ঘর বলতে মানুষের সে সম্পর্ককে বুঝায় যা বংশীয় আত্নীয়তার সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ, বাপ দাদার কারণে সম্পর্ক। যথা, চাচা, ফুফু ইত্যাদী।

অবস্থানগত সম্পর্ক বলতে সে সম্পর্ককে বুঝায় যা ঘরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। যথা- স্ত্রীকুল রমণীগণ। জন্মগত সম্পর্ক বলতে সেই বংশধরকে বুঝায় যারা ঘরে ভূমিষ্ট হয়। যথা- পুত্র, কন্যা, নাতি নাতনী ইত্যাদি।

যখন সাধারণভাবে আহলে বাইত বলা হয় তখন উপরে বর্ণিত তিন প্রকারের সম্পর্ককে বুঝায়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন: হে হাবীব, আপনি বলে দিন যে, আমি (রাসূল) তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাইনা তবে (আমার) নিকটাত্মীয়দের ভালবাসা ব্যতীত। (সূরা শুরা-২৩)

এ আয়াতে করীমা নাযিল হওয়ার পর সম্মানিত সাহাবায়ে কেরামগণ রাসূলে আকরম (সা:) এর নিকট তাদের সম্পর্কে বিনয়ের সাথে জানতে চাইলেন-

হে আল্লাহর রসূল! আপনার নিকটাত্মীয় কারা? যাদের প্রতি (আমাদের) আন্তরিক ভালবাসা প্রদর্শন করা ওয়াজিব! সরকারে কায়েনাত (সা:) এরশাদ করলেন-

তারা (আহলে বাইয়াত হলেন হযরত আলী, হযরত ফাতিমা, হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা এবং তাদের উভয়ের আউলাদ।

বস্তুতঃ উপরিউক্ত আহলে বাইত ছিলেন রাসূল করিম (সা:) এর খুবই নিকটতম আপনজন। পবিত্র কুরআনে তাদের পবিত্রতা ঘোষণা করে আল্লাহ পাকের ইরশাদ হয়-

হে আহলে বাইত! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূণরূপে পবিত্র করতে। (সূরা আহযাব-৩৩)

আয়াতটি নাযিল হলে হযরত আবু সাঈদ খুদরী, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা ও উম্মে সালমা (রা:) বলেন এটি "আহলে বাইত" মা ফাতেমা, হযরত আলী, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

হজরত আলীকে (রা:) লক্ষ্য করে রাসূলে পাক ফরমান 'হে আলী, মূসার কাছে হারুনের যে মর্যাদা, আমার কাছে তোমার একই মর্যাদা, কিন্তু তফাৎ এই যে আমার পরে কোনো নবী নেই। ' হারুন (আ.) নবী ছিলেন। আলী (রা.) সহ আওলাদে রাসূলগণ- আওলাদে রাহমাতাল্লিল আলামিনরা মর্যাদায় নবী তুল্য, কিন্তু নবী নন।

সৈয়দ যা একটি সম্মানসূচক উপাধি যা ধারা ইমাম আলী আ: এর ওরুসে এবং নবী নন্দিনী মা ফাতেমা (আ:) এর গর্ভে সন্তান ইমাম হাসান ও হোসাইনের (আ:) বংশধারার নবী মোহাম্মদ (সা:) বংশধরগণকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। সৈয়দ অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ। ধর্মীয় ও সামাজিক দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বংশ। যেমনটি ওসমানীয়া খেলাফত যুগে নবী মোহাম্মদের বংশধরগণ সবুজ পাগড়ী ব্যবহারের মাধ্যমে এক স্বকীয় পরিচয়ের স্বাক্ষর বহন করতেন। সৈয়দগণের প্রতি কুৎসা রটানো যাবে না, এবং তাদের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান রাখতে হবে। হুজুর সাল্লালল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, অর্থাৎ যারা রাসূলের বংশধরের প্রতি হেয় মনোভাব রেখে মৃত্যুবরণ করবে, তারা কখনও বেহেশেতের সুগন্ধী পাবে না।

(তাফসীরে ইবনে আরাবী, তাফসীরে রুহুল বায়ান)।

"জেনে রাখ, গণিমতের সম্পদ হিসেবে তোমরা যা কিছু পাবে তার পাঁচটি অংশ আল্লাহ্, রাসূল, আহলে বাইতে রাসূল, এতিম এবং মিসকিনদের জন্য। (সূরা আনফাল-৪১) অর্থাৎ গণিমতের মালের মধ্যে আওলাদে রাসূলের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা একটা অংশ ছিল। সুন্নি মাযহাবের ইমাম শাফেয়ী রঃ এর মত ছিলঃ শুধু সে সময় নয় বরং অদ্যবধি আওলাদে রাসূলগণ তাঁদের অংশ পাবেন, সে সম্মান অন্য কোন বংশের প্রাপ্তি হয়নি।

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি বলেন, "ক্বিয়ামতের দিন আমি নিজেই চার শ্রেণীর লোককে খাছভাবে সুপারিশ করবো।

- যে ব্যক্তি আমার বংশধর তথা আহলে বাইত এবং আওলাদে রসূলদেরকে সম্মান করবে।
- যে ব্যক্তি আহলে বাইত এবং আওলাদে রসূলদেরকে অর্থ-সম্পদ দ্বারা খিদমত করবে।
- যে ব্যক্তি আহলে বাইত এবং আওলাদে রসূলদেরকে কাজে-কর্মে সহযোগিতা বা খিদমত করবে।
- যে ব্যক্তি আহলে বাইত এবং আওলাদে রসূলদেরকে মনেপ্রাণে গভীরভাবে মুহব্বত করবে।"

(বিহারুল আনওয়ার-8/49, যখায়রিল উক্বা-18)

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) গ্রন্থ থেকে আওলাদে রসূলের মর্যাদা বিষয়ে কিছু স্বপ্নের বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলোঃ

১.

নসর ইবনে আহমদ ছিলেন খোরাসানের বাদশাহ। একদিন দুপুর বেলায় তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন। দরজার বাইরে বসে একজন কোতওয়াল পাহারা দিচ্ছিল। এমন সময় একজন স্ত্রীলাকে এসে বাদশাহর সাক্ষাৎপ্রার্থী হলেন। তিনি বললেন, আমি সৈয়দজাদী। সুদূর বলখ থেকে এসেছি। সেখানকার শাসনকর্তা আমার ফরিয়াদ শুনে না। তাই খাদে বাদশাহর নিকট অভিযাগে পেশ করতে চাই। কোতওয়াল বললেন, এখন তো অভিযাগে শোনার সময় নয়। বাদশা বিশ্রাম নিচ্ছেন। আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।

কোতওয়ালের জবাব শুনে সৈয়দজাদী সাক্ষাৎ প্রার্থীগণের জন্য নির্ধারিত স্থানে গিয়ে বসে রইলেন। কিন্তু কোতওয়াল শান্তি পাচ্ছিলেন না। সৈয়দজাদীর নৈরাশ্য-পীড়িত কর। মুখচ্ছবি বার বার তাঁর চোখের সামনে ভাসতে লাগলো এবং বারবারই তিনি শয়নকক্ষে গিয়ে দেখতে লাগলেন, বাদশাহর ঘুম ভাঙছে কিনা!

কোতওয়ালের বারবার নাগানোর ফলে বাদশাহর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি বিরক্ত হলেন। বিরক্তির সাথেই তিনি কোতওয়ালকে তলব করে এভাবে তাঁর ঘুম ভাঙ্গানারে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। কোতওয়াল বিনয়ের সাথে নিবেদন করলেন, -"জাঁহাপনাহ! সুদূর বলখ থেকে একজন স্ত্রীলাকে ফরিয়াদ নিয়ে হাজির হয়েছেন। তিনি নিজেকে একজন সৈয়দজাদী বলে পরিচিত করছেন। আমি আগন্তুক মহিলার এই পরিচিতির কথা শুনে দ্রুত খবরটা আপনার নিকট পৌছে দিতে চেয়েছিলাম মাত্র। কারণ, হুযুরে পাকের (সাঃ) আল-আওলাদের সাথে তথা আমাদিগকে সাধ্যমত সদ্ব্যবহার করতে বলা হয়েছে।

ক্রুদ্ধ বাদশাহ সৈয়দজাদীর কথা শুনার সাথে সাথেই একেবারে নরম হয়ে গেলেন। বললেন, এখনই তাঁকে এখানে ডেকে আন! তিনি সৈয়দজাদীর ফরিয়াদ শুনলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্যার প্রতিকার করলেন। অধিকন্তু দশ হাজার মুদ্রা নজর পেশ করে নিতান্ত সম্মানের সাথে তাঁকে বিদায় করলেন। ভবিষ্যতেও যেন এই মহিলার জন্য কোন সমস্যার সৃষ্টি করা না হয়, বলখের শাসনকর্তাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখার জন্য একটি আলাদা পত্র লিখে দিলেন।

সে রাত্রেই বাদশাহ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখলেন। হুযুর (সাঃ) বলেছেন, "নসর! তুমি আজ যেভাবে আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে, আল্লাহ তা'আলা যেন তোমাকে সেভাবে সম্মানিত করেন।"

সকালে জাগ্রত হয়ে বাদশাহ তাঁর সকল সভাসদ এবং শহরের আলেম ও দরবেশগণকে একত্রিত করে তাঁর স্বপ্নের কথা বললেন। এরপর তিনি এমর্মে

নির্দেশ জারি করলেন যে, তাঁর রাজ্যের সর্বত্রই যেন রসূলে খোদার (সাঃ) আহলে বাইত তথা সৈয়দ খান্দানের লোকজনের প্রতি বিশেষ সদ্ব্যবহার করা হয়।

২.

হারামাইন শরীফের কাজী আবুল হাসান (রাহঃ) বর্ণনা করেন, -আমি ওজীর আলী ইবনে ঈসার মুখে শুনেছি, তিনি বলেনঃ বাগদাদে থাকা অবস্থায় আমি সৈয়দজাদাগণের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতাম। পরিচিত সবাইকে বার্ষিক ভাতা দিতাম এবং প্রতি রমযান মাসে এক সাথে তা তাঁদের নিকট পৌঁছে দেওয়া হতো।

হযরত মূসা ইবনে জাফরের (রাহঃ) আওলাদগণের মধ্যস্থিত এক বৃদ্ধকেও আমি বার্ষিক পাঁচ হাজার দেরহাম প্রদান করতাম। এক শীতের সকালে সেই বৃদ্ধ সৈয়দকে বাগদাদের এক রাস্তায় মত্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম। লোকটির পোশাক ছিল কর্দমাক্ত। সে বার বার বমি করছিল। তাকে এ অবস্থায় দেখতে পেয়ে মনে মনে ভাবলাম, এমন একটা ফাসেক শরাবীকে বার্ষিক পাঁচ হাজার দেরহাম দেওয়া অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। আমার দেওয়া টাকা সে নাফরমানির কাজে উড়িয়ে দেয়। সুতরাং আগামী রমযান থেকে আর ওকে ভাতার টাকা দেওয়া হবে না।

পরবর্তী রমযান মাসে ভাতার অর্থ না পেয়ে সে ব্যক্তি আমার বাড়ীতে এসে হাজির হলো। আমি তাকে বললাম, তোমার শরাবের পয়সা আমি জোগাতে পারবো না। গত শীতকালে একদিন তোমাকে আমি মত্ত অবস্থায় রাস্তায় মাতলামি করতে দেখেছি। এভাবে নানা কথায় লজ্জিত করে তাকে আমার দরজা থেকে তাড়িয়ে দিলাম। বলে দিলাম, ভবিষ্যতে যেন আর তাকে আমার বাড়ীতে না দেখি।

সে রাতেই আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখলাম। আমি তাঁকে সালাম আরজ করলাম কিন্তু তিনি সালামের জবাব না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

আমি কাতর স্বরে বললাম, -ইয়া রসূলাল্লাহ (সাঃ)! আমি আপনার আওলাদগণের একজন দীন সেবক। আমার প্রতি একটু অনুগ্রহের দৃষ্টি দিন।

হুযুর (সাঃ) এরশাদ করলেন-তুমি আমার অমুক আওলাদকে দরজা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ। সে নিরাশ হয়ে সেখান থেকে ফিরে এসেছে। আমি বললাম, -হুযুর! সে আপনার শরীয়তের খেলাফ কাজ করে। আমি একদিন নিজ চোখে তাকে রাস্তায় মাতলামি করতে দেখেছি।

হুযুর (সাঃ) এরশাদ করলেন, -"তুমি ওকে যা দিতে তা কি ওর কোন কাজের বিনিময়ে, না আমার নামের খাতিরে দিতে?

আমি আরয করলাম, -"ইয়া রসূলাল্লাহ (সাঃ)! একমাত্র আপনার মহব্বতেই দিতাম।

৩.

তাপসী হযরত রাবেয়া বসরীর (রাহঃ) মা-বাবা ছিলেন অত্যন্ত গরীব। যে রাতে হযরত রাবেয়া (রাহঃ) জন্মগ্রহণ করেন, ঘরে তাঁদের বাতি জ্বালাবার মত তেল পর্যন্ত ছিল না।

হযরত রাবেয়ার মা স্বামীকে বললেন, কোন পড়শীর বাড়ী থেকে অন্ততঃ সামান্য একটু তেল চেয়ে আনুন না!

হযরত রাবেয়ার আব্বা ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর আবেদ ব্যক্তি। তিনি কসম করে রেখেছিলেন যে, নিজের অভাব-অভিযোগের কথা কারও কাছে কোন দিন প্রকাশ করবেন না।

স্ত্রীর কথা রক্ষা করার জন্যই তিনি বের হয়ে গেলেন এবং পড়শীর বাড়ীর দরজায় হাত রেখে ফিরে এলেন। স্ত্রীকে বললেন, ওদের দরজা বন্ধ। এরপর তাঁরা অন্ধকারেই শুয়ে পড়লেন। সে রাতেই হযরত রাবেয়ার আব্বা স্বপ্নে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ করলেন।

হুযুর (সাঃ) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, -"দুঃখ করো না। । তোমার এ কন্যা একজন সাইয়্যেদা। এর এমন মর্যাদা হবে যে, আমার উম্মতের অন্ততঃ সত্তর হাজার লাকের জন্যে সে সুপারিশ করতে পারবে।

কাল তুমি বসরার আমীর ঈসা যরওয়ানের নিকট যাও এবং তাকে লিখিতভাবে জানাও যে, "প্রতি রাতে সে আমার প্রতি একশ' বার দরূদ শরীফ প্রেরণ করতো এবং জুমার রাতে চারশো বার। গত জুমার রাতে দরূদ প্রেরণ করে নাই। এর কাফফারা স্বরূপ সে যেন তোমাকে চারশো স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে দেয়। সে মুদ্রা দ্বারা তুমি তোমার প্রয়োজন মিটাও।"

হযরত রাবেয়ার আব্বা ক্রন্দনরত অবস্থায় জাগ্রত হলেন এবং নির্দেশ অনুযায়ী স্বপ্নের বৃত্তান্ত একটি কাগজে লিখে আমীর ঈসা যরওয়ানের নিকট পেশ করলেন। ঈসা স্বপ্নের বিবরণ পাঠ করে অভিভূত হয়ে পড়লেন। এমন একটা সৌভাগ্যসূচক স্বপ্নের শুকরিয়াস্বরূপ তৎক্ষনাৎ দশ হাজার মুদ্রা দরবেশগণের মধ্যে বন্টন করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। চার হাজার স্বর্ণ মুদ্রাসহ রাবেয়াদের পূর্ণ কুটিরে নিজে হাজির হলেন এবং অত্যন্ত ভক্তির সাথে সেগুলি হযরত রাবেয়ার (রাহঃ) আব্বার হাতে সমর্পণ করলেন! - [তাযকেরাতুল আওলিয়া: ফরীদুদ্দীন আত্তার।

৪.

আবুল আব্বাস ইবনে নফীস কারী ছিলেন একজন অন্ধ। তিনি বর্ণনা করেন, "একবার আমি তিন দিন উপবাস থেকে রওজা শরীফের পাশে এসে নিবেদন। করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি ক্ষুধার্ত।" এরপর দুর্বল শরীর নিয়ে শুয়ে পড়লাম।

কিছুক্ষণ পর একটি বালিকা এসে আমার পায়ে নাড়া দিল এবং বলল-আমার সঙ্গে আস। আমি তার সঙ্গে গেলাম। সে আমাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেল এবং যত্ন করে খেতে দিল। বলল-নানাজান আমাকে হুকুম দিয়েছেন যেন তোমাকে ডেকে খেতে দেই। যখনই ক্ষুধা অনুভব কর, এখানে চলে এসো। উল্লেখ্য যে, সৈয়দ খান্দানের লোকেরা সাধারণত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নানাজান' বলে সম্বাধেন করে থাকেন। -(ওয়াফা আল-ওয়াফা)। ।

ইমাম তিবরানী, আবুশ শায়খ এবং ইবনুল-মুকরী একই সাথে মদীনা শরীফে শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন। এক সময় তাঁরা তিনজনই মারাত্মক অর্থাভাবে পতিত হয়ে একাধারে রোযা রেখে চলছিলেন। শেষ পর্যন্ত অপারগ হয়ে একদিন তিনজনে মিলে রওজা শরীফ যিয়ারত করতে গেলেন এবং পাশে দাড়িয়ে বললেন- ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছি।

ফরিয়াদ জানানোর পর দু'জন বাসস্থানে চলে গেলেন। কিন্তু ইমাম তিবরানী (রাহঃ) গেলেন না। তিনি এই বলে রওজাপাকের পাশে বসে রইলেন. এরপর এক ব্যক্তি গোশত ও নানা প্রকার সুগন্ধি দ্বারা পাকানো ছারীদ নিয়ে হাজির হলো এবং আমাকে শোয়া থেকে উঠিয়ে বলতে লাগলো ঘরে আজ এই উপাদেয় খাবার পাক হয়েছিল। আমি নিদ্রিত ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম, হুযুরে পাক (সাঃ) আমাকে লক্ষ্য করে এরশাদ করছেনঃ তোমার এক ভাইয়ের ছারীদ খেতে মন চেয়েছে। সে মসজিদে শায়িত। তাকে তোমার এ খাবার থেকে অংশ দাও। - (ফাযায়েলে হজ্ব)

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা রক্ষায় সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহঃ)'র সিলসিলার অবদান

জাবেদ বিন ফারুকী

প্রাককথা

উম্মতের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা সর্বোচ্চ শিখরে। সাহাবায়ে কিরামের শিক্ষক হলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)। তিনি তালিম, তারবিয়্যাত, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, ইসলাহ্ ও সংশোধনের মাধ্যমে তাদেরকে যোগ্য করে গড়ে তুলেছিলেন। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের সত্যবাদিতা, নির্ভরযোগ্যতা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার প্রশংসা করেছেন। সাহাবায়ে কিরামের জামাআত আদর্শ জামাআত। তাদের অনুসৃত পথ সঠিক বা নির্ভুল পথ। এ কারণেই তাদের বিরোধিতা করাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর বিরোধিতার নামান্তর বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এবং এ জাতীয় লোকদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়েছে এবং এ জাতীয় লোকদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে বলে সতর্ক করা হয়েছে। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের (সা.) বিরুদ্ধাচারণ করে আর মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে তবে যেদিক সে ফিরে যায়, সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করবো আর তা কত মন্দ আবাস। (সুরা নিসা, ৪ঃ১১৫)

আলোচ্য নিবন্ধে আমরা সাহাবায়ে কেরামের পরিচয়, তাঁদের মর্যাদা, সংখ্যা ও সমালোচনার পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাবো ইনশাআল্লাহ।

সাহাবীর পরিচয়

'সাহাবী' শব্দটি আরবি ভাষার (الصحبة) 'সুহবত' শব্দের একটি রূপ। একবচনে 'সাহেব' ও 'সাহাবী' এবং বহুবচনে (الصاحب) 'সাহাব' ও (الأصحاب) 'আসহাব' ব্যবহৃত হয়। আভিধানিক অর্থ সঙ্গী, সাথী, সহচর, এক সাথে জীবন যাপনকারী অথবা সাহচর্যে অবস্থানকারী, (The Companions)। ইসলামি

পরিভাষায় 'সাহাবা' শব্দটি দ্বারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মহান সঙ্গী-সাথীদের বোঝায়। (ড. রুহী আল-বালবাকী, আল মাওরিদ, দারুল ইলমিল মালায়ীন, (বৈরুত, ৭ম সংস্করণ -১৯৯৫ইং), পৃ. ৬৮৭)

তবে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গী-সাথীদের বোঝানোর জন্য 'সাহেব'-এর বহুবচনে 'সাহাবা' ছাড়া 'আসহাব' ও 'সাহব'ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (ফাতহুল মুগিস, ইমাম সামছুদ্দীন আস-সাখাবি, (মৃ. ১৩৪৮খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৭৯)

হাফেজ ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা গ্রন্থে সাহাবীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

.إن الصحابي: من لقي النبيّ ﷺ مؤمنًا به، ومات على الإسلام

'সাহাবী সেই ব্যক্তি যিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ঈমান সহকারে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ইসলামের ওপরই মৃত্যুবরণ করেছেন। ' (ইবনে হাজার আল-আসকালানী (মৃ. ৮৫২ হি.), আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, বৈরুত, লেবানন, খ. ১, পৃ. ১৫৮)

সুতারাং সাহাবী ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি রাসুল (সা.) হাতে ইসলাম গ্রহন করে ঈমান এনেছেন এবং ঈমানী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সাথে তাঁদের সঙ্গ স্বল্প সময়ের জন্য হোক বা দীর্ঘ সময়ের জন্য হোক। তাঁরা রাসুলুল্লাহ (সা.) হতে হাদিস বর্ণনা করুক বা নাই করুক। তাঁরা রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সঙ্গে জিহাদে অংশ গ্রহণ করুক বা নাই করুক।

উপরোক্ত সংজ্ঞায় সাহাবী হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। যথা-

১. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ঈমান,

২. ঈমানের অবস্থায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ (আল-লিকা)

৩. ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ (মাওত আলাল ইসলাম)।

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদাঃ

*** কুরআন শরীফ থেকেঃ**

পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াত সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত হলো:

১. মহান আল্লাহ তায়ালা সকল সাহাবীর প্রশংসা করছেন,

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ.

'মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রাসুল; তাঁর সহচরগণ, কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাঁদেরকে রুকু ও সাজদায় অবনত দেখবে। তাঁদের মুখমন্ডলে সাজদার চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তাঁদের বর্ণনা এরূপই এবং ইনজীলেও।' (সূরা আল-ফাতহ, ৪৮:২৯)

তাফসীরে ইবনে কাসিরে এসেছে,

يخبر تعالى عن محمد صلوات الله عليه ، أنه رسوله حقا بلا شك ولا ريب، فقال: { محمد رسول الله } ، وهذا مبتدأ وخبر، وهو مشتمل على كل وصف جميل، ثم ثنى بالثناء على أصحابه فقال: { والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم } ، كما قال تعالى: { فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين

মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এই সংবাদ দিতেছেন যে, তিনি সন্দেহাতীতরূপে আল্লাহর সত্য নবী। তাই তিনি বলেছেন, مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রাসুল। আয়াতে "محمد" মুবতাদা বা উদ্দেশ্য এবং رَسُولُ اللهِ" খবর বা বিধেয়। অর্থাৎ ইহা একটি পূর্ণ বাক্য। মুহাম্মদ সা. যাবতীয় প্রশংসনীয় গুনে গুনান্বিত।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা করে নাজিল করলেন,

وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

"তাঁর সহচরগণ, কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।"

যেমন অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ.

আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায়কে আনবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন। যাহারা তাঁকে ভালোবাসবে, তারা মুমিনদের প্রতি কোমল, আর কাফেরদের প্রতি কঠোর হইবে। ইহাই মুমিনের পরিচয় যে, তারা কাফেরদের প্রতি হবে কঠোর পাষাণ আর মুমিনদের প্রতি সহনশীল।

(তাফসীরে কুরআনুল আজীম, আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসির (মৃ. ৭৭৪ হি.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, (প্রথম সংস্করণ ১৪১৯ হি.), খ. ৭, পৃ. ৩৩৬-৩৭)

রাসুল সা. বলেন, মুমিনদের পারস্পরিক ভালোবাসা, প্রীতি ও হৃদ্যতার দৃষ্টান্ত হলো এক দেহের ন্যায়, একটি অংগ অসুস্থ হলে সারা দেহেই অনিদ্রা ও জ্বর দেখা দেয়। (সহীহ বুখারি, ৪৮১)

২. আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

'মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এটা মহা কামিয়াবি।' (সূরা আত-তাওবা, ৯:১০০)

এই আয়াতের তাফসীরে ইবনে কাসিরে এসেছে,

قَال الشّعبي: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية.

وقَال أبو موسى الأشعري، وسعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، والحسن، وقتادة: هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقَال محمد بن كعب القرظي: مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ: { والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار } فأخذ عمر بيده فقال: من أقرأك هذا؟ فقال: أبي بن كعب. فقال: لا تفارقني حتى أذهب بك إليه. فلما جاءه قال عمر: أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا؟ قال: نعم. قال: وسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا، فقال أبي: تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة: { وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم } [الجمعة:3] وفي سورة الحشر: { والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان } [الحشر:10] وفي الأنفال: { والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم

শা'বী(রঃ) বলেন যে, মুহাজির ও আনছারদের মধ্যে অগ্রবর্তী ও প্রথম তাঁরাই যাঁরা হুদায়বিয়ায় বায়আ'তে রিযওয়ানের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব আল কুরাজি (রাঃ) বলেন যে, ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এমন একজন লোকের পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন যিনি এই আয়াতটি পাঠ করছিলেন,

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَار

তখন ওমর (রাঃ) তাঁর হাতখানা ধরে জিজ্ঞেস করলেনঃ 'কে তোমাকে এটা এরূপে পাঠ করালেন?" লোকটি উত্তরে বললেনঃ "উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)"। তখন ওমর (রাঃ) বললেন চলো আমরা উবাই ইবনে কাবে'র কাছে যাই এবং এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি। অতঃপর উবাই ইবনে কাবে'র কাছে গিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনি কি এই আয়াতটি এভাবে পড়তে বলেছেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। তখন ওমর (রাঃ) তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনি কি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে এভাবেই পড়তে শুনেছেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। ওমর (রাঃ) বললেনঃ "তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আমরা এমন এক মর্যাদা লাভ করেছি যা আমাদের পরে কেউ লাভ করতে পারবেনা"। এ কথা শুনে উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন যে, এই আয়াতের সত্যতা প্রমাণকারী সুরায়ে জুমাআ'র প্রথম দিকের আয়াতটিও বটে। তা হচ্ছে-

وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

অর্থাৎ "আর উপস্থিতরা ব্যতিত অন্যান্ন লোকদের জন্যেও, যারা তাদের সাথে শামিল হবে, কিন্তু এখনও শামিল হয়নি, আর তিনি মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (সূরা জুময়া, ৬২ঃ৩)

(তাফসীরে কুরআনুল আজীম, আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসির (মৃ. ৭৭৪ হি.), প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৭৭-১৭৮)-

وَذُكِرَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا بِرَفْعِ :رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرقَالَ
عَطْفًا عَلَى (وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ) "الأَنْصَارِ"

ইবনে জারীর(রঃ) এটা রিওয়ায়াত করেছেন এবং বলেছেন যে, হাসান বসরী(রাঃ) انصار 'আনছার' শব্দটিকে পেশ দিয়ে পড়তেন এবং السابقون الأولون-এর উপর عطف করতেন। তখন অর্থ দাঁড়াবেঃ "মুহাজিরদের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী ও প্রথম এবং আনছার ও তাদের অনুসারীদের প্রতি আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট"।

৩. অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

'এ সম্পদ অভাবগ্রস্থ মুহাজিরদের জন্য যাঁরা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তাঁরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাহায্য করে। তারাই তো সত্যাশ্রয়ী। মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এ নগরীতে (মদীনা) বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে তাঁরা মুহাজিরদের ভালবাসে এবং মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না, আর তাঁরা তাঁদেরকে নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্থ হলেও।' (সূরা আল-হাশর, ৫৯:৮- ৯)

এ আয়াতে প্রথম মুহাজির ও পরে আনসারদের প্রশংসা করা হয়েছে। (বিস্তারিত: উক্ত আয়াতের ব্যাখা- তাফসীরে মায়ালিমুল তানজীল, আবি মুহাম্মাদ হুসাইন ইবনে মাসউদ আল বাগাভী (মৃ. ৫১৬হি.), দারু তায়েবাহ, রিয়াদ (১ম সংস্করণ, ১৪১২ হি.) খ.৮, পৃ. ৭৫-৭৬)

ঐ দুইটি স্তর দুইটি অতিবাহিত হয়ে গেছে; আর বাকি আছে এ স্তরটি। সুতারাং সবচে সুন্দর হবে যখন তোমাদের অবস্থান হবে ঐ স্তরের সাথে, যা অবশিষ্ট আছে। তিনি বলেন, তোমরা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।

(হাকেম, আল মুসতাদরাক, হা.৩৮০০)

৪. অপর জায়গায় এরশাদ হয়েছে-

لَقَدْ رَضِيَ اللَّـهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়া'লা ঐ সকল মুসলমানদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন (যাহারা আপনার সফর সঙ্গী), যখন তাঁহারা আপনার সাথে গাছের নিচে অঙ্গীকার করছিলো এবং তাঁদের অন্তরে যা কিছু (ইখলাস ও মজবুতি) ছিল তাও আল্লাহ তায়া'লার জানা ছিল, আর আল্লাহ তায়া'লা তাঁদের অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে একটি নিকটবর্তী বিজয় দান করলেন। (এর দ্বারা খায়বরের বিজয় কে বুঝানো হয়েছে, যা একেবারে নিকটবর্তী সময়ে হয়েছে) আর প্রচুর গনিমতও দান করলেন। (সূরা আল ফাতহ- ৪৮:১৮)

উক্ত আয়াতের শানে নুজুলে এসেছে,

حدثني إياس بن سلمة، عن أبيه، قال: بينما نحن قائلون. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، البيعة البيعة، نزل روح القدس. قال: فثرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت شجرة سمرة فبايعناه

সালমা ইবনে আকওয়া রা. বলেন, আমরা দুপুরের খানা খেয়ে বিশ্রাম করছিলাম, এমতাবস্থায় রাসুলুল্লাহ সা. এর ঘোষক ঘোষণা দিলেন, "বাইয়াত, বাইয়াত"। আরো ঘোষণা এলো, তোমরা সকলে বৃক্ষের নিচে আসো। রহুল কুদুস (জিবরাঈল আ.) অবতরণ করেছেন। আমরা এই ডাকে সাড়া দিয়ে হাজির হলাম। তখন রাসুলুল্লাহ সা. ঝাউ গাছের নীচে অবস্থান করছিলেন। এই সময় এই আয়াত নাজিল হয়।

(তাফসীরে কুরআনুল আজীম, হাফেজ ইমাদ্দুদিন আবুল ফিদা ইবনে কাসির, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৩১৫)

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন,

كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة

আমরা হুদাইবিয়ার অনুষ্ঠানে ছিলাম এক হাজার চারশত। (সহীহ বুখারী, খ. ৬, পৃ. ১৩৬, হা. ৪৮৪০)

সুতারাং এ আয়াতটি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, আল্লাহ সাহাবীদেরকে পরিশুদ্ধ করেছেন, আর এ তাজকিয়া বা পরিশুদ্ধির সংবাদ আল্লাহই পরিবেশন করেছেন।

৫. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে তারা সমান নয় (তাদের, যারা তা বিজয়ের পরে করেছে)। এরূপ লোকদের

মর্যাদা অনেক বড় তাদের অপেক্ষা যারা পরে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। তবে উভয়ের জন্যই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবগত।"

(সূরা আল হাদিদ, ৫৭:১০)

আল্লামা কালবী (র.) বলেন, উক্ত আয়াতটি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. শানে নাজিল হয়েছে। তিনিই সর্ব প্রথম মুসলমান হয়েছেন এবং আল্লাহর রাহে দান করেছেন। মিরাজের ঘটনা শ্রবণ করে তিনিই সর্ব প্রথম বিশ্বাস স্থাপন করেছেন।

(আল জামে লি আহকামুল কুরআন, আবু আবদুল্লাহ আল কুরতবি (মৃ. ৬৭১ হি.), মুয়াসসিসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, (প্রথম সংস্করণ ১৪২৭ হি.), খ.১৭, পৃ. ২৪০)

প্রখ্যাত তাবেয়ী মুজাহিদ ও কাতাদা (র.) এর মতে, উক্ত আয়াতে اَلْحُسْنٰى দ্বারা জান্নাত উদ্দেশ্য।

(তাফসীরে তাবারী, আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারির আত তাবারি (মৃ. ৩১০হি.), দারুল মারেফাহ, ৪র্থ সংস্করণ, বৈরুত, খ. ২৭, পৃ. ২২০)

৬. আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كنتم خير أمة أخرجت للناس الخ-

অর্থাৎ -"তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে।

(সুরা আল-ইমরান, ৩:১১০)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ওমরের (রাঃ) একটি উক্তি তুলে ধরেছেন-

لو شاء الله لقال انتم فكنا كلنا ولكن قال كنتم فى

خاصة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم"

অর্থাৎ "যদি আল্লাহপাক ইচ্ছা করতেন তাহলে কুনতুম না বলে "আনতুম খায়রা উম্মাতিন"বলতে পারতেন এবং সেক্ষেত্রে আমরা সকলেই এ আয়াতের আওতায় চলে আসতাম। কিন্তু! আল্লাহপাক এখানে সাহাবাদের মধ্যে বিশেষ জামায়াতকে সম্বোধণ করেছেন।

(তাফসীরে দুররে মানসুর, হাফেজ জালালুদ্দিন আস সুয়ূতি (মৃ. ৯১১হি.), দারুল ফিকর, বৈরুত, (১ম সংস্করণ ১৪৩৩হি.), খ.২ পৃ. ২৯৩)

হাদিস শরীফ থেকে

রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজেও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের শানে বক্তব্য রেখেছেন। তাঁদের সম্মান, মর্যাদা ও স্থান নির্ধারণ করে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যেমন,

১. রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন,

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ أَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ وَشَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম লোক হচ্ছে আমার যুগের লোকেরা। তারপর তার পরের যুগের লোকেরা, তারপর তার পরের যুগের লোকেরা। তারপর এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে যাদের কসম হবে তাদের সাক্ষ্যের অগ্রগামী। তাদের কাছে সাক্ষী চাওয়ার আগেই তারা সাক্ষ্য দেবে।"

(সুলাইমান ইবনুল আশআস সিজিস্থানি (মৃ. ২৭৫ হি.) সুনান আবু দাউদ, দারু হিজরা, কায়রো, মিসর, খ. ১, পৃ. ২৩৯, হাদীস: ২৯৭)

২. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন,

مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد فى تركه فإن لم يكن فى كتاب الله فسنة منى ماضية فإن لم يكن سنة منى ماضية فما قال أصحابى إن أصحابى بمنزلة النجوم فى السماء بأيما أخذتم به اهتديتم واختلاف أصحابى لكم رحمة

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাবের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তার ওপর আমল করতে হবে। তা তরক করা সম্পর্কে তোমাদের কারো কোনো ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি আল্লাহর কিতাবে কোনো সিদ্ধান্ত না পাওয়া যায় তাহলে আমার সুন্নাহে খোঁজ করতে থাক। যদি তাতেও না পাওয়া যায় তাহলে আমার সাহাবায়ে কেরামের কথায় তালাশ করতে হবে। আমার সাহাবীরা আকাশের তারকা সদৃশ। তার কোনো একটিকে তোমরা গ্রহণ করলে সঠিক পথ পাবে। আর আমার সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক ইখতিলাফ বা মতপার্থক্য তোমাদের জন্য রহমতস্বরূপ।

(আহমদ ইবনুল হোসাইন (মৃ. ৪৫৮ হি.) আল-বায়হাকীঃ সুনান কুবরা, দারুল খুলাফা লিল-কুতুবিল ইসলামিয়া, কুয়েত, পৃ. ১৪৭, হাদীস: ১৫২)

৩. রাসুল সা. বলেন,

النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ

অর্থঃ নক্ষত্র সমুহ আসমানের জন্য আমানত স্বরুপ। যখন নক্ষত্রগুলি বিলুপ্ত হয়ে যাবে তখন আসমানকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কেয়ামত চলে আসবে।

এবং আমি আমার সাহাবীদের জন্য আমানত স্বরূপ। অতএব যখন আমি ইহকাল ত্যাগ করব তখন তাঁদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁদের (সাহাবাদের) মধ্যে ইজতেহাদি মতানৈক্য দেখা দিবে। এবং আমার সাহাবীরা উম্মতের জন্য আমানত স্বরুপ। অতএব যখন তাঁদের যুগের অবসান ঘটবে তখন আমার উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ফেতনা-ফ্যাসাদের সুত্রপাত ঘটবে। (মুসলিম শরীফ, হা. ২৫৩১)

৪. অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ সা. বলেন,

الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله أوشك أن يأخذه.

হযরত ইবনে মুগাফফাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমার ছাহাবীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহকে ভয় কর। আমার পরবর্তীকালে তোমরা তাঁদের সমালোচনার নিশানায় পরিণত করো না। কারণ, যে তাদের ভালোবাসবে সে আমার মুহাব্বতেই তাদের ভালোবাসবে। আর যে তাঁদের অপছন্দ করবে সে আমাকে অপছন্দ করার ফলেই তাঁদের অপছন্দ করবে। আর যে তাঁদের কষ্ট দেবে সে আমাকেই কষ্ট দেবে। আর যে আমাকে কষ্ট দেবে সে যেন আল্লাহকেই কষ্ট দিল। আর যে আল্লাহকে কষ্ট দেবে অচিরেই আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন।'

(মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, সুনান তিরমিযী, দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, খ. ৫, পৃ. ৬৯৬, হাদীসঃ ৩৮৬২)

৫. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন,

إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار لي من أصحابي أربعة ' - يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً رحمهم الله - "فجعلهم أصحابي . وقال في أصحابي: كلهم خير، واختار أمتي على الأمم، واختار " من أمتي أربعة قرون: القرن الأول والثاني والثالث والرابع

আল্লাহ তায়ালা নবী রাসুলগণ ব্যতীত সমস্ত সৃষ্টি জগতের মধ্যে আমার সাহাবীদের পছন্দ করেছেন। আর তিনি আমার সাহাবীদের মধ্য হতে চারজন - হযরত আবি বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী রা. কে আমার জন্য পছন্দ করেছেন। রাসুল সা. আরো ইরশাদ করেন, আমার সমস্ত সাহাবীর মধ্যে কল্যাণ নিহিত আছে। আল্লাহ তায়ালা সমগ্র উম্মতের মধ্য হতে আমার উম্মতকে পছন্দ করেছেন। আবার আমার উম্মতের মধ্য হতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীকে অধিক পছন্দ করেছেন।

সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা

সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা যে কত তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। গ্রহণযোগ্য একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়,

'আবু জুরয়া (রহ.)-কে নবী করিম (রা.) থেকে যেসব সাহাবি হাদিস বর্ণনা করেছেন তাঁদের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, কে এই সংখ্যা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করেছে? বিদায় হজে নবীজির সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন ৪০ হাজার সাহাবি আর তাবুক যুদ্ধে ৭০ হাজার সাহাবি। তিনি আরো বলেছেন, 'নবী (সা.) মদিনা, মক্কা এবং এর মাঝের বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী এবং বেদুইনদের মধ্য থেকে এক লাখ ১৪ হাজার সাহাবি ছেড়ে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। যাঁরা তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর কাছে শুনেছেন। (অথবা তিনি বলেছেন, যাঁরা তাঁকে দেখেছেন বা তাঁর কথা শুনেছেন)। আর বিদায় হজে জাবালে আরাফাতে সবাই তাঁকে দেখেছেন এবং তাঁর কথা শুনেছেন।'

(খতিবে বাগদাদী (মৃ. ৪৬৩ হি.), আল জামে লি আখলাকির রা'য়ি ওয়া আদাবু ছামি, মাকতাবুল মায়ারিফ, রিয়াদ, খ. ২, পৃ. ২৯৩, হা. ১৮৯৪)

তাহলে যে সকল সাহাবী কোনো হাদীস বর্ণনা করেননি তাঁদের সংখ্যা যে কত বিপুল তা সহজেই অনুমেয়। সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রাযি.)-এর একটি বক্তব্য দ্বারা। তিনি তাবুক অভিযান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন,

والمسلمون مع رسول الله {صلى الله عليه وسلم} كثير ولا يجمعهم كتابٌ حافظ يريد بذلك الديوان

'মানুষের সংখ্যা অনেক। কোনো দফতর বা দিওয়ান তা গণনা করতে পারবে না।'

(মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (মৃ. ২৬১ হি.) সহীহ আল মুসলিম, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন, খ. ৪, পৃ. ২১২০, হাদীস:২৭৬৯)

জালালুদ্দিন সুয়ুতি (রহ.) বলেন,

أنّ عدد الصحابة مئةٌ وأربعةٌ وعشرون ألفاً،

সাহাবিদের সংখ্যা এক লাখ ২৪ হাজার। (আল খাসাইসুল কুবরা)।

সাহাবায়ে কেরামের যথাযথ হিসেব কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কারণ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের শেষ দিকে মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর হাতে বাইয়াত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, হিজরী দশম সনে মক্কা এবং তায়েফে একজনও অমুসলিম ছিল না। সকলে ইসলাম গ্রহণ করে বিদায় হজ্জে অংশগ্রহণ করে। হযরত আবু বকরের (রাঃ) খিলাফতকালে ভন্ড নবী ও

(নুরুদ্দীন আলী ইবনে আবু বকর আল-হায়সামি (মৃ. ৮০৭ হি.) মাজমাউজ জাওয়ায়েদ ওয়ামান ফাউল ফাওয়ায়েদ, (দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪১২ হি.) খ. ৯, পৃ. ৭৩৬)

৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন,

مثل أصحابي مثل النجوم يهتدي به فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم

রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন, আমার সাহাবাগণ এমন তারকাতুল্য, যা পথ প্রদর্শন করে, সুতরাং তোমরা যার বক্তব্যকেই গ্রহণ কর তোমরা হেদায়েত পেয়ে যাবে। (মুসনাদে আব্দ বিন হুমাইদ, হাদীস নং-৭৮৩)

৭. হযরত ওমর রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন,

أَكْرِمُوا أَصْحَابِي ، فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ ،

তোমরা আমার সাহাবীগণকে সম্মান কর, কারণ, নিশ্চয়ই তাঁরা তোমাদের মধ্যে উত্তম।

(মোল্লা আলি ক্বারি (মৃ. ১০১৪ হি.), মিরকাতুল মাফাতীহ ফি শরহে মিসকাতুল মাসাবীহ, দারুল ফিকর, বৈরুত, পৃ. ০৯, হাদিস, ৩৮৭৯)

৮. হাফিয ইবনে আবদুল বার (রহ.) সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,

'রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুহবত ও তাঁর সুন্নাতের হিফাযত ও ইশায়াতের দুর্লভ মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা এসব মহান ব্যক্তির ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন। এ কারণেই তাঁরা খায়রুল কুরুন ও খায়রু উম্মাতিনের মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন।'

(ইবনে আবদুল বার (মৃ. ১০৭১খ্রি.), আল-ইসতিআব ফী মা'রিফাতিল আসহাব, দারুল জীলদ, বৈরুত, খ. ১, পৃ. ১)

৯. দশজন সাহাবীর জীবদ্দশায় রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তবে মুসলিম পণ্ডিতদের অনেকে সাহাবায়ে কেরামের সকলেই জান্নাতী বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকলানী (রহ.) আল-ইসাবা গ্রন্থে স্পেনের ইমাম ইবনে হাযাম (রহ.)-এর মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন,

الصحابة كلّهم من أهل الجنة قطعا.

'সাহাবায়ে কেরামের সকলেই নিশ্চিতভাবে জান্নাতী।'

(সাঈদ ইবনে হাযম (মৃ. ৪৫৬ হি.), আল-ফাসাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল, মাকতাবাতুল খানজী, কায়রো, মিসর, খ. ৪, পৃ. ১১৬)

ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযানকালে অসংখ্য সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। তাঁদের অনেকের পরিচয় ধরে রাখা সম্ভব হয়নি।

সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা বা কটুক্তির পরিণাম

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা হলো, সাহাবায়ে কেরামের সম্পর্কে কটূক্তি কিংবা গালি দেয়া সম্পূর্ণ হারাম। এটা কবিরা গুনাহ।

১. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللهَ وَ رَسُوْلَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا.

নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লানত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অপমানজনক আযাব। (সূরা আহযাব, ৩৩:৫৭)

২. হাদিস শরীফে রাসুলুল্লাহ সা. বলেন,

لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার সাহাবীদের গালমন্দ করবে না। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের কেউ যদি উহূদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও দান-খয়রাত করে তবে তা তাদের কারো এক মুদ্দ বা অর্ধ মুদ্দ দান-খয়রাত করার সমান মর্যাদাসম্পন্নও হবে না।

(ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (মৃ. ২৬১ হি.), সহীহ আল মুসলিম, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, খ. 8, পৃ. ১৯৬৭, হাদীসঃ ২৫৪০)

মুদ্দ হলো একটি শরয়ী ওজন। মেট্রিক পদ্ধতিতে এক মুদ্দ হলো ৭৯৬.৬৮ গ্রাম।

[বি.দ্র.] অভিধানে (سب) ছাব্ব সরাসরি গালিকে বলে না, বরং গালির দিকে ধাবমান নিন্দাবাদকে বলে। মুজামুল ফারকুল লাগাবিয়্যাহ, নং-১১৭৪।

(হাফেজ ইবনে তাইমিয়া রহঃ বলেন-যে কথা সমাজে খারাপ ও দোষ এবং ত্রুটি হিসেবে বলা হয় তা'ই ছব্ব। আস সারেমূল মাসলূল-৫৩৪)

আরবীতে গালি বুঝাতে ব্যবহৃত হয় شتم শব্দ। "শাতাম" অর্থ হল গালি। ছাব্ব অর্থ সরাসরি গালি নয়। বরং যথার্থ অর্থ হল, মন্দ বলা, খারাপ বলা ইত্যাদি।

৩. হাদিস শরীফে এসেছে,

হযরত ইবনে উমর রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যে আমার সাহাবীকে মন্দ বলে, তার উপর আল্লাহর অভিশাপ।" (তাবরানি শরীফ, খ.১২, পৃ. ৪৩৪, হাদিস- ১৩৬২২)

৪. অন্য হাদিসে এসেছে,

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين

হযরত আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার সাহাবীকে মন্দ বলবে, তার উপর আল্লাহর, ফেরেশতা এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ।"

(আহমাদ বিন হাম্বল (মৃ. ২৪১ হি.), ফাযায়েলে সাহাবা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, খ. ১, পৃ. ৫২, হাদিস- ৮)

৫. রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন,

من سب نبيًا فاقتلوه ومن سب أصحابى فاضربوه

হযরত আলী রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন- "যে ব্যক্তি নবীকে [ছাব্ব] মন্দ বলে, তাকে হত্যা কর। আর যে সাহাবীকে [ছাব্ব] মন্দ বলে তাকে প্রহার কর।" (দায়লামী, খ. ৩, পৃ. ৫৪১, হাদীস- ৫৬৮৮)

৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

"তোমরা মুহাম্মাদ সা. এর সাহাবিদের গালি কিংবা তাদের সম্পর্কে কটূক্তি করো না। কেননা, তাঁদের রাসুল সা. এর সাথে এক মুহূর্ত অবস্থান তোমাদের চল্লিশ বছর ইবাদতের চেয়ে অনেক উত্তম।"

(ইবনে বাত্তাহ আল আকবারি (মৃ. ৩৮৭হি.) শরহুল ইবানাহ, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, মদিনা মুনাওয়ারা, পৃ. ১১৯)

৭. হযরত আতা ইবনে আবু রাবাহ (রহ.) বর্ণনা করেন, রাসুল সা. বলেছেন,

مَنْ حَفِظَنِي فِي أَصْحَابِي كُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَافِظًا ، وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ

"যে ব্যক্তি আমার সাহাবিদের বিষয়ে আমাকে নিরাপদ রাখবে, কিয়ামতের দিন আমি তার নিরাপত্তা দান করবো। আর যে ব্যক্তি আমার সাহাবিদের গাল-মন্দ, কটূক্তি করবে, তার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক।" (ফাযায়েলে সাহাবাহ, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৫৪, হা. ১০)

৮. হাদিস শরীফে এসেছে,

الأَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ

" মুমিন ছাড়া আনসারদেরকে কেউ ভালবাসবে না এবং মুনাফিক ছাড়া কেউ তাঁদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে না। যে ব্যক্তি তাঁদেরকে ভালবাসবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ভালবাসবেন আর যে ব্যক্তি তাঁদের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ঘৃণা করবেন। (সহীহ বুখারি, খ. ৫, পৃ. ৩২, হা. ৩৭৮৩)

৯. ইমাম মালেক রহ. বলেন,

إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك ، فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء و لو كان رجلاً صالحاً لكان أصحابه صالحين

"যারা সাহাবাদের ব্যপারে কুৎসা রটনা করে এবং তাদেরকে গালি দেয় এরা মূলত: রাসূল সা. এর বিরুদ্ধেও কুৎসা রটাতে চেয়েছিলো, কিন্তু তাদের দ্বারা তা সম্ভব হয়নি। তাই তারা সাহাবাগণের ব্যাপারে মিথ্যা রটিয়েছে এবং বলেছে, অমুক সাহাবী নিকৃষ্ট লোক ছিল, অমুকে এমন ছিল তেমন ছিল ইত্যাদি। রাসূল স. যদি নেককার ও সৎ হয়ে থাকেন, তবে তাদের নিকট তার সাহাবীরাও সৎ ও নেককার বিবেচিত হতো।"

(ইমাম ইবনে তাইমিয়া (মৃ. ৭২৮ হি.), আস-সারিমূল মাসলূল, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, বৈরুত, পৃ. ৫৫৩)

১০. হযরত আবূ যুর'আ রহ. বলেন,

فإذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلم انه زنديق، وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم اولى وهم زنادقة

"তোমরা যখন কাউকে কোন সাহাবীর অবমাননা করতে দেখ, তখন বিশ্বাস করে নাও যে, সে যিন্দীক ও বির্ধমী। তা এ জন্য যে, আমাদের নিকট রাসূল সা. সত্য নবী, পবিত্র কুরআন সত্য; কুরআন হাদীস তথা পুরা দ্বীন যা আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে, তার প্রথম যোগসূত্র হলেন সম্মানিত এ জামাত। সুতরাং যে ব্যক্তি সাহাবাগণের সমলোচনা করবে, সে আমাদের বিশ্বস্ত সাক্ষীদের সমালোচনার মাধ্যমে সম্পূর্ণ দ্বীনকে অগ্রাহ্য বলে ঘোষণা করতে চায়। অর্থাৎ ইসলামের মূলভিত্তি ধ্বংস করে দিতে চায়। সুতরাং এজাতীয় লোকদের সমালোচনা করা উত্তম বরং এরা হলো যিন্দিক।"

(খতীবে বাগদাদী, আল-কিফায়া ফী ইলমি রিওয়া-ইয়াহ, পৃ. ৪৯)

১১. ইমাম আহমদ র. বলেন,

يَا أَبَا الْحَسَنِ إِذَا رَأَيْتَ رَجُلًا يَذْكُرُ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ بِسُوءٍ فَاتَّهِمْهُ عَلَى الْإِسْلَامِ.

হে আবুল হাসান! যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে সাহাবিগণের মধ্যে কোন একজনের বিরুদ্ধে মন্দ সমালোচনার করতে দেখবে, তখন তুমি তাকে সন্দেহ করবে যে, সে মুসলিম কিনা। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ. ৮, পৃ. ১৪২)

১২. ইমাম আবু নাঈম র. বলেন,

তোমাদের কেহ যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের ত্রুটি ও ভুলভ্রান্তির পিছনে না লাগে, বরং সে যেন তাদের পক্ষ থেকে রাগান্বিত অবস্থায় মনের অজান্তে তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে মন্দ কিছু হয়ে থাকলে, সে ব্যাপারে তাদেরকে হেফাজত করে। (আবু নাঈম, ইমামত, পৃ. ৩৪৪)

১৩.শামসুল আইয়িম্মাহ সারাখসী রহঃ লিখেনঃ

لِأَن الله تَعَالَى أثنى عَلَيْهِم فِي غير مَوضِع من كِتَابه كَمَا قَالَ تَعَالَى {مُحَمَّد رَسُول الله وَالَّذين مَعَه} الْآيَة وَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَصفهم بِأَنَّهُم خير النَّاس فَقَالَ خير النَّاس قَرْنِي الَّذين أَنا فيهم والشريعة إِنَّمَا بلغتنا بنقلهم فَمن طعن فيهم فَهُوَ ملحد منابذ لِلْإِسْلَامِ دواؤه السَّيْف إِن لم يتب

কুরআনে কারীমের একাধিক স্থানে আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরাম রাঃ এর প্রশংসা করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন { مُحَمَّد رَسُول الله وَالَّذين مَعَه} الْآيَة এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় ইরশাদে সাহাবাগণকে খাইরুন্নাস তথা সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ হবার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। আর এ লোকেরা সেই জমানার শ্রেষ্ঠ মানুষ যে জমানায় আমি নবী রয়েছি। শরীয়তে ইসলামিয়া সাহাবাগণের মাধ্যমেই বর্ণিত হয়ে আমাদের পর্যন্ত এসেছে। [অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম ইসলামী শরীয়তের বিস্তারকারী] সুতরাং যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে সমালোচনা করবে সে মুলহিদ এবং বে-দ্বীন। ইসলামের দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী। যদি সে ব্যক্তি তওবা না করে তাহলে তার একমাত্র সমাধান তলোয়ার। [উসূলে সারাখসী-২/১৩৪]

হযরত মুয়াবিয়া রা. এর মর্যাদাঃ

১. হাদিস শরীফে এসেছে,

أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا

হজরত উম্মে হারাম (রা.) বলেন, 'আমি রাসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের সর্বপ্রথম সামুদ্রিক অভিযানে অংশগ্রহণকারী বাহিনীর জন্য জান্নাত অবধারিত'। (সহিহ বুখারি, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ঈসমাইল (মৃ. ২৫৬হি.), দারুল ইবনে কাসির, দামেস্ক (১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি.) খ. ৪, পৃ. ৪২, হা. ২৯২৪)।

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় মুহাল্লাব (রহ.) বলেন,

قال المهلّب : في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحر

"হাদিসটিতে হজরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। কেননা হজরত মুয়াবিয়া (রা.)-ই ছিলেন ওই বাহিনীর সিপাহসালার'। এ অভিযান কে ইতিহাসের ভাষায় "সাইপ্রাস" অভিযান বলে। (ফাতহুল বারী, হাফেজ আহমদ ইবনে আলি ইবনে হাজার আসকালানী (মৃ. ৭৬৩হি.), দারু ইহইয়াউল তুরাছিল আরাবি, বৈরুত, (২য় সংস্করণ ১৩৪৮ হি.), খ.৬, পৃ. ১০২।

২.হাদিস শরীফে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمِيرَةَ، وَكَانَ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ " اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا وَاهْدِ بِهِ.

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবী উমাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী ছিলেন; নবী সাল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআবিয়া (রাঃ)-এর জন্য দু'আ করেনঃ "হে আল্লাহ! তুমি তাকে পথপ্রদর্শক ও হেদায়াতপ্রাপ্ত বানাও এবং তার মাধ্যমে মানুষকে সৎপথ দেখাও। (সুনান তিরমিজি, আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ইসা আত তিরমিজি (মৃ. ২৯৭ হি.) দারুল তুরাছিল, লেবানন (১ম সংস্করণ, ১৪৩৫ হি.) খ. ৫, পৃ. ১০৬, হা. ৪১৪৬) হাদিসের বর্ণনা কারী সকলেই সিকাহ। হাদিসটি হাসান (তাহযিবুল তাহযিব, হাফেজ ইবনে হাজার আস কালানী (মৃ. ৮৫২ হি.) দারুল কিতাবিল ইসলামিয়্যাহ, কায়রো (১ম সংস্করণ, ১৪১৪হি.) খ. ৬, পৃ. ২৪৩)

৩. হযরত ইরবায ইবনে সারিয়াহ (রা.) বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সা. থেকে শুনেছি তিনি মুয়াবিয়ার জন্য বলেন-

اللهم علّم معاوية الكتاب والحساب ، وقِهِ العذاب

"হে আল্লাহ আপনি মুয়াবিয়াকে কিতাব ও হিসাবের জ্ঞান প্রদান করুন এবং তাকে জাহান্নাম এর আযাব হতে হিফাজাত করুন।" নুর উদ্দিন হায়ছামি (মৃ. ৮০৭ হি.) মাজমাউল জাওয়েদ ওয়ামান বাউল ফাওয়ায়েদ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত (১ম সংস্করণ, ১৪২২ হি.) খ.৯, পৃ. ৩৫৬, হা.১৫৯১৮ হাদিসটির সনদ সহীহ।

৪. ইবনে আব্দুল বার র. বলেন, "হযরত উমর (রা.) এর উপস্থিতিতে একবার হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা শুরু হলে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, যে কুরায়েশী যুবক চরম ক্রোধের মুহূর্তেও হাসতে পারে, যার হাত থেকে স্বেচ্ছায় না দিলে কিছু ছিনিয়ে আনা সম্ভব নয় এবং যার শিরস্ত্রাণ পেতে হলে পায়ে লুটিয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই, (অর্থাৎ, সহনশীলতা, সাহসিকতা ও আত্মসম্মানবোধে যে যুবক অতুলনীয়) তোমরা তারই সমালোচনা করছ?"

(আল ইসতিআব ফি মারেফাতুল আসহাব, হাফেজ ইবনে আবদুল বার (মৃ. ৪৬৩ হি.), দারুল আলম, ওমান (প্রথম সংস্করণ, ১৪৬৩ হি.), খ.৩, পৃ. ৩৭৭)

৫. বড়পীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানী আল হাসানী র. বলেন,

وَاتَّفَق أَهْلِ السُّنَّةِ عَلِيَ وُجُوبَ الْكَفِ عمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَالْإِمْسَاك عَنْ مُسَاوِيهِمْ وَإِظْهَار فضاءلهم ومحاسنهم وَتَسْلِيم أَمَرَهُم إِلَيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَ مَا كَانَ وَجَرْيِ مِنْ اخْتِلَافِ عَلِيَ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرُ وعاءشة وَمُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

"আহলে সুন্নাতের সকলে এ ব্যাপারে একমত যে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে পরষ্পরের যুদ্ধের ব্যাপারে তর্ক করা এবং তাঁদেরকে মন্দ বলা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। তাঁদের মর্যাদা সমূহ ও গুণাবলী প্রকাশ করতে হবে এবং তাঁদের ব্যাপারটা মহান আল্লাহর নিকট সোপর্দ করতে হবে। বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে যেসব যুদ্ধ বা মতানৈক্য ঘটেছিলো। যা হয়েছে হযরত আলী রা. হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) এর মধ্যে, যেমন উষ্ঠের যুদ্ধ ও সিফফিনের যুদ্ধে। এ ব্যাপারে আমাদের জবানকে সংযত রাখতে হবে। কাউকে কোনরূপ দোষারোপ বা সমালোচনা করা যাবেনা।

(গুনয়াতুত ত্বালিবীন, আব্দুল কাদের জিলানী বাগদাদি (মৃ. ৫৬১ হি.), দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ, বৈরুত, (১ম সংস্করণ, ১৪১৭হি.) খ.১, পৃ. ১০০)

৬. আল্লামা হাফেজ ইবনে কাসীর বর্ণনা করেছেন, সিফফীন যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে আপন অনুগামীদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, হে লোক-সকল ! মুয়াবিয়ার শাসনকে তোমরা অপছন্দ করো না। কেননা তাঁকে যেদিন হারাবে সেদিন দেখবে, ধড় থেকে মুন্ডগুলো হানযাল ফলের মত কেটে কেটে পড়ে যাচ্ছে।

(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইবনে কাসির (মৃ. ৭৭৪ হি.), সৌদি আরব, খ. ৮, পৃ. ১৩১)

৭. কাজী আয়াজ র. বলেন,

قال مالك رحمه من شتم أحداً من أصحاب النبي أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو معاوية أو عمرو بن العاص فإن قال : كانوا على ضلال وكفر و قتل

হযরত মালিক এর মতে যদি কেহ সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে, যেমন হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলি, হযরত মুয়াবিয়া ও হযরত ওমর বিন আস প্রমুখদের গালি দেয়, সে গোমরাহ ও কুফরের মধ্যে। তাকে কতল কর।

(আশ শিফা বি তা'রীফি হুকূকিল মুস্তফা, আল্লামা কাযী ইয়ায (মৃ. ৫৪৪ হি.), দারু ইবনে হাজম, বৈরুত (১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি.), খ. ২, পৃ. ৪৯৩, হা. ১৮২৬)

৮. মুজাদ্দিদে আলফে সানি শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহেন্দী র. বলেন, সাহাবায়ে কেরাম কতেক ইজতেহাদি বিষয়ে স্বয়ং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভিমতেরও বিপরীত অভিমত দিতেন। তাদের এই বৈপরীত্য দূষণীয় ছিলো না, নিন্দনীয়ও ছিলো না। তাঁদের বিরুদ্ধে এ কারণে কোন ওহি নাজিল হয় নি।

সুতারাং তারা ইজতিহাদ করতে গিয়ে হজরত আলী রা. বিরোধিতা করে পেললে তা কিভাবে কুফরি হতে পারে? তা না হলে এ বিরোধিতাকারীদের প্রতি ভর্ৎসনা ও নিন্দা করাও কিভাবে বৈধ হতে পারে? বস্তুত হযরত আলী রা. বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অনেক মুসলমান ও বিশিষ্ট সাহাবীও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত। সুতরাং তাঁদেরকে কাফির বলা কিংবা তাঁদের বিরুদ্ধে অশালীন সমালোচনা করা কোন ছোটখাটো অপরাধ হবে না। মুজাদ্দিদে আলফে সানি আরো বলেন, ইমাম বুখারি যেমন হযরত আলী রা. থেকে রেওয়য়াত করছেন, তেমনি আমিরে মুয়াবিয়া রা. থেকেও রেওয়য়াত নিয়েছেন। যদি ইমাম বুখারীর মতে হযরত আমিরে মুয়াবিয়ার কোনরূপ দূষণীয় দিক থাকতো তাহলে তিনি তাঁর নিকট থেকে বর্ণিত কোন রেওয়ায়ত কখনো গ্রহণ করতেন না এবং তা তাঁর "সহীহ" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করতেন না। (মকতুবাত শরীফ, মুজাদ্দিদে আলফে সানি সেরহেন্দী আল ফারুকী (মৃ. ১০৩৪ হি.), খ.২, পৃ. ৭২)

এছাড়াও হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী র. বিষয়ে তাঁর লিখিত "রিসালাতু রাদ্দির রাওয়াফেয" এই কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

৯. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী র. এর অভিমত :

باید دانست که حضرت معاویه ابن ابی سفیان یکی از اصحاب آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم بود، صاحب فضیلت جلیله و در زمرة صحابه کرام قرار دارد. زینهار تا در حق او سوء ظن نکنی و در ورطة سبّ او نیفتی و مرتکب حرام نشوی

"জানা প্রয়োজন হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লামার জলিলুল ক্বদর সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত এবং ফযীলত এর হক্বদার। তোমরা কখনো উনার ব্যাপারে মন্দ ধারণাও

করবেনা এবং তাঁকে মন্দ বলে নিজে মুসিবতে পতিত হয়োনা। অন্যথায় তোমরা হারামের অনুসারী হয়ে যাবে।"

(ইজালাতুল খাফা আনিল খিলাফাতিল খুলাফাহ, শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (মৃ. ১১৬৭ হি.) দারুল কলম, দামেস্ক (১ম সংস্করণ ১৪৩৪ হি.) খ. ১, পৃ.

১০. হযরত খাজা নিজাম উদ্দীন আওলিয়া (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, "একদিন রাসুলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণের সাথে বসা ছিলেন, এমন সময়ে মুয়াবিয়া (রা.) তার পুত্র এজিদকে কাঁধে নিয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলো। তাঁকে দেখে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হেসে বললেন, 'দেখ, দেখ, জান্নাতির কাঁধে জাহান্নামী যাচ্ছে! একথা শোনার পর সভাসদস্যদের মধ্যে উপস্থিত মাওলা আলী (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, কী করে এজিদ জাহান্নামি হবে? উত্তরে এরশাদ হলো, এই বদবখত আমার ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইন (রা.) এবং তাঁদের বংশদেরও শহীদ করবে।"হযরত মাওলা আলী (রা.) এই কথা শোনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তলোয়ার উন্মুক্ত করে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) আপনি নির্দেশ দিন আমি ওকে শেষ করে দেই। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন না তা হয় না। এটা আল্লাহরই বিধান এবং বলেন, কারো ভাগ্যের উপর হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।" (হযরত খাজা নিজাম উদ্দীন আওলিয়া (মৃ. ১৩২৫ খ্রি.) রাহাতিল কুলুব, রশিদ বুক হাউজ, ঢাকা (১ম প্রকাশ, ২০০৪ ইং) পৃঃ ১৩৭-১৩৮)

হযরত আলী (রা.) ও হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর ইজতিহাদী ভুল এবং সে ব্যাপারে ইমামগণের ইজমাঃ

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর বিদ্রোহটা কোন ব্যক্তিগত কারণে ছিল না। বরং দ্বীনী কারণে ছিল। অন্য শব্দে বললে এটি ছিল ইজতিহাদী বিষয়। আর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর ইজতিহাদ ভুল ছিল। মুয়াবিয়া (রা.) এর ইজতিহাদ ভুল হবার পরও তিনি একটি সওয়াবের অধিকারী হবেন। এ কারণেই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের উলামাগণ এ বিষয়ে পরিস্কার ভাষায় নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেছেনঃ

১.

ان اهل السنة اجمعوا على ان من خرج على على كرم الله وجهه خارج على الامام الحق الا ان هذا البغى الاجتهادى معفو عنه

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের এ বিষয়ে ইজমা ও একমত যে, হযরত আলী রা. এর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণকারীগণ ইজতিহাদের ভিত্তিতে এমনটি করেছেন। তাই তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত। (আন নাহিয়াহ আন তা'নি মুয়াবিয়া-৩৮)

২. ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন,

والظنّ بالصحابة في تلك الحروب أنهم كانوا فيها متأوّلين، وللمجتهد المخطئ أجر، وإذا ثبت هذا في حق آحاد الناس، فثبوته للصحابة بالطريق الأولى

অর্থাৎ, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এর পারস্পরিক যুদ্ধ বিষয়ে আমাদের ধারণা এই যে, তারা উপরোক্ত যুদ্ধ বিষয়ে মুজতাহিদ ছিলেন। আর ভুল ইজতিহাদকারী একটি সওয়াব পায়। যখন সাধারণ মুজতাহিদ ভুল করলে একটি সওয়াবের অধিকারী হন, সুতরাং এটি সাহাবায়ে কেরামের ক্ষেত্রে তা আরো অগ্রগণ্যতার সাথে সাব্যস্ত হবে। (আল ইসাবাহ ফী তাময়িজিস সাহাবাহ, ইমাম ইবনে হাজর আস কালানী (মৃ. ৭৬৩ হি.) দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, খ.৭, পৃ. ২৬০)

৩. হাফেজ ইবনে কাসীর (র.) বলেন,

وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَسْمِيَةِ أَصْحَابِ مُعَاوِيَةَ بُغَاةً تَكْفِيرُهُمْ كَمَا يُحَاوِلُهُ جَهَلَةُ الْفِرْقَةِ الضَّالَّةِ مِنَ الشِّيعَةِ وَغَيْرِهِمْ لِأَنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا بُغَاةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا مُجْتَهِدِينَ فِيمَا تَعَاطَوْهُ مِنَ الْقِتَالِ وَلَيْسَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبًا بَلِ الْمُصِيبُ لَهُ أَجْرَانِ وَالْمُخْطِئُ لَهُ أَجْرٌ،

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর জামাআত বিষয়ে বাগী তথা বিদ্রোহী মন্তব্য করার দ্বারা তাদেরকে কাফের বলা প্রমাণ করে না। যেমনটি অজ্ঞ দল পথভ্রষ্ট শিয়া ও অন্যান্যরা বলে থাকে। যদিও তারা মৌলিকভাবে বিদ্রোহী হন না কেন, কিন্তু তারা এ যুদ্ধ বিষয়ে মুজতাহিদ ছিলেন। আর সব মুজতাহিদই সর্বদা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। বরং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারলে দু'টি সওয়াব পান, আর ভুল করলে একটি সওয়াব পান। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ২৬৫)

৪. ইবনে আছির র. বলেন,

فإن ما جرى بينهم كان مبنيًا على الاجتهاد، وكل مجتهد مصيب، والمصيب واحد مثاب، والمخطئ معذور، لا تردُّ شهادته "

তাদের মাঝে যা কিছু সংঘটিত হয়েছে তা ছিল ইজতিহাদ নির্ভর। আর প্রতিটি মুজতাহিদই সওয়াব পায়। যিনি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারেন, তিনি সওয়াব পান, আর যিনি ভুল করেন, তারাও এতে মাজূর। তাদের সাক্ষ্য অগ্রহণীয় নয়।

(জামেউল উসূল ফী আহাদিসির রাসূল, ইবনুল আছীর জাযারী (মৃ. ৫৪৪হি.) মাকতাবাতুল দারুল লেবানন, (১ম সংস্করণ, ১৩৯০হি.) খ.১, ১৩৩)

৫. ইমাম মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন,

ثم كان معاوية مخطيا الا انه فعل ما فعل عن تأويل فلم يصر به فاسقا

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ভুলের উপর ছিলেন। কিন্তু তার কাজটি ছিল ইজতিহাদের ভিত্তিতে। তাই তাকে ফাসিক বলা যাবে না।

(শরহে ফিকহুল আকবার, মোল্লা আলী কারী (মৃ. ১০১৪ হি.) মাকতাবাতুল হাকিমুল উম্মাহ, ঢাকা, পৃ. ১০৮)

মদ প্রাণের অভিযোগঃ

১.হাদিস শরীফে এসেছে,

عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى مُعَاوِيَةَ فَأَجْلَسَنَا عَلَى الْفُرُشِ ثُمَّ أُتِينَا بِالطَّعَامِ فَأَكَلْنَا ثُمَّ أُتِينَا بِالشَّرَابِ فَشَرِبَ مُعَاوِيَةُ ثُمَّ نَاوَلَ أَبِي ثُمَّ قَالَ مَا شَرِبْتُهُ مُنْذُ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُعَاوِيَةُ كُنْتُ أَجْمَلَ شَبَابِ قُرَيْشٍ وَأَجْوَدَهُ ثَغْرًا وَمَا شَيْءٌ كُنْتُ أَجِدُ لَهُ لَذَّةً كَمَا كُنْتُ أَجِدُهُ وَأَنَا شَابٌّ غَيْرُ اللَّبَنِ أَوْ إِنْسَانٍ حَسَنِ الْحَدِيثِ يُحَدِّثُنِي

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদা বর্ণনা করেছেন "আমি ও আমার আব্বা মুয়াবিয়ার কাছে গেলাম, মুয়াবিয়া আমাদের ফারসের উপর বসতে দিল এবং আমাদের জন্য খাদ্য পরিবেশন করল ও আমরা খেলাম, তারপর মুয়াবিয়া শারাব নিয়ে এল, মুয়াবিয়া পান করল ও আমার আব্বাকে দিল, আমার আব্বা বললেন, যখন থেকে রাসূল সা: এটিকে হারাম হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন, তখন থেকে আমি এটি পান করিনি। অতঃপর আমীরে মুয়াবিয়া বলেন..... আমি যে জিনিসে স্বাদ পেয়েছি, আমি যখন কিশোর ছিলাম সেই সময় শুধু লসসিতে পেতাম। আজ যেমন স্বাদ পেয়েছি তেমন পুর্বেও স্বাদ পেয়েছিলাম। (মুসনাদে আহমদ খ.৫, পৃ. ৩৪৭, হা.২২৪৩২)

হাদীসটির সনদ দ্বয়ীফ। কারণ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহঃ মুসনাদ আহমদে উল্লেখ করে স্বয়ং হাদীসকে মুনকার হিসেবে রায় দিয়ে

লিখেন -

عبد الله بن بريدة الذي روى عنه حسين بن واقد ما أنكرها

আব্দুল্লাহ বিন বুরাঈদার হাদীস, যেটি হুসাঈন বিন ওয়াকেদ বর্ণনা করেছেন সেটি "মুনাকার" হিসেবে সাব্যস্ত। (ইল্লাতুল মায়ারেফাত আর রিজাল, ইমাম

আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল (মৃ. ২৪১হি.), দারুল খায়ানি, রিয়াদ (২য় সংস্করণ, ১৪২২ হি.) খ.২, পৃ. ২২)

২. মুসনাদে আহমদের ব্যাখ্যাকার আব্দুল্লাহ শুআইব আরনাউত রাঃ হজরত আব্দুল্লাহ বুরাঈদা রাঃ এর হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন -

وقوله : " ثم قال : ما شربتُه منذ حرّمه رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم " أي : معاوية بن أبي سفيان، ولعله قال ذلك لما رأى من الكراهة والإنكار في وجه بريدة، لظنّه أنه شرابٌ مُحرّم، والله أعلم

মুয়াবিয়া রা.এর এই বক্তব্য অর্থাৎ" আমি এখনও পর্যন্ত এটি পান করিনি যখন হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদকে হারাম ঘোষণা দিয়েছেন। বস্তুত, এই কথাটি আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) তখন বলেছিলেন, যখন তিনি হজরতে বুরাঈদা (রা.) এর চেহারায় একপ্রকারের মালিন্যতা দেখতে পান। অর্থাৎ, হজরত বুরাঈদা (রা.) ভাবনায় ছিলেন যে, মুয়াবীয়া (রা.) কি আমাকে হারাম" মাশরুব" দিলেন..!

(মুসনাদে আহমদ, তাহকীক শুয়াইব আরনাউত, খ.৩৮, পৃ. ২৬)

কিন্তু উর্দুতে যেটাকে "শরাব" বলা হয় সেটাকে আরবীতে " خمر " বলা হয়।"শরাব" এর তরজুমা " ما شَربتُه " করাই সঠিক অর্থ এক প্রকারের পানীয় জল।

৩. হাদিস শরীফে এসেছে,

عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبُوا
الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا
شَرِبُوهَا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রা. বর্ণনা করে বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কেহ যদি মদ পান করে, তাদের এক শত চাবুক মারো। এবং পুনরায় পান করলে পুনরায় তাদের চাবুক মারো এরপরও যদি এমনকি চতুর্থবার পান করে তাদের কতল করে দাও। (মুসনাদে আহমাদ, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল(মৃ. ২৪১হি.) দারুল হাদিস, কায়রো (১ম সংস্করণ, ১৪১৬হি.) খ.১৩, পৃ. ১৮৩, হা. ১৬৮০২)

উক্ত হাদীসে মদপানের বিরোধী মূলক বক্তব্য প্রমাণ করে রাফেজিরা বিভিন্নভাবে আমীরে মুয়াবিয়ার উপর অপবাদ দিতে চায় যা তাদের একটা কুকৌশল মাত্র।

সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ বেরলভি (রঃ)-এর সিলসিলার অবদানঃ

১. **ফুরফুরার মুজাদ্দিদে জামান র. এর মেজ সাহেব জাদা মুফতীয়ে আজম আবু জাফর সিদ্দিকী আল কুরাইশী র.** (মৃ. ২০০২ ইং) ওহাবিদের ভ্রান্ত আকিদা সমূহ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

"ওহাবীরা হযরত নবী সা. ব্যতীত সাহাবায়ে, তাবেঈন, ইমাম ও পীরাণে পীরগণ কাহাকেও সত্যের মানদন্ড বলিয়া স্বীকার করে না, এইহেতু তাঁহাদের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করে।" (তাহ্কীকুল মাসায়েল, ২য় সংস্করণ ২০০৫ ইং, পৃ. ১০)

২. **ফুরফুরার বিশিষ্ট খলিফা হাফিজুল হাদিস আল্লামা রুহুল আমিন বশিরহাটী র. (মৃ. ১৯৪৫ ইং)** সাহাবায়ে কেরাম বিদ্বেষীদের দাঁতভাঙা জবাবে বেশ কয়েকটি বই রচনা করেন। যেমন,

* রদ্দে শিয়া (১ম ভাগ). বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৬। ৪/১ হায়াৎ খাঁ লেন মাজেদিয়া প্রেস হতে মুনশী মুহাম্মাদ আব্দুর রহিম কর্তৃক ১৯৩৭ ইং ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে শিয়াদের মতবাদের খন্ডন ও তিন খলিফার গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষত প্রথম ৪/৫ জন সাহাবী ব্যতীত বাকি অসংখ্য সাহাবায়ে কেরামকে কাফির ও বেদ্বীন বানানোর যে ব্যর্থ চেষ্টা করেছে শিয়ারা তাদের উপযুক্ত জবাব দেয়া হয়েছে উক্ত গ্রন্থে।

* কালেমাতোল কোফর। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৩। চব্বিশ পরগণা, বশিরহাট নিবাসী পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্তৃক নবনূর প্রেস থেকে ১৪১৬ ব. চতুর্থবার মুদ্রিত হয়। উক্ত গ্রন্থে শিয়াদের কুফরী আকিদাসমূহ কুরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে জবাব দেয়া হয়েছে।

* ফেরকাতুন নাজিন বা সত্য ফেরকা নির্বাচন। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০২। মোহাম্মদ শরফুল জামিন কর্তৃক বসিরহাট নবনূর প্রেস থেকে ১৯২৫ ইং ৫ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থে প্রথমে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীতে মুতাজিলা, খারেজী, শিয়া, রাফেজী, মুশাব্বিহা, মুজাচ্ছিমা ও বিশেষত মাযহাব বিদ্বেষীদের আকিদা বর্ণনা করেছেন। সাহাবাগণের ভিন্ন ভিন্ন কাজ, মতের কারণ ও প্রমাণসমূহ আলোচনা করেছেন।

এছাড়াও উনি মজমুয়া ফাতাওয়ায় আমিনিয়া (১-৮ভাগ), জরুরী মাসায়েল (১-৩ ভাগ) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে অসংখ্য প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

৩. **ছারছীনা শরীফের পীর শাহ্ ছুফি নেছার উদ্দিন আহমদ র. (মৃ. ১৯৫২ইং)** কাছে ফতোয়া জানা হয়েছে সাহাবায়ে কেরামের কথা আমল করা ওয়াজিব কিনা? তিনি ফতোয়ায়ে শামির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

"সাহাবায়ে কেরামের আদেশ বা নিষেধ যদি সহীহ হাদিসের খেলাফ না হয়, তবে তা আমাদের মান্য করা ওয়াজিব এবং তা শরীয়তের প্রামাণ্য দলিল।

(ফতোয়ায়ে ছিদ্দীকিয়া, ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাহ লাইব্রেরী, পিরোজপুর, (সংশোধিত সংস্করণ ২০১৪ইং) পৃ. ২৭)

এছাড়াও বর্তমান পীর সাহেব শাহ্ মোহাম্মদ মোহিবুল্লাহ (মা.জি.আ.) কর্তৃক রচিত "খুতবায়ে ছালেহিয়াহ" গ্রন্থে সাহাবায়ে কেরাম সকলেই ন্যায়পরায়ণ ও সত্যের মাপকাঠি এই সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

৪. ফুরফুরার মুজাদ্দিদে জামান (রঃ)- এর বিশিষ্ট খলিফা শাহ্ ছুফি ছদর উদ্দিন আহমদ র. (মৃ. ১৯৪৪ ইং) বলেন,

"আমাদের নবী ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে সকল মুসলমান জীবিত অবস্থায় দেখেছেন তাদেরকে সাহাবী বলা হয়। তাঁদের অনেক বড় মর্যাদা রয়েছে।

তাদের সকলের নাম ভালোর সাথে উচ্চারণ করবে। কোন সাহাবী কে গালি দিলে কাফের হবে। সকল সাহাবির প্রতি ভালোবাসা ও সুধারণা রাখা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। তাঁদের মধ্যে কোন যুদ্ধ বা লড়াই শ্রুতিগোচর হলে ইজতেহাদী খাতা বিবেচনা করবে এবং তাদের প্রতি কোন খারাপ ধারণা পোষণ করবে না ও তাঁদের কোন দোষ-ত্রুটি আলোচনা করবে না। এতে ঈমান যাওয়ার ভয় আছে।"

(এলমে তাছাওয়োফ, কাদেরিয়া তরিকা, পৃ. ৮৫-৮৬; এলমে তাছাওয়োফ, নকশাবন্দিয়া-মোজাদ্দাদিয়া তরিকা, পৃ. ৯২)

৫. মাগুরা দরবার শরীফের পীর শাহ্ ছুফি মাওলানা খন্দকার রশিদ আহমদ র. সাহাবায়ে কেরামের ইলম সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

"সাহাবীরা প্রত্যেকে ছিলেন দো-জাহানের বাদশাহ, মাহবুবে খোদা, সাইয়্যিদুল মুরসালীন সা. এর সহবত ও সুহবতের ফয়েজ দ্বারা গড়া এক একটি নক্ষত্র। ঈমানের সহিত একবার মাত্র ক্ষনিক দর্শন বা সান্নিধ্য একজন সাহাবীকে রাসুল সা. এর খাস ফয়েজ এমন করিয়াছে যে, কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতের কেহ উক্ত সাহাবীর কদম পাকের এক বিন্দু ধুলি কণারও সমান মর্যাদার হইতে পারিবে না।" (রাহে জান্নাত, খানকায়ে হামীদিয়া, মাগুরা, ১ম প্রকাশ ২০১১ ইং, পৃ. ৬৫)

৬. ছারছীনা দরবার শরীফের বিশিষ্ট খলিফা শাহ্ ছুফি মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী কায়েদ সাহেব র. (মৃ. ২০০৮ইং) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকায়েদ ও পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

"আমাদের পয়গম্বরকে সা. যে সমস্ত মুসলমান দেখেছেন তাদেরকে সাহাবা বলে। তাঁদের বহু বুজুর্গীর কথা কিতাবে বর্ণিত আছে। তাদের প্রত্যেকের উপর মহব্বত ও ভাল ধারণা রাখা অতি জরুরি। কোন অলী সামান্য দরজার সাহাবারও সমকক্ষ হতে পারে না। (আহলে সুন্নাত অল -জামায়াতের পরিচয় ও আকায়েদ, নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, ঝালকাঠি, ৫ম সংস্করণ ২০০৮, পৃ. ২৯)

এছাড়াও নুর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র.), কারামত আলী জৌনপুরী (র.), নুর মুহাম্মদ ঝানঝানবী র. সহ অসংখ্য ওলি, তাঁদের খলিফাগণ লিখনি ও বয়ানে সাহাবায়ে কেরামের শান মান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আমাদের অন্তঃকরণকে নিষ্কলুষ রাখতে হবে। তাঁদের প্রতি হৃদয়ে কোন হিংসা-বিদ্বেষ বা ঘৃণা থাকবে না; থাকবে না কোন প্রকার শত্রুতা। বরং হৃদয়ের মণিকোঠায় থাকবে শুধু ভালবাসা, অনুগ্রহ আর সহানুভূতি।

ইসলামে মুজাদ্দিদের গুরুত্ব: একটি পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মাদ মোফাজ্জেল হোসেন*

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

'আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি'। [১৮৭]

মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এ ধরাধামে প্রেরণ করেছেন তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্যে। তাঁর সেই উবুদিয়াতকে যে মনে প্রাণে মেনে নিবে ও সে অনুযায়ী আমল করবে সে হবে ইনসানে কামেল এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দা। আর সে ইবাদত হতে হবে শিরক, কুফর, বিদআতমুক্ত, নিরেট-নির্ভেজাল একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের সন্তুষ্টি কামনায়। কিন্তু সেই খাঁটি ইবাদতের উপর চলতে বাঁধা সৃষ্টি করে মানুষের প্রকাশ্য চির শত্রু ইবলিস ও তার অনুসারী অবাধ্য জ্বিন। তারা সর্বদা সচেষ্ট কিভাবে একজন মুমিন আবেদকে প্রতিপালকের ইবাদত থেকে বিরত রাখা যায়, কিভাবে তার ইবাদতে শিরক-বিদআত মিশ্রিত করে আমল বরবাদ করা যায়, কিভাবে তাকে পথভ্রষ্ট-গোমরাহ করা যায়। যখন মানুষ শয়তানের ধোঁকায় প্ররোচিত হয়ে কুফর, শিরক-বিদআত, অন্যায় অনাচার, খুন-খারাপী, জুলুম-নির্যাতনের চরম পর্যায়ে পৌছে গিয়েছে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তর থেকে সেই শিরক, কুফর, বিদআতের মূলোৎপাটন করে সঠিক পথের দিশা দিতে, তাদেরকে তাওহীদরে উপর অটল-অবিচল রেখে নেক আমলের উপর স্থির করতে যুগে যুগে অসংখ্যা-অগণিত নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর পরে আর কোন নবী-রাসূলের আগমন ঘটেনি, ভবিষ্যতেও আর কোনো নবী-রাসূলের আবির্ভাব হবে না। কিন্তু তাঁর নবুয়তের সে মিশন কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বীনের হিফাজতকারী। এ দ্বীনকে হিফাজত করতে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ইনতিকালের পর আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে কিছু হক্কানী আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখ প্রেরণ করেছেন, যারা সমাজ থেকে সকল প্রকার কুফর, শিরক, বিদআত, ভণ্ডামী, অন্যায়-অপরাধ, অনাচার-পাপাচার, জুলুম-নির্যাতনের অবসান ঘটিয়ে সুন্দর দ্বীনী পরিবেশ তৈরী

---

[১৮৭]. সূরা জারিয়াত: ৫৬।

করেছেন। তাদেরকে পরিভাষায় 'মুজাদ্দিদ' (সমাজ সংস্কারক) বলা হয়। তারা নিজেরা যেমন হকের উপর প্রতিষ্ঠিত, তেমনি তারা অন্যদেরকেউ হকের প্রতি আহ্বান করে তাদেরকে একেকজন প্রকৃত মানুষ, আল্লাহওয়ালা হিসেবে গড়ে তুলেছেন।

আলোচ্য নিবন্ধে আমরা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মুজাদ্দিদের পরিচয়, মুজাদ্দিদের আবির্ভাবের সঠিক ব্যাখ্যা, মুজাদ্দিদের প্রকার, গুণাবলী, কার্যাবলি, যুগে যুগে মুজাদ্দিদগণের তালিকা ইত্যাদি বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা পেশ করব। ইনশা আল্লাহ!

মুজাদ্দিদ পরিচিতি:

'মুজাদ্দিদ' (المجدد) শব্দের শাব্দিক অর্থ:

'মুজাদ্দিদ' (المجدد) শব্দটি বাবে তাফয়ীল (باب التفعيل) থেকে ইসমে মাফউল (اسم المفعول) এর শব্দরূপ। শাব্দিক অর্থ: নতুনভাবে সম্পাদনকারী, নবায়নকারী, সংস্কারকারী, সংস্কারক, সংশোধনকারী, পরিশুদ্ধকারী। [১৮৮]

ইংরেজীতে, Renewer, Innovator, Originator, Modernizer, Reformer.[১৮৯]

পারিভাষিক পরিচয়:

প্রত্যেক শতাব্দীর শুরুতে প্রেরিত একজন সংস্কারক যিনি উম্মতের ক্রান্তিলগ্নে তাদেরকে সকল প্রকার শিরক-বিদআত থেকে মুক্ত করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা, আমল, আদর্শের উপর পরিচালিত করেন তাকে মুজাদ্দিদ বলে।

১. মুফতী সায়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান রহ. বলেন,

مَن يُحْيِى مَا انْدَرَسَ مِنَ الْعَمَلِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

মুজাদ্দিদ হলো- 'যিনি কুরআন-সুন্নাহর বিলুপ্ত আমলগুলো পুনরুজ্জীবিত করেন।'[১৯০]

---

১৮৮. ড. রুহী আল বালবাকী, **আল মাওরিদ**, (বৈরুত: দারুল ইলম লিলমালায়ীন, ১৯৯৫খ্রি.), ৭ম সং, পৃ. ৫২০; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, **আল মু'জামুল ওয়াফী**, (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, তা.বি), পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সং, পৃ. ৮৯১।

১৮৯. **আল মাওরিদ**, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭৭।

১৯০. মুফতী সায়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান আল মুজাদ্দেদী আল বারাকাতী (মৃত্যু: ১৩৯৫হি./১৯৭৪ খ্রী.), **কাওয়ায়েদুল ফিকহ**, (ভারত: ইউ.পি, দেওবন্দ, আশরাফী বুক ডিপো, তা.বি), পৃ. ৪৬৬।

২. আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. বলেন,

قال العلقمي: معنى التجديد إحياء ما اندرس من الكتاب والسنة، والأمر بمقتضاهما.

আলকামী রহ. বলেন, (তাজদীদ) সংস্কার হলো-কুরআন-সুন্নাহর হারানো আমলগুলো পুনরুজ্জীবিত করা এবং সে অনুযায়ী (মানুষদেরকে) নির্দেশ প্রদান করা।[১৯১]

৩. 'উইকিপিডিয়া'তে উল্লেখ রয়েছে,

المجدد هو عالم دين يبعثه الله على رأس كل مائة سنة ليجدد للناس دينهم عن طريق القيام بأعمال جليلة ونشر العلم الديني بين الناس بالإضافة إلى إحياء سنن الرسول والرد والمحاربة للبدع المنتشرة بين الناس في زمانه.

মুজাদ্দিদ বলা হয়- প্রত্যেক শতাব্দীর শুরুতে প্রেরিত এমন একজন সংস্কারক আলেম যিনি আমল ও ধর্মীয় ইলম বিস্তারের মাধ্যমে সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং তাঁর যামানায় প্রকাশিত সকল বিদআতের অবসান ঘটান।[১৯২]

৪. মুজাদ্দিদে আলফে ছানী রহ. বলেন, 'মুজাদ্দিদ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার মাধ্যমে সেই যুগের কুতুব, আওতাদ, আবদাল, নুকাবা, নুজাবা নির্বেশেষে সকল উম্মত ফয়েয ও নূর হাসিল করে থাকেন।[১৯৩]

৫. তাজদীদ (সংস্কার): আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. উল্লেখ করেন,

ليس المراد منه بحال من الأحوال: تجديد التبديل من الأصل إلى أصل آخر، وإنما هو عادة الدين إلى (جدته الأولى)، بإزالة ما قد يكون دس عليه من أعدائه، أو انحرف الناس به في الممارسة والتطبيق عن الأصل، فهو كغسل الثوب لتنقيته من أدرانه، وإعادة نصاعه إليه.

আর (তাজদীদ) সংস্কার দ্বারা সমাজকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন করা উদ্দেশ্য নয়, বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- ইসলামের শত্রু কর্তৃক দ্বীনের মধ্যে অনুপ্রবেশকৃত, মানুষের অনুশীলন ও বাস্তবায়নকৃত শিরক-বিদআত,

---

[১৯১]. লাক্ষ্ণৌভী, ইমাম আবুল হাসানাত মুহাম্মাদ আব্দুল হাই হিন্দী (মৃত : ১৩০৪হি.), **আররফউ ওয়াততাকমীল ফিল জারহি ওয়াততাদীল**, তা. আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (মৃত : ১৪১৭হি.), (বৈরুত : মাকতাবাতুল মাতবুআতুল ইসলামিয়্যাহ, ১৪২৫হি./২০০৪খ্রি.), ৮ম সং, পৃ. ৪৪।

[১৯২]. https://ar.wikipedia.org/wiki

[১৯৩]. মকতুবাতে মুজাদ্দিদে আলফে ছানী রহ., খ.২, মকতুব নং-৪ ; মুজাদ্দেদে আলফেছানী রহ.-এর কামইয়াবী ও কর্মপদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

কুসংস্কার, বদ রুসুম ইত্যাদি বিদূরিত করার মাধ্যমে ধর্মকে মৌলিক অবস্থার উপর স্থির রাখা। যেমন কাপড় পরিস্কার করে তাঁর থেকে ময়লা বিদূরিত করে মূল অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া হয়।[১৯৪]

৬. ইমাম আবু যুহরা রহ. বলেন,

إنما التجديد هو أن يعاد إلى الدين رونقه، ويزال عنه ما علق بيه من أوهام، ويبين للناس صافيا كجهوره نقيا كأصله، وإنه لمن التجديد أن تحيا السنة وتموت البدعة ويقوم بين الناس عمود الدين.

(তাজদীদ) সংস্কার হলো দ্বীনের সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনা, দ্বীনের সাথে যে সকল সংশয় ও ভুল ধারণা মিশ্রিত হয়েছে তা বিলুপ্ত করা এবং দ্বীনকে মানুষের নিকট স্বচ্ছ মনিমুক্তার ন্যায় স্পষ্ট করা। সংস্কার হলো সুন্নাত পুনরুজ্জীবিত করা, বিদআতকে অপসারণ করা এবং মানুষের মাঝে দ্বীনের ভিত্তি স্থাপন করা।[১৯৫]

মুজাদ্দিদ প্রেরণের প্রমাণ

হাদীস নং-১:

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন,

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ.

"প্রত্যেক উত্তর প্রজন্মের আস্থাভাজন শ্রেণি এই ইলমকে গ্রহণ করবে, তাঁরা একে মুক্ত রাখবে সীমালঙ্ঘনকারী (বিদআতীদের) বিকৃতি, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে।"[১৯৬]

হাদীসের সনদ পর্যালোচনা:

ইমাম কাস্তাল্লানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১৯৭]

---

[১৯৪]. আররফউ ওয়াততাকমীল ফিল জারহি ওয়াততাদীল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

[১৯৫]. মুহাম্মাদ আবু যুহরাহ, মুকাদ্দিমাতু মাকালাতুল কাওসারী, (দারুস সালাম, ১৪৩০হি./২০০৯খ্রি.), ৩য় প্রকাশ, পৃ. ১১।

[১৯৬]. ইমাম আবু জাফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ তাহাবী রহ. (মৃতঃ ৩২১হি.), **শরহু মুশকিলিল আছার**, তা. শুয়াঈব আরনাউত, (মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৫হি./১৯৯৪ খি.), প্রথম প্রকাশ, খ.১০, পৃ. ১৭, হা. নং-৩৮৮৪; আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী খতীব বাগদাদী (মৃতঃ ৪৬৩), **শারাফু আসহাবিল হাদীস**, তা. ড. মুহাম্মাদ সাঈদ, (আনকারাহঃ দারু ইহইয়ায়িস সুন্নাতিন নবাবিয়্যাহ, তা.বি), পৃ. ১১; সালাউদ্দীন আলায়ী (মৃতঃ ৭৬১), **বুগইয়াতুল মুলতামিস**, (বৈরুতঃ আলামুল কুতুব, ১৪০৫হি./১৯৮৫খ্রি.), প্রথম প্রকাশ, পৃ. ৩৪।

হাদীসের ব্যাখ্যা :

যুগ পরম্পরায় যারা আসবে তাদের মধ্যে ন্যায় পরায়ণ, নেককার-দ্বীনদার, মুত্তাকী, সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ এই দ্বীনের ইলম সংরক্ষণ করবে এবং বাস্তবায়ন করবে। ফলে তারা কাদরীয়্যাহ, জাবারিয়্যাহ, মুশাব্বিহা ও অন্যান্য বাতিল-বিদআতী আকিদা পোষণকারীদের অপব্যাখ্যা ও বাতিল আকিদাকে বিদূরিত করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা প্রতিষ্ঠা করবে ; রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীস, কর্ম ও সুন্নাতকে বাতীলপন্থীদের বানোয়াট, মিথ্যা-জাল হাদীস থেকে সংরক্ষণ করবে, মানুষের নিকট সত্যকে স্পষ্ট করবে ; এবং অজ্ঞ-মূর্খদের কুরআন ও হাদীসের অপব্যাখ্যা থেকে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করবে, সে সকল ব্যাখ্যার অসারতা প্রমাণ করবে এবং সে সকল ব্যাখ্যা গ্রহণ করা থেকে তাদেরকে বিরত রাখবে। [১৯৮]

হাদীস নং-২:

عن أبي هريرة، عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال: إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا.

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ তা'আলা এই উম্মত (উম্মতে মুহাম্মাদীর) জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এমন মহান ব্যক্তি (মুজাদ্দিদ) প্রেরণ করেন, যিনি বা যারা ঐ উম্মতের উক্ত দ্বীনের সংস্কার করবেন।'[১৯৯]

---

[১৯৭]. আবুল আব্বাস শিহাবুদ্দিন আহমাদ কাস্তাল্লানী (মৃতঃ ৯২৩হি.), **ইরশাদুস সারী শরহুল বুখারী**, (আল মাতবায়াতুল কুবরা আমিরিয়্যাহ, ১৩২৩হি.), ৭ম সং, খ.১, পৃ. ৪।

[১৯৮]. ইমাম মুল্লা আলী আল কারী, আবুল হাসান নুরুদ্দীন (মৃতঃ ১০১৪ হি.), **মিরকাতুল মাফাতীহ**, (দারুল ফিকরঃ বৈরুত-লিবানন, ১৪২২হি./২০০২ খ্রি.), প্রথম প্রকাশ, খ.১, পৃ. ৩২১।

[১৯৯]. আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনে আশআছ সিজিস্তানী (মৃতঃ২৭৫হি.), সুনানু আবি দাউদ, তা. মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন আব্দুল হামীদ, (বৈরুতঃ আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, তা.বি.), খ.৪, পৃ. ১০৯, হা. নং-৪২৯১; নিসাপুরী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল্লাহ (মৃতঃ ৪০৫), আলমুসতাদরাক, তা. মুস্তফা আব্দুল কাদির (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১১হি./ ১৯৯০খ্রি.), ১ম সং, খ.৪, পৃ. ৫৬৫, হা. নং-৮৫৯২; ইমাম আবুল কাসেম তাবারানী (মৃত্যুঃ ৩৬০হি.), **আল মু'জামুল আওসাত**, (কাহিরাঃ দারুল হারামাইন, তা.বি), খ.৬, পৃ. ৩২৩, হা. নং-৬৫২৮।

হাদীসের সনদ পর্যালোচনা:
ইমাম হাকেম নিসাপুরী, ইমাম বাইহাকী, ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী রহ. সহ সকল হাফিজুল হাদীস মুহাদ্দিসগণ হাদীসটির সনদ সহীহ বলেছেন। [২০০]

হাদীসের ব্যাখ্যা :
ইমাম মুল্লা আলী কারী রহ. এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক শতাব্দীর শুরুতে বা শেষ ভাগে যখন ইলম সংকীর্ণ হয়ে যায়, সুন্নাতের আমল সীমিত হয়ে যায়, অজ্ঞতা ও বিদআতের সয়লাভ হয় তখন এই উম্মতের দ্বীনের সংস্কারকল্পে একজন মুজাদ্দিদ প্রেরণ করেন যিনি কুফরের পরিবর্তে সুন্নাতের শিক্ষা দেন, দ্বীনি ইলম বিস্তার করেন, আলেমদের মর্যাদা বুলন্দ করেন, বিদআত ধ্বংস করেন ও বিদআতীদের পরাস্ত করেন। [২০১]

এ হাদীস দ্বারা আরও একটি কথা প্রতীয়মান হয় যে, যে শতাব্দীর যিনি মুজাদ্দিদ, সেই শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে মুজাদ্দিদ হিসেবে মনোনীত হবেন এবং তার সংস্কারমূলক খেদমতের আঞ্জাম দিবেন। কিন্তু উক্ত মুজাদ্দিদের জন্ম মৃত্যু কবে হবে তা উক্ত হাদীসে উল্লিখিত হয় নাই। কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, যে শতাব্দীতে যিনি মুজাদ্দিদ তার জন্ম ঐ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও হতে পারে অথবা পূর্ববর্তী শতাব্দীর শেষ ভাগেও হতে পারে। অনুরূপভাবে তাঁর মৃত্যু উক্ত শতাব্দীর প্রথম ভাগ, মধ্যভাগ বা শেষ ভাগেও হতে পারে। [২০২]

ইমাম ইবনুল আছীর রহ. এই হাদীসের ব্যাখ্যায় দীর্ঘ আলোচনার পর বলেন,

فَالْأَحْسَنُ وَالْأَجْدَرُ أَن يَكُوْنَ ذَلِكَ إِشَارَةً إِلَى حُدُوْثِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَكَابِرِ الْمَشْهُوْرِيْنَ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ يُجَدِّدُوْنَ لِلنَّاسِ دِيْنَهُمْ، وَيَحْفَظُوْنَ مَذَاهِبَهُمُ الَّتِي قَلَّدُوْا فِيْهَا مُجْتَهِدِيْهِمْ وَأَئِمَّتَهُمْ.

অতএব, উচিৎ হলো- এই হাদীসটি এ দিকে ইঙ্গিত করে যে, এর দ্বারা এমন একদল প্রসিদ্ধ আকাবীর আলেম (মুজাদ্দিদ) উদ্দেশ্য, যারা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে প্রেরিত। তাঁরা তাঁদের দ্বীনের হিফাজত করবেন এবং তাঁরা যে সকল

---

[২০০]. সুয়ূতী, আবুল ফযল জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান (মৃত্যু: ৯১১হি.), **মিরকাতুস সউদ ইলা সুনানি আবি দাউদ,** (লিবানন: দারু ইবনে হাজম, ১৪৩৩হি./২০১২খ্রি.), ১ম প্রকাশ, খ.৩, পৃ. ১০৬১।

[২০১]. **মিরকাতুল মাফাতীহ**, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৩২১।

[২০২]. মাওলানা মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, **মুজাদ্দেদে আলফেছানী রহ.-এর কামইয়াবী ও কর্মপদ্ধতি**, (ঝালকাঠী: নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, ২০১৫খ্রি.), ৫সং, পৃ. ১২।

মুজতাহিদ আলেমগণের অনুসরণ (তাকলীদ করেন) তাঁদের মাযহাবকে সুরক্ষিত রাখবেন।[২০৩]

উপর্যুক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক হিজরী শতাব্দীর প্রথম ভাগে আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহপূর্বক শতাব্দীর শেষভাগে উদ্ভূত সকল প্রকার শিরক, কুফর, বিদআত, কুসংস্কার বিদূরিত করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসৃত খাঁটি ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) প্রেরণ করেন।[২০৪]

মুজাদ্দিদের প্রকার :

মুজাদ্দিদের যোগ্যতা, গুণাবলি ও কামালিয়্যাত বিবেচনায় এবং বাতিল মতবাদ, বাতিল ফিরকার প্রাদুর্ভাব, বিদআত, কুসংস্কার সয়লাব হওয়ার বিবেচনায় মুজাদ্দিদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

এক. মুজাদ্দিদে মিয়াত (শতাব্দীর মুজাদ্দিদ) : প্রতি শতাব্দীর শিরোভাগে যে মুজাদ্দিদ প্রেরিত হন, তিনি সমাজ থেকে সকল প্রকার, শিরক, বিদআত, কুসংস্কার বিদূরিত করেন, তাকে মুজাদ্দিদে মিয়াত (শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বলে)। পূর্বোল্লিখিত হাদীসে যার প্রমাণ রয়েছে।

দুই. মুজাদ্দিদে আলফ (সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ) : যেহেতু শতাব্দীর শেষ ভাগের চেয়ে সহস্রাব্দের শেষ ভাগে বাতিল মতবাদ ও বাতিল ফিরকার প্রাদুর্ভাব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়, সেহেতু শতাব্দীর মুজাদ্দিদের চেয়ে সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ বহুগুণে কামেল হয়ে থাকেন। সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদের ব্যাপারে কয়েকটি উদ্ধৃতি 'মকতুবাতে মুজাদ্দিদে আলফে ছানী রহ.' থেকে উল্লেখ করা হলো-

১. 'জাতব্য যে, প্রত্যেক শতাব্দীর প্রারম্ভে এক বা একাধিক মুজাদ্দিদের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ভিন্ন ও সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ ভিন্ন। যেরূপ শত বছর ও সহস্র বছরের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান ; শতাব্দীর মুজাদ্দিদ এবং সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদের মধ্যেও ঠিক সেরূপ বরং ততোধিক পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে।'[২০৫]

---

[২০৩]. ইবনুল আসীর জাযুরী, মাজদুদ্দীন আবু সাআদাত শাইবানী (মৃত্যু:৬০৬হি.), **জামেউল উসূল ফি আহাদিসির রাসূল**, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৩৯২হি./১৯৭২খ্রি.), খ.১১, পৃ. ৩১৯।

[২০৪]. **মুজাদ্দেদে আলফেছানী রহ.-এর কামইয়াবী ও কর্মপদ্ধতি**, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

[২০৫]. মকতুবাতে মুজাদ্দিদে আলফে ছানী রহ., খ.২, মকতুব নং-৪ ; **মুজাদ্দেদে আলফেছানী রহ.-এর কামইয়াবী ও কর্মপদ্ধতি**, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

২. 'হে বৎস ! পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের যুগে যখন পৃথিবী কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে যেত, তখন এক একজন উলূল আযম পয়গম্বর প্রেরিত হতেন এবং নতুন শরীয়ত প্রবর্তন করতেন। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) শেষ নবী বিধায় তাঁর উম্মতের আলেমগণকে বনী ইসরাঈল বংশীয় নবীগণের মর্তবা দান করা হয়েছে এবং তাঁদের দ্বারা পয়গম্বর প্রেরণের আবশ্যকতা পূর্ণ করা হয়েছে। এজন্য প্রত্যেক শতাব্দীর প্রারম্ভে উম্মতে মুহাম্মাদীর আলেমগণের মধ্য হতে কোন এক ব্যক্তিকে শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হিসেবে মনোনীত করা হয়, যেন তিনি দ্বীন-শরীয়তকে পুনরুজ্জীবিত করেন। বিশেষত সহস্র বছর অতিবাহিত হওয়ার পর পূর্ববর্তী যামানার উলুল আযম পয়গম্বর প্রেরিত হতেন। কেননা, তখন সাধারণ পয়গম্বর দ্বারা যথেষ্ট হতো না। বর্তমান যামানার অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত (মারেফাতের অধিকারী) এমন এক বুযুর্গ ব্যক্তির আবির্ভাব আবশ্যক, যিনি উলুল আযম পয়গম্বরের স্থলাভিষিক্ত হবেন।'[২০৬]

৩. 'এরূপ বুযুর্গ ব্যক্তি (সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ) কোন সময় একাধিক হন না। কেননা, তাদের আবির্ভাব বহুদিন পর হয়ে থাকে।'[২০৭]

৪. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি রহ. বলেন, 'হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পূর্ববর্তী যামানায় মানুষের হেদায়েতের জন্য প্রত্যেক যুগে একই সময় বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নবী প্রোরিত হতেন। হাদীস শরীফে আছে, নবীগণের সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার এবং রসূলগণের সংখ্যা ৩১৩ জন এবং হাজার বছর অথবা এর চেয়ে কম সময় পর একজন উলুল আযম পয়গম্বর প্রেরিত হন।

হযরত আদম আ. এর এক হাজার বছর পর হযরত নূহ আ., হযরত নূহ আ. এর এক হাজার বছর পর হযরত ইব্রাহীম আ., হযরত ইব্রাহীম আ. এর এক হাজার বছর পর হযরত মুসা আ., হযরত মুসা আ. এর এক হাজার বছর পর হযরত ঈসা আ. উলুল আযম পয়গম্বর হিসেবে প্রেরিত হয়েছে। হযরত ঈসা আ. এর প্রায় ছয়শত বছর পর হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) উলুল আযম ও সর্বশেষ পয়গম্বর হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন।

কাজেই হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ইন্তিকালের পর তাঁর উম্মতের ওলীগণ মানুষের হেদায়েতের জন্য তাঁর নায়েব হবেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন,

اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিস (উত্তারাধিকারী)।[২০৮]

---

২০৬. মকতুবাতে মুজাদ্দিদে আলফে ছানী রহ., খ.১, মকতুব নং-২৩৪ ; মুজাদ্দেদে আলফেছানী রহ.-এর কামইয়াবী ও কর্মপদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

২০৭. মকতুবাতে মুজাদ্দিদে আলফে ছানী রহ., খ.১, মকতুব নং-২৩৪ ; মুজাদ্দেদে আলফেছানী রহ.-এর কামইয়াবী ও কর্মপদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

২০৮. সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুল ইলম, বাবুল হিচ্ছি আলা তলাবিল ইলম, প্রাগুক্ত, হা. নং-৩৬৪১।

উম্মতে মুহাম্মাদীর আলেমগণের মধ্য হতে কতককে প্রত্যেক শতাব্দীর বিশিষ্ট মর্তবা দান করা হয়েছে। (তারা শতাব্দীর মুজাদ্দিদের মর্তবা লাভ করেছেন)। তাদের মর্তবা পূর্ব যামানার রসূলগণের ন্যায়। তাঁরা দ্বীনের তাজদীদ করেন। (অর্থাৎ কুসংস্কার দূর করে শরীয়তকে পুনরুজ্জীবিত করেন।)

রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেন,

إنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الأمَّةِ عَلى رَأسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَها دينَها

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ তা'আলা এই উম্মত (উম্মতে মুহাম্মাদীর) জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এমন মহান ব্যক্তি (মুজাদ্দিদ) প্রেরণ করেন, যিনি বা যারা ঐ উম্মতের উক্ত দ্বীনের সংস্কার করবেন।'[২০৯]

যখন হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে এবং একজন উলুল আযম পয়গম্বরের আবির্ভাবের সময় উপস্থিত হয়েছে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর পূর্ব নিয়মানুযায়ী দ্বিতীয় সহস্রাব্দের জন্য একজন মুজাদ্দিদ সৃষ্টি করেছেন, যিনি পূর্ব যামানায় উলুল আযম পয়গম্বরগণের মর্যাদা লাভ করেন।[২১০]

মুজাদ্দিদ প্রেরণের উদ্দেশ্য :

পূর্বোক্ত হাদীসের মধ্যেই মুজাদ্দিদ প্রেরণের উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের সংস্কারক হিসেবে প্রেরণ করেন। মুজাদ্দিদ প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আযীমাবাদী রহ. বলেন,

وَإِنَّمَا كَانَ التَّجْدِيدُ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ لِانْخِرَامِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ غَالِبًا وَانْدِرَاسِ السُّنَنِ وَظُهُورِ الْبِدَعِ فَيُحْتَاجُ حِينَئِذٍ إِلَى تَجْدِيدِ الدِّينِ فَيَأْتِي اللهُ تَعَالَى مِنَ الْخَلْقِ بِعِوَضٍ مِنَ السَّلَفِ إما واحدا أو متعددا.

'সংস্কার হয় প্রতি শতাব্দীর শিরোভাগে আলেম-উলামার ক্লান্তিলগ্নে, সুন্নাতের বিলুপ্তি ও বিদআতের সয়লাবের সময়, যখন দ্বীন সংস্কারের মুখাপেক্ষী হয় তখন আল্লাহ তা'আলা এক বা একাধিক ব্যক্তিকে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করে প্রেরণ করেন।'[২১১]

---

[২০৯]. সুনানু আবি দাউদ, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ১০৯, হা. নং-৪২৯১; আলমুসতাদরাক, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৫৬৫, হা. নং-৮৫৯২; আল মু'জামুল আওসাত, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ. ৩২৩, হা. নং-৬৫২৮।

[২১০]. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি রহ., ইরশাদুত্তালেবীন; মুজাদ্দেদে আলফেছানী রহ.-এর কামইয়াবী ও কর্মপদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৫।

[২১১]. মুহাম্মাদ আশরাফ ইবনে আমীর আযীমাবাদী (মৃত: ১৩২৯হি.), আউনুল মাবুদ শরহু আবি দাউদ, (বৈরুত: দারুল কুতবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৫হি.), খ.১১, পৃ. ২৬৩।

ইমাম মুল্লা আলী কারী রহ. বলেন, 'মুজাদ্দিদ তিনি বিদআত থেকে সুন্নাতকে স্পষ্ট করবেন, ইলমের প্রসার ঘটাবেন, আলেমগণের সম্মান সমুন্নত করবেন, বিদআত ও বিদআতীদের বিচূর্ণ করবেন। [২১২]

মুজাদ্দিদের বৈশিষ্ট্য :

ইমাম ইবনুল আছীর রহ. বলেন, এটা আবশ্যক নয় যে, প্রেরিত ব্যক্তি শুধু ফকীহগণ হবেন যেমন কতিপয় আলেম মত পেশ করেছেন। কেননা, ফকীহগণ কর্তৃক ধর্মীয় বিষয়ে উম্মতের ব্যপক উপকার ও কল্যাণ সাধিত হলেও তাঁরা ব্যতীত শাসক-বাদশা, মুহাদ্দিস, কারী, ওয়ায়েজ (বক্তা), বিভিন্ন স্তরের পীর-ওলীগণের দ্বারাও উম্মতের প্রভূত উপকার ও কল্যাণ সাধিত হয়। কেননা, এক একেকজন যে বিষয়ে উপকার সাধণ করেন অপরজন সে বিষয়ে উপকার সাধনে ততটা পারদর্শী নন। কেননা, দ্বীন রক্ষার্থে রাজ্য পরিচালনা নীতিমালা সংরক্ষণ করা, ন্যায় বিচার পরিচালনা করা, সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যা রক্তপাতকে বন্ধ করে এবং যার মাধ্যমে শরীয়তের বিধি-বিধান বাস্তবায়ন সম্ভব হয়; আর এটা তো শাসকবর্গের কাজ। অনুরূপভাবে মুহাদ্দিসগণ হাদীস সংরক্ষণ করেন যা হলো শরীয়তের দলীল, কারীগণ কুরআন শরীফ মুখস্থ রাখার মাধ্যমে সাত কিরাতসহ কুরআন সংরক্ষণ করেন এবং পীর-ওলীগণ ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে মানুষদেরকে তাকওয়াবান ও দুনিয়াবিমুখ হতে উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে প্রত্যেকের দ্বীন রক্ষার ব্যাপারে আলাদা পদক্ষেপ ও ভূমিকা রয়েছে। অতএব, উচিৎ হলো- প্রত্যেক শতাব্দীর শুরুতে প্রেরিত ব্যক্তি সেই যুগের উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর যে কোন একটি বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করবেন এবং মানুষের ইশারার কেন্দ্রস্থল হবেন। কাজেই যখন হাদীসটির ব্যাখ্যা এই অর্থে গ্রহণ করা হবে তা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ও হিকমতের চাহিদা অনুযায়ী ব্যাখ্যা হবে। [২১৩]

মুজাদ্দিদের আলামত :

মুজাদ্দিদ হওয়ার নিশ্চিত কোন আলামত বা বৈশিষ্ট্য কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলীল দ্বারা সুপ্রমাণিত নয়। বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যিনি মুজাদ্দীদ হিসেবে মনোনীত হন, দ্বীনদার, পরহেযগার ও হক্কানী আলেমগণ তাঁদের তাজদীদী (সংস্কারমূলক) কর্মকাণ্ড, কর্মপদ্ধতি, গুণাবলী, আমল-আখলাক, তাকওয়া, পরহেযগারীতা ইত্যাদী বিষয়াদি পর্যালোচনা করে মুজাদ্দিদ খিতাব

---

[২১২]. **মিরকাতুল মাফাতীহ**, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৩২২; **আউনুল মাবুদ শরহু আবি দাউদ**, প্রাগুক্ত, খ.১১, পৃ. ২৬৩।

[২১৩]. **জামেউল উসূল ফি আহাদিসির রাসূল**, প্রাগুক্ত, খ.১১, পৃ. ৩১৯।

প্রদান করেন। কারণ, নেককার, দ্বীনদার, মুত্তাকী, আলেম-ওলী, পীর-মাশায়েখের প্রতি ভালোবাসা ও আন্তরিক টান এটা আল্লাহ প্রদত্ত।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبْهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ

আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে মহব্বত করেন, তখন তিনি হযরত জিব্রাঈল আ. কে ডেকে বলেন, 'আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাস। অতপর জিব্রাঈল আ. উক্ত বান্দাকে ভালোবাসেন এবং ফিরিশতাগণের মাঝে ঘোষণা করেন, 'আল্লাহ তা'আলা অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন তোমরাও তাকে ভালোবাসো। অতপর ফিরিশতাগণ তাকে ভালোবাসতে থাকেন। অতপর দুনিয়াবাসীর অন্তরে তাঁর প্রতি ভালোবাসা ঢেলে দেয়া হয়। [২১৪]

আযীমাবাদী রহ. বলেন,

وَلَا يُعْلَمُ ذَلِكَ الْمُجَدِّدُ إِلَّا بِغَلَبَةِ الظَّنِّ مِمَّنْ عَاصَرَهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِقَرَائِنِ أَحْوَالِهِ وَالِانْتِفَاعِ بِعِلْمِهِ إِذِ الْمُجَدِّدُ لِلدِّينِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ قَاصِرًا لِلسُّنَّةِ قَامِعًا لِلْبِدْعَةِ وَأَنْ يَعُمَّ عِلْمُهُ أَهْلَ زَمَانِهِ.

'জ্ঞাতব্য যে, মুজাদ্দিদের কার্যকলাপ এবং তাঁর ইলমে দ্বীনের খেদমত দেখে সেই যুগের মানুষ যাকে মুজাদ্দিদের বলে স্বীকৃতি দিবে সেই মুজাদ্দিদ বলে গণ্য হবে। যিনি মুজাদ্দিদ হবেন, তিনি যাহেরী-বাতেনী উভয় প্রকার ইলমের অধিকারী হবেন এবং সুন্নাতের সাহায্যকারী (পূনরুজ্জীবিতকারী), বিদআত ধ্বংসকারী হবেন। [২১৫]

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ নূর মুহাম্মাদ আযমী রহ. বলেন, প্রয়োজন অনুসারে আল্লাহ তা'আলা এরূপ লোক (মুজাদ্দিদ) সৃষ্টি করেন। কার্যকলাপ দেখে মানুষ, বিশেষ করে দ্বীনদার, আলেম-উলামা যাকে এরূপ ব্যক্তি (মুজাদ্দিদ) মনে করেন তিনিই এরূপ ব্যক্তি। [২১৬]

---

২১৪. আবু আব্দুল্লাহ ইসমাঈল বুখারী (মৃতঃ ২৫৬হি.) সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ২০৩০, হা. নং- ২৬৩৭; ইমাম মুসলিম, হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম কুশাইরী রহ. (মৃতঃ ২৬১হি.) সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ১১১, হা. নং-৩২০৯।

২১৫. আউনুল মাবুদ শরহু আবি দাউদ, প্রাগুক্ত, খ.১১, পৃ. ২৬৩; মিরকাতুল মাফাতীহ, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৩২২; মুজাদ্দেদে আলফেছানী রহ.-এর কামইয়াবী ও কর্মপদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

২১৬. মুজাদ্দেদে আলফেছানী রহ.-এর কামইয়াবী ও কর্মপদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

মুজাদ্দিদের সংখ্যা:

ইমাম ইবনুল আছীর রহ. বলেন, কিছু বিদ্যান এই মত পোষণ করেছেন যে, হাদীসের সাধারণ অর্থ গ্রহণ করা উত্তম ; কেননা, (مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا) (যে তাদের দ্বীনের সংস্কার করবে) এখানে (مَنْ) 'মান' শব্দটি এক ও একাধিক উভয় অর্থে ব্যবহার হয়। ফলে এ হাদীস দ্বারা এ কথা বলা আবশ্যক নয় যে, শতাব্দীর শিরোভাগে প্রেরিত মুজাদ্দিদ একজন হবেন, বরং কখনো একজন হতে পারেন আবার কখনো একাধিক হতে পারেন।[২১৭]

ইমাম ইবনু হাজর আসকালানী রহ. বলেন,

قال بعض الأئمة في شرح الحديث : أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ فِي رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ وَاحِدٌ فَقَطْ بَلْ يَكُونُ الْأَمْرُ فِيهِ مِنْ أَنَّهَا جَمَاعَةٌ مُتَعَدِّدَةٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْمُؤْمِنِينَ مَا بَيْنَ شُجَاعٍ وَبَصِيرٍ بِالْحَرْبِ وَفَقِيهٍ وَمُحَدِّثٍ وَمُفَسِّرٍ وَقَائِمٍ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَزَاهِدٍ وَعَابِدٍ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونُوا مُجْتَمِعِينَ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ بَلْ يَجُوزُ اجْتِمَاعُهُمْ فِي قُطْرٍ وَاحِدٍ وَافْتِرَاقُهُمْ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَيَجُوزُ أَنْ يَجْتَمِعُوا فِي الْبَلَدِ الْوَاحِدِ وَأَنْ يَكُونُوا فِي بَعْضٍ مِنْهُ دُونَ بَعْضٍ. وَهُوَ مُتَّجَهٌ فَإِنَّ اجْتِمَاعَ الصِّفَاتِ الْمُحْتَاجِ إِلَى تَجْدِيدِهَا لَا يَنْحَصِرُ فِي نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْخَيْرِ وَلَا يَلْزَمُ أَنَّ جَمِيعَ خِصَالِ الْخَيْرِ كُلِّهَا فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يُدَّعَى ذَلِكَ فِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَإِنَّهُ كَانَ الْقَائِمَ بِالْأَمْرِ عَلَى رَأْسِ الْمِائَةِ الْأُولَى بِاتِّصَافِهِ بِجَمِيعِ صِفَاتِ الْخَيْرِ وَتَقَدُّمِهِ فِيهَا.

'কতিপয় বিদ্যান এই মত পোষণ করেন যে, এ হাদীস দ্বারা প্রত্যেক শতাব্দীতে একজন মুজাদ্দিদ হওয়া আবশ্যক হয় না। বরং মুমিনদের একদল এই গুণে গুণান্বিত হতে পারে। যাদের কেউ বীর ও সমরনীতিতে পারঙ্গম, কেউ ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, শাসক, দুনিয়াবিমূক, আবেদ। আর এ সকল ব্যক্তি একই শহরে হওয়া আবশ্যক নয় ; বরং ভিন্ন ভিন্ন শহরে হতে পারে। তবে সকলে একই শহরে হতে পারে আবার কোন শহর ব্যতীত কোন শহরে হতে পারে। আর এটাই গ্রহণযোগ্য মত। কেননা, সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী একক কল্যাণকর কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আর এ সকল বৈশিষ্ট্য একজন ব্যক্তির মধ্যে সমাবেশ ঘটাও আবশ্যক নয়, যা শুধুমাত্র হযরত উমার ইবনু আব্দিল আযীয রহ. এর মধ্যে সমাবেশ ঘটেছিল। কারণ তিনি প্রথম শতাব্দীতে তিনি এ সকল উত্তম গুণাবলী একত্রকারী একজন শাসক এবং এ বিষয়ে তিনি অগ্রগামী।'[২১৮]

---

[২১৭]. জামেউল উসূল ফি আহাদিসির রাসূল, প্রাগুক্ত, খ.১১, পৃ. ৩১৯।

[২১৮]. ইমাম আবুল ফযল আহমাদ ইবনে আলী ইবনু হাজারআসকালানী (মৃত : ৮৫২হি.), **ফাতহুল বারী**, (বৈরুত : দারুল মারেফা, ১৩৭৯হি.), খ.১৩, পৃ. ৩২৯৫।

ইমাম মুল্লা আলী কারী রহ. বলেন,

وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَنْ يُجَدِّدُ لَيْسَ شَخْصًا وَاحِدًا، بَلِ الْمُرَادُ بِهِ جَمَاعَةٌ يُجَدِّدُ كُلُّ أَحَدٍ فِي بَلَدٍ فِي فَنٍّ أَوْ فُنُونٍ مِنَ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنَ الْأُمُورِ التَّقْرِيرِيَّةِ أَوِ التَّحْرِيرِيَّةِ، وَيَكُونُ سَبَبًا لِبَقَائِهِ وَعَدَمِ انْدِرَاسِهِ وَانْقِضَائِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا التَّجْدِيدَ أَمْرٌ إِضَافِيٌّ، لِأَنَّ الْعِلْمَ كُلَّ سَنَةٍ فِي التَّنَزُّلِ، كَمَا أَنَّ الْجَهْلَ كُلَّ عَامٍ فِي التَّرَقِّي، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ تَرَقِّي عُلَمَاءِ زَمَانِنَا بِسَبَبِ تَنَزُّلِ الْعِلْمِ فِي أَوَانِنَا، وَإِلَّا فَلَا مُنَاسَبَةَ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ عِلْمًا وَعَمَلًا وَحِلْمًا وَفَضْلًا وَتَحْقِيقًا وَتَدْقِيقًا لِمَا يَقْتَضِي الْبُعْدَ عَنْ زَمَنِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ،

'আমার নিকট সুস্পষ্ট যে, শতাব্দীর মুজাদ্দিদ সম্পর্কিত হাদীসের (مَنْ يُجَدِّدُ) (যে সংস্কার করবে) বাক্যাংশের অর্থ এই নয় যে, একই শতাব্দীতে কেবলমাত্র একজন হবে, বরং হাদীসের অর্থ এই যে, প্রত্যেক শতাব্দীতে একদল মুজাদ্দিদ প্রেরিত হবেন, যারা বিভিন্ন এলাকায় দ্বীনী ইলমের কোন এক বিষয়ে বা বিভিন্ন বিষয়ে সাধ্যমত সংস্কারের খেদমতের আঞ্জাম দিবেন, তা বক্তব্যের মাধ্যমে হতে পারে আবার লিখনীর মাধ্যমেও হতে পারে। যেই খেদমতের মাধ্যমে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী ও পরিচিত থাকবেন। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে সংস্কারমূলক কাজ একটি যৌগিক (তুলনামূলক বিষয়)। কেননা, প্রত্যেক যুগেই ইলমের হ্রাস হচ্ছে এবং মূর্খতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর বর্তমান যুগের আলেমগণের মর্যাদার কারণ হচ্ছে বর্তমান সময়ে ইলমের অবনতি। তা নাহলে পূর্বযুগের আলেমগণের সাথে বর্তমান যুগের আলেমগণের ইলম, আমল, বুদ্ধিমত্তা, মর্যাদা, দুদর্শিতা, তীক্ষ্ণ চিন্তা ইত্যাদির সাথে কোন তুলনা করা যায় না। যেহেতু নববী যুগ থেকে আমাদের যুগ অনেক দূরবর্তী।'[২১৯]

তিনি আরও বলেন,

قَالَ صَاحِبُ جَامِعِ الْأُصُولِ: وَقَدْ تَكَلَّمَ الْعُلَمَاءُ فِي تَأْوِيلِهِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ أَشَارَ إِلَى الْعَالِمِ الَّذِي هُوَ فِي مَذْهَبِهِ، وَحَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَيْهِ، وَالْأَوْلَى الْحَمْلُ عَلَى الْعُمُومِ فَإِنَّ لَفْظَةَ "مَنْ" تَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ،

'জামেউল উসূল' প্রণেতা বলেন, 'উলামায়ে কিরাম এই (মুজাদ্দিদের) হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এবং প্রতেকেই তাঁর মাযহাবের (দল) আলেমের প্রতি ইশারা করেছেন এবং হাদীসের ব্যাখ্যা তাঁদের উপর সীমাবদ্ধ করেছেন। তবে উত্তম হলো হাদীসটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা। কেননা, আরবীতে 'মান' (مَنْ) শব্দটি এক ও একাধিক উভয় অর্থেই ব্যবহার হয়ে থাকে। [২২০] আর এ

---

২১৯. মিরকাতুল মাফাতীহ, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৩২২।

২২০. মিরকাতুল মাফাতীহ, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৩২১।

কারণে এ হাদীস দ্বারা প্রত্যেক শতাব্দীতে একজন মুজাদ্দিদ হওয়া আবশ্যক হয় না। বরং এক বা একাধিক মুজাদ্দিদ হতে পারে।[২২১]

মাওলানা আব্দুল হক দেহলভী রহ. 'আশিয়াতুল লুমআত' কিতাবের ১ম খণ্ড ১৮২ পৃষ্ঠায় বলেন, 'উক্ত মুজাদ্দিদ এক ব্যক্তি হতে পারেন, কিম্বা একদলও হতে পারেন। কেননা, আরবী (مَنْ) 'মান' শব্দটি এক ব্যক্তি ও একাধিক ব্যক্তি উভয়ের উপর প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। যে সমস্ত শ্রেণী কর্তৃক দ্বীনের শক্তি, পূর্ণতা ও প্রচার প্রকাশিত হয়, তাঁরা উক্ত মুজাদ্দিদ শ্রেণীভুক্ত হবেন। এক যামানায় এক শহরে একজন তাঁর অনুসারীদলসহ এরূপ গুণে গুণান্বিত হন, তাও হতে পারে।[২২২]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে, প্রতি শতাব্দীর শুরুতে মুজাদ্দিদের আগমন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে প্রতি শতাব্দীতে কতজন মুজাদ্দিদ আগমন করবেন তা নির্দিষ্ট নয়, একজনও হতে পারে আবার একাধিকও হতে পারে। একই বিষয়ে হতে পারে আবার ভিন্ন বিষয়ে হতে পারে, একই এলাকায় হতে পারে আবার বিভিন্ন অঞ্চলে হতে পারে। যেহেতু কুরআন-সুন্নাহতে নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ উল্লেখ নেই, তাই হাদীসটি ব্যপকতার উপর প্রয়োগ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

মুজাদ্দিদের তালিকা:

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক শতাব্দীর প্রারম্ভে শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ও সহস্রাব্দের শুরুতে সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ এবং কিয়ামতের পূর্বে মুজাদ্দিদে আযম ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম আগমন করবেন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মত। তবে কোন শতাব্দীতে কে মুজাদ্দিদ ছিলেন বা আগমন করবেন সে বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহতে কোনো স্পষ্ট বক্তব্য নেই। এছাড়াও একই শতাব্দীতে আঞ্চলিক ও বিষয় ভিত্তিক বহু মুজাদ্দিদ হতে পারেন। এ সকল কারণে কে কোন শতাব্দীর মুজাদ্দিদ তা নিয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। প্রত্যেক দলের আলেমগণ তাদের মধ্য হতে আলামত ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে কেবলমাত্র তাদের দল থেকেই মুজাদ্দিদের তালিকা পেশ করেছেন। এটা তাদের ধারণা অনুযায়ী। ইমাম মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন,

وَأَغْرَبَ ابْنُ حَجَرٍ وَحَمَلَ الْمُجَدِّدِينَ مَحْصُورِينَ عَلَى الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ، وَخَتَمَهُمْ بِشَيْخِهِ الشَّيْخِ زَكَرِيَّا مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ بِتَجْدِيدِ فَنٍّ مِنَ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ

---

[২২১]. জামেউল উসূল ফি আহাদিসির রাসূল, প্রাগুক্ত, খ.১১, পৃ. ৩২০।

[২২২]. হাফেজুল হাদীস আল্লামা রুহুল আমিন বশিরহাটি রহ., **ফুরফুরা শরীফের পীর মুজাদ্দিদে যামান হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী রহ. এর বিস্তারিত জীবনী**, (বাংলাদেশঃ ঢাকা, মাকতাবাতুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, ২০১৪খ্রি.), প্রথম প্রকাশ, পৃ. ৩০।

'হযরত ইবনু হাজার আসকালানী রহ. মুজাদ্দিদের তালিকা প্রণয়ন করতে গিয়ে এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছেন এবং মুজাদ্দিদের তালিকা শুধুমাত্র শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন। তিনি তাঁর উস্তাদ শাইখ যাকারিয়া রহ. এর মাধ্যমে মুজাদ্দিদের তালিকা শেষ করেছেন। অথচ দ্বীনী ইলমের কোনো বিষয়ের তাজদীদ করছেন বলে কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না।'[২২৩]

এই জন্য শাফেয়ী মাযহাবপন্থী হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানী রহ., আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ., শাইখুল ইসলাম বদরুদ্দীন আবদাল রহ. এবং আহলে হাদীসপন্থী 'আউনুল মাবুদ' প্রণেতা প্রমূখ মুজাদ্দিদের যে তালিকা পেশ করেছেন তার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তারা মুজাদ্দিদের তালিকা প্রণয়ের ক্ষেত্রে উদার দৃষ্টিভঙ্গি পরিচয় প্রদান করেন নাই। ফলে তাদের তালিকা থেকে এমন কিছু মুজাদ্দিদের নাম বাদ পড়েছে যাদের তাজদীদী খেদমত তাদের তালিকাভুক্ত মুজাদ্দিদদের থেকে অনেক বেশি ও বহু ব্যাপক।

হানাফী মাযহাবপন্থী 'মাজমাউল বিহার' ও মজমুআয়ে ফতোয়া' প্রণেতা মুজাদ্দিদের যে তালিকা পেশ করেছেন, তাতে কিছুটা উদার দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করা হয়েছে বটে ; কিন্তু তাও পরিপূর্ণ ইনসাফপূর্ণ নয়।[২২৪] ফলে আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিভিন্ন দলের মতামতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং মুজাদ্দিদ সম্পর্কিত হাদীসের ব্যাপক অর্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে বিভিন্ন শতাব্দীর মুজাদ্দিদগণের একটি তালিকা প্রস্তুত করলাম। এ ক্ষেত্রে আমরা যে মুজাদ্দিদ যে শতাব্দীতে ইন্তেকাল করেছেন সেই শতাব্দীর মুজাদ্দিদ গণ্য করে তাদের তালিকা পেশ করেছি।

প্রথম শতাব্দী:

প্রথম শতাব্দী হলো নবী যুগ ও সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ীযুগ। সুতরাং এই শতাব্দীতে মুজাদ্দিদ আবির্ভাবের যারা দাবি করেছেন তাদের দাবির সাথে একমত হওয়া সমীচীন নয়। এই শতাব্দীর শেষভাবে যারা জন্ম গ্রহণ করেছেন বলে যারা তাদেরকে প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বলেছেন, তারা প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ নন, তারা দ্বিতীয় শতাব্দীর মুজাদ্দিদ। যেমন হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী সিরহিন্দী রহ. প্রথম সহাস্রাব্দে জন্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও সর্বসম্মতিক্রমে তিনি 'মুজাদ্দিদে আলফে সানী' (দ্বিতীয় সহাস্রাব্দের মুজাদ্দিদ)।[২২৫]

যেহেতু প্রথম শতাব্দীতে মুজাদ্দিদ আগমন আমরা সমর্থন করি না, ফলে দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে মুজাদ্দিদের তালিকা পেশ করলাম। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মুজাদ্দিদ নির্বাচন একটি ধারণা

---

[২২৩]. মিরকাতুল মাফাতীহ, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৩২১ ; মুজাদ্দেদে আলফেছানী রহ.-এর কামইয়াবী ও কর্মপদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

[২২৪]. মুজাদ্দেদে আলফেছানী রহ.-এর কামইয়াবী ও কর্মপদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

[২২৫]. মুজাদ্দেদে আলফেছানী রহ.-এর কামইয়াবী ও কর্মপদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

দ্বিতীয় শতাব্দী :

০১. হযরত উমার ইবনু আব্দুল আযীয রহ. (৬১-১০১ হি.)। সকল আলেম ও ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত যে, তিনিই সর্বপ্রথম মুজাদ্দিদ।[২২৬]

০২. ইমাম আযম আবু হানিফা নুমান ইবনু সাবিত রহ. (৮০-১৫০হি.)।[২২৭]

০৩. ইমাম মালিক ইবনু আনাস রহ. (৯০-১৭৯হি.)।[২২৮]

তৃতীয় শতাব্দী

০১. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস শাফেয়ী রহ. (১৫০-২০৪হি.)।[২২৯]

০২. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ. (১৬৪-২৪১হি.)।[২৩০]

চতুর্থ শতাব্দী :

০১. ইমাম আবুল হাসান আশয়ারী রহ. (২৭০-৩২৪হি.)।[২৩১]

০২. ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদী রহ. (২৭০-২৮০হি.)।[২৩২]

০৩. ইমাম আবু জাফর ত্বাহাবী রহ. (২৩৯-৩২১হি.)।[২৩৩]

পঞ্চম শতাব্দী :

০১. ইমাম কাযী আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে তায়্যেব বাকেল্লানী রহ. (মৃত : ৪০৩হি.)।[২৩৪]

০২. ইমাম ইসফারাঈনী, আবু হামেদ আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ রহ. (মৃত : ৪০৬হি.)।[২৩৫]

---

[২২৬]. জামেউল উসূল ফি আহাদিসির রাসূল, প্রাগুক্ত, খ.১১, পৃ. ৩১৯ ; ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃত্যু : ৯১১হি.), আততামবীহ বিমান ইয়াবআছুহুল্লাহু আলা রাসি কুল্লি মিয়াত, (দারুছছিক লিননাশরি ওয়াত তাওযী, তা.বি), পৃ. ২০।

[২২৭]. জামেউল উসূল ফি আহাদিসির রাসূল, প্রাগুক্ত, খ.১১, পৃ. ৩১৯।

[২২৮]. জামেউল উসূল ফি আহাদিসির রাসূল, প্রাগুক্ত, খ.১১, পৃ. ৩১৯।

[২২৯]. জামেউল উসূল ফি আহাদিসির রাসূল, প্রাগুক্ত, খ.১১, পৃ. ৩১৯ ; আততামবীহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

[২৩০]. জামেউল উসূল ফি আহাদিসির রাসূল, প্রাগুক্ত, খ.১১, পৃ. ৩১৯।

[২৩১]. ইমাম আজলূনী, ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ (মৃতঃ ১২৬২হি.), কাশফুল খাফা, (মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, ১৪২০হি./ ২০০০খ্রি.), প্রথম প্রকাশ, খ.১, পৃ. ২৭৬ ; আততামবীহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

[২৩২]. আততামবীহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯, হাশিয়া নং-১।

[২৩৩]. জামেউল উসূল ফি আহাদিসির রাসূল, প্রাগুক্ত, খ.১১, পৃ. ৩২৩।

[২৩৪]. জামেউল উসূল ফি আহাদিসির রাসূল, প্রাগুক্ত, খ.১১, পৃ. ৩২৩ ; কাশফুল খাফা, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৭৬ ; আততামবীহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

[২৩৫]. কাশফুল খাফা, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৭৬ ; আততামবীহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

০৩. ইমাম আবু তায়্যেব সাহাল ইবনে মুহাম্মাদ সালূকী (মৃত :)। [২৩৬]

ষষ্ঠ শতাব্দী :

০১. গাউসুল আযম বড়পীর হযরত আব্দুল কাদির মহিউদ্দীন জিলানী রহ. (৪৭০-৫৯৭হি.)। [২৩৭]

০২. হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ গাজালী রহ. (৪৫০-৫০৫হি.)। [২৩৮]

সপ্তম শতাব্দী :

০১. ইমামুল মুফাসসিরীন ফখরুদ্দীন উমার রাযী রহ. (৫৪৪-৬০৬হি.)। [২৩৯]

০২. গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী আযমেরী রহ. (৫৩৬-৬৩৩হি.)। [২৪০]

অষ্টম শতাব্দী :

০১. হযরত তকীউদ্দীন ইবনু দাকীকিল ঈদ রহ. (৬২৫-৭০২হি.)। [২৪১]

০২. হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ. (৬৬১-৭২৫হি.)। [২৪২]

০৩. হযরত খাজা বাহউদ্দীন নকশবন্দী রহ. (৭০৮-৭৯১হি.)। [২৪৩]

নবম শতাব্দী :

০১. ইমাম বালকীনী সিরাজুদ্দীন রহ. (৭২৪-৮০৫হি.)। [২৪৪]

০২. ইমাম হাফেজ আবুল ফযল যাইনুদ্দীন ইরাকী (৭২৫-৮০৬হি.)। [২৪৫]

---

[২৩৬]. আততামবীহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

[২৩৭]. মুহাম্মাদ রশীদ রেযা, মুজাদ্দিদুল কুরুনিস সাবেকা ফি দ্বীন ওয়াদ্দুনিয়া, মাজাল্লাতুল মানার, সংখ্যা-১, জুমাদাল আখিরা, ১৩৫০হি./অক্টোবর, ১৯৩১হি., পৃ. ৩-৪।

[২৩৮]. জামেউল উসূল ফি আহাদিসির রাসূল, প্রাগুক্ত, খ.১১, পৃ. ৩২৪; কাশফুল খাফা, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৭৬ ; আততামবীহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

[২৩৯]. কাশফুল খাফা, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৭৬ ; আততামবীহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

[২৪০]. মুজাদ্দেদে আলফেছানী রহ.-এর কামইয়াবী ও কর্মপদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

[২৪১]. কাশফুল খাফা, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৭৬।

[২৪২]. মুজাদ্দেদে আলফেছানী রহ.-এর কামইয়াবী ও কর্মপদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

[২৪৩]. মুজাদ্দেদে আলফেছানী রহ.-এর কামইয়াবী ও কর্মপদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

[২৪৪]. মুজাদ্দেদে আলফেছানী রহ.-এর কামইয়াবী ও কর্মপদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

[২৪৫]. আততামবীহ বিমান ইয়াবআছুহুল্লাহু আলা রাসি কুল্লি মিয়াত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬ ; মুজাদ্দেদে আলফেছানী রহ.-এর কামইয়াবী ও কর্মপদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

দশম শতাব্দী :

০১. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. (৮৪৯-৯১১হি.)।[২৪৬]

০২. ইমাম সামসুদ্দীন সাখাবী রহ. (৮৩১-৯০২হি.)।[২৪৭]

একাদশ শতাব্দী :

০১. হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী শাইখ আহমাদ ফারুকী সিরহিন্দী নকশবন্দী রহ. (৯৭১-১০৩৪হি.)। এ ব্যাপারে সকলে একমত তিনি দ্বিতীয় সহাস্রাব্দের মুজাদ্দিদ তথা 'মুজাদ্দিদে আলফে সানী'।[২৪৮]

দ্বাদশ শতাব্দী :

০১. শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. (১১১৪-১১৮৪হি.)।[২৪৯]

ত্রয়োদশ শতাব্দী :

০১. হযরত সায়্যেদ আহমদ শহীদ বেরলভী রহ. (১২০১-১২৪৬হি.)।[২৫০]

০২. হযরত মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী রহ. (১২১৫-১২৯০হি.)।[২৫১]

চতুর্দশ শতাব্দী :

০১. হযরত মাওলানা শাহ সূফী আবু বকর সিদ্দীকী ফুরফুরাভী রহ. (১২৬৩হি./১৮৪৬খ্রি.-১৩৫৮ হি.)/১৯৩৯খ্রি.।[২৫২]

---

[২৪৬] মিরকাতুল মাফাতীহ, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৩২১ ; আততামবীহ বিমান ইয়াবআছুহুল্লাহ আলা রাসি কুল্লি মিয়াত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

[২৪৭] মুজাদ্দেদে আলফেছানী রহ.-এর কামইয়াবী ও কর্মপদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

[২৪৮] মুহাম্মাদ ইবনু হাসান সালাবী ফাসী (মৃত :১৯৯৫খ্রি.), কিতাবুল ফিকরিস সামী ফি তারিখিল ফিকহিল ইসলামী, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম প্রকাশ, খ.২, পৃ. ৩২৬।

[২৪৯].কিতাবুল ফিকরিস সামী ফি তারিখিল ফিকহিল ইসলামী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৪২৩।

[২৫০] মুজাদ্দেদে আলফেছানী রহ.-এর কামইয়াবী ও কর্মপদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

[২৫১] বাংলাপিডিয়া ; মুজাদ্দেদে আলফেছানী রহ.-এর কামইয়াবী ও কর্মপদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

[২৫২]. ফুরফুরা শরীফের পীর মুজাদ্দিদে যামান হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী রহ. এর বিস্তারিত জীবনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯ ; মুহা. মুবারক আলী রহমানী, সীরাতে ওয়সী, (কলকাতা: নূরীয়া ফতেহীয়া সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন, ৭০/এ, একবালপুর, ১৪২৮হি./ ২০০৭খ্রি.), প্রথম প্রকাশ, পৃ. ৬৬ ; মুজাদ্দেদে আলফেছানী রহ.-এর কামইয়াবী ও কর্মপদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬ ; মাওলানা মুহাম্মাদ মোফাজ্জেল হোসেন , ফুরফুরার পীর মুজাদ্দিদে জামান আবু বকর সিদ্দীকি র., (ঢাকা : গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ, বাংলাদেশ ছাত্র হিযবুল্লাহ, দারুননাজাত সিদ্দিকীয়া কামিল মাদরাসা, ২০১৩খ্রি.), প্রথম প্রকাশ, পৃ. ৬।

০২. হযরত মাওলানা আব্দুল আউয়াল জৈনপুরী রহ. (১২৮৩-১৩৩৯হি.)। [২৫৩]
০৩. হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. (১২৮০-১৩৬২হি.)। (দেওবন্দী উলামায়ে কিরামের মতে তিনি বর্তমান শতাব্দীর মুজাদ্দিদ)। [২৫৪]
০৪. হযরত মাওলানা আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী রহ. (১২৭২-১৩৬২হি.)। (বেরলভী উলামায়ে কিরামের মতে তিনি বর্তমান শতাব্দীর মুজাদ্দিদ)। [২৫৫]
০৫. ইমাম যাহিদ কাওসারী রহ. (১২৯৬-১৩৭১হি.)। [২৫৬]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমাদের নিকট স্পষ্ট যে, তাজদীদ বলতে দ্বীনের মধ্যে অনুপ্রবেশকৃত শিরক, বিদআত, কুসংস্কার ইত্যাদি সকল বিষয় দূর করে দ্বীনকে আসল অবস্থার উপর স্থির করা। আর যিনি এ খিদমতের আঞ্জাম দিয়ে থাকেন তাকে মুজাদ্দিদ বলা হয়। প্রতি শতাব্দীতে বিভিন্ন অঞ্চলে বা একই অঞ্চলে, একই বিষয়ে বা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে, একজন বা একাধিক ব্যক্তি মুজাদ্দিদ হিসেবে প্রেরিত হয়ে থাকেন। মুজাদ্দিদ কে হবেন তা আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করে দেন। কুরআন-হাদীসে কে মুজাদ্দিদ হবেন তা স্পষ্ট বর্ণনা করা হয়নি। ফলে উলামায়ে কিরাম প্রত্যেক যুগের আলেম, ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, সূফীগণের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করে মুজাদ্দিদ খিতাব দিয়ে থাকেন। অনেকে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নিজেদের দলের আলেমগণের মধ্যেই মুজাদ্দিদের তালিকা সীমাবদ্ধ করেছেন। আবার কেউ অতি উদারতার কারণে অনেক বাতিল আকিদার অধিকারী ব্যক্তিকেও মুজাদ্দিদের তালিকাভুক্ত করেছেন। যেমন, জারুল্লাহ যামাখশারী (মুতাযিলা), মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহহাব নজদী, নাসিরুদ্দীন আলবানী প্রমুখ। তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি আমরা সমর্থন করি না। কারণ মুজাদ্দিদ হতে হলে অবশ্যই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। কেননা, একজন মুজাদ্দিদের দায়িত্বই হলো সমাজ থেকে বাতিল আকিদা দূরিভূত করা। আর এটা স্বতসিদ্ধ মত সঠিক আকিদার অধিকারী শুধুমাত্র আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত। তাই এই দল ছাড়া অন্য কোনো ফিরকার কোনো আলিমকে মুজাদ্দিদের তালিকাভুক্ত করা নিতান্তই মূর্খতা। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন!

* সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, দারুন নাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, ডেমরা, ঢাকা।

---

২৫৩. মুজাদ্দেদে আলফেছানী রহ.-এর কামইয়াবী ও কর্মপদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।
২৫৪. মুজাদ্দেদে আলফেছানী রহ.-এর কামইয়াবী ও কর্মপদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।
২৫৫. মুজাদ্দেদে আলফেছানী রহ.-এর কামইয়াবী ও কর্মপদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।
২৫৬. মুকাদ্দিমাতু মাকালাতুল কাওসারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

জিহাদের উদ্দেশ্য

অধ্যাপক আবদুল খালেক এম. এ.

জীবনের প্রকৃত রূপ ফুটিয়া উঠে বিরোধ ও সংঘর্ষের প্রবাল সংঘাতে এবং শক্তির ও চরম পরীক্ষা হয় সেখানে। প্রবল টিকিয়া থাকে, দূর্বল নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়; প্রভাত অরুনের মত সত্যের আলোক স্বমহিমায় জলিয়া উঠে এবং নৈশ অন্ধকারের ন্যায় অসত্যের অন্ধকার আপনা হইতে মিলাইয়া যায়। অনুরূপ ভাবে জিহাদও আত্মপ্রকাশ করে সত্য ও মিথ্যার বিরোধ ও সংঘাতের সংঘাতে। জিহাদের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠে জীবনের সত্যিকার রূপ, ধরা পরে সত্যের সমূহ বৈশিষ্ট্য, পরিচয় হয় প্রকৃত শক্তির। ইহাতে জীবন হয় তলোয়ারের মত শাণিত, পূর্নতার মহিমায় উজ্জ্বল। ইহা জীবন-মরু চলার পথে প্রেরণার একমাত্র নির্ঝর ধারা, বিশাল আধারে আশার একমাত্র উজ্জ্বল বার্তিকা। প্রকৃতপক্ষে ইহাই জীবন ও জীবনীশক্তি। জীহাদ ভিন্ন জীবন নহে মৃত্যু। ইহা মানুষকে দান করে সত্যিকার আধিপত্য ও বিশ্বের রাজদরবারে শ্রেষ্টত্বের গৌরবময় আসন এবং আখিরাতে বাগেরিজওয়ান-চিরসুখের আবাস। জিহাদের কল্যাণেই এককালে মুসলমানগণ পৃথিবীর বুকে আধিপত্য বিস্তার করে ও বিশ্বের রাজদরবারে শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবময় আসন অধিকার করে এবং ইহাতেই তাহাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন সার্থক ও সুন্দর হয়। মুসলিম সভ্যতা মুক্তি ও কল্যাণের মহান আদর্শমন্ডিত। এইরূপ বিশিষ্ট সভ্যতা জগতের ইতিহাসে অদ্বিতীয়।

বুলন্দি (উন্নতি) -ই জীবনের লক্ষ্য ও কাম্য। বুলন্দির সর্বোচ্চ শিখর জিহাদ এবং জিহাদের চরম শীর্ষে সমাসীন আমাদের নূরনবী সারওয়ারে কায়িনাত আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি সাইয়েদুল মুরসালীন-যেমনি ফজিলতের মাকামে, তেমনি জিহাদের ময়দানে। জিহাদের আলোক মহিমায় তাহার জীবন উজ্জ্বল-তাহার প্রতিটি কার্য, প্রতিটি কথা, প্রতিটি নিশ্বাসই জিহাদ। তাহার হাস্তিই জিহাদের হাস্তি। তিনি সাইফুল্লাহ-আল্লাহর তলওয়ার। তাহার নূরের প্রভা সৃষ্টি উষা হইতেই শত আলোড়ন ও বিলোড়নের ভিতর দিয়া বিচ্ছুরিত হইতেছে। ইহারই স্পর্শে যুগে যুগে শত শত সত্যের সিনাই দুলিয়া উঠিয়াছে, অসত্যের অন্ধকার পর্দারাশি পুড়িয়া খাক হইয়া গিয়াছে, পূর্ব আকাশের তোরণ পথে তাওহিদের সুবেহ

সাদিকের শুভ্র রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে, কুফরের অনামিশা তিরোহিত হইয়াছে, সৃষ্টি উদ্যানের শিরা উপশিরায়প্রেমের রক্তবহ্নি জলিয়া উঠিয়াছে, শত্রুকুল অনুতাপ ও অনুশোচনার কালাগ্নিতে রক্তবহ্নি জলিয়া উঠিয়াছে, শত্রুকুল অনুতাপ ও অনুশোচনার কালাগ্নিতে বিদগ্ধ" হইয়াছে, কোপগ্রস্ত মারদুদ শয়তান পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে, নফসের কারসাজিও ফেরেববাজি ফাসিয়া গিয়াছে, শয়তানী সুলতানাত ধ্বংস হইয়াছে, আল্লাহর খিলাফত কায়েম হইয়াছে। ঐ খিলাফত জিন, ইনসান, আসমান, জমিন ও সমস্ত মাখলুক স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

ইলম ও মা'রিফাতের ঐশ্বর্যময় খাজিনা রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর নূরানী কালব মোবারক। ঐ খাজিনা হইতে নূরের অনন্ত বিচ্ছুরণ শাণিত তলওয়ারের মত কুফরের পুঞ্জীভূত অন্ধকার স্তররাশির উপর সতত আপতিত হইতেছে, ফলে সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সমস্ত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। তাঁহার পবিত্র রসনায় ঐ নূর ও পাক কুরআনের নূরের এক অপূর্ব সমাবেশ। ঐ সমাবেশের প্রখরতায় প্রভায় কুফর ও কপটতার ছদ্ম আবরণ পুরিয়া ছাই হইয়া যায়, আর সত্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠে সূর্যের ন্যায়। তাহার কুসুম কোমল পবিত্র হস্তে দু-ধারী জুলফিকার। উহার আঘাতে কুফরের অজেয় দূর্গ হয় চূর্ণ বিচুর্ণ।

রসুলুল্লাহ (সঃ) এর একটি বৈশিষ্ট্য জিহাদ। তাহার জীবনে চিরদুবীর্ণিত আরব জাতির তরফ হইতে যেমন আসিল প্রবলতম সংঘাত, তেমনি তিনিও তাহাদের উপর হানিলেন কঠোরতম আঘাত। যে জাতির বিরুদ্ধে কোন পরাক্রমশালী মানুষ কখনও হস্ত উত্তোলন করতে পারে নাই, তিনি তাহাদেরই উপর আঘাত হানিলেন। ঐ আঘাত মানবতার বিরুদ্ধে ছিল না ছিল শিরক ও কুফরের বিরুদ্ধে। ঐ আঘাত ছিল অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের, তিমিরের বিরুদ্ধে আলোকের অজ্ঞতা ও মূর্খতার বিরুদ্ধে জ্ঞানের, শয়তান ও নফসের বিরুদ্ধে রুহানী শক্তির। আঘাতের ফল ফলিল বিস্ময়কর-জাতি ভাঙ্গিল না-গড়িয়া উঠিল মানবতার সৌধ ধ্বংসিয়া পড়িল না, পূর্নতার আলোক মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল। জিহাদ তাহাকে আনিয়া দিল ফাতেহ মুবীন প্রকাশ্য বিজয়-কুফর শিরকের উপর তওহিদের বিজয়। পবিত্র হেরেমে হেলালী নিশান তাওহীদের বিজয় ঘোষনা করিল। আরব নতি স্বীকার করিল আযমেও বিজয় সূচিত হইল। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া তিনি প্রমানিত হইলেন। মর্তলোকে তাহার মহিমার পূর্ণ বিকাশ হইল। আজ প্রমানিত হইল, তিনি 'সিরাজাম মুনীরা'-রওশন চেরাগ, প্রদীপ্ত সূর্য। ঐ দীপ্তিতে সত্যের আলোক স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অসত্যের অন্ধকার অবলুপ্ত হইল তাহার জীবনে বর্ণে বর্ণে সত্যই হইল অমর বানী ঃ

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

বল ঃ সত্য আসিয়াছে, অসত্য অবলুপ্ত হইয়াছে নিশ্চয়ই অসত্য অবলুপ্ত হইয়া থাকে। -সূরা বনি ইসরাইল ঃ ৮১

আল্লাহর জমিন আজ আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত, দিক দিগন্তে খিলাফতের আলোক বিচ্ছুরিত-তাহার সীমা সহরদ পূর্ব, পশ্চিম, উওর, দক্ষিণ, আসমান, যামিন।

ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস তাওহীদ ও কুফরের সংর্ঘষের ইতিহাস। ইসলাম সব কিছুতেই তাওহীদের রঙে রঙিন করিয়া তোলে এবং কুফরের মূলকে সম্পূর্ণরূপে উৎপাটন করে। ন্যায় ও বিচারের একমাত্র শান্তিনির্যর তাওহীদ। অন্যায় ও অত্যাচারের মূল উৎস কুফর। তাওহীদ নিজেই এক মহা জিহাদ। ইহার লক্ষ্য মানব জাতির দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তি ও কল্যাণ। ইসলামের একটি সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম ও নীতি আছে। এই কার্যক্রম ও নীতির পূর্ণ অনূসৃতির ভিতরেই মুক্তি ও কল্যান নিহিত। এই দুইটিকে বাস্তবে রূপায়িত করার অপর নাম আল্লাহর খিলাফত কায়েম করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের পথে বহু বাধা ও বিপত্তি আসিয়া দাড়ায় এবং তাহা অপসারিত করিতে যে শক্তি ও কৌশল প্রয়োগ করতে হয় তাহার সমষ্টিগত নাম জিহাদ। সার-কথা মুসলমানদের জীবন সংগ্রামের অপর এক নাম জিহাদ। প্রত্যেক মুসলমানদের জীবনই জিহাদের জীবন। প্রত্যেক মুসলমানই এক একজন মুজাহিদ -ধর্মযোদ্ধা।

জিহাদ মূলত দুই শ্রেনিতে বিভক্ত-জাহেরী ও বাতেনী। জাহেরী জিহাদ জাহেরী শত্রু কাফির ও মুনাফিকের বিরুদ্ধে-কাফিরের বিরুদ্ধে তলওয়ার ও মুনাফিকের বিরুদ্ধে হুজ্জত বা যুক্তি তর্ক। বাতেনী জিহাদ বাতেনী শত্রু নফস ও ইবলিসের বিরুদ্ধে। তাহা রুহানী।

ইসলাম মানব জাতির ফিতরাতী বা স্বভাবগত একমাত্র কল্যানকর ধর্ম। এই ধর্মের প্রচার ও প্রসারকল্পেই যুগে যুগে নবী প্রেরিত হইয়াছেন। যখনই মানুষ তাওহীদকে ভুলিয়া কুফরের ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে তখনই আল্লাহ তায়া'লা নবী প্রেরণ করিয়া তাহাদিগের সত্যের পথের সন্ধান দান করিয়াছেন। নবীগন যে পথের নির্দেশ দিয়াছেন তাহা ঐ ইবাদতের পথ যাহার জন্য জিন ও ইনসানের সৃষ্টি। ইবাদতের পথই সিরাতুল মুস্তাকিম-সরল পথ। এই সরল পথকে রোধ করিয়া ধারায় কতিপয় প্রতিকূল শক্তি। এই কথা পরিষ্কারভবে বুঝা আবশ্যক যে, বাতেনী জিহাদের মূল লক্ষ্য মানবকে সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত রাখা ও পরিপূর্ণতা দান করা। জাহেরী জিহাদ বাতেনি জিহাদের পরিপূরক ও সহায়ক মাত্র. কাজেই উভয় প্রকার জিহাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক। এই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বিষয়টিকে বিচার না করিলে ভ্রম অনিবার্য। জাহেরী জিহাদের উদ্দেশ্য মানুষকে কতল করিয়া নিশ্চিহ্ন করা নহে, মাত্র সত্যের পথরোধকারী ও প্রতিকূল শক্তিগুলোকে অপসারিত করা, যেন মানব জীবন শক্তিময় ও সর্বাঙ্গসুন্দর হয় এবং সে একমাত্র দিনরাত্রী ধর্ম ইসলামের উপর থাকিয়া দুনিয়া ও আখিরাতের অনন্ত সুখ সমৃদ্ধির অধিকারী হয়।

নবীগণ আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত পুরুষ এবং তাহাদের মুখ নিঃসৃত আদেশ নিষেধ আল্লাহরই আদেশ নিষেধ। ওই আদেশ ও নিষেধের উপর তাঁহাদের

ব্যক্তিগত কোনো ইখতিয়ার আর নেই। তাহাদের প্রচারকার্যে ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের সমস্ত পথ রুদ্ধ। কাজেই তাঁহাদের ইমামতি ও নায়কত্ব সম্পূর্ণ স্বার্থ মুক্ত। এই ইমামতির একমাত্র উদ্দেশ্য মানব মুক্তি ও কল্যাণ। নায়কত্বের এমন নিখুঁত ও নির্মল আদর্শ সাধারণ নায়কতায় পাওয়া যায় না। সাধারণ নায়কত্ব স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া থাকে। সেই স্বার্থ কখনো ব্যক্তিগত, কখনো সমষ্টিগত হইয়া থাকে। এইরূপে বহু স্বার্থের সংঘাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতি হিংসা প্রতিশোধের স্পৃহা প্রজ্বলিত হয় এবং সর্বশেষে সংঘর্ষ অনিবার্য ও অপরিহার্য হইয়া উঠে। তদুপরি ওই নায়কত্বের গণ্ডি ও সীমাবদ্ধ তাহা কোন ব্যক্তি, দল বা জাতিবিশেষ এর কতকটা উপকার ও কল্যাণ করিতে পারে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপক্ষ ব্যক্তি, দল বা জাতির বহু অকল্যাণ সংঘটিত হইয়া থাকে। ফলে সংঘর্ষের সূচনা হয় ও তাহা শ্রেণী যুদ্ধে পরিণত হয়। আবহমানকাল হইতে এই শ্রেণীযুদ্ধের ধারা চলিয়া আসিতেছে। ইহার ফল যে মারাত্মক হয়, বলাই বাহুল্য। কিন্তু নবীগণের ইমামতি সমগ্র মানবজাতিকে নিঃস্বার্থভাবে শান্তি, মুক্তি ও সুখ সমৃদ্ধির নির্দেশ দেয় ও তাহাতে শ্রেণী যুদ্ধ সমূলে উৎপাটিত হয়।

মানুষকে বাঁচিতে হইলে সত্যিকার আযাদী একান্ত আবশ্যক। সত্যিকারের আযাদী কি? যথেচ্ছাচার প্রভু পরিবর্তন ও স্বজাতীয় প্রভুর দাসত্ব স্বীকার? এই দুইটির গণ্ডি সম্পূর্ণ পৃথক, উভয়ের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নাই। সৃষ্ট জগতে নিহত কোন উন্নত শক্তির প্রভাব দর্শনের ক্ষীণ বুদ্ধি মানব অজ্ঞতাবশত সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে সকল্পিতভাবে একটি সামঞ্জস্য রেখা টানিয়া আনে। সে ভ্রমবশত সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমপর্যায়ভুক্ত মনে করে এবং স্রষ্টার আসনে অধিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিতে থাকে। এই অন্ধ বৃষ্টির ফলে দেব, দেবী, অনল, অনিল, সলীল, বিটপি, শিলা পূজা পাইয়া থাকে। উত্তরকালে এইসব বিকল্পিত চিন্তা করাই এক একটি মনগড়া ধর্ম বা রাষ্ট্রীয় বিধানের রূপ পরিগ্রহ করে এবং তাহাই সনাতন আচার-অনুষ্ঠান বলিয়া একশ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধা পাইয়া থাকে। ইতিহাসে ইহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। এক আদম সন্তান কাল ক্রমে ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির ফলে বিভিন্ন সমাজ ও দলে পরিণত হইয়াছে এবং এক মানব সমাজ সততা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

সর্বাঙ্গীণ সুন্দর মুক্তি ও কল্যাণের সন্ধান মানুষ যে স্বকল্পিত চিন্তাধারার ভিতর দিয়া পাইতে পারে না তাহা স্পষ্ট; একমাত্র স্রষ্টাই সম্যকভাবে অবগত আছেন কাজেই মুক্তির পথ প্রদর্শনের অধিকার তাহারই, মানুষের নহে। ইহাতে হস্তক্ষেপ করা অনধিকারচর্চা ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদি এমন হয় যে, নিজের কল্পিত মতি মুক্তির পথ, তবে তাহার সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ নির্ভুল ও অকাট্য প্রমাণ থাকা আবশ্যক; কিন্তু তাহার একান্ত অভাব। কাজেই ঐ সমস্ত পথ গ্রহণীয় নহে। আর নবীগন যে সর্বাঙ্গীণ মুক্তি ও কল্যাণকর পথ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহাদের কাছে অকাট্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে। তাহারা মানুষকে সৃষ্টির প্রভাব হইতে

মুক্ত করিয়াছেন এবং স্রষ্টার নিকট আত্মসমর্পণ এর পথ প্রদর্শন করেছেন যাহা সত্যিকার আযাদী।

এখন প্রশ্ন এই যে, মানুষ কোন শক্তির প্ররোচনায় সৃষ্টিকে স্রষ্টার সহিত সমশক্তিতে স্থান দান করে নিজের জ্ঞান ও বাস্তব এবং দিব্যদৃষ্টি কে অন্ধ করিয়া দেয়। সেই শক্তি ইবলিশ এবং নফস। এই দুইটি গোপন শত্রু। ইহারা জ্ঞান ও দিব্যদৃষ্টি উপর আবরণ ঢালিয়া দেয়। গর্বান্ধ আদম সন্তান ইবলিশ ও নফসের ফেরেববাজী না বুঝিতে পারিয়া ক্রমে ক্রমে প্রকাশ্য ভ্রান্তি আল্লাহর নাফরমানির পথের দিকে পা বাড়ায়। এই সর্বনাশা ভ্রান্তি হইতে মুক্তি লাভের একমাত্র পথ জিহাদ। ইহা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যস্থিত সমস্ত কৃত্রিম আবরণকে উঠাইয়া দেয় এবং সরল সত্য পথ প্রদর্শন করে। এইজন্যই সকল শ্রেণীর শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করিতে হয়। কাফের ও মুনাফিকদের প্রকৃতপক্ষে ইবলিশ এবং নফসেরই অনুসারী। কাজেই জাহেরী জিহাদ চলে অনুসারী কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে এবং বাতেনী জিহাদ অনুসৃত হয় শয়তান ও নফসের বিরুদ্ধে। স্রষ্টাকে অস্বীকার করা বা তাহার সহিত সৃষ্টির পূজা করার নামই কুফর। যখনই কুফরের তিমিররাশিতে জগত আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে তখনই কোন না কোন নবীর আবির্ভাব হয়েছে এবং তাওহীদের আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তাওহীদ ও কুফরের ইহাই প্রভেদ-তাওহীদ গড়ে, কুফর ভাঙ্গে। যখনই কুফরের ভাঙ্গন শক্তিগুলো সরল পথকে অবরোধ করিয়া দাঁড়ায় তখনই তাদের উপর আঘাত হানিবার আদেশ হয়।

এখন প্রমাণিত হলো যে, জিহাদ জাতিকে গড়িয়া তোলে এবং তাহা সত্যিকারের আযাদী ও মুক্তি দান করে। ইহা ভিন্ন মানুষের মুক্তির পথ রুদ্ধ এবং জীবন ব্যর্থ হইয়া ওঠে। ইহার ভিতর দিয়েই স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপিত হয়। স্বাধীন রাষ্ট্রে ইসলাম স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, অন্যত্র নহে। রসুলুল্লাহ (স.) এর জিহাদের ভিতর দিয়া সেই স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যেখানে আযাদী নাই সেখানে আল্লাহর ইবাদত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না গোলামির আওতায় ইসলামের শক্তি ও প্রভাব অক্ষুন্ন ও অম্লান থাকে না কাজেই নিজের ও মানব জাতির মুক্তি ও কল্যাণের জন্য সত্যিকারের আযাদী আবশ্যক ও অপরিহার্য।

বর্তমান বিশ্বের সমস্যা সমাধান কোথায়? একমাত্র ইসলামে। যুগপৎ ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের পথের নির্দেশ ও সন্ধান ইসলামই দিতে পারে। আজ স্রষ্টার আদেশ ও নিষেধ অমান্য এবং তাহার শক্তিকে অবজ্ঞা করার ফলে মানুষ মানুষের হাতে ক্রীড়ণক হইয়া পড়িয়াছে, সবল শাসক, দূর্বল শাসিত, সবল চোষক দুর্বল চোষিত, সবল প্রভু, দুর্বল ভৃত্য, সবল ভোগবিলাসে মত্ত, দুর্বল রোগক্লিষ্ট, সবল ইবাদতের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, দুর্বল অজ্ঞতার অন্ধকার মাথা ঘুরিয়া

মরিতেছে -ফলে সমগ্র মানবজাতি বিরাট ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। সমগ্র মানবজাতির মুক্তিবাণী বাহক একমাত্র ইসলাম। জগৎবাসীর বৃহত্তর মুক্তি ও কল্যাণের জন্য ইসলামকে বাস্তবে রূপায়িত করা আবশ্যক এবং তাহার জিহাদ ও অপরিহার্য।

উপরের বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হইল যে, জিহাদই মানুষকে উন্নতির চরম শিখরে পৌছায়। স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবনী তাহার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। তিনি জিহাদের ভিতর মুসলিম জাতিকে বিশ্বের রাজ দরবারে শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। কয়েক শতাব্দী পূর্বে যে জাতি মরুর রাখাল বলে পরিচিত ছিল আজ তাহারা জগতের নৈতিক শিক্ষক, সমগ্র মানবজাতিকে ইসলামের পথে আনিবার ভার আজ তাহাদের উপর ন্যস্ত। আল্লাহ তা'আলা কুরআনপাকে ঘোষণা করিতেছেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

তোমরা সর্বশেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তেমাদের অভ্যুদয়, তোমরা সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎকাজ হইতে নিবৃত্ত কর। -সূরা আল ইমরান ঃ ১১০

সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতের মর্যাদার উপযোগী দায়িত্ব, সন্দেহ নাই। তাহাদের একমাত্র কর্তব্য কুরআনের আদর্শে নিজেদিগকে ও মানবজাতিকে গড়িয়া তোলা। এই মহান দায়িত্ব যতকাল তাহারা বহন করিয়াছে ততকাল শনৈঃ শনৈঃ তাহাদের উন্নতি হইয়াছে এবং বিশ্বের রাজ দরবারে তাহারা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু যেইমাত্র ঐ দায়িত্ব পালনে তাহারা কুণ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে অধঃপতন শুরু হইয়াছে। আজ মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের অনুপ্রেরণা নাই, আজ তাহাদের দুরবস্থা-তাহারা হেয়, লাঞ্ছিত ও পদদলিত। তাহাদের দৃষ্টির মধ্যে আজ পর্দা পড়িয়াছে। তাই তাহারা নিজ হস্তের আলোক দেখিতে পায় না, অন্ধকারকেই আলোক বালিয়া মনে করিতেছে। যে কুরআর সমগ্র মানবজাতির মুক্তি ও কল্যাণের জন্য উম্মতে মুহাম্মদী জিম্মাদার- এই কথা ভূলিলে চলিবে না। মুসলিম জাতি বলিতে কোন একটি বিশেষ গোত্র, গোষ্ঠী বা কবিলাকে বুঝায় না, তাহা বিশেষ কোন রাজনৈতিক দল বা সামাজিক সংঘকেও বুঝায় না, কোন দেশবাসী একই ভাষাভাষী বর্ণের মানবশ্রেণীকে বুঝায় না। যে মানবগোষ্ঠী এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করিয়াছে, যাহাদের ধন-প্রাণ একমাত্র তাঁহারই জন্য উৎসর্গিত হইয়াছে তাহারই মুসলিম, থাকুক তাহাদের মধ্যে ভাষা ও বর্ণ বিভেদ, থাকুক তাহাদের মধ্যে দেশ ও কালের বিভেদ। ইহাদিগকে কুরআনের ভাষায় বলা হয় হিজবুল্লাহ-আল্লাহর জামাত, আল্লাহর ফৌজ। কুরআনে আছেঃ

اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

স্মরণ রাখ, আল্লাহর জামাত-একমাত্র তাহারাই জয়ী। -সুরা মুযাদিলা ঃ ২২

এখানে জাহেরী জিহাদের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইতেছে। তাহা আল্লাহর হক ও একটি বিশিষ্ট ইবাদত। কুরআন ও হাদীসে ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। আল্লাহর পছে কাফরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্দ্যেশ্যে শারীরিক ও মানসিক শক্তি, মাল-মাত্তা, অস্ত্র-শস্ত্র, রসদ প্রভৃতির প্রয়োগকে শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদ বলা হয়। আরবীতে যুদ্ধের অর্থ প্রকাশের জন্য হার্ব, কিতাল, মুকাতিলা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ শব্দ রহিয়াছে। তাহা সত্বেও জিহাদ শব্দ বাছিয়া লওয়া হইয়াছে-উদ্দেশ্য, জিহাদ ও যুদ্ধের মদ্ধে পার্থক্য দর্শানো। জিহাদ শব্দটি জাহদ হইতে উৎপন্ন। ইহার অর্থ কোন উদ্দেশ্যকে ক্রমান্বয়ে সাফল্যমণ্ডিত করিবার পথে সর্বশক্তি নিয়োগ করা। আরবীতে হারব বা যুদ্ধ বলিলে সাধারণত ঐসমস্ত যুদ্ধকে বুঝায় যাহা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে বাদশাহ বা জাতিবিশেষের পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য করা হয়, মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ সুন্দর কল্যাণ ও মুক্তির জন্য নহে। একমাত্র ইসলামের জিহাদেই সমগ্র মানবজাতির মুক্তি ও কল্যাণের আদর্শ অন্তর্নিহিত রহিয়াছে।

রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সীরত প্রণেতাগণ আবার জিহাদের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র পরিভাষা গ্রহণ করিয়াছেন- একটি 'গাযওয়া' অপরটি 'সারিয়া'। যে সমস্ত জিহাদে রসুলুল্লাহ (সঃ) স্বয়ং অংশগ্রহণ করিআছেন তাহা 'গাযওয়া' এবং যাহাতে তিনি অংশগ্রহণ করেন নাই তাহা 'সারিয়া'। সারিয়ার আভিধানিক অর্থ নৈশ অভিযান। শত্রুপক্ষ হইতে গতিবিধি গোপন রাখিবার উদ্দেশ্যে রসুলুল্লাহ (সঃ) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাত্রিকালে বহির্গত হইতেন। এজন্য ঐ শব্দটি পরিভাষা রূপে গৃহিত হইয়াছে। খন্ড নৈশ অভিযানের নাম 'সারিয়া' এবং উহাতে সৈন্য সংখ্যাও সাধারণত দুইশতের অধিক থাকে না। যুদ্ধ শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ, সংবাদ সংগ্রহ, শরীয়ত শিক্ষাদান, পণ্যদ্রব্য হস্তগত করা প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সারিয়া প্রেরিত হইত।

রসুলুল্লাহ (সঃ) হিজরত করিলেন বটে; তাহা স্বত্তেও কুরাইশদের হিংসা ও শত্রুতার অনল নিভিল না তাহা আরও তীব্র দাহিকা শক্তি লাইয়া দ্বিগুন-ত্রিগুন বেগে জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা সুদূর মদীনায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে উৎপীড়ন চালাইতে বদ্ধ পরিকর হইল। বিপুল আকারে যুদ্ধ প্রস্তুতি আরম্ভ হইল। রণসম্ভার যোগাইবার জন্য বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য কাফেলা প্রেরিত হইতে লাগিল। তাওহীদের মুক্ত আকাশ ঘন-ঘটাজালে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। উম্মল কুরার বা মক্কার প্রান্তরে যে আলোকশিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, আজ কি তাহা নিভিয়া যাইবে? তাহা কখনো হইতে পারেনা। স্বয়ং সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা তাহা প্রজ্বলিত রাখিবেন, তাঁহারই আদেশে তাহা দ্বিগুন ত্রিগুন বেগে জ্বলিয়া উঠিবে ও সমস্ত বিশ্বকে আলোকিত করিবে।

যাহারা আজ তাওহীদের পথে কন্টকের মত বসিল, আল্লাহর ইচ্ছায় তাহারাই আবার কন্টকের মত উঠিয়া যাইবে। তাওহীদের গতিরোধের জন্য যে সমস্ত ধন

সম্পদ ও জীবন নিয়োজিত হইল, আল্লাহ মুসলমানদের জন্য তাহা হালাল করিয়া দিলেন; তাহাদিগকে অবাধ অধিকার দান করিলেন রসুলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহর শত্রুর ধন-সম্পদের প্রতি হস্ত প্রসারণ এবং শয়তানী ফৌজের রক্তপাতের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন; উদ্দেশ্য পার্থিব বা ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধি নহে, আল্লাহর কলেমা বুলন্দ করা ও কুফরের ষড়যন্ত্র জাল বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া।

কুফরের জুলুম ও ফাসাদকে অপনীত করিয়া ইসলামের প্রসার করাই জিহাদের উদ্দেশ্য। জিহাদ কুফরের উপদ্রবের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। জিহাদ না হইলে ঐ পথ উন্মুক্ত থাকিত এবং তাহাতে ইসলামী সাম্রজ্যে সর্বদা ফিতনা, ফাসাদ ও জুলুমের সৃষ্টি হইত। ইসলাম যেমন কাহারো উপর জুলুম করেনা তেমনি কাহারো জুলুম বরদাশত করে না। কাজেই দ্বীন প্রচার ও প্রসার পথেই হউক কিংবা ইসলামী সাম্রাজ্য বা মুসলমানদের উপরেই হউক, যদি কুফর আঘাত হানিয়া বসে, তবে সেই আঘাত প্রতিহত ও সেই জুলুম অপনীত করিতেই হইবে। জিহাদ আত্মরক্ষামূলক ধর্মযুদ্ধ, আক্রমণাত্মক নহে। যাহারা মানবজাতির বৃহত্তর মুক্তি ও কল্যাণের পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়, তাহার জন্য মুসলমানগণ প্রাণ পর্যন্ত কুরবান করিতে দ্বিধাবোধ করে না, মুসলমানদের তলওয়ার তাহাদেরই উপর উদ্যত হয় এবং উহার আঘাতে তাহাদেরই শির দ্বিখন্ডিত হয়। যে সময় মানবমুক্তি ও কল্যাণের পথরোধ হইয়া পড়ে সে সময় তলওয়ার উন্মুক্ত করাই প্রকৃত কল্যাণ, আর যদি ঐ সন্ধিক্ষণে তাহা কোষে আবদ্ধ থাকে তবে তাহা হইবে অকল্যাণ ও শত্রতা। ঐ অবস্থায় জিহাদ মুক্তি ও কল্যাণের পথকেই উন্মুক্ত করে। কাজেই জিহাদ বান্দার উপর আল্লাহর এক অশেষ রহমত, গযব নহে।

জিহাদ আল্লাহর পথে হয়, অন্য পথে নহে। কুরআন এবং হাদিসে 'জিহাদ' শব্দের সহিত 'ফী-সাবীলিল্লাহ'-আল্লাহর পথে, এই বিশেষ অংশের প্রয়োগ রহিয়াছে। একমাত্র আল্লাহর রিজামন্দি লাভের জন্য যে জিহাদ হয় তাহাই জিহাদ 'ফি-সাবীল্লাহ'। তাহাতে পার্থিব কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ থাকে না। যাহাতে পার্থিব উদ্দেশ্য ও লক্ষ থাকে তাহা জিহাদ নহে, শয়তানের যুদ্ধ।

কুরআনে বর্ণিত আছে ঃ

الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ

যাহারা ঈমানদার তাহারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে এবং যাহারা কাফির তাহারা শয়তানের পথে যুদ্ধ করে। -সূরা নিসাঃ ৭৬

প্রভুত্ব স্থাপন, রাজ্য বিস্তার, আধিপত্য লাভ প্রভৃতি পার্থিব উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করা শয়তানী সংগ্রামের শ্রেণীভুক্ত।

জিহাদের শর্ত ই'লায়ে কালেমাতুল্লাহ আল্লাহর বাণী জয়যুক্ত করা। হাদীসে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আল্লাহর পথে

যুদ্ধ কি? কেহ মাল লাভের আশায় যুদ্ধ করে, কেহ বাহাদুরী প্রাপ্তির আশায় যুদ্ধ করে, কেহ বা শত্রুতা হেতু কিংবা নিজ কওমকে শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করার জন্য উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধ করে। ইহাদের মধ্যে কার যুদ্ধ ফী-সাবিলিল্লাহ?" রসুলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, "কাহারও যুদ্ধ নহে। যে যুদ্ধের একমাত্র লক্ষ্য আল্লাহর বাণীকে জয়যুক্ত করা কেবল তাহাই ফী-সাবিলিল্লাহ যুদ্ধ।" অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে আর তাহার মনে উট বাঁধিবার জন্য এক গাছি রজ্জু লাভের নিয়তও থাকে তাহা হইলে তাহার সাওয়াব বরবাদ হইয়া যাইবে।" আল্লাহ স্বীয় কালেমাকে বিজয়মণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে তাওহীদের পথরোধকারী শয়তানদের রক্তপাত বৈধ করিয়াছেন, অন্য কোন উদ্দেশ্য নহে। কাজেই জিহাদ ব্যতীত অন্য সমস্ত যুদ্ধ নিছক মানব-হত্যালীলা বই আর কিছুই নহে। হত্যালীলা যদি জিহাদের লক্ষ্য হইত তাহা হইলে রাসুলুল্লাহ (সঃ) মক্কার জীবনেও তাহা করিতে পারিতেন, তিনি কখনও আল্লাহর আদেশের জন্য অপেক্ষা করিতেন না। কিন্তু জিহাদের লক্ষ্য তাহা নয়। তিনি নিজ ইচ্ছায় বা নিজের জন্য কাফিরদের জান ও মাল বৈধ মনে করেন নাই। তিনি আল্লাহর আদেশের অপেক্ষা করিলেন। জীবনের মালিক আল্লাহ। কাজেই তাহা লইবার ও রাখিবার অধিকার তাঁহারই। যখন আদেশ আসিল তিনি আল্লাহর উদ্দেশ্যেই তাহা গ্রহণ করিলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় জান ও মাল গ্রহণের জন্য নবী দায়ী নহেন, দায়ী দুশমনদের দুশমনী।

রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর জমানায় জাহেরী জিহাদের আবশ্যকতা যেরূপ তীব্রভাবে অনুভূত হইয়াছিল, পূর্ববর্তী নবীগণের জমানায় সেরূপ হয় নাই। তাঁহাদের জমানায় বাতেনী জিহাদ মুখ্য এবং জাহেরী জিহাদ-গৌণ ছিল। রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর জমানায় উভয় জিহাদই মুখ্য। জাহেরী জিহাদের জন্য স্বতন্ত্র হুকুম একমাত্র তিনিই লাভ করেন। তিনি স্বয়ং সাতাইশটি জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। সারিয়্যার সংখ্যাও কম নহে। অপরাপর নবীদের মোট জিহাদের সংখ্যা সাতাইশ হবে কিনা সন্দেহ। পূর্ববর্তী শরীয়ত মনসুখ হইয়া যাইত এবং কুফরের ফাসাদ অপনীত করিবার জন্য সময়োপযোগী নূতন শরীয়ত জারী হইত। কাজেই তলওয়ারের জিহাদের কোন স্বতন্ত্র ও স্থায়ী হুকুমের আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর পরে কোন নবী প্রেরিত হইবেন না এবং তাঁহার শরীয়তও রহিত হইবে না। কাজেই স্বতন্ত্র ও স্থায়ী হুকুমের আবশ্যকতা। তদুপরি স্থায়ী হুকুম দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের তুলনায় এই উম্মতের সহিত কাফিরদের শত্রুতা ও বিরোধিতা প্রবলতর হইবে। মি'রাজের রাত্রিতে রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর ফজিলত, কামালত, সমগ্র সৃষ্টি উদ্যান রচনার মূল উদ্দেশ্য সৃষ্টির রহস্য, মানবের মহত্ত্ব এবং ফেরেশতার উপর মানবের শ্রেষ্ঠত্ব সম্যক প্রকাশ হইয়া পড়িল। প্রকৃতপক্ষে ঐ রাত্রিতেই আলমে শাহাদত, আলমে মিসাল ও আলমে গায়েবে তাঁহার খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাই খিলাফতে কোবরা মহান

খিলাফাত। মক্কা বিজয় ঐ খিলাফতের অভিব্যক্তি এবং ইহাই ঐ বিজয়ের বৈশিষ্ট্য। এই মহিমাময় বিজয় আসিল জিহাদের ভিতর দিয়া। রসুলুল্লাহ (সঃ) উলুল-আযমের উন্নতম মাকামে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উক্ত মাকাম হইতে সুলতানুন-নাসিরা সাহায্যকারী শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হইতে লাগিল, যাহার পূণ্য স্পর্শে বহু ঘটনা অলৌকিকতার অপূর্ব আভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ঐ সকল ঘটবার ভিতর দিয়া তাওহীদের মহিমা রিসালাতের গরিমা ও আওলিয়ায়ে কিরামের মহত্ত্ব উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার বিজয় প্রবাহও অলৌকিকতার ধারায় প্রবাহিত। প্রবলতম সংঘর্ষে দুর্বলতম ভাংগিয়া পড়িল না, প্রভাত সূর্যের মত কেবল স্বমহিমায় উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়া উঠিল।

মানব সমাজের ইতিহাসে যুদ্ধ এক অপরিহার্য উপসর্গ। ইহাকে এড়াইবার সাধু চেষ্টা থাকিলেও এড়ানো যায় না। যুদ্ধ একদিকে যেমন ধ্বংসের লীলাভূমি রচনা করে অপরদিকে তেমনি সৃষ্টির প্রেরণা যোগায়। ইহার ভিতর দিয়া বহু জাতির উত্থান ও পতন হইয়াছে; কিন্তু তাহা কখনও মানুষকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর মুক্তি ও কল্যাণের পথের নির্দেশ দিতে পারে নাই। তবে ব্যাঘ্রের ধারাল নখরের মত যে পৈশাচিক শক্তি ইহার মধ্যে নিহিত আছে তাহা দ্বারা ঐ সর্বাঙ্গীণ সুন্দর মুক্তির পথকে রোধ করিয়া দাঁড়াইতে পারে। কাজেই মুক্তির পথকে উন্মুক্ত রাখিতে হইলে ও নিছক মানব হত্যালীলার অবসান ঘটাইতে হইলে ধর্মেও রক্ষাকবচ হিসাবে অনুরূপ শক্তি থাকা দরকার। ধর্মের ঐ শক্তি জিহাদ। ইহা শুধু মানব হত্যালীলার অবসান ঘটায় না, সর্বাঙ্গীণ সুন্দর মুক্তি এবং কল্যাণের পথও উন্মুক্ত রাখে। জিহাদের বিধান না হইলে মানব সমাজের ইতিহাসে প্রতিক্রিয়াশীল প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে রক্ষা কবচের স্থান অবিসংবাদিতভাবেই অপূর্ণ থাকিত। ইহার অভাবে ধর্মও অপূর্ণ থাকিত। কাজেই জিহাদের ব্যবস্থা দ্বারা ধর্মের শুধু পূর্ণতাই সাধিত হইল না, তাহাতে পূর্ণাংগতার সৌষ্ঠবও সম্যকভাবে বৃদ্ধি পাইল। মানব সমাজের ঐ প্রবল শক্তিকে প্রতিহত করিবার জন্য রসুলুল্লাহ (সঃ)-কে বাধ্য হইয়াই জীবনের শেষ দশটি বৎসর জিহাদে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল।

তথ্যসূত্র: সাইয়েদুল মুরসালীন, ১ম খন্ড, সংস্করণ-২০১২, পৃষ্ঠা:৩৬০-৩৭১

শরীয়তের দৃষ্টিতে মুজাহিদ ও শহীদের মর্যাদা

এস. এম. নাজমুস সাকিব*

ক. মুজাহিদের মর্যাদা

কুরআন কারীম থেকে কিছু আয়াত-

মুজাহিদ ও শহীদের মর্যাদা অনেক অনেক বেশী। এ কারণে পবিত্র কুরআনে প্রায় ২০০ এর উপরে আয়াত নাযিল হয়েছে। একজন মানুষ জিহাদ করবে, তাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের মুমীন বলা হবে। যদি জিহাদের সময় বা মুহূর্ত না আসে, তবে অন্তরে ধারণ করে রাখবে জিহাদে শামিল হবার দৃঢ় ইচ্ছা। যারা জিহাদ করে, তাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী হোন স্বয়ং আল্লাহ।

وَاللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللهِ نَصِيرًا

আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের ভালোভাবে জানেন। অভিভাবক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।[২৫৭]

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ

স্মরণ করো যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের প্রতি ওহি পাঠিয়েছিলেন, আমি তোমাদের সঙ্গেই আছি। অতএব মুমীনদেরকে তোমরা দৃঢ়পদ রাখো। অচিরেই আমি কাফিরদের দিলে ভীতি সঞ্চার করবো। কাজেই তাদের স্কন্ধে আঘাত হানো, আঘাত হানো প্রত্যেকটি আঙ্গুলের গিঁটে গিঁটে।[২৫৮]

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে- যেন তার সীসা-গলানো প্রাচীর।[২৫৯]

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে তোমরা মৃত ভেবো না। বরং তারা জীবিত, তাদের প্রতিপালকের সান্নিধ্যে থেকে তারা রিযিক প্রাপ্ত হচ্ছে।[২৬০]

---

[২৫৭] সূরাতুন নিসা, আয়াত নং ৪৫

[২৫৮] সূরাতুল আনফাল, আয়াত নং ১২

[২৫৯] সূরাতুস সাফ, আয়াত নং ০৪

[২৬০] সূরাতু আলে ইমরান, আয়াত নং ১৬৯

হাদীস শরীফ থেকে কিছু বাণী–

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل ؟ قال : « إيمان بالله ورسوله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : « ثم الجهاد في سبيل الله » قيل له : ثم ماذا ؟ قال : « ثم حج مبرور

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ এবং তার রাসুলের প্রতি ঈমান। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, এরপর কোন আমল সর্বোত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।[২৬১]

سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : «مَثَلُ المجاهد في سبيل الله -والله أعلم بمن جاهد في سبيله - كَمَثَلِ الصَّائِمِ القائم ، وتوكَّل الله للمجاهد في سبيله بأن يَتَوَفَّاهُ : أنْ يُدخِلَهُ الجنة ، أو يَرْجِعَه سالما مع أجر أو غنيمة

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহর পথের মুজাহিদ, অবশ্য আল্লাহই অধিক জ্ঞাত- কে তাঁর পথে জিহাদ করছে, সর্বদা সিয়াম পালনকারী ও সালাত আদায়কারীর মতো। আল্লাহ তা'আলা তাঁর পথে জিহাদকারীর জন্য এই দায়িত্ব নিয়েছেন, যদি তাকে মৃত্যু দেন তবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, অথবা পুরস্কার বা গণিমতসহ নিরাপদে ফিরিয়ে আনবেন।[২৬২]

খ. শহীদের মর্যাদা–

কুরআন কারীম থেকে কিছু আয়াত–

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ

নিশ্চয় আল্লাহ মুমীনদের কাছ থেকে জান আর মাল কিনে নিয়েছেন। কারণ তাদের জন্য (বিনিময়ে) রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। অতঃপর (দুশমনদের) হত্যা করে এবং (নিজেরা) নিহত হয়।[২৬৩]

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (58) لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ

আর যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, অতঃপর নিহত হয়েছে কিংবা মারা গিয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই উৎকৃষ্ট রিযিক দান করবেন, আর

---

[২৬১] বুখারী শরীফ, হাদীস নং ১৫১৯

[২৬২] বুখারী শরীফ, হাদীস নং ২৭৮৭

[২৬৩] সূরাতুত তাওবাহ, আয়াত নং ১১১

আল্লাহ- তিনি তো সর্বোত্তম রিযিকদাতা। তিনি তাদেরকে অবশ্যই দাখিল করবেন এমন জায়গায়, যা পেয়ে তারা খুবই সন্তুষ্ট হবে, আর আল্লাহ নিশ্চিতই অবশ্যই সর্বজ্ঞ, পরম সহিষ্ণু। [২৬৪]

হাদীস শরীফ থেকে কিছু বাণী–

عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد يموت له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى

হযরত আনাস বিন মালিক রা. বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর কোন বান্দা এমতাবস্থায় মারা যায় যে, আল্লাহর কাছে তার সওয়াব রয়েছে, তাকে দুনিয়ার সব কিছু দিলেও দুনিয়ায় ফিরে আসতে আগ্রহী হবে না- একমাত্র শহীদ ব্যতীত। সে শাহাদাতের ফজীলত দেখার কারণে আবার দুনিয়ায় ফিরে এসে আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার প্রতি আগ্রহী হবে। [২৬৫]

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَلاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করে বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি মুমীনদের এমন একটি দল না থাকতো, যারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে পছন্দ করে না এবং যাদের সওয়ারী দিতে পারবো না বলে আশংকা করতাম, তাহলে যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছে, আমি সেই ক্ষুদ্র দলটির সঙ্গী হওয়া হতে বিরত থাকতাম না। সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি পছন্দ করি আমাকে যেন আল্লাহর রাস্তায় শহীদ করা হয়, আবার জীবিত করা হয়। অত:পর শহীদ করা হয়, আবার জীবিত করা হয়। পুনরায় শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, আবার শহীদ করা হয়। [২৬৬]

*উস্তাযুল হাদীস, জামিয়া ইসলামিয়া সৈয়দ আহমাদিয়া এতিখানা ও দাওরায়ে হাদীস মাদরাসা, মধুপুর, টাঙ্গাইল।

---

[২৬৪] সূরাতুল হাজ্জ, আয়াত নং ৫৮-৫৯

[২৬৫] বুখারী শরীফ, হাদীস নং ২৭৯৫

[২৬৬] বুখারী শরীফ, হাদীস নং ২৭৯৭

মুজাহিদ ও শহীদ হিসেবে হযরত সায়্যিদ আহ্মাদ শহীদ বেরলভী (রহ.) এর মর্যাদা

মাওলানা মুহিব্বুল ইসলাম চৌধুরী
পীর ছাহেব, সিরাজিয়া দরবার শরীফ, মহিপাল, ফেনী।

মহান আল্লাহ পাকের ঘোষণা

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

হে ঈমানদারগণ : তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদিদের অন্তর্ভূক্ত হও। এই সাদেকীনদের তথা সত্যবাদিদের পরিচয় দিয়ে আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে এরশাদ করেন, [১]

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَـٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّـٰدِقُونَ

প্রকৃত মু'মিন তারাই, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। অত:পর তাতে সন্দেহ করেনি। তদুপরি স্বীয় ধন-সম্পদ ও জান প্রাণ সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছে তারাই সত্যবাদী। [২] আলহামদুলিল্লাহ: মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত সায়্যিদ আহ্মাদ শহীদ বেরলভী (রহ) সত্যবাদিদেরই একজন। কেননা তিনি একজন খাঁটি মু'মিন ও মুজাহিদ এবং শহীদ। যার শরীরের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল বালাকোটরে ময়দান। স্বয়ং আল্লাহ নিজেই সাক্ষী আছেন। সেদিন সাক্ষী ছিল বালাকোটের মাঠি। সাক্ষী ছিল চন্দ্র, সূর্য, আকাশ বাতাস গ্রহ নক্ষত্র এবং অসংখ্য ফেরেস্তা। সে যুদ্ধ ছিল হক ও বাতিলের মধ্যে। শিরক ও কুফরের বিরুদ্ধে ইসলাম ও ঈমানের যুদ্ধ। তথাকথিত শিখ সম্প্রদায় নিমজ্জিত ছিল শিরক ও কুফরের অন্ধকারে, পক্ষান্তরে সায়্যিদ আহ্মাদ শহীদ বেরলভী (রহ) ও তার অনুসারী সৈনিকরা ছিলেন ইসলাম ও ঈমানের আলোয় আলোকিত।

---

[১] সূরা তাওবাহ, আয়াত-১১৯;

[২] সূরা হুজুরা-ত, আয়াত-১৫;

সত্যের বিজয় হয়েছিল। মিথ্যা তথা বাতিল অপদস্থ, অপমানিত, লাঞ্ছিত ও পরাজিত হয়েছিল। সায়্যিদ আহ্মাদ শহীদ বেরলভী তথা মুসীলমদের পক্ষে ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। আর তারাই হলে হিজবুল্লাহ অর্থ্যাৎ আল্লাহর দল। আর আল্লাহর দলই বিজয়ই দল। কেননা আল্লাহ পাকে ঘোষণা–

أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

মনে রাখিও নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ই দল।[৩]

অপরপক্ষ ছিল তাগুতী শক্তি শয়তানের দল, যারা ক্ষতিগ্রস্ত।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন–

أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَٰنِ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ

মনের রাখিও নিশ্চয় শয়তানের দল ক্ষতিগ্রস্ত[৪]

অন্যত্র আরো এরশাদ করেন,

وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَٰطِلُ إِنَّ ٱلْبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا

সত্য সমাগত, মিথ্যা বিতারিত, নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।[৫]

মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত সায়্যিদ আহ্মাদ শহীদ বেরলভী (রহ.) শহীদী মৃত্যু বরণ করেছেন। আল্লাহ রাস্তায় যারা শহীদ হয়েছেন তাদের অনেক বেশি মর্যাদা রয়েছে। কেননা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সব.) নিজেই মহান আল্লাহর কাছে শহীদী মৃত্যু কামনা করেছেন। যদি শহীদদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে না থাকত, তাহলে কিছুতেই রাসূলুল্লাহ (স.) আল্লাহর কছে তা কামনা করতেন না। মহান আল্লাহ শহীদদেরকে মৃত বলতে নিষেধ করেছেন। পবিত্র কুরআনে তিনি ইরশাদ করেন:

وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَن يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتٌۢ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ

অর্থ: যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত বলোনা কেননা তারা জীবিত কিন্তু তোমরা সেটা বুঝনা।[৬] শুধু তাই নয় শহদরা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতের রিজিকপ্রাপ্ত, সূরা আল ইমরানে আল্লাহ ঘোষনা দেন:

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

---

[৩] সূরামুজ্ব-দালাহ, আয়াত-২২;

[৪] সূরা মুজ্ব-দালাহ, আয়াত-১৯;

[৫] সূরা ইসরা, আয়াত-৮১;

[৬] সূরা বাকারা, আয়াত-১৫৪

যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তোমরা তাদেরকে মৃত মনে কর না বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তারা রিজিকপ্রাপ্ত।[৭]

সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আছে- শহীদদের আত্মা সবুজ পাখী আকার ধারণ করে জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা সেখানে উড়ে বেড়ায়। অবশেষ তারা আরশের নিচে জ্বলন্ত বাতিসমূহের উপর এসে বসে থাকে। এসময় আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি চাও? তারা উত্তর দেয়, হে আমাদের প্রভু! আপনিত আমাদেরকে অনেক কিছু দিয়েছেন যা অন্য সৃষ্টিকে দেননি। তাই আমরা আপনার কাছে আর কি বা চাইব? আল্লাহ তাদের আবার প্রশ্ন করবেন, তখন তারা দেখবে আল্লাহ তায়ালা প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে ছাড়বেন না। তখন তারা বলবে, আমরা চাই- আপনি আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠান। আমরা আপনার রাস্তায় জিহাদ করে আবার শহীদ হব। শহীদদের অপরিমেয় সুফল দেখে তারা এরকম আবদার করবে। তখন আল্লাহ বলবেন, আমি সুনির্দিষ্টভাবে লিখেছি কোন বান্দা দুনিয়া ছেড়ে আসলে আবার সেখানে ফিরে যাবে না।

উল্লেখ্য যে, শহীদরা পবিত্র। কেননা, মৃত ব্যক্তির গোসল দেয়া ওয়াজিব, অথচ শহীদদের কোন গোসল নেই। তারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কেননা আল্লাহ পাকের ঘোষনা-

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনের জানমালকে খরিদ করেছেন জান্নাতের বিনিময়ে। কেননা তারা আল্লাহ রাস্তায় সংগ্রাম করে।[৮]

যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তার রাস্তায় জিহাদ করে, যুদ্ধ করে, তারা আল্লাহ প্রিয়পাত্র। তিনি তাদেরকে ভালোবাসেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ এরশাদ করেন:

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন। যারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে, যেন তারা অট্টালিকাস্বরূপ।[৯]

শুধু তাই নয়, যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে তিনি তাদেরকে সকল শাস্তি থেকে রক্ষ করবেন। তাদের সকল গুনাহ্ মাফ করবেন, আল্লাহ ঘোষনা–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ
تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

---

[৭] সূরা আল-ইমরান, আয়াত-১৬৯;

[৮] সূরা তাওবাহ, আয়াত-১১১;

[৯] সূরা ছা-ফ, আয়াত৪;

অর্থ : হে ঈমানদার্গণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার কথা বলবো কি? যা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষ করবে? তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তোমাদের জানমাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে যদি তোমরা তা জানতে পার। তিনি তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন এবং তোমাদেরকে এমন এক জান্নাতে প্রবশে করাবেন যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত এবং জান্নাতুল আদনে পবিত্র স্থান। তাদের জন্য নির্ধারিত। আর এটিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাফল্য। [১০]

আল্লাহ তায়ালা শহীদদেরকে নিয়ামতপ্রাপ্ত হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন যেমন তিনি এরশাদ করেন:

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ
وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ

যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে তারা ঐ সকল নেয়ামতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন আর নিয়ামতপ্রাপ্ত বান্দারা হলে নবীগণ সিদ্দীকগণ শহীদগণ এবং নেককার বান্দাগণ। সে হিসেবে মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত সায়্যিদ আহ্মাদ শহীদ বেরলভী (রহ.) নেয়ামতপ্রাপ্ত বান্দা। [১১]

হযরত নোমান বিন বশির (রহ) বলেছেন, একদা আমি হুজুর (স.) এর মিম্বারের কাছে বসা ছিলাম, এমন সময় একব্যক্তি বললো দ্বীন ইসলামে দীক্ষা নেওয়ার পর হাজীদের সেবা, তাদেরকে পানি পান করানো ও মসজিদে হারামে আদাব করা ছাড়া অন্য কোন আমলের আমি দরকার দেখছি না। তার কথার পর অন্য ব্যক্তি বললো তুমি যে কাজগুলোর কথা বললে সেগুলোর চেয়ে জিহাদের গুরুত্ব অধিক। তাদের কথা শুনে হযরত ওমর (রা) বললেন হুজুর (স.) এর মিম্বরের কাছে বসে তোমরা এইভাবে চিৎকার করছ কেন? এটা মোটেই ঠিক নয়। বরং তোমাদের জন্য এরূপ করা ভালো যে, আজ জুমার দিন নামাজ শেষ হয়ে গেলে তোমরা তোমাদের মতবিরোধের বিষয়টি হুজুর (স.) থেকে সমাধান করে নিতে পার। এরপরেই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাযেল হলো–

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ
وَجَٰهَدَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُۥنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ

---

[১০] সূরা ছা-ফ, আয়াত ১০-১২;

[১১] সূরা নিসা, আয়াত ৬৯

অর্থ: তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানোকে এবং মসজিদের হারামকে আবাদ রাখাকে সেই ব্যক্তির কাজের সমান বিবেচনা করছ? যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক ও কিয়ামতের বিশ্বাস এসেছে এবং আল্লাহ রাস্তায় জিহাদ করেছে? তারা আল্লাহর নিকট সমান নয়। আর যারা অবিবেচক আল্লাহ পাক তদেরকে সুপথ দেখান না। [১২]

হুজুর (সা) এরশাদ করেছেন–

ان مثل المجاهد فى سبيل الله والله اعلم بمن يجاهد فى سبيله كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد

অর্থ খালেছ নিয়তে আল্লাহর পথে জিহাদকারী ব্যক্তির মর্যাদা রোজাদার এবং একাগ্রতা সহকারে রুকু সিজদা এবং কিয়ামকারী নামাযী ব্যক্তি তুল্য। তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে প্রতিপালকরূপে, ইসলামকে ধর্ম এবং মুহাম্মদ (স.)কে রাসূলরূপে মেনে নিয়েছে তার জন্য বেহেস্ত অবধারিত হয়ে গেছে। তিনি বললেন, ইহা রাসূলাল্লাহ কথাটি আবার বলুন সেমতে পুনরায় তিনি হাদিসটি শুনালেন এবং বললেন আরেকটি বিষয় এমন আছে যার উপর আমল করলে আল্লাহ তায়ালা আমলকারীর মর্তবা একশত গুণ বাড়িয়ে দেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী আরজ করলেন ইয়া রাসূলাল্রাহ বিষয়টি কি? হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) এর কাছে ব্যাপারটি খুবই ভালো লাগলো। তিনি বললেন আল্লাহর পথে জিহাদ করা। মহান আল্লাহর বাণী এবং রাসূলুল্লাহ (স.)এর বাণী থেকে উহা প্রতীয়মান হয় যে, মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী এবং শাহাদাত বরনকারী ব্যক্তি মর্যাদা অনেক। কেননা, তিনি ছিলেন একজন খাঁটি মুমিন। পরোপকারী আল্লাহর পথে জিহাদকারী এবং শাহাদাত বরনকারী। মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন। তার রেখে যাওয়া আদর্শ আমরা যেন আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং রাসূলুল্লরাহ (স) এর মহব্বত অর্জন করতে পারি, আল্লাহপাক আমাদের সকলকে যেন সেই তাওফিক দান করেন। [১৩]

---

[১২] সূরা তাওবাহ, আয়াত ১৯;

[১৩] মুকাশাফাতুল ক্বলূব, ইমাম গাযযালী (রহ.)

নবম অধ্যায়

সিলসিলা ও অবদান

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি (রহ.)
উপমহাদেশের কালজয়ী মুসলিম দার্শনিক

মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের পর ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম সমাজে যে সর্বগ্রাসী নৈরাজ্য ও নৈরাশ্য দেখা দেয়, তা থেকে মুসলিম সমাজকে যাঁরা মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভি (রহ.) তাঁদের অন্যতম। তিনি একই সঙ্গে মুসলিম দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, চিন্তানায়ক ও সমাজসংস্কারক ছিলেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) একদিকে যেমন মুসলিম সমাজকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনৈসলামিক অনাচার থেকে রক্ষা করেছিলেন, অন্যদিকে মুসলমানের চিন্তার অসারতা দূর করেছিলেন। তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারা ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে ভারতবর্ষের, বিশেষ করে ভারতীয় মুসলমানের রাজনৈতিক মুক্তির পথ দেখিয়েছিল।

জন্ম ও শিক্ষা : শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভি (রহ.) ১১১৪ হিজরি মোতাবেক ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শাহ আবদুর রহিম (রহ.) ছিলেন সমকালের বিখ্যাত আলেম ও মুসলিম চিন্তাবিদ। সম্রাট আলমগীর সর্বোচ্চ উলামা পরিষদে শাহ আবদুর রহিম (রহ.)-এর নাম অন্তর্ভুক্ত করেন এবং ফাতাওয়ায়ে আলমগিরি সম্পাদনা ও পরিমার্জনের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। পিতার কাছে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.)-এর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। কোরআন-হাদিসের পাশাপাশি তিনি আরবি ও ফারসি ব্যাকরণ ও সাহিত্য, উচ্চতর দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, অধিবিদ্যা, অতীন্দ্রিয়তা ও আইনশাস্ত্রের পাঠ নেন। ১১৩১ হিজরি (১৭১৮ খ্রি.) পিতার ইন্তেকাল হলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায়ে রহিমিয়ার শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ১২ বছর শিক্ষাদান করেন।

মক্কায় গমন ও উপমহাদেশে হাদিসচর্চার বিস্তার : ১১৪৩ বা ১১৪৪ হিজরিতে ২৯ বছর বয়সে তিনি মক্কায় গমন করেন এবং ১১৪৫ বা ১১৪৬ সাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি হজব্রত পালন করেন এবং মক্কা-মদিনার বিশিষ্ট হাদিসবিশারদদের কাছে হাদিসের পাঠ গ্রহণ করেন। দেশে ফিরে তিনি ইলমে হাদিসের পাঠদান ও গ্রন্থ রচনায় মনোযোগ দেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি (রহ.) ভারতীয় উপমহাদেশে ইলম হাদিসচর্চার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। হাদিসচর্চায় তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে 'মুহাদ্দিসে দেহলভি' উপাধি দেওয়া হয়।

দর্শনচর্চার নতুন ধারা : উমাইয়া যুগে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে যখন দর্শনশাস্ত্র যুক্ত হয়, তখন থেকে মুসলিম দার্শনিকদের ভেতর দুটি ধারা সৃষ্টি হয়। এক. যাঁরা পশ্চিমা বা গ্রিক দর্শনের আলোকে ইসলামী বিশ্বাস ও বিধি-বিধানের যৌক্তিকতা ও গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ করতেন, দুই. যাঁরা গ্রিক দর্শনের অনুগামীদের পক্ষ থেকে ইসলামী আকিদা, মূল্যবোধ ও বিধি-বিধানের ওপর উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্ন ও অভিযোগের উত্তর দিতেন। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজালি (রহ.) প্রধানত দ্বিতীয় ধারার দার্শনিক ছিলেন। তিনি তাঁর 'তাহাফাতুল ফালাসিফা' রচনার মাধ্যমে এ ধারাকেই শক্তিশালী করেন। তবে তিনি ইহয়াউ উলুমিদ্দিন রচনার মাধ্যমে মুসলিম দর্শনে তৃতীয় একটি ধারার সূর্যোদয় করেন। তা হলো, গ্রিক বা পশ্চিমা দর্শনের সঙ্গে তুলনা বা সংঘাতে না গিয়ে শরিয়ত ও ইসলামী আকিদা-বিশ্বাসের যৌক্তিকতা ও সৌন্দর্য তুলে ধরা। তবে ইহয়াউল উলুমিদ্দিন গ্রন্থে দর্শন ও সুফিবাদ উভয় শাস্ত্রের প্রতিফলন ঘটায় তার দার্শনিক দিককে চূড়ান্ত বলার অবকাশ নেই। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভি (রহ.) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' রচনা করে ইসলামী বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, বিধি-বিধান ও জীবনব্যবস্থার চূড়ান্ত সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন। যা একই সঙ্গে মানবজাতির প্রতি আল্লাহর ইচ্ছা ও প্রত্যাশার গূঢ় রহস্য যেমন উন্মোচন করেছে, তেমনি এসব বিধি-বিধানের যৌক্তিকতা নিয়ে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছে। এবং তিনি তা করেছেন মানবিক যুক্তি ও ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার সমন্বয়ে।

শিক্ষা সংস্কার : শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.)-এর সময়ে ইসলামী শিক্ষাধারার পাঠক্রমে কোরআন ও হাদিসের স্থান ছিল খুবই সীমিত। কয়েক শতাব্দীকালের প্রাচীন দর্শন ও যুক্তিবিদ্যাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হতো। কোরআনের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা গ্রন্থ ও হাদিসের নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলো পাঠক্রমের বাইরে ছিল। শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) কোরআন-হাদিস তথা নসভিত্তিক জ্ঞানচর্চায় গুরুত্ব দেন এবং উপমহাদেশে হাদিসশাস্ত্রের বিশুদ্ধ ছয় গ্রন্থের সর্বাত্মক পাঠদান শুরু

করেন। নিজে তাফসির (কোরআনের ব্যাখ্যা) ও হাদিসশাস্ত্রের ওপর একাধিক মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। একইভাবে তিনি সম্রাট আলমগীর-পরবর্তী দিল্লির শাসকদের ইসলামের প্রতি উদাসীনতা ও রাজনৈতিক দুর্দশা বিবেচনা করে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার বিপরীতে স্বাধীন ও স্বনির্ভর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এমনকি তিনি নিজের মাদরাসা দিল্লি থেকে শাহজাহানাবাদে সরিয়ে নেন।

বৈপ্লবিক চিন্তাধারা : শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভি (রহ.) ছিলেন উপমহাদেশের মুসলিম পুনর্জাগরণ ও বৈপ্লবিক চিন্তাধারার জনক। তাঁর সন্তান ও শিষ্যরাই পরবর্তী সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি প্রথাগত কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করেননি; বরং একটি বৈপ্লবিক চিন্তাধারার জন্ম দিয়েছিলেন। শাসকগোষ্ঠীর অভিপ্রায় এবং স্থানীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাবে উপমহাদেশে ইসলাম তার সর্বজনীন রূপ হারিয়ে প্রথাসর্বস্ব আচারে পরিণত হয়েছিল। শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) তাঁর লেখনীর মাধ্যমে 'ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন বিধান' চিরায়ত এ সত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর চিন্তার পুনর্গঠনে মনোযোগ দেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানকে এমন যুক্তিগ্রাহ্যভাবে ঢেলে সাজাতে প্রয়াসী ছিলেন, যার মাধ্যমে ইসলামী বিধি-ব্যবস্থার মূল রহস্য, তথ্য ও দার্শনিক দিক সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং মুসলিম পুনর্জাগরণ ও ইসলামী রাজনীতির অভ্যুদয় ঘটে। তাঁর লেখায় উম্মাহর রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক মুক্তি ও সমৃদ্ধি এবং সমাজিক উন্নয়নের যাবতীয় উপকরণ সম্পর্কে পথনির্দেশ রয়েছে।

সংস্কার ও চিন্তাধারার প্রভাব : শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি (রহ.)-এর সংস্কার আন্দোলন ও বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রভাব দুই ভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। এক. দারুল উলুম দেওবন্দের মতো স্বনির্ভর ও স্বাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল, যার হাত ধরে উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা পুনর্জীবন লাভ করেছিল, দুই. ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে শাহ আবদুল আজিজ, শাহ ইসমাইল শহিদ, সাইয়েদ আহমদ শহিদ, কাসেম নানুতভি (রহ.)-এর মতো অকুতোভয় সেনাপতির জন্ম দিয়েছিল। মূলত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.)-এর ছেলে ও চিন্তার উত্তরাধিকারী শাহ আবদুল আজিজ (রহ.)-এর ঐতিহাসিক ফতোয়ার মাধ্যমে উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। তিনি ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' বা শত্রু কবলিত অঞ্চল ঘোষণা করেন এবং ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরজ বলে ফতোয়া দেন।

মৃত্যু : শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভি (রহ.) ২৯ সফর ১১৭৬ হিজরি ইন্তেকাল করেন এবং শাহজাহানাবাদে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর পাঁচ ছেলের মধ্যে শাহ আবদুল আজিজ (রহ.) পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.)-এর প্রায় ৪৩ টি বইয়ের নাম পাওয়া যায়। এর মধ্যে ফাতহুর রহমান, ফাউজুল কাবির, ফাতহুল কাবির, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, আরবাইন, ইজালাতুল খিফা অন্যতম।

তথ্যসূত্র : দার্শনিক শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি ও তাঁর চিন্তাধারা, আখতার ফারুক (রহ.) অনূদিত হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ-এর ভূমিকা

শাহ্ আব্দুল আযীয দিহ্লবী : জীবন ও চিন্তাধারা

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ

ভূমিকা

শাহ্ আব্দুল আযীয দিহ্লবী (১১৫৯/১৭৪৬-১২৩৯/১৮২৪) ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ ইসলামি চিন্তাবিদ, তাফসির-হাদিস-ফিকহ তথা ইসলামি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সুপণ্ডিত, আধ্যাত্মিক নেতা, মহান সমাজ-সংস্কারক, রাজনীতিবিদ, বিপ্লবী নেতা, ইংরেজবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপনকারী মহান ব্যক্তিত্ব। উপমহাদেশের এক ঐতিহাসিক যুগ সন্ধিক্ষণে তাঁর জন্ম হয়। তখন এই উপমহাদেশের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল খুবই বিপর্যস্ত। ধর্মীয় কুসংস্কার, আধ্যাত্মিক চর্চার নামে ইসলাম অসমর্থিত নানারূপ কর্মকাণ্ড, আলিম সমাজের কুর'আন-হাদিস চর্চা বাদ দিয়ে দর্শন ও কালাম শাস্ত্রচর্চা এবং ফিকহের খুঁটিনাটি মতবিরোধে নিয়ে ফিরকাবন্দীর বিভ্রান্তিমুলক ঝগড়া ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়া ছিল তৎকালীন সময়ের উপমহাদেশের মূল ক্ষমতা হস্তগত করে উপমহাদেশবাসীর বুকে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে। এ সময় সামাজিক অস্থিরতা, অন্যায় অবিচার, জুলুম নির্যাতন, নিরাপত্তাহীনতা, বিশৃঙ্খলা, অনৈক্য সাধারণভাবে সমাজ কাঠামোর রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুরারোগ্য ব্যধির মত ছড়িয়ে পড়েছিল। মুজাদ্দিদ আলফেসানী শায়খ আহমদ সিরহিন্দী (মৃ. ১০৩৪/১৬২৪) অতঃপর শাহ্ ওলীউল্লাহ দিহ্লবী অব্যাহত সংস্কার কর্মসূচির মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে যে কর্মযজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন ঐতিহাসিক প্রয়োজনে শাহ্ আব্দুল আযীয দিহলবী তাতে নতুন মাত্রা যোগ করে কালোত্তীর্ণ অবদান রাখার প্রয়াস পেয়েছিরেলন। বক্ষমান নিবন্ধে শাহ্ আব্দুল আযীয দিহলবীর জীবন ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

জন্ম ও শিক্ষা

শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয মোগল সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের শাসনামলে ২৫ রমযান, ১১৫৯ হিজরী/১১ অক্টোবর, ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে জন্মলাভ করেন। [২৬৭]

---

[২৬৮]. শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয, *মালফুজাত-ই-আযীযিয়্যা*, (উর্দূ অনুবাদ) করাচী, ১৯৬০ খ্রি., পৃ. ৮, ২০২ -এ জন্ম তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে ১১৫৯ হিজরীর ২৫ রমযান, বৃহস্পতিবার। এ. ডি.

আবজাদ হিসেবে গোলাম হালীম (غلم حليم) বাক্য দ্বারা তাঁর জন্মতারিখ নির্ণয় করা যায়।[২৬৮] শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয নিজ প্রণীত 'তুহফা-ই-ইসনা 'আশারিয়্যা' গ্রন্থে এ নামটিরই উল্লেখ করেছেন।[২৬৯] বিশ্বখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ মহামনীষী শাহ্ ওলীউল্লাহ্ দিহলবী (১১১৪/১৭০৩ -১১৭৬/১৭৬২) ছিলেন তাঁর মহান পিতা এবং মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়কালের উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিম-ফিকহবিদ, *ফাতওয়া আলমগীরি* সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য শাহ্ আব্দুর রহীম (১০৫৪/১৬৪৪-১১৩১/১৭১৯) ছিলেন তাঁর পিতামহ। শাহ্ ওলীউল্লাহর ছিল চার পুত্র। শাহ্ আব্দুল আযীয ছিলেন সবার বড়। অন্যরা হলেন- শাহ্ রফীউদ্দীন (১১৬৩/১৭৫০-১২৩৩/১৮১৮), শাহ্ আব্দুল কাদির (১১৬৭/১৭৫৩-১২৩০/১৮১৬) এবং শাহ্ আব্দুল গণী (১১৭০/১৭৫৬-১২১৭/১৮১২)।

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তিনি নিজ বাড়ীতেই মহান পিতার তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। বাল্যকালেই পবিত্র কুর'আন মুখস্থর পর এগার বছর বয়সে তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয়। মাত্র দু'বছরেই তিনি 'আরবী ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে বিস্ময়কর দক্ষতা লাভ করেন। তিনি ছিলেন আসাধারণ মেধা ও ধী-শক্তির অধিকারী।[২৭০] তাঁর শিক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিলেন মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ 'আশিক বিন 'উবায়দুল্লাহ ফুলতী, মাওলানা খাজা মুহাম্মদ আমীন কাশ্মিরী এবং শায়খ নূরুল্লাহ বোরহানুবী প্রমুখ বিখ্যাত 'আলিমগণ। তাঁদের নিকট থেকে তিনি প্রথমে ফার্সী, ও আরবি ব্যাকরণ শিক্ষা লাভ করেন। পরে তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসূল, মান্তিক, কালাম, 'আক্বাঈদ, অংক, জ্যোতির্বিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। একই সাথে স্বীয় পিতার নিকট শরী'আত ও মা'রিফাতের সর্বোচ্চ শিক্ষাও লাভ করেন।[২৭১]

মুজতার -এর বর্ণনা অনুযায়ী জন্ম তারিখ ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের ১১ তারিখ মঙ্গলবার, (A. D. Muztar, *Shah Wali Allah*, Islamabaফ: ১৯৭৯ চ. ১৯৩)

২৬৮. মাওলানা মুহাম্মদ রহীম বক্স, *হায়াত-ই-ওলী*, (দিল্লী, ১৩১৯ হি.) পৃ. ৩২০;

২৬৯. শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয দিহলবী, *তুহফা-ই-ইসনা আশারিয়্যা*, (লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯০৫ খ্রি.), পৃ. ২

২৭০. শাহ্ আব্দুল আযীয, *উজালা-ই-নাফিয়াহ*, (করাচী, ১৯৬৪ খ্রি.) পৃ. ১৭-১৮; মাওলানা মিয়া মুহাম্মদ, *উলামা-ই-হিন্দকা শানদার মাযী*, দিল্লী: ১৯৬০খ্রি. ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৮

২৭১. মাওলানা মুহাম্মদ রহীম বক্স, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২

অধ্যাপনা

শাহ আব্দুল আযীয অত্যন্ত সফলতার সাথে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে রহীমিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনা পেশায় নিয়োজিত হন। এমনকি ছাত্র থাকা অবস্থায়ই তিনি পাঠ গ্রহণের ফাঁকে ফাঁকে রহীমিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা কার্যেও আত্মনিয়োগ করেন। সকল বিষয়ে শিক্ষাদান করলেও তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল পবিত্র কুরআনের তাফসীর ও হাদীসের প্রতি।

তাঁর পিতা শাহ ওয়ালী উল্লাহর ইন্তিকালের (১৭৬২ খ্রি.) পর রহীমিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং আমৃত্যু এ দায়িত্ব পালন করে যান। রহীমিয়া মাদ্রাসায় তাঁর শিক্ষাদানের খ্যাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ দূরদূরান্ত হতে এসে তাঁর নিকট ইলম হাসিল করতে সক্ষম হতেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে তাঁর ভাই শাহ আব্দুল কাদির, শাহ রফী উদ্দিন, শাহ আব্দুল গনী, জামাতা মাওলানা আব্দুল হাই, মুফতী ইলাহী বখশ কান্ধলভী, সাইয়্যেদ কামরুদ্দিন সোনীপতী, হযরত মীর্যা মাযহার জানে জানান (র.)-এর খলীফা শাহ এবং সাইয়্যেদ কুতবুদ্দিন মাওলানা মুহাম্মদ ওয়াজিহ রায়বেরেলবী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[১৯]

অধ্যাপনার বাইরে শাহ আব্দুল আযীয নিয়মিত তাফসীর মাহফিল করতেন। তাঁর দৌহিত্র শাহ মুহাম্মদ ইসহাক ছিল অবশ্যই তিনিই তাঁর তাফসীর মাহফিলের কারী ছিলেন। তিনি প্রথমে কুরআনের এক রুকু তিলাওয়াত করতেন আর শাহ সাহেব তাঁর তাফসীর বর্ণনা করতেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহরও একই রীতি ছিল। শাহ ওয়ালী উল্লাহ সর্বশেষ তাফসীরের দারস দিয়েছিলেন পবিত্র কুরআনের [illegible] সূরার [illegible] আয়াত পর্যন্ত। তাঁর ইন্তিকালের পর শাহ আব্দুল আযীয এ আয়াতের পর থেকে শুরু করেন এবং পবিত্র কুরআনের ৪র্থ সূরার ১০ নং আয়াত পর্যন্ত সর্বশেষ পাঠদান করেন। এরপর তাঁর ইন্তিকাল হলে তাঁর দৌহিত্র মুহাম্মদ ইসহাক তাফসীর পাঠদান করেন।[২০]

শাহ ওয়ালী উল্লাহ যখন ইন্তিকাল করেন, তখন শাহ আব্দুল আযীয ছিলেন ষোল বছর বয়সের একজন যুবক। এ সময় শাহ ওয়ালী উল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় পরিষদ শাহ আব্দুল আযীযকে ইমাম বা নেতা মেনে নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এরপর তাঁর দ্বারা উপমহাদেশের কুরআন-হাদীসের তথা ইসলামী

---

১৯. শাহ আব্দুল আযীযের ছাত্রদের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখা যেতে পারে, মুহাম্মদ ইকবাল হিন্দুস্তানী মাও ফিরোজী, আল-ইসলামিয়্যা-জামী, দিল্লী, ১৯৬৪ খ্রি. পৃ. ৭৫-৭৯

২০. মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী, তারীখ-ই-দাওয়াত ওয়া আযীমাত (লাখনৌ: লাক্ষ্ণৌ, ১৯৮৩) ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯

শিক্ষার এত ব্যাপক প্রসার হয়েছিল যে, উপমহাদেশে এমন কোন দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্র নেই, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত ছিল না। এমনকি এশিয়ার অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রেও তাঁর শিক্ষার আলোকছটা ছড়িয়ে পড়েছিল।[২৭৪]

ধর্মীয় চিন্তাধারা

শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন ছিল মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগ। ভারতীয় মুসলিম রাজত্বের অধঃপতনের ধারাবাহিক চিত্র ও ভারতের মুসলিম আধিপত্য ক্ষুণ্ন হবার মূল কারণ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু থেকেই তার মন-মগজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তিনি মুসলমানদের মুক্তির উপায় খুঁজছিলেন। অবশেষে তিনি এমন এক পন্থা অবলম্বন করলেন যার ফলে তিনি উপমহাদেশের মুসলমানদের অন্তরে চিরদিন অমর ও পরম শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে বিরাজ করবেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি প্রথম তাঁর মহান পিতার দর্শন মুতাবিক ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এর পূর্বশর্ত হিসেবে মুসলমানদের ইসলামী জীবনবোধের সঠিক তাৎপর্য অনুধাবন করার ব্যাপারে উদ্যোগী হন। তিনি দিল্লীস্থ পৈতৃক শিক্ষাদান কেন্দ্রের মাধ্যমেই এ কাজ শুরু করেন। এটা ছিল সত্যিকার অর্থে শাহ্ ওলী উল্লাহর দর্শন ও শিক্ষার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। শাহ্ 'আব্দুল 'আযীযের পিতামহ শাহ্ 'আব্দুর রহীম প্রতিষ্ঠিত "রহীমিয়া মাদ্রাসায়" ছাত্র সংকুলান হচ্ছিল না দেখে সম্রাট মুহাম্মদ শাহ্ মহামনীষী শাহ ওলী উল্লাহকে দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য এই সরকারী ভবনটি ওয়াক্ফ করেছিলেন।[২৭৫]

নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী পুর্নজাগণের এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মূলনীতি হিসেবে যেসব বিষয় গৃহীত হয়েছিল, তা হচ্ছে,

১. কুর'আন -সুন্নাহর শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও শাহ্ ওলী উল্লাহর চিন্তাধারাকে সর্বান্তকরণে উপলদ্ধি করা।
২. আল্লাহর ভীতি ও আদর্শ জীবন গঠনের প্রেরণা সৃষ্টি করা।
৩. রাজতন্ত্র ও সরকার তোষণ মনোভাব মন-মস্তিস্ক থেকে দূর করা এবং ইসলামী বিপ্লবকে পরিপূর্ণভাবে জয়যুক্ত করার জন্য মানুষের মধ্যে ত্যাগের প্রেরণা সৃষ্টি করা।
৪. সমাজসেবা ও দুস্থ মানবতার প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করা।
৫. রাজকীয় বিলাসিতা পরিহার করে সহজ-সরল জীবন যাপন করা।

---

[২৭৪]. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, দার্শনিক শাহ্ ওলী উল্লাহ্ দেহলভী (রহ.) ও তাঁর চিন্তাধারা, (আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকাঃ ১৯৯৪ খ্রি.) পৃ. ৫৬-৫৭

[২৭৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

৬. ত্যাগী ভাবধারা সৃষ্টি করা এবং যে কোন দুর্যোগ মুহূর্তে ধৈর্য ও সহনশীলতার অনুশীলন করা।

৭. সমাজ-বিধ্বংসী সকল প্রকার অনাচার, কুসংস্কার ও রীতিনীতি উৎখাতের চেষ্টা করা এবং বিলাসিতার আখড়াসমূহের উচ্ছেদ করা, যা সমাজকে আরামপ্রিয় ও দুর্বল করে তোলে।[২৭৬]

গ্রন্থ রচনা

শাহ্ ওলী উল্লাহর চিন্তাধারার সঙ্গে শিক্ষিত সমাজকে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু করেন। তিনি যেমন ছিলেন একজন সুবক্তা, তেমনি ছিলেন সুলেখক। পিতার ন্যায় আল্লাহ্প্রদত্ত লেখনীশক্তি ছিল তাঁর। তিনি তাফসীর, হাদীস, ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেকগুলো মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। জনসাধারণের বোঝার সুবিধার জন্য তিনি শাহ্ ওলী উল্লাহর দর্শন বিষয়ক গ্রন্থাবলীর ব্যাখ্যায়ও অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচনাবলীর বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

১. *তাফসীরু ফাতহিল 'আযীয :* সাধারণত ঃ 'তাফসীর 'আযীযী' নামে পরিচিত। প্রথম খন্ড শুরু হতে ২য় পারার এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত। ২য় ও ৩য় খন্ড শেষ দুই পারার তাফসীর। (প্রথম প্রকাশ: কলিকাতা, ১২৪৮হিঃ/১৮৩৩ খ্রি.)। এর উর্দূ অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।[২৭৭]

শাহ্ ওলী উল্লাহ্ কর্তৃক লিখিত 'তাফসীর-ই-ফাতহুর রহমান' সাধারণের বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয 'তাফসীর-ই-'আযীয' প্রণয়ন করেন।

২. *'তুহফা-ইসনা 'আশারিয়্যা':* ১২০৪ হিজরী সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। মাকতাবা' সামারহিন্দ, লক্ষ্ণৌ হতে ১৮৭৯ ও ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনঃপ্রকাশিত হয়। আরকটের নবাব এটাকে আরবীতে অনুবাদ করিয়ে আরবদেশে প্রেরণ করেছিলেন।[২৭৮]

শী'আ সম্প্রদায় খুলাফা-ই-রাশেদার প্রথম দুই খলিফা আবূ বকর (রা)ও হযরত 'উমর (রা) এবং তাঁদের খিলাফতের প্রতি যেসব অভিযোগ করেছিল, সেগুলোর প্রতিবাদে শাহ্ ওলী উল্লাহ তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ইযালাতুল খাফা' প্রণয়ন করেন। শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয তাঁর ভূমিকাস্বরূপ '*তুহফা-ই-ইসনা 'আশারিয়্যা*' লিখেন। শী'আগণ

---

[২৭৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

[২৭৭]. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৮

[২৭৮]. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড,পৃ. ৪৭৮

কুর'আনের প্রকৃত তাৎপর্য উদ্ধারের জন্য ইমাম মাহদীর আবির্ভাব অপরিহার্য বলে প্রচার করে বেড়াতো। তারা ইমাম মাহদীর আগমনের ব্যাপারে অদ্ভুত সব কাহিনী সৃষ্টি করেছিল। শী'আদের এই প্রচারণার ফলে মুসলমানগণ কুর'আনের ব্যাপক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়। এদিকে ইসনা 'আশারিয়্যা দল ইমাম 'আব্দুল 'আযীযের যুগে উত্তর ভারতে তাঁদের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাদের প্রচারের সংক্রমণ থেকে মুসলিম জনসাধানকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই শাহ্'আব্দুল 'আযীয এ গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর এ গ্রন্থ ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।[২৭৯]

৩. *বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন :* হাদীস সর্ম্পকিত গ্রন্থ। দিল্লী, ১৮৭৬, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে, লাহোর ১৮৯৩ ও ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর উর্দূ অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।[২৮০]

৪. *আল-'উজালা-আল-নাফি'আ :* ফারসী ভাষায় রচিত উসূল-ই-হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ। মাকতাবা' মুজাতবায়ী, দিল্লী, ১২১২ হিজরী (১৭৯৮ খ্রি.) সনে প্রকাশিত হয়।

৫. *সিররুশ্ শাহাদাতায়ন :* ইমাম হাসান ও হুসাইনের শাহাদাতের বিবরণ গ্রন্থ। দিল্লী, ১২৬১ হিজরীতে (১৮৪৬ খ্রি.) প্রকাশিত। সাইয়্যেদ আলী আকবর 'ইজহারুস সায়াদা' নামে এর একটি ফার্সী অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। তাঁর একজন শিষ্য মৌলভী সালামাতুল্লাহ দামিস্কী "তাহরীরুশ শাহাদাতায়ন" নামে এর একটি ফার্সী ভাষ্য ১২৯৯ হিজরীতে (১৮৮২ খ্রি.) প্রকাশ কারেন। এর হস্তলিপির কপি আলীগড় এবং বাকীপুরে সংরক্ষিত আছে।[২৮১]

৬. *আযীযুল ইকতিবাস ফী ফাদাইলি আখিয়ারিন্নাস :* (খুলাফা-ই-রাশেদার ফযীলত সম্বলিত হাদীস ও ঐতিহাসিক বিবরণের সংকলন) দিল্লী, ১৩২২ হিজরী (১৯০৫ খ্রি.) সনে প্রকাশিত হয়। এর হস্তলিখিত কপি রামপুর এবং আসাফিয়ায় সংরক্ষিত আছে। এর ফার্সী ও উর্দূ অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।[২৮২]

৭. *মীযানুল কালাম :* গ্রন্থখানি মীযানুল 'আক্বাইদ নামেও খ্যাত। কালাম শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ। দিল্লী, ১৩২১ হিজরী (১৯০৪খ্রি.) সনে প্রকাশিত হয়।

৮. *ফাতাওয়া-ই-'আযীযী (ফার্সী) :* দুই খণ্ড (দিল্লী, ১৩৪১ হিঃ/১৯২৩ খ্রি.)। এতে "সাওয়ালাত আশারা" এবং কতিপয় পুস্তিকাও সংযোজিত হয়েছে। এর প্রথম খন্ডের উর্দূ অনুবাদ মৌলবী নওয়াব 'আলী এবং মৌলবী 'আব্দুল জলীল (১৩১৩ হিঃ/ ১৮৯৬ খ্রি.) হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য হতে প্রকাশ করেন।

---

[২৭৯]. শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ ও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭

[২৮০]. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৮

[২৮১]. প্রাগুক্ত

[২৮২]. প্রাগুক্ত

৯. *রাসাইল খামসা (ফার্সী)* : এর কোন কোন পুস্তিকায় ফাতাওয়া সংকলিত হয়েছে।

১০. *তা'বীরুর রুয়া* : ফার্সী ভাষায় স্বপ্ন সম্পর্কে রচিত।

১১. *মালফুজাত শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয (ফার্সী)* : মাকতাবা' মুজতাবায়ী, মীরাঠ, কর্তৃক ১৩১৪ হিজরী (১৮৯৭ খ্রীঃ) সনে প্রকাশিত হয়। এর উর্দূ অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ করেন মুহাম্মদ আলী লুতফী ও মুফতী ইন্তেজামুল্লাহ শিহাবী।

মাওলানা মুহাম্মদ রহীম বক্স *হায়াত-ই-ওলী* গ্রন্থে *শারহ মীযানুল মানতিক* এবং *হাওয়াশি-ই-বাদীউল মীযান* -এর নামের উল্লেখ রয়েছে। তদুপরি *তাযকারী-ই-'আযীযিয়্যা* গ্রন্থে মীযানুল বালাগাত -এর উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এর প্রকাশ সম্বন্ধে জানা যায় নি। [২৮৩]

শাহ্ 'আব্দুর 'আযীযের এসব লেখনী জনমনে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়। কেননা, তিনি তাঁর মরহুম পিতার উপদেশ অনুযায়ী তৎকালীন পুঁজিবাদী এবং স্বৈরাচারী সাম্রাজ্যবাদীর অভিশাপের মুখোশ এমনভাবে উন্মোচন করেন যে, সমাজের উচ্চস্তরের যারা সৎপ্রকৃতির ছিলেন, তাঁরা সহজেই তাঁর কুফল সম্পর্কে অবহিত হতে পেরেছিলন।

সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা

মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর এবং শাহ্জাহানের সমৃদ্ধির কাল থেকে চলে আসা বিলাসিতা এবং অনাচার থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয কর্তৃক শিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত তরুণদল উঠেপড়ে লেগেছিল। অবশ্য তখন রাজত্ব এবং সমৃদ্ধি কোনটাই অবশিষ্ট ছিল না। চারদিকে অভাব ও দারিদ্র। ফলে, অভিজাত শ্রেণীর লোকদের মনোবল ভেঙ্গে গিয়েছিল। এ সময় শাহ্ ওলী উল্লাহর চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ যুবক শ্রেণী অদম্য উৎসাহে কাজে নেমেছিলেন। নতুন চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত পরিবারগুলোর মহিলারাও ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। তাদের ত্যাগের ফলেই হাজার হাজার মুজাহিদ দশ বছর ধরে শুধু রুটি খেয়ে জীবন ধারণ করেছেন, তবুও অশুভ শক্তির মাথা নত করেন নি। [২৮৪]

তখন ধনীক শ্রেণী বিশেষ করে দুশ্চরিত্র যুবকদের বেপরোয়া উচ্ছৃংখল জীবনযাত্রার ফলে অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। পরবর্তীকালে স্যার সাইয়্যেদ আহমদ শহীদের নেতৃত্বে বিলাস ও ঐশ্বর্যের কোলে লালিত-পালিত অভিজাত

---

২৮৩. ইমাম ফাদল খায়রাবাদী, *তারাজিমুল ফুদালা*, করাচী, পাকিস্তান, পৃ. ৪৬ হতে উদ্ধৃত, ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৮

২৮৪. *শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ ও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

পরিবারের যুবকগণও সিন্ধুর পথে কাবুল এবং কান্দাহার হয়ে পেশোয়ার পৌঁছেছিলেন। দুর্গম পর্বত ও অরণ্য পথে জিহাদ করতে এবং শহীদ হতে যে তাঁরা প্রস্তুত হয়েছিলেন, তাঁর পেছনে ছিল শাহ্ 'আব্দুল 'আযীযের শিক্ষা ও সংগঠন। এসব শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে মাওলানা বেলায়াত 'আলী 'আযীমাবাদীর নাম উল্লেখযোগ্য। এই সংস্কার আন্দোলনকে বেগবান ও বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয এসব শিক্ষিত যুবকদের নিয়ে একটি কেন্দ্রিয় পরিষদ গঠন করেছিলেন, যার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন তাঁর তিন ভাই শাহ্ রাফী উদ্দিন, শাহ্ 'আব্দুল কাদির এবং শাহ্ 'আব্দুল গণী। এজন্য দিল্লীর অধিবাসীগণ শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয এবং তাঁর ভাইদেরকে উদ্দেশ্যে করেই *হাযারাত-এ-সালাসা* বা হযরতত্রয় বলতেন। এভাবে গঠিত কেন্দ্রীয় পরিষদের যুবকদের দ্বারা আর একটি পরিষদ গঠিত হয়েছিল তাঁদের পৃষ্ঠপোষক তিন/চারজন প্রধান ছিলেন। তাঁরা ছিলেন মাওলানা ইসমাঈল শহীদ, মাওলানা 'আব্দুল হাই, মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক এবং মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব। সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ এই দলের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। বিশিষ্টজনের সমন্বয়ে সংগঠন এভাবে তৈরী হয়ে যাওয়ার পর শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন ব্যাপক করে তোলার উদ্দেশ্যে জনসভায় বক্তৃতা করতেন। জীবনের শেষ অবধি তিনি এ কাজেই ব্যাপৃত ছিলেন। [২৮৫]

যুবক বয়স থেকেই শাহ 'আব্দুল 'আযীয খুবই পরিচ্ছন্ন ও প্রাঞ্জল আলোচনা-রীতিতে পারঙ্গম ছিলেন। কোনো কঠিন বিষয়কে তিনি এমন সুন্দর ও সহজভাবে উপস্থাপন করতেন যে, পণ্ডিত ব্যক্তিগণও আশ্চর্য হয়ে যেতেন। [২৮৬] পিতার মৃত্যুর পর তিনি ষোল বছর বয়সে অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহন করেন। তখন হতে আমৃত্যু তিনি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, রচনা ও সংকলন, তাবলীগ ও মুরিদগণের তা'লীম এবং শিষ্যদের সাধনা পরিচালনায় ব্যাপৃত থাকতেন। [২৮৭] তিনি অসাধারণ স্বরণশক্তির অধিকারী ছিলেন। কোন বিষয়ের উপর অনেক অপরিচিত গ্রন্থাদির সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। আধ্যাত্মিক বিষয়ে তিনি যখন বক্তৃতা করতেন তখন মনে হত যেন বিক্ষুব্ধ সাগরে উর্মিমালা আছড়ে পড়ছে। মসলিশে বক্তৃতা করলে উপস্থিত শ্রোতামন্ডলী বিমুগ্ধ হয়ে যেত। আল্লাহর নূরে তাদের হৃদয় আলোকিত হয়ে যেত। [২৮৮]

---

[২৮৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫১

[২৮৬]. মাওলানা মুহাম্মদ রহীম বক্স, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২

[২৮৭]. সিদ্দিক হাসান খান, *ইতহাফুন নুবালা*, (মাতবা' কানপুর, ১২৮৮ হিঃ) পৃ. ২৯৬ হতে উদ্ধৃত, ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৭

[২৮৮]. মাওলানা মুহাম্মদ রহীম বক্স, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬

সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবার এবং জুম'আর দিন দিল্লীর কুচাচিলান মাদ্রাসায় ওয়াজ মাহফিলের অনুষ্ঠান হতো। সভায় সম্ভ্রান্ত, বিশিষ্ট এবং সাধারণ লোক সকলেই দলে দলে যোগদান করতেন। শাহ্ 'আব্দুল 'আযীযের বর্ণনাভংগী এমন চমৎকার ছিল যে, দলমত নির্বিশেষে সকলেই তাঁর সভা থেকে সন্তুষ্টচিত্তে ফিরতেন। কেউ মনঃক্ষুণ্ন হয়ে ফিরতেন না। এ মাহফিল অনুষ্ঠানের নিয়মও এমন নিষ্ঠার সাথে তিনি পালন করতে যে, গুরুতর অসুস্থ অবস্থায়ও মাহফিলের নির্দিষ্ট তারিখে তাঁকে শয্যা থেকে তুলে দিতে বলতেন এবং ওয়াজ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যকারীদের দূরে সরে থাকার নির্দেশ দিতেন। তিনি স্বচ্ছন্দে ওয়াজ করে যেতেন। অসুস্থতাজনিত দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও দৃঢ়তা এবং স্থিরতার কোন অভাব দেখা যেত না তাঁর মধ্যে তার এক নিয়মিত বক্তৃতায় জনসাধারণের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। তারা সজাগ হয়। বক্তৃতার মাধ্যমে জনমতকে কিভাবে সংগঠিত করা যায়, বিশিষ্ট শ্রেণীর লোকেরা তা দেখতে পায়। এভাবে শিক্ষা এবং দীক্ষা গ্রহন করার পর বিশিষ্ট শ্রেণীর লোকেরা উপমহাদেশের সর্বত্র এ আন্দোলনের মর্মকথা নিয়ে ছড়িয়ে পড়েন। সে যুগেরই একজন বিশিষ্ট 'আলিম সারা উপমহাদেশ ভ্রমণ করেও এমন একজন 'আলিমের সাক্ষাত পাননি, যিনি শাহ্ 'আব্দুল 'আযীযের শিষ্য ছিলেন না। [২৮৯]

ওয়াজ এবং বক্তৃতার এই সাধারণ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শাহ্ আব্দুল 'আযীয কর্তৃক গঠিত কেন্দ্রীয় উভয় পরিষদের সদস্যগণ তাঁরই নির্ধারিত নীতি এবং আদর্শের ভিত্তিতে উচ্চ এবং সাধারণ শ্রেণীকে সচেতন এবং সংগঠিত করে তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পুস্তক রচনা করেছিলেন। বিশিষ্ট লোকদের জন্য মাওলানা রাফী উদ্দীন *আসরারুল মুহাব্বত* এবং *তাকমীলুল আযহান* প্রণয়ন করেছিলেন। এ ছাড়াও ছোট ছোট অনেক পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। সেগুলো ছিল মূলত: সবই শাহ্ ওলী উল্লাহর চিন্তাধারার ব্যাখ্যা -বিশ্লেষণ। [২৯০]

সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা

১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীর ক্ষমতায় আরোহণ করেন। মোঘল শাসন ব্যবস্থা তখন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। তিনি দিল্লীর সিংহাসনে প্রভাবশালী আমীরদের হাতের পুতুলে পরিণত হন। বিভিন্ন প্রদেশ এক এক করে দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের হাতছাড়া হয়ে যায়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.) পর থেকেই মোঘল সাম্রাজ্যে ফাটল ধরতে থাকে। তাঁর মৃত্যুর পর

---

[২৮৯]. সাইয়্যেদ মাহবুব রিযবী, তারীখে দারুল 'উলুম দেওবন্দ, ইদারায়ে ইহতিমাম, ভারত- ১৯৯২, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৪

[২৯০]. শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ ও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫২

মোগলদের চিরাচরিত উত্তরাধিকার সংঘর্ষে শাহজাদা মুয়াজ্জম তথা প্রথম বাহাদুর শাহ্ বিজয়ী হয়ে পাঁচ বছর রাজত্ব করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের পর ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ স্বল্পকালের জন্য দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন- (১) প্রথম বাহাদুর শাহ্, (২) মুঈজ্জদ্দীন জাহাদার শাহ্, (৩) ফররুখ সিয়ার, (৪) রাফি উদ্দারাজাত, (৫) রাফি উদ্দৌলা, (৬) মুহাম্মদ শাহ্, (৭) আহমাদ শাহ্, (৮) দ্বিতীয় আলমগীর, (৯) শাহে আলম, (১০) দ্বিতীয় আকবর এবং (১১) সম্রাট বাহাদুর শাহ্ জা'ফর। তাঁদের মধ্যে মুহাম্মদ শাহ্ দ্বিতীয় আলমগীর এবং শাহে আলমের সম্রাট জীবনই অধিকতর স্থায়ী ছিল। এদের সবাই শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে দুর্বল ও অকর্মণ্য সম্রাট ছিলেন এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত উজীর ও আমীর- 'উমারার ক্রীড়নক ছিলেন।[২৯১]

শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয দ্বিতীয় আলমগীর হতে সম্রাট শাহে আলমের যুগের (১৭৪১-১৮০৬ খ্রি.) পরেও ছয় বছর এদেশের মুসলিম রাজত্বের পরিণতি দেখেছেন। এদের রাজত্বকালে বাংলা, অযোধ্যা এবং দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদের শাসকগণ কার্যত স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করেন। মুসলমান আমীরগণ কেউ ভারতীয়, কেউ ইরানী এবং কেউ তুরানী মোগল ছিলেন। তাদের মধ্যে শি'আ-সুন্নী বিরোধও ছিল প্রকট। তাঁদের পরস্পরের উপর প্রাধান্য লাভের প্রতিযোগিতা সাম্রাজ্যেকে আরো দুর্বল করেছিলো। মারাঠাদের অভ্যুত্থান, শিখ ও জাঠদের শক্তি মোগল সাম্রাজ্যর অস্তিত্বকে অধিক বিপন্ন করে তুলেছিলো। দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিজামুল মুলক আসফ জাহ মারাঠাদের সহায়তায় অযোধ্যার শাসক মীর মুহাম্মদ আমীন বুরহানুল মুলক নওয়াব সায়াদাত খাঁকে ডিঙ্গিয়ে কেন্দ্রীয় শাসক সম্রাট মুহাম্মদ শাহের উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হলে সায়াদাত খাঁ ও অন্যান্য শি'আ কর্মচারী প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে ইরান থেকে নাদির শাহকে দিল্লী আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান। নাদির শাহ্ ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে সর্বশেষ প্রচণ্ড আক্রমণ করে কাবুল, সিন্ধু ও পাঞ্জাবের কিয়দংশ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন। অভ্যন্তরীণ এসব গোলযোগের সুযোগ নেয়ার জন্য ইংরেজ বেনিয়ারা ওৎ পেতে বসেছিল। তাঁরা ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে নবাব সিরাজ উদ্দৌলাকে পরাজিত ও নিহত করে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা দখল করে নেয়।[২৯২]

শিখ ও মারাঠাদের অমানবিক জুলুম-নির্যাতনে মুসলমানদের অস্তিত্ব বিপন্ন হলেও এই জুলুম থেকে মুসলমানদের রক্ষার কোন ক্ষমতাই সম্রাটদের ছিল না। ফলে বিষয়টি সবাইকে ভাবিয়ে তুলল। খোদ আমীরুল উমারাও অস্থির ছিলেন। এ অবস্থায় শাহী দরবারের প্রধান কর্মকর্তা হযরত শাহ ওলী উল্লাহর ভাবশিষ্য

---

[২৯১]. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

[২৯২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

নওয়াব নাজীবুদ্দৌলাহ আহমদ শাহ্ আবদালীকে কান্দাহার থেকে ডেকে আনেন। আহমদ শাহ্ ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দ পানিপথের সর্বশেষ যুদ্ধে মারাঠাদের ভীষণভাবে পরাজিত করেন। বিজয়ী আবদালী মারাঠা শত্রুদের দমন করে মোগল সাম্রাজ্যকে ইসলামপ্রিয় রুহীলা পাঠান নেতাদের (শাহ্ 'আব্দুল, সুজা উদ্দৌলা, নাজিব উদ্দৌলা) হাতে দিলেও তৎকালীন অযোগ্য মোগল সম্রাট তার থেকে কোনরূপ লাভবান হতে পারেননি। পানিপথের শেষ যুদ্ধের সময় শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয যৌবনে পর্দাপণ করেন। মারাঠাগণ পরে শক্তি সঞ্চয় করে। শী'আ আমীরুল 'উমারা নজফ আলী খাঁর (১৭৭৩-১৭৮২ খ্রি.) মৃত্যুর পর ২০ বছর যাবত দিল্লীর কর্তা ছিলেন। সম্রাট তাদের কথায় উঠতেন বসতেন।[২৯৩]

কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ভারতের বিভিন্ন অংশে দেশী-বিদেশী কর্তৃত্বে অনেক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নামে মাত্র দিল্লী সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য দেখানো হত। সম্রাটগণ নিজ ব্যর্থতাবশত কার্যত শাসকের মর্যাদা হারিয়ে ফেলেন। দু'এক অঞ্চল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কেবল বাৎসরিক নির্ধারিত রাজস্ব বা অধিকৃত এলাকা শাসনের আনুষ্ঠানিক অনুমতি সনদ বাবদ নজরানা আসত। কেননা ধর্মবিশ্বাসের ন্যায় জনগণের এটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, দেশের আসল মালিক হচ্ছেন দীর্ঘকাল স্থায়ী সেই দিল্লীর রাজা-বাদশাহগণ। তাই যিনিই আঞ্চলিক শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন না কেন বাধ্য হয়েই তাকে মোঘল বাদশাহদের কর্তৃত্ব মানতে হত। বিদ্রোহী শাসকদেরও চেষ্টা থাকত যাতে বাদশাহদের নিকট থেকে অধিকৃত এলাকার বৈধ শাসনের জন্য সনদ লাভ করতে পারেন। স্বয়ং ইংরেজদেরও দীর্ঘদিন যাবত তা করতে হয়েছিল। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাহে 'আলমের পক্ষে মারাঠা শক্তিকে ক্ষমতাচ্যুত করে ইংরেজরা যখন পূর্ণরূপে দিল্লীতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠ করে এবং সম্রাট শাহে 'আলম ইংরেজদের আশ্রয়ে বসবাস করতে থাকেন, তখন কার্যত গোটা ভারতে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রভুত্ব চলা সত্ত্বেও তাদেরকে প্রকাশ্যে বাদশাহের আনুগত্য দেখাতে হয়েছে।[২৯৪]

মোটকথা, শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয -এর যুগে একদিকে দিল্লী থেকে কলকাতা পর্যন্ত ইংরেজদের পরোক্ষ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[২৯৫] অন্যদিকে দাক্ষিণাত্যে মারাঠা এবং পাঞ্জাবে শিখরা প্রবল হয়ে উঠেছিল। তাদের মুকাবিলায় লক্ষ্ণৌ,

---

[২৯৩]. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬১

[২৯৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১-৬২

[২৯৫]. ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তারের ইতিহাস জানার জন্য দেখা যেতে পারে, ফযল হক খায়রাবাদী, আযাদী আন্দোলন- ১৮৫৭, অনুবাদ মুহিউদ্দীন খান, (মূল গ্রন্থের নাম- আল-সাওরাত-আল-হিন্দিয়া), বাংলা একাডেমী, ঢাকাঃ ১৯৬৮ খ্রি.

হায়দারাবাদে এবং মহীশূরের মুসলিম রাজ্যগুলি দিল্লীর সিংহাসনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করত।

শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয ভারতের মুসলমানদের এই অবস্থাও দেখতে পেয়েছিলেন যে, ইংরেজগণ কিভাবে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ জয়ের পর থেকে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী দখল পর্যন্ত একের পর এক দিল্লী কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন মুসলিম -অমুসলিম স্বাধীন শক্তিগুলোকে ধ্বংস বা বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেছিল। কিরূপে প্রচন্ড শক্তি ব্যয় করে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মহীশূরের বীর সুলতান টিপুকে বিপর্যস্ত, পরাজিত ও নিহত করে সমগ্র ভারতে নিজেদের নিরংকুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। তারপর থেকে এদেশে ইংরেজদের রাজনৈতিক ক্ষমতা সুদৃঢ়করণ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতা, ধ্যান-ধারণা, কৃষ্টি-কালচারের প্রসার দান ও এদেশের ঐতিহ্যবাহী শাসক জাতি মুসলমানদের পাশ্চাত্যমুখী ও হীনমনা করে গড়ে তোলার কি সব ষড়যন্ত্র শুরু করা হয়, তিনি তাও প্রত্যক্ষ করলেন। উপমহাদেশের মুসলমানদের এই করুণ অবস্থায় তাদের মধ্যে পুর্নজাগরণ সৃষ্টির জন্য শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন।[২৯৬]

শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয দিহলবীর চারদিকে এই পরিবেশ বিরাজ করছিল। এর ভিতর দিয়েই তাঁকে নিজ লক্ষ্যের জন্য পথের সন্ধান করতে হয়েছিল। এজন্য তিনি যে বিচক্ষণতা এবং প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে তাঁর বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌছবার জন্য যে কর্মসূচী নিয়েছিলেন তা ছিল ইসলামী 'আক্বীদা এবং আখলাক সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে যে ভ্রান্ত ধারণা এবং কুসংস্কার প্রচলিত হয়ে পড়েছিল, তাঁর সংস্কার সাধন করা। কার্যত তার অর্থ ছিল শাহ্ সাহেবের সংস্কার আন্দোলনের পক্ষে লোকদের আকৃষ্ট করা এবং বিরুদ্ধবাদীদের অনুপ্রবেশ থেকে সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখা। শাহ্ 'আব্দুল 'আযীযের এ ছিল কর্মপন্থার প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি ব্যাপক আন্দোলনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠন করেছিলেন। এ পরিষদের সদস্য ছিলেন শাহ্ ইসমাঈল শহীদ, সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ এবং মাওলানা 'আব্দুল হাই। শাহ্ ইসহাককে তিনি নিজের স্থানে নিযুক্ত করেছিলেন। এই নবগঠিত পরিষদের আমীর ছিলেন শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাক। মাওলানা সাইয়্যেদ আহমাদ ছিলেন সংগ্রাম বিভাগের আহবায়ক এবং আমীর। এই সংগ্রাম পরিষদের সাহায্যে শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয দিল্লীর মসনদকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এ পরিষদ ছিল একটি অস্থায়ী সরকারের ন্যায়। তবে দিল্লী প্রকাশ্যত এ কাজের উপযুক্ত স্থান ছিল না। এ জন্যই এ পরিষদকে অগত্যা আফগানিস্তানের এলাকায় স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

---

[২৯৬]. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৬৩

আফগানদের কাছে একজন সাইয়্যেদ নেতৃত্ব দ্বিধাহীনভাবে স্বীকৃত হওয়ার ভরসা ছিল- এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই সাইয়্যেদ আহমাদকে আমীর এবং মাওলানা ইসমাঈল শহীদ ও মাওলানা 'আব্দুল হাইকে উজীর রূপে নিযুক্ত করা হয়েছিল। [২৯৭]

সরকারের দুর্ব্যবহার ও এর পটভূমি

সম্রাট আওরঙ্গজেবের 'আমল থেকে রাজপরিবারের সাথে শাহ্ ওলী উল্লাহ্-পরিবারের একটা সম্পর্ক ছিল। যদিও রাজদরবারে তাঁরা কোন পদ গ্রহণ করেননি। সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক খ্যাতনামা আইন শাস্ত্র *ফাতাওয়া -এ-আলমগীরী* গ্রন্থ রচনায় শাহ্ ওলী উল্লাহর পিতা শাহ্ 'আব্দুর রহীমকে অনুরোধ, সম্রাট মুহাম্মদ শাহ্ কর্তৃক রহীমিয়া মাদ্রাসার জন্য সরকারী ভবন ছেড়ে দেয়া এবং তাঁরই ইচ্ছায় নাজিবউদ্দৌলা কর্তৃক মারাঠা দমনের উদ্দেশ্যে আহমাদ শাহ্ 'আবদালীকে আমন্ত্রণ জানানো এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এভাবে সুন্নী উজীর, আমীর-'উমরা ও তাদের সন্তানগণ অনেকেই ওলী উল্লাহর পরিবারকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, কিন্তু হুমায়ূন কর্তৃক শের শাহকে দমন করার উদ্দেশ্যে একবার ইরান থেকে সামরিক সাহায্য নেয়ার পর মোগল শাসন যন্ত্রে শী'আদের যে প্রভাব বেড়ে চলছিল, তারই সুদূরপ্রসারী প্রভাবে সেনাবাহিনী ও শাসনযন্ত্রের ক্ষেত্রে উজীর-নাজির ও আমীর-'উমারার মধ্যেও একটি বিরাট শী'আ দল প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। এরই ধারবাহিকতায় ইংরেজদের ক্রীড়ানক নজফ আলী খাঁ যখন আমীরুল 'উমারা পদে আসীন হন (১৭৭৩-১৭৮১ খ্রি.), তখন শাহ্ পরিবারের উপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়। কেননা শী'আ কর্মকর্তাগণ তাঁদের এই দ্বীনী আন্দোলনকে মোটেই পছন্দ করতেন না। [২৯৮]

এ সম্পর্কে শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয নিজেই বলেন "দিল্লীতে বসবাসকালে আমার ইংজেরদের তোষামোদকারী এবং শী'আ মুসলমানদের দ্বারা অবর্ণনীয় জুলুম- নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছি। তারা আমাদের উত্যক্ত করার জন্য গুণ্ডা ও দুষ্কৃতকারীদের নিয়োজিত করে। তারা আমাদের বসবাসের ঘরের ছাদে তাজিয়া নিক্ষেপ করত। এমনকি পবিত্র রোযার মাসে আমরা মসজিতে যখন তারাবীহ নামাযে রত থাকতাম, তখন কখনো তারা মাতাল, চরিত্রহীনা কোন নারীকে এনে পবিত্র মসজিদে ঢুকিয়ে দিত। তখন সে হাফিজ শিরাজির কবিতা আবৃত্তি করত, নাচত আর চিৎকার করত। এ সময় দুষ্কৃতিকারীরা মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে উক্ত মাতাল নারীকে প্ররোচিত করত, ঢোল বাজাত এবং আমাদের গালাগাল দিত।

---

[২৯৭]. শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ ও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

[২৯৮]. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪

ইসলামী আন্দোলনের ক্ষতি হবে বিবেচনা করে আমরা এ নির্যাতনের জবাব দানে বিরত থাকতাম"[২৯৯]।

এসব নির্যাতন ক্ষমতাসীনদের সর্মথন ও সহযোগিতা থাকত। একটির পর একটি মামলা দায়ের করার মাধ্যমে চলত আরেক ধরনের জ্বালা যন্ত্রণা, কিন্তু এতেও কোন ফলোদয় না হলে ক্ষমতাসীনদের কর্তৃক শাহ্ 'আব্দুল 'আযীযের সহায়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। অবশ্য অন্য প্রভাব খাটিয়ে পরে এই নির্দেশ প্রত্যাহার করানো হয়।[৩০০]

সহায়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির মামলা প্রত্যাহার হলে শুরু হয় নির্যাতনের আরেক কৌশল। শাহ্ 'আব্দুল 'আযীযের প্রতি সপরিবারে দেশত্যাগের হুকুম জারি করা হয়। কোন প্রভাব খাটিয়ে কাজ হলো না। এ অবস্থায় শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয স্বীয় ভ্রাতাগণ, পরিবারের অন্যান্যরা এবং ভক্তবৃন্দসহ পায়ে হেঁটে দিল্লী ত্যাগ করে শাহেদরাহ্ গমন করেন। সেখানে থেকে তাঁদের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করেছিলেন, শাহ্ ফখরুদ্দিন, যিনি ইতঃপূর্বে শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয -পরিবারের সহায়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির হুকুম রদ করিয়েছিলেন।[৩০১]

নির্যাতন এখানেই শেষ নয়, শাহ্ 'আব্দুল 'আযীযকে কুচক্রীগণ দুই দুইবার বিষ প্রয়োগে হত্যা করারও ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু আল্লাহর দয়ায় তাদের ষড়যন্ত্র-জাল ছিন্ন হয়ে যায়। তবে তাঁর শরীরের উপর এর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। জানা যায়, একবার তাঁর গায়ে টিকটিকির মলম লাগিয়ে দেয়ায় তাঁর শরীরে শ্বেত রোগের সৃষ্টি হয়েছিল। এসব কষ্ট-নির্যাতনের ফলে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন, রক্তচাপ বেড়ে গিয়েছিল এবং শ্বেতরোগসহ আরও নানাবিধ ব্যাধিতে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন।[৩০২]

ইংরেজ বিরোধী ফাতওয়া প্রদান

পাক ভারত উপমহাদেশকে বৃটিশদের নাগপাশ হতে মুক্ত করার জন্য শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয দিহলবী কালজয়ী ভূমিকা পালন করেন। এ বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত ফাতওয়া ইতিহাসে সোনালী অক্ষরে লিখিত আছে। উপমহাদেশের পরাজিত ও ভগ্নোৎসাহ মুসলমানদের মনে ইংরেজ বিরোধী যে আগুন জ্বলে উঠেছিল তার অন্যতম কারণ ছিল একটি নির্ভিক ও বৈপ্লবিক ফাতওয়া। হযরত শাহ 'আব্দুল আযীয দিহ্লবীর

---

[২৯৯]. শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয, মালফুজাত, মীরাঠ, ১৩১৪ হি. পৃ. ৫৪

[৩০০]. মানাকেবে ফরীদী হতে উদ্ধৃত, জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

[৩০১]. মাওলানা মিয়াঁ মুহাম্মদ, ওলামা-এ-হিন্দকা শানদার মাযী, (দিল্লীঃ ১৯৬০ খ্রি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৯

[৩০২]. 'আরওয়াহে সালাসা' হতে উদ্ধৃত, জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

এই ফাতওয়া প্রকাশিত হওয়ার পরই কিংকর্তব্যবিমূঢ় মুসলিম জাতি আন্দোলনের পথ খুঁজে পায়। এই ফাতওয়া সকল শ্রেণীর মানুষকে স্বাধীনতা আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করে তোলে। উল্লেখ্য যে ইংরেজগণ প্রথম ক্ষমতাকে নিজেদের করায়ত্ত না করে চতুরতার আশ্রয় নেয়। যেমন- প্রথমে সম্রাটকে মসনদচ্যুত না করে এবং তাঁর শাহী মুকুট ছিনিয়ে নেয়ার পরিবর্তে ইংল্যান্ডের রাজার ন্যায় 'সাক্ষীগোপাল' করে রাখা হয়। অন্য সকল ক্ষমতা চলে যায় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে। তারা ধর্মীয় কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিয়ে নেয় এবং অপরদিকে মোগল সম্রাটের রাজত্ব ও তৈমুরী বংশের সম্মান রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়। হিন্দু মুসলমানদের হাতে ন্যস্ত রাষ্ট্রীয় কাজ-কারবার তখন থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে ন্যাস্ত হল। শুধু তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করারই প্রতিশ্রুতি দেয়া হল না, বরং মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ের মীমাংসা মুসলিমবাদীদের হাতে এবং হিন্দুদের ফয়সালা হিন্দু পন্ডিতদের হাতে অপর্ণ করা হল। এভাবে তারা ভারতীয়দেরকে তথাকথিত 'সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করল।

সাধারণ মানুষ সবসময়ই অসচেতন থাকে। ঐ সময় সমাজের বুদ্ধিজীবিরাও এই পার্থক্য বা চক্রান্তটি ধরতে পারেননি। তারা ভাবলেন, যখন আমাদের ধর্মীয় ও তমদ্দুনিক অধিকার ঠিক থাকবে এবং সম্রাটকে ও মসনদচ্যুত করা হবে না, তখন আর আপত্তিকর কি আছে? এমন জটিল পরিস্থিতিতে 'আজাদী' বলা হবে না 'গোলামী' -ইসলামী দৃষ্টিতে এটা এক জটিল প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল যে এ অবস্থায় ভারত কি পূর্বের ন্যায় 'দারুল ইসলাম' (ইসলামী রাষ্ট্র) রূপে আখ্যায়িত হবে, না 'দারুল হরব'[৩০৩] বলতে হবে, কিংবা ঐ অবস্থায় ভারতকে 'দারুল আমান' বলা হবে? ঊনিশ শতকের শুরুতে এ বিষয়টি তদানীন্তন ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ও 'আলিম সমাজের সামনে এক জটিল প্রশ্ন হয়ে দেখা দিল এবং এটা এমন এক প্রশ্ন ছিল, যেখানে মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ ছিল। ধুরন্ধর ইংরেজ জাতি সেই মতবাদের সুযোগ নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করলেও শাহ্ ওলী উল্লাহর চিন্তাধারার বিশ্বাসীদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি। তাই ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয

---

৩০৩. ইসলামী পরিভাষায় 'দারুল হরব' সে দেশকেই বলা হয়, যে দেশে ইসলাম বিরোধী সরকারের সঙ্গে জিহাদ করা হয় অথবা যেখানে থেকে ধর্মীয় নির্দেশ অনুযায়ী হিজরত করতে হয়। 'দারুল আমান' হল যেখানে সরকার অমুসলিম হলেও মুসলমানদের জান-মাল নিরাপদ এবং তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা বিদ্যমান থাকে। আর এ দৃষ্টিতে সেখানে প্রতিষ্ঠিত সরকারের সঙ্গে লড়াই করাও অবৈধ। (বিস্তারিত দ্র. মুহাম্মদ যফরুদ্দীন, ইসলামকা নিযামে আমান, (আযমগড়: ১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ৬৪; হায়দার যামান সিদ্দীকী, *ইসলাম কা নাযরিয়ায়ে জিহাদ*, (লাহোর: ১৯৪৯ খ্রি.), পৃ. ১০৫

এক ফাতওয়া জারি করে ইসলামী আন্দোলনের দ্বার উন্মোচিত করেন। ফাতওয়াটি হল:

> "ইংরেজ অফিসাররাই এখন দেশের শাসন পরিচালনা করছে। তাদের শাসন চলার অর্থ হলো- তারা দেশরক্ষা জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রণ, রাজস্ব, ট্যাক্স, ওশর, খারাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচার ব্যবস্থা প্রভৃতিতে একচ্ছত্র ক্ষমতার মালিক। ভারতীয়দের এ সব বিষয়ে কোন কর্তৃত্ব নেই। যদিও তারা জুমু'আর নামায আযান, গরু জবাই এসব ইসলামী রীতিনীতিতে কোন প্রতিবন্ধকতা বা বাঁধার সৃষ্টি করছে না, কিন্তু এগুলো হলো শাখা-প্রশাখা। তবে যে সব বিষয় -উপরিউক্ত বিষয়সমূহের এবং স্বাধীনতার মূল বিষয় যেমন- মানবীয় মৌলিক অধিকার, নাগরিক অধিকার জনগণের বাক স্বাধীনতা, সে সবের প্রত্যেকটি ছিনিয়ে নিয়েছে এবং পদদলিত করছে। মসজিদ ধ্বংস করা হচ্ছে। তাদের পূর্ব অনুমতি তথা পাসপোর্ট -পারমিট ব্যতীত হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে কারো শহরে গমনাগমনে বাধা দেওয়া হচ্ছে। সাধারণ প্রবাসী ও ব্যবসায়ীদের শহরে আগমন ও প্রত্যাগমনের অনুমতি দান দেশের স্বার্থরক্ষার্থে কিংবা নাগরিক অধিকারের ভিত্তিতে প্রদান করছে না, বরং তাদের স্বার্থ বিবেচনায়ই করা হচ্ছে। যদিও বা হায়দারাবাদে, লক্ষ্ণৌ এবং রামপুরের শাসকগণ ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়ার কারণে সেখানে সরাসরি তাদের শাসন প্রচলিত নেই, তবুও সমগ্র দেশের উপরই 'দারুল হরব' -এর হুকুম প্রযোজ্য হবে"।[৩০৪]

এ 'ফাতওয়া' সম্পর্কে মাওলানা 'উবায়দুল্লাহ সিন্ধী বলেন, "ইমাম 'আব্দুল 'আযীয সর্বপ্রথম ফাতওয়া দিয়েছিলেন যে, উপমহাদেশে মুসলিম অধিকৃত এলাকায় যদিও নামে মাত্র দিল্লীর সম্রাটের কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া হয়, কিন্তু কার্যত, সে সব এলাকা দারুল হরবের অন্তর্গত। ইমাম 'আব্দুল 'আযীযের মতে, শুধু নামে মাত্র অধিকার কোন দেশকে 'দারুল ইসলাম' করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সুতরাং উপমহাদেশে যে বিপুল মুসলিম শক্তি বিদ্যমান তাদের সামনে দু'টি পথ খোলা রয়েছে। হয় শক্তি প্রয়োগ করে ইসলামী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা, নতুবা ইসলামী রাজ্যে হিজরত করে যাওয়া। দারুল হরবে অবস্থিত প্রত্যেক মুসলমানদের প্রতি এটা হচ্ছে মাযহাবী কর্তব্য-ফরয। অন্য কথায়, ইসলামী হুকুমাত যদি অনৈসলামিক প্রবল শক্তির মোকাবিলা করতে সমর্থ না হয়, তখন ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত রাখার দায়িত্ব সর্বসাধারণ মুসলমানদের উপর বর্তায়। মুসলিম

---

৩০৪. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয, *ফাতওয়া-ই-আযীযিয়্যা* (ফার্সী), মুজতবায়ী প্রেস, দিল্লী, ১৩৪১ হিঃ, পৃ. ১৭, ১৮৫

সমাজ এ বিষয়ে উদাসীন থাকতে পারে না। শরী'আতের দৃষ্টিতে সে ঔদাসীন্য হবে অবৈধ-হারাম। ইসলামী হুকুমাত এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে প্রত্যেক মুসলমাদের শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং সম্মিলিত শক্তিও গড়ে তুলতে হবে।[৩০৫]

সাধারণ মুসলমানরা এই ফাতওয়ার ফলে তারা কর্মনীতি নির্বাচনের পথ খুঁজে পেলো। শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয দিহলবীর আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত কর্মী ও তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রবৃন্দ উপমহাদেশের সকল শ্রেণীর মুসলমানদের নিকট এই বিপ্লবী ফাতওয়া প্রচার করেন। এভাবে মুসলমানদের মনে ক্রমে ক্রমে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদী ভাব জাগ্রত হতে থাকে।[৩০৬] আর এই জিহাদী ভাব পরবর্তী দুশত বছর পর্যন্ত উপমহাদেশের জনসাধারণকে ইংরেজবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে বিরতিহীন ভাবে উত্তাপ যুগিয়েছিল।

ইন্তিকাল

এই মহান মনীষী রমযান ১২৩৯ হিজরীর (এপ্রিল ১৮২৪ খ্রি.) শেষদিকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পীড়া বেড়ে গেলে নগদ সমস্ত সম্পত্তি তিনি শরী'আত মুতাবিক ভ্রাতুষ্পুত্র ও নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করে দেন। তাঁর পরিধেয় বস্ত্র দ্বারাই তাঁর কাফন দানের ব্যবস্থা করার জন্য ওয়াসিত করে যান। ৭ শাওয়াল ১২৩৯ হিজরী (৫জুন ১৮২৪ খ্রি.), রবিবার সকালে তিনি ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছরের কিছু বেশী। পর পর পঞ্চাশবার তাঁর নামাযে জানাযা আদায় করা হয়। দিল্লীর তুর্কী দরজার বাইরে পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে পিতার কবরের নিকট দাফন করা হয়।[৩০৭]

উপসংহার

শাহ আব্দুল আযীয ছিলেন তাঁর সমকালের আলিমগণের নেতা। উপমহাদেশের শুধু নয়, বরং তিনি ছিলেন মুসলিম বিশ্বের একজন শীর্ষস্থানীয় মনীষী, প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব। তাঁকে 'সিরাজুল হিন্দ', 'চেরাগ দিহ্লী' এবং 'হুজ্জাতুল্লাহ' প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। কেবল ভারতীয় উপমহাদেশেই নয়, বরং 'আরব তথা মুসলিম বিশ্বে তাঁর 'ফাতওয়া' বা ইসলামি আইনের ব্যাখ্যা সর্বাধিক প্রামাণ্য হিসেবে গৃহীত হতো।

---

[৩০৫]. মাওলানা 'উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩-৪৪

[৩০৬]. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৬

[৩০৭]. মাওলানা হাকীম সাইয়্যেদ 'আব্দুল হাই হাসানী, *নুযহাত-আল-খাওয়াতির*, ৭ম খন্ড, পৃ. ২৬৬-২৬৮

মনীষী শাহ্ ওলীউল্লাহ দিহলবী ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী পুনর্জাগরণের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যকে কার্যকরী করার পথে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন শাহ্ আব্দুল আযীয দিহলবী। এছাড়াও উপমহাদেশে ইসলাম ও মুসলিম জাতিসত্তার সংরক্ষণে শাহ্ আব্দুল আযীয এর বংশধরগণের রয়েছে অপরিসীম অবদান। বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের তাঁরাই ছিলেন পথিকৃৎ।

মোটকথা, উপমহাদেশে ইসলামি জ্ঞানের প্রচার-প্রসার ও সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে শাহ্ আব্দুল আযীয এর অবদান ইতিহাসে তাঁকে চির অমর করে রেখেছে।

ইতিহাসের নায়ক মহাবীর তিতুমীর

আহমাদ রায়েদ

মহাবীর তিতুমীরের প্রকৃত নাম সৈয়দ মীর নিসার আলী। তিনি ছিলেন একজন ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী নেতা। তিনি নীলকর জমিদার ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বীরবিক্রমে লড়াই করেছেন। তাঁর বিখ্যাত বাঁশের কেল্লার জন্য তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। আজকের দিনে অর্থাৎ ১৯ নভেম্বর ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় এই বাঁশের কেল্লাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

তিতুমীরের জন্ম ২৭ জানুয়ারি, ১৭৮২ খ্রীঃ উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহাকুমার বাদুড়িয়া থানার চাঁদপুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম মীর হাসান আলী এবং মাতার নাম আবিদা রোকেয়া খাতুন। তিতুমীরের প্রাথমিক শিক্ষা হয় তাঁর গ্রামের বিদ্যালয়ে। পরবর্তীকালে তিনি স্থানীয় একটি মাদ্রাসাতে লেখাপড়া করেন। ১৮ বছর বয়সে তিতুমীর কোরানে হাফেজ হন এবং হাদিস বিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। একই সাথে তিনি বাংলা, আরবি ও ফার্সি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

১৮২২ সালে তিতুমীর মক্কায় হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে যান। তিনি সেখানে স্বাধীনতার অন্যতম পথ প্রদর্শক সৈয়দ আহমেদ শহীদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও ওয়াহাবি মতবাদে অনুপ্রাণিত হন। সেখান থেকে এসে (১৮২৭) তিতুমীর তাঁর গ্রামের দরিদ্র কৃষকদের নিয়ে জমিদার এবং ব্রিটিশ নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়ে আন্দোলন শুরু করেন। তিনি ও তাঁর অনুসারীরা তৎকালীন হিন্দু জমিদারদের অত্যাচারের প্রতিবাদে ধুতির বদলে 'তাহ্‌বান্দ' নামে এক ধরনের বস্ত্র পরিধান শুরু করেন। তিতুমীর হিন্দু জমিদার কৃষ্ণদেব রায় কর্তৃক মুসলমানদের ওপর বৈষম্যমূলকভাবে আরোপিত 'দাঁড়ির খাজনা' এবং মসজিদের করের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে স্থানীয় জমিদার ও নীলকর সাহেবদের মধ্যে সংঘর্ষ তীব্রতর হতে থাকে। আগেই তিতুমীর পালোয়ান হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং পূর্বে জমিদারের লাঠিয়াল হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তিনি তাঁর অনুসারীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তোলেন।

তিতুমীরের অনুসারীর সংখ্যা বেড়ে এক সময় ৫, ০০০ গিয়ে পৌঁছায়। তারা সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়। ১৮৩১ সালের ২৩শে অক্টোবর বারাসতের কাছে বাদুড়িয়ার ১০ কিলোমিটার দূরে নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে তাঁরা বাঁশের কেল্লা তৈরি করেন। বাঁশ এবং কাদা দিয়ে তারা দ্বি-স্তর বিশিষ্ট এই কেল্লা নির্মাণ করেন।

তিতুমীর বর্তমান চব্বিশ পরগনা, নদীয়া এবং ফরিদপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অধিকার নিয়ে সেখানে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। স্থানীয় জমিদারদের নিজস্ব বাহিনী এবং ব্রিটিশ বাহিনী তিতুমীরের হাতে বেশ কয়েকবার পরাজয় বরণ করে। তন্মধ্যে বারাসতের বিদ্রোহ অন্যতম। উইলিয়াম হান্টার বলেন, ওই বিদ্রোহে প্রায় ৮৩ হাজার কৃষকসেনা তিতুমীরের পক্ষে যুদ্ধ করেন।

অবশেষে ১৮৩১ সালের ১৩ নভেম্বর ব্রিটিশ সৈন্যরা তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। তিতুমীর স্বাধীনতা ঘোষণা দিলেন, 'ভাই সব, একটু পরেই ইংরেজ বাহিনী আমাদের কেল্লা আক্রমণ করবে। লড়াইতে হার-জিত আছেই, এতে আমাদের ভয় পেলে চলবে না। দেশের জন্য শহীদ হওয়ার মর্যাদা অনেক। তবে এই লড়াই আমাদের শেষ লড়াই নয়। আমাদের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েই এ দেশের মানুষ একদিন দেশ উদ্ধার করবে। আমরা যে লড়াই শুরু করলাম, এই পথ ধরেই একদিন দেশ স্বাধীন হবে। '

১৪ নভেম্বর কর্নেল হার্ডিং-এর নেতৃত্বে ব্রিটিশ সৈন্যরা ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীদের আক্রমণ করে। তাদের সাধারণ তলোয়ার ও হালকা অস্ত্র নিয়ে তিতুমীর ও তার সৈন্যরা ব্রিটিশ সৈন্যদের আধুনিক অস্ত্রের সামনে দাঁড়াতে পারেনি। ১৮৩১ সালের ১৪ নভেম্বর ইংরেজ বাহিনী তিতুমীর বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালায়। মুজাহিদরা সাবেকি ধরনের স্থানীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত ইংরেজ বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়ে বাঁশের কেল্লায় আশ্রয় নেয়। ইংরেজরা কামানে গোলাবর্ষণ করে কেল্লা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দেয়। বিপুল সংখ্যক মুজাহিদ প্রাণ হারায়। বহুসংখ্যক অনুসারিসহ তিতুমীর যুদ্ধে শহীদ হন। দিনটি ছিল ১৯ নভেম্বর, ১৮৩১। মুজাহিদ বাহিনীর অধিনায়ক গোলাম মাসুমসহ ৩৫০ জন মুজাহিদ ইংরেজদের হাতে বন্দি হন। গোলাম মাসুম মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৪০ জন বন্দিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তাঁর বাহিনীর প্রধান মাসুম খাঁ বা গোলাম মাসুমকে ফাঁসি দেওয়া হয়। বাশেঁর কেল্লা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

তথ্যসূত্র: কালের কণ্ঠ, ১৯ নভেম্বর ২০১৭ ইং

বাংলা-আসামের হিদায়াতের দিশারি মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.)

মোহাম্মদ মিফতাহুল ইসলাম তালহা

ভারতীয় উপমহাদেশে সরাসরি রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে ইসলাম প্রচার খুব একটা না হলেও কয়েক শতাব্দি ধরে এ অঞ্চল মুসলিম শাসকদের অধীনে ছিল। মুঘল আমলে সম্রাট আকবরের মতো ধর্মদ্রোহী শাসকের যখন উত্থান হয়েছিল, ঠিক তখনই ইমাম মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী আল্লাহর মনোনীত দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। কয়েক শতাব্দির মুসলিম শাসনের পর যখন মুঘলদের পতনের ঘণ্টা বাজতে শুরু করে, সেই মুহূর্তে আবার মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানীর সিলসিলায় আত্মপ্রকাশ করেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)। মুসলিম শাসকদের পতনের পর উপমহাদেশের মুসলিমদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন এই মহান ইমামের সিলসিলার বুযুর্গগণ।

মুসলিম উম্মাহর সেই ক্রান্তিলগ্নে এ সিলসিলার যেসকল বুযুর্গ ইসলামের অতন্দ্র প্রহরীরূপে এ অঞ্চলে ইসলামের খিদমত চালিয়ে গিয়েছিলেন, আল্লামা শাহ কারামত আলী সিদ্দীকী জৌনপুরী (র.) তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। ওয়ালিউল্লাহী সিলসিলার অন্যতম প্রাণপুরুষ ইমামুত তরীকত, আমীরুল মুমিনীন, শহীদে বালাকোট সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর অন্যতম প্রধান এই খলীফা বাংলা ও আসাম জুড়ে ইসলামের সুমহান বাণী এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, শত শত বছরের মুসলিম শাসনের পরও অবিভক্ত বাংলায় মুসলিমরা সংখ্যালঘু থাকলেও তাঁর খিদমত ও দাওয়াতের ফলে ব্রিটিশ আমলে এ অঞ্চলে মুসলিমরাই সংখ্যাগুরু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

বাংলা-আসামের হিদায়াতের দিশারি, তরীকায়ে মুহাম্মদিয়ার অন্যতম প্রচারক, বিখ্যাত হানাফী ফকীহ ও সূফী শায়খ আল্লামা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) ১২১৫ হিজরীর ১৮ই মুহাররাম মুতাবেক ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই জুন ভারতের উত্তরপ্রদেশের জৌনপুর শহরের মুল্লাটুলা মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর বংশধর, ৩৫ পুরুষের মধ্যস্থতায় তাঁর বংশলতিকা আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাঁর পিতার

নাম শায়খ আবূ ইবরাহীম ইমাম বখশ, তিনি ফার্সি ভাষায় সুপণ্ডিত আলিম ছিলেন। জন্মের পর কারামত আলীর নাম রাখা হয়েছিল আলী, সে হিসেবে তিনি প্রথম দিকে আলী জৌনপুরী নামে পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর কারামতের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে লোকমুখে তিনি কারামত আলী জৌনপুরী নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

১৩৬১ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত জৌনপুর শহর শত বছর ধরে ভারতীয় উপমহাদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। মুঘল সম্রাট শাহজাহান জৌনপুরকে "হিন্দুস্তানের শিরাজ" বলে আখ্যায়িত করেছিলেন এ শহরের ইলমি ঐতিহ্যের কারণে (তাযকিরাতুল উলামা, মৌলভী খায়রুদ্দীন এলাহাবাদী, কলকাতা)। কিন্তু কারামত আলী (র.) যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তখন জৌনপুরের ঐতিহ্য আর আগের মতো ছিল না, বরং ইলম চর্চার এই বিখ্যাত শহরে অজ্ঞতার বিস্তার ঘটছিল ক্রমশই। তবে তখনো জৌনপুরের ইলমি ঐতিহ্যের ধারক-বাহক কিছু পরিবারের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল, কারামত আলী জৌনপুরীর জন্ম এরকমই এক ঐতিহ্যবাহী পরিবারে।

আল্লামা জৌনপুরীর শিক্ষাজীবন শুরু হয় তাঁর বাবা শায়খ আবু ইবরাহীমের নিকট আরবি, ফার্সি, উর্দু ও প্রাথমিক ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে। এরপর মাওলানা কুদরতুল্লাহ রূদলভীর নিকট ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়, মাওলানা রহমতুল্লাহ আল্লামীর নিকট হাদীস শাস্ত্র, মাওলানা আহমদ আলী চিরিয়াকুটির নিকট মা'কুলাত, কারী সায়্যিদ ইবরাহীম মাদানী, কারী সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইসকান্দার ও শায়খ উমার বিন আব্দুর রাসূল আল-আকমালী প্রমুখের নিকট ইলমে কিরাত ও তাজভীদের উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করেন।

সে যুগে হস্তলিপি ও ক্যালিওগ্রাফি চর্চার বিশেষ কদর ছিল। এ বিষয়টি আল্লামা জৌনপুরীর পারিবারিক ঐতিহ্যের অংশও ছিল, তাঁর বাবাও বিখ্যাত হস্তলিপিকার ছিলেন। তিনি এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা বাবার নিকট থেকে অর্জন করেন, পরবর্তীতে বিখ্যাত ক্যালিওগ্রাফার হাফিয আব্দুল গণীর নিকট থেকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভ করেন। অন্য সকল বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও তিনি সুদক্ষ হয়ে ওঠেন, এমনকি সূরার নাম ও বিসমিল্লাহসহ পুরো সূরা ইখলাস মাত্র একটি চালের বীজে তিনি লিখতে পারতেন। এছাড়াও জিহাদ ও দাওয়াতি কাজের সুবিধার্থে বর্শা নিক্ষেপ, সাঁতারসহ বিভিন্ন ধরনের শারীরিক কসরতেও তিনি দক্ষতা অর্জন করেন। ইলমে দীন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জনের পর তিনি তাসাউফ তথা মা'রিফতের জ্ঞান অর্জনের জন্য ১২৩৪ হিজরীতে মাত্র ১৮-১৯ বছর বয়সে রায়বেরেলীর উদ্দেশ্যে সফর করেন। রায়বেরেলী গমনের কারণ– তখন সেখানে অবস্থান করছিলেন বিখ্যাত মুজাদ্দিদ ও মুজাহিদ, তরীকতের ইমাম সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.)। হযরত জৌনপুরী (র.) এ বিষয়ে তাঁর কিতাব

যাদুত-তাকওয়ায় লিখেন, "আমার প্রাজ্ঞ মুরশিদ সায়্যিদ আহমদ (র.) বেরেলী মসজিদে আমাকে মাত্র ১৮ দিনে তরীকত ও সুলূকের রহস্যসমূহ শিক্ষাদান করেন, এরপর তিনি (মুরশিদ) আল্লাহর হামদ ও সানা পাঠ করে বলেন, কাজ সম্পন্ন হয়েছে, এখন তুমি ইচ্ছা করলে অধিক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জনের জন্য আরো দুই-তিন দিন অবস্থান করতে পারো।" এভাবে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর নিকট থেকে তিনি ইলমে তরীকতের খেলাফত অর্জন করেন। এরপর সায়্যিদ ছাহেব জৌনপুরী (র.) কে নির্দেশ দিলেন, "আপনি মানুষের হিদায়াতের কাজে মনোনিবেশ করুন।" তাঁর ইচ্ছা ছিল মুর্শিদের সাথেই থাকবেন, কিন্তু মুর্শিদের নির্দেশ পালনে বাধ্য হয়ে রায়বেরেলী ছেড়ে জৌনপুর ফিরে আসেন।

জৌনপুরের এসে তিনি দাওয়াত ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ এর বাণী "নিশ্চয় কিছু বক্তব্যে জাদু আছে।"– এ হাদীসের বাস্তব প্রমাণ ছিলেন হযরত জৌনপুরী (র.)। তিনি যখন নসীহত করতেন, তাঁর নসীহত মানুষের হৃদয় ছোঁয়ে যেত, মানুষের অন্তরে তাঁর বক্তব্যের গভীর প্রভাব পড়তো। ফলে তাঁর নসীহতে মানুষ সহজেই হিদায়াত লাভ করতো। জৌনপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সংস্কারের লক্ষ্যে এ সময় তিনি নিয়মিত নসীহত করতে থাকেন। বিদআত ও ভণ্ডামী নির্মূল এবং মানুষের নিকট ইসলামের সঠিক শিক্ষা পৌঁছে দেওয়াই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। এ সময় তিনি সাধারণ মানুষের প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের উপযুক্ত বইয়ের অভাব লক্ষ্য করলেন। তখন তিনি ১৮২০ সালে মাত্র বিশ বছর বয়সে 'মিফতাহুল জান্নাত' নামে ধর্মীয় প্রাথমিক জ্ঞানের একটি বই রচনা করেন। বহুগ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা জৌনপুরীর এটি ছিল প্রথম গ্রন্থ, এবং এটি পাঠকদের নিকট অভূতপূর্ব গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। সে যুগে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের ঘরে ঘরে এ গ্রন্থটি পাওয়া যেতো। রায়বেরেলী থেকে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে ১৮২৩ খ্রি. পর্যন্ত সময়কাল তিনি জৌনপুর ও তার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় দাওয়াতী সফর, সংস্কার এবং মিফতাহুল জান্নাত নামক পাঠকনন্দিত মকবুল কিতাবখানি রচনায় ব্যয় করেন।

এদিকে তাঁর মহান মুর্শিদ সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) তখন জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। এজন্য তিনি হযরত জৌনপুরীর মতো আলিম ও বাগ্মী ব্যক্তিত্বকে দাওয়াতের মাধ্যমে জিহাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। মুর্শিদের নির্দেশে হযরত জৌনপুরী (র.) ১৮২৪ সালে বাংলায় চলে আসেন। তিনি তখন ২৪ বছরের এক তরুণ আলিম। প্রথম বারের মতো নিজের সারা জীবনের কর্মস্থল বাংলায় পা রাখলেন। 'ব্রিটিশ পলিসি অ্যান্ড ব্যাঙ্গলি মুসলিম' (ঢাকা, ১৯৬১) গ্রন্থে ঐতিহাসিক এ.আর. মল্লিক জৌনপুরী (র.) এর এ সফর সম্পর্কে লিখেন, "কারামত আলী মুজাহিদ নিয়োগ ও জিহাদের প্রচারণার জন্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ঢাকা, ফরিদপুর ও বরিশালে সফর করেন" (পৃ. ১০১)। প্রথম বারের

বাংলা সফরে জৌনপুরী (র.) সাফল্যের সাথে তাঁর দায়িত্ব আনজাম দিতে সক্ষম হন। বাংলা থেকে তাঁর মাধ্যমে অসংখ্য মুজাহিদ আমীরুল মুমিনীন সায়্যিদ আহমদের বাহিনীতে যোগদান করেন। এছাড়া বাংলার মানুষ হযরত জৌনপুরী (র.) এর আহ্বানে মুজাহিদদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেন।

মাত্র বছর দেড়েকের এই সংক্ষিপ্ত সফর শেষে হজ্জ আদায়ের জন্য তিনি হিজাযের উদ্দেশ্যে সফর করেন। হজ্জ পালনের পর তিনি হিজাযে কিছুদিন অবস্থান করেন, এসময় তিনি ইলমে কিরাতের উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করেন। আরব সফর শেষে দেশে ফেরার পথে কলকাতায় কয়েক দিন অতিবাহিত করেন, এসময় কলকাতা থেকে প্রথম বারের মতো মিফতাহুল জান্নাত কিতাবটি প্রকাশিত হয়। কলকাতা থেকে ফিরে যান প্রিয় মাতৃভূমি জৌনপুরে। জৌনপুরে গিয়ে ১২৪৪ হিজরীতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, এ সময় প্রায় আড়াই বছরের মতো সময় পরিবারের সাথে বসবাস করেন। তবে জৌনপুর কেন্দ্রিক দাওয়াতি কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

১২৪৬ হিজরী মুতাবেক ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দ। আমীরুল মুমিনীন সায়্যিদ আহমদ (র.) তাঁর জীবনের চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এর আগে সায়্যিদ আহমদ (র.) আরো কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করলেও কারামত আলী জৌনপুরী দাওয়াতের ময়দানে ছিলেন। এবার তিনি মুরশিদের অধীনে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চাইলেন। বালাকোট যুদ্ধের প্রাক্কালে হযরত জৌনপুরী (র.) তাঁর মুরশিদ সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু আমীরুল মুমিনীন চিন্তা করলেন, কারামাত আলীকে যুদ্ধের চেয়ে দাওয়াতের ময়দানে অধিক প্রয়োজন। যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক, এই মহান আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কারামত আলী জৌনপুরীর মতো বাগ্মী আলিমের প্রয়োজন হবেই। তাই সায়্যিদ আহমদ (র.) কারামত আলী জৌনপুরী (র.) কে বালাকোটের যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণের অনুমতি না দিয়ে ফিরিয়ে দিলেন। ঐতিহাসিক জাফর থানেশ্বরীর বর্ণনা মতে, "কারামত আলী জৌনপুরী বালাকোটে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সায়্যিদ আহমদ শহীদ আন্দোলনকে জীবিত ও অব্যাহত রাখার স্বার্থে একদল দায়ীকে সশস্ত্র যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে দেন। তাঁদের মধ্যে শাইখ কারামত আলীও ছিলেন।" (সাওয়ানিহে আহমদী, জাফর থানেশ্বরী, পৃ. ১৮৪)

মুরশিদের নির্দেশে যুদ্ধ না করেই বালাকোট থেকে জৌনপুর ফিরে আসলেন হযরত জৌনপুরী (র.)। এরই মধ্যে মহান মুরশিদ সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)-সহ তাঁর সহচরদের শাহাদতের খবর পৌঁছলো। শাহাদাতের খবর পেয়ে কাল বিলম্ব না করেই নিজের কাঁধে অর্পিত দায়িত্ব পালনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন হযরত জৌনপুরী (র.)। নব-উদ্যোমে শুরু হলো দাওয়াতি সফর। জৌনপুর থেকে বাংলা

চলতে থাকলো তার সেই ক্লান্তিহীন সফর। সশস্ত্র জিহাদের পথ আপাতত বন্ধ হলে সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) এর অন্যান্য খলীফাদের মতো তিনিও কর্মপন্থায় কিছুটা বদল আনলেন। এখন আর শাসক গোষ্ঠীর রোষানলে পড়লে চলবে না, বরং তাদেরকে পাশ কাটিয়েই চালিয়ে যেতে হবে অন্য এক জিহাদ– মানুষের নিকট হিদায়াতের বাণী পৌঁছে দেওয়ার জিহাদ। তাঁর সে সংস্কার আন্দোলনে পরিণত হয় হিজরী ত্রয়োদশ শতকের সবচেয়ে বড় সংস্কার আন্দোলনে, কোটি কোটি মানুষের নিকট হিদায়াতের বাণী পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেন তিনি। এ পর্যায়ে জৌনপুরের সমসাময়িক আরেক আলিম শাইখ সাখাওয়াত জৌনপুরীর সহযোগিতায় জৌনপুরে কুরআনিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পর অবশ্য জৌনপুরে বেশি দিন অবস্থান করেননি, বরং মাদরাসার দায়িত্ব শাইখ সাখাওয়াত জৌনপুরীর উপর অর্পণ করে তিনি বেরিয়ে পড়েন দাওয়াতি সফরে।

১২৫৬ হিজরীতে তিনি কলকাতায় পৌঁছান। কলকাতায় তাঁর সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। তিনি অবিভক্ত বাংলা ও আসাম-জুড়ে তাঁর দাওয়াতি কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকেন। এ সময় নৌকাই ছিল তাঁর বাড়ি-ঘর, নৌকাতে করে বাংলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঘুরে বেড়াতেন দীনের দাওয়াত নিয়ে। তাঁর নৌবহরে যুক্ত করেন একটি ভ্রাম্যমাণ মাদরাসা, যে মাদরাসার ছাত্ররা নৌকাতেই থাকতো, নৌকাতেই তাদেরকে পাঠদান করতেন হযরত জৌনপুরী (র.)। এ মাদরাসার সমস্ত ব্যয়ভার তিনি নিজে বহন করতেন।

সুদীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে অব্যাহত ছিল তাঁর এই বিরামহীন দাওয়াতি সফর। এরপর ভাবলেন এবার প্রিয় মাতৃভূমিতে রেখে আসা প্রিয়জনদের খোঁজ-খবর নেওয়া দরকার। তাই জৌনপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। ১২৬৮ হিজরীতে জৌনপুর পৌঁছালেন তিনি। জৌনপুরে তিনি অভাবনীয় উষ্ণ অভ্যর্থনা লাভ করলেন। দলে দলে মানুষ আসতে শুরু করলেন তাঁর সাথে দেখা করতে। সবার চোখে বিস্ময় আর শ্রদ্ধা, হৃদয়ে ভালোবাসা। জৌনপুর তাঁর শ্রেষ্ঠ সন্তানকে বরণ করে নিল হার্দিক অভ্যর্থনা আর ভালোবাসা দিয়ে।

জৌনপুরে এসেও তার দাওয়াতী ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম অব্যাহত থাকলো। মনে পড়লো নিজের হাতে গড়া কুরআনিয়া মাদরাসার কথা, সে মাদরাসাতে শুধু কুরআন তিলাওয়াত ও প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হতো। চিন্তা করলেন এবার নিজ শহরের মানুষের ধর্মীয় উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। তাঁর সে উদ্যোগে সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে এলেন জৌনপুরে অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব রঈস মুনশী ইমাম বখশ। মুনশী ইমাম বখশের সহযোগিতায় কারামত আলী জৌনপুরী (র.) ইমাম আযম আবু হানীফা (র.) এর নামানুসারে ১২৮০ হিজরী মুতাবেক ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করলেন মাদরাসা হানাফিয়্যা। তিনি

যেহেতু দাওয়াত ও ইসলাহের জন্য ভ্রাম্যমাণ জীবন বেছে নিয়েছেন, তাই মাদরাসায় অধ্যাপনার জন্য সে যুগের বিখ্যাত আলিম মাওলানা আব্দুল হালীম লখনভী ফিরিঙ্গি মহল্লীকে নিয়োগ দিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ ইমাম আব্দুল হাই লখনভী মাওলানা আব্দুল হালীম লখনভীর ছেলে এবং মাদরাসা হানাফিয়্যার কৃতী ছাত্র।

বালাকোট যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর অন্যতম দায়িত্ব ছিল জনগণকে জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত করা। বালাকোটের পর ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম কিছুদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলেও কারামত আলী জৌনপুরী (র.) স্বীয় মুরশিদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি একটুও। ১৮৫৭ সালে আবার যখন ব্রিটিশবিরোধী আযাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরি হলো, কারামত আলী জৌনপুরী (র.) স্বভাবতই এই সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়লেন। সুসংগঠিত বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট তৈরি হওয়া মাত্র জৌনপুরী (র.) তাঁর মুরীদ কাজী সরফরাজ আলী খানকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে জেনারেল বখত খানকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ করলেন। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক ইন্তেজাম উল্লাহ আশ-শিহাবী লিখেন, "কারামত আলী জৌনপুরীর ছাত্র ও সুহৃদ সরফরাজ খান জেনারেল বখত খানকে (বিদ্রোহের জন্য) অনুপ্রাণিত করেন। বখত খান ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন, দিল্লির ইতিহাসে তিনি জেনারেল বখত খান নামে পরিচিত। (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আওর বাগী উলামা, মুফতী ইন্তেজাম উল্লাহ আশ-শিহাবী, পৃ. ৪৫)

১৮৫৭ সালের যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর বখত খানকে অনুপ্রাণিত করার অভিযোগে সরফরাজ আলী খানকে শাস্তি দেওয়া হয়। একই অভিযোগে হযরত কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর বিরুদ্ধেও মামলা পরিচালিত হয়। সে সময় জৌনপুর শহরের উত্তর দিকে ইংরেজদের একটি কারখানা ছিল। বিপ্লব শুরু হলে মুসলিম বাহিনী সেই কারখানায় হামলা করে। তখন সেখানকার কিছু বেসামরিক বৃদ্ধ, নারী ও শিশু প্রাণভয়ে পালিয়ে এসে ঘটনাক্রমে কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। বেসামরিক বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের উপর আক্রমণ যেহেতু ইসলামে অবৈধ, তাই ইসলামের সুমহান শিক্ষা অনুযায়ী কারামত আলী জৌনপুরী (র.) তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করেন। আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে কিছু প্রভাবশালী ইংরেজ পরিবারের সদস্যও ছিল। তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বাতিল করে সরকার তাঁকে বরং জৌনপুরে এক খণ্ড জমি দান করে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে কোনো কোনো লেখক জৌনপুরী (র.) কে প্রো-ব্রিটিশ ইসলামিক স্কলার হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর সারা জীবনের কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে তাদের এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয় এবং ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বিপ্লব স্তিমিত হলে কারামত আলী জৌনপুরী (র.) আবার ১২৮০ হিজরীতে তাঁর দাওয়াত ও ইসলাহের মূল কর্মক্ষেত্র বাংলায় চলে আসেন। এরপর আর কখনোই নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে যাননি। আবার শুরু হয় ক্লান্তিহীন নৌভ্রমণ। বাংলা ও আসামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে হিদায়াতের বাণী পৌঁছে দেওয়া, বিভিন্ন স্থানে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, এসকল মাদরাসার তত্ত্বাবধান আর নৌকাযুগে এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় সফর, এই ছিল জৌনপুরী (র.) এর প্রাত্যহিক কার্যক্রম। এভাবে কেটে যায় আরো দশটি বছর।

১২৯০ হিজরীর ৩ রবীউস সানী মুতাবেক ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩ মে। মহান এই সংস্কারক ও ধর্মপ্রচারক তাঁর রবের রহমতের আশ্রয়ে পরপারে পাড়ি জমান বাংলাদেশের রংপুর শহরে। জীবদ্দশায় বাংলায় তাঁর কোন স্থায়ী ঠিকানা ছিল না, নৌবহরই ছিল তাঁর ঠিকানা। ইন্তিকালের পর সমাহিত হলেন রংপুরের মুনশিপাড়া জামে মসজিদের পাশে। রংপুরেই শুয়ে আছেন তিনি। সারাজীবনের মূল কর্মক্ষেত্র বাংলায় থেকে গেছেন, ফিরে যাননি মাতৃভূমি জৌনপুরে। আজও বাংলার মানুষ তাঁদের মহান পথপ্রদর্শককে স্মরণ করেন বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে।

শতাধিক খলীফা ও ১৪জন সন্তান-সন্ততি রেখে যান কারামত আলী জৌনপুরী (র.)। ইন্তিকালের পর তাঁর কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যান তাঁরা। এক্ষেত্রে তাঁর দুই সুযোগ্য সন্তান হযরত হাফিয আহমদ জৌনপুরী (র.) ও হযরত আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী (র.) এর অবদান সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। হযরত হাফিয আহমদ জৌনপুরী (র.) এর অন্যতম খলীফা হযরত শাহ ইয়াকুব বদরপুরী (র.)। বাংলাদেশের সিলেট ও ভারতের আসাম অঞ্চলে তার দ্বীনী খিদমত সর্বজনবিদিত। তাঁর অন্যতম খলীফা হযরত আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) সমকালে যে খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তার তুলনা বিরল। আজও তাঁর খান্দানের এবং তাঁর সিলসিলার বুযুর্গগণ তাঁর খিদমতের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছেন।

হযরত কারামত আলী সিদ্দীকী জৌনপুরী (র.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনার পর এবার বর্ণাঢ্য জীবনের বহুমুখী কার্যক্রমসমূহের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা তুলে ধরছি। তাঁর সমস্ত কার্যক্রমকে মোটা দাগে তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। অধ্যাপনা, গ্রন্থ রচনা, ধর্ম প্রচার ও ধর্মীয় সংস্কারমূলক কার্যক্রম। প্রতিটি কার্যক্রমই বিস্ময়কর সাফল্য ও মকবুলিয়ত অর্জন করেছে, যার প্রভাব আজও আমরা দেখতে পাচ্ছি।

অধ্যাপনা: জৌনপুরী (র.) কেবল এক ধর্মপ্রচারক পীর ছাহেবই ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হানাফী ফকীহ ও খ্যাতনামা কারী। বাংলা, আসাম ও জৌনপুর তথা গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে তিনি তাঁর ইলমি দক্ষতার

সৌরভ ছড়িয়ে দিয়েছেন সাফল্যের সাথে। বিভিন্ন স্থানে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ছাড়াও নিজে অধ্যাপনার জন্য তাঁর নৌবহরেই যুক্ত করেছিলেন এক ভ্রাম্যমাণ মাদরাসা। এ মাদরাসায় তিনিই অধ্যাপনা করতেন, তিনিই এ মাদরাসার ব্যয় নির্বাহ করতেন। সাধারণত সকাল আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত তিনি তাঁর এ ভ্রাম্যমাণ মাদরাসায় বিভিন্ন বিষয় অধ্যাপনা করতেন, এরপর শুরু হতো অন্যান্য কার্যক্রম। আবার বাদ মাগরিব ইলমে কিরাত ও তাজভীদের অধ্যাপনা করতেন একই মাদরাসায়। দাওয়াতি কার্যক্রমে চরম ব্যস্ততা সত্ত্বেও তার অধ্যাপনার এই রুটিন ছিল প্রাত্যহিক। প্রতিদিন এ রুটিন অনুসারে ইলমে দীনের খেদমত চালিয়ে যেতেন।

গ্রন্থ রচনাঃ জৌনপুরী (র.) এর সারা জীবন ছিল দাওয়াতী সফরে ভরপুর। স্বাভাবিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে লেখালেখির জন্য তাঁর খুব বেশি সময় পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু তিনি তাঁর ব্যস্ততার ফাঁকেও নিজের কলমকে থামিয়ে রাখেননি। বিরামহীন লিখে গিয়েছেন মুসলিম জনগোষ্ঠীর জ্ঞানগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য। মাত্র ২০ বছর বয়সে ইসলামী বুনিয়াদি ইলমের কিতাব 'মিফতাহুল জান্নাত' লিখে যে যাত্রা শুরু করেছিলেন, সেই যাত্রা অব্যাহত রেখেছেন সারা জীবন। তাঁর রচিত গ্রন্থসম্ভারের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। কোন বর্ণনা মতে এ সংখ্যা চল্লিশের কম নয়, কারো কারো মতে অবশ্য তার রচিত মোট গ্রন্থসংখ্যা ১০০'র কাছাকাছি। এর মধ্য থেকে মাত্র ১৯টি গ্রন্থ 'যখীরায়ে কারামত' নামে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। অন্যান্য গ্রন্থসমূহ এখন দুষ্প্রাপ্য। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর লেখা গ্রন্থসমূহের মধ্যে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো

ক. ফিকহ, মাসআলা-মাসাইল ও ইসলামী মৌলিক জ্ঞান **বিষয়ক গ্রন্থঃ** এ বিষয়ে তাঁর লেখা অনেকগুলো কিতাব রয়েছে। তন্মধ্যে মিফতাহুল জান্নাত, যিনাতুল মুসাল্লী, ফাযায়েলে হারামাইন, তাযকিয়াতুন নিসওয়ান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

খ. আকীদা বিষয়ক গ্রন্থঃ তাযকিয়াতুল আকাইদ, আকাইদে হাক্কাহ প্রভৃতি তাঁর লেখা আকীদা বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

গ. হাদীস শাস্ত্রঃ ইলমে হাদীসের খেদমতে তিনি যে সকল গ্রন্থ সংকলন করেছেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তরজমায়ে মিশকাত, তরজমায়ে শামাইলে তিরমিযী ইত্যাদি।

ঘ. তাজভীদ শাস্ত্রঃ তাজভীদ শাস্ত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো- শরহে জযরী, শরহে শাতবী, যীনাতুল কারী, মাখারিজুল হুরূফ, কাওকাবে দুররী ইত্যাদি। এসকল গ্রন্থ সমসাময়িক আলিমদের নিকট এতোটাই গ্রহণযোগ্যতা

অর্জন করে যে, তাঁর সুযোগ্য ছেলে আল্লামা আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী (র.) মক্কা শরীফ সফরের সময় দেখতে পান, এসকল গ্রন্থ মক্কা শরীফেও তাজভীদ শাস্ত্রে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পড়ানো হচ্ছিল।

ঙ. ইলমে তাসাওউফ: ইমামুত তরীকত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর অন্যতম প্রধান খলীফা হিসেবে তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সাথে তাসাওউফের খেদমত আনজাম দিয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- বায়আত ও তাওবাহ, ফয়যে আম, যা-দুত তাকওয়া, মুরাদুল মুরীদীন, রাফীকুস সালিকীন ইত্যাদি।

চ. বাহাস-মুনাযারা বিষয়ক গ্রন্থ: জৌনপুরী (র.) সারা জীবন বহু ভ্রান্ত গোষ্ঠীর ভ্রান্তি অপনোদনে এবং বিদআত ও ভণ্ডামীর মূলোৎপাটনে কাজ করে গেছেন। এক্ষেত্রে তিনি অনেক সময় সরাসরি মুনাযারায় অংশগ্রহণ করে ইসলামের সঠিক শিক্ষা তুলে ধরেছেন, আবার কখনো কখনো বিভিন্ন ভ্রান্ত গোষ্ঠীর বিভ্রান্তি অপনোদন করে গ্রন্থ রচনা করেছে। এ ধরনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো- তাযকিয়াতুল ফুয়াদ, আল-কাওলুস সাবিত, মিরআতুল হক, বারাহিনে কাতিয়া, নাসীমুল হারামাইন, কুওয়াতুল ঈমান ইত্যাদি।

দুঃখজনক হলেও সত্যি, তাঁর রেখে যাওয়া এসকল আমানত যথাযথরূপে সংরক্ষণ হয়নি। অনেক গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না, আবার কিছু কিছু গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেক প্রকাশক খেয়ানত করেছেন।

ধর্মপ্রচার ও ধর্মীয় সংস্কার: কারামাত আলী জৌনপুরী (র.) তাঁর পুরো জীবন ধর্ম প্রচারেই উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর জীবনী আলোচনা করে আমরা দেখতে পাচ্ছি, জীবনের বেশির ভাগ সময় তিনি এ কাজেই ব্যয় করেছেন। জীবনভর যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, সে প্রচেষ্টার সাফল্যও ছিল ঈর্ষণীয়। শত শত বছর মুসলিম শাসনাধীন বাংলায় মুসলমানরা ছিল সংখ্যালঘু, কারণ কোনো মুসলিম শাসকই এ দেশে ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেননি। উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সর্বপ্রথম এই বাংলাতে, পলাশীর প্রান্তরে সিরাজুদ্দৌলার পতনের মাধ্যমে। ব্রিটিশ শাসনের প্রাণকেন্দ্র বাংলা অঞ্চলই ছিল জৌনপুরী (র.)'র ধর্মপ্রচারের মূল কর্মক্ষেত্র। চরম প্রতিকূল এই পরিস্থিতিতেও তিনি নিজের কাজ চালিয়ে যান সাফল্যের সাথে যার প্রত্যক্ষ ফলাফলরূপে আমরা দেখতে পাই- ব্রিটিশরা যখন এ দেশ ছেড়ে চলে যায়, তখন অবিভক্ত বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ছিল ইসলাম ধর্মাবলম্বী।

কারামত আলী জৌনপুরী (র.) ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় দিক থেকে সবচেয়ে অস্থির সময়ের সাক্ষী। চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তিনি যেভাবে ইসলামের সুমহান বাণী বাংলা ও আসামের ঘরে ঘরে

পৌঁছিয়েছেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দিতে তো বটেই, উপমহাদেশের ইসলাম প্রচারে তাঁর দাওয়াতি কার্যক্রম সর্বযুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সফল কার্যক্রম হিসেবে স্বীকৃত। বিখ্যাত আলিম শাইখ আবুল হাসান আলী নদভীর মতানুসারে কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর হাতে হিদায়াতের দাওয়াত গ্রহণ করেছেন প্রায় দুই কোটি মানুষ। (কারওয়ানে যিন্দেগী, ৩য় খণ্ড, ৫৪ পৃ.) আরো অসংখ্য মানুষ ইসলামের সুমহান বাণীর দাওয়াত পেয়েছেন তাঁর মুরীদ ও ছাত্রদের মাধ্যমে। তাছাড়া তাঁর মাধ্যমে শুধু অমুসলিমরাই মুসলিম হননি, বরং অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত এ অঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠীও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করেছেন, জাগ্রত হয়েছে তাদের ইসলামী চিন্তা-চেতনা। সাফল্য ও মকবুলিয়তের বিবেচনায় তাঁর ধর্ম প্রচার ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের নযীর পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

সে যুগে মুসলিম সমাজে হিন্দুয়ানি সংস্কৃতি ও রীতিনীতি বহুল প্রচলিত ছিল। মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের বিধি-বিধান ছিল উপেক্ষিত। কুরআন শরীফের মাসহাফ ছিল বাংলা অঞ্চলে দুর্লভ। নামায-রোযার মতো আবশ্যিক বিষয় সম্পর্কেও অনেক মুসলমান কিছুই জানতো না। উল্টো অনেক মুসলমান বাড়িতে তুলসির মঞ্চে বাতি জ্বালাতো। মুসলমান মেয়েদের মধ্যে শাঁখা সিঁদুর পরার প্রচলন ছিল। কবরে সিজদা করে মৃত ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করতো। পর্দার বিধান ছিল একেবারেই উপেক্ষিত। নারী-পুরুষ কেউই ইসলামের নির্দেশিত পোশাক-পরিচ্ছদে অভ্যস্থ ছিলেন না, বরং স্থানীয় এমন সব পোশাক পরিধান করতেন, যা ছিল ইসলামী বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য বা স্বকীয়তা বলতে কিছু অবশিষ্ট ছিল না। এমনকি মুসলমানদের নামের শুরুতে হিন্দুদের অনুসরণে শ্রী লেখা হতো।

কারামত আলী জৌনপুরী (র.) মুসলিম সমাজে ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। মুসলিম সমাজে ধর্মীয় বিধান অনুসারে পোশাক পরিধানের প্রথা চালু করেন, ভণ্ডামি ও গোমরাহি থেকে মুক্ত করেন, মুসলিম সমাজে প্রচলিত হিন্দুয়ানি সংস্কৃতি বিলুপ্ত করেন। মুসলমানদের নামের শুরুতে শ্রীর বদলে মুহাম্মদ লেখার প্রচলন শুরু করেন। নামায-রোযাসহ ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি দেশের এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে অবিরাম সফর করতে থাকেন। জনশূন্য কিংবা বিদআত ও ভণ্ডামিতে ভরপুর মসজিদসমূহ তিনি আবাদ করেন। জৌনপুরী (র.) নিজ হাতে কুরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করে বিভিন্ন এলাকায় বিতরণ করেন।

কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর ধর্মপ্রচার ব্রিটিশ আমলে বাংলার জনমতে বদলে দিয়েছিল। তাঁর সেই সুদূরপ্রসারী কার্যক্রমের ফলেই বাংলাদেশ আজ পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাতৃভূমি। আমাদের এ ভূখণ্ড যে

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের অংশ এবং তারপর ১৯৭১ সালে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, তার পিছনে এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ফলে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর সুদূরপ্রসারী আন্দোলনের ফসল বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না।

তথ্যসূত্রঃ

১. মাওলানা আব্দুল বাতিন জৌনপুরী, সীরাতে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.), মুল্লাটোলা, জৌনপুর, ভারত।
২. মাওলানা মুজিবুল্লাহ নদভী, তাযকিরায়ে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী, সায়্যিদ আহমদ শহীদ অ্যাকাডেমি, রায়বেরেলভী (২০০৯), ভারত।
৩. মৌলভী খায়রুদ্দীন এলাহাবাদী, তাযকেরাতুল উলামা, কলকাতা, ভারত। এ. আর. মল্লিক, ব্রিটিশ পলিসি অ্যান্ড ব্যাঙ্গলি মুসলিম, ঢাকা (১৯৬১)।
৪. জাফর থানেশ্বরী, সাওয়ানিহে আহমদী।
৫. মুফতী ইন্তেজাম উল্লাহ আশ-শিহাবী, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আওর বাগী উলামা।
৬. এন. হানিফ, বায়োগ্রাফিকাল এনসাইক্লোপিডিয়া অফ সুফিজ, নয়া দিল্লি (২০০০), ভারত।
৭. বাংলাপিডিয়াঃ বাংলাদেশের জাতীয় বিশ্বকোষ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।
৮. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

অমর বালাকোট-সংগ্রামী :
নোয়াখালীর মাওলানা গাজী ইমামুদ্দীন বাঙ্গালী রাহ.

শরীফ মুহাম্মদ

তার নামটাই এসেছে প্রথমে এবং প্রধান হয়ে। তৎকালীন পূর্ববঙ্গ অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে। ব্রিটিশকবলিত বাংলা-ভারত উপমহাদেশজুড়ে পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রাম বা জিহাদ আন্দোলনের তিনি ছিলেন প্রথম সারির একজন কান্ডারি। ১৮২০ সাল থেকে ১৮৩১ সাল পর্যন্ত তিনি সে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ওতপ্রোতভাবে; নিবেদন, সমর্পণ, সংগঠন ও নেতৃত্ব নিয়ে। আজাদির সংগ্রামে নিবেদিত এই মহান পুরুষের জন্মভিটা ছিল তৎকালীন পূর্ববঙ্গের নোয়াখালীর হাজীপুরে। গবেষক-আলেম গোলাম রসূল মেহেরের গ্রন্থে লেখা হয়েছে, সুধারাম-হাজীপুর। আর ইতিহাস বিশ্লেষক চিন্তাবিদ, দাঈ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে, হাজীপুর-বাংলাদেশ। তিনি ছিলেন বিপ্লব-সাধনা ও আধ্যাত্মিকতার ইমাম, আন্দোলনের প্রাণপুরুষ সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর বিশিষ্ট শিষ্য ও খলীফা। এই আন্দোলন চলাকালে পূর্ববঙ্গ থেকে বিপ্লবী আলেম রিক্রুট এবং পূর্ববঙ্গে সে আন্দোলনের দ্যুতি ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ সবচেয়ে বেশি করেছেন তিনিই।

উনবিংশ শতকের এই দরবেশ বিপ্লবী তার জীবনের শেষ প্রায় দুটি যুগ কাটান নোয়াখালীর সাদুল্লাপুরে। তৎকালীন এক দ্বীনদার দারোগা (ভূস্বামী) সাবের খাঁ স্বেচ্ছায় তার বহু খেদমত করেছেন। ঠাঁই গোজার জন্য তাকে কিছু জায়গা-জমি দিতে চেয়েছেন। তিনি তাতে সম্মত না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ওই দারোগা তার স্ত্রীর নামে এক প্রকার জোর করে সাদুল্লাপুরের জায়গাটুকু দান করেন। তখন থেকেই তার পরিবার ও বংশধরের বসবাস সাদুল্লাপুরে। সুতরাং আমাদের যেতে হবে সেখানেই। সে হিসেবে দুপুর গড়িয়ে চৌমুহনী থেকে সাদুল্লাপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা। সঙ্গী মাওলানা উমায়ের কোববাদীর সঙ্গে যোগ হয়েছেন আলেম-লেখক নেযামুদ্দীন। এখলাসপুর-মাইজদি হয়ে আসরের সময় আমরা পৌঁছলাম ধন্যপুর মিফতাহুল উলূম মাদরাসার সামনে। অভিজ্ঞ রাহবার হিসেবে সেখানে যুক্ত হলেন ওই মাদরাসার নওজোয়ান মুহাদ্দিস মাওলানা নূরুল আলম।

৯ মার্চের বিকাল। গাছের ছায়াগুলো তখন বেশ দীর্ঘ। মাওলানা গাজী ইমামুদ্দীনের ভিটার মুখে প্রাচীন মসজিদের সামনে এসে দাঁড়ালাম। সামনে ছোট মাঠ ও পুকুর। দক্ষিণ পাশে ঘন গাছ-গাছালিতে ঢাকা অপ্রশস্ত কবরস্থান। সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘেরাও করা। এই কবরস্থানে শুয়ে আছেন তার স্ত্রী, মেয়েরা। শুয়ে আছেন শত বছর আগে চলে যাওয়া তার পরিবারের আরও ক'জন মুরব্বি। কিন্তু তিনি এখানে নেই। এ মসজিদ তার আমলে তাকে কেন্দ্র করেই নির্মিত। এই ভিটা তাকে ঘিরেই এখন জনবসতি। তার জীবন ও জীবনের ঘটনা নিয়ে বহু কিংবদন্তি এই দহলিজে বিচরণ করছে। এর সবকিছুর সঙ্গেই তার স্মৃতির পরশ আছে, কেবল তার কবরটি এখানে নেই। তিনি আর কেউ নন, বিখ্যাত আলেম-দরবেশ ও যোদ্ধা মাওলানা গাজী ইমামুদ্দীন বাঙ্গালী (রহ.)। দুঃখ-সুখের এক অপার্থিব জীবন ছিল তার।

দুইঃ ১৭৮৮ সালে নোয়াখালীর হাজীপুরে ইমামুদ্দীনের জন্ম। ৩ বছর বয়সে এতীম হয়ে যান। তার আম্মার আবার বিয়ে হয়। অবহেলা ও বঞ্চনার জীবন কাটে তার শৈশব-কৈশোরে। মমতাময়ী মায়ের চোখের পানিতে অনুমোদনের রোদ দেখে দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের জন্য পথে নামেন। নোয়াখালী, ঢাকা হয়ে কলকাতায় যান। কোন কোন মাদরাসায় পড়েছেন এখন আর জানা যায় না। লেখাপড়ার শেষ প্রান্তে তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন দিল্লীর মাদরাসায়ে রহিমিয়ায় উপমহাদেশের শীর্ষ আলেম শাহ আবদুল আযীয (রহ.)-এর। এই শাহ আবদুল আযীযের শিষ্য সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.) নিজেও। সাইয়েদ সাহেবের বিশিষ্ট দুজন অনুসারী শাহ ইসমাইল (রহ.) ও শাহ আবদুল হাই (রহ.) ও তার শিষ্য ছিলেন। বাংলাদেশে শাহ আবদুল আযীযের সরাসরি শিষ্য সম্ভবত গাজী মাওলানা ইমামুদ্দীন ছাড়া আর কেউ নেই। শাহ আবদুল আযীয ছিলেন উপমহাদেশের মুসলিম চিন্তানায়ক মনীষী-আলেম শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)-এর ছেলে। তিনিই প্রথম ব্রিটিশকবলিত ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' বা শত্রু কবলিত দেশ হিসেবে ফতোয়া দেন এবং তার আধ্যাত্মিক দীক্ষাপ্রাপ্ত শাগরিদ সাইয়েদ আহমদ শহীদকে ভারতবর্ষ মুক্ত করার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেন।

দিল্লীতে থাকাকালে প্রায় ত্রিশ বছর বয়সী যুবক ইমামুদ্দীন সাইয়েদ আহমদ শহীদের সঙ্গে দেখা করেন। তখন অনেকেই তার কাছে মুরিদ হচ্ছিলেন। ইমামুদ্দীন সে সময়ে মুরিদ হননি। তিনি তার মুরিদ হন লাখনৌর এক বাইয়াতের মজলিসে, আকস্মিক সিদ্ধান্তে। এরপর ৩ দিন কাটে তার প্রায় বেহুশের মতো, মজযুব অবস্থায়। তখন থেকেই তার মুর্শিদ সাইয়েদ আহমদ শহীদের সঙ্গে তিনি সার্বক্ষণিকভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। প্রায় সব সফর, সব অভিযান ও সংগ্রামে তিনি তার সঙ্গেই ছিলেন; একদম ১৮৩১ সালের বালাকোট পর্যন্ত। ১৮২২ সালের

কলকাতা সফর এবং সেখান থেকে হজ্বের সফরেও তার উপস্থিতির বর্ণনা রয়েছে। সে সময় তিনি কলকাতা থেকে সাইয়েদ সাহেবের অনুমতি নিয়ে নোয়াখালী আসেন তার আম্মার সঙ্গে দেখা করতে। সাইয়েদ সাহেব হজ্বের সফরে তার আম্মাকে নিয়ে আসতে বললেও বিশেষ অপারগতায় তার আম্মা যেতে পারেননি। তিনি তখন নোয়াখালী ও পার্শর্ববর্তী অঞ্চলের ৪০ জন বিপ্লবী মুজাহিদকে নিয়ে কলকাতায় ফেরেন। তারপর কাফেলার সঙ্গে হজ্বে যান। তার অবস্থান বেশিরভাগ সময়েই থাকত সাইয়েদ সাহেবের কাছাকাছি। সাহস, আনুগত্য, আস্থা আর নিবেদনের যোগ্যতার কারণে দায়িত্বপূর্ণ বহু কাজে তাকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রাখা হতো। ১৮২৯ সালে পাঞ্জতারে নির্মিত দুর্গে তার কামরা আর সাইয়েদ সাহেবের কামরার মাঝে ছিল আরেকটি কামরা। মাঝের কামরাটি ছিল ঠিকানা ও সূত্র না জানা আরেক বাঙ্গালী সাধক-বিপ্লবী ওয়ারেস আলী বাঙ্গালীর। গোলাম রসুল মেহের তার গ্রন্থে পাঞ্জতার দুর্গের যে নকশাটি দিয়েছেন তাতে অবস্থান ও নামের তালিকায় এ বিষয়টি দেখা গেছে। ২০ জনের ওই তালিকার ১৮ নাম্বার নামটি ছিল নূর মুহাম্মদ বাঙ্গালীর। অর্থাৎ সুফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী রাহ.-এর। বাংলা-ভারত সর্বব্যাপী ওই আন্দোলনে অন্য অঞ্চলের মতো বাংলা অঞ্চলের বিপ্লবী মুজাহিদদের নামের সঙ্গে 'বাঙ্গালী' শব্দটি যুক্ত করেছেন ঐতিহাসিকরা। সম্ভবত এ শব্দটি মুজাহিদগণের নিজেদের মধ্যেও ব্যবহৃত হত। পরিচয়ের সুবিধার্থে ব্যবহৃত বাঙ্গালী শব্দটি তাদের নামের অংশ হয়ে গিয়েছিল।

বালাকোটের পর তিনি নোয়াখালী ফিরে আসেন। তখন তিনি ছিলেন অর্থ-বিত্তহীন, নাম-ডাকমুক্ত অতি সাধারণ প্রায়-পৌঢ় একজন মানুষ। তার ভেতরের অবস্থা তাকে দেখে বোঝা যেত না, তিনি ছিলেন বড় আলেমে দ্বীন, বড় বিপ্লবী-মুজাহিদ, বড় আল্লাহওয়ালা দরবেশ। তার স্বরূপ যখন ধীরে ধীরে প্রকাশ হতে থাকে তখন তার চারপাশে দ্বীনপাগল মানুষেরা এসে ভিড় করেন। তার জীবন যাপন ও দ্বীনী কাজে সহায়ক হিসেবে বহু মানুষ নিজেদের নিবেদন করেন। নোয়াখালী ফিরে আসার পর তার কামালত ও মহত্বের বিষয়টি কিছুদিনের মধ্যে সংশ্লিষ্টজনদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। তার জীবনের বহু কারামতের ঘটনা তাই লোকের মুখে মুখে চর্চা হয়। কিন্তু ফিরে আসার পর প্রথম পর্যায়ে অপরিচিতিজনিত অনেক রকম প্রতিকূলতার মধ্যে তাকে পড়তে হয়েছে। তার বিয়ের জন্য তিনি একা যান তৎকালীন বড় বুযুর্গ রামগতির চাঁদশাহ ফকীর (রহ.)-এর বাড়িতে। তার মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। অপরিচিতি ও মুরবিব না থাকার কারণে প্রথমে তার কাছে মেয়ে বিয়ে দেওয়া নিয়ে সংশয় প্রকাশিত হলেও পরে তার তাৎক্ষণিক বুযুর্গি, শরাফত ও কারামত দেখে মুগ্ধতার সঙ্গে তার কাছে মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে পারিবারিক পরম্পরাসূত্রে সুন্দর কিছু ঘটনার কথাও জানা যায়। মাসিক আলকাউসার-এর সম্পাদক ও তত্ত্বাবধায়ক

মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ছাহেব ও মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেবের মুহতারামা আম্মাজান তার বড় ছেলেকে জানিয়েছেন, মাওলানা গাজী ইমামুদ্দীন (রহ.) ছিলেন তাঁর নানুর খালু। সে কারণেই মুরব্বি পরম্পরায় তারা মৌখিকভাবে গাজী সাহেবের বিবাহ ও পরবর্তী সময়ের কিছু কিছু ঘটনা শুনেছেন। এসব ঘটনায় প্রমাণিত হয়, গাজী ইমামুদ্দীন (রহ.) একজন ছাহেবে কারামত মুস্তাজাবুদ্দাওয়াত বুযুর্গ ছিলেন। সমকালে নিজ অঞ্চলে তিনি সব মহলের কাছে বরেণ্য, সম্মানীয় ও সমাদৃত ছিলেন।

দেশে ফিরে আসার পর স্থানীয়ভাবে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে তার যুক্ত হওয়ার লিখিত কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। কিন্তু মৌখিকভাবে জানা যায়, ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে বৃহত্তর নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা অঞ্চলে ধর্মপ্রাণ মানুষকে উদ্দীপ্ত ও সংগঠিত করার পেছনে তিনি আজীবন ভূমিকা রেখে গেছেন। তার প্রকাশ্য তৎপরতা ছিল ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও শুদ্ধ, সুস্থ দ্বীনী জীবনে মানুষকে দীক্ষাদান। একজন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সাধক দরবেশ হিসেবে তার নাম এখনও বৃহত্তর নোয়াখালীর ধর্মপ্রাণ মানুষের ঘরে ঘরে উচ্চারিত হয়। সাইয়েদ আহমদ শহীদের আরেক খলীফা কারামত আলী জৌনপুরী (রহ.) বাংলা অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াতের কাজে এলে পরবর্তী সময়ে প্রবীণ এই পীর ভাইয়ের কাছে উপদেশ ও সংস্রব গ্রহণ করতেন। তার কাছে 'সিরাতুল মুস্তাকীম' গ্রন্থের পাঠও গ্রহণ করতেন। নৌকায় চড়ে তিনি সাদুল্লাপুরে এসে উঠতেন। ১৮৫০ সালের দিকে নোয়াখালী অঞ্চলে গাজী ইমামুদ্দীনের বহু মুরিদ-অনুসারী, খলীফা গড়ে ওঠেন। এদেরই একজন ছিলেন এদেশের বরেণ্য বুযুর্গ হযরত হাফেজ্জী হুজুর (রহ.)-এর দাদা লক্ষ্মীপুরের লুধুয়া নিবাসী মাওলানা আকরামুদ্দীন মিয়াজী (রহ.)।

গোলাম রসুল মেহের লিখেছেন, গাজী ইমামুদ্দীন (রহ.) শেষ জীবন কাটিয়েছেন রাজস্থানের টোঁকের নবাব ওয়াযিরুদ্দৌলার মেহমানদারিতে। কিন্তু বালাকোট পূর্বাপর তথ্য সমন্বয় করে দেখলে মনে হয়-টোঁকে গাজী সাহেবের অবস্থানের ঘটনাটি ঘটেছে বালাকোটের পর পর। এরপর তিনি দেশে ফিরে এসেছেন এবং এখানেই সংসার যাপন ও হেদায়াতের কাজ করেছেন। ১৮৫৮ সালে তিনি নিজ উদ্যোগে সংগঠিত কাফেলা নিয়ে দ্বিতীয়বার হজ্বে যান এবং ফেরার পথে ১৮৫৯ সালে এডেনের কাছে জাহাজে তার ইন্তেকাল হয়। জাহাজের মধ্যে সফরসঙ্গী হাজী সাহেবগণ ইহরামের কাপড়ের কাফন পরিয়ে নামাযে জানাযা পড়ে পাথর বেঁধে তার লাশ সমুদ্রে নামিয়ে দেন। জিহাদ আন্দোলনে পূর্ববঙ্গের প্রধান কান্ডারি এই বিপ্লবী দরবেশের সলিলসমাধি হয় আরব সাগরের এক অজ্ঞাত জায়গায়। তার কবর খুঁজে বের করার এবং কবরের সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর সাধ্য আর কারও নেই। লোক পরম্পরায় শোনা যায়, শেষ জীবনে

তিনি প্রকাশ্যে দুআ করেছেন ও আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছেন তার কবর যেন লোকেরা খুঁজে না পায়। আল্লাহ তার দুআ কবুল করেছেন। জানা যায়, একই দুআ করেছিলেন তার মুর্শিদ সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.)। এ জন্য বালাকোটে শহীদ হওয়ার পর তার লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি। একদল মানুষ বহুদিন পর্যন্ত বিশবাস করত, তিনি বেঁচে আছেন, আত্মগোপন করে আছেন, সময় হলেই প্রকাশ হবেন।

বালাকোটে শহীদ বিপ্লবী মুজাহিদদের তালিকায় বেশ কয়েকজন বাঙ্গালীর নাম রয়েছে। এদের বেশিরভাগই ছিলেন গাজী ইমামুদ্দীনের রিক্রুট। এদেরই একজন ছিলেন তার আপন ভাই-আলীমুদ্দীন শহীদ (রহ.)। ধারণা করা হয় হাজীপুরের এই আলীমুদ্দীন ছিলেন তার বৈপিতৃয় ভাই। গাজী মাওলানা ইমামুদ্দীন (রহ.)-এর ওপর ড. শাহ মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ ইসলামী বিশ্বকোষের ৫ম খন্ডে (দ্বিতীয় সংস্করণ) নাতিদীর্ঘ একটি নিবন্ধ লিখেছেন। অধ্যাপক ড. আহসানুল্লাহ ফয়সাল এ বিষয়ে গবেষণার কাজ চালু রেখেছেন। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'চরিতাভিধান'-এ অনুর্ধ্ব মাত্র ১০০ শব্দের একটি ছোট নিবন্ধও রয়েছে তার ওপর।

তিন ঃ প্রখ্যাত গবেষক মাওলানা গোলাম রসূল মেহের হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.) এবং জিহাদ আন্দোলন নিয়ে লিখিত তার তৃতীয় খন্ডের গ্রন্থটির নাম রেখেছেন, 'জামাআতে মুজাহিদীন'। এ গ্রন্থে জিহাদ আন্দোলনে অংশ নেওয়া বিপ্লবী মুহাজিদগণের জীবন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তাতে মাওলানা গাজী ইমামুদ্দীন (রহ.) সম্পর্কে প্রায় দেড় পৃষ্ঠার একটি বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) লিখিত 'কারাওয়ানে ঈমান ওয়া আযীমত' গ্রন্থে ইমামুদ্দীন (রহ.) সম্পর্কিত আলোচনাটি একই রকম। সে আলোচনায় সাইয়েদ সাহেবের কাছে বায়আত হওয়ার ঘটনা থেকে নিয়ে তার আধ্যাত্মিক উচ্চতা বিষয়ক বিশ্বস্ত বিবরণ রয়েছে। এখানে গোলাম রসূল মেহের লিখিত আলোচনাটি তুলে ধরা হল-'মওলবী ইমামুদ্দীন জেলা সুধারাম, (বর্তমান নোয়াখালীর) হাজীপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভীর কাছ থেকে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। সাইয়েদ সাহেব রাজপুতানা থেকে দিল্লী পৌছলে বহু লোক বায়আত করতে শুরু করেন। মওলবী ইমামুদ্দীনও তার মজলিসে বসতেন ও আলাপ-আলোচনা করতেন, কিন্তু বায়আতের দিতে তার আগ্রহ দেখা যেতো না। কিছুদিন পর সাইয়েদ সাহেব রায়বেরেলী থেকে লাখনৌ গেলেন ও সেখানে কয়েক মাস থাকলেন। মওলবী ইমামুদ্দীনও সেখানে এলেন। সাইয়েদ সাহেব বায়আত নেওয়ায় ব্যস্ত হলেন। এসব দেখে মওলবী ইমামুদ্দীনের মনে ভাবান্তর হলো এবং তিনি বায়আত করার জন্য তৈরি হলেন। প্রায় তিন দিন তিনি অচেতন হয়ে থাকলেন। কেবল নামাযের সময়ে কিছুটা সংজ্ঞা ফিরে আসতো। তখন থেকে তিনি সব সময়ের জন্য সাইয়েদ সাহেবের সাহচর্যে

থাকতেন। তার শাহাদাত পর্যন্ত তিনি তার সাহচর্য ত্যাগ করেননি। সাধারণত 'তাওয়াজ্জুহ' দেওয়া প্রসঙ্গে তাঁর উল্লেখ দেখা যায়। অর্থাৎ সাইয়েদ সাহেবের কাছে যারা বায়আতে তওবা করতেন, তাদেরকে 'তাওয়াজ্জুহ' দেবার হুকুম হতো মওলবী সাহেবের উপর। চার সদায় সাইয়েদ মীর খান দুররানীকে তিনি তাওয়াজ্জুহ দিয়েছিলেন।

নওয়াব ওয়াযিরুদৌলা 'ওসায়া' গ্রন্থে লিখেছেন যে, মওলবী সাহেব 'সীরাতুল মুসতাকীম' কয়েকবার খোদ সাইয়েদ সাহেবের কাছে পড়েছিলেন। পাঠদানের সময় সাইয়েদ সাহেব (রহ.) বিচিত্র তাৎপর্য উদঘাটন করতেন। মওলবী ইমামুদ্দীন সকল তাৎপর্য অন্তরে সংরক্ষণ করতেন এবং এই কিতাবের ব্যাখ্যা সম্পর্কে তিনি বিশেষ উপলব্ধি হাসিল করেছিলেন।

হজ্বের সফরকালে তিনি রায়বেরেলী থেকে সাইয়েদ সাহেবের সাথে বেরিয়ে যান। কলকাতায় পৌঁছলে তিনি এজাযত নিয়ে মাতাকে দেখার জন্য গৃহে চলে যান। সাইয়েদ সাহেব মাতাকেও হজ্বের জন্য সাথে নিয়ে আসতে বলে দিলেন। তার আম্মা এলেন না, কিন্তু তাঁর সাথে ত্রিশ-চল্লিশজন লোক যিয়ারত ও বায়আতের উদ্দেশ্যে এলেন। ...

প্রত্যাবর্তন ঃ বালাকোটের পর মওলবী সাহেব দেশে ফিরে আসেন। তারপর টোঁকে বসতি স্থাপন করেন। নওয়াব ওয়াযিরুদ্দৌলা 'সীরাতুল মুসতাকীম' তার কাছে পড়েছিলেন। নওয়াবের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'ওসায়া' প্রণয়নকালে মওলবী সাহেব জীবিত ছিলেন। নওয়াব সাহেব লিখেছেন : 'তিনি উপদেশ দান কার্যে নিযুক্ত রয়েছেন এবং বহু লোক তার হেদায়াত থেকে কল্যাণ লাভ করেছেন। বহুবার দেখেছি, যিকরে জেহরের তালীমের সময়ে যখনই আল্লাহর পবিত্র নাম মুখে আসতো, তখন বাইরের চেতনা বিলুপ্ত হয়ে অন্তরের আলোকে তিনি নিমজ্জিত হতেন। তার ভাই আলীমুদ্দীনও জিহাদে শরীক ছিলেন এবং বালাকোটের যুদ্ধে শহীদ হন।'

চার ঃ গাজী ইমামুদ্দীন বাঙ্গালী (রহ.)-এর পঞ্চম প্রজন্মের একজন ৬৪ বছর বয়সী শাহাবুদ্দীন মাহমুদ। আমাদের নিয়ে মসজিদের সামনে বসলেন। তার সঙ্গে তার ভাগ্নে ফিরোজউদ্দীন এবং ফিরোজউদ্দীনের ছেলে মাদরাসার কাফিয়া জামাতে অধ্যয়নরত হাফেজ ইজহারুদ্দীন। পরিবারের পক্ষ থেকে দীর্ঘদেহী বৃদ্ধ শাহাবুদ্দীন এখন এই মসজিদের মোতোওয়াল্লী। গাজী সাহেবের স্মৃতিমূলক কোনো কিছু দেখতে চাওয়ায় আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী তিনি বাড়ির ভেতর থেকে নিয়ে এলেন দুটি ছিন্ন পুরনো পোশাক। গাজী সাহেব গায়ে দিতেন। একটি পিতলের বদনা এবং যুদ্ধে ব্যবহৃত তলোয়ারের একটি অংশ। মরিচা ধরে ক্ষয়ে যেতে যেতে এটি ছোট হয়ে গেছে; এখন দেখায় চাকুর মতো। এসবই গাজী সাহেব ব্যবহার করতেন। প্রচন্ড কৌতূহল নিয়ে আমরা জিনিসগুলো দেখলাম। গাজী সাহেবের

জীবনী রচনায় কাজে লাগবে অপ্রাপ্ত এমন কোনো তথ্য অবশ্য তার কাছে পেলাম না। তিনি জানালেন, গাজী সাহেব শারীরিক গঠনের দিক থেকে ছিলেন দীর্ঘদেহী।

মাগরিবের আযান হতে দশ মিনিট বাকি, পথে এসে দাঁড়ালাম। সামনেই শুকিয়ে যাওয়া নদী। এটাকে বলা হয় নোয়াখালী খাল। এ খালই ছিল এক সময় চলাচলের পথ। একশ' ষাট-সত্তর বছর আগে নিশ্চয়ই গাজী ইমামুদ্দীন বাঙ্গালী (রহ.) এ খাল দিয়েই দাওয়াত, সংস্কার ও সংগ্রামের কাজে এদিক ওদিক যেতেন। মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহ.) নৌকায় চড়ে এ পথেই সাদুল্লাপুর আসতেন। তখন নদী কেমন ছিল, দিন কেমন ছিল, মানুষ ও মানুষের মন কেমন ছিল? ঈমান, সাহস ও স্বাধীনতার আকাঙ্খায় উজ্জীবিত সেসব অধ্যায়ের কথা আমরা কি ফিরে দেখার চেষ্টা করব না? নাকি বিস্মৃতির ভারী চাদর দিয়ে স্বাধীনতা ও মানবিকতার সে শুভ্র আকাশটাকে ঢেকে রাখার চেষ্টাই করে যাব সারাজীবন? আমাদের মনে হয় আরেকবার ভেবে দেখা দরকার।

তথ্যসুত্র : মাসিক আল কাউসার বর্ষ: ০৯, সংখ্যা: ০৪ জুমাদাল উখরা ১৪৩৪। এপ্রিল ২০১৩

মর্দে মুজাহিদ সূফি নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী (১৭৯০- ১৮৫৮) : জীবন ও অবদান

মাসুক আহমেদ

সূফি নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রহ. উনিশ শতকের প্রভাবশালী সূফিদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি উপমহাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর মুজাহিদ সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী রহ. এর অন্যতম প্রধান খলিফা ছিলেন। নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী বালাকোট যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহন করেন এবং গাজীয়ে বালাকোট উপাধি লাভ করেন।[১]

বংশ পরিচয় ঃ

ইতিহাসবিদদের মতে তাঁর পূর্ব পুরুষ ছিলেন ইরানী সূফিবংশদ্ভূত। কালক্রমে তাঁরা আফগানিস্তানের গজনীতে সুলতান হন এবং গজনীর সুলতান বখতিয়ার কুতুব আলমের তিনি সপ্তম উত্তর পুরুষ। কারো কারো মতে, নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরীর সঙ্গে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) এঁর বংশধর খালিদ বিন আবদুল্লাহর যোগসূত্র আছে। উমাইয়া শাসনকালে জনাব আবদুল্লাহ ৬৬৪ সালে কাবুলের শাসন কর্তা ছিলেন। আবার কারো মতে, তিনি ইরানের সূফিকবি আবু মুহাম্মাদ মুসলিহ আল-দিন বিন আবদুল্লা শিরাজীর (শেখ সাদী) বংশধর।[২] আনওয়া নাইয়্যেরাইন গ্রন্থের বর্ণনা মতে, শাহ সূফি নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রহ. এর পূর্বপুরুষগণ গজনীর অধিবাসী ছিলেন। গজনী থেকে বাংলাদেশে আগমনের বহুল প্রচলিত ইতিহাস রয়েছে তা নিম্নরুপ-

বখতিয়ার নামে গজনীর বাদশাহর একজন ছেলে ছিল। বাদশাহ তাকে কুতুবে আলম নামে ডাকতেন। বাল্যকালেই বখতিয়ার পিতৃহারা হন। মৃত্যুকালে তার পিতা তাকে তার এক মামার রক্ষণাবেক্ষণে রেখে যান এবং সমস্ত রাজত্ব ও ধন-দৌলত তাকে দিয়ে অছিয়ত করেন। যদি ছেলে বড় হয়, তাহলে সমস্ত রাজত্ব ও ধন-দৌলত ছেলেকে সমর্পণ করবে। বখতিয়ার বড় হবার পর তার পিতৃসম্পত্তি মামার নিকট দাবী করলে, তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন। বরং তার উপর বিভিন্ন জুলুম, অত্যাচার করে তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়। বখতিয়ার নিরুপায়

হয়ে নিজপুত্র ফিরোজ শাহ ও কন্যা মায়মুনা খাতুন এবং কতেক সম্ভ্রান্ত লোককে সঙ্গে নিয়ে দেশ ত্যাগ করেন এবং দিল্লীর বাদশাহর নিকট উপস্থিত হন। দিল্লীর বাদশাহ রাজপুত্র হিসাবে বখতিয়ারকে খুব সম্মান করলেন। ফলে বখতিয়ারের ভাগ্য আলোকিত হয়ে গেল। বাদশাহ তার অপরিসীম বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হয়ে তাকে গৌড় নামক স্থানের বাদশাহী প্রদান করেন।

বখতিয়ার দীর্ঘ দিন নিজ দায়িত্বে বহাল থেকে যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় দেন। তার যোগ্যতা, দক্ষতা, কর্মপটুতা ও কর্তব্যপরায়ণতা স্থানীয় লোকদের ঈর্ষার কারণ হয়। বাদশাহকে এই বলে প্ররোচিত করল, তাকে যদি দেশ থেকে বহিষ্কার করা না হয়, তাহলে সে একসময় দিল্লীর বাদশাহীর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে। তাই স্থানীয় লোকজন ও বাদশাহ তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। ফলে তিনি দিল্লীতে বসবাস করা কিংবা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করা কোনটাই উচিত নয় বলে মনে করলেন এবং সুদূর নোয়াখালী জেলার দান্দীরা নামক স্থানে চলে আসেন। এখানে বখতিয়ারের বংশধর খ্যাতি অর্জন করে। ফিরোজ শাহ তার বোন মায়মুনা খাতুনকে সেনাপতি শুজা খাঁ এর সাথে বিবাহ দেন। ফলে মায়মুনাকে কেন্দ্র করে তাদের বংশ বিস্তার লাভ করে। মায়মুনা খাতুনের গর্ভে মিয়া মল্লিক জন্মগ্রহণ করেন। মিয়া মল্লিকের ঘরে ইব্রাহীম জন্মগ্রহণ করেন। ইব্রাহীমের ঘরে শেখ মুবারক ও শেখ বদ্দুহ জন্মগ্রহণ করেন। শেখ বদ্দুহ থেকে শেখ আমানুল্লাহ এবং শেখ আমানুল্লাহ থেকে শেখ নাসের মুহাম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। তার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন শেখ মুহাম্মদ ফানাহ (রঃ)। তিনিই শাহ সূফি নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী (রহঃ) এর শ্রদ্ধেয় পিতা।

জন্মসন ও স্থান ঃ

সূফি নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরীর জন্মসন ও জন্মস্থান নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভিন্নতা দেখা যায়। অধিকাংশের মতে তিনি ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে নোয়াখালী জেলার দান্দিরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৩]

শিক্ষাজীবন ঃ

তাঁর পিতা শেখ মুহাম্মাদ ফানাহ কুরআন ও হাদিস বিশারদ আলেমে দ্বীন ছিলেন। তাঁর কাছেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এরপর নোয়াখালী জেলার বাহমনী এলাকার বিশিষ্ট আলেম ও বুজুর্গ আজিমপুর দায়েরা শরীফের সূফি দায়েমের খলিফা শেখ জাহিদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করেন। এরপর উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য তিনি ঐতিহাসিক কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা গমন করেন। সেখান থেকে কুর'আন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। নূর মুহাম্মাদ আজমী তাঁর গ্রন্থে সূফি নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরীকে চট্টগ্রামের

মুহাদ্দিস কেরামের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করেন। কারো কারো মতে আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ণ সমাপ্তের পর তাঁকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। [৪]

তাসাওউফের তালীম ঃ

মাদ্রাসার অধ্যয়নের পর তিনি আজিমপুর দায়রা শরীফের গদ্দিনসীন সূফি সাইয়্যেদ লাক্বীত উল্লাহ রহ. এর কাছে নকশবন্দীয়া মোজাদ্দেদীয়া তরিকায় বাইয়াত গ্রহণ করে সূফি খেতাব লাভ করেন। [৫] এরপর হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে কলকাতায় গিয়ে সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরলভী রহ. এর কাছে কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দীয়া-মোজাদ্দেদীয়া, মুহাম্মাদীয়া তরিকায় বাইয়াত গ্রহণ করেন। [৬] 'আইনায়ে ওয়াইসী' গ্রন্থে (১০২ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত আছে, একদা সায়্যিদ আহমদ শহীদ তিনমাস কলিকাতায় অবস্থান করেন। এ সময় তাঁর প্রভাবে হাজার হাজার মুসলমান সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়। সিলেট, চট্টগ্রাম এর দূর দূরান্ত থেকেও অধিক মুসলমান আসে এবং তাঁর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করে সত্যিকার ও ধার্মিক মুসলমান হয়। সায়্যিদ মুহাম্মদ আলী স্বীয় গ্রন্থ 'মাখযানে আহমদী' গ্রন্থে লিখেছেন, প্রত্যেক এলাকা ও অঞ্চল থেকে সহস্রাধিক বরং অগণিত মুসলমান তাঁর নিকট উপস্থিত হন, শিরক-বিদাতে লিপ্ত মুসলমানগণ এবং নাফরমান ও পাপীগণ নিজেদের খারাপ কর্ম থেকে তওবা করে খাটি মুমীনের দলভুক্ত হয়। সে সময় চট্টগ্রাম জেলার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মীরসরাই থানার অন্তর্গত মালিয়াইশ (মিঠানালা) গ্রামের জনৈক আলেম মাওলানা সূফি নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরীকে স্বপ্নে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে সুসংবাদ দেওয়া হয় যে, আমার আওলাদ সায়্যিদ আহমদ এসেছে, তুমি গিয়ে তাঁর হাতে বাইয়াত কর। অতঃপর সূফি নূর মুহাম্মাদ তাড়াতাড়ি কলকাতা আসলেন এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুসংবাদ অনুসারে আমীরুল মুমেনীন হযরত সায়্যিদ আহমদ বেরলভী রহ. এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন।

সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. এর সোহবত ঃ

স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে বায়াত গ্রহণ করার পর ১৮২১-১৮৩১ এই দশ বছরের দীর্ঘ সময় তিনি মুর্শিদের সরাসরি সোহবতে ছিলেন। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুলাই, ১২৩৬ হিজরি সনের ২০ শাওয়াল ৪৩০ ত্রিশজন সাথীসহ সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী রহ. কলকাতা থেকে হজ্জব্রত পালনের উদ্যেশ্যে বায়তুল্লাহ শরীফ রওনা হন। পথিমধ্যে আরো ৭০০ জন এই মুবারক কাফেলায় যুক্ত হয়। সূফি নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী এই হজের সফরে অন্যতম প্রধান সঙ্গী হিসেবে গমন করেন।

জিহাদের সফরে সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. তাবুর সন্নিকটেই নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রহ. এর কামরা থাকতো। [৭]

খেলাফত, দ্বীন প্রচার ও ফয়েজ প্রদানের নির্দেশ ঃ

বায়াত গ্রহণের পরেই তিনি পীরের নির্দেশে রিয়াযতে নিমগ্ন হন। সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. এর তালিম তায়াজ্জুহর ফলে দ্রুত তিনি কামালতের উচ্চ পর্যায়ে পৌছান এবং খেলাফত লাভ করেন। পীর ও মুর্শিদ কর্তৃক তিনি দ্বীন ও তরীকা প্রচার এবং সালেকদের মধ্যে ফায়েজ প্রদানের নির্দেশ প্রাপ্ত হন। তিনি ও তাঁর পীরভাইদের একান্ত প্রচেষ্টায় সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. এর কাফেলায় অসংখ্য সালেকের সমাবেশ ঘটতে থাকে তাঁরা সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. এর কাছে বায়্যাত হয়ে সুন্নতে নববীর অনুসরণের প্রতি তৎপর হয়ে ওঠে। এমনকি এসময় প্রতিদিন ৫০-১০০ জন লোক মুসলমান হত। মাখযানে আহমদীর লেখক বলেন- ঐ সময় জনসমাজে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, (দেখলে) তুমি বলতে এ যেন নবীর যুগ পুনর্জীবন লাভ করেছে। [৮]

জিহাদের বায়াত ও অবদান ঃ

তরিকতের বায়াতের পাশাপাশী সূফি নূর মুহাম্মদ তাঁর পীর মুর্শিদ সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী রহ. এর কাছে জিহাদেরও বায়াত গ্রহণ করেন। **১৮২৬ -১৮৩১** পর্যন্ত প্রায় ১৮টি ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ ও গুরত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। যেমন- আকুড়ার যুদ্ধ, নওশাহের যুদ্ধ, পাঞ্জতারের যুদ্ধ, মায়দার যুদ্ধ, শায়দুর যুদ্ধ, হাজারার যুদ্ধ, মাইয়ার যুদ্ধ ও ঐতিহাসিক বালাকোট যুদ্ধ। এছাড়া ফুলেড়া অভিযান, পেশোয়ার অভিযান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মায়দার যুদ্ধে শত্রুপক্ষ কামানের গোলা ছুড়তে শুরু করলে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে তখন সূফি নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রহ. হাকীকতে মাকামে সাইফুল্লাহর ফয়েজ প্রয়োগ করেন ফলে নিজেদের সৈন্য রক্ষা ও শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার প্রথম পদক্ষেপ সফল হয় এমনকি তিনি তাঁর নিজ হাত মুবারক দিয়ে কামানের গোলা হস্তগত করে অকার্যকর করে দেন এর ফলশ্রুতিতে মুজাহিদ বাহিনী জয়লাভ করে। বিপুল পরিমান অস্ত্র, কামান, গোলা, বারুদ ইত্যাদি হস্তগত হয়। [৯]

১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে 'মাইয়ার যুদ্ধে ফজলুর রহমান বর্দ্ধমানী শহীদ হন এবং মৌলানা আব্দুল হাকীম বাঙ্গালী ও সূফি নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রহ. প্রমুখ জখমী হন। নওশাহের যুদ্ধে সূফি নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী অন্যতম সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিপক্ষের সহস্রাধিক সৈন্যের মোকাবেলা করেন। অসীম বীরত্ব ও সঠিক নেতৃত্বের সর্বোপরি আল্লাহতায়ালার গায়েবী মদদে মুসলমানগণ উক্ত যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এ সকল জিহাদে নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন

করেন, যুদ্ধের পূর্বে তিনি একটা রুমাল ঘুরিয়ে সেনাবাহিনীর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করতেন এবং শত্রুপক্ষের তীর, বর্শা ইত্যাদি বিসমিল্লাহ বলে হাত দিয়ে ধরে ফেলতেন। অগণিত তীর, বর্শা ও বল্লমের আঘাতে তাঁর একহাত অবশেষে অবশ হয়ে যায় তবুও তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নাই। রণজিৎ সিং এর বাহিনীর সাথে এক যুদ্ধের প্রাক্কালে রণজিতের প্রাসাদের অদূরে আমীরুল মুমিনীন সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী রহ. তাঁর মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে তাঁবু খাটান। নামাজের সময় হলে তিনি ঘোষণা দেন- 'আজ ঐ ব্যক্তি আযান দিবেন যার (দীর্ঘ সময় উল্লেখপূর্বক) আসরের সুন্নাত নামাজ ছুটে যায় নাই' সেদিন সূফি নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী আযান দেন। কথিত আছ, তাঁর আযানের সাথে সাথে রণজিৎ সিং এর রাজমুকুট খসে পড়ে এবং ঝড় শুরু হয়। [১০]

বালাকোট যুদ্ধে অবদান ঃ

১২৪৬ হিজরীর ২৪ জিলকদ জুমা'বার মুতাবেক ৬মে ১৮৩১ ইং সালে ঐতিহাসিক বালাকোট প্রান্তরে ইতিহাসখ্যাত বালাকোট যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে সূফি নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী অনবদ্য ভূমিকা রাখেন। এ যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭০০ জন এবং শিখদের সংখ্যা ছিল বিশ হাজার। অপর্যাপ্ত রসদ ও প্রায় অস্ত্রবিহীন সাতশত মুসলিম মুজাহিদ বাহিনী বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বিশ হাজার শিখ সৈন্যকে বালাকোট প্রান্তর থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে হটিয়ে দেয়। কিন্তু কিছু পাঠানের বিশ্বাসঘাতকতায় অতর্কিত হামলায় মুজাহিদ বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে মুযাহিদে আযম সায়্যিদ আহমদ বেরলভী, শাহ ইসমাইল ও সায়্যিদ ওয়ারেস আলী প্রমুখ শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। এমন সঙ্কটকালে সূফি নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর ঈমানদীপ্ত ভাষণে মুজাহিদ বাহিনীর মনোবল ফিরে আসে। অতঃপর দুর্নিবার গতিতে যুদ্ধ চলতে থাকে নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী একাই প্রায় দুই হাজার শিখকে হতাহত করেন। তাঁর মুবারক হাঁটুতে একটি গুলি বিদ্ধ হয়ে বের হয়ে যায় কিন্তু তাঁর কোন অনুভূতিই ছিলনা, হাঁটু দিয়ে যখন অজস্র ধারায় রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল এবং সেই পবিত্র রক্তের ধারায় কাপড় ভিজে গেল তখন তিনি অনুভব করতে পারলেন। এভাবে অবিরাম যুদ্ধ করার কারণে ও অনাহারে থাকার কারণে ক্রমশ দুর্বল হতে থাকেন। তারপরেও তিনি ময়দান ছেড়ে যাননি। এক পর্যায়ে সারা শরীরে জখম ও রক্ত প্রবাহিত হতে থাকলে তিনি তরবারি ছেড়ে দিয়ে কবিতার পংক্তিতে আল্লাহতায়ালার দরবারে ফরিয়াদ করেন- "বরছুরম আমদওলে বিছিয়ার জোদ আজমন গূণদাসত, দৌলাত তেজী কেমীন গৌইয়ান্দ শমশির তাবুয়াদ"। অর্থাৎ ঃ 'হে আমার রব! আমার মাথার উপর অনেক তীর তরবারী এসে পড়েছে কিন্তু তাতে আমার কোন খবরই ছিলনা বরং তরবারী

আমাকে ঐশী প্রেরণা দেয় যুদ্ধ চালিয়ে যেতে। কিন্তু আমি যে হীন দুর্বল হয়ে পড়েছি। আর যুদ্ধ করতে পারছিনা।'[১১]

বালাকোট যুদ্ধে এই বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি 'গাজীয়ে বালাকোট' খেতাব প্রাপ্ত হন।

বালাকোট পরবর্তী জীবন ঃ

বালাকোট যুদ্ধের পর সূফি নূর মুহাম্মাদ কিছুকাল কলকাতায় অবস্থান করেন। একদা সূফি নূর মুহাম্মাদ গোলাম রহমান মসজিদে জামাতের সহিত ইশার নামাজ পড়ার জন্য উপস্থিত হন। তখন ইংরেজ সরকারের একদল সিপাহী মসজিদটির চতুর্পাশ ঘিরে ফেলল। পরিস্থিতি অনুধাবন করতে কারো অসুবিধা হল না। সিপাহীরা অপেক্ষা করতে লাগল যেন সূফি সাহেব নামাজ পড়ে বের হলেই গ্রেপ্তার করতে পারে। অন্যান্য মুসল্লীগণ নামাজ শেষ করে স্ব স্ব গন্তব্যে ফিরে গেলেন। কেবলমাত্র সূফি নূর মুহাম্মাদ মসজিদের ভিতর আল্লাহর জিকিরে মগ্ন। সিপাহীগণ ভাবল, তিনি আর কতক্ষণ মসজিদে থাকতে পারবেন, রাত্রি শেষে বাধ্য হয়েই তাকে বের হতে হবে এ ভেবে মসজিদ অবরোধ করে রাখল। তিনি যেন পালাতে না পারেন সেদিকে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা হল। কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ যাঁর নেগাহবান, তাঁর অনিষ্ট সাধন করা কি মানুষের সাধ্য? ভোর হওয়ার পর সিপাহীরা সূফি সাহেবকে ডাকতে লাগল, মসজিদের ভিতর তন্ন তন্ন করে সন্ধান করা হল কিন্তু তাঁর নাম গন্ধও পাওয়া গেলনা। মহান আল্লাহ পাকের অপার করুণা ও অসীম কুদরতে সূফি নূর মুহাম্মাদ অলৌকিকভাবে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, ইংরেজ সিপাহীরা যখন উক্ত মসজিদ ঘেরাও করে রেখেছিল ঠিক একই সময়ে আসামের মুসলমানরা সূফি নূর মুহাম্মাদকে আসামে দেখতে পায়। এ সংবাদ জানতে পেরে ইংরেজ সরকার আরো বিচলিত হয়ে পড়ে। উক্ত ঘটনার কিছুদিন পর ইংরেজরা সংবাদ পেল যে, সূফি নূর মুহাম্মাদ গোলাম রহমান মসজিদের পার্শবর্তী একটি লঙ্গরখানায় অবস্থান করছেন। সংবাদ পাওয়া মাত্র কলিকাতা সিটি পুলিশের একটি বাহিনী অতর্কিতে সে লঙ্গরখানায় উপস্থিত হয় তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য। কিন্তু এবারও তিনি অলৌকিকভাবে রক্ষা পান। ইংরেজদের চক্রান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এবার ইংরেজ সরকার আরেকটি কৌশল অবলম্বন করে। ইংরেজ সরকার সূফি নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরীর দৈনন্দিন কাজ-কর্মের রিপোর্ট করার জন্য কিছু গুপ্তচর নিয়োগ করে। কিন্তু আল্লাহ পাকের মহিমা গুপ্তচররা সূফি সাহেবের সান্নিধ্যে এসে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা দেখে আত্মসমর্পণ করে এবং মুসলমান হয়ে যায়। এভাবে ইংরেজ সরকার একের পর এক কৌশল গ্রহণ করে। কিন্তু তাদের সকল চেষ্টা ও চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। এবার সূফি নূর মুহাম্মাদ কে হত্যা করার জন্য জনৈক দুষ্কৃতিকারীকে নিয়োগ করে। কিন্তু সে

দুষ্কৃতিকারীও সূফি সাহেবের কারামত দর্শনে সূফি সাহেবের নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং মুসলমান হয়ে যায়। [১২]

এরপর তিনি ফিরে এসে নিজামপুর পরগনার মলিয়াইশে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। এবং বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাঁর পীর মুর্শিদের প্রতিষ্ঠিত তরিকা-ই-মুহাম্মদিয়ার বার্তা প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত করেন। দ্রুততম সময়ে যদিও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা সহজসাধ্য ছিল না, তাই লোকজনের মনোযোগ আকর্ষণ এবং ইসলাম ধর্মের মৌলিক নীতি বিষয়ে লোকজনকে প্রশিক্ষণ দিতে তিনি তাঁর মসজিদ সংলগ্ন একটি খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বক্তব্য শুনতে এবং নিজেদেরকে তরিকায়ে মুহাম্মদিয়ার বিধি অনুযায়ী সজ্জিত করতে এই খানকায় বিপুল সংখ্যক লোক একত্রিত হতো। তিনি মজররদ (চিরকুমার) ছিলেন। [১৩]

সিলসিলা পরিচিতি ও অবদান ঃ

সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. এর আদর্শ ও রূহানী তায়াজ্জুহর মাধ্যমে প্রাপ্ত কামালিয়াতের সিলসিলা সূফি নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রহ. এর খলিফাদের মাধ্যমে আজো চলমান রয়েছে। বাংলা অঞ্চলে সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. এর দুইজন বিশিষ্ট খলিফা মাওলানা শাহ কারামত আলী জৌনপুরী রহ. ও সূফি নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রহ. এর মাধ্যমে জৌনপুরী সিলসিলা ও ফুরফুরা সিলসিলা বিকাশ লাভ করে। উক্ত দুই মুবারক সিলসিলার মাধ্যমে দ্বীনের প্রচার প্রসারে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়। বিশাল সংখ্যক মানুষের ইসলাম গ্রহণ, ইসলামী তাহযিব তামাদ্দুন ও সুন্নাতের ব্যাপক প্রচলন এবং অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা, ইয়াতিমখানা, হেফজখানা, কিতাবখানাসহ বিভিন্ন দ্বীনি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে এই সিলসিলা দ্বীন ও দেশের কল্যাণে অসামান্য অবদান রাখে। [১৪]

সূফি নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী রহ. এর খলিফাদের মধ্যে সূফি ফতেহ আলী ওয়াইসি বর্ধমানী রহ. ছিলেন প্রধান খলিফা। তিনি কামালিয়তের উচ্চ পর্যায়ের অধিকারী ছিলেন। তাঁর পিতা সায়্যিদ ওয়ারেস আলী বালাকোট যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তিনি রুহানীভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অহরহ যিয়ারত পেতেন বিধায় তাঁকে ' রসূলে নুমা' বলা হয়। তিনি উচ্চ পর্যায়ের আশেকে রসূল ছিলেন। তরিকতের ইমামগণের কাছ থেকে তিনি রুহানী তালিম তারবিয়ত প্রাপ্ত হয়েছিলেন বিধায় তাঁকে ওয়াইসী বলা বলা হয়। 'দিওয়ানে ওয়াইসী' তাঁর ফার্সী ভাষায় লিখিত ইশকে রসূলের অমর কাব্যগ্রন্থ। তাঁর ৩৯ জন বিশিষ্ট খলিফা ছিল। তার মধ্যে ফুরফুরা শরীফের মুজাদ্দেদে জামান শাহ আবু বকর সিদ্দিকী রহ. প্রধান খলিফা ছিলেন। তাঁর মাধ্যমে ফুরফুরা সিলসিলা বিকাশ

লাভ করে। মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার সময় তিনি ৮০০ ওল্ড স্কিম ও নিউ স্কিম মাদ্রাসা ও ১১০০ মসজিদ সহ বহু খানকা, সামাজিক ও দ্বীনি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ও উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি অনন্য ভূমিকা পালন করেন। বাংলা ভাষায় ইসলাম চর্চায় কিতাব রচনা ও সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর অগ্রনী ভূমিকা রয়েছে। তাঁর অন্যতম প্রধান খলিফা মাওলানা রুহুল আমীন বশীরহাটি রহ. একাই প্রায় ১৩৮টি কিতাব রচনা করেন। মুজাদ্দেদে যামানের আরেক বিশিষ্ট খলিফা সূফি ছদর উদ্দীন আহমদ শহীদ রহ. তাসাওউফের উপর ১৮ টি কিতাব রচনা করেন। খলিফাদের মধ্যে পীর প্রফেসর আব্দুল খালেক রহ. পাকিস্তানের সংবিধানে শরীয়ার আইন বাস্তবায়নের জন্য গঠিত 'তালিমাতে ইসলামিয়া বোর্ডের সদস্য ছিলেন। প্রফেসর আব্দুল খালেক রহ. তাঁর পীরের নির্দেশে বাংলা ভাষায় সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক তথ্যবহুল নবীজীবনী 'সাইয়েদুল মুরসালীন' এর রচয়িতা। মুজাদ্দেদে জামান রহ. এর অন্যতম প্রধান ও বিশিষ্ট খলিফা সূফি নেসার উদ্দীন আহমদ রহ, যিনি ছারছীনা দরবারের প্রতিষ্ঠাতা সূফি নেসার উদ্দীন রহ. বাংলাদেশের প্রথম কামিল মাদ্রাসা 'ছারছীনার দারুস সুন্নাত কামিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা সহ বহু মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা, ইয়াতিমখানা প্রতিষ্ঠা, কিতাব ও সংবাদপত্র প্রকাশ সহ বহুমাত্রিক খেদমত করেন। মুজাদ্দেদে যামানের খলিফাদের মধ্যে বহুভাষাবিদ জ্ঞানতাপস ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, সোনাকান্দার আব্দুর রহমান হানাফি, যশোরের সূফি তোয়াজুদ্দীন, মাওলানা হাতেম আলী বাগদাদী রহ. প্রমুখের মাধ্যমেও বহু খেদমত সাধিত হয়। যা এখনো তাঁদের খলিফা ও উত্তরসূরীদের মাধ্যমে জারি আছে। [১৫]

সূফি নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রহ. এর অন্যান্য খলিফাদের মধ্যে চট্টগ্রামের শাহ আহমদুল্লাহ রহ., খান বাহাদুর হামীদুল্লাহ খান রহ, মাওলানা আকরাম আলী নিজামপুরী রহ. প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। [১৬]

বিশিষ্ট জনের মূল্যায়ন ঃ

১। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ তাঁর 'বাংলাদেশে খ্যাতিমান আরবীবিদ (১৮০১-১৯৭১)' গ্রন্থে ২৩ জন বিশিষ্ট আলিমের নাম উল্লেখ করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম সূফি নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী রহ.।

২। প্রখ্যাত আলেম আল্লামা নূর মুহাম্মাদ আজমী রহ. তাঁর মেশকাত শরীফের বঙ্গানুবাদের ১ম খন্ড ২য় অধ্যায়ে ' বঙ্গে এলমে হাদিস' সম্পর্কিত আলোচনায় সূফি নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রহ. কে চট্টগ্রামের মুহাদ্দেসীনে কেরামের মধ্যে তালিকাভূক্ত করেন।

৩। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও ইসলামী গবেষক সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. তাঁর রচিত 'কারাওয়ানে ঈমান ও আজীমত গ্রন্থে বলেন- 'সূফি নূর

মুহাম্মাদ নিজামপুরী রহ. ছিলেন বাংলা অঞ্চলে সায়্যিদ আহমদ বেরলভী রহ. এর প্রধান খলিফাদের একজন। [১৭]

উপসংহার ঃ

বাংলার এই অঞ্চলে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী রহ. এর পাশাপাশী সূফি নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রহ. এবং তাঁর খলিফারা নিজেদেরকে তরিকা তথা তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়ার প্রচার ও প্রচারণায় গভীরভাবে নিয়োজিত করেন। এছাড়া মাওলানা ওলিয়ত আলী ও এনায়েত আলী রাজশাহী ও মালদায়, মাওলানা ইমাম উদ্দিন চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ ও নোয়াখালীতে এবং মাওলানা আবদুল্লাহ ঢাকায় এই আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেন। সূফি নূর মুহাম্মাদ জিহাদ থেকে চট্টগ্রামের নিজামপুর পরগনার মলিয়াইশ গ্রামে ফিরে এসে আসাম, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে তাঁর পীর সায়্যিদ আহমদ শহিদ বেরলভী রহ. এর আধ্যাত্মবাদ প্রচার করেন। সায়্যিদ আহমদ রহ. এর একনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে তাঁর অন্তর্গত গুণ, পবিত্র চরিত্র, অদম্য সাহস সূফি নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরীকে তাঁর ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া প্রচারে নিয়োজিত রেখেছিল। ইতিহাসবিদ গোলাম রসূল মেহের বলেন সূফি নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রহ. অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, রিয়ামুক্ত, দ্বীনদার ও পরহেজগার বুযুর্গ ছিলেন। ইসলামী বিশ্বকোষের ১৪ খন্ডে উল্লেখ আছে - 'তিনি ছিলেন উঁচু মাপের আলেম ও মুহাদ্দিস। ছিলেন সমকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কামিল বুযুর্গ। ' সূফি নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রহ. এর পবিত্র জীবন যেন আসহাবে সুফফার নূরে জ্যোতির্ময়। তাঁর জীবনালেখ্য আমাদের সাহাবা কেরামের সেই জীবনাচারকেই যেন পুনর্পাঠ করায়। এই মহান মুহাদ্দিস ও বীর মুজাহিদ ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ১ নভেম্বর, ১৩ কার্তিক ১২৬৬ বঙ্গাব্দ, ১২৭৫ হিজরির রবিউল আওয়াল মাসের ২৪ তারিখ সোমবারে পরলোকগমন করেন। চট্টগ্রামের মিরসরাইতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মসজিদের পাশেই তিনি শায়িত আছেন।

তথ্যসূত্র :

১. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ইসলাম প্রসঙ্গ, মাওলা ব্রাদার্স, ২য় মুদ্রণ, ২০০০, পৃ. ১০১, Shabnam Begum, Bengal's Contribution to Islamic Studies During The 18th Century, PhD. Thesis, Aligarh Muslim University, 1994, P.7
২. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ মিয়া, সীরাতে সূফি নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (রঃ), পৃ. ১৩
৩. মোহাম্মদ সাইফুল হক সিরাজী, নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী রহ ঃ এর জীবনী, পৃ. ৬
৪. মোহাম্মদ সাইফুল হক সিরাজী, মীরসরাইয়ের সুফী সাধক ও ইসলামিক ব্যক্তিত্ব, পৃ. ২৮

৫. মোশ্বদায়ে ফজলে হক, ১৩৫২ হিজরীতে মুদ্রিত, আজীমপুর দায়রা শরীফ, সিদ্দিক আহমদ খান, মাওলানা আব্দুল খালেক রহ. এর জীবনী পৃ. ৪৫০-৫১, ড. মতিউর রহমান খান, আইনায়ে ওয়াইসি, পৃ. ১১৯
৬. ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, সূফীবাদ এবং প্রধান প্রধান সূফী ও তাঁদের অবদান, পৃ. ৩২১
৭. মুহা. মুবারক আলী রহমানী, সীরাতে- ওয়সী, প" ২য় সংস্করণ, ২০১৭, পৃ. ২১-২২
৮. মাওলানা মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন খান, সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী রহ., পৃ. ১২৩, মাওলানা রুহুল আমীন, কারামতে আহমদীয়া, পৃ. ৩৪
৯. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ মিয়া, প্রাগুক্ত পৃ. ১৫৯-১৬৪, . মাওলানা মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন খান, প্রাগুক্ত পৃ. ২১৮
১০. চট্টগ্রামের সূফী সাধক, পৃ. ৯৩-৯৪, মুহা. মুবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
১১. এম ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আওলিয়াগণ, পৃ. ৩০৪, মাওলানা নুরুর রহমান, তাযকেরাতুল আওলিয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, এমদাদীয়া লাইব্রেরী, ১ম মুদ্রণ, ১৯৮২, পৃ. ২০৫-৯, মাওলানা আবুল লায়েস আনসারী, চল্লিশ আওলিয়ার কাহিনী, পৃ. ৫১৯-৫২৬, আব্দুল মান্নান চৌধুরী, সূফী নূর মুহাম্মদ র. এর জীবনী, পৃ. ৯
১২. মুহা. মুবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪, মাওলানা রুহুল আমীন, ফুরফুরা পীর সাহেবের বিস্তারিত জীবনী, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, পৃ. ২৩, মাওলানা আবুল লায়েস আনসারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৬-৩১
১৩. Muhammad Ismail, Development of Sufism In Bengal, PhD. Thesis, Aligarh Muslim University, 1989, P. 33, 34, ড. মুহম্মদ শেহাবুল হুদা (দ্যা সেইন্টস এন্ড শ্রাইনস অব চিটাগাং) শীর্ষক অভিসন্দর্ভ এর অনুবাদ, শাহাব উদ্দীন নীপু, চট্টগ্রামেরর সূফী সাধক ও দরগাহ সুফিবাদ চর্চার হাজার বছর, পৃ. ১৩৯১৪. হামিদ উল্লাহ খান, আহাদিসুল খাওয়ানিন, কলকাতা, ১৮৩১, পৃ. ৩১৮ ইনস্ক্রিপশানস অব বেংগল, খন্ড ৪, পৃ. ২৮৭-৮৮
১৫. শেখ বোরহানুদ্দীন, হাদিয়াতুছ্ ছালেকীন, ১ম সংস্করণ, ১৯৬০, পৃ. ১৭-২০, আহমদুল ইসলাম চৌধুরী, শানে ওয়াইসী, ওয়াইসী হয়ে আজমগড়ী সিলসিলা, পৃ১৯, ২৩, ৩৯, ড. আ. র.ম. আলী হায়দার, শিক্ষা বিস্তার ও সংস্কারে ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দীকী (র), ইফাবা, মে ২০০৪, পৃ. ১৩
১৬. ড. মুহম্মদ শেহাবুল হুদা (দ্যা সেইন্টস এন্ড শ্রাইনস অব চিটাগাং) শীর্ষক অভিসন্দর্ভ এর অনুবাদ, শাহাব উদ্দীন নীপু, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪৬, ১৫৩, রশীদ আহমদ, বাংলাদেশের সূফিসাধক, ঢাকা, মার্চ, ১৯৭৪, পৃ. ৩৯, সৈয়দ

দেলোয়ার হোসেন, জীবনী ও কারামত, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৩৬, ড. মঈন উদ্দিন আহমদ খান, আ হিস্ট্রি অব ফরায়েজি মুভমেন্ট ইন বেংগল, ১৯৬৫, পৃ. ১১, আহমদুল ইসলাম চৌধুরী, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৬

১৭. মোহাম্মদ সাইফুল হক সিরাজী, নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী রহঃ এর জীবনী, পৃ. ২১

সংগ্রহ : মাসিক পরওয়ানা, মে ২০২১ সংখ্যা

বাঙ্গালী ফারসী কবি সূফী ফৎহ্ 'আলী (রঃ)

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং গত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যিনি উত্তর ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের ইহ-পরকালের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি হইতেছেন হযরত শাহ সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভী (রহঃ)। যদি বালাকোটের যুদ্ধে রণজিৎ সিংহের সৈন্যবাহিনীর নিকট তাঁর মুজাহিদ বাহিনী পরাজিত না হইত, তবে আমরা একশত বৎসর পূর্বেই পাকিস্তান হাসিল করিতে পারিতাম। কিন্তু শহীদের খুন কখনো বৃথা যায় না। তাঁহার পরে তাঁর খলিফা মৌলানা কিরামত 'আলী জৌনপুরী, মৌলানা শাহ সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী প্রভৃতি বাংলাদেশ ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন তাঁহাদের নেতা পীর বীর শহীদের পন্থা অনুসরণ করিয়া ইসলামের মৃত সঞ্জীবনী সুধাবাণী প্রচার করেন। মৌলানা সূফী নূর মুহম্মদ নিযামপুরী সাহেব ১২৬৫ বাংলা সনে এন্তেকাল করেন। তাঁহার অন্যতম প্রধান খলীফা ছিলেন হযরত মৌলানা শাহ সূফী ফৎহ আলী সাহেব।

তাঁহার জন্মস্থান চট্টগ্রাম। তিনি মাদ্রাসার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া পদচ্যুত নওয়াব ওয়াজেদ আলী শাহের প্রাইভেট সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন, পরে পলিটিক্যাল পেনশন অফিসের সুপারিনটেনডেনন্টের পদ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে তিনি কলিকাতায় অবস্থান করিতেন। তার বিবাহ জিলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত পুনাশী গ্রামে হয়। চাকরী-জীবনেই তিনি নিজের পীরের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া লোকদিগকে মুরীদ(দীক্ষিত) করিতেন। তাঁহার কয়েকজন প্রধান খলিফা ছিলেন হযরত শাহ সূফী মৌলানা মুহম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী, হযরত শাহ সূফী মৌলানা গোলাম সলমানী, হয়রত শাহ সূফী ইকরামুল হক, শামসুল 'উলামা মির্যা আশরাফ 'আলী, হযরত সৈয়দ ওয়াজেদ আলী সাহেবান প্রভৃতি। পরে তিনি চাকরি ছাড়িয়া দীনের খিদমতে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন।

হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী শায়খ আহমদ সেরহিন্দী পর্যন্ত তাঁহার সিলসিলা (পীর পরম্পরা) নিম্নে উল্লেখ করিতেছি। হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী, তাঁহার খলিফা হযরত আদম বিননূরী, তাঁহার খলিফা হযরত সৈয়দ আবদুল্লাহ আকবরাবাদী, তাঁহার খলীফা মৌলানা শাহ ওলীউল্লাহ, তাঁহার খলীফা সৈয়দ

মৌলানা শাহ আবদুল আযীয, তাঁহার খলীফা হযরতে সৈয়দ আহমদ শহীদ, তাঁহার খলীফা হযরত সূফী নূর মুহম্মদ নিযামপুরী, তাঁহার খলীফা হযরত সূফী ফৎহ আলী (রহিমাহুমুল্লাহু তা'আলা আজ্ মা'ঈন)।

তাঁহার পুত্র মৌলভী মুস্তফা আলীর সাহেব তাঁহার অবসর গ্রহণের পর পোলিটিক্যাল পেনশন অফিসে তাঁহার পদে নিযুক্ত হন। মৌঃ মুস্তফা আলী মরহুম সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মৌলানা মুহম্মদ মস'উদুর রহমান এবং দ্বিতীয় পুত্র মৌলভী জানে 'আলম এম-এ, বি-এল বর্তমানে ঢাকা হাইকোর্টের এডভোকেট।

হযরত সূফী ফৎহ 'আলী সাহেব ১৩০৪ হিজরীর ৮ই রবী'উল আউয়াল তারিখ মোতাবেক ১২৯৩ সালের ২০শে অগ্রহায়ণ (১৮৮৬ খ্রীঃ) রবিবার দিন এন্তেকাল করেন। তাঁহার মাযার কলিকাতার মানিকতলায়।

তিনি কেবল তরিকতের পীর ছিলেন না। তিনি ফারসী ভাষায় একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি ছিলেন। তাঁহার তখলুস (কবি-নাম) ছিল ওয়েসী। তাঁহার দীওয়ান-ই-ওয়েসী তাঁহার দৌহিত্র মৌলভী সৈয়দ মীর হাসান কর্তৃক সংগ্রহীত হইয়া ১৯৩৫ খ্রীষ্টব্দে পুস্তক প্রকাশক হাজী মুহম্মদ 'আবদুল কয়্যুম কর্তৃক কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাতে তাঁহার ১৭৯ টি গযল এবং ২৩ টি কাসীদা আছে। যাহাদের ফারসী জানার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে, তাঁহার মূল কবিতাগুলির রসাস্বদন করিয়া ধন্য হইবেন। বাঙ্গালী পাঠকের জন্য আমি তাঁহার একটি মাত্র গযলের অনুবাদ দিতেছি। ইহার প্রথম দুইটি চরণ মহাকবি হাফিযের এক বিখ্যাত গযলের আরম্ভ বয়তের সহিত তুলনীয়। হাফিজ বলিয়াছেন-

আগর আঁ তুর্কে শীরাযী ব-দস্ত আরিদ দিলে মারা
ব-খালে হিন্দুয়শ্ বখ্ শম্ সমরকন্দ্ ও বুখারারা।
(সেই শিরাযী তুর্কিবালা নেয় যদি মোর এ হিয়ারে,
তার এক তিলে বিলিয়ে দিব সমরকন্দ বুখারারে।)

আমাদের কবি বলেন-

আগর আঁ শাহে খূবানম্ নিহদ্ বর্ চশমে মন্ পারা
ব-খাকে পাএউ বখ্শম্ দুন্ইয়া ও 'উক্‌বারা।

এখন সমস্ত গযলটির অনুবাদ শুনুন-

মোর যদি সে রূপের রাজা পা রাখে মোর আঁখির পরে,
বিলিয়ে দিব দীন্-দুনিয়া তার চরণের ধূলির তরে।
তার পীরিতি জ্বালায় নিতি পরাণ এমন বুকের মাঝে,
আগুন-পারা মোর হাহাকার দেয় গলায়ে পাষোণেরে।

হায় কি হ'ল রূপের রাজার? আমার দশায় নাই দয়া তাঁর।
মোর তবে কি রোদন দশার নাই খবর সেই রূপ-রাজেরে।
বারেক ব'লে, মলয় পবন! মোর কথা রূপ-সুলতানেরে-
তোমার বিনি দরশনে চাইনে আমি দুই চোখেরে।
ওগো এসো আহমদ নবী! এসো ওগো দয়ার ছবি!
নেক নজর দাও আমার দশায়, পা রাখ মোর আঁখির পরে।
নাই সখা মোর তোমা বিনে, নাই কো কোনও দিল-দরদী।
তুমি কিবলা, তুমিই গতি, তোমা বৈ কে দুঃখ হরে?
দরশনের আশে তোমার আঁখি হ'তে বহাই ধারা,
দোহাই খোদার, দাও এক নজর, খোল অন্ধ নয়নেরে।
ধিক্ আমারি বদ-নসীবের, শোক ছাড়া নাই ভাগ্যে কিছু,
পোড়ায় তোমার বিচ্ছেদানল পাগলা দিলখানারে।
এস ওগো ব্যথার ওষুধ, এস আমার আশার আলো,
দাও গো মলম জখম পরে, বর্ষা চিনি লাল অধরে।
এস ওগো উজল জ্যোতি, এস উজল-দশন-জ্যোতি,
জ্যোতির তব কি উন্নতি! দেখাও সুঠাম ও- দেহরে।
সে রূপ-রাজের বন্দনাতে কিবা গযল গাইলে ওয়েসী।
আশেক দিবে কাব্যে তোমার বিলিয়ে দীন্ ও দুনিয়ারে। *

হযরত শাহ সূফী ফৎহ 'আলী (রঃ) আধ্যাত্মিক শক্তি (কারামত) সম্পন্ন ছিলেন। তাহার একটি বৃত্তান্ত এখানে দিতেছি। ইহা সূফী সাহেবের প্রশিষ্য হযরত শাহ কসীমুদ্দীন (রঃ) সাহেবের জীবনীতে (পৃঃ৪ -৯) উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা তিনি তাঁহার মুরিদ ও জীবনীলেখক মৌলভী শাহ মুহাম্মদ নসীহুল্লাহ মরহুম সাহেবের নিকট বর্ণনা করেন।

একবার সূফী ফৎহ 'আলী সাহেব ছদ্মবেশে দেশ ভ্রমণ করিতে উত্তর বঙ্গের কমচিবাড়ীর নিকটবর্তী সুন্দরগঞ্জ হাটে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি শাহ কসীমুদ্দীনের পীর খোরাসান হইতে আগত হযরত মৌলানা শাহ সৈয়দ মুহম্মদ কাসিম (রঃ) সাহেবের জনৈক মুরীদের বাড়ীতে কিছুকাল বাস করেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক গুনাবলীর কথা ফুলের সৌরভের ন্যায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। তখন খোরাসানী পীর সাহেব কতিপয় মুরীদান সহ সুন্দরগঞ্জে তাঁহার যিয়ারতের জন্য আসেন। সূফী সাহেব তাঁহাকে দেখিবামাত্র জাম্বিল হইতে কয়েকটি চাউল বাহির করিয়া তাঁহাকে খাইতে দেন। তাহাতে তিনি আত্মহারা হইয়া মনে করেন যে তাঁহার অধিকতর আধ্যাত্মিক আলোক লাভ হইয়াছে। তাহাতে তিনি সূফী সাহেবের খিদমতে রহিয়া যান। একদিন সূফী সাহেব কয়েকজন মুরীদ সহ

তাঁহাকে লইয়া তিস্তা নদীতে নৌকা ভ্রমণ করিতে যান। তিনি নৌকায় ভ্রমণ কালে খোরাসানী পীর সাহেবকে বলেন, 'হযরত, আমি যাই। ' তাহাতে খোরাসানী বলেন, 'হ্যাঁ, যান। ' তখন সূফী সাহেব ঝাঁপ দিয়া নদীবক্ষে দাঁড়াইলেন। আবার বলিলেন, 'আমি যাই। ' তদুত্তরে তিনি বলিলেন, 'যান। ' এবার হাটু পর্যন্ত পানিতে ডুবিল। এইরূপে ক্রমে বুক, গলা পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়া গেল। শেষ যখন বলিলেন, 'আমি যাই। ' তখন যান বলার সাথে সাথে সূফী সাহব গভীর পানিতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

এই অভাবনীয় ব্যাপার দেখিয়া খোরাসানী পীর সাহেব ও নদীতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু নৌকাস্থিত লোকজন তাঁহাকে নিরস্ত করেন। অতঃপর তিনি তীরে উঠিয়া সূফী সাহেবের অন্বেষণে তীর দিয়া চলিতে থাকেন। কতক দূরে গিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, এক পাগলা ফকীর কতকগুলি ফুলের মালা গলায় দিয়া নদীতীরে বসিয়া আছেন। তিনি তাঁহাকে সূফী সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে পাগলা ফকীর বলিলেন, 'কি ভাল হইত, যদি তুমিও তাঁহার সঙ্গে নদীতে ডুবিতে। ' তখন খোরাসানী পীর সাহেব ব্যাকূলভাবে কিছু দূর গিয়া ফিরিয়া দেখেন যে, ঐ পাগলা ফকীর আর সেখানে নাই। তখন তিনি মনে করিলেন যে, ঐ পাগলা ফকীর অবশ্যই সূফী সাহেব হইবেন। অতঃপর তিনি সন্ধান করিতে করিতে ভুটানের এক পাহাড়ে তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করেন। সূফী সাহেব তাঁহাকে সুলুক শিক্ষা দিয়া রংপুর, গাইবাঁন্ধা প্রভৃতি অঞ্চলের লোকদিগকে হিদায়াত করিতে উপদেশ দেন।

হযরত শাহ সূফী ফৎহ 'আলী সাহেবের ওফাতের বৃত্তান্ত ফুরফুরার পীর সাহেব কেবলার মুরীদ মৌলানা মোঃ আবদুল হালীম 'আরামবাগী সাহেবের 'ফুরফুরার পীর কেবলার জীবনী' (পৃঃ ৪৮-৫০) হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। হযরত দাদাপীর সাহেব যে দিন এন্তেকাল ফরমান, তাহার পূর্বরাত্রে জনাব পীর ছাহেব কেবলা সমভিব্যাহারে হুগলী জেলার মোল্লা সিমলা গ্রামে জনৈক মোল্লার বাড়ীতে আমাদের খাওয়া দাওয়াত উপলক্ষে অবস্থান করিতে ছিলেন। সেই সময় দাদা পীর ছাহেব কেবলা বলিয়াছিলেন যে, 'তানফিরের ফয়জ' আসিতেছে (অর্থাৎ দুনিয়া হইতে রুখছুত হইবেন বলিয়া ইঙ্গিত করিলেন)। তৎপর পীর সাহেব কেবলাকে হুকুম করিয়াছিলেন, হযরত শাহ হালব্বীর (রঃ)'র মাজার শরীফে জিয়ারতে করিতে যাও। উক্ত হযরতের তরফ হইতে যাহা মা'লুম হয় আমাকে জানাইও। হুজুর কেবলা বলিয়াছিলেন- 'উক্ত মাজার শরীফে বসিয়া আমার ম'লুম হইয়াছিল যে কার মোল্লার বাড়ীতে আমাদের খাওয়া হইবে না, কিন্তু সাহস করিয়া এই কথা পীর ছাহেবের কর্ণগোচর করিতে পারিলাম না। ' সেই রাতে দাদা পীর সাহেব কেবলা বসিয়া সকলকেই ছবক জিজ্ঞাসা করিলেন বটে কিন্তু, কাহাকেও তাওয়াজ্জুহ প্রদান করিলেন না; কেবলমাত্র হুজুর কেবলাকেই তাওয়াজ্জু প্রদান

করিতেছিলেন। সেই তাওয়াজ্জুহই হুজুরের শেষ তাওয়াজ্জুহ। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দাদা পীর ছাহেব কেবলা বলিলেন 'একটি ফয়েজ বন্ধ হইয়া গেল কেন?' পরক্ষণেই আবার তাঁহার চেহার মুবারক উজ্জ্বলতর ধারণ করিল, তখন পুনরায় বলিলেন- 'না ফয়েজ পুনরায় আসিয়াছে। ' দুপুর বেলায় দস্তরখানে খাওয়ার সামগ্রী প্রস্তুত, এমন সময় তিনি এস্তেঞ্জা করিয়া আসিয়া বলিলেন- আসমান হইতে ব্যারাম আমার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে জলদি ছল্‌ব কর (রুহানী শক্তিবলে সারইয়া দেওয়া) কর। ' হুজুর কেবলা ছল্‌ব করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু ছল্‌ব হইতেছিল না। হুজুর বলিয়াছেন যে- তখন আমার কুওয়াতের ফয়েজের (রুহানী শক্তি) জোরও খুব বেশী ছিল, এত চেষ্টা করিতে লাগিলাম যেন আমি শূন্যে উঠিয়া যাইতেছি, তথাপি ব্যারাম ছল্‌ব হইতেছে না। ' তৎপর তিনি ইশারায় জোহরের নামায আদায় করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার অর্ধেক শরীর অবশ হইয়া গেল। হুজুর কেবলা তাঁহাকে লইয়া গাড়ীতে করিয়া কলিকাতা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। সেদিন মোল্লার বাড়ীতে তাহাদিগের আর খাওয়া হইল না। গাড়ী হাওড়া ষ্টেশনে যেমন পৌঁছিল, অমনি দাদা পীর ছাহেব কেবলা হুজুর কেবলার কোলে মাথা রাখিয়া বাং ১২৯৩ সালের ২০ শে অগ্রহায়ণ, মোতাবেক এন্তেকাল ফরমাইলেন। 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। '

তাহার মাযার শরীফ কলিকাতা মানিকতলায় ২৪/১ মুনশীপাড়া লেন দিল্লীওয়ালা কবরস্থানে বিদ্যমান আছে। প্রত্যেক বছর ২৬ শে রমযান গতে রাত্রিতে সেখানে ঈসাল সওয়াবের জলসা হয়।

হযরত পীর ফৎহ আলী (রাঃ) সাহেবের কয়েকজন প্রধান খলিফার নাম

১। মৌলানা শাহ সূফী আবু বকর সিদ্দীকী (রঃ) ফুরফুরা। ২। মৌলানা 'আবদুল হক (রঃ), শিজগ্রম, মুর্শিদাবাদ। ৩। শাহ সূফী একরামুল হক (রঃ), পুনাসি, মুর্শিদাবাদ। ৪। মাওলানা গোলাম সালমানী (রঃ), ফুরফুরা। ৫। সূফী নেয়াজ আহমদ (রহঃ), কাৎড়া পোতা, বর্ধমান। ৬। শাহ দীদার বখশ (রঃ), পদ্মপুকুর, হাওড়া। ৮। শেখ কোরবান (রঃ), বানিয়াতালাব কলিকাতা। ৯। শামুসল 'উলামা মির্যা আশরফ আলী (রঃ), কলিকাতা। ১০। শাহ সূফী সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (রঃ), মেহদী বাগ, কলিকাতা। ১১। মৌলভী সৈয়দ যুলফিকার আলী (রঃ), টিটাগড়, ২৪ পরগনা। ১২। মৌলভী 'আতাএ এলাহী (রহঃ) মোগলকোট, বর্ধমান। ১৩। শাহ সূফী সুলায়মান (রঃ), বারাসাত, ২৪ পরগনা। ১৪। মৌলবী কাযী খোদা নওয়ায (রঃ), ধসা, হুগলি। ১৫। সূফী শায়খ লাল মুহাম্মদ (রঃ), চুঁচুড়া, হুগলি। ১৬। মৌলভী ওবায়দুল্লাহ (রঃ), শান্তিপুর, নদীয়া। ১৭। হাফিয মুহম্মদ ইবরাহীম (রঃ), চট্টগ্রম। ১৮। মৌলভী 'আবদুল 'আযীয (রঃ), চন্দোর জাহানাবাদ, হুগলি। ১৯। মৌলভী আকবর আলী (রঃ), সিল্‌হেটে। ২০। হাফিজ মুহম্মদ ইবরাহীম (রঃ), ফুরফুরা, হুগলি; ইত্যাদি।

প্রমাণপঞ্জী

১। হায়াতে ওয়সী- মাওলানা জয়নুল আবিদীন প্রণীত (১৯৫৫ইং)

২। শাহ কছিম (রঃ) সাহেবের জীবনী- মৌলানা শাহ মুহম্মদ নছিহত উল্লাহ প্রণীত [(১৩৫৫) মৌলভী মুহম্মদ মস'উদুর রহমান সাহেবের সৌজন্যে প্রাপ্ত] প্রথম প্রকাশ। মাহেলাও শ্রাবণ-১৩৬০।

** মাহেনও। শ্রাবণ, ১৩৬০ জুলাই, ১৯৫৩।

শিক্ষা বিস্তার ও সংস্কারে ফুরফুরার পীর আবূ বকর সিদ্দীকী (র)

ড. আ. র. ম. আলী হায়দার

শাহ সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী (র) সূফী, ইসলাম প্রচারক, শিক্ষানুরাগী, সমাজ সংস্কারক, জাতি গঠক, রাজনীতিক ও সাংবাদিকতার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর কর্মজীবন বিশাল ও বৈচিত্র্যময়। তিনি ধর্মীয়, সামাজিক সংস্কারের সাথে সাথে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অর্ধশতকেরও অধিককাল নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। তিনি মহৎ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। 'বজ্রের মত কঠোর ও ফুলের মত কোমল' বলে যে কথা আছে, তা তাঁর চরিত্রে পরিপূর্ণরূপে পরিলক্ষিত হয়। তাঁর মত ধীর-গম্ভীর, শান্ত-ভদ্র, স্নেহশীল মহৃদয় কর্মপ্রাণ মহাপুরুষ খুব কমই দেখা যায়। তাঁর শিক্ষা বিস্তার ও সংস্কারের অফুরন্ত কীর্তিরাশি বাংলার বুকে আজও ছড়িয়ে রয়েছে। এ নিবন্ধে তা আলোচনা করার পূর্বে তাঁর কর্মময় জীবনের প্রতি সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা গেল।

জন্ম

কুত্‌বুল ইরশাদ শাহ্ সূফী সৈয়দ ফত্‌হ আলীর[১] (র) (মৃ. ১৮৮৬ খৃ.) প্রধান খলীফা শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী (র) ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের অন্তর্গত হুগলী জেলার জঙ্গীপাড়া থানাধীন ফুরফুরা নামক গ্রামে ১২৬৩ হি./১৮৪৬ খৃ./১২৫৩ বা. ফাল্গুন মাসে জন্মগ্রহণ করেন।[২] তাঁর পিতার নাম মওলানা হাজী আবদুল মুক্তাদির এবং মায়ের নাম মুহাব্বাতুন্ নেসা। ইসলামের প্রথম খলীফা আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর ৩০ ঊর্ধ্বতন পুরুষ বলে ফুরফুরার শায়খকে সিদ্দীকী বলা হয়। সাহাবী আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ১৬শ অধস্তন পুরুষ মনসুর বাগদাদী (র) ভারত সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালে (১২৯৬-১৩২৬ খৃ.) বাগদাদ হতে ইসলাম প্রচারের জন্য বঙ্গদেশে আসেন এবং হুগলী জেলার অন্তর্গত মোল্লাপাড়া[৩] গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। মনসুর বাগদাদীর অধস্তন পুরুষ হাজী মুস্তফা মদনী (র) ও বাদশাহ আলমগীর (র) মুজাদ্দিদে আল ফেসানী (র)-এর (১০২৪/১৬১৫) তৃতীয় পুত্র মাসূম রব্বানী (র)-এর (মৃ. ১০৩৪/১৬২৪) হাতে দিল্লীর জামে মসজিদে একত্রে বায়আত গ্রহণ করেন।[৪]

ফুরফুরা

হুগলী জেলার অন্তর্গত বালিয়া পরগণা ও শ্রীরামপুরা মহকুমার অধীন ফুরফুরা ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন স্থান। এ স্থান অনেক শহীদ ও ওলীকে বুকে ধারণ করে আছে। এ জন্য এটি 'গঞ্জে শুহাদা' নামে বিখ্যাত। এখানে বাগদী রাজা বাস করতেন। [৫] তাই স্থানটি 'বাগদী রাজগড়' নামে পরিচিতি ছিল এবং তাঁর রাজ্যের নাম ছিল 'বালিয়া বাসন্তি'। [৬] রাজগড়ের দক্ষিণ দিকের অগভীর ও আগাছাপূর্ণ রাজ সরোবরটি আজও বাগদী রাজার স্মৃতি বহন করছে। সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ্ (র) (শাসনকাল ১৩৮৯-১৪০৯ খৃ.) যখন বাংলার সুলতান, তখন পর্যন্ত বাগীরথীর তীর এলাকায় ইসলামের আলো পুরোপুরি বিকীর্ণ হয়নি। ফলে সেখানকার মানুষের মাঝে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, ধনী-গরীব, শ্রমিক-মালিক, দাস-প্রভু প্রভৃতি ভেদাভেদ বিদ্যমান ছিল। সুলতান গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ্ অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ লোক ছিলেন। [৭] এ সংবাদে তিনি ব্যথিত হয়ে একদল মুজাহিদকে (৭৯৬/১৩৯৩) এ এলাকায় প্রেরণ করেন। [৮] অত্যাচারীদের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে মানুষ যেন ইসলাম গ্রহণ করতে পারে সে জন্য তিনি মুজাহিদদের সাথে এক দল আউলিয়া প্রেরণ করেন। ওলীদের নেতা ছিলেন সফীউদ্দীন গাজী ওরফে শাহ্ সূফী সুলতান (র)। [৯] তিনি ওলীদের দু'দলে বিভক্ত করেন। এক দলেন নেতৃত্ব নিজে গ্রহণ করে 'ছোট পান্ডুয়া'র দিকে রওনা হন এবং অপর দলের নেতৃত্ব সৈয়দ হুসাইন বুখারী (র)-কে দিয়ে বালিয়া বাসন্তির দিকে প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় দলের সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন ফুরফুরার শায়খ আবূ বকর সিদ্দীকী (র)-এর ১৫শ তম উর্ধ্বতন পুরুষ মনসুর বাগদাদী (র)। তাঁর বাগদী রাজাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। ফলে যুদ্ধ বেঁধে যায়। সে যুদ্ধে যাঁরা শহীদ হন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন–

১. সৈয়দ খায়রুর রহমান, ২. সৈয়দ তবীবুর রহমান, ৩. সৈয়দ আবদুর রহমান, ৪. সৈয়দ ফয়জুর রহমান (র) প্রমুখ চার সহোদর। যুদ্ধে রাজা পরাজিত হন এবং বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে পলায়ন করেন। মনসুর বাগদাদী (র) ফুরফুরায় এবং অন্যান্য সহচর বেলপাড়া, কুতুবপুর, নাজীপুর, সূফী জঙ্গল, মোল্লাপাড়া প্রভৃতি স্থানে বসতি স্থাপন করেন।

ফুরফুরা নামকরণ

যুদ্ধে শহীদ চার সহোদরকে সেখানে সমাধিস্থ করা হয় বলে 'বাগদী রাজগড় 'গঞ্জে শুহাদা' নামে অভিহিত হয়। গঞ্জে শুহাদার অপর নাম 'পুরফরাহ'। পুর অর্থ পূর্ণ, 'ফরাহ' অর্থ আনন্দ। অত্যাচার, অবিচার, বর্ণ-বৈষম্য থেকে উদ্ধার পেয়ে এ অঞ্চলের জনগণ পূর্ণ আনন্দ লাভ করেছিলেন। তাই 'পুরফুরাহ' নিপীড়িত জনগণের পূর্ণ আনন্দের স্মৃতি বহন করছে। পুরফরাহ-এর অপভ্রংশ ফুরফুরা। আবার কারো

কারো মতে ফুরফুরা 'ফারে ফারাহ' হতে উৎকলিত। অর্থ, জাঁকজমকময় আনন্দ। আবার কেউ বলেন, ফুরফুরা 'ফরফরা' হতে নিষ্পন্ন। অর্থ দ্রুত। এ অঞ্চল মুসলমানদের দ্রুত অধিকারভুক্ত হয়েছিল বলে ফুরফুরা বলা হয়। মনসূর বাগদাদী (র)-এর বংশে মওলানা শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী (র) জন্মগ্রহণ করেন।

প্রাথমিক জীবন

পিতৃবিয়োগ

আবূ বকর সিদ্দিকী (র)-এর বয়স যখন মাত্র নয় মাস, তখন তাঁর পিতা মওলানা আলহাজ্জ আবদুল মুক্তাদির (র) ১২৫৩/১৮৪৭ সনে কার্তিক মাসে ইন্তেকাল করেন। তিনি তদানিন্তন একজন বিশিষ্ট ওলী এবং শ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন। [১০]

মায়ের তত্ত্ববধানে

পিতার ইন্তেকালের পর শিশু আবূ বকরের লালন পালনের দায়িত্ব তাঁর মহীয়সী মা মুহাব্বাতুন্ নেসার উপর অর্পিত হন। তিনি ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ ধৈর্যশীলা উন্নত হৃদয়ের বিদুষী মহিলা। গভীর মমতা ও যত্নের সাথে তিনি ইয়াতীম শিশুকে লালন পালন করেন।

শিক্ষা

তাঁর মা আবূ বকর সিদ্দীকীকে যথাসময়ে গ্রামের মক্তবে ভর্তি করেন। মক্তবে ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তিনি সীতাপুর মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন। [১১] সেখান থেকে তিনি হুগলী মুহসিনিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং উক্ত মাদ্রাসা হতে জমাতে উলা (বর্তমান ফাযিল) পরীক্ষায় (১৮৬৩ খৃ.) কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। [১২] অতঃপর তিনি কলকাতা যান। সেখানে সিন্দুরিয়া পট্টির মসজিদে হাফিয মওলানা জামাল উদ্দীন (র)[১৩] (মৃ. ১৩০৩/;১৮৮৪)-এর নিকট হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ প্রভৃতি অধ্যয়ন করে ইজাযত (সনদ) লাভ করেন (১৮৬৮খৃ.)। তারপর তিনি কলকাতা নাখোদা মসজিদের ইমাম মওলানা বিলায়েত হুসাইন (র)-এর নিকট মানতিক, হিকমত ইত্যাদি বিষয় শিক্ষালাভ করেন। এরূপে তিনি ২৩ বছর বয়সে বিবিধ বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করেন। এরপর তাঁর শিক্ষার তৃষ্ণা নিবারিত না হওয়ায় তিনি ১৩১০/১৯০৩ খৃষ্টাব্দে হজ্জ পালন ও যিয়ারত উপলক্ষে মক্কা মুআয্যমা ও মদীনা মুনাওয়ারা গমন করেন। সেখানে তিনি রওযা পাকের সংরক্ষক মুহাদ্দিস শায়খুদ্ দালাইল সৈয়দ আমীন রিযওয়ানের কাছে নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ অধ্যায়ন করে সনদ লাভ করেন ঃ

(১) সহীহ বুখারী (২) সহীহ মুসলিম (৩) সুনান আবি দাউদ (৪) জামি তিরমিযী (৫) সুনান নাসায়ী (৬) সুনান ইব্ন মাজা (৭) মুআত্তা ইমাম মালিক

(৮) মুসনাদ ইমাম আবি হানীফা (৯) মুসনাদ ইমাম শাফিয়ী (১০) মুসনাদ ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (১১) মুসনাদ দারিমী (১২) মুসনাদ আবি দাউদ তায়ালিসী (১৩) মুসনাদ আব্‌দ ইব্‌ন হুমাইদ (১৪) মুসনাদ হারিস ইব্‌ন উসামা (১৫) মুসনাদ বায্‌যার (১৬) মুসনাদ আবূয়'লি মুসিলী (১৭) সহীহ ইব্‌ন হিব্বান (১৮) সহীহ ইব্‌ন খুযায়মা (১৯) মুসান্নাফ আবদুর রায্‌যাক (২০) মিশকাতুল আনওয়ার লি শায়খিল আতবর (২১) সুনান বায়হাকীয়ে কুবরা (২২) মুসনাদ সাঈদ ইব্‌ন মনসুর (২৩) মুসহাফ ইব্‌ন আবী শায়বা (২৪) সুনান বায়হাকীয়ে কুবরা (২৫) তারীখ ইব্‌ন আসাকীর (২৬) তারীখ ইয়াহইয়া ইব্‌ন মঈন (২৭) শিফা কাযী ইয়ায (২৮) শারহুস সুন্নাহ লিল বাগাভী (২৯) আয্‌যুহদ ওয়াদ্দাকায়েক লি ইব্‌ন মুবারক (৩০) নাওয়াদিরুল উসূললিল হাকিম আত্‌তিরমিযী (৩১) কিতাবাতুদ্দুআ লি তবরানী (৩২) আমসালুল ইল্‌ম ওয়াল আমাল লিল খতীব (৩৩) মুস্তাখরিয ইসমাঈল আলা মহীহিল বুখারী (৩৪) মুস্তাদরিক লিল হাকিম (৩৫) আল ফারায বাদাশ শিদ্দাহ লি ইব্‌ন আবিদ্দুনইয়া (৩৬) মুস্তাখরিয আবী ইয়ালা আলা সহীহ মুসলিম (৩৭) হুলিয়া লি আবী নাঈম (৩৮) জিয়াদুল মিসালিস সালাত লি জালালুদ্দীন সুয়ূতি (৩৯) আয্‌যুররিয়াতুত্তাসিরী (৪০) আমালুল ইয়াওম ওয়াল্‌ লাইল লি আবিস সুন্নী।[১৪]

অতঃপর শায়খ আবূ বকর সিদ্দীকী (র) মদীনা মুনাওয়ারা থেকে ১৩১০ বাং/ ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে দেশে ফিরে আসেন এবং বহু দুর্লভ কিতাব সংগ্রহ করে একাদিক্রমে ১৮ বছর ব্যক্তিগতভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন।

আধ্যাত্মিক শিক্ষা

এভাবে ৪২ বছর বয়স পর্যন্ত বহুবিধ জ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জন করে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যার্জনের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক জ্ঞন আহরণেও নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। তখন শাহ্ সূফী সৈয়দ ফতহ্ আলী (র) কলকাতায় অবস্থান করছিলেন। তিনি তাঁর সান্নিধ্যে যান এবং তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় নিজেকে পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন এবং ১৫ বছর সাধনার পর কাদীরিয়া, চিশ্‌তিয়া, নকশবন্দিয়া ও মুজাদ্দিদিয়া তরীকায় কামালিয়াত অর্জন করে খিলাফত ও ইজযাত লাভ করেন।

বিয়ে ও পরিবার

শায়খ আবূ বকর সিদ্দীকী (র) নজিরা খাতুনকে বিয়ে করেন। তারপর সুফিয়া নুরজাহান খাতুনকে বিয়ে করেন। স্ত্রীদের তিনি সমান চোখে দেখতেন এবং তাদের সাথে ভদ্রোচিত ব্যবহার করতেন। কোন ভুল পরিলক্ষিত হলে তা তিনি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন। এ নিরিখে বলা যায়, তাঁর দাম্পত্য জীবন সুখের

ছিল। তিনি বহু সন্তান-সন্ততির পিতা হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। কিন্তু মৃত্যুকালে পাঁচজন পুত্র সন্তান ও পাঁচজন কন্যা সন্তান জীবিত ছিল।

আধ্যাত্মিক অনুশীলন

ফুরফুরার শায়েখের দরবারে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় মুরাকাবা মুশাহাদা, যিক্র প্রভৃতি আধ্যাত্মিক শিক্ষার অনুশীলন হত। তাঁর অনুশীলন ও প্রশিক্ষণ এত নিখুঁত, যুগোপযোগী ও কার্যকরী ছিল যে অল্পদিনের মধ্যেই মানুষ এর প্রভাবে গোমরাহীর পথ পরিত্যাগ করে হিদায়াতের পথ অবলম্বন করত। ফলে তাঁরা ঈমান ও আমলে পরিপক্ব হয়ে অনেকে খিলাফত প্রাপ্ত এবং সমাজের পথিকৃৎ হতেন।

খিলাফতপ্রাপ্ত

১. মওলানা নিসার উদ্দীন আহমদ (র), বরিশাল (মৃ. ১৯৫২) ২. মওলানা রুহুল আমীন (র), চব্বিশ পরগণা (মৃ. ১৯৪৫) ৩. মওলানা তাজাম্মুল হোসেন সিদ্দীকী (র), নদীয়া ৪. মওলানা সদরউদ্দীন (র), যশোর (মৃ. ১৯৪৪) ৫. মওলানা হাফিয আবুল বশার বশীর উদ্দীন (র), ঢাকা (মৃ. ১৯৮৭) ৬. মওলানা হাতিম আলী (র), নোয়াখালী (মৃ. ১৯৭৬) ৭. মওলানা আবদুর রহমান (র), মালাকান্দা, কুমিল্লা (মৃ. ১৯৬৪) ৮. শাহ্ সূফী আবদুল মুমিন (র), চট্টগ্রাম, (মৃ. ১৯২৪) ৯. মওলানা ময়েয্যুদ্দীন হামিদী (র), খুলনা (মৃ. ১৯৭১)

এ ছাড়াও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁর কাছে বায়আত গ্রহণ করে খিলাফতপ্রাপ্ত হন। তাঁদের মধ্যে ১. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (র), ঢাকা (মৃ. ১৯৬৯) ২. প্রফেসর আবদুল খালিক (র), ছতুরা (মৃ. ১৯৫৫) ৩. কবি মুজাম্মিল হক (র), ভোলা বরিশাল ৪. মুন্সী জমীরউদ্দীন (র) (মৃ. ১৯৩০) প্রমুখ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উপমহাদেশ ছাড়াও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে মহাদেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর মুরীদ ও খলীফাগণ। তাঁদের মধ্যে মওলানা মুআয্যিম হুসাইন মক্কী (র), মওলানা বদরুদ্দীন মেসফালা, মওলানা আবদুল মজীদ পেশওয়ারী (র), হাজী মীর মুহাম্মদ গয়া (র), মৌলভী আবদুল মজীদ দারভাঙ্গা (র) (বিহার) প্রমুখ হেজায ও মধ্য এশিয়ার এবং শাহ্ সূফী আবদুল মুমিন (র) ও শাহ্ সূফী সদরুদ্দীন (র) (মৃ. ১৯৪৪) চীন, জাপান ও বার্মায় লোকজনকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দান করেন।

হজ্জ পালন

শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী (র) চব্বিশ বছর বয়সে ১৩১০/১৯০৩ খৃ. প্রথম বার এবং ষাট বয়সে ১৩৩০/১৯২৩ সনে দ্বিতীয় বার হজ্জ সম্পাদন করেন।[১৫] দ্বিতীয় বার হজ্জ সফরে তাঁর সাথে ১৩০০ মুরীদ ও অনুসারী সাথী হন। হজ্জের কাজ

শেষ করে তিনি মক্কা শরীফের সাওলাতিয়া১৬ মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন এবং এ মাদ্রাসায় এক হাজার টাকা দান করেন।

ইসলাম প্রচার

হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী (র) পূর্ণোদ্যমে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ব্রিটিশ ভারতের রাজ্যহারা ও ধর্মহারা মুসলিমদের ইসলামের মৌলিক বিধানে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি বিভিন্ন ধরণের বাস্তব ও সুদূরপ্রসারী ইসলামী মিশন প্রতিষ্ঠা করেন।

ওয়ায-নসীহত

তিনি একজন সুবক্তা ছিলেন। বাংলা ও আসামের শহরে ও গ্রামে-গঞ্জে অগণিত ধর্মীয় সভায় ওয়ায-নসীহত করেন এবং বিদআতপন্থী, বেশরা পীর-ফকীরদের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি মৌলিক ও কলমের মাধ্যমে বিরামহীন সংগ্রাম করেন। এ জন্য তাঁর উপাধি দেয়া হয় 'মাহিয়্যে বিদআত'[১৭] ও 'মুহিয়ে সুন্নাত'।[১৮]

মাতৃভাষা বাংলায় চর্চা গবেষণা

শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী (র) বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য রচনা করে বাংলা ভাষার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তৎকালীন সময়ে আলিমগণ সাধারণত বাংলা ভাষা চর্চা করতেন না এবং এ ক্ষেত্রে সাহিত্য রচনায় ও আগ্রহী ছিলেন না। তিনি উপলব্ধি করলেন, মাতৃভাষা বাংলায় কিছু না লিখলে ইসলাম প্রচার সহজসাধ্য ও সুদূরপ্রসারী হবে না। তাই তিনি ইসলামী বিধিমালার উপর বই-পুস্তক রচনা করতে তাঁর আলিম ও ইংরেজী শিক্ষিত মুরীদগণকে উৎসাহিত করেন, যার ফলে মওলানা রুহুল আমীন (র) (মৃ. ১৯৪৫), মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (র), বিখ্যাত তাফসীরকার আবদুল হাকীম (র), ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (র) (মৃ. ১৯৬৯), প্রফেসর এম. এ. খালিক (র) (মৃ. ১৯৫৫) প্রমুখ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বই-পুস্তক রচনা করেন। এ ছাড়া আরও অনেকে এ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর নির্দেশ ও অনুমোদনে লিখিত এ ধরণের বইয়ের সংখ্যা সহস্রাধিক হবে। তাঁর বিশিষ্ট মুরীদ ও খলীফা মওলানা রুহুল আমীন (র) একাই প্রায় ১৩৫ খানা পুস্তকের রচয়িতা। তাঁর নির্দেশে লিখিত ও অনুমোদন প্রাপ্ত কয়েকখানা বইয়ের নাম এখানে উদ্ধৃত হল ঃ

(১) আকাঈদে ইসলাম, (২) ইলমে তাসাওউফ, (৩) সিরাজুস সালিকীন, (৪) পীর মুরীদ তত্ত্ব, (৫) বাতিল দলের মতামত, (৬) নসীহতে সিদ্দীকিয়্যা, (৭) ফাতাওয়ায়ে সিদ্দীকিয়্যা, (৮) তালীমে তরীকত, (৯) ইরশাদে সিদ্দীকিয়্যা।

মওলানা রুহুল আমীন লিখিত 'তরীকত দর্পণ বা তাসাওউফ তত্ত্ব' বইটি শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী (র)-এর মুখ নিঃসৃত বাণীর সংকলন। তিনি নিজেও

একজন সুলেখক ছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ, লিখিত ভাষাণ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। তার লিখিত উর্দুতে 'তারীখুল ইসলাম', 'কাওলুল হাক্ব' এবং বাংলায় 'অসীয়ত নামা' প্রকাশিত হয়েছে। তিনি 'আল আদিল্লাতুল মুহাম্মাদীয়া' নামে আরবীতে পাণ্ডুলিপি রচনা করেন; কিন্তু তা প্রকাশিত হয়নি।[১৯]

শিক্ষা বিস্তার

বাংলার মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে শায়খে ফুরফুরা আবূ বকর সিদ্দীকী (র)-এর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকা সংস্কার করে মুসলিমদের আদর্শ ঐতিহ্য সম্বলিত শিক্ষা প্রণয়নের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান। যুগোপযোগী শিক্ষা গ্রহণের অভাবে সমাজ পেছনে পড়ে যায়– এ কথা তিনি মর্মে মর্মে অনুধাবন করে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের উপর মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলতেন 'ইংরেজী একটি বিদ্যা'।

শিশু শিক্ষা

শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত। তিনি সেদিকে লক্ষ্য রেখে মুসলিম বালক-বালিকাদের ইসলামের রীতি-নীতি ও ইসলামী পরিবেশে শিক্ষা দেয়ান জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। এ উদ্দেশ্যে 'বালক-নূর' ও বালিকা-নূর' বই তাঁর তত্ত্বাবধানে রচিত হয়।[২০]

নারী শিক্ষা

মায়ের সচ্চরিত্র আদর্শবতী না হলে ছেলেমেয়েরা আদর্শবান ও চরিত্রবান হবে না- এ বাস্তবতা উপলব্ধি করে আবূ বকর সিদ্দীকী (র) নারী শিক্ষাকে জরুরী বলে ঘোষণা করেন; তবে তা পর্দার সাথে হতে হবে। মেয়েদের জন্য বিশেষত উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে পৃথকভাবে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য তিনি উপদেশ দেন।[২১]

মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা

শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে পৌছে দেয়ার মানসে বিদ্যোৎসাহী আবূ বকর সিদ্দীকী (র) বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৮০০ মাদ্রাসা ও ১১০০ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। নিজ গ্রাম ফুরফুরায় তিনি একটি ওল্ড স্কীম, একটি নিউ স্কীম মাদ্রাসা এবং একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার গভর্নিং বডির অন্যতম সদস্য (১৯২৮ খৃ.) ছিলেন।[২২]

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে

শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী (র) সংস্কার ও ইসলাম প্রচারকে বাংলায় সীমাবদ্ধ রাখেননি। ১৩৪১ হিজরীতে তিনি দিল্লী ও আজমীরে গিয়ে অনেক

মাযার যিয়ারত করেন ও আজমীরে খাজা মঈনউদ্দীন চিশতী (র)-এর (মৃ. ৬৩৩ হি.) মাযারে বিরাজিত বিদআত বন্ধ করার সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরে সিরহিন্দ গিয়ে আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আল ফেসানী (র) (মৃ. ১৬৫৮ খৃ.) মাযারে ১০/১২ দিন অবস্থান করেন ও ওয়ায-নসীহত করেন। সেখান থেকে বিদায়কালে তাঁকে মুজাদ্দিদী টপী ও পাগড়ী পরিয়ে দেয়া হয়। ১৩৫১ হি. সনে সউদী আরবের বাদশাহ আবদুল আযীয ইব্‌ন সউদের নিকট তিনি প্রাচীন কীর্তিগুলো ভেঙ্গে না ফেলার ও প্রকাশ্যে সুন্নতের পরিপন্থী কার্যাবলী না করার পরামর্শ দিয়ে এক পত্র প্রেরণ করেন এবং বাদশাহ্‌র পক্ষ থেকে এর প্রত্যুত্তর পান।[২৩]

সংবাদপত্র প্রকাশনা

সংবাদপত্র প্রচার মাধ্যম হিসেবে সব সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শায়খে ফুরফুরা আবূ বকর সিদ্দীকী এ কথা উপলব্ধি করে বেশ কয়েকটি পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। শুধু তাই নয়, আর্থিক সংকটে নিপতিত অনেক পত্রিকাকে তিনি নিজ তহবিল হতে বা চাঁদা সংগ্রহ করে সাহায্য করেন। তাঁর পৃষ্ঠপেষকতায় অনেক পত্রিকা প্রকাশিত হয় ঃ যেমন– মিহির ও সুধাকর, নবনূর, মোহাম্মদী, সোলতান, মুসলিম হিতৈষী, শরীঅতে ইসলাম, সুন্নত অল জামাত, হানীফা, ইসলাম দর্শন ইত্যাদি।

সমাজসেবা

প্রতিষ্ঠানিক ও আধ্যাত্মিক বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের পর শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী (র) সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি মুসলিম সমাজ হতে শিরক, বিদআত ও অনৈসলামী কার্যকলাপ দূর করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁর পরামর্শ ও পৃষ্ঠপোষকতায় ১৩১৭/১৯১১ সনে 'আঞ্জুমানে ওয়ায়েযীনে বাংলা ও আসাম' সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম সমাজকে হিদায়েতের জন্য ওয়ায-নসীহতের ব্যবস্থা করা, খৃষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপের প্রতিরোধ প্রতিবিধান করা ও অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেন।[২৪] ইন্তেকাল-পূর্ব পর্যন্ত তিনি আঞ্জুমানের সভাপতি ছিলেন।

রাজনীতি

অবিভক্ত স্বাধীন ভারতের সমর্থক নিখিল ভারত কংগ্রেসের অঙ্গ সংগঠন 'জমইয়তে উলামায়ে হিন্দ' ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এবং দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিষ্ঠান 'মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে। মুসলিম লীগের একটি শাখা ফুরফুরার শায়খের তত্ত্বাবধানে নেতৃত্বে 'জমইয়তে উলামায়ে বাঙ্গালা ও

আসাম' নামে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৬ সনে। মওলানা আবূ বকর সিদ্দীকী (র) শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। জমইয়তের এক অধিবেশনে সভাপতি ভাষণে তিনি বলেন ঃ শরীঅত, তরীকত, হাকীকত ও মা'রিফাত পূর্ণরূপে আমল করে দেশ ও জাতির খেদমতের জন্য আলিমগণের রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতিতে যোগ দেয়া আবশ্যক।[২৫] তিনি আরও বলেন, রাজনীতি থেকে আলিমগণের দূরে থাকার কারণে আজ মুসলিম সমাজে নানাবিধ অন্যায় ও শরীঅত বিরোধী কাজ হচ্ছে।

অসহযোগ আন্দোলন বয়কট

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় জমইয়তে হিন্দের বার্ষিক সভায় অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হলে তিনি এর বিরোধিতা করেন।[২৬] তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, ''আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট ও মহাক্ষতি সাধিত হচ্ছে। স্বরাজ-স্বাধীনতা সকলের কাম্য; এটা লাভ করার জন্য পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করা আবশ্যক, অন্যথা তার ফল হবে ভয়ংকর ও বিস্ময়কর। ভারতের মুসলমানগণ এ বিষয়ে বহু পশ্চাতে পড়ে রয়েছে। তারা সামাজিক সংগঠনে ও শিক্ষায় নিতান্ত পশ্চাৎপদ। সুতরাং তাদের শিক্ষা, সংগঠন প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতি সাধন করতে হবে নতুবা মহাসর্বনাশ অনিবার্য। আইন অমান্য আন্দোলন থেকে তাদের সম্পূর্ণ পৃথক থাকা বিশেষ প্রয়োজন।''[২৭] ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচনে তিনি তাঁর মুরীদ, মুতাকিদীন ও সাধারণ মুসলিমদের পার্লামেন্টারী বোর্ড কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে অনুরোধ করেন।

ইন্তেকাল

এ মহান ওলীয়ে কামিল মুজাদ্দিদ ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ হতে বহুমূত্র রোগে ভূগতে থাকেন। ১৯৩৮ খৃ. তাঁর আরও কিছু নতুন রোগ দেখা দেয়। তখন তাঁকে চিকিৎসার জন্য কলকাতা পাঠানো হয়। সেখানে তিনি কিছুদিন অবস্থান করেন। ১৯৩৮ সনের ডিসেম্বরে তিনি ফুরফুরায় ফিরে আসেন এবং ১৯৩৯ সনের ২১, ২২ ও ২৩ ফাল্গুন ফুরফুরার ইসালে সওয়াবের মাহফিলে সববেত হাজার হাজার মুরীদ ভক্তের সাথে তিনি নিয়ম মাফিক দেখা সাক্ষাৎ করেন ও মুরীদদের যথারীতি তা'লীম দেন। তিনি মাহফিলের আখেরী মুনাজাত পরিচালনা করেন। তারপর ২৫ মুহররম ১৩৫৮ হি. ৩ চৈত্র ১৩৪৬ বা. ১৭ মার্চ ১৯৩৯ খৃ. শুক্রবার প্রত্যূষে ৯৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।' ফুরফুরা মিয়াপাড়া মহল্লায় পারিবারিক গোরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়। এখনও প্রতি বছর ২১, ২২ ও ২৩ ফাল্গুন ফুরফুরায় তাঁর স্মৃতি বিজড়িত ও

ঐতিহ্যবাহী মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। [২৮] অগণিত লোক সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁর জীবন ও কর্ম থেকে ইসলামী প্রেরণা ও শিক্ষা গ্রহণ করেন।

চরিত্র

তাকওয়া

শায়খ আবূ বকর সিদ্দীকী (র) হারাম ও সন্দেহের জিনিস তো বটেই; বং মুবাহ অর্থাৎ শরীয়ত নির্দেশও দেয়নি এবং নিষেধও করেনি, এমন বস্থ থেকেও বেঁচে থাকতেন। সুদখোর, ফাসিক লোকের দাওয়াত কবূল করতেন না। বেনামাযীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন না; হিদায়েতের উদ্দেশ্যে কারো দাওয়াত গ্রহণ করলেও সেখানে পানাহার করতেন না। সাধারণভাবে চাঁদার পয়সার খানা খেতেন না। তোহ্ফাও গ্রহণ করতেন না। কারণ চাঁদা সংগৃহীত টাকায় হারাম মিশ্রিত থাকতে পারে। এভাবে যাদের আয় অবৈধ পথে হত, তা গ্রহণ করতেন না। [২৯]

বিনম্রতা

শাহ্ সূফী আবূ বকর (র) নবী (র) চরিত্রের প্রতিভূ ছিলেন। মওলানা রুহুল আমীন (র) বলেন, ''আমি জীবনে তাঁকে কখনো কর্কশ কথা বলতে শুনিনি। ওয়ায-নসীহতের সময় তাঁর কথাগুলো এত শ্রুতিমধুর বলে বিবেচিত হত যে শ্রোতাদের হৃদয়পটে যেন পাথরে ক্ষোদিত করার ন্যায় অঙ্কিত হয়ে যেত। কেউ কোন বিষয়ে তাঁর সাথে তর্ক করতে থাকলে তিনি সামন্য বিরক্ত না হয়ে ধৈর্যের সাথে অতি নরম ভাষায় যুক্তিপূর্ণভাবে বুঝিয়ে দিতেন, যাতে সে ব্যক্তি আনন্দিত হয়ে অবনত মস্তকে নিজ ত্রুটি স্বীকার করে তাঁর নিকট মুরীদ হয়ে চলে যেতেন। তিনি সকলের আগে সালাম প্রদান করতেন।''

ক্রোধ সংবরণ

তিনি কখনো কারো প্রতি ব্যক্তিগত ব্যাপারে রাগান্বিত হতেন না। তবে শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণকারীদের প্রতি নীতিগতভাবে রাগ করলেও তা এমনভাবে করতেন যে, তারা তাঁর মত হাসিমুখে মেনে নিজেরা ভ্রান্তি থেকে সংশোধিত হয়ে যেতো।

দানশীলতা

সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী (র) দানশীলতা, বদান্যতা ও পরোপকারে মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁর দ্বার থেকে কেউ খালি হাতে ফিরে যেত না, বরং বহু গরীব মিসকীন তাঁর দ্বারা প্রতিপালিত হত। কোন সম্পদশালী ব্যক্তি হঠাৎ গরীব হয়ে গেলে তিনি তাঁকে গোপনে সাহায্য করতেন।

শিক্ষা বিস্তার

শিক্ষাহীনতা ও তৎকালীন রাষ্ট্রভাষা ইংরেজী না জানার জন্য এককালের শাসক মুসলিম জাতি শোষিত-বঞ্চিত হয়েছিল। ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার বলেন ঃ ''ভারত সরকারের দেশ রক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী মি. বেইলি বলেছেন, আমরা যে শিক্ষা ব্যবস্থা উপস্থিত করেছি, তা আমাদের বিবেচনায় যতই উৎকৃষ্ট হোক না কেন, মুসলমান সমাজ সযত্নে তা হতে দূরে অবস্থান করছে। এতে বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই, কেননা এ শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলমানদের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং মানসিকতার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা তাদের নীতি নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের মান রক্ষা হতে পারে না। [৩০]

১৮৩৭ খৃ. রাষ্ট্রভাষা ফারসী উঠিয়ে দিয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয় ইংরেজী। [৩১] ফলে চাকরি ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানগণ সম্পূর্ণভাবে হয় বঞ্চিত। বাংলায় প্রবর্তিত ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থা যা চাকরি প্রার্থীর যোগ্যতার মাপকাঠি বলে বিবেচিত হতো, উইলিয়াম হান্টারের ভাষায় তা ছিল, ''A system exclusively adapted to the Hindus.'' অর্থাৎ এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা যা কেবলমাত্র হিন্দুদের জন্যই উপযুক্ত। শুধু তাই নয়, মুসলমানদের চাকরি থেকে দূরে রাখার জন্য গভর্নমেন্ট গেজেট প্রকাশ্য বিজ্ঞাপনে উল্লেখ থাকতো যে এসব চাকরি হিন্দু ছাড়া অপর কাউকে দেয়া হবে না। [৩২] বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের শিক্ষিতের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ ছিল ঃ

বাংলা মোট জনসংখ্যা ছিল ৪, ৬৫, ৪৪, ৮৭০ জন। এর মধ্যে ৪৪, ৮৭০ জন খৃষ্টান, ২, ১০, ০০, ০০০ জন হিন্দু, ২, ৫৫, ০০, ০০০ জন মুসলমান। ১৯২৬-২৭ সনের রিপোর্ট অনুযায়ী শিক্ষার হার নিম্ন প্রাইমারীতে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা শতকরা ৪২ জন এবং মুসলমান শতকরা ৫৭ জন; উচ্চ প্রাইমারীতে হিন্দু শতকরা ৬২ জন আর মুসলমান শতকরা ২০ জন। হাই স্কুলে হিন্দু শতকরা ৮৬ জন, আর মুসলমান ১৪ জন। টেকনিক্যাল কলেজে হিন্দু শতকরা ৮৫ জন, মুসলমান ১০ জন এবং অন্য জাতি শতকরা ৫ জন। মেডিকেল কলেজে হিন্দু শতকরা ৮৯ জন এবং মুসলমান ৯ জন আর অন্যান্য জাতি ২ জন।

অপরপক্ষে হিন্দু ছাত্রীর সংখ্যা নিম্ন প্রাইমারীতে শতকরা ৩৮ জন। উচ্চ প্রাইমারীতে শতকরা ৬২.৫ জন এবং মুসলমান ছাত্রী শতকরা ৩৭.৫ জন। মধ্য শিক্ষায় হিন্দু ছাত্রী শতকরা ৬৪.৫ জন এবং মুসলমান ছাত্রী শতকরা ৫ জন। হাইস্কুলে হিন্দু ছাত্রী শতকরা ৯৬.৫ জন আর মুসলমান ছাত্রী ৩.৫ জন। আর্ট কলেজে হিন্দু ছাত্রী শতকরা ৯৮ জন এবং মুসলমান ছাত্রী ২ জন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় মিলে সেকালে বাংলায় পুরুষ শিক্ষিতের হার ছিল শতকরা ৯ জন আর মহিলা শিক্ষিতের হার শতকরা পৌনে ২ জন। [৩৩] শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের এরূপ শোচনীয় পশ্চাদপদতার যুগে শাহ্ শূফী আবূ বকর সিদ্দীকী

(র)-এর প্রচেষ্টায় প্রায় ৮০০ ওল্ড স্কীম ও নিউ স্কীম মাদ্রাসা এবং ১১০০ মসজিদ স্থাপিত হয়।

প্রসিদ্ধ কয়েকটি মাদ্রাসা

ফুরফুরার মাদ্রাসা, দোঁক মাদ্রাসা, সীতাপুর মাদ্রাসা, মোল্লা শিমলা মাদ্রাসা, ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত মাদ্রাসা, (বরিশাল), ছায়ানী মাদ্রাসা, ইসলামিয়া মাদ্রাসা, চৌধুরাণী ফাতহিয়া মাদ্রাসা, জোড়া মাদ্রাসা (পাবনা), মরইল মাদ্রাসা, মোস্তফাবিয়া মাদ্রাসা (বগুড়া), হালদ মাদ্রাসা, ধলেশ্বর মাদ্রাসা, ধুলাউড়া মাদ্রাসা, তাবারোউয়া মাদ্রাসা, সেনাতুনিয়া মাদ্রাসা, গোবিন্দপুর মাদ্রাসা, গোপগ্রাম মাদ্রাসা, লাহড়িয়া মাদ্রাসা, বাকুল মাদ্রাসা, মাগুড়া মাদ্রাসা, তেকুয়া মাদ্রাসা, কাহালু মাদ্রাসা, পদ্যবিলা মাদ্রাসা, ইসলামবাদ মাদ্রাশা, মহিরাণ পীর সাহেবের মাদ্রাসা, ছনপুর আসার নগর মাদ্রাসা, দোগাছিয়া মাদ্রাসা ইত্যাদি।[৩৪] এসব মাদ্রাসা আজও সগৌরবে দাঁড়িয়ে তাঁর অমর কীর্তির সাক্ষ্য দিচ্ছে।

ফুরফুরায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী (র)-এর উর্ধতন পুরুষ মওলানা মুস্তফা মাদানী (র)-এর পীর ভাই আওরঙ্গজেব আলমগীর৩৫ তাঁর রাজত্বকালে (১৬৫৮-১৭০৭) কোন এক সময় ফুরফুরায় শুভ প্রদার্পণ করেন বলে কিংবদন্তী রয়েছে। উভয়ের শায়খ ছিলেন মাসূম রব্বানী (র) ইব্ন মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র) (মৃ. ১৬৫৮ খৃ.)।[৩৬] সে সময়েই ফুরফুরায় ইসলামী শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাদশাহ আলমগীর আয়মা[৩৭] ছাড়াও বহু সম্পত্তি বন্দোবস্ত করে দেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খরচের জন্য। ১০৭৭/১৬৬৬ হিজরীতে প্রদত্ত বাদশাহী সনদপত্র এখনও ফুরফুরার আবূ জাফর সিদ্দীকীর নিকট গচ্ছিত আছে।[৩৮]

ফুরফুরা ফতেহিয়া মাদ্রাসা

শায়খে ফুরফুরা মুসলিম বালক-বালিকাদের বিশুদ্ধভাবে কুরআনুল করীম শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সুযোগ্য হাফিয ও কারীর তত্ত্বাবধানে তাঁর শায়খের নামের স্মৃতি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য ফতেহিয়া মাদ্রাসা নামে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রথমে একটি কিরাতিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে তাজবীদ শিক্ষাদানের সাথে সাথে হাদীস, তাফসীর ও ফিক্হ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। সম্ভবত বঙ্গ ও আসামে এটাই প্রথম আবাসিক বেসরকারী দরসে নিযামিয়া (ওল্ড স্কীম) মাদ্রাসা। তিনি আধুনিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। তাতে প্রতিদিন বহু কোমলমতি বালক-বালিকা শিক্ষা লাভ করে ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

অতঃপর ১৯০২ খৃষ্টাব্দে উক্ত মাদ্রাসার পাঠদান পদ্ধতি যথারীতি আলিয়া মাদ্রাসার নিসাব অনুসরণ করতে থাকে। কালক্রমে এ মাদ্রাসা ফুরফুরা ফতেহিয়া সিনিয়র ফাযিল মাদ্রাসায় উন্নীত হয়।

কামিল মাদ্রাসা

উক্ত ওল্ড স্কীম সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যায়ক্রমে কামিল মাদ্রাসায় উন্নীত হয়। এ জন্য শায়খে ফুরফুরা ৩৮ হাত দীর্ঘ একখানা দালান তৈরী করেন।

এ মাদ্রাসা ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে সরকার কর্তৃক মঞ্জুরী লাভ করে এবং অনুদান প্রাপ্ত হয়। এ প্রতিষ্ঠান হতে অগণিত আলিমে হক্কানী বের হয়ে দেশ ও জাতির খেদমতে নিয়োজিত হন। প্রতি বছর ফুরফুরায় অনুষ্ঠিত ২১, ২২ ও ২৫ ফাল্গুন বার্ষিক মাহফিলে কামিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মওলানাদের মাথায় তিনি নিজ হাতে পাগড়ী বেঁধে দিতেন। কামিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ মওলানাদের তিনি 'ফখরুল মুহাদ্দিসীন' এবং দ্বিতীয় বিভাগপ্রাপ্তদের 'কামারুল মুহাদ্দিসীন' উপাধিত ভূষিত করতেন। [৩৯]

শায়খে ফুরফুরার ইন্তেকালের পর অনিবার্য কারণবশত দাওরা (কামিল) হাদীসের ক্লাসের অবলুপ্তি ঘটে; কিন্তু বর্তমান শায়খগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আবার কামিল ক্লাস চালু হয়ে সুনামের সাথে চলে আসছে। [৪০]

নিউ স্কীম মাদ্রাসা

তিনি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে শিক্ষামন্ত্রীর সহায়তায় নিউ স্কীম জুনিয়র মাদ্রাসা ফুরফুরা স্থাপন করেন এবং এর মঞ্জুরীর ব্যবস্থা করেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে এ মাদ্রাসা হাই মাদ্রাসায় পরিণত হলে সরকার হতে মাসিক ১৫০ টাকা করে অনুদান পায়। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ১৫০ হাত দীর্ঘ একটি পাকা গৃহ নির্মাণ করা হয়। এতে শায়খে ফুরফুরা ৬০০০ (ছয় হাজার) টাকা দান করেন এবং সরকার ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা সাহায্য করেন। এছাড়া তিনি তাঁর ২৮০০০ (আটাশ হাজার) টাকার সম্পত্তি মাদ্রাসায় ওয়াক্‌ফ করে দেন। [৪১] মাদ্রাসার সার্বিক খরচের ঘাটতিও তাঁর তহবিল হতে পূরণ করা হয়। দরিদ্র, অসহায় ও মেধাবী ছাত্রদের সাহায্যার্থে মাদ্রাসা সংলগ্ন একটি ছাত্রাবাস (লিল্লাহ বোডিং) প্রতিষ্ঠা করা হয়। তিনি হাসপাতালসহ অন্যান্য জনকল্যানমূলক প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করেন।

লাইব্রেরী

ফুরফুরা শায়খ কেবল মাদ্রাসাই প্রতিষ্ঠা করেননি; বরং এর উৎস ও প্রাণ বই-পুস্তক সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য তিনি প্রথমে ১০, ০০০ (দশ হাজার) টাকা ব্যয়ে ফুরফুরায় একখানা কুতুবখানা বা লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এ লাইব্রেরীর

জন্য দুষ্প্রাপ্য তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, ইতিহাস, মানতিক (তর্কবিদ্যা), হিকমত ও ফালসাফা (বিজ্ঞান ও দর্শন) এবং ওলী-আল্লাহ্গণের জীবনীগ্রন্থ প্রভৃতি সংগ্রহ করেন।

শিক্ষা সংস্কার

আলিয়া মাদ্রাসার সিলেবাস সংস্কার

ইংরেজ শাসনামলে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে মুসলিম জাতির ধ্বংসস্তূপের উপর কলকাতায় আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। গভর্নর জেনারেল হেষ্টিংস (১৭৭২-১৭৮৬) আলিয়া পদ্ধতির প্রবর্তক।[৪২] এ শিক্ষা ব্যবস্থায় কুরআনুল কারীমের বিজ্ঞান-দর্শন, নবী (সা)-এর বৈপ্লবিক জীবনাদর্শ, রাজনীতি, অর্থনীতি, জিহাদ প্রভৃতি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার পরিবর্তে গ্রীকের প্রাচীনপন্থী মান্তিক, নাস্তিক্যবাদী যুগের অচল হিকমত ইত্যাদি মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, ইসলামী সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করে তাদের মন-মানসিকতার ছাত্র তৈরির লক্ষ্যে।

তদানীন্তন আলিয়ার সিলেবাসের যে ক্রুটিপূর্ণ চিত্র ছিল, তা উইলিয়াম হান্টারের ভাষায়, এ ধরনের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সাত বছরকাল শিক্ষালাভ করে ছাত্রগণ যে বিদ্যা নিয়ে বের হয়ে থাকে, সে বিদ্যার আর যে কোন ক্ষমতাই থাকুক না কেন, তার দ্বারা জীবনের দুর্দশা বৃদ্ধি ছাড়া লাঘবের কোন বিষয়বস্তু যে তাতে থাকতে পারে না, তা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না।[৪৩] এজন্য ফুরফুরার শায়খ ১৩৪০/১৯৩৩ সালে জমইয়তের তুলাবায়ে আরাবিয়া আসাম-এর তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে ভাষণ দান করেন এবং প্রস্তাব গ্রহণ করে সিলেবাস সংস্কারের জন্য সরকারের নিকট দাবী পেশ করেন। এখানে উক্ত ভাষণের সারসংক্ষেপ উপস্থপিত হল।

''আমার মতে কোন বিষয়ের শিক্ষাকে বাদ না দিয়ে যে যে ভাষা বাংলাও আসামে প্রচলিত আছে সেসব ভাষায়ই শিক্ষা জরুরী। আমাদের এমন শিক্ষা পেতে হবে যাতে আমরা রাজদরবারে কাজ করতে পারি, স্বাধীনভাবে পার্থিব উন্নতি করতে পারি এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুসরণ করতে পারি। ইংরেজী ও আরবী উভয় শিক্ষায় ক্রুটির জন্য ছাত্রগণ জীবনের নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে না। ফলে চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্য প্রার্থীর চেয়ে অযোগ্য প্রার্থী অধিক হয়ে যায়। আমাদের প্রয়োজন সংখ্যক মুসলিম প্রার্থী না থাকায় অমুসলিম প্রার্থী দিয়ে সে পদ পূরণ করতে হয়। এজন্য আমাদের চার দলে বিভক্ত হতে হবে ঃ

একদল শাহী দপ্তরে কাজ করবে; দ্বিতীয় দল কৃষি ও শিল্পে; তৃতীয় দল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ; চতুর্থ দল কুরআন-হাদীসের নির্দেশানুসারে ইসলাম প্রচারে মাদ্রাসায় শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত থাকবে। এরূপ হাদীগণই (পথপ্রদর্শক) প্রকৃত

শায়খ ও পথপ্রদর্শক। দুনিয়া ও আখিরাতের কর্তব্য সম্পাদনে স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, এজন্য কেউ ডাক্তারী পড়বে, কেউ কবিরাজী। আবার বর্তমান কলকারাখানার যুগে বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিদ্যা একান্ত আবশ্যক। এজন্য ওল্ড স্কীম ও নিউ স্কীম উভয় পদ্ধতির মাদ্রাসা ও স্কুল কলেজ প্রয়োজন। স্কুল-কলেজে আরবী দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে থাকবে।

বর্তমান নিউ স্কীম ও ওল্ড স্কীম উভয় প্রকার সিলেবাস ছাত্রদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাতে তালীম ভাল হয় না। অবশেষে আরবীতে পারদর্শিতা অর্জনের লক্ষ্যে হিন্দুস্তানে যেতে হয়। তা ছাড়া আজকালকার এই সিলেবাসে পাস করা মৌলভীগণ দীনী আকাঈদে, রূহানী জোশে ও কর্মশক্তিতে সব দিক দিয়ে অদক্ষ থেকে যায়। নিউ স্কীম ও ওল্ড স্কীম মাদ্রাসাসমূহের যথাশীঘ্র মাদ্রাসা সিলেবাসের সংস্কার এবং ওল্ড স্কীম মাদ্রাসাসমূহে যথাশীঘ্র হাকিকী (প্রকৃত) শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা প্রয়োজন।

অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী

১. বঙ্গীয় গভর্নমেন্ট বঙ্গব্যাপী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন বিষয়ক যে বিল সিন্ডিকেট কমিটিতে পেশ করেছেন, উক্ত বিল আইনে পরিণত করে দেশের প্রকৃত উন্নতির পথ সুগম করতে এ সভা সদাশয় গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করছে।

২. বঙ্গদেশের হাইস্কুল সমূহের বিশেষ সাহায্য হেতু গভর্নমেন্ট বেশীর ভাগে আট লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন; কিন্তু মাদ্রাসা সমূহের বিশেষ সাহায্য মঞ্জুর করেননি। ইতিপূর্বে জানা গেছে যে, মাদ্রাসাসমূহের সাহায্য বাবদ গভর্নমেন্ট মোট ২৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন। তারপর বিশ হাজার, তারপর সতের হাজারের কথা প্রকাশ পায়। এ সবের মূল কোনটি সত্য তা জনসাধারণ জানতে পারেনি। এ সভা মাদ্রাসার প্রতি এরূপ উদাসীনতার তীব্র প্রতিবাদ করছে এবং মাদ্রাসাসমূহের যথাযোগ্য সাহায্য মঞ্জুরের জন্য গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করছে।

৩. জুনিয়র মাদ্রাসার উর্ধ্বতন ক্লাসে অন্তত ২০ জন ছাত্র না হলে উক্ত মাদ্রাসাকে ডিপার্টমেন্ট মঞ্জুরী দেবে না এবং তাতে সরকারী সাহায্য প্রদত্ত হবে না বলে বিভাগ কর্তৃক যে ঘোষণা করা হয়েছে, এ সভা উক্ত ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ করছে এবং তা প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করছে।

উপরোক্ত ভাষণ ও প্রস্তাবাবলী হতে সহজেই অনুমেয় যে, যুগ সংস্কারক (মুজাদ্দিদ) বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আবূ বকর সিদ্দীকী (র) শিক্ষা প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার সাধন করে জাতিকে উন্নতি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিতে কতটুকু সচেতন ছিলেন। ওল্ড স্কীম মাদ্রাসার বিপক্ষে ১৯০৫ সনে প্রতিবাদ উঠে। [৪৪] এর বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম আবূ নসর ওহীদ[৪৫] 'রিফর্মড মাদ্রাসা স্কীম' নামে বৃটিশ ভারত সরকারের নিকট এক প্রতিবেদন পেশ করার মাধ্যমে

ওল্ড স্কীম মাদ্রাসা উঠিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেন।[৪৬] পরবর্তীকালেও এক শ্রেণীর আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে ওল্ড স্কীম ও নিউ স্কীম উভয় শিক্ষা পদ্ধতির বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার হন এবং তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় তাদের অভিমত পরিবেশিত হয়। দৃষ্টান্তরূপ কতিপয় পত্রিকার অভিমত তুলে ধরা হলো ঃ

'শিখা'য় 'শিক্ষা সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয়, ''আমাদের শিক্ষার আদর্শানুযায়ী মুসলিম শিক্ষা প্রণালীর সংশোধন করতে হলে প্রাথমিক শিক্ষার আরবী, ফার্সী, উর্দূ বিজাতীয় ভাষা একেবারে উঠিয়ে দিতে হবে এবং নতুন পুরাতন সকল মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়ে স্কুল কলেজের শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করা উচিত। কেউ কেউ বলেন যে, আমরা দরিদ্র মুসলমান; স্কুল-কলেজের খরচে চলে না। মাদ্রাসা শিক্ষাই ভাল। কিন্তু আমার মনে হয়, মাদ্রাসার কুশিক্ষার চেয়ে অশিক্ষাই ভাল, কারণ তাতে জাতীয় শক্তির অপচয় হয় না।''[৪৭]

সওগাত-এ 'মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যা' শীর্ষক সম্পাদকীয়ে বলা হয়, ''আমাদের প্রস্তাব মোটামুটি এই প্রাচীন ধরনের মক্তব মাদ্রাসাসমূহকে সোজাসুজি আধুনিক ধরনের স্কুলে পরিণত করতে হবে।''[৪৮]

সওগাত-এ 'ইসলাম ও মুসলমান' নিবন্ধে বলা হয়, 'আরবী, ফারসী, উর্দু বা মাদ্রাসা-মক্তবের মোহে পড়ে মুসলমানদের যে কি অনিষ্ট সাধিত হচ্ছে, তা বলে শেষ করা যাবে না। এ শিক্ষাতে বুদ্ধি কোনরূপ প্রসার লাভ করতে পারে না। এতে অযথা সময়, শক্তি ও অর্থের অপব্যয় হয়।''[৪৯]

এ অবস্থায় ফুরফুরার শায়খ শহরে, গ্রামে-গঞ্জে বক্তৃতা ও পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি প্রদানের মাধ্যমে মুসলিমদের ধর্ম শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করতে থাকেন। শুধু বক্তৃতায় স্থায়ী কাজ হবে না, এজন্য বঙ্গ আসামের গ্রামে, শহরে-নগরে ঘুরে ঘুরে নিজ হাতে অগণিত মাদ্রাসা স্থাপন করেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি ১৩১৯ সালে পাবনায় হাদল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিপূর্বে এ জেলায় উল্লেখযোগ্য কোন মাদ্রাসা ছিল না।[৫০]

বঙ্গ বিজয়ী ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী[৫১] (১২০৩ খৃ.) উত্তরবঙ্গের রংপুরে প্রথম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৫২] এর শত শত বছর পর বিশ শতকের গোড়ার দিকে শায়খে ফুরফুরা মহাস্থানগড়ে ওয়ায করতে আসেন এবং শাহ্ সুলতান মাহী সাওয়ার (র)-এর মাযার যিয়ারত করেন। পরে সেখানে আবূ বকর সিদ্দীকী (র) একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং সেখানকার খাদিম সৈয়দ আলী (র)-কে জনগণের হিতার্থে ইলম শিক্ষার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। তখন পর্যন্ত বগুড়া শহরে কোন মাদ্রাসা স্থাপিত হয়নি।[৫৩]

১৯৩৭ সালে বৃদ্ধ বয়সেও তিনি আসামে হিদায়েত তথা ইসলামী শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে ছুটে গিয়েছিলেন। সেদিন তিনি আসামের মহেন্দ্রগঞ্জে যে

মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন করেন, সে মাদ্রাসা স্বগৌরবে আজও তাঁর অমর স্মৃতি বহন করছে। এ সময় আবূ নসর ওহীদ দেশের ওল্ড স্কীম মাদ্রাসাগুলো দেয়ার পরিকল্পনা করলে ফুরফুরার শায়খের প্রবল প্রতিবাদের ফলে তাঁর চেষ্টা বিফল হয়ে যায়।[৫৪]

আধুনিক শিক্ষা

শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী (র) যে কেবল ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের জন্য চেষ্টা করেছেন, তা নয় বরং যুগের চাহিদার প্রেক্ষাপটে মাতৃভাষা বাংলা ও ইংরেজী শিক্ষার জন্য মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করেন। অথচ ফারায়েযী আন্দোলনের প্রবর্তক হাজী শরীয়ত উল্লাহ্[৫৫] অমুসলিম শাসক ইংরেজদের ভাষা শিক্ষাকে অবৈধ বলে ফতওয়া দেন। ফলে ইংরেজদের প্রতি জনগণের অনীহা জন্মে। এ সম্পর্কে মীর মোশারফ হোসেন (মৃ. ১৯১২) বলেন, ''আত্মীয় স্বজন, গুরুজনের ধারণা যে ইংরেজী পত্রিকা পড়লেই একরূপ ছোটখাট শয়তান হয়। ১৯০২ ও ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়, ধর্ম ভরে প্রাচীন ব্যক্তিরা তাদের সন্তানদের ইংরেজী শিক্ষা দেবার বিরোধী ছিলেন। 'মিহির ও সুধাকর' (১৮৯৯ খৃ.) পত্রিকায় ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের উদাসীনতার কথা উল্লেখ করা হয়। তৎকালীন এক শ্রেণীর মৌলভী আরবী ফার্সী ছাড়া অন্য ভাষা শিক্ষা করা অবৈধ বলে ধারণা পোষণ করতেন। কিন্তু আবূ বকর সিদ্দীকী তাঁর ভাষণে বলেন, ''দুনিয়াবী প্রয়োজনের জন্য ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করা ইসলামে নাজায়েয নয়। নবী করীম (সা) তাঁর সাহাবী যায়েদ (রা)-কে ইবরানী (হিব্রু) ভাষা শিক্ষার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।''[৫৬]

বইপুস্তক প্রকাশ

বইপুস্তক প্রকাশনার মাধ্যমে সমাজ সংস্কার সাধন ও চিন্তাধারা প্রচার সহজতর হয়, একথা সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু ফুরফুরা শায়খের আর্বিভাবের প্রাক্কালে অভিভক্ত বাংলা ও আসামের মুসলমানদের মধ্যে মাতৃভাষা বাংলায় ধর্মশিক্ষা করার প্রবণতা ও বই-পুস্তকের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এ কথার স্বপক্ষে প্রমাণস্বরূপ তদানীন্তন কালের একটি পত্রিকায় মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য ঃ

''বর্তমান সময়ে নানা কারণে আমাদের পবিত্র ধর্মের বিমল জ্যোতি বঙ্গদেশীয় মুসলমানদের দ্বারা হীনপ্রভঃ হয়ে পড়ছে। আমাদের সমাজে ধর্মপ্রচারক এবং ধর্মগ্রন্থের অভাবই এর একমাত্র কারণ। ধর্মগ্রন্থের অভাব বলতে বাংলা ভাষায় ধর্মগ্রন্থের অভাব বলতে হবে। নচেৎ আরবী, ফারসী, উর্দু ভাষায় বলতে আমাদের ধর্মগ্রন্থ এত অধিক পরিমাণ বিদ্যমান আছে যে, পৃথিবীর অন্য সমুদয় জাতির ধর্মগ্রন্থ একত্র করলেও আমাদের ধর্মগ্রন্থসমূহের সমান হবে না বলে

আমাদের ধারণা। কিন্তু সে সব মহাগ্রন্থের মর্ম বুঝতে সক্ষম লোক খুবই বিরল।"[৫৭] ফুরফুরার শায়খের পূর্বে লেখা ও বিবৃতির মাধ্যমে বাংলায় ইসলাম প্রচার ও কুসংস্কার দূরীকরণের ক্ষেত্রে মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র) (মৃ. ১৮৬০খৃ.)-এর খেদমত ও অবদান অতুলনীয়। তাঁর রচিত ৪১-৪৬টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। আজও কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে তাঁর কিছু সংখ্যক পুস্তক সংরক্ষিত আছে। কিন্তু সবগুলো গ্রন্থই উর্দু ভাষায় লিখিতে বলে বাংলাভাষী জনসাধারণ এর দ্বারা উপকৃত হতে পারেনি। অপরপক্ষে ফুরফুরা শায়খের মিশন ও সংগঠনের পক্ষ হতে তাঁর আদেশ ও আপ্রাণ চেষ্টায় যে সমস্ত পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে তার সংখ্যা দু'হাজারের অধিক। উক্ত পুস্তকসমূহের মধ্যে কিছু ছিল প্রতিবাদমূলক, যা তৎকালীন বিদআতী বেশরা কথিত পীর, কাদিয়ানী, মিশনারী প্রভৃতির বিরুদ্ধে লেখা হয়েছিল এবং এমন কিছুসংখ্যক পুস্তক ছিল যার দ্বারা সাধারণ জনগণ মাতৃভাষা বাংলায় সহজে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, যুগসংস্কারক শায়খ আবূ বকর সিদ্দীকী (র)-এর পূর্বে মাতৃভাষা বাংলায় এত অধিক সংখ্যক বই-পুস্তক আহলে সুন্নত অল জামাআতের পক্ষ হতে প্রকাশিত হওয়ার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। তাঁর অনুসারীদের মধ্যে যাঁরা শতাধিক পুস্তকের লেখক তাঁরা হলেন ঃ যথাক্রমে বাংলার শীর্ষস্থানীয় মওলানা রুহুল আমীন (র) (মৃ. ১৯৪৫)। ফুরফুরার শায়খের নির্দেশে তাঁর লিখিত পুস্তকের সংখ্যা ১৩৫। অবিভক্ত বাংলা ও আসামের শায়খ নিসারুদ্দীন আহমদ (র) (মৃ. ১৯৫২), ফুরফুরার শায়খের আদেশে তিনি যে সমস্ত পুস্তক রচনা করেন তার সংখ্যা অর্ধশতাধিক। প্রখ্যাত ধর্মপ্রচারক জমীর উদ্দীন বিদ্যাবিনোদ (র) (মৃ. ১৯৩০), ফুরফুরার শায়খের আদেশে যে সকল পুস্তক রচনা করেন তার সংখ্যা ১০৮।[৫৮] এ ছাড়াও পুস্তক রচনা করেছেন ফুরফুরার শায়খের মেজো সাহেবযাদা আবু জাফর সিদ্দীকী, মওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরী (র), আল্লামা ইবরাহীম জয়নগরী (২৪ পরগনা), মওলানাময়েযুদ্দীন হামিদী (র) (মৃ. ১৯৭১), মওলানা আফসার উদ্দীন (র), মওলানা সূফী তাজাম্মুল হুসাইন সিদ্দীকী (র), সূফী সদরউদ্দীন (র) (মৃ. ১৯৪৪) মওলানা ইবরাহীম (হাদল, বাংলাদেশ) আল্লামা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (র) (মৃ. ১৯৬৯), প্রফেসর মওলানা আবদুল খালিক (র) (মৃ. ১৯৫৫), কবি মুজাম্মেল হক, মৌলভী মুন্শী রিয়ায উদ্দীন, মোসলেম হিতৈষীর সম্পাদক মুন্শী শেখ আবদুর রহীম, মৌলভী আবদুল হাকিম, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (মৃ. ১৯৫০) প্রমুখ। এরূপ আরও অগণিত ব্যক্তি তাঁর আদেশ ও যত্নে বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেন। এ ছাড়াও ফুরফুরার শায়খের সুহৃদ ভক্ত ও অনুগামী মুন্শী মোঃ মেহেরুল্লাহ (র) (মৃ. ১৯০৭) খৃষ্টান চক্রান্তের বিরুদ্ধে বই-পুস্তক রচনার ক্ষেত্রে ফুরফুরার শায়খের সহযোগিতা ও সহানুভূতি লাভ করেন।

ফুরফুরা শায়খের নির্দেশে ও সহযোগীতায় প্রকাশিত পুস্তক

(১) ইসলাম এন্ড মোহামেডান ল (২) ইসলাম ও পর্দা (৩) ইসলাম ও সঙ্গীত (৪) ইসলাম ও বিজ্ঞান (৫) পীর মুরিদী তত্ত্ব (৬) কুরআন প্রসঙ্গ (৭) ইসলাম প্রসঙ্গ (৮) বাংলাদেশে বাতিল ফেরকাহ (৯) বালক নূর বা বাল্য শিক্ষা (১০) ছেলেদের নূরনবী (১১) কৃষকের উন্নতি ও দুঃখ দুর্দশার প্রতিকার (১২) ধূমপানের অপকারিতা (১৩) তালীমে ইসলাম ও নামায শিক্ষা (১৪) হাদীস শিক্ষা (১৫) সরল অযীফা শিক্ষা (১৬) বৃহৎ নামায শিক্ষা (১৭) জতীয় কল্যাণ (১৮) নূরুল হিদায়েত বা বিদ'আতী ফকীরের ধোঁকাভঞ্জন (১৯) খিলাফত আন্দোলন পদ্ধতি (২০) সমাজ উন্নতি (২১) হুক্কা বিনাশ (২২) রদ্দে কাদিয়ানী (২৩) কাদিয়ানী রহস্য (২৪) কাদিয়ানী রদ (মোট ৬ খণ্ড) (২৫) রদ্দে বিদআত (চার খণ্ড) (২৬) যুলযাতে ওহ্হাবিয়া (২৭) রদ্দে শি'আ (২৮) ইসলাম ও মুহাররম (২৯) মুহাররম তাযীয়ার ফাতাওয়া (৩০) গ্রামে জুম'আ বা হিন্দুস্থানের একটি ফাতাওয়া রদ (৩১) গ্রামে জুমআ সম্বন্ধে শরীফ ও হিন্দুস্থানের ফাতাওয়া (৩২) আল জুমআ (৩৩) গ্রামে জুমআর নামায পড়িলাম কেন? (৩৪) জুমআর দ্বিধা ভঞ্জন (৩৫) জুমআ বিরোধী আপত্তি (৩৬) গ্রামে জুমআ (৩৭) জরুরী মাসায়েল (মোট ৩ খণ্ড) (৩৮) ওয়ায শিক্ষা (মোট আট খণ্ড) (৩৯) ফাতাওয়ায়ে আমীনিয়া (মোট ৭ খণ্ড) (৪০) হানাফী ফিক্হ তত্ত্ব বা মাসায়েল ভাণ্ডার (৪১) রাসরুল মুজতাহিদীন বা মাসায়েল খণ্ড (মোট ৩ খণ্ড) (৪২) বঙ্গানুবাদ মিশকাত শরীফ (মোট ৩ খণ্ড) (৪৩) কুরআন শরীফের তাফসীর (৪৪) যাকাত ফিতরার বিস্তারিত মাসআলা (৪৫) খাঁ সাহেবের তাফসীরের প্রতিবাদ (৪৬) খাঁ সাহেবের মোস্তাফা চরিত্রের প্রতিবাদ (৪৭) খোন্দকারের ধোঁকা ভঞ্জন (৪৮) কিরাত শিক্ষা (৪৯) কামিউল মুবতাদিয়ীন (মোট ৩ খণ্ড) (৫০) কিয়ামুল মুজতাহিদীন (৫১) মাসায়েলে সালাসা (৫২) মাযহাব ও তাকলীদ (৫৩) ফাতাওয়ায়ে সিদ্দীকীয়া (৫ খণ্ড) (৫৪) হাকিকাতে মারিফাতি রব্বানীয়া (৫৫) তারীখুল ইসলাম (ইসলামের ইতিহাস) (৫৬) বুরহানুল মুকাল্লিদীন বা মাযহাব মীমাংসা (৫৭) তরীকত দর্পন (৫৮) ঈদ ও নারী (৫৯) দল্লীন ও যল্লীন মীমাংসা (৬০) দাফিউল মুফসিদীন (৬১) মসজিদ স্থানান্তরিত করার রদ (৬২) মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের প্রতিবাদ (৬৩) মীলাদে মুস্তাফা (৬৪) বীমা সম্বন্ধে আযাদের বাতিল ফাতাওয়া (৬৫) দাফন কাফনের মাসআলা (৬৬) নিকাহ ও জানাযা তত্ত্ব (৬৭) আলাকাবুল মুসলিমীন (৬৮) ফিরকাতুন্নাজীন (৬৯) শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ও পাদরীর ধোঁকা ভঞ্জন (৭০) ইসলামী বক্তৃতা (৭১) ইঞ্জিলে হযরত মুহাম্মদ (সা) (৭২) খৃষ্টান দে (৭৩) আকায়েদে ইসলাম (৭৪) ইলমে তাসাওউফ (৭৫) ওযীফা শিক্ষা বা ইরশাদে সিদ্দীকীয়া (৭৬) মারিফাত দর্পণ (৭৭) রাহনোমায়ে আবরার (৭৮) মাইজ ভাণ্ডারের বাহাছ (৭৯) রদ্দে আযানগাছি (৮০) বাগমারী বাহাছ

(৮১) দাফেয়ে যুলমাত ও দ্বীন ও দুনিয়ার শান্তি (৮২) হজ্জের মাসায়েল ও দু'আ (৮৩) যাকাত-ফিতরার বিস্তারিত মাসায়েল (৮৪) জাল হাদীস (আল মওযুয়াতের বঙ্গানুবাদ) (৮৫) মৌলুদ ও কিয়ামের ফাতাওয়া (৮৬) কামিল পীরের আলামত (৮৭) যবেহ ও কুরবানীর মাসায়েল (৮৮) সংক্ষিপ্ত সহজ নামায শিক্ষা (৮৯) হযরত বড়পীর সাহেব (রা)-এর জীবন চরিত্র (৯০) সৈয়দ আহমদ বেরলভী (র)-এর জীবন চরিত্র (৯১) ফারায়েয শিক্ষা (৯২) আফতাবে হিদায়েত ফী রদ্দে মাহতাবে জালালাত (৯৩) তাযকিরাতুস সালিহাত (৯৪) মাওলানা পরিচয় (৯৫) আখিরাতের সম্বল (৯৬) সুদ সমস্যা (৯৭) স্বভাব দর্পণ (৯৮) হুজ্জাতুল ইসলাম (৯৯) বঙ্গ আসমের পীর আউলীয়া কাহিনী (১০০) আখিরী যুহর (১০১) উমদাতুল ইসলাম (১০২) আমাদের সমস্যা (১০৩) তাযকিরাতুল ইযাম (১০৪) বিবি শওহারের মাসআলা (১০৫) শেরখানীর ফাতাওয়া (১০৬) সাইয়েদুল মুরসালীন (১০৭) রত্নখনি (১০৮) আমার প্রিয় রসূল (সা) (১০৯) আমপারার তাফসীর (১১০) ইযহারুল হক বা কদমবুসীর ফাতাওয়া (১১১) নসীহতে সিদ্দীকীয়া (১১২) কারামতে সিদ্দীকীয়া (১১৩) ইকামাতুস সুন্নত বা বিদআত খণ্ডন (১১৪) দুর্দশার প্রতিকারে (১১৫) প্রজাস্বত্ব আইন (১১৬) মহাজনী আইন (১১৭) ভোট ও ভোটার (১১৮) সরল টোটকা চিকিৎসা (১১৯) গো-কোরবানী (১২০) তাবিযের কিতাব (১২১) স্ত্রীলোকের পর্দা সম্বন্ধে ফাতাওয়া (১২২) ইরশাদে সিদ্দীকীয়া ফাইযাতে ফাতাহিয়া (১২৩) ইসালে সাওয়াবের ফাতাওয়া (উর্দু) (১২৪) শরীঅতের হুকুম জ্ঞানের অনুকূল (১২৫) রদ্দে বদগুমান (১২৬) নাজাতে আখিরাত (১২৭) মাসআয়েলে আরবাআ (১২৮) ওয়াযে ইসলাম (১২৯) বাতিল মতবাদ (১৩০) অমর কাব্য (১৩১) যবেহ কুরবানীর ফাতওয়া (১৩২) বাউল ধ্বংসের ফাতাওয়া (১৩৩) ভণ্ড ফকীর (১৩৪) হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন চরিত্র ও ধর্মনীতি।

পত্র-পত্রিকা প্রকাশ

ইসলামী ভাবধারা ও সাহিত্য সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত করতে, সরকার ও জনসাধারণকে বক্তব্য জনাতে এবং মুসলিম সমাজের অভাব অভিযোগ তুলে ধরতে ফুরফুরার শায়খ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এ জন্য তাঁর অনুগামীদের সম্পাদনায় ও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা যেসব পত্রিকা বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়, তার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

(১) ইসলাম প্রচার (১৮৯১), সম্পাদক মোঃ রিয়ায উদ্দীন (২) মিহির ও সুধাকর (১৮৯৫) সম্পাদক আবদুর রহীম ও রিয়াজ উদ্দীন (৩) হাফেজ (১৮৯৭), সম্পাদক আবদুর রহীম (৪) সুলতান (১৯০২), সম্পাদক রিয়ায উদ্দীন আহমদ (৫) নবনূর (১৯০৩), সম্পাদক সৈয়দ ইমদাদ আলী (৬) মোহাম্মদী (১৯০৩, সম্পাদক মাওলানা আকরাম খাঁ[৫৭] (৭) মোসলেম হিতৈষী (১৯১১), সম্পাদক

শেখ আবদুর রহীম (৮) আল-এসলাম (১৯১৫), সম্পাদক মাওলানা আকরাম খাঁ, পরে মনিরুজ্জামান (৯) বঙ্গনূর (১৯১৯), সম্পাদক শেখ হাবীবুর রহমান (১০) ইসলাম দর্শন (১৯২০), সম্পাদক আবদুল হাকিম (১১) ইসলাম জগত (১৯২৩), সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ ইদ্রীস (১২) রওশনে হিদায়েত (১৯২৪), সম্পাদক মোঃ ইবরাহীম (১৩) শরীঅতে ইসলাম (১৯২৪), সম্পাদক আহমদ আলী এনায়েতপুর (১৪) হানাফী (১৯২৬), সম্পাদক মাওলানা রুহুল আমীন (১৫) হানাফী জামাআত (১৯২৬), সম্পাদক শেখ হাবীবুর রহমান (১৬) আল-মুসলিম (১৯২৮), সম্পাদক ফজলুল হক শেলবর্ষী (১৭) তরুণের ঝাণ্ডা, ইসলামের ডাণ্ডা (১৯৩০), সম্পাদক অজ্ঞাত (১৮) সুন্নত আল জামাআত (১৩৩৯/১৯৩২), সম্পাদক মাওলানা রুহুল আমীন (১৯) মোসলেম (২০) হিদায়েত ইত্যাদি।

উপসংহার

ইংরেজ শাসনামলে যখন মুসলিম জাতির পশ্চাদপতার সুযোগে বাংলার দিশেহারা মুসলমানদের নিজেদের ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও আচার-ব্যবহারের ব্যাপারে উদাসীন করে তোলা হয়েছিল, ঠিক সে সময়েই মুজাদ্দিদে আলফে সানী শায়খ আহমদ সিরহিন্দের (র) (মৃ. ১০২৪/১৬১৫) সিলসিলার পতাকাবাহী, শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভীর মানসপুত্র এবং শহীদ সাইয়িদ আহ্মদ বেরলভী (১৮৩১) প্রতিনিধি শাহ্ সূফী মওলানা আবূ বকর সিদ্দীকী ফুরফুরায় জন্মগ্রহণ করেন। জাতির উল্লিখিত শোচনীয় পরিস্থিতিতে বাংলার হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ এবং মওলানা নিসার আলী তিতুমীর প্রমুখের আন্তরিক সাধনা ও আজীবন জিহাদের ফলে বাংলার দিকে দিকে সংগ্রামী চেতনার উন্মেষ ঘটে মওলানা শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী ছিলেন সে যুগ-চেতনারই একটি শুভ অভিব্যক্তি।

ইসলাম ধর্ম ও মহান আল্লাহ্র পবিত্র বাণী প্রচার ছিল তাঁর জীবনের সাধনা। তিনি পর্যায়ক্রমে ওয়াজ নসীহত, আধ্যাত্মিক সাধনা, শিক্ষা বিস্তার, সমাজ সংস্কারও সমাজসেবা, সাহিত্যচর্চা ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ এবং সাংগঠনিক কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলার অবহেলিত এবং আত্মবিস্মৃত মুসলিম সমাজকে অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন।

তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনায় বাংলা ও আসমে অনেক মাদ্রাসা, মসজিদ ও খানকা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ফুরফুরায় একটি ওল্ড স্কীম ও একটি নিউ ওল্ড স্কীম মাদ্রাসা এবং আর্ত মানবতার সেবায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রয়োজনের তাকীদে তিনি অনেক পত্র-পত্রিকা এবং প্রবন্ধ-পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তিনি বিশিষ্ট ওয়ায়িয ও লেখক রূপে পরিচিত ছিলেন। মোসলেম হিতৈষী, হানাফী, সুন্নত অল-জামায়াত, মোসলেম, সোলতান, শরিয়তে এছলাম, হেদায়েৎ, ইসলাম দর্শন, মিহির ও সুধাকর প্রভৃতি ইসলামী পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক

ছিলেন তিনি। এসব পত্র-পত্রিকা বাংলার মুসলিম পুনর্জাগরণে অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করে।

ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯১১ সালে আঞ্জুমান-এ-ওয়ায়েযীন প্রতিষ্ঠা করেন। আজীবন তিনি এর সভাপতি ছিলেন। এভাবে তিনি ইসলাম প্রচার, মুসলিম সমাজ থেকে অনাচার ও কুসংস্কার দূরীকরণ এবং নানাপ্রকার ইসলাম বিরোধী আক্রমণের প্রতিরোধ কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। যখনই ইসলাম ও মুসলমানদের উপর বিজাতীয়দের পক্ষ হতে কোন আঘাত এসেছে এই নির্ভীক শায়খ আবূ বকর সিদ্দীকী অকুতোভয়ে এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। যেমন গো-কুরবানী বন্ধের ঘোষণা, মসজিদের পাশে বাদ্য বাজনা ও মূর্তি স্থাপন প্রভৃতির বিরুদ্ধে তিনি বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে এর প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেন।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু তিনি কখনো দলীয় রাজনীতি করেননি। রাজনীতিতে তাঁর ভূমিকা ছিল গঠনমূলক। তিনি ধ্বংসাত্মক ও অসহযোগিতার রাজনীতি অপছন্দ করতেন। এজন্যই তিনি গান্ধীর আহবানে বৃটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেননি অথচ মুসলিম স্বার্থে খিলাফত আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। তিনি মনে করতেন এর মাঝেই ইসলাম এবং মুসলমানদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

বাংলার উলামা সমাজকে সচেতন করা এবং তাঁদের রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে সংঘবদ্ধ করার লক্ষ্যে তিনি জমইয়তে উলামায়ে বাংলায় যোগদান করেন এবং এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি রূপে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু জমইয়তে উলামায়ে বাংলার মূল সংগঠন জমইয়তে উলামায়ে হিন্দ্ কংগ্রেসকে বিনা শর্তে সমর্থন করায় তিনি 'জমইয়তে উলামায়ে বাংলা' ত্যাগ করে 'জমইয়তে উলামায়ে বাংলা ও আসাম' প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে তিনি মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বীজ বপন করে যান।

মওলানা শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী (র) ব্যক্তি জীবনে ছিলেন ইনসানে কামিল। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তাঁর ভূমিকা ছিল অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী। রাজনৈতিক জীবনে তিনি ছিলেন দূরদর্শী ও সময়োচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অতুলনীয়। মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে তিনি ছিলেন আপোষহীন। যুগে যুগে কালজয়ী সংস্কারকগণ যে পন্থায় অধঃপতিত ও আত্মবিস্মৃত মুসলিম জাতিকে মর্যাদা ও হৃত গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সূক্ষ্মদর্শী আবূ বকর সিদ্দীকী (র) তাঁর সকল পন্থা প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলার মুসলিম সমাজকে সে স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। তাঁর দিকপাল খলীফাগণ এ কাজ অব্যাহত রেখেছেন। শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী (র) কেবল খানকাকেন্দ্রিক শায়খই ছিলেন না; শিক্ষাবিস্তার ও সংস্কারের অগ্রদূতও ছিলেন। এ জন্য অনেক মনীষী তাঁকে 'মুজাদ্দিদ' (সংস্কারক) বলে আখ্যায়িত করেছেন। বাংলার মুসলিম সমাজ

সবদিক দিয়ে তাঁর কাছে ঋণী। শায়খে ফুরফুরা অনাগত প্রজন্মের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন।

তথ্যসূত্র

১. এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ই.ফা.বা পত্রিকা, ১৯৯৮-৯৯ সংখ্যা দ্র.।

২. তাঁর জন্ম তারিখ নিয়ে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সর্বজন স্বীকৃত ইন্তেকাল তারিখ ধরে তাঁর বয়স ৯৩ বছর ধরলে (১৯৩৯-৯৩=১৮৪৬ খৃষ্টাব্দকে তাঁর জন্ম তারিখ ধরা সঠিক বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। দ্র. ড. মতিউর রহমান, আয়েনায়ে উয়াইসী, লাইবল লিথু প্রেস, পাটনা, ১৯৭৬ খৃ., পৃ. ২৪২; আবূ ফাতেমা মোহাম্মদ ইসহাক, ফুরফুরার পীর হযরত আবূ বকর সিদ্দীকী, ই.ফা.বা. ঢাকা, ১ম সং, ১৯৮০, পৃ. ৯; মোহাম্মদ মোয়েজুদ্দীন হামিদী, আওলিয়া পরিচয়, ১ম সং., হামিদপুর খুলনা, ১৩৭২/১৯৬৫, পৃ. ৪৬-৪৮।

৩. মোল্লাপাড়ার পূর্ণ নাম কৃষ্ণনগর।

৪. সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত, সংসদ বাঙ্গালী চরিতাভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ১৯৭৬, পৃ. ৪৩। শাহ আবদুল মাবুদ ফারুকী, সাওয়ানিহে উমরিয়ে গাওসে সামদানী আবূ বকর সিদ্দীকী (র), সিরাজী প্রেস, ১৩৪১/১৯২০ খৃ. পৃ. ৭-৯; মুহাম্মদ রুহুল আমীন, ফুরফুরার পীর কিবলার জীবনী, ১ম সং., রিপন ষ্ট্রীট, মাজেদিয়া প্রেস কলকাত, ১৩৪৬ বাং, পৃ. ৮-১১; ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ইসলাম প্রসঙ্গ, ১ম সং., রেনেসা প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬৩, পৃ. ৮-১১; আবদুছ ছাত্তার, ইমামুল মুসলিমীন হযরত মুহাম্মদ আবূ বকর সিদ্দীকী (র) পীর কেবলার জীবন চরিত, ২য় সং., জলিল প্রিন্টার্স, ২৭ কে. এম. দাস লেন, ঢাকা ১৯৮৪, পৃ. ১৭-২১; মওলানা এম. ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, ১ম সং., হামিদিয়া প্রেস, ফেনী, ১৯৬৯, পৃ. ৩৫-৩৬।

৫. রাজার সঠিক নাম জানা যায় না। দ্র. এম. এ. রহমান, মোবারক আলী রহমানী, হায়াতে একরাম, রবি আর্ট প্রেস, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ১।

৬. খান বাহাদুর আবদুল হাকিম (সম্পা.) বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম খ., নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭২ পৃ. -১৮১।

৭. তর্কবাগীশ, (দিওয়ান মুহাম্মদ ইবরাহিম তর্কবাগীশ), হাকীকতে ইনসানিয়াত, ২য় সং., দি ইউনিভার্সেল প্রেস, ৩০ সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ১, ড. মতিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪-২৩৭।

৮. মুহাম্মদ আবূ জাফর, ফুরফুরা শরীফের ইতিহাস, মুজাদ্দেদিয়া লাইব্রেরী, ১৩৩৭/১৯২৮, হুগলী, পৃ. ১-২।

৯. ড. আবদুল গফুর সিদ্দীকী, বালাস্তীর পীর হযরত গোরাচাঁদ রাজী, তারিখবিহীন, পৃ. ৪৩, ৫১।

১০. মওলানা এম. ওবাইদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৬।

১১. এস. এ. জাহাঙ্গীর, সৈয়দ আবদুল মতিন জাহাঙ্গীর, গাওসে যমান শাহ সূফী ফত্হ আলী, ১ম সং., রব্বি আর্ট প্রেস, কলকাতা, ১৩৮০/১৯৭৩, পৃ. ১০৩-১০৪।

১২. হুমায়ুন আবদুল হাই, মুসলিম সংস্কারক ও সাধক, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ১০৩।

১৩. মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬-১৬০; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট, ইসলামিক ফাউন্ডেশন (ইফাবা), ১৯৮৫, পৃ. ২১-২২; মওলানা নুরুর রহমান, তাযকিরাতুল আওলিয়া, ৬ষ্ঠ খ., ১ম সং., এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১৮২-১৮৩, (৫ম খৃ.) আবু ফাতেমা মোহাম্মদ ইসহাক। ফুরফুরার পীর হযরত আবূ বকর সিদ্দীকী, ১ম সং., ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ২৬৭।

১৪. এম. এ. রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯-১১০; সৈয়দ মুহাম্মদ বাহাউদ্দীন ও শেখ মুহাম্মদ মহিউদ্দীন, A Great religious and social reformer, ফুরফুরার পীর হযরত আবূ বকর সিদ্দীকী (র), ১ম, সং., নাগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ১৪-১৫; আবু ফাতেমা মোহাম্মদ ইসহাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০; হাজী মুহাম্মদ আবদুল গফুর, রাহনুমায়ে আবরার (উর্দু) মাতবুআ আর্ট লিথু প্রিন্টিং প্রেস, লাহোর, তারিখ বিহীন, পৃ. ১৭৩। উক্ত সনদ তাঁর দ্বিতীয় পুত্র শাহ আবূ জাফর সিদ্দীকীর নিকট সংরক্ষিত আছে।

১৫. তৎকালে বাঙ্গালী হাজীরা কলিকাতা হতে বোম্বাই গিয়ে জাহাজে চড়তেন। রাস্তার কষ্ট ছাড়াও বোম্বেতে হাজীদের থাকা খাওয়ার কষ্ট হত। শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী (র) কলিকাতা হতে ট্রেনযোগে বোম্বে যান। পথে প্রতিটি ষ্টেশনে অগণিত মানুষ তাঁকে সম্বর্ধনা জানায়। বোম্বেতে কিছুদিন অপেক্ষা করার পর তিনি মুযাফ্‌ফরী জাহাজযোগে জিদ্দার পথে রওয়ানা হন। বোম্বেতে বাঙ্গালী হাজীদের কষ্ট সচক্ষে দেখে তিনি হজ্জ থেকে দেশে ফিরে বৃটিশ সরকারের কাছে লেখালেখি করে কলিকাতা থেকে জাহাজ ছাড়ার ব্যবস্থা করেন। (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, পরিশিষ্ট, পৃ. ২২)

১৬. এই মাদ্রাসা শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী (র)-এর জনৈকা আত্মীয়া সাওলাতুন নেসা প্রতিষ্ঠা করেন। (১২৯১ হি./১৮৭৪)। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের রাজধানী কলিকাতা শহরের পূর্ব-দক্ষিণ দিকে প্রায় আঠার মাইল দূরে ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত ও সিলাহ গ্রামে মৌলভী এজাযত হোসাইনের ঔরসে ১৮৩২ খৃ. সওলাতুন নেসা জন্মগ্রহণ করেন। সওলাতুন নেসা একজন জমিদার ছিলেন। তিনি ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। সূত্র ঃ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ইসলাম প্রসঙ্গ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২।

১৭. ইসলাম অমূলক নতুন পথ ও মতের উচ্ছেদকারী ও বিলুপ্তকারী।
১৮. রাসূল (সা)-এর সুন্নাত জীবিতকারী।
১৯. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, পরিশিষ্ট, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
২০. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, পরিশিষ্ট, প্রগুক্ত, পৃ. ২২
২১. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, পরিশিষ্ট, প্রগুক্ত, পৃ. ২২
২২. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, পরিশিষ্ট, প্রগুক্ত, পৃ. ২২
২৩. দেওয়ান-ই-ইব্রাহিম তর্কবাগীশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২-৯৫।
২৪. আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, ১ম সং., বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ১২৫।
২৫. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০-১।
২৬. মওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৫-৬।
২৭. শরীয়তে ইসলাম, ৫ম বর্ষ, আষাঢ় সংখ্যা, পৃ. ১৪২-৪৩।
২৮. এ মাহফিল বিদআত বর্জিত এবং সুন্নতে নববীর উপর প্রতিষ্ঠিত।
২৯. মোসলেম পত্রিকা, ৬ চৈত্র, সোমবার, ১৩৪৭/১৯৩৯; আবদুস ছাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩-৪০।
৩০. উদ্ধৃত, তর্কবাগীশ, হাকীকতে ইনসানিয়াত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।
৩১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা (প্রবন্ধ-মুসলিম ও বৃটিশ যুগে উপমহাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা) মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ (২১শ সংখ্যা, ঢাকা, ফাল্গুন, ১৩৯১/ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫, পৃ. ৩৬; The Islamic University Studies (Part-A) Vol. 2, No. 1, June 1993, Kushtia, p. 1.
৩২. ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্স, অনুঃ এম, আনিসুজ্জামান, নতুন সং, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১৫৩-১৫৪।
৩৩. শরীয়তে ইসলাম, ৪র্থ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ১৩৩৬/১৯২৯।
৩৪. তর্কবাগীশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।
৩৫. আওরঙ্গজেব আলমগীর মোগল সম্রাট শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র। যোগ্যতা এবং কর্মদক্ষতাগুণে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি একাধানে একজন সুদক্ষ সেনাপতি, আদর্শ শাসক, ধার্মিক ব্যক্তি, নিরপেক্ষ বিচারক, প্রজাহিতৈষী ও ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে ভারত বর্ষের ইতিহাতে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। সারল্য, কর্তব্যপরায়ণতা, নিরপেক্ষ ও সৎ উদ্দেশ্য ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়া সত্ত্বেও তিনি পবিত্র কুরআন শরীফ নকল করে ও টুপি সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করেন। মুসলিম ধর্ম তত্ত্বেও তাঁর অগাধ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর তত্ত্বাবধানে নয়'শ আলিমের অক্লান্ত অভ্যন্তরে মতি মসজিদ এবং সাম্রাজ্যব্যাপি অগণিত ইসলামী প্রতিষ্ঠান তাঁর অমর কীর্তির স্বাক্ষর। দীর্ঘ ৫২ বছর ইসলামী

আদর্শনুযায়ী সাম্রাজ্য পরিচালনার পর ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। সূত্র ঃ সৈয়দ গোলাম হুসাইন খান তাবকাবায়ী, সিয়ারে মুতাআখ্‌খিরীন, অনু. ড. এম. আবদুল কাদের, ১ম সং., বাংলা একাডেমী, ১৩৮৫/১৯৭৮; পৃ. ১; কে আলী, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস (মধ্য ও আধুনিক যুগ) নবম সং., ঢাকা, ১৯৮৯ পৃ. ৪০২-৪৩৩; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, পরিশিষ্ট, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৩; বাংলা বিশ্বকোষ ১ম খ., ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ১০২-১০৩; Dr, Muhammad Enamul Haq. A History of Sufiism in Bengla, 1st. Ed. Asiatic Society, Dhaka, Bangladesh, ১৯৭৫, চ. ৩৩.

৩৬. তর্কবাগীশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

৩৭. নিষ্কর ও লাখেরাজ সম্পত্তি।

৩৮. মওলানা বাকী বিল্লাহ্ (ফুরফুরা)-এর বাচনিক বিবরণ।

৩৯. এম. রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৫।

৪০. আবূ জাফর সিদ্দীকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১৪।

৪১. মওলানা রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬।

৪২. ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা স্থাপন করেন। দ্র. Dr.A.K.M. Ayub Ali, History og Traditional Islamic Education in Bangladesh, Down to AD 1980. 1st. ed. Dhaka. ১৯৮৩, চ.৩৪।

৪৩. তর্কবাগীশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

৪৪. বাহাউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

৪৫. আবূ নসর ওহীদ, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সিলেট শহরের হাওয়াপড়ায় এর মধ্যবিত্ত পরিবার জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৭ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আরবীতে এম. এ. পাস করেন। কর্মজীবনে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকতার পর ১৯২১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। কর্মজীবনে শিক্ষকতার সাথে সাথে শিক্ষা সংস্কারের প্রয়াস চালিয়ে যান। শিক্ষা ব্যবস্থায় 'নিউ স্কীম' পদ্ধতি চালু এ ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা-কর্মের প্রধান কীর্তি। তিনি বাংলা, ইংরেজী, ফারসী ও আরবীতে পারদর্শী ছিলেন। ১৯০১ সালে তিনি শামসুল উলামা উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৮৫ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। সূত্র ঃ সৈয়দ মুর্তজা আলী, মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, এ. বি. বুক ষ্টোর, নিউমার্কেট, ঢাকা, ১৯৭৬ পৃ. ১৩৬-১৩৭; Report of the Moslem Education Advisory Committee. ১৯৩৪, পৃ. ৭৬; ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, ১ম সং., ই. ফা. বা, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ২১৪-২২৩; ডক্টর ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, প্রথম খ. ১ম সং., বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৩. পৃ. ১২৯-১৩০;

এস. ডব্লিউ হোসেন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি, কলকাতা মোহামেডান ইউনিয়ন, কলিকাতা, ১৯০৩দ্র. বুলবুল, ৩ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, পৌষ, ১৩৪৩।

৪৬. রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩; বাহাউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

৪৭. মুস্তাফা নূর-উল-ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, ১ম সং., বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ১৫; শিখা পত্রিকা, ১ম বর্ষ, চৈত্র ১৩৩৩/১৯২৬।

৪৮. সওগাত, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা; ১৩৩৬/১৯২৮।

৪৯. সওগাত, ৭ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ১৩৩৬/১৯২৯।

৫০. রওশন হেদায়েত, ৩য় বর্ষ, দশম সংখ্যা;১৩৩৩।

৫১. বাংলাদেশের ইতিহাসে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর নাম অবিস্মরণীয়। তাঁর প্রথম জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। তবে তবকাত-ই-নাসিরী থেকে জানা যায়, বাল্যকাল থেকেই সৈনিক হওয়ার বাসনা তাঁর ছিল। তুর্কী বংশোদ্ভূত খিলজী বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পর তাঁর পরিবারবর্গ ছেড়ে গজনবীর সুলতান মুহাম্মদ ঘুরীর দরবারে যোগ্যতানুযায়ী চাকরী না পেয়ে দিল্লী চলে আসেন। একই কারণে তিনি দিল্লী ছেড়ে বদাউনে আসেন এবং সেখান থেকে মির্যাপুর চলে যান এবং দু'টি পরগণার জায়গীর লাভ করেন। ইতিমধ্যে তাঁর বীরত্ব ও সাফল্যের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে কুতুবুদ্দীন আইবেক কর্তৃক তিনি খিলাফত প্রাপ্ত হন। পরবর্তীকালে বিহার অধিকার কারার পর তিনি বদাউনে কুতুবুদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ব্যাপকভাবে সম্মানিত হন। অতঃপর বিহারে প্রত্যাবর্তন করে তিনি বাংলা বিজয়ে যাত্রা করেন। এ সময়ে বাংলার রাজা ছিলেন লুক্ষ্মণ সেন। ইখতিয়ার উদ্দীন ১২০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর সৈন্য বাহিনীর মাত্র ১৭ জন সমভিব্যহারে হঠাৎ লক্ষণ সেনের রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করলে তিনি ভয়ে সনকানাত ও বঙ্গোর দিকে পালিয়ে যান। এমনিভাবে বাংলায় মুসলিম রাজত্বের সূত্রপাত ঘটিয়ে তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন। ১২০৫ খৃষ্টাব্দে এই ইতিহাসখ্যাত বীরের জীবনাসান ঘটে। সূত্র ঃ মোহাম্মদ কাসেম ফেরেশতা, তারীখে ফেরেশতা, ২য় খ., গোলাম আলী এন্ড সন্স, পৃ. ৮৪৩-৮৫০; মীনহাজ-ই-সিরাজ, তবকাত-ই-নাসিরী, অনু, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, ১ম সং., বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১৬-৪৩; আবদুস সাত্তার, তারীখে মাদরাসা-ই-আলিয়া (১৭৮১-১৯৫৯); মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা, পৃ. ২২-২৮; ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৩৫ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানু-মার্চ ১৯৯৬, পৃ. ৪১-৫৩; শামস-ই-সিরাজ-আকীহ; তারীখ-ই-ফিরোজশাহী, কলকাতা, ১৮৯০, পৃ. ১১৪, ১১৬-১১৮, ১২০; Charles Stuart, History of Bangla,

London. ১৮২৩, চ. ৫৬; আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল), ঢাকা, ১৯৭৭, খৃ. ৬৬; Ghulam Hussain Salim. Riyazu-s-Salatin (A History of Bangla). Tr. Abdus Salam, 1st. Ed. Delhi, 1903, P.594; 'দনিক ইনকিলাব, ১১বর্ষ, ২১১ সংখ্যা, ৯ জানু, ১৯৯৭।

৫২. মওলানা আবদুস সাত্তার, তারীখে মাদ্রাসা-ই-আলিয়া (উর্দু), ব্যাংক প্রেস, ঢাকা, ১৯৫৯ পৃ. ২২।

৫৩. খান মুহাম্মদ আফজাল, মহাস্থনগড়ের ইতিহাস, (তারিখবিহীন)

৫৪. রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

৫৫. হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। একটানা ২০ বছর তিনি (১৭৯৮-১৮১৮) মক্কা শরীফে উচ্চশিক্ষা অর্জন করে দেশে ফিরে আসেন। আমৃত্যু দীর্ঘ ২২ বছর (১৮১৮-১৮৪০) তিনি ফরায়েযী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। বাহ্যত এটি ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারমূলক তথা কৃষক-প্রজা আন্দোলন হলেও এর অন্তর্নিহিত রূপ ছিল রাজনৈতিক। সূত্র ঃ ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-২; ড. ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার ধারা, ১ম সং., বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৪৫; ড. বদিউজ্জামান, ইসমাইল হোসেন সিরাজী ঃ জীবন ও সাহিত্য, ১ম সং., ই, ফা.বা. ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ১০১২।

৫৬. তর্কবাগীশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮; আবূ ফাতেমা মোহাম্মদ ইসহাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

৫৭. ইসলাম প্রচার পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র ১২৯৮/১৮৯১।

৫৮. বাহাউদ্দীন; প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৬৩।

৫৯. বাহাউদ্দীন; প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯।

نبذة من حياة الشيخ العلامة العارف بالله مولانا كرامت علي الجونبوري الهندي ثم البنجلاديشي الحنفي "الملخص" (1290هـ/1873م)، وكتابه

الدكتور مولانا محمد سيف الإسلام الأزهري الحنفي القادري

➢ اسمه ونسبه :

هو الشيخ كرامت علي الجونبوري. ولد في مولاها تا،جونبور، الهند. والده أبو ابراهيم كورونا محمد الإمام بكش ، صديقي النسب، حنفي المذهب، صوفي المشرب، عالم من الأدب الفارسي. وهو كان سليل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

➢ مرحلة الدراسة :

كان رحمه الله بدأ التعليم الابتدائي في عهد والده، وتعلم التصوف من مولانا قدرة الله، والأدب، والحديث من أحمد الله الأنامي، وحفظ القرآن الكريم وتبحر في فن تلاوة القرآن في سن مبكرة. وكان على دراية جيدة في الحديث ، وغيرها من فروع المعرفة. وأصبح حريصا على تطوير المعرفة الروحية، ونحث على التنقية الذاتية جعله لا يهدأ، وأخذ البيعة في الهند على يد الشيخ السيد أحمد رحمه الله تعالى.

➢ خدماته ومؤلفاته :

سافر المؤلف إلى ولاية بنغال بأمر مرشده في الطريقة لنشر الدعوة الإسلامية.

وقبل وصوله إلى ولاية البنغال، قد أنشأ مدرسة في جونبور. سرعان ما أصبحت هذه المدرسة شهيرة ، ومركزا للتعليم الإسلامي. وكان المؤلف أحد أتباع المتحمسين للمعايير الإسلامية الأصلية، والشعائر والطقوس، ومخالفا للأمور المنكرات في الشريعة.

وله رضي الله تعالى عنه مؤلفات كثيرة حوالي 46 (ست وأربعين) من الكتب مرت طبعات كثيرة. فقد أقر في شبه "مفتاح الجنة" والرسائل. ومن مصنفاته كتابه القارة الهند في شكل كتاب كبير على الإسلام . معظم كتبه باللغة الأردية على الرغم من أنه كتب باللغتين العربية والفارسية أيضا. وبعض كتبه الهامة هي :

1. مفتاح الجنة؛
2. الكوكب الدري؛
3. ترجمة الشمائل المحمدية للإمام الترمذي؛
4. ترجمة مشكاة المصابيح ؛
5. القول الثابت؛
6. البيعة والتوبة؛
7. القول الأمين؛
8. نور على نور؛
9. زاد التقوي؛
10. كرامة الحرمين الشريفين؛

الذي لخصه من الكتاب المذكور كما نبه عليه المصنف أثناء "الملخص" 11. كتابه هذا.

➢ مكانة المؤلف :

وقد وجدنا في آخر الكتاب المترجم للملخص باللغة الأردية[308] بعض العبارات تتعلق بالمؤلف تظهر مكانته العلمية والعملية والروحية وتكشف عن حقيقة حياته ما نصه : " عالم جليل، فاضل نبيل، جامع الفضائل والكمالات، قامع المحدثات والبدعات، واقف الأحاديث والآيات، صاحب الحجج والبينات، مظهر الحالات والكرامات، مصدر الخيرات والبركات، زبدة الأصفياء، وارث الأنبياء، واقف حقائق معنوي وصوري ."

وفي الصفحة الأخيرة للكتاب المترجم المذكور وجدنا بعض الأبيات في شانه كما فى التالية :

أين الذي قد فاقَ في أمصارنا * ذو الفضلِ عن أفضاله يستنصرُ
قد خابَ شمسَ الفضل في بحر الظلمِ * بالخسف أقمار العلومِ مكدَّرِ
وهو العليُ المُنْجَلي بفضله * متقدِّس متورِّع متبحِّر
بحرٌ محيطٌ لا يُرى أقطارُه * قاموسُ علمٍ فضله يتبحَّر
إنكان ينظرُ حظه من عينه * الشمسُ في تدويرِه يتدوَّر
لما سمعتُ وفاتَه يا ويلَتا * أرَخْتُ عن عام الوفاة ِ بيغفرُ.

---

[308] مطبوع في مطبع محسني جونبور، سنة 1343هـ .

➢ وفاته :

وتوفي رضي الله عنه 30 (ثلاثين) مايو ، 1873 (ثلاث وسبعين وثمانمائة وألف) من السنة الميلادية[309] ، المطابق 1290(ألف ومائتين وتسعين) من السنة الهجرية الشريفة – رضي الله تعالى عنه وعنا جميعا - ومقامه مشهور في بنجلاديش يزار ويتبرك.

وقال الشيخ عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي "**(ت1341هـ)** في الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى بـ (نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر) في الشيخ الصالح " في ترجمة الشيخ مولانا كرامة علي الجونبوري: "المصلح الكبير كرامة علي بن إمام بخش بن جار الله بن كل محمد بن محمد دائم الصديقي الحنفي الجونبوري أحد أكابر الفقهاء الحنفية، ودعاة الإسلام. ولد لسبع عشرة خلون من المحرم سنة خمس عشرة ومائتين وألف بمدينة جونبور.

وقرأ بعض الكتب الدرسية على الشيخ أحمد علي الجرياكوتي، وبعضها على مولانا أحمد الله الأنامي، وبعضها على مولانا قدرة الله الردولوي.

وبايع السيد الإمام أحمد بن عرفان الشهيد البريلوي ولازمه زماناً وعهد إليه السيد بالدعوة إلى الدين والشرع والاصلاح وبشره بها، فسافر إلى بنكاله ودار البلاد للإرشاد.

وكان الناس بدواً أميين بعداء عن المدنية والحضارة لا يلبسون من الثياب إلا ما يسترون به عوراتهم وكان النساء سافرات الوجوه لا يحتجبن ولا يمتاز المسلمون عن الوثنيين في العادات والتقاليد والشعائر حتى في الأسماء، وكانوا يفرون من أهل الحضر ويستوحشون من المصلحين فلم يزل يفتل في غاربهم ويتلطف بهم حتى استأنسوا به واجتمعوا لديه فأرشدهم إلى الحق وهداهم إلى الدين الخالص وعلمهم وهذبهم وأصبح نافذ الكلمة فيهم يعظمه الناس، ويتلقون إشاراته بالقبول وتغلغلت دعوته في أحشاء البلاد وأوغلت في أوديتها وجبالها وقراها وأمصارها واهتدى به خلائق تعد بمآت الألوف.

وله مصنفات في الفقه والسلوك نحو مفتاح الجنة وقد نال قبولاً عظيماً وانتشاراً كبيراً ونقل إلى لغات عديدة وأعيد طبعه مراراً، وزينة المصلي، وزينة القاري، وزاد التقوي، والكوكب الدري، والدعوات المسنونة، وشرح الجزري، ونور الهدى، ورفيق السالكين، وفيض عام، ومكاشفات رحمت، وقوة الإيمان، ونسيم الحرمين، وغيرها من الكتب والرسائل.

---

[309] . ملتقطا من بنغلابيديا (Banglapedia، 2006م) ، وغيره.

وكان مجوداً يقرأ القرآن بلحن شجي يأخذ بمجامع القلوب سافر إلى الحرمين الشريفين فحج وزار، وأخذ القراءة عن السيد إبراهيم المدني والسيد محمد الاسكندراني وكان قليل الخبرة بالحديث[310] .

مات يوم الجمعة لثلاث خلون من ربيع الثاني سنة تسعين ومائتين وألف برنكبور من أعمال بنكاله كما في مفيد المفتي وغيره[311] .

➢ كلمات عن الكتاب "الملخص":

الكتاب الذي بين أيدينا طبع من مطبع محسني جونفور، ملاتولا، الهند (قبل حصول الاستقلال لبنجلاديش عنها) في السنة 1343هـ /1925م . وقد ظفرت بالنسختين القديمتين عن تراث جدنا العلامة الكبير مولانا محمد سراج الحق، (ت 1998هـ) رضي الله تعالى عنه. واحدى النسختين باللغة العربية والأخرى مترجمة باللغة الأردية، وهما كادتا أن لا توجدا عند الناس، وإن كانت النسخ المترجمة إلى اللغة البنجالية توجد أحيانا.

فأردت أن أقوم بواجبي وقدمت هذا التراث القيم النادر الوجود نحو الورثة المحمدية والله المستجاب، والسعي منا والإتمام من الله عز وجل . وبفضل الله ومنّه القول التمام في شرح ملخص الإمام"، وقد طبع الكتاب " شرحت الكتاب وسميته ب والشرح معًا من دار الكتب العلمية ببيروت – لبنان سنة 2014م/1435هـ، وتوجد للكتاب النسخ الكثيرة في أنحاء بنجلاديش.

➢

سمية الكتاب ب" الملخص":

يشير إلى أنه مختصر من كتاب آخر، والحقيقة كذلك. وهذا الكتاب لخصه عندما وجه إليه السؤال عن مشروعية "كرامة الحرمين الشريفين "المؤلف من كتابه الاحتفال بالمولد الشريف والقيام فيه تعظيما للحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما يبدو من بداية كتابه هذا.

---

[310] والله ورسوله أعلم.

[311] عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي (ت1341هـ)، **نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر = الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام**، (بيروت، لبنان: دار ابن حزم، ط1، 1420 هـ/ 1999م)، ج7، ص 1073.

كتب هذا الملخص العبد الفقير إلى الله علي "قال المؤلف في آخر الكتاب :
الجونفوري الصديقي الحنفي ملخصا من رسالته المسماة ب"كرامة الحرمين الشريفين
."من شاء تفصيله فلينظر إليه والله سبحانه وتعالى أعلم "في إزالة شبه الفريقين

➢

نهج المؤلف في الكتاب:

سلك المؤلف في كتابه لإثبات الموضوع الشريف مسلك نقل فتاوى الأئمة والمجتهدين منهم والعلماء الكبار الذين هم المسؤولون بإصدار الرأي فى الحوادث والنوازل وهم أصحاب الفتيا وأحسن وأجاد .

صدر الكتاب بالسؤال وعقبه بالجواب بالأدلة الحاسمة للشبهات الطارئة حيث ظهرت أمام القراء، قال رحمه الله تعالى:

ما قولكم رحمكم الله تعالى في عمل المولد والقيام أمستحب أم بدعة، ومكروه؟

وقد قال الفقهاء إذا تردد المكلف في شيء من الأعمال أو الأقوال أو العقائد أو الأحوال بين كونه سنة وبدعة يعنى بدعة سيئة وشك في ذلك ولم يظهر له دليل يرجح محيط " عنده أحد الطرفين فترك ذلك الشيئ المتردد فيه واجب كما قال في أن ما تردد فيه بين الواجب والبدعة يأتي به "من كتاب السجدات "السرخسي احتياطا وما تردد بين البدعة والسنة تركه . لأن ترك البدعة لازم وأداء السنة غير لازم في الفصل الثاني من الباب الأول "الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية" هكذا في فعرف من هذه القاعدة الكلية أن ترك المولد والقيام لازم لأنهما محدثان بالاتفاق وسنيتهما مشكوكة فتركهما لازم.

الجـــــواب

بسم الله الرحمن الرحيم

حامدا ومصليا نقول إن التردد لا يحدث إلا إذا وجد المكلف التعارض بين أقوال نور " العلماء كما في تعريف المصر في باب الجمعة ولا بد للتعارض من المساواة كما في فلا يوجد شرط التعارض في باب المولد والقيام . "الأنوار

و"مدارج "المواهب اللدنية" لأن استحباب عمل المولد بتخصيص اسمه ثابت من ما ثبت " ونتبعهما عند الوعظ ونعتمد عليهما أشد الاعتماد ، أيضا ثابت من "النبوة للإمام السيوطي ومن "مصباح الزجاجة" ومن "تفسير روح البيان" ومن "من السنة فتاويه. وهو مجتهد من أجلة مشائخنا في سند الحديث كما ذكره الشيخ عبد العزيز

ومن "عجالة النافعة" قدس سره في ذكر السند لعلم الحديث في رسالته المسماة ب
التنوير " كما في التفسير المذكور ومن "إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون "كتاب
بمولد البشير النذير"كما فى التفسير المذكورومن قول الإمام ابن الجزري كما في
ومن قول الحافظ عماد الدين كما في السيرة المذكورة "سيرة الشامي "المواهب ومن
ومن فعل أبي "الدر المنتظم" ومن قول ابن الجوزي ومن قول العلامة طغربل في
الحسن المعروف بابن فضل ومن عمل جمال الدين العجمي الهمداني ومن عمل
يوسف الحجار ومن قول الشيخ الامام العلامة نصير الدين المبارك الشهير بابن الطباخ
ومن قول الشيخ الامام جمال الدين عبد الرحمن بن عبد الملك وهولاء المذكورون كلهم
المعتمدون عند مصنفها ومن قول ابن حجر الهيثمي والسخاوي وهو "سيرة الشامي" في
أيضا من أجلة مشائخنا في سند الحديث كما ذكره الشيخ في رسالته المذكورة ومن
لأبي "الباعث "قول الحافظ ابن حجرالذي نقله مصنف التفسير المذكور ومن كتاب
ومن قول أبي "فتح العليم الستار المنجي" شامة وهو شيخ الإمام النووي ومن مضمون
وقال عند أبي زرعة ولا يقال مثل "المواهب "زرعة وهو مجتهد لأن أخذ قوله صاحب
هذا القول إلا للمجتهد ومن قول علي بن سلطان محمد الهروي المقري بالحرم الشريف
المورد الروي في المولد " المكي الشهير بملا علي القاري الذي قال في رسالته المسماة ب
بالشرح والبسط وهو من تلاميذ شمس الدين محمد السخاوي رحمهما الله "النبوي
تعالي . ومن توارث أهالي بلاد الإسلام لا سيما من توارث أهل الحرمين الشريفين وهو
معتمد يوجب العمل وهو من أقوي الدلائل لأنه مسلم عند الكل بلا خلاف

وأما استحباب هذا القيام فثابت بالتصريح والتخصيص من عمل السواد الأعظم
من أهل الإسلام من سائرالأقطار والمدن الكبار ومن عمل الامام تقي الدين السبكي كما
في باب "رد المحتار" وهو المجتهد الحنفي كما قال في "و"سيرة الشامي "روح البيان" في
المرتد قال الامام خاتمة المجتهدين الشيخ تقي الدين السبكي الخ وكما في الشرح
المذكور لمولد البرزنجي ومن فتوي عثمان بن الحسن الدمياطي وعبد الله بن عبد
الرحمن السراج رحمهما الله تعالي كما سنذكرهما ومن توارث أهالي بلاد الإسلام لا
سيما من توارث أهل الحرمين الشريفين وهو معتمد يوجب العمل كما عرفت انفا ومن
ولكلتهما أصل ثابت من السنة . "سيرة الشامي "ومن "إنسان العيون "كتاب

أما قصة المولد فمن بيانه صلي الله عليه وسلم والصحابة ثابت من شاء فليرجع
إلي كتب الحديث.

وأما هذا القيام وهو قيام التعظيم فمن فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم وفاطمة رضي الله عنهما ثابت بالمداومة من شاء فلينظر الي في "مشكوة المصابيح" الفصل الثاني من باب المصافحة والمعانقة في حديث عائشة رضي الله عنها فحصل اليقين باستحبابهما ...

وفي آخر الكتاب تقاريظ كثيرة للكتاب وبها انتهى. والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

দশম অধ্যায়

সাক্ষাৎকার

ড. মুহাম্মাদ আহসান উল্লাহ ফয়সালের সাক্ষাৎকার

আহলে সুন্নাহ মিডিয়া আয়োজিত 'ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতায় বালাকোটের অবদান' শীর্ষক একটি ওয়েবিনারে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন সদ্য প্রয়াত বিশিষ্ট গবেষক ও ইতিহাসবিদ, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. আহসান উল্লাহ ফায়সাল রহ.। আব্দুল্লাহ যোবায়েরকে দেওয়া সাক্ষাৎকারের চুম্বক অংশের অনুলিখন দেওয়া হলো।

[আমাদের গবেষণা স্মারকের প্রস্তুতির শুরুতেই আমরা স্যারের সাথে যোগাযোগ করি। তিনি আমাদের স্মারকের জন্য একটি মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ দিবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহপাকের ইচ্ছা গত ৬ মে ২০২১ ইং স্যার ইন্তেকাল করেন। আমরা তাঁর পরলৌকিক জীবনের কল্যাণ কামনা করি- সম্পাদক।]

আব্দুল্লাহ যোবায়েরঃ
শাহ ওয়ালীউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলভী একটি আন্দোলন শুরু করেছিলেন ও তাঁর ইন্তেকালের পর শাহ আবদুল আযীয সেটিকে এগিয়ে নিয়ে যান। আমরা আপনার কাছে জানতে চাই সায়্যিদ আহমাদ বেরলভীর বালাকোট আন্দোলনের পেছনে এই বিষয়গুলা কিভাবে কাজ করেছিলো এবং প্রকৃত প্রেক্ষাপটগুলো কি ছিল?

ড. আহসান উল্লাহ ফয়সালঃ
ধন্যবাদ তোমাকে এই সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য।

সায়্যিদ আহমাদ শহীদের ইন্তেকালের পর এবং তাঁর জীবদ্দশায় আড়াই হাজার পৃষ্ঠার একটি বই আমাদের কাছে আছে আরেকটি একটি বই আছে যেটা নেপাল থেকে এনেছি। সায়্যিদ আহমদ শহীদের ভাই তাফসীর লিখেছেন মাখযানে

আহমাদী। সায়্যিদ আহমাদের চিঠিগুলোর অনেকগুলো চিঠি তাফসীরে আছে। আবুল হাসান নদভী এ বিষয়ে চারটি বই লিখেছেন। গোলাম রসুল মেহের দুইটি বই লিখেছেন। এছাড়াও বাংলাদেশের অনুবাদ হয়েছে কিছু, কিন্তু বাংলাদেশের অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীর নাম এখানে আসেনি। যারা অনুবাদ করেছেন তারা অনেকটা ভুল করেছেন।

সায়্যিদ আহমাদ শাহ আযীয কর্তৃক ঘোষিত দারুল হরব এটা হাজী শরীয়তউল্লাহ যেমন ঘোষণা করেছিলেন শাহ আবদুল আযীযও করেছিলেন। শাহ আব্দুল আযীয ঘোষণা করেছিলেন ১৮০৩ সালে আর উনি ইন্তেকাল করেন ১৮২৪ সালে। সায়্যিদ আহমাদ শহীদ এবং ইমাম উদ্দিনও উনার ছাত্র ছিলেন। পরবর্তীতে ইমাম উদ্দিন উনার খলিফা হন ও সায়্যিদ আহমাদ শহীদ দিল্লির মাদ্রাসায়ে রাহেমীয়াতে পড়াশোনা করেন যেটি শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভীর বাবা শাহ আবদুর রহীমের প্রতিষ্ঠিত। ঐ মাদ্রাসায় পড়াকালীন মেশকাত পড়ার পর তিনি যেহেন যাকাওয়াত যেটা আমি অন্য এক জায়গায় আলোচনা করেছি, উনার এতো পারদর্শিতা ছিল যে উনি আধ্যাত্মিকতার লাইনে অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছিলেন। শাহ আব্দুল আযীয রহ. একবার স্বপ্ন দেখেছিলেন দিল্লিতে লোকেরা ঘুরে আসতেছে। সবাই চতুর্দিক থেকে দিল্লিতে আসতেছে। তখন তিনি সেই স্বপ্ন দেখার পর শাহ গোলাম আলীর কাছে চলে গেলেন। শাহ গোলাম আলী তখন বললেন জামানার ইউসুফ আমার কাছে এসেছে স্বপ্নের ব্যাখ্যার জন্য! এ কথা শোনার পর শাহ আব্দুল আযীয বললেন কেন ভাই, আপনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমাকে দেন। আমি তো বুঝতে পারছি না। তখন তিনি বললেন আপনার হয়তো কোনো এক খলিফার মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশরা আছে বা ইসলামবিদ্বেষীরা আছে সেটা হয়তো প্রতিহত হতে পারে এবং আপনার কোন লোকের মাধ্যমে দিল্লি কেন্দ্রিক মুসলমানদের যে সালতানাত, মুসলমানদের যে রাজত্ব মুসলমানের রুল অব জাস্টিস এটা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ঐ মুহূর্তে মাওলানা ইমামুদ্দিনও সেখানে ছিলেন।

বালাকোটের বিষয়ে যে প্রশ্নটি আপনি করেছেন আব্দুল্লাহ যোবায়ের, সেটা হল বালাকোটের একটা প্রেক্ষাপট ছিল। সায়্যিদ আহমাদ শহীদ ১৮২১ সালে হজ্জ করতে গেলেন ১৮২৩ সালে আসলেন ও ১৮২৬ সালে উনি মুজাহিদ সংগ্রহ করা শুরু করলেন। এর মাঝে বাংলার অনেক মুজাহিদ সেখানে অংশগ্রহণ করেছিল, উত্তরপ্রদেশের অনেক মুজাহিদ অংশগ্রহণ করেছিল এবং সাথে সাথে তাদের সাথে সীমান্ত প্রদেশের অনেকে, পশ্চিমবাংলা বিহারের অনেকে। আমি অনেকের নাম বলতে চাইব কিন্তু তাদের নাম বলে শেষ করা যাবে না। এবং তাঁদের মাধ্যমে বাংলাদেশ নয় ভারতীয় উপমহাদেশে আজকে যত পীর সাহেব আছেন যত সিলসিলা আছে প্রায় সবার শীর্ষে উনি আছেন।

একমাত্র আহমাদ রেযা খান (উনার কিছু অনুসারী এই বিষয়ে বিভেদ করেন) যিনি ১৮৫৬ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯২১ সালে ইন্তেকাল করেছিলেন, উনিও রায় বেরেলীর; আহমাদ বিন ইরফানের এলাকার। কিন্তু উনাদের নিজেদের মধ্যে কোনো সংঘর্ষ বা বিভেদ ছিল না। কারণ উনি ১৮৩১ সালে শহীদ হয়েছিলেন। আর উনার মুরীদদের সাথে এ নিয়ে পরবর্তীতে কোনো ঝামেলা হয়েছিল কি না জানা নেই। সায়্যিদ আহমাদ শহীদ যখন ১৮২৬ সালে লোকজন নিয়ে যাওয়া শুরু করলেন তখন নোয়াখালীতে সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী এবং বাংলার অনেক, তারপর হচ্ছে আব্দুল হাকিম সুনুকি উনারা সবাই এবং মাওলানা আলিমুদ্দিন; বর্তমান পাকিস্তানের, তখন তো পাকিস্তান ছিলনা তারা এখান থেকে লোকজন নিয়ে জেহাদ অংশগ্রহণ করতো।

শুধু তাই না উনার প্রধান মুন্সি, মুন্সি বলতে মন্ত্রিপরিষদ সচিব তিনি হলেন বাংলার লোক। কাজী নজরুল ইসলামের এলাকার পশ্চিম বাংলার লোক এবং সকল কিছু লিখে রাখতেন তিনি। এরপরে ১৮২০ সালে আমাদের মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী, মাওলানা ইমামুদ্দীন উনার বায়াত গ্রহণ করেন। ১৮২৯ সালে যখন তিনি পাঞ্জাবের পাশে পেশোয়ারে ইসলামী রাষ্ট" কায়েম করেন সেখানে পাঠান এবং কিছু খানরা এটার বিরোধিতা করে এবং রাত্রিবেলায় এশার সময় উনার লোকজনকে হত্যা করে। এই সুবাদে তিনি আফগানিস্তানের পাশে এবং পাকিস্তানের পাঞ্জাবের পাশে ওখানে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে উনারা দূরে সরে আসলেন। প্রেক্ষাপটটা তখন কিন্তু বালাকোটের জন্য উনারা যান নাই। উনারা ইসলামী রাষ্ট" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, খলিফা উনি নিজে ছিলেন এবং মাওলানা ইমামুদ্দীন মন্ত্রী ছিলেন, নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী মন্ত্রী ছিলেন। উনারা একটা-দুইটা নয় অন্তত ১৮ টা যুদ্ধ আমি লিখেছি আমার বইতে; ১৮ টা যুদ্ধ করেছেন। মোট ১৮ টা যুদ্ধ উনি করেছেন এবং প্রত্যেকটা যুদ্ধে উনি জয়ী হয়েছেন। ১৮৩১ সালের যুদ্ধে উনি জয়ী হতে পারেননি। এর নানাবিধ কারণ ছিল। আমাদের এখানের পাঠানরা ১৯৭১ সালে আমাদের উপর অত্যাচার করেছিল।

ঐ পাঠানরাই সায়্যিদ আহমাদের বিরোধিতা করে। তাই তিনি সুলতান মাহমুদ খানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন। সুলতান মাহমুদ খান উনাকে আশ্রয় দিবেন বলেছিলেন এবং সহযোগিতা করবেন বলেছিলেন। কিন্তু উনার লোকজনকে এশার নামাজের সময়, ফজর নামাজের সময় হত্যা করা হতো।

সেখানে মুচিরা, ঝারুদাররা, দারোয়ানরা তাঁর অনেক লোককে রক্ষা করেছিল। সেই মুহূর্তে উনি বালাকোটের পাশে যেতে বাধ্য হন। আর সেখানে ১৮৩১ সালের ৬ই মে শুক্রবার দিন তিনি সেখানে উপস্থিত হন এবং মাওলানা আলিমুদ্দিন এগারোটার দিকে উনার সামনে গিয়ে উনি যেখানে বসে ছিলেন

চেয়ারের উপর সেই চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন একটা ছায়ার নিচে। এটার বর্ণনা আছে। ভূপালের নওয়াব উনি এটার বর্ণনা দিয়েছেন। বালাকোট একটি আন্দোলন, বালাকোট একটি ইতিহাস বালাকোট শুধুমাত্র একটি যুদ্ধ নয়। মাওলানা বেলায়েত আলী, মাওলানা এনায়েত আলী, কুষ্টিয়ার কাজী মেহেজান, ময়মনসিংহের কাজি আশিক উল্লাহ এরা সবাই আন্দোলনে শরিক হন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করে পাকিস্তান ও ভারত স্বাধীন হল সেখানে তাঁদের অনেক অবদান আছে। উনাদের হাজার হাজার কর্মী সেখানে শহীদ হয়েছিলেন।

আসলে বিষয় হলো শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভীর বিজ্ঞ ছাত্র হলেন সায়্যিদ আহমাদ শহীদ। ইলমের দিক দিয়ে ইমামুদ্দীন অনেক বড় ছিলেন কিন্তু তাসাউফ বা আধ্যাত্মিক বিষয়ে সায়্যিদ আহমাদ শহীদের মতো ওখানে কেউ ছিলেন না।

কলকাতায় যখন সায়্যিদ আহমাদ শহীদ আসেন তখন টিপু সুলতানের সন্তানদেরকে উনি ডাকেন। ১৭৯২ সালে ব্রিটিশরা টিপু সুলতানকে হত্যা করে। টিপু সুলতানের ৪৪ টার মত বই ছিল। এটা আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই জানেন না হয়তোবা। তাঁর প্রথম বইটা হলো তোহফাতুল নুয়াম মুজাহেদীন। টিপু সুলতান যে মসজিদটা করেছেন সেটা এখনো আছে। সেই মসজিদটা করার পর তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে গত ১০ বছর যাবৎ যার তাহাজ্জুদ কাযা হয় না তিনিই প্রথম নামাজ পড়াবেন। একজন আলেমও সেখানে দাড়াননি। টিপু সুলতান নিজে গিয়ে দাড়ালেন এবং বললেন আমিই তাহলে প্রথম নামাজ পড়াই। কারণ তিনি একজন তাহাজ্জুদগুজার ছিলেন। কিন্তু তাঁর চরিত্র যেভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সেরকম তিনি ছিলেন না। টিপু সুলতানের দুইজন সন্তান যখন নাস্তিক হয়ে গিয়েছিল ১৮২২ সালে, তখন সায়্যিদ আহমাদ শহীদ তাদেরকে ডাকলেন। কলকাতা আলিয়ার দুজন শিক্ষক রাফেজী শিয়া হয়ে গিয়েছিল। তিনি ওদেরকে এবং এদেরকে ডেকে বুঝাতে বুঝাতে নাস্তিকতার পথ থেকে পুনরায় ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনেন। এবং যারা রাফেজী হয়ে গিয়েছিল মাওলানা ওজির যেটা হান্টার তার বইয়ে লিখেছে সেই মাওলানা ওজির সহ সকলকে সরল সঠিক পথে নিয়ে আসেন। মাওলানা আমিনুদ্দিন তিনি সায়্যিদ আহমাদ বেরলভীর জন্য দুইটি পুকুর খনন করেন। উনার মুরীদদের মহিলাদের থাকার জন্য একটা ব্যবস্থা করেন এবং পুরুষদের থাকার জন্য একটা ব্যবস্থা করেন। এবং ঢাকা থেকে শত শত লোক ওখানে যেয়ে বায়্যাত গ্রহণ করেন। ঢাকা থেকে লোকজনকে আনয়ন করতেন নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী এবং চিঠিগুলি দিয়েছেন মাওলানা ইমামুদ্দীন বাঙ্গালী যেগুলা ফারসী ভাষায় লেখা আছে। ঢাকা থেকে লোকেরা গিয়ে সায়্যিদ আহমাদ শহীদের হাতে বায়্যাত গ্রহণ করতো আর যখন এত বেশি লোক হত যে তিনি বায়্যাত করাতে পারতেন না তখন তিনি তাঁর পাগড়ি ছেড়ে দিতেন লম্বা করে

যতদূর যেতো লোকেরা পাগড়ি ধরে বায়্যাত গ্রহণ করতেন। কিন্তু তিনি কখনও কোনো মহিলার হাত ধরেন নি এবং কাউকে বায়্যাত দেয়ার সময় এ কাজটি করে নি। আমি অনেকগুলো কারামত তাঁর দেখেছি। সায়্যিদ আহমাদ শহীদের হাতে যিনি হাত রাখতেন এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি কুদরতি ব্যাপার। যাঁরা এই বিষয়ে লিখেছেন তাঁরা কিন্তু বানিয়ে লেখার মত লোক না। তিনি করাচীর পাশে সিন্ধুতে গেলেন। সেখানে একটি গাছের নিচে বসলেন। লোকেরা বললো এখানে তো অনেক বছর ধরে ফল হয় না। সায়্যিদ আহমাদ শহীদকে বললেন যে হুজুর আপনি একটু দোয়া করেন। উনি ওখানে ১ মাস ছিলেন এবং সে গাছে আম ধরেছে। সে আম উনি খেয়ে এসেছেন। কাঁচা আম। এরকম উনার কারামত ছিলো। সব কারামত তো হাদীসের মত আমরা যাচাই বাছাই করতে পারবো না, বলতেও পারবো না। সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বুঝতে পারতেন। উনি আমীর খানের অধীনে চাকরি করেছিলেন। কিন্তু যেই মাত্র ঐ লোক ব্রিটিশদের সাথে চুক্তি করেছিলো সেই মাত্র তিনি সম্পর্ক ছেদ করে শাহ আবদুল আযীযের কাছে চলে আসেন। আর এখানে এসে তিনি জিহাদের প্রশিক্ষণ নেন। তিনি শারীরিক বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি যুদ্ধ করতে জানতেন। তিনি ঐ আমীর খানের কাছে থাকা অবস্থায় আমেরিকার পিন্ডারীর শতকরা ৯০ ভাগ সৈন্য উনার অনুগত হয়ে যায়। আমীর খানের অনুগত আর থাকে না। এই যে কথাগুলি। এগুলা লেখা আছে। এগুলো চল্লিশ হাজারের বেশিও হতে পারে। কারণ উনার অধীনে উনার মুরীদ যদি বা উনার খলিফা মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী যদি হাজার হাজার মুসলমান করে থাকেন। সেই হিসেবে সায়্যিদ আহমাদ শহীদও করেছিলেন। কারণ ছাত্র হিসেবে আমার কোনো ছাত্র যদি একটা আর্টিকেল লিখে তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে আমিই লিখেছি। সন্তান যদি কোনো কাজ করে মনে হয় যে আমিই করেছি।

ইংরেজরা বিশেষ করে হাজী শরীয়তউল্লাহ, তিতুমীর ও সায়্যিদ আহমাদ শহীদকে ওহাবী বলে গালি দিয়েছে। আজকে যেমন অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমানকেও মৌলবাদী বলে গালি দেয়া হয়, আই এস বলে গালি দেয়া হয়, সন্ত্রাসী বলে গালি দেয়া হয় তখনও অনুরূপভাবে ওহাবী বলে, ফান্ডামেন্টালিস্ট বলে ইত্যাদি খেতাব দিয়ে উনাদেরকে বদনাম করার চেষ্টা করা হয়।

সায়্যিদ আহমাদ শহীদ যখন মক্কাতে যান। মক্কার ইমাম সাহেব উনার হাতে বায়্যাত নিয়েছেন। ইমাম সাহেব হানাফী মাজহাবের ছিলেন।

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী সহ আরও অনেকে বলেছেন উনি মোজাদ্দেদ ছিলেন দ্বাদশ শতকের। উনি যখন ওখানে গেলেন এর আগেই কিন্তু ওহাবীরা মক্কা দখল করেছিলো। তখন হাজী শরীয়তউল্লাহ ওখানে উপস্থিত ছিলেন। ১৮১৮ সালে হাজী শরীয়তউল্লাহ চলে আসেন। এবং ১৮২৩ সালে

তিতুমীর সেখানে যান। সায়্যিদ আহমাদ শহীদও ওখানে ছিলেন। সেই মুহূর্তে মক্কার ইমাম যদি উনার হাতে বায়্যাত গ্রহণ করেন তাহলে দেখেন ওহাবীদের উনি ইমাম ছিলেন না কি উনার খলিফা ছিল ওহাবীরা? এটা কি বুঝা যায়? আমার কাছে মনে হচ্ছে বিষয়টা ভিন্ন রকম। তবে এখন যখন কলেজের বা কোনো একটা ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা সন্ত্রাসী কাজ করে তখন দায় পড়ে মাদ্রাসার ছাত্রদের উপর। মাদ্রাসার ছাত্ররা যে একবারে নির্দোষ আমি তা বলবো না। কিন্তু অনুরূপভাবে আজকে ইরাক ধ্বংস হয়ে গেলো এরকম মুসলমানদের উপর দায় চাপিয়ে। চেচনিয়া ধ্বংস হয়ে গেলো, কুয়েত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিলো তারপরে ইয়েমেনে হচ্ছে। এগুলো হলো যারা যুদ্ধবাজ, যারা দেশ দখল করতে চায় তাদের বিভিন্ন টার্ম। এটা মুসলমানরা আরও ভালভাবে গিলে এবং সেটা ব্যবহার করে। মুসলমানদের মধ্যে অনেকে লিখেছেন এবং হাইকোর্টের একজন এডভোকেট একটা বই লিখেছিলেন উনিও লিখেছেন ওহাবী নেতা। আমি বললাম যে ভাই, ওহাবী হওয়ার জন্য যে শর্তগুলি দরকার সেগুলো তো উনার মধ্যে ছিলো না। তবে মিলটা হচ্ছে ওহাবীরা যেমন শিরক বেদাত বিরোধী ছিলো উনিও এগুলোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ওর অর্থ তো এই নয় যে উনি ওদের থেকে নিবেন। আরেকটি কথা বলি। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলভী সংস্কার আন্দোলন করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় শাহ আবদুল আযীয করেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় সায়্যিদ আহমাদ শহীদ করেছেন। সুতরাং ইন্ডিয়ার যে সংস্কার আর সৌদি আরবের সংস্কারের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। উনি কিন্তু আধ্যাত্মিকতা মানতেন এবং চর্চা করতেন। উনি রাতে তাহাজ্জুদ পড়তেন। কিন্তু ওহাবীরা কিন্তু তাসাউফ মানে না। সুতরাং উনাকে যারা ওহাবীদের সাথে মিলিয়ে যারা কথা বলেন তারা কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের স্পিরিটটাকে শেষ করে দেয়ার জন্য কথা বলেন।

সায়্যিদ আহমাদ শহীদ যখন কলকাতায় আসেন হজে যাওয়ার জন্য তখন সেই মুহূর্তে সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী বায়্যাত নেন। এর আগে বায়াত নিয়েছিলেন মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী হাজার ১৮২০ সালে লক্ষ্ণৌ, রায়বেরেলীতে। মাওলানা ইমামউদ্দিন বায়াত নিয়েছিলেন একই মসজিদে বর্তমানে সেখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে উত্তরপ্রদেশে সেই বিশ্ববিদ্যালয় জামিয়া সৈয়দ আহমদ। সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী আগে থেকেই সূফী ছিলেন। উনি অনেক ভাল মানুষ ছিলেন। সায়্যিদ আহমাদ যতজনকে তাওয়াজ্জুহ দিতেন, যদিও আমাদের দেশে এখন তায়াজ্জুহ'র নামে অনেক ভণ্ডামিও আছে। উনি তাওয়াজ্জুহ দিতেন আল্লাহর মারেফাতকে বোঝানোর জন্য। এছাড়াও তাওয়াজ্জুহ দেয়ার জন্য তিনজন লোক ছিলেন। মাওলানা ইমাম উদ্দিন একজন ও সুফি নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী একজন। উনারা যাদেরকে হিদায়েতের পথে এনেছেন

তাদের মধ্যে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়ার লোকজনও ছিল এবং বার্মার সৈয়দ হামজাও ছিলো।

সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী পায়ের মধ্যে গুলিবিদ্ধ হলেন। তাঁবুর দুইপাশে মাওলানা ইমামউদ্দিন এবং সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী ছিলেন। বাঙালীদেরকে সায়্যিদ আহমদ অত্যন্ত মর্যাদা দিতেন। যখন মন্ত্রী পরিষদের প্রধান হলেন পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানের একজন দায়িত্ব ছিল, তিনি চিঠি লিখতেন। শত শত চিঠি বিদেশে পাঠিয়েছেন, আফগানিস্তানে পাঠিয়েছেন, সুদূর আরব পাঠিয়েছেন। সূফি নূর মুহাম্মদ নিজামপুরীর বিষয়ে একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে উনার সরাসরি খলিফা, আমি অন্তত ১০টা বইতে দেখেছি, প্রাচীন বইগুলো তথা তখনকার দিনের বইগুলোতে যে ফতেহ আলী ওয়াইসী যিনি বাংলা ভাষায় বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ফার্সি কবি।"মাশরেকে হুব্বে মুহাম্মদ মাতলায়ে দিওয়ানে মা, মাতলায়ে খুরশীদে এশকেশ সিনায়ে সুজানে মা"।

মাওলানা ইমামুদ্দীনের কাছে ফতেহ আলী ওয়াইসী পড়াশোনা করতেন। উনার খলিফা হলেন ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকী ১৮৪৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে কাজী নজরুলের সাথে নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন এবং খেলাফত আন্দোলন নিয়ে ফুরফুরা পীর সাহেবও আন্দোলন করেছেন। চরমোনাই যারা একটা বইতে দেখেছি তারা সায়্যিদ আহমাদ শহীদকে মানেন। গতরাতে আমি একটা বইতে দেখেছি তারা নূর মোহাম্মদ ঝানঝানাবী সূত্রে উজানীর হুজুর ক্বারী ইব্রাহীম কে মানেন। যেহেতু উজানির হুজুর ক্বারী ইব্রাহীম উনি মক্কাতে শিক্ষক ছিলেন এবং বাংলাদেশের মক্কাতে শিক্ষক ছিলেন দুই জন লোক। তার মধ্যে উজানির পীরসাহেব ক্বারী ইব্রাহিম নামে পরিচিত। বাংলাদেশে অনেক পণ্ডিত দেখা যায় কিন্তু মক্কাতে শিক্ষকতা করেছেন এরকম আমি কাউকে দেখিনি।

আব্দুল্লাহ যোবায়েরঃ

অভিযোগ দেওয়া হয় সায়্যিদ আহমাদের আন্দোলন ছিলো শিখদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়?

ড. আহসান উল্লাহ ফয়সালঃ

এখানে উনার অনেকগুলো চিঠি আছে। শিখদের বিরুদ্ধে আসলে ছিলো না। আমি আজকেও সন্ধ্যায় পড়েছি। শিখরা আসলে মূলতঃ এখানে ফ্যাক্টর ছিলো না। কিন্তু রণজিৎ সিংহের একটা চুক্তি হয়েছিলো ফ্রান্সের তৎকালীন জেনারেলের সাথে। আর ব্রিটিশদের একজন জেনারেল ছিলো ঐ জায়গায়। এরা মুসলমানদেরকে পাঞ্জাবে অবস্থান করতে দিচ্ছিল না। পাঞ্জাবে বালাকোটে যুদ্ধ করার জন্য সায়্যিদ

আহমাদ শহীদ সেখানে যাননি। কিন্তু ওরা বাধ্য করেছেন উনাদেরকে, এরাই পাঠানদেরকে বাধ্য করেছিল যেন সায়্যিদ আহমাদ শহীদের আন্দোলনকে ধ্বংস করতে পারে। তখন ওখানের মুসলমানদের উপর যখন চরমভাবে অত্যাচার শুরু হয় তখন লোকেরা জিজ্ঞেস করেছিল ইয়া আমিরুল মুমিনিন ছোট শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেছেন বড় শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেছেন না কেন? এই শব্দটাই বলেছিল। তখন তিনি বলেছিলেন দেখো, ব্রিটিশরা যেহেতু ভারতের অধিকাংশ জায়গা দখল করে ফেলেছে তাদের বিরুদ্ধে যাওয়া মানে নিজেদের সংকট তৈরি হয়, এখনই তা আমরা পারবো না। আমার যে লোক আছে তাদেরকে দিয়ে আগে পাঞ্জাবের মুসলমানদেরকে রক্ষা করবো। এজন্য তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। এর আগে যে তিনি ১৮ টা যুদ্ধ করলেন কোনো জায়গায় কিন্তু শিখ বা হিন্দু কারও বিরুদ্ধে ছিলো না। উনার আন্দোলনে ছিল মূলত যারা উনার বিরোধিতা করতো তাদের বিরুদ্ধে। হিন্দু ধর্মের প্রচুর লোক উনার ভক্ত ছিলেন, প্রচুর লোক উনার হাতের পানি পড়া নিতেন। হাফেজ আহমাদ জৈনপুরী হতে প্রচুর হিন্দুলোক পানি পড়া নিতেন। শিখরা উনার পাগড়ি ধরে নিজেরা গায়ে মাখতো যদিও এর কিন্তু যেহেতু উনাদের উপর আক্রমণ হয়ে গেলো এই কারণেই তাঁরা বালাকোটে যুদ্ধ করে শহীদ হতে বাধ্য হলেন। এ ব্যাপারে দুটো চিঠি আছে ফার্সি ভাষায়। মা খাতীবে সায়্যিদ আহমাদ শহীদের যেটা আফগানিস্তানের প্রধানকে লক্ষ্য করে তিনি লিখেছেন এবং দিল্লীর সম্রাটকে লক্ষ্য করে তিনি লিখেছেন।

নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নিয়ে আমরা যে কথাগুলা জানি কলকাতার একজন লোক পর্তুগালে গিয়ে সেখানে মূল ডকুমেন্ট দেখে, ব্রিটিশদের ইন্ডিয়ান লাইব্রেরি অফিস লন্ডনে দেখে একটা বই লিখেছেন। ঐ বইটা পড়লে মনে হবে সিরাজউদ্দৌলার যে চরিত্র আমরা দেখেছি তার সাথে তার মিল নেই। তেমনিভাবে সায়্যিদ আহমাদ শহীদকে এদেশে বহুলোক তাঁকে অন্যভাবে দেখেছে। সায়্যিদ আহমাদ শহীদ ১৮১৭ অথবা ১৮১৮ সালে জিহাদের বায়্যাত নিয়েছিলেন শাহ আবদুল আযীযের হাতে। আর শাহ আবদুল আযীয তখন প্রবীণ। শাহ আবদুল আযীযের একটি উক্তি আছে যে আমি যদি বুড়ো না হতাম তবে তোমার সাথে জিহাদে যেতাম। আর এর আগে যে বায়্যাত নিয়েছিলেন সেটা হলো তাসাউফের বায়্যাত। মেশকাত উনার কাছে পড়েছেন। উনার ভাই শাহ আবদুল কাদেরের সাথে থাকতেন। শাহ রফীউদ্দীনের সাথে দিল্লীর আকবরাবাদী মসজিদে থাকতেন। ঐ মসজিদটা দিল্লীর লোকেরা ২০১৫ সালে মাটির নিচে পেয়েছেন। যেটা ব্রিটিশরা ১৮৫৮ সালে গুড়িয়ে দিয়েছিলো।

আমার দাদা বাড়ি হাজিপুরের মাওলানা আকরাম উদ্দিন মিয়া। উনি মাওলানা ইমামউদ্দিনের খলিফা ছিলেন। উনার ঘরে জন্ম নেন মৌলভী ইদ্রিস।

তার ঘরে জন্ম নেন হাবিবুর। শামসুল হক ফরিদপুরীর দাদাও কিন্তু সে জিহাদের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং শহীদ হয়েছিলেন। শামসুল হক ফরিদপুরীর দাদা শহীদ হয়েছেন। আপনি যদি সাতক্ষীরা, রংপুর, নোয়াখালী অত্র বাংলাদেশে খোজ নেন তাহলে বহু গাজী পাবেন যারা তিতুমীরের জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

আব্দুল্লাহ যোবায়েরঃ
আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য।

ড. আহসান উল্লাহ ফয়সালঃ
আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।

একাদশ অধ্যায়

উম্মাহ্‌র ঐক্য

ঐক্যের আহ্বান

প্রফেসর মাওলানা সালাহ উদ্দিন

পৃথিবীর সমস্ত মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ কাফির, তাদের সংখ্যা অনেক। তারা বলে আল্লাহ বলতে কিছু নেই (নাউযুবিল্লাহ)। আরেক দল আল্লাহ আছেন মানে কিন্তু তাকে এক মানে না। একটি দেশ চালাতে কত মন্ত্রী দরকার হয়, আর এতো বড় ইউনিভার্স, এতো বড় বিশ্বজগৎ এটা কি আল্লাহ একলা চালাতে পারে? তার অনেক শরীক দরকার। এরা মুশরিক। আরেক দল মুমিন। কাফির-মুশরিকরা জাহান্নামী। আর মুমিন যারা রাসূল (সা.)-এর উম্মত, তামাম আম্বিয়ায়ে কিরাম ও তাদের উম্মত, তারা বেহেশতী। খাতামুন্নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আমরা যারা উম্মত, মুসলিম-মুমিন এদের মধ্যে আবার কেউ কেউ তরীকা বিশ্বাস করে না, পীর আউলিয়া বিশ্বাস করে না। তারা বলে ডায়াবেটিস রোগীকে যেমন চিনি থেকে দূরে রাখতে হয়, সাধারণ মানুষকে পীর সাহেব থেকে তেমন দূরে রাখতে হবে (নাউযুবিল্লাহ)।

আজকের এই মাহফিলে সব হক্কানী দরবারের মুরীদীন, মুতাআল্লিকীন সকলে উপস্থিত আছেন। আর এদের সবার মুরব্বি হলেন শহীদে বালাকোট সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.)। সকলে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। নবীর উম্মত যারা, তারা দু'ভাগ। এক ভাগ তরীকা বিশ্বাস করে না, পীর আউলিয়া বিশ্বাস করে না। আর এক ভাগ পীর আউলিয়া বিশ্বাস করে। আমরাও বিশ্বাস করি। আমাদের এ উপমহাদেশে ওলী-আল্লাহগণ ইসলাম নিয়ে এসেছেন। এখানে নবী আসেন নি। আল্লাহর ওলীরা এসেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন গরীবে নেওয়াজ, খাজায়ে খাজেগান হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (র.), তিনি আজমীর শরীফে শুয়ে আছেন। আরেকজন পাকিস্তানে শুয়ে আছেন-হযরত খাজা গঞ্জে বখশ (র.)।

আরেকজন ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর দেশ সিলেটে শুয়ে আছেন, তিনি হলেন হযরত শাহজালাল মুজাররদে ইয়ামানী (র.)। এই তিনজন বুযুর্গ যদি সাব কন্টিনেন্ট-এ না আসতেন, তাহলে এই লক্ষ লক্ষ মসজিদ-মাদরাসা, খানকা কিছুই হতো না। যারা পীর আউলিয়ার বিরুদ্ধে বলে তাদের অস্তিত্বই থাকতো না। দেশের নাম ছিল হিন্দুস্থান, যেখানে সবাই ছিল হিন্দু। ঐ হিন্দু থেকে আমাদের দেশে আজ ১৫ কোটি মুসলমান, পাকিস্তানে প্রায় ১৪/১৫ কোটি, ইন্ডিয়াতে প্রায় ২০ কোটির উপরে মুসলমান। এই ৫০ কোটির অধিক মানুষের মুসলমান হওয়ার পেছনে অবদান হলো ওলী-আল্লাহদের (সুবহানাল্লাহ)। এত বড় একটি সত্যকে অস্বীকার করা কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়। আমরা যারা পীর-ওলী বিশ্বাস করি, যারা তরীকা বিশ্বাস করি, এটা আমাদের বড় শক্তি।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত-সুন্নী, আমরা কেবল মুসলিম না, আমরা আমাদের বায়োডাটায় লিখি মুসলিম ও সুন্নী। তো সুন্নী যারা, তাদের একটা বিরাট শক্তি ছিল-“একতার বলে হও বলীয়ান, তবে উড়বে আকাশে বিজয় নিশান।” যারা বিভাজন করতে চান, যারা বিভেদ করতে চান, তারাও আমাদের ভাই। আমি তাদের অনুরোধ করব ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখুন। এতে আপনাদের মঙ্গল হবে, আমাদেরও মঙ্গল হবে। আমরা যদি সবাই একত্রে মিলে-মিশে থাকি তাতে আমাদেরই মঙ্গল হবে। আমাদের কি ক্ষমতা আছে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)-এর ভুল ধরার, তাঁর সমালোচনা করার? কেউ তাঁর সমান হলে বুঝতাম হয়তো তাঁর সমালোচনা করার অধিকার আছে। তাঁর সমান নই আমরা, আমরা যদি তাঁর সমালোচনা করি এতে তাঁর কি হবে? সদরঘাটে বড় বড় লঞ্চ ভিড়ে বরিশাল থেকে ছারছিনা থেকে। এখন ছোট ডিঙ্গি বা কোষা নৌকা যদি এ বিশাল লঞ্চকে গুতো মারে তবে ঐ লঞ্চের কি হবে? কিচ্ছু হবে না। সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)-এর কিছু আসে যায় না। যারা তাঁর সমালোচনা করেন, তাঁর সাথে টক্কর লাগান, তারা দেখবেন মানুষের কাছে, সমাজের কাছে, আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর কাছে তারাই কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মধ্যে আবার কেউ কেউ, বুঝে হোক আর না বুজে হোক, সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) কে নিয়ে বিতর্ক শুরু করেছে। অথচ মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। বিশেষ করে আমরা যারা তরীকা-তাসাউফের চর্চা করি আমরা জানি চিশতিয়া, কাদিরিয়া, নকশবন্দিয়া, মুজাদ্দিদিয়া, মুহাম্মদিয়া এ সমস্ত তরীকাই বরহক। সুতরাং আমরা সকল ভেদাভেদ ভুলে যাই। ইসলামের বিপদের দিনে, তরীকার এই বিপদের সময়ে আমরা একতাবদ্ধ হয়ে থাকি।

আমাদের দেশে যত তরীকা আছে সবগুলার মূল হলেন হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)। মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.), সূফী নূর

মোহাম্মদ নিজামপুরী (র.), শাহ সূফী ফতেহ আলী (র.)-দের সকলের গোড়া হলেন সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)। তাকে অস্বীকার করা, তাকে ছোট করা আমাদের জন্য বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়।"খাতায়ে বুযুর্গা গিফিরতন খাতা আস্ত" এত বড় বড় বুযুর্গদের যদি আমরা ভুল ধরতে যাই তবে আমাদেরই ভুল হবে। আল্লাহ তায়ালা এ ধরনের ভুল থেকে আমাদের সকলকেই বাঁচিয়ে রাখুন। সমস্ত সুন্নী, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত-এর অনুসারী যারা, আসুন আমরা বিভেদ সৃষ্টি না করে একতাবদ্ধ হয়ে থাকি। আমারতো সন্দেহ হয় এই সুন্নীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য বাইরের একটি শক্তি কাজ করছে। রিমোট তাদের হাতে। আমাদের বুদ্ধি কম বলে আমরা এগুলো নিয়ে চিন্তা করি না। আসুন আমরা নিজের ভুল নিজে ধরতে চেষ্টা করি, আল্লাহর ওলীদের ভুল ধরতে না যাই। আমি এ মসজিদের খাদিম, আমার জন্য দু'আ করবেন যেন এ মসজিদের খিদমত করে যেতে পারি (সংক্ষেপিত)

সংগ্রহ : বালাকোট-চেতনা উজ্জীবন পরিষদ, সম্মেলন স্মারক ২০১৬

ঐক্যের সংকটে উত্তরণ ভাবনা

মুফতি মফিদুল ইসলাম আহমাদী

আমাদের বাংলাদেশে ইমামুত তরীকত সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরলভী (র.) ও আলা হযরত আহমাদ রেজা খান বেরলভী (র.) সিলসিলার অনুসারীর মধ্যে কিছু ভুল বুঝাবুঝি আছে। কিন্তু নিরপেক্ষ গবেষণায় পাওয়া যায় এই দুই সিলসিলার নির্ভরযোগ্য আলেম ওলামার মধ্যে বিশেষ কোন দ্বন্দ্ব নেই। এ বিষয়ে নিম্নে দুই সিলসিলার আলেমদের অভিমত পেশ করা হল, যা পারস্পারিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

আলা হযরত মুফতি আহমাদ রেজা খান বেরলভী (র.) ফতোয়ায়ে রেজবীয়ায় ২৯ নম্বর খন্ডে সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলবী (র.) কে বুযুর্গ হিসেবে সমর্থন করেছেন।

মাস'আলা ৯০- প্রশ্নকারী সায়্যিদ মুহাম্মাদ সাজ্জাদ হুসাইন সাহেব, গ্রাম শীশগড়হ, পোস্ট অফিস- বারেইলি, তারিখ-২৯ মুহাররামুল হারাম ১৩৩৭ হিজরি।

১ নং প্রশ্ন- যাইদ "সিদ্দিকীউল ওয়ারেসি" উপাধি থাকা সত্ত্বেও ইসমাইল দেহলভীকে "হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেব শহীদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি" লেখে।

২ নং প্রশ্ন-বকর নিজেকে "চিশতী", "হাইদারী" দাবী করে, এবং নিম্নবর্ণিত আকিদা পোষণ করে অর্থাৎ, যে মুসলমান হযরত পীরানে পীর জনাব শাইখ সায়্যিদ মুহিউদ্দীন আব্দুল কাদির জিলানী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর গিয়ারভি শরীফ নির্ধারিত করে উনার পবিত্র রূহে সওয়াব পাঠায়, এমন ব্যক্তির ব্যাপারে যাইদ বলে যে, ১১তম তারিখকে নির্দিষ্ট করা গর্হিত। রজব মাসের ব্যাপারে যাইদ লেখে যে, এই মাসের নফল ইবাদতসমূহ, নামায, রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের ব্যাপারে বড় বড় সওয়াবের অনেক রিওয়ায়াত আছে, এগুলোর মধ্যে কোনটিই সহীহ নয়। এবং এ কথা একেবারেই ভুল এবং সনদহীন যে, নূহ আলাইহিস সালামকে রজব মাসে কিশতি বানানোর হুকুম দেয়া হয়েছে। শা'বান মাসে হালুয়া রান্না করা অথবা তের তারিখে আরাফাহ করা, ঈদের দিন খানা বন্টন করা নিষিদ্ধ। মুহাররম মাসে খিচুড়ি অথবা শরবত নির্দিষ্টভাবে রান্না করা ও পান করানো ও ঈমামগণের নামে শিরনী দেয়া এবং আল্লাহর ওয়াস্তে মানুষকে

খাওয়ানো অত্যন্ত জঘন্য বিদ'আত। সফর মাসে কোন বিশেষ সওয়াব বা বরকত এর আশা করা মূর্খতা। **সায়্যিদ আহমাদ রায় বারেইলি কে নেক বুযুর্গ, বরং ওলী মনে করে। সুতরাং, এমন লোকদের বিষয়ে উলামায়ে হক এর মতামত কি,** তাদের আসল মাযহাব কি ? এবং উপরোল্লেখিত বিষয়ের হাকিকত বিস্তারিতভাবে লেখা হোক।

জবাব ১- বর্ণিত অবস্থায় যাইদ গোমরাহ, বদদ্বীন, নজদী ইসমাইলি। এবং ফুকাহায়ে কিরামের হুকুম অনুযায়ী তাঁর উপর কুফর এর হুকুম জরুরী। যার বিস্তারিত "আল কাউকাবাতুশ শিহাবিয়্যাহ ফি আবিল ওয়াহ্যাবিয়্যাহ" দ্বারা স্পষ্ট। এবং আল্লাহ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত।

জবাব ২- বকরকে সতর্ক ওয়াহ্যাবী মনে হচ্ছে, গিয়ারভী শরীফকে গর্হিত, শা'বানের হালুয়া, তের তারিখের আরাফাহ, ঈদের খাওয়াকে ঢালাওভাবে শরীয়তের নিষেধাজ্ঞা ব্যতীত নিষিদ্ধ, মুহাররম শরীফের খিচুড়িকে, পবিত্র ঈমামগণের নামে প্রস্তুতকৃত শরবত এর বণ্টনকে ঢালাওভাবে মন্দ বিদ'আত আখ্যা দেয়া ওয়াহ্যাবিয়াতের আলামত এবং, ওয়াহ্যাবী গোমরাহ ও বদদ্বীন। রজবের আমলের হাদীসসমূহকে সহীহ না বলা বড় চালাকি। মুহাদ্দিসগণের "সহীহ" পরিভাষা এখানে নিস্প্রয়োজন, আমলের ফযিলতের ক্ষেত্রে "যয়ীফ হাদীস" গ্রহণযোগ্য হবার ওপর ঐক্যমত সাব্যস্ত। রজবে কিশতি বানানো হয়নি বরং কিশতি চলতে আরম্ভ করলো এবং শত্রুদের ওপর গযব আর বন্ধুদের ওপর "এবং আমি নূহকে আরোহণ করিয়েছি তক্তা ও আলপিন ওয়ালার ওপর, যাতে করে আমার দৃষ্টির সামনে থেকেই তা বয়ে যায়, ইহা এর বিনিময়ে যার সাথে কুফর করা হয়েছিল" অনুগ্রহ এ মাসেই হয়েছিল। এটা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুম এবং অন্যান্যদের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সফর ও আশুরার ব্যাপারে তাঁর বক্তব্যকে ফিরিয়ে না দেয়া হোক, যদিও, দ্বিতীয় বিষয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। যদি "সিরাতে মুস্তাকীম" এর বাতিল কথাগুলোকে বাতিল, কুফরী কথাগুলোকে কুফরী, ইসমাইল দেহলভীকে গোমরাহ, বদদ্বীন মনে করে **তাহলে সে ওয়াহ্যাবিয়্যাত থেকে মুক্ত। তো, সায়্যিদ আহমাদকে বুযুর্গ মনে করলে ওয়াহ্যাবি হবে না।** নতুবা "সত্য, আমি জ্ঞানীদের জন্য আলামত প্রকাশ করে দিয়েছি, যতটুকু আমাদের রব আমাদেরকে হিদায়াত করেছেন, আমাদের পরওয়ারদেগার তাদের এ সমস্ত কথা হতে পবিত্র"। এবং আল্লাহ তা'আলা অধিক জ্ঞাত"।

-ফতোয়ায়ে রেজভিয়া, খন্ডঃ ২৯

অন্যদিকে একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে মালফুযাতে আলা হযরতে উল্লেখিত সৈয়দ আহমদ বলতে স্যার সৈয়দ আহমদ খান আলীগড়ীকে বুঝানো হয়েছে সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) কে নয়।

অতএব, সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরলভী (র.)এর বিরুদ্ধে আলা হযরত মুফতি আহমাদ রেজা খান বেরলভী (র.) এর কোন তাকফিরী বা ওহায়বিয়াতের ফতোয়া নাই। বরং বুযুর্গ হিসেবে সমর্থন করেছেন।

আল্লামা রুহুল আমিন বশীরহাটি (র.)

মুজাদ্দিদে জামান আবু বকর সিদ্দিক ফুরফুরাভী (র.) এর অন্যতম খলিফা হাফিজুল হাদিস আল্লামা রুহুল আমিন বশীরহাটি (র.) ফাতাওয়ায়ে আমিনিয়া কিতাবের পঞ্চমভাগে লিখেছেন- উনাকে প্রশ্ন করা হয়েছে- মাওলানা আহমাদ রেজা খান সাহেব কেমন লোক ছিলেন? তাহার মাদরাসাতে পড়া কি? এর উত্তরে তিনি লিখেছেন, 'তিনি হচ্ছেন অদ্বিতীয় আলিম। তিনি মিলাদ ও কিয়াম জায়েয বলিতেন। আমাদের অনেক মতের সহিত তাহার মতের মিল ছিল। তাহার সাগরেদগণের মধ্যে বড় বড় প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন। তাহারা খাঁটি সুন্নি ছিলেন। দেওবন্দীদিগের কতক আলেমকে তিনি কাফের হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন, আমরা কিন্তু তাঁহার এই ফৎওয়ার প্রতি আমল করি না। আমরা দেওবন্দী-আলেমগণের উক্ত প্রকার ভ্রান্তিকে এজতেহাদী ভ্রমের তুল্য ধারণা করি।

তথ্যসূত্রঃ ফাতাওয়ায়ে আমিনিয়া, ৫ম ভাগ, পৃ. ৭৬

শায়খুল ইসলাম ড. তাহিরুল কাদেরীর বক্তব্যঃ

একটি কনফারেন্সে তিনি আলা হযরত মুফতি আহমাদ রেজা খান রহ. এর সাথে কোন কোন ইলমী সনদে তিনি নেসবতযুক্ত সেগুলো বর্ননার পর নিম্নের ঘটনা বর্ননা করেন।

উলামায়ে কিরাম যারা আছেন আপনাদের জন্য হৃদয়স্পর্শী এবং আশ্চর্যজনক একটি বিষয় উপস্থাপন করতে চাই। আমাকে শায়খ সাইয়্যিদ আবদুল মাবুদ জিলানী (রহ.) বর্ণনা করেছেন, যে সময় তিনি শাহ সুলাইমান তৌসী (রহ.) এর খিদমতে ছিলেন তৌসা শরীফে। তো তিনি বর্ণনা করেন এক সকালে উনার মজলিসে একজন মৌলভী বসা ছিলেন। সে সময় তিনি উনাকে চিনলেন না। হযরত শাহ সুলাইমান তৌসী (রহ.) এর মজলিসে। আমি হযরত শাহ সুলাইমান তৌসী (রহ.) কে জিজ্ঞেস করলাম। সৈয়দ আবদুল মাবুদ জিলানী (রহ.) থেকে আমি বর্ণনা করছি। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এই মৌলভী সাহেবকে চিনেন? এখানে আরো উলামায়ে কিরাম উপস্থিত ছিলেন। নতুন আগন্তুককে তিনি চিনেন নাই। জবাব দিলেন, ইনি শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) এর পৌত্র মৌলভী মোহাম্মদ ইসমাইল। বুঝতে পারছেন? ইনি শাহ ইসমাইল দেহলভী 'তাকভিয়াতুল ঈমান' এবং " সীরাতে মুস্তাকিম" এর রচয়িতা। তিনি শাহ সুলাইমান তৌসী (রহ.) এর সাথে সাক্ষাতের জন্য তাঁর

মজলিসে গিয়েছেন। বুঝতে পেরেছেন? ঐ মজলিসে ছিলেন যে মজলিসে আমিও উপস্থিত ছিলাম। এখন আপনারা কেউ কেউ অবাক হবেন যে, এই ব্যক্তি আউলিয়া কিরামের দরবারে উপস্থিত হলেন। জীবনে কত বড় পরিবর্তন আসে! শুরুতে তার আকীদা এত খারাপ ছিল না। একটু একটু করে রাস্তা থেকে সরে গেছেন। তার পরিবর্তন হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) এর নাতি এবং তাঁর বংশের হওয়ার কারণে এমনকি খোদ সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভী (রহ.) এর মুরীদ ছিলেন যিনি খোদ ভারতীয় সুফিদের অন্যতম ছিলেন। তিনি কিন্তু এই আকীদার মানুষ ছিলেন না। তিনি সূফিয়ায়ে কিরামের অন্যতম। একটি পুরাতন বর্ণনা আছে, এই ব্যক্তির (ইসমাইল দেহলভী) আকীদা নষ্ট হয়েছিল তিনি যখন হজ্জে গিয়েছিলেন। দুইজনেই গিয়েছিলেন; শায়েখ এবং তাঁর মুরীদ। সেখানে তিনি মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব নজদীর কিতাব পড়েছিলেন। তাঁর 'ওয়াহাবী নজদী মতবাদ' সেই সময় বিস্তার লাভ করেছিল। সেখানে বড় বড় নজদী উলামা উনাদের সাথে তার সাক্ষাত হয়, কথা-বার্তা হয় তারা তাদের কিতাব দেন। 'কিতাবুত তাওহীদ' নামে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব যে কিতাব লিখেছিলেন তার ব্যাখ্যা গ্রন্থ লেখা হয়েছিল, 'কিফায়া' এবং অন্যান্য কিতাব পড়েন এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন এবং তার আকীদা নষ্ট হয়ে যায়। যখন থেকেই তার আকীদা পরিবর্তন হয়ে যায় তখন থেকেই নিজ শায়খ সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভীর সাথে তার মতানৈক্য এবং ঝগড়া আরম্ভ হয় তার নিজের পীর ও মুরশিদের সাথে। যখন এই ঝগড়া শুরু হয় এবং নিজ পীর ও মুরশিদের সাথে বিতর্ক-মুনজারায় লিপ্ত হন এবং একদিন নিজ শায়েখকে এক পর্যায়ে বলে ফেললেন আপনি দিনকে রাত আর রাতকে দিন বললে তবুও কি মানতে হবে ? তবুও মানতে হবে ? এ কথা থেকেই তার শায়েখ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। অতঃপর সেখান থেকে কিতাবুত তাওহীদের ব্যাখ্যাসমূহ নিয়ে আসলেন এবং দেশে ফিরে তারি উপর ভিত্তি করে এর সারমর্ম হিসেবে "তাকভিয়াতুল ঈমান" লেখেন। আরো অনেক আলোচনা আছে। তিনি (সৈয়দ আহমদ বেরেলভী) তাঁকে অনেক নিষেধ করেছেন এ কাজ না করার জন্য যাতে ফিতনা সৃষ্টি হবে। কিন্তু তাওহীদের প্রচার এবং শিরক-বিদাত উৎখাতের নামে এক ভুত তার মাথায় চেপে যায়, যা থেকে এ ফিতনার সৃষ্টি হয়। প্রথম জীবনে যদিও ইনি সূফীগণের মজলিসে আসা যাওয়া করতেন যেভাবে বর্ণনা করেছি; শায়খ সুলাইমান তৌসী (রহ.) এর দরবারেও যেতেন। (ভিডিওটি ইন্টারনেটে ও আমাদের কাছে মওজুদ আছে)

আল্লামা নুরুল ইসলাম হাশেমী সাহেব (রহ.) ঃ

উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, এদেশের অন্যতম শীর্ষ আলেমে দ্বীন, উস্তাজুল উলামা শায়খুল হাদিস হযরত আল্লামা নুরুল ইসলাম হাশেমী রহ. এর সাথে ফুরফুরা শরীফের তরিকতের যোগসূত্রতা ছিল। তিনি ফুরফুরা শরীফের

মুজাদ্দিদে যামান আবু বকর সিদ্দিকী (রহ.) এর বড় সাহেবজাদা হযরত আবু নছর আব্দুল হাই সিদ্দিকী (রহ.) কর্তৃক খেলাফত প্রাপ্ত ছিলেন। এছাড়া আল্লামা নুরুল ইসলাম হাশেমী রহ. এর লিখিত জাদুল মোছলেমীন কিতাবে দেওয়া আছে হাশেমী সাহেবের পিতা হযরত আহছানুজ্জামান রহ. ফুরফুরা শরীফের মুজাদ্দিদে যামান রহ. এর কাছে কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দীয়া, মুজাদ্দেদিয়া, মুহাম্মাদীয়া তরিকা সমূহের বায়াত ও খলিফা ছিলেন। তিনি ঐ শাজারায় তাঁর পিতা কর্তৃক খেলাফত প্রাপ্ত।

ইমামুত তরীকত মুজাদ্দিদে যামান সায়্যিদ আহমাদ শহীদ রায় বেরেলী রহ. এর স্মরণে ২০১১ সালে বালাকোট সম্মেলনে আল্লামা কাজী নুরুল ইসলাম হাশেমী (রহ.) যোগদান করে সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন এবং গুরত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। বালাকোট সম্মেলন- ২০১১ তে তাঁর বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত রূপ-

ফুরফুরা, ছারছীনা, জৌনপুর, বিশেষত ফুলতলীর পীরসাহেব কেবলা (রহঃ)-এর উত্তরসুরীদের পক্ষ থেকে আজকের মাহফিলের আয়োজন। আমরা যদি তাকাই পিছনের দিকে, দেখতে পাই যে, এই দেশে দ্বীনের ঈমান ইসলামের চেতনা যাঁদের মাধ্যমে এরা ফুরফুরার, জৌনপুরের, ছারছীনার ছিলছিলার হযরত ওলেমায়ে কেরাম (রহঃ)। পৃথিবীর বুকে অন্য কোথাও ইসলামী লেবাসে, ইসলামী পোশাকে, ইসলামী চালচলনে, ইসলামিক সভ্যতায়, ইসলামিক ভদ্রতা ইত্যাদি বাহ্যিক দিক দিয়ে এবং ভিতরের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভাবে ইসলামকে যারা মেনে চলে, যদি জানিতে পারি একমাত্র ইন্ডিয়া এবং আমরা আছি। তার পিছনে যাঁদের বদৌলতে যেমন ফুরফুরা, জৌনপুর, ফুলতলী, ছারছিনা এদেরই অবদান এদেরই মাধ্যমে ইসলামের এই বাগান বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়াতে আছে। শুধু বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া নয়, আমেরিকাতে, লন্ডনে যারা অমুসলিম, অমুসলিম দেশের মধ্যেও ইসলামের চলন যাঁদের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে, তাঁদের নাম বলতে হবে, স্বীকার করতে হবে এরা জৌনপুর সিলাসিলার, ফুরফুরা সিলসিলার বিশেষত ফুলতলির হযরত কেবলা (রহঃ) ..

ড. সাইয়েদ এরশাদ বুখারীঃ

আমি বাংলাদেশে ইমাম আহমাদ রেযা খান র. এর দরবারে লেখাপড়া করেছি। আমাদের পূর্বপুরুষ হলেন হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া র. এর বড় ভাই সাইয়েদ জামালুদ্দীন বোখারী উনারই বংশধর। হযরত নিযামুদ্দীন র. এর ভাই জামালুদ্দীন র. এর ২২ তম আওলাদ আমরা। ১৯৪৭ এ আমার দাদা বাংলাদেশে আসেন। আমাদেরও এখনো পুরো খানদান দাদার দিক থেকে নানার দিকে প্রায় সবাই ভারতেই আছেন। মাওলানা ইমাম আহমাদ রেযা খান র. প্রায় ১৫০০ কিতাব

লিখেছেন। আমি কিন্তু আমার নামের সাথে কখনও পীর বা খলিফা ইত্যাদি লিখতে দেই না। আমি ২২ জায়গা থেকে খেলাফত প্রাপ্ত। আমি লিখতে দেই না কারণ সাধারণত পীর শব্দ থাকলেই জেনারেল শিক্ষিত লোকেরা আপনার বক্তব্য শুনতে চায় না। তো আলা হযরত র. প্রায় ১৫০০ কিতাব লিখে তৎকালীন আল আতায়্যা নাবাভীয়্যা ফিল ফাতাওয়া রাযাভিয়্যা প্রায় ৩১ খন্ড প্রতিটি খন্ড প্রায় ১০০০ থেকে ১২০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত লিখে এই উম্মতের উপর অনেক বড় এহসান করেছেন। রেযাখানি শব্দটা এটা ওহাবিরা শুরু করলো। যখন তাদের কিছু বদ আকীদা উনি তুলে ধরলেন আল হুসামুল হারামাইন আলা মানহারিল কুফি ওয়াল মাইন এই কিতাবের মধ্যে। তখন তারা এই শব্দটা রেযাখানি বলতে শুরু করলো। আমি যেখানে বা আমার যেটা স্ট্যান্ড যারা সাইয়েদ আহমাদ বেরলভী গ্রুপের আছেন উনাদের এখানে আমি যাই, আলা হযরতের দরবারে যারা সম্পৃক্ত তাদের এখানেও আমি যাই। আমার যে চিন্তাধারা সেটা হলো আমরা কোনো সিলসিলার কোনো বুযুর্গকে গালি গালাজ না করে এই বাংলার মাটিতে যারা ইয়া নবী সালাম আলাইকা পড়নেওয়ালা, যারা নবী করীম স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ সাল্লামার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করবে, যারা রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ সাল্লামার শান ও মানকে তুলে ধরবে বা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বেসিক আকীদার মধ্যে যারা পড়ে আমরা তাদেরকে আপন করে নিবো। আমাদের যারা শত্রু তথা মাযহাবের শত্রু, সুন্নীয়তের শত্রু এদেরকে আমরা চিহ্নিত করবো এবং এদের সাথে আমাদের কোনো আপোষ নেই। আর আমাদের আকীদার সাথে যাদের মিল আছে, আমাদের মাজহাব ও মিল্লাতের সাথে যাদের মিল আছে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলি যেমন আমাদের জনাব কফিলুদ্দীন সরকার সালেহী সাহেব যে কথা বললেন চট্টগ্রামের একজন ব্যক্তির দিকে ইশারা করে ; দেখেন যে আমরাও দেখলাম এবং এরপর আমি আলা হযরতের দরবারে ফোন করলাম এবং ওখানকার যিনি গ্র্যান্ড মুফতি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে সাইয়েদ আহমাদ বেরলভী উনার উপর আহমাদ রেযা খান সাহেবের কোনো কুফরীর ফাতওয়া আছে? গ্র্যান্ড মুফতি চমকে উঠলেন আর বললেন-

"কন ক্যাহতা হ্যায়, কন ক্যাহতা হ্যায় ইয়ে? ইয়ে বিলকুল সারাসার গালাত হ্যায়। উনকা এসা কয়ি ফাতওয়া হি নেহি হ্যায়। কোয়ি আগার দিখা দে তো ম্যায় সারি জিন্দেগি গুলামি কারুঙ্গা" অর্থঃ কে বলে, কে বলে এটা? এটা নিশ্চিতভাবে পুরোপুরি ভুল। উনার এমন কোনো ফতওয়াই নেই। যদি কেউ দেখিয়ে দিতে পারে তবে আমি সারা জীবন গোলামি করবো। তো যারা সুন্নীয়তকে ভাগ করতে চায় তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে। আর আমরা অনেক কষ্ট করে আমাদের অগ্রজরা সুন্নীয়তকে এতদূর নিয়ে এসেছেন। আপনি যখন একজনের পীরকে গালি দেবেন সে আপনার দাদা পীরকে গালি দিবে, আপনার পীরকে গালি দেবে।

দরকার কি আছে এতে? আপনি রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ সাল্লামার প্রশংসা করুন, মুজেযাত নিয়ে আলোচনা করুন। আমরা একে অপরকে কটাক্ষ করা বাদ দেই। না হলে বর্তমানে চট্টগ্রামে যেটা দেখছি আহলে সুন্নাতের মধ্যে কতগুলো গ্রুপ, প্রত্যেক গ্রুপের আলাদা আলাদা চেয়ারম্যান। আমরা ইনশা'আল্লাহ তায়ালা হাবীব স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ সাল্লামার শানকে সামনে রেখে আমরা সবাই যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি প্ল্যান করি; আমরা দেখেছি পাকিস্তানের নূরানী সাহেব উনি ঐক্য করেছিলেন। আমাদের মধ্যে ঐক্য হবে না কেনো? আমরা যদি আমাদের বেসিক আকীদার জায়গায় ঠিক থাকি আমরা ঐক্য করতে পারি। আমরা কাউকে কটাক্ষ করবো না, কারও পীরকে কটাক্ষ করবো না, কারও সিলসিলাকে কটাক্ষ করবো না। যেই জায়গায় আমরা মুত্তাফিক সেই জায়গাগুলো নিয়ে আমরা বেশি আলোচনা করবো। আমার কথা শেষ। উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করার লোক কম কিন্তু বিভক্ত করার লোক জায়গায় জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ঐক্যের জন্য কাজ করার তৌফিকা আমাদেরকে দান করেন। আমিন।

তথ্যসূত্র: রোজটিভি অনলাইন (ভিডিওটি ইন্টারনেটে ও আমাদের কাছে মওজুদ আছে)

শহীদ মাওলানা নুরুল ইসলাম ফারুকী রহ.:

ইংরেজরা কিছু আলেমকে কিনে নিয়েছিল। তারপর সায়্যিদ আহমদ বেরেলভী (রহ.)'র নাম দিয়ে কিতাব লিখেছে যে, উনি বলেছেন আমরা লিখেছি। তাদের একজন ইসমাঈল দেহলবী হতে পারে। তাকে হয়তো কিনে নিয়েছে। এরকম একটা মতামত রয়েছে। এসব মতামত ঐতিহাসিক মতামত। এগুলা হাদিসও নয় কুরআনও নয়। হাদীসে সায়্যিদ আহমদ বেরেলভীর কথা উল্লেখ নেই। অলী আল্লাহর কথা উল্লেখ আছে। যেহেতু এটা ইতিহাস, ইতিহাস যে কতটা নির্মম হতে পারে তাতো আপনারা জানেনই। ইংরেজরা ইতিহাস লিখে দিয়েছে আছিয়া মুসা নামের এক লোকের প্রেমে পড়েছিল বলে ফেরাউন তাকে হত্যা করল। তাহলে এখানে বুঝা গেল আছিয়া প্রেমিকা, মুসা প্রেমিক। প্রেম শব্দ দিয়ে আছিয়ার ইতিহাসকে কলংকিত করে দিল, যেমন মুনাফিকরা কলংকিত করেছিল হযরত আয়েশা (রা.) কে। তাহলে ইতিহাস এরকমই। যেমন ইংরেজরা চেষ্টা করল সায়্যিদ আহমদ বেরেলভীকে ওয়াহাবী অপবাদ দিতে। এখন সায়্যিদ আহমদ বেরেলভী (রহ.)'র যারা অনুসারী, খলিফা রয়েছেন তাদের এক্টিভিটিস আমাদেরকে দেখতে হবে। ভারতবর্ষের পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত তাঁর অনুসারী রয়েছে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অনুসারী রয়েছে। তাঁর বড় বড় খলিফা রয়েছে।

নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী, ফুরফুরার হযরত আবু বকর সিদ্দিকী রহ., শর্ষিনার নেছারউদ্দীন রহ. এই মসলকের এবং মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী রহ।

তথ্যসূত্র: মাইটিভি (ভিডিওটি ইন্টারনেটে ও আমাদের কাছে মওজুদ আছে)

কাযী মুহাম্মদ আবুল বয়ান এম.আর. রহমান হাশেমীঃ

বিষয়টি হচ্ছে হযরত সৈয়দ আহমদ বেরলবী (র.) সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে। ১৮৩১ সালে বালাকোটের ময়দানে শিখদের বিরুদ্ধে এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে ইংরেজ তাড়াতে গিয়ে বালাকোটের ময়দানে একজন মুসলিম বীর সিপাহসালার যিনি দেহলবী খানদানের সর্বশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত হযরত আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) হতে সরাসরি বায়াত, এযাযত এবং তরীকতের সবক পেয়েছিলেন তার বিপরীতে ইসমাঈল দেহলবী নামক এই উপমহাদেশে ওহাবীয়ত, নজদিয়ত প্রচারকারী বড় আলেমও ছিল। আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) এর পুত্র বা নাতী তাকে খেলাফত দেয়নি। খেলাফত দিয়েছেন বাইরের একজন লোককে যার নাম ছিল সৈয়দ আহমদ বেরলবী (র.) এবং এই কারণে খেলাফত দেয়নি- তার আকিদা, আমল, আখলাক খারাপ ছিল। এর পূর্বে ১৮৩০ সালে শিখ এবং ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধের মধ্যে অনেকেই গিয়েছিল। আমাদের এই দেশ থেকে শাহ সুফি নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী (র.) এবং চুনতীর জমিনে শায়িত আছেন দুইজন মনীষী। একজন মাওলানা আব্দুল হাকিম (র.) যিনি চুনতী শাহ সাহেব হুজুরের বাবাজান। আবদুল হাকিম সাহেব বালাকোটের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মিরসরাইয়ের মাওলানা নূর মুহাম্মাদ নিযামপুরী (র.)ও বালাকোটের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমার কথা হচ্ছে, শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) এর ফয়েজপ্রাপ্ত সৈয়দ আহমদ বেরলবী (র.) এর মাধ্যমে আমাদের এই দেশে তরীকত জগৎ প্রচারিত-প্রসারিত হয়েছিল। ঐ ধারাবাহিকতায় ফুরফুরার হুজুর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী ফুরফুরাবী (র.) আমাদের এই বঙ্গদেশে বা পূর্ব বাংলায় ইসলাম প্রচারের জন্য এসেছিলেন। শাহ সুফি ফতেহ আলী ওয়েসী (র.) যাকে বলা হয় রসূলনোমা উনিও সৈয়দ আহমদ বেরলবী (র.) এর ফয়েজপ্রাপ্ত। আমি এই কথা বলতে চাচ্ছি যে, আপনাদের খেদমতে আরয করছি কেউ কাউকে ইতিহাস জানা ছাড়া বই পুস্তক পড়া ছাড়া ওহাবী বলা বা আকিদা নষ্ট হয়ে গিয়েছে এইভাবে বলা ঠিক না। আমি এটি কারও ব্যক্তিগত সমালোচনা করছিনা। কথাগুলো বললাম এইজন্যে গত জুমআবারে আপনাদের এই মসজিদের মধ্যে আমাকে নিয়ে বেশ আলোচনা করা হয়েছে যে আমি বালাকোটি। বালাকোটি কি জিনিস আমি আপনাদের সামনে ব্যক্ত করলাম। আপনারা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। (ভিডিওটি ইন্টারনেটে ও আমাদের কাছে মওজুদ আছে)

কাযী মুহাম্মদ আবুল বয়ান এম.আর. রহমান হাশেম সাহেব তাঁর আরেকটি প্রবন্ধের শেষে একটি নিম্নে বর্নিত গুরত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ননা করেন- পরিশেষে আমি আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান বেরলভী (রহঃ) এর নগন্য অনুসারী হওয়ার সুবাদে সুন্নি ভাইদের উদ্দেশ্যে একটি মাসআলার ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। ইমাম আহমদ রেজা খানের সংকলন 'মালফুজাত' এর প্রথম খন্ডের একশত দশ পৃষ্ঠাতে এক প্রশ্নোত্তরে তেরোশ হিজরীর মুজাদ্দিদ ও মোহাম্মদী আন্দোলনের সার্থক পরিচালক হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রঃ) কে কাফের হিসেবে মন্তব্য করা হয়েছে এবং আরো বলা হয়েছে যে হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রঃ) কে যাঁরা কাফের হিসাবে মেনে নিতে সন্দেহ করেন তাঁরাও কাফের। এই মালফুজাতটি কতটুকু সঠিক তা অনুধাবনের জন্য কুতুবুল এরশাদ হযরত সৈয়দ হাফেজ মুনির উদ্দিন (রহঃ) ৫-১২-১৯৩২ ইং সনে চট্টগ্রামের দারুল উলুম আলীয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আবদুল আউয়াল ছাহেব (রাহঃ) কে দিয়ে নিজস্ব তত্ত্বাবধানে বিশেষ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালার উপর আলোকপাত করে একটি উর্দূ পুস্তিকা লিখিয়েছিলেন, পাঠকদেরকে সেই উর্দু পুস্তিকাটি পাঠ করার অনুরোধ জানাই। উক্ত পুস্তিকাটির নাম ছিল আ'জামুল ফতোয়া' ঐ পুস্তিকাটির একটি জায়গায় বড়পীর হযরত শাহ আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) পর্যন্ত বেলায়েত সমাপ্ত কিনা এক প্রশ্নোত্তরের জওয়াবে হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রঃ) কে অলি হিসাবে বর্ণনা করা হয়। তাঁর বেলায়েতে কোন সন্দেহ নেই বলে ফতোয়া প্রদান করা হয়। ঐ পুস্তিকাটিতে ঐ মতামতের স্বপক্ষে সে সময়ের চট্টগ্রামের আহলে ছুন্নাত ওয়াল জামাতের যে সমস্ত বুজুর্গ ওলামা, পীরে ত্বরীকত ও মোহাদ্দেছিনে কেরাম দস্তখত করেছিলেন তাঁরা হলেন যথাক্রমে ঃ

১) পীরে ত্বরীকত সুলতানুল কামেলীন হযরত মাওলানা আবদুল হামিদ বাগদাদী (রহঃ)
২) চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়ার মুহাদ্দিছ পীরে কামেল হযরত মাওলানা ছফিরুর রহমান হাশেমী (রহঃ)
৩) কলিকাতা আলীয়া ও চট্টগ্রাম মোহসেনীয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আবদুল হামিদ ফখরে বাংলা (রহঃ)
৪) আল্লামা গাজী শেরে বাংলা হযরত আজিজুল হক আলকাদেরী (রহঃ)
৫) পীরে তরিকত গারাঙ্গীয়ার হযরত শাহ মওলানা আবদুল মজিদ (রহঃ)
৬) চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দীস হযরত মাওলানা মীর মাছউদ আলী (রহঃ)
৭) হযরত মাওলানা সূফী আহসান উল্লাহ সাহেব (রহঃ)
৮) পীরে তরীকত হযরত মাওলানা সৈয়দ আবদুল করিম মাদানী (রহঃ)
৯) হযরত মাওলানা তকি সাহেব (রহঃ)

১০) হযরত মাওলানা এরশাদ আলী সাহেব (রহঃ)
১১) হযরত মাওলানা বদিউর রহমান সাহেব (রহঃ)
১২) হযরত হাফেজ সৈয়দ মুনির উদ্দিন সাহেব রহঃ)
১৩) হযরত মাওলানা ফয়েজুল করিম (রহঃ)
১৪) চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়া মাদ্রাসার মোহাদ্দীস মাওলানা আফাজ উল্লাহ (রহঃ)
১৫) চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দীস চুনতি নিবাসী হযরত শাহ মাওলানা নজীর আহমদ (রহঃ) এবং হযরত মাওলানা আবদুল আওয়াল সাহেব (রহঃ) যিনি এই ফতোয়া ও পুস্তিকা 'আজামুল ফতোয়ার লেখক'। আরব, আজম, হিন্দুস্তান ও বাংলায় জাহেরী বাতেনী কামালতে পূর্ণ বড় বড় আলেমগণ যাঁদের দ্বারা শিরক, বিদয়াত দূরীভূত হয়েছে। তাঁরা উক্ত সাইয়িদ সাহেবের মুরিদ ছিলেন। তাঁরা সকলেই মজহাব অবলম্বনকারী ছিলেন। হযরত সৈয়দ সাহেব (রঃ) হযরত মাওলানা আবদুল আজিজ মোহাদ্দেদ দেহলভী (রহঃ)'র খাছ মুরিদ ছিলেন। যে ব্যক্তি এই রূপ তরিকত ও শরীয়াতের হাদী, হুজুর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের বংশধর ও কামেল মোর্শেদের উপর অযথা অপবাদ প্রয়োগ করে সে ব্যক্তি গুনাগার, বদকার, মিথ্যাবাদী ও অপবাদকারী ব্যতীত আর কিছুই নয়। যে ব্যক্তি এই ধ্রুব সত্যকে অস্বীকার করে সে ব্যক্তি ভ্রান্ত, সত্য পথ ভ্রষ্ট। (মুসলিম চেতনায় বালাকোট ও সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহঃ)- কাযী মুহাম্মদ আবুল বয়ান এম.আর. রহমান হাশেমী, বালাকোট সম্মেলন স্মারক-২০১০)

মুফতি আলাউদ্দিন জিহাদী সাহেবের পক্ষ থেকে ঐক্যের আহবানঃ

সারাদেশ থেকে এবং প্রবাস থেকেও অনেক সুধীজন চলমান সুন্নিয়তের দুই মাসলাকের মধ্যে যে কাদা ছোড়া-ছুড়ি হচ্ছে সেই বিষয়টি নিয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিমত পেশ করার জন্য অনেক মোহাব্বতের তাকিদ দিয়েছেন। এই বিষয়ে কথা বলতে গেলে প্রথমেই আমাকে বলতে হবে সায়্যিদুল মুরসালিন রহমাতুল্লিল আলামীন হুজুরে পুরনূর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার দয়াল নবীজিই হলেন ঈমানের মূল আর নবীর বংশ হলো ঈমানের অংশ। সুতরাং আলা হযরত আযিমুল বরকত ইমামে আহলে সুন্নাত আহমদ রেজা খান ফাজেলে বেরেলবী (র.) কে আমি ভালোবাসি কারণ তিনি তাঁর সারা জীবন বাতেলের বিরুদ্ধে আল্লাহর হাবীবের সুন্নিয়তের পক্ষে সংগ্রাম করেছেন। ঠিক একই নিরিখে শহীদে বালাকোট আওলাদে রসূল সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলবী (র.) কে আমি

ভালোবাসি। যেহেতু তিনি নবীর বংশের লোক ছিলেন; একজন সাইয়্যেদ ছিলেন সেহেতু বিনা দলিলেই আমি তাঁকে ভালোবাসি কারণ তিনি আমার নবীর বংশধর। তরীকতের শাজারায় ভারতবর্ষের আলেমে দ্বীন হিজরি তেরশত শতাব্দীর অন্যতম মুজাদ্দিদ শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিস দেহলবী (র.) এর সুযোগ্য খলিফা ছিলেন আওলাদে রসূল সায়্যিদ আহমদ বেরেলবী (র.)। ঠিক এরূপই আমার পীর কেবলাজান শাহ সুফি আল্লামা ফরিদপুরী (র.) বলেছেন এবং বিশ্ব খ্যাত আলেমে দ্বীন ইমামে আহলে সুন্নাত আহমদ রেজাখান ফাযেলে বেরলবী (র.) **ফতোয়ায়ে রেজবীয়ায় ২৯ নম্বর খন্ডে সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলবী (র.) কে বুযুর্গ হিসেবে সমর্থন করেছেন।**

আমাদের জেনে রাখা উচিৎ সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলবী (র.) এর সিলসিলার মধ্যে অসংখ্য দরবার রয়েছে যে দরবারগুলোর মাধ্যমে সুন্নিয়তের খেদমত হচ্ছে। সুন্নিয়তের আনযাম দেওয়া হচ্ছে। উলেল্লখযোগ্য বিশ্ব জাকের মঞ্জিল আটরশি দরবার শরীফ, এনায়েতপুর দরবার শরীফ, ছারছিনা শরীফ, ফুরফুরা শরীফ, ফুলতলী দরবার শরীফ, জৈনপুর এবং বদরপুর সহ অসংখ্য দরবার রয়েছে যে দরবারগুলোর মাধ্যমে সুন্নিয়তের খেদমতের আনযাম দেওয়া হচ্ছে। অতএব আওলাদে রসূল সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলবী (র.) তিনি একজন আল্লাহর অলী ছিলেন, একজন বুযুর্গ ছিলেন, তিনি একজন তরীকতের মহান সাধক ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। আমি ব্যক্তিগতভাবে রিসার্চ করে যতটুকু জেনেছি- এই ভারতবর্ষে ওহাবী আকিদ প্রচার করেছেন লা-মাযহাবীরা সেই লা-মাযহাবীদের যোগসূত্র ছিল ইংরেজদের সাথে। ইংরেজরা এবং লা-মাযহাবীর সুকৌশলে সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলবী (র.) কে এই ওহাবী আন্দোলনের সাথে জড়িত করার ভূয়া ইতিহাস তৈরি করেছেন। এর পিছনে কারণ হলো সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলবী (র.) জোড়ালোভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। সর্বোপরি আমরা একসাথে বসে আলোচনা করলে এই বিষয়টির সামাধান হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সর্বসাধারণের প্রতি এই অধমের আহ্বান থাকবে- বর্তমান যামানা অত্যন্ত মসিবত এবং ফেতনা-ফাসাদের যামানা। আপনারা শায়খ নূরুল ইসলাম ফারুকী (র) এর কথা স্মরন করুন। তিনি আমাদেরকে জোড়ালোভাবে শিখিয়ে গেছেন- 'পীর যার যার, সুন্নিয়ত সবার'। অতএব আপনারা যে যেই তরীকারই হোন আপনারা সবাই মিলে মিশে থাকুন। ঐক্যবদ্ধ থাকুন। সুন্নিয়তের স্বার্থে একসাথে কাজ করুন। মনে রাখবেন সুন্নিয়ত কোন পীর সাহেব কেন্দ্রীক নয়। সুন্নিয়ত হলো মদীনাওয়ালা কেন্দ্রিক। আমাদেরকে সুন্নিয়তের খেদমতের জন্য সামনে এগিয়ে যেতে হবে। আল্লামা আশরাফুজ্জামান আল-কাদেরী সাহেবের প্রতি আমার করজোরে আরযি থাকবে আওলাদে রসূল সাইয়্যেদ আহমদ সিরকোটি (র.) এর অক্লান্ত পরিশ্রমে তার প্রতিষ্ঠিত সেই

বিখ্যাত দ্বীনি প্রতিষ্ঠান জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া কামিল মাদরাসার একজন প্রবীণ খাদেম আপনি। আপনার অনেক বড় দায়িত্ব। হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ মুফতি, মুহাদ্দিস আপনার ছাত্র। আপনার প্রতি আমাদের অনেক দাবী রয়েছে। আপনাকে আমরা সুন্নি ঐক্যের অগ্রদূত হিসেবে কামনা করি। কোন জটিল বিষয়ে ছোট্ট একটি চ্যালেঞ্জ দেওয়ার আগেও হাজার বার চিন্তা করে তারপরে সেই চ্যালেঞ্জ বা সেই ব্যাপারে কথা বলা উচিৎ বলে আমরা মনে করি। আপনার একটা ছোট্ট চ্যালেঞ্জ এর কারণে সাড়া ওয়ার্ল্ডে বাংলা ভাষা-ভাষী সকল সুন্নিদের মধ্যে অনৈক্য তৈরি হয়ে গেছে। সুন্নিদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে। আমি জানি না বর্তমান এই প্রেক্ষাপটে কোটি কোটি সুন্নি ভাই ও বোনদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণে আল্লাহর হাবীব রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার উপরে খুশি আছেন কিনা। তাই উদার্তভাবে আপনার প্রতি আমার আকুল আরজি সুন্নিয়তের বৃহৎ স্বার্থে আপনি এমন একটি ভূমিকা রাখুন যেই ভূমিকার মাধ্যমে পুনরায় সকল সুন্নিরা আবার একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে। আপনার কাছে আমরা সেটাই কামনা করি এবং উদারতা, সেক্রিফাইজ এই দুইটি জিনিস থাকলে নিশ্চই আবার আপনার মাধ্যমেই সুন্নিয়তের ঐক্য আসা সম্ভব। পাশাপাশি শ্রদ্ধেয় আল্লামা আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা সাহেবের কাছে আমার আরজি- সাড়া ওয়ার্ল্ডের মধ্যে আপনি একজন নির্ভরযোগ্য আলেম। বহু বাতেল লা-মাযহাবীদের দমনে আপনার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সুন্নি জামায়াতের বৃহৎ স্বার্থে আপনার মতো একজন আলেম আমাদের দরকার। আমি জানি, আপনি আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের জীবনের চাইতেও বেশি ভালোবাসেন। আমি এ-ও জানি রসূলে পাকের আহলে বাইতকে আপনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। আমি এ-ও জানি আলা হযরতকে আপনি ভালোবাসেন। আপনিও জেনে রাখেন, মসলকে আলা হযরতের অসংখ্য উলামায়ে কেরাম আছে তারা সবাই আপনাকে ভালোবাসে, মোহাব্বত করে। তাই আমরা সুন্নিয়তের সেই বন্ধন অটুটভাবে পুনরায় দেখতে চাই। সুন্নিদের মধ্যে কাদা ছোড়া-ছুড়ি আমরা দেখতে চাইনা। আপনার কাছে আমার আরজি আপনি এমন একটা ভূমিকা নেন বা এমন কিছু পদক্ষেপ নেন যেন সকল সুন্নিরা আবার ঐক্যবদ্ধ হয়। সৎ ইচ্ছা এবং সেক্রিফাইজ দ্বারা আল্লাহর হাবীবের মোহাব্বতে পদক্ষেপ নিলেই এই বিষয়টি সম্ভব। বক্তব্য শেষ করার আগে বিশেষ একটি প্রস্তাব আমি পেশ করি উলামায়ে আহলে সুন্নাত আপনারা এই বিষয়টি বিবেচনা করবেন ইনশা-আল্লাহ। সারাদেশের সকল সুন্নি পীর-মাশায়েখ, উলামা-ফুকাহাগণের প্রতি আমার আকুল আবেদন- সুন্নিয়তের ময়দানে চলমান সমস্যার সমাধানে আমাদের উদার মনে এগিয়ে আসার প্রয়োজন বিশেষ করে আল্লামা মুফতি আবু নাসের জিহাদী সাহেব, আল্লামা আবুল কাশেম মুহাম্মদ ফজলুল হক সাহেব, আল্লামা ড. এনায়েত উল্লাহ

আব্বাসী সাহেব, আল্লামা ড. কাফিলুদ্দীন সরকার সালেহী সাহেব, আল্লামা মুফতি অসিউর রহমান সাহেব, আল্লামা আব্দুল করিম সিরাজনগরী সাহেব, আল্লামা আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা সাহেব, আল্লামা আশরাফুজ্জামান আল-কাদেরী সাহেব এবং মুফতি শাহ আলম সাহেব সহ আরো যাদেরকে প্রয়োজন মনে করেন সবাই সুন্নিয়তের বৃহৎ স্বার্থে মদীনাওয়ালার মোহাব্বতে, নবীর আহলে বাইতের মোহাব্বতে আপনার এক জায়গায় বসুন। আমি বিশ্বাস করি আপনারা যদি এক জায়গায় বসেন তাহলে আমাদের দূরত্ব কমে যাবে। আমাদের মধ্যে মোহাব্বত পয়দা হবে। যেকোন জটিল বিষয়ে আমরা একসাথে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ নিয়ে যদি আলোচনা করি এটি সামান্য সময়ের মধ্যেই সমাধান হওয়া সম্ভব। আপনারে সবার প্রতি আরযি- আপনারা একে অপরের সাথে সম্পর্ক রাখেন, যোগাযোগ রাখেন। আমাদের মধ্যে যদি কো-অপারেশন মজবুত হয় তাহলে সকল সুন্নিদের মধ্যে শক্তি বাড়বে, ঐক্যবদ্ধতা বাড়বে এটি আমি বিশ্বাস করি। সকল সুন্নিদেরকে শায়খ নূরুল ইসলাম ফারুকী (র.) সেই বাণী আমি আবার মনে করিয়ে দিতে চাই- 'পীর যার যার, সুন্নিয়ত সবার' সেই বাণীকে সামনে রেখে আসুন আবার আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। এক কাতারে দাঁড়িয়ে যাই। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এক হওয়ার তৌফিক দেন। আমিন। (ভিডিওটি ইন্টারনেটে ও আমাদের কাছে মওজুদ আছে)

মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম আশরাফীঃ

সাইয়্যেদ আহমদ বেরলভী(রহ.) এর অবদানকে আমরা খাটো করে দেখছি না। দেখুন, এই বাংলাদেশে যারা সাইয়্যেদ আহমদ বেরলভী (রহ.) এর সিলসিলার বিরোধিতা করতে চান- আমি তাদেরকে বলছি দেখুন, এই বাংলাদেশে ছারছীনা, ফুলতলী, জৈনপুর, সোনাকান্দা, ছতুরা এই দরবারগুলোর যে অবদান, খেদমত এগুলোকে আপনি কিভাবে বিচার করবেন? (ভিডিওটি ইন্টারনেটে ও আমাদের কাছে মওজুদ আছে)

সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া আযহারীঃ

What do you think about Sayyid Ahmad Berelvi? সাইয়্যেদ আহমদ বেরলভী একটি তরীকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। আমি বিশ্বাস করি শায়খ সাইয়্যেদ আহমদ বেরলভী সাহেব উনার তরীকার মাধ্যমে তরীকত - তাসাউফের অনেক খেদমত হয়েছে। উনার তরীকাতে অসংখ্য- অগণিত অলী-আউলিয়া, পীর-মাশায়েখ, হাক্বানী বুযুর্গানে দ্বীনদের আগমন হয়েছে। বর্তমানে উনার অনুসারী যারা, তাঁরা আক্বীদা বিরোধী কোন কথা বলেন না। তারা আজে-বাজে কোন কথা বলেন না। তাঁরা আমাদের মতোই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর

আশেক, আহলে বায়েতকে মানেন। কাজেই আমরা এই বিষয়গুলী নিয়ে বাড়াবাড়ি না করি এটাই হচ্ছে আমার মত। (ভিডিওটি ইন্টারনেটে ও আমাদের কাছে মওজুদ আছে)

উপসংহারঃ

সায়্যিদ আহমাদ শহীদ (র.) এর সুমহান মর্যাদা কোন ফতোয়া বা কোন ব্যক্তির অভিমতের উপর মুখাপেক্ষী নয়। তিনি আল্লাহতায়ালার কাছে একজন মকবুল বান্দা এটাই তাঁর বড় পরিচয়। মুজাদ্দেদে জামান, ইমামুত তরীকত, শহীদে বালাকোট মাকামগুলো সেই মাকবুলিয়াতের নিদর্শন বহন করে। সত্যানুসন্ধানীদের প্রতি সালাম।

দিওয়ান-ই আযীয ও সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. সিলসিলার ফয়েজঃ একটি পর্যালোচনা

আহমদ সানী বোরহান

শেরে বাংলা আযীযুল হক আল কাদেরী (রহ.) প্রণীত দিওয়ানে আযীয গ্রন্থে শাহ ইসমাইল দেহলভী লিখিত কিতাবের সূত্রে সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ.) এর সমালোচনা করা হয়েছে।

বলা হয়েছে এবং "যে সিলসিলায় সাইয়্যেদ আহমদ বেরলভী এসেছে, সেটা হুযুর মুহাম্মদ মুস্তফার ফয়েজ ও বরকত থেকে কর্তিত" (দিওয়ান--ই আযীয, মাওলানা আব্দুল মান্নান অনূদিত, পৃ. ৪৩৭) অন্যদিকে এই দিওয়ান-ই-আযীযেই শেরে বাংলা আযীযুল হক আল কাদেরী (রহ.) সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহ.) এর সিলসিলার অনেক বুযুর্গদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কারো কারো মাযার শরীফকে ফয়েজের খনী বলেছেন। কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হল–

শাহ 'আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রহ.

সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ.) এর পীর মুর্শেদ শাহ 'আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. সম্পর্কে বলেছেন-

অলিকুলের সম্রাট, কামিল বান্দাদের গর্ব, মুহাদ্দিসদের সনদ, মুফাসসিরদের ইমাম, আরিফ বান্দাদের মূখ্য ব্যক্তি, যুগের শ্রেষ্ঠ, সমসাময়িক ঈর্ষার পাত্র, সৃষ্টিকুল শ্রেষ্ঠ সত্তার প্রিয়ভাজন, উঁচু মর্যাদাসমূহে আসীন, আল্লাহর নূররাশির প্রকাশস্থল, হযরাতুল হাজ্জ মুহাদ্দিস মাওলানা শাহ 'আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী' আলাইহি রাহমাতু রাব্বিহিল বারি।

পবিত্রাত্মাসমূহের ফয়েজ ও বরকতরাজির উৎসস্থল, আশ্চর্যজনক গুণাবলির প্রস্রবণ হযরতুল হাজ্জ মুহাদ্দিস মাওলানা শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী আলাইহি রাহমাতু রাব্বি হিল বারীর প্রশংসায়--

শত স্বাগতম, শত মোবারকবাদ, শত ধন্যবাদ, স্বাগতম।
শাহ আব্দুল আযীয দেহলভীকে শত স্বাগতম।
তিনি ওই যুগের গর্ব ছিলেন তাফসির ও ফাতওয়া গ্রন্থের প্রণেতা।

তাঁর তাফসীর ও ফাতওয়া গ্রন্থের নাম যথাক্রমে-'তাফসীরে আযীযী' ও 'ফতওয়া-ই আযীযীয়্যাহ' - এটা ভালোভাবে জেনে রেখো।

তাঁর পিতাও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি হলেন শাহ ওয়ালি উল্লাহ।

এ কথাও জেনে রেখো।

এ কথাও জেনে রেখো যে, তিনিও কাশফ ও কারামতের অধিকারী এবং গ্রন্থপ্রণেতা ছিলেন।

নিঃসন্দেহে তিনি আহলে সুন্নাতের পেশোয়া।

হে জগতের মহান রব! তাঁর মাযার শরীফকে জান্নাতের বাগান করে দিন।

ওই দিল্লীতে তাঁর নূরানী মাযার শরীফ অবস্থিত-এ কথা জেনে রেখো!

তাঁর বরকতময় সত্তা থেকে মানুষ সর্বদা ফয়েয লাভ করে ধন্য হচ্ছে।

(দিওয়ান--ই আযীয, মাওলানা আব্দুল মান্নান অনূদিত, পৃ. ৯৮-৯৯)

সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ.) এর অন্যতম প্রধান খলিফা সূফি নূর মুহাম্মাদ নিযামপুরী রহ.। ফুরফুরা শরীফের খলিফা আল্লামা রুহুল আমীন বশীরহাটি রহ. তাঁর লিখিত কারামতে আহমদীয়া গ্রন্থে (যা সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেররলভী রহ. মর্যাদা ও তাঁর বিপক্ষে অপবাদ খন্ডনে লেখা হয়) সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ.) এর ৮১ জন খলিফার তালিকা প্রদান করেন। সেই তালিকায় সূফি নূর মুহাম্মাদ নিযামপুরী রহ. রয়েছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে কলকাতায় গিয়ে তিনি সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরলভী (র.) এর কাছে কাদিরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়্যাহ-মুজাদ্দিদিয়া, মুহাম্মাদিয়া তরীকায় বায়আত গ্রহণ করেন। তাঁর খলিফা সূফি ফতেহ আলী ওয়াইসি রহ, তাঁর প্রধান খলিফা ফুরফুরার আবু বকর সিদ্দিকী (রহ.)।

এই তিন বুযুর্গ সম্পর্কে আযীযুল হক আল কাদেরী (রহ.) প্রণীত দিওয়ানে আযীয গ্রন্থে ভূয়সী প্রশংসা হয়েছে-

গাজীয়ে বালাকোট সূফি নূর মুহাম্মাদ নিযামপুরী রহ.

সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ.) এর অন্যতম প্রধান খলিফা গাজীয়ে বালাকোট সূফি নূর মুহাম্মাদ নিযামপুরী রহ. সম্পর্কে লিখেন-

তরীকতপন্থীদের শিরোমণি, আরিফ বান্দাদের গর্ব, যুগবরেণ্য সূফী, কাশফ ও কারামতের ধারক, ফয়য ও বরকতের খনি, চট্টগ্রাম শরীফের মিরসরাই নিযামপুর নিবাসী হযরত সূফী নূর মুহাম্মদ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর প্রশংসায়

শত স্বাগতম, শত ধন্যবাদ, শত মুবারকবাদ, স্বাগতম-

পবিত্রাত্মা ওলী ওই হযরত সূফী নূর মুহাম্মদকে।

তিনি আরিফকুলের শিরোমণি ও ইবাদতপরায়ণ বুযুর্গদের আদর্শ।
তিনি ছিলেন ফয়য ও কামালের খনি এবং যুগবিখ্যাত মুর্শিদ।
জেনে রেখো (মিরসরাইয়ের) নিযামপুরে তাঁর নূরানী রওযা শরীফ অবস্থিত।
ভক্তবৃন্দ সবসময় তাঁর বরকতময় সত্তা থেকে ফয়যপ্রাপ্ত হচ্ছে।
হে বিশ্বপ্রতিপালক! তাঁর মাযার শরীফকে জান্নাতের বাগানে পরিণত করুণ!
হে মহান রব! নবীকুল সর্দারের ওসীলায় এ দো'আ ক্ববূল করুন।
তুমি যদি এর রচয়িতার নাম জানতে চাও, তবে জানো, তিনি হলেন 'শেরে বাংলা'
নিঃসন্দেহে ওলীগণের অস্বীকারকারীদের জন্য তিনি শানিত তরবারি।
(দিওয়ান--ই আযীয, মাওলানা আব্দুল মান্নান অনূদিত, পৃ. ৩৯১-২)

সূফি ফতেহ আলী ওয়াইসি রহ.

সূফী ফতেহ আলী ওয়াইসি রহ. পিতা ইমামুত তরিকত সায়্যিদ আহমাদ শহীদ রহ. থেকে কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দীয়া, মুজাদ্দেদিয়া ও মুহাম্মাদিয়া তরিকায় খেলাফতপ্রাপ্ত বুযুর্গ পীর ছিলেন। তিনি ১৮২৬-১৮৩১ সাল পর্যন্ত সায়্যিদ আহমাদ শহীদ রহ. এর সাথে বিভিন্ন জিহাদে অংশগ্রহণ করেন এবং ১৮৩১ সালে বালাকোটে শহীদ হন। ফতেহ আলী ওয়াইসি রহ. তাঁর পিতার পীরভাই ও যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক বুযুর্গ গাজীয়ে বালাকোট হযরত সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রহ. এর তরীকতের বায়াত গ্রহণ অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দীয়া, মোজাদ্দেদিয়া ও মুহাম্মাদীয়া তরীকায় খেলাফত অর্জন করেন।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর 'ইসলাম প্রসঙ্গ' গ্রন্থে সূফি ফতেহ আলী ওয়াইসি রহ. এর শাজারা সম্পর্কে লেখেন- হযরত মুজাদ্দিদ আলফসানী শায়খ আহমদ সেরহিন্দী পর্যন্ত তাঁহার সিলসিলা (পীর পরম্পরা) নিম্নে উল্লেখ করিতেছি। -হযরত মুজাদ্দিদ আলফসানী, তাঁহার খলীফা হযরত আদম বিননুরী, তাঁহার খলিফা হযরত সৈয়দ আবদুল্লাহ আকবরাবাদী, তাঁহার খলিফা মৌলানা শাহ ওলীয়ুল্লাহ, তাঁহার খলিফা মৌলানা শাহ আব্দুল আযীয, তাঁহার খলীফা সৈয়দ আহমদ শহীদ, তাঁহার খলীফা হযরত সূফী নূর মুহম্মদ নিযামপুরী, তাঁহার খলীফা হযরত সূফী ফৎহ্ 'আলী (রহিমাহুল্লাহু তা'আলা আজ মা'ঈন) (ইসলাম প্রসঙ্গ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মাওলা ব্রাদার্স সংস্করণ, ২০০০, পৃ. ১০১)

তরিকা সমূহের এই শাজারা সমূহ সূফি ফতেহ আলী ওয়াইসি রহ. নিজ সিলমোহর যুক্ত করে প্রকাশ করেছিলেন যা এখনো সংরক্ষিত আছে এবং তাঁর রচিত দিওয়ান-ই- ওয়াইসীতেও সংযুক্ত আছে।

সূফি ফতেহ আলী ওয়াইসি রহ. সম্পর্কে আযীযুল হক আল কাদেরী (রহ.) লিখেছেন-

আলিমদের শিরোমণি, তরীকতপন্থীদের আদর্শ, আরিফবান্দাদের স্মৃতি, যুগের পথ প্রদশর্ক, পীরে কামিল, কাশফ ও কারামতের ধারক, কামালাতের ফুয়ূযাতের খনি, হযরত সূফী ফতেহ আলী শাহ- এর এর প্রশংসায়। সূফি নূর মুহাম্মদ নেযামপুরীর খলীফা, চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় জন্মগ্রহণকারী মাওলানা আবূ বকর ফুরফুরার পীর- মুর্শিদ (তাঁর উপর মহান স্রষ্টা ও রবের রহমত বর্ষিত হোক) - এর প্রশংসায়।

শত স্বাগতম, শত ধন্যবাদ, শত মুবারকবাদ, স্বাগতম-
ওই পবিত্রাত্মা ওলী সূফী ফতেহ আলীকে।
তিনি হলেন আলিমগণের আদর্শ, তরীকতপন্থীদের শিরোমণি।
তিনি মাওলানা আবূ বকরের মুর্শিদ এ কথা সন্দেহাতীতভাবে জানবে।
আরো জানবে, ওই সাতকানিয়ায় তাঁর জন্মস্থান; এতেও সন্দেহ নেই।
জেনে রেখো, ওই কোলকাতায় তাঁর নূরানী মাযার শরীফ অবস্থিত,
ভক্তবৃন্দ তাঁর বরকতময় সত্তা থেকে সবসময় ফয়েযপ্রাপ্ত হয়ে আসছে।
হে বিশ্বপ্রতিপালক! তাঁর মাযার শরীফকে জান্নাতের বাগানে পরিণত করুণ!
হে মহান রব! নবীকুল সর্দারের ওসীলায় এ দো'আ ক্ববূল করুন।
তুমি যদি এর রচয়িতার নাম জানতে চাও, তবে জানো, তিনি হলেন 'শেরে বাংলা'
নিঃসন্দেহে ওলীগণের অস্বীকারকারীদের জন্য তিনি শানিত তরবারি।
(দিওয়ান--ই আযীয, মাওলানা আব্দুল মান্নান অনূদিত, পৃ. ৪০২-৩)

সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ.) এর সিলসিলার উজ্জ্বল নক্ষত্র, সূফি ফতেহ আলী ওয়াইসি রহ, এর প্রধান খলিফা, ফুরফুরার মুজাদ্দেদে জামান আবু বকর সিদ্দিকী (রহ.)। সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ.) এর উপর বিভিন্ন অপবাদের জবাব স্বরূপ তিনি তাঁর অন্যতম খলিফা আল্লামা রুহুল আমীন বশীরহাটি রহ. কে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লেখার নির্দেশ দেন। সেই সুত্রে 'কারামতে আহমদীয়া' নামক কিতাব লেখা হয়। মুজাদ্দেদে জামান আবু বকর সিদ্দিকী (রহ.) এর সিলসিলার সকল শাজারায় সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ.) এর নাম আছে। শুধু তাই নয় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর ইসলাম প্রসঙ্গ গ্রন্থে তাঁর পীর মুর্শেদ সম্পর্কে বলেন- বিখ্যাত হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ.) এর অন্যতম খলিফা মৌলানা হাফিজ জামালুদ্দীন সাহেবের নিকট আবু বকর সিদ্দিকী (রহ.) হাদীস, তফসীর এবং ফিকহ অধ্যায়ন করেন। (ইসলাম প্রসঙ্গ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মাওলা ব্রাদার্স সংস্করণ, ২০০০, পৃ. ১০৭)

দিওয়ান--ই আযীয গ্রন্থে মুজাদ্দেদে জামান আবু বকর সিদ্দিকী (রহ.) সম্পর্কে বলা হয়- আলিমকুল শিরোমণি, তরীকতপন্থীদের আদর্শ, যুগের পথ প্রদশর্ক, যুগ বরেণ্য মুর্শিদ, কাশফ ও কারামতের ধারক, ফুয়ূজাত ও কামালাতের

উৎস, ভারতের হুগলী জেলার ফুরফুরা নিবাসী হযরাতুল হাজ্জ মাওলানা আবু বকর শাহ (তাঁর উপর তাঁর পরম করুণাময় আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক)-এর প্রশংসায়।

স্বাগতম, শত মুবারকবাদ, শত ধন্যবাদ, মুবারকবাদ
হিদায়াতের (মহান) পীর মাওলানা আবূ বকরকে।
তিনি হলেন আলিমগণের শিরোমণি এবং জ্ঞানী-গুণীদের আদর্শ।
তিনি ছিলেন কাশফ ও কারামাতের ধারক, আরো ছিলেন যুগ প্রসিদ্ধ বুযুর্গ।
ঐ ফুরফুরায় তাঁর নূরানী মাযার শরীফ অবস্থিত।
অসংখ্য মানুষ তাঁর বরকতময় সত্তা থেকে সর্বদা ফয়যপ্রাপ্ত হয়।
হে বিশ্বপ্রতিপালক! তাঁর মাযার শরীফকে জান্নাতের বাগানে পরিণত করুণ!
হে মহান রব! নবীকুল সর্দারের ওসীলায় এ দো'আ ক্ববূল করুন।
তুমি যদি এর রচয়িতার নাম জানতে চাও, তবে জানো, তিনি হলেন 'শেরে বাংলা'
নিঃসন্দেহে ওলীগণের অস্বীকারকারীদের জন্য তিনি শানিত তরবারি।
(দিওয়ান--ই আযীয, মাওলানা আব্দুল মান্নান অনূদিত, পৃ. ৩৩৩-৪)

হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মাক্কী রহ.

সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ.) এর অন্যতম খলিফা মিয়াজি নূর মুহাম্মাদ ঝানঝানাভী রহ.। এই ঝানঝানাভী রহ. এর প্রধান খলিফা হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মাক্কী রহ.।

হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মাক্কী রহ. নিজেই তাঁর জিয়াউল কুলুব কিতাবে তরিকা সমূহের শাজারা লিখে গিয়েছেন। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মাক্কী রহ. সম্পর্কে শেরে বাংলা আযীযুল হক আল কাদেরী (রহ.) বলেন-

হযরত আলহাজ্ব মাওলানা ইমদাদুল্লাহ সাহেব আল ফারুকী মুহাজিরে মক্কী (র.), তাঁর মুরীদ রশীদ আহমদ গাঙ্গূহী তাঁর প্রশংসায় বলেছেন, "রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী তাঁর কিতাব 'ইমদাদূস্ সুলূক'- এ তাঁর মুর্শিদ হযরত আলহাজ্ব মাওলানা ইমদাদুল্লাহ ফারুকী থানভী মুহাজিরে মক্কী (র.) সম্পর্কে বলেছেন, "তিনি হলেন প্রসিদ্ধ মাশায়েখ কুলের গর্ব, আম-খাস সকল শ্রেণীর মানুষের কেন্দ্রস্থল, পবিত্র বরকত গুলোর প্রসবণ, পছন্দনীয় কল্যাণাদির প্রকাশস্থল, আল্লাহর জ্ঞান-বিজ্ঞানের খনি, হাকীকতগুলোর ভান্ডার, সূক্ষ্মবিষয়াদির মিলনকেন্দ্র, তাঁর যুগের সূর্য, তাঁর সমসাময়িক কালের আর্দশ, সুলতানুল আরেফীন, শ্রেষ্ঠতর দুনিয়াত্যাগী, খোদা পরিচিতি সম্পন্নদের সুলতান, সংসার ত্যাগীদের বাদশাহ, কামিলদের জন্য গাউস, ওই সত্যসন্ধানীদের সাহায্যকারী, যাঁর পূর্ণাঙ্গ প্রশংসা করতে কলমগুলো পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে, যাঁর উজ্জ্বল চারিত্রিক সৌন্দর্যবলী বর্ণনা করতে কলমসমূহ অপারগ, তাঁর বৈশিষ্ট্যবলীর কারণে পূর্ববর্তীগণ ঈর্ষা করেন, পাপিষ্ঠ ও উদাসীনগণ তাঁর

চাদর দেখে হিংসার আগুনে জ্বলে উঠে, আমার মুর্শিদ, আমার ভরসা, আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের ওসীলাহ, আমার মুনিব ও আমাকে মুক্তকারী, আমার সর্দার, আমার সনদ, আমার শায়েখ, যিনি আলহাজ্ব ইমদাদুল্লাহ ফারুকী থানভী নামে প্রসিদ্ধ, আল্লাহ তায়ালা তাঁর উপর শান্তি বর্ষণ করুক, তাঁর পথপ্রদর্শন ও হিদায়াতের বিনিময়ে তাঁর প্রসিদ্ধ সত্তা দ্বারা পথভ্রষ্টতা দূরীভূত করুন"- এর প্রশংসায়

শত স্বাগতম, শত মুবারকবাদ, শত ধন্যবাদ, স্বাগতম।
হুযুর মুস্তফার বন্ধু ওই হাজী ইমদাদুল্লাকে স্বাগতম।
ওই পীরে কামিল কুফর ও পথভ্রষ্টতাকে দূরীভূত করেছেন।
তিনি কাসেম নানূতবী, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী ও আশরাফ আলী থানভীর পীর-মুর্শিদ ছিলেন;
ওই ভারতে যদি তাঁর পবিত্র সত্তা না হতো,
তবে ওখানে আহলে সুন্নাতের মোটেই অস্তিত্ব থাকতো না।
সমগ্র ভারতবাসী ওহাবী-নজদীর মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়তো।
তিনি আহলে সুন্নাতের মহাস্তম্ভ ছিলেন! তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।
ওই যুগশ্রেষ্ঠ শায়েখ মক্কায় হিজরত করে চলে যান। রাসূলকুল সর্দারের নির্দেশে তিনি হারাম শরীফে তাফসীর পড়াতেন।
তাঁকে কাশফ ও কারামতের ধারক ও পুস্তক রচয়িতা বলে জানো!
হে বিশ্বের মহান রব! তাঁর মাজার শরীফকে বেহেশতের বাগানে পরিণত করুন!
ওই পবিত্র মক্কায় তাঁর নূরানী মাজার শরীফ অবস্থিত।
তাঁর বরকতময় সত্তা থেকে মানুষ সর্বদা ফয়েয (কল্যাণ) লাভ করে ধন্য হচ্ছে।

(দিওয়ান--ই আযীয, মাওলানা আব্দুল মান্নান অনূদিত, পৃ. ৯৫-৯৬)

নারিন্দার শাহ আহসানুল্লাহ (রহ.)

শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দেস দেহলভী (রহ.) এর খলিফা সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ.)। সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ.)এর অন্যতম খলিফা খাজা গোলজার শাহ (রহ.), তাঁর খলিফা খাজা লশকর মোল্লা (রহ.), তাঁর খলিফা শেখ শাহ আহসানুল্লাহ (রহ.)। (যিনি ঢাকার প্রখ্যাত নারিন্দা, মুশরীখোলার দরবারের প্রতিষ্ঠাতা পীর)। মুশরীখোলা দরবার থেকে প্রকাশিত এ, এফ, এম, আব্দুল মজীদ রুশদী প্রণীত শেখ শাহ আহসানুল্লাহ (রহ.) এর জীবনী 'হযরত কেবলা'র শেজরায়ে চিশতিয়াতে পৃ. ১৬৯ তে উপরোক্ত তথ্য বিদ্যমান রয়েছে।)

শাহ আহসানুল্লাহ (রহ.) সম্পর্কে আযীযুল হক আল কাদেরী (রহ.) লিখেছেন-আলিমকুল শিরমণি, আরিফকুলের আর্দশ পুরুষ, কাশফ ও কারামতের

খনি, ফায়েজ বরকতের উৎস, কামালতের ধারক পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) ঢাকার বাসিন্দা হযরত মাওলানা শাহ ছুফি আহসানের প্রশংসায়, তাঁর উপর তাঁর অতি ক্ষমাশীল মহান রবের রহমত বর্ষিত হোক।

শত স্বাগতম, শত মোবারকবাদ, শত ধন্যবাদ, স্বাগতম -
ঢাকার বাসিন্দা হযরত ছুফি আহসান সমীপে।
তিনি আলিমকুল শিরমণি ও আরিফকুলের আদর্শ ছিলেন।
আরো ছিলেন কাশফ- কারামতের ধারক ও যুগ প্রসিদ্ধ বুজুর্গ।
যুগের লোকদের পথপ্রদর্শক ছিলেন তিনি, আরো ছিলেন পীরে কামেল।
দুনিয়ায় তুমি তাঁর শতসহস্র মুরীদান দেখতে পাবে।
জেনে রেখো ঢাকার মুশরীখোলায় তাঁর নূরানী রওযা শরীফ অবস্থিত।
সবসময় অসংখ্য মানুষ তাঁর বরকতময় সত্তা থেকে ফয়েজ প্রাপ্ত হচ্ছে।

(দিওয়ান--ই আযীয, মাওলানা আব্দুল মান্নান অনূদিত, পৃ. ১৯৫)

পর্যালোচনা

দিওয়ানে আযীয গ্রন্থে এভাবে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) সিলসিলার আরো অনেক বুযুর্গের প্রশংসা রয়েছে। উপরোক্ত আলোচনায় আযীযুল হক আল কাদেরী (রহ.) সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ.) এর সিলসিলার উর্ধ্বতন ও অধস্থন বুযুর্গদের সম্পর্কে যে প্রশংসা করেছে এতেই জবাব পরিস্কার যে, সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ.) এর সিলসিলা এক মকবুল সিলসিলাই নয় বরং এই সোনার সিলসিলা ফয়েজের খনী। যা তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে লিখেছেন। অন্যদিকে, শাহ ইসমাইল দেহলভী ও 'সিরাতুল মুসতাকিম' সম্পর্কে সূত্রে সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ.) যে অভিযোগ এসেছে আমরা মনে করি সেটা সেটা তাঁর প্রতক্ষ অভিজ্ঞতা নয় বরং প্রচলিত অপপ্রচার থেকে ধারণাগত জায়গা থেকে তথ্যসংকট বা ভুল বোঝাবুঝির কারণে হয়েছে। না হয় তাঁর বক্তব্যেইতো অভিযোগের জবাব রয়েছে।

শাহ ইসমাইল দেহলভী লিখিত বইগুলো বিশেষ করে 'সিরাতুল মুসতাকিম' যা সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর মালফুজাত হিসেবে পরিচিত অনেকের মতামত হল, ব্রিটিশ ষড়যন্ত্রে সেগুলোর বিকৃতি হয়েছিল এবং সেই বিকৃত বই পড়েই অনেকে ফতোয়া দিয়েছিলেন। অন্যদিকে অনেকের মতে শাহ ইসমাইল দেহলভী জীবনের কোন অংশে ভিন্ন চিন্তার দিকে ঝুকলেও তিনি পরে আহলে সুন্নাতের দিকে রুজু করেছিলেন। আল্লাহতায়ালাই ভালো জানেন। তবে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় এখানে সায়্যিদ আহমাদ শহীদ (র.)। যেহেতু যেই বইয়ের বিষয় নিয়ে তাঁর আকিদা সম্পর্কে অভিযোগ দেওয়া হয় সেটা কতটুকু

গ্রহণযোগ্য হবে যখন সেই বই পরবর্তীতে বিকৃতির অভিযোগ রয়েছে? যেখানে অভিযোগই সন্দেহযুক্ত সেখানে অকাট্য শাস্তি কিভাবে হতে পারে? এবং এটা জানার পর ফতোয়া থাকলেও কতটা কার্যকর থাকে? অথচ সায়্যিদ আহমাদ শহীদ (র.) উত্তরসূরিদের অধিকাংশের মধ্যে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা ও শুদ্ধ তাসাউফ চর্চা আজ অবধি চলমান। তাঁদের রুহানীয়াত সম্পর্কে ধারণা পেতে শেরে বাংলা আযীযুল হক আল কাদেরী (রহ.) এর প্রশংসাবাণীই যথেষ্ঠ।

ইসলামের ইতিহাসে কিতাব বিকৃত হওয়ার ঘটনা নতুন কিছু নয়। মুজাদ্দেদে আলফে সানী রা. কয়েকটি মকতুব একজন বহিস্কৃত মুরীদ ষড়যন্ত্র করে, বিকৃত করে ছাপিয়ে বিভিন্ন আলেমদের কাছে পাঠিয়ে ফতোয়া তালাশ করেছিল। অনেক বিজ্ঞ আলেম এমনকি শাহ আব্দুল হক দেহলভী র. মতো আলেম প্রথমদিকে ঐ বিকৃত মকতুব পড়ে মুজাদ্দেদে আলফে সানী সম্পর্কে বিরূপ ধারণা নিয়েছিলেন। আল্লাহর রহমতে পরে সত্য উন্মোচিত হয় এবং শাহ আব্দুল হক দেহলভী র. এর সাথে মুজাদ্দেদে আলফে সানী রা. এর সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইমামে আজম আবু হানীফা সহ অনেক জগতবিখ্যাত আউলিয়া ও উলেমায়ে আহলে সুন্নাহর কিতাব বিকৃতি করার ঘটনা ঘটেছিল পরবর্তীতে সেটা জানাও গেছে। এমনকি সহীহ হাদীসের সাথে কেউ কেউ জাল হাদীসও বর্ননা করেছেন এবং সেগুলো চিহ্নিত হয়েছে। জাল হাদীসের কারণে কি সহীহ হাদীস বাদ হয়ে যাবে? ভণ্ড পীরের কারণে কি হাক্কানী পীরদেরকেও মন্দ ভাববো? শাহ ইসমাইল দেহলভী ছিলেন শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী র. এর নাতি এবং শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দেস দেহলভী র এর ভাতিজা। এখনকি তাহলে তাঁদেরকেও মন্দ বলা হবে? শাহ ইসমাইল দেহলভীর বিষয়ে যদি অভিযোগ সত্য ধরেও নেওয়া হয় এবং সেই কারণে যদি সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) কে দোষারোপ করা হয় তবে সেটা মাআযাল্লাহ ৭২ ফিরকার জন্য আল্লাহতায়ালার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, শিয়াদের কারণে মাওলা আলী রাদি আল্লাহু আনহুকে, কুখ্যাত এজিদের কারণে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা) কে দোষারোপের অনূরূপ হবে।

সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) সিলসিলা যদি ফয়েয ও বরকত কর্তিত হয়ে থাকে তবে দিওয়ানে আযীযে লিখিত শেরে বাংলা আযীযুল হক আল কাদেরী (রহ.) এর এতো এতো প্রশংসা ভুল প্রমাণিত হবে। সত্য তো তাই যা তিনি প্রশংসা করেছেন বরং এতোগুলো ভুল হওয়া অযৌক্তিক। তথ্যগত কারণে অল্পকিছু ভুল হয়েই যেতে পারে যেটা লেখকদের জন্য অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক কিছু নয়। শেরে বাংলা আল কাদেরী (রহ.) নিজেই এর আরেকটা চমৎকার মীমাংসা দিয়েছেন। তিনি (দিওয়ান--ই আযীয, মাওলানা আব্দুল মান্নান অনূদিত, পৃ. ৪৩৬) নিজেই বলেছেন- মাস'আলা সাজিয়ে- গুছিয়ে বর্ণনা করা কোন সহজ কাজ নয়। যদি ভুল পাও তবে আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা করো। আল্লাহতায়ালা তাঁর এই তাকওয়াপূর্ণ উক্তিকে কবুল করুক। আল্লাহুম্মা আমীন।

দ্বাদশ অধ্যায়

মাকতুবাতে সায়্যিদ আহমাদ বেরলভী (রহঃ)

English translition of Sayyid Ahmad Shahid's letter (appearing on page 176) sent to Muhammad Jam'e and others of Rae Bareli

In the name of Allah the most Compassionate, the Most Mercyful.

Sayyid Muhammad Jam'e Sayyid Ghulam Jilani, Sayyid Masum Ahmed, Sayyid Muhammad Mustafa and the highly respected brother Sayyid Muhammad; After salutations prayer for the well-being of all, be it known that; This friar reached the Frontier of Yusufzais is, with the help and mercy of Allah, after passing through Hydaerabad Sind, Shikarpur, Qandahar (Kandahar), Ghazni, Kabul, and Peshawar, and invited the Muslims to join the jihad. Thousands of men responded to the call while saveral thousand infidel Sikhs appeared to put up a fight (with them). The faithful warriors despatched hundredes of them to the Hell by their successive night attacks and captured a large booty of war and number of horses. Being a leaderless army, the warriors took away, in the manner of rioters, all the spoils with them. At last, the Ulama, the raligious leaders, the Sardars and the nobles took biat, in the way of Prophet, on the hands of this friar and appointed him as their Amir (leader) by reciting his name in Khutba (Friday Sermon). By this time thousands of persons have collected to fight the infidels. Arrangements for the training and management of these troops and their reorganisation into ranks, sections and detachments are being made. An encounter is likely to take place in the near future between the forces of islam and the infidels, whom they shall defeat, if Allah so wills, and whole of their country including the famous fort of attock will in this manner be brought under muslims rule. The infidels shall be humbled in this way in no long time and the rule of shariah promulgated over

their territories. You may also beseech to Allah for the well-being and stability of the muslims, humiliation of the infidels and victory of the religion of the leader of prophets, on whom be peach and blessings of Allah and also on his progeny and companions. Subsequent events shall be communicated to you in detail later on. You may enquire about the remaining affairs from the bearer of this letter, for, threre is nothing more to put down in writing save our ardent desire to meet you and the prayers for your welfare. Hamid-ud-din present at the time of writing (this letter) conveys his situations. (Seal of Sayyid Ahmad).

সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ জামে এবং রায় বেরেলির অন্যান্যদের কাছে প্রেরিত সাইয়্যিদ আহমাদ শহীদের চিঠির (১৭৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত) অনুবাদ করেছেন শিহাব উদ্দীন

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আমীরুল মুমিনিন, সাইয়্যিদ আহমাদের তরফ থেকে সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ জামে, সাইয়্যিদ গোলাম জিলানী, সাইয়্যিদ মাসুম আহমাদ, সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ মুস্তফা এবং পরম শ্রদ্ধেয় ভাই সাইয়্যিদ মুহাম্মাদের প্রতি; সকলের মঙ্গল কামনা করে দোয়া ও সালামের পর বিদিত করা যাচ্ছে যে, হায়দরাবাদ সিন্ধ, শিকারপুর, কান্দাহার (কান্দাহির), গজনী, কাবুল এবং পেশোয়ার পেরিয়ে এই ফক্বির আল্লাহর অনুগ্রহ ও সাহায্যে ইউসুফাযীদের সীমান্তে পৌঁছে এবং মুসলমানদের জিহাদে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। হাজার হাজার মানুষ এই ডাকে সাড়া দেয়। অন্যদিকে কয়েক হাজার কাফের শিখ (তাদের সাথে) লড়াইয়ে নামার জন্য হাজির হয় ঈমানদার মুজাহিদরা রাতের বেলা সফল আক্রমণে করে তাদের একের পর এক শত শত কাফেরকে জাহান্নামে প্রেরণ করে এবং বিশাল পরিমাণে গণিমত এবং বেশ কয়েকটি ঘোড়া জব্দ করে। সেনাবাহিনী নেতৃত্বহীন হওয়ায়, মুজাহিদরা দাঙ্গাকারীদের মতো সমস্ত সম্পদ তাদের সাথে নিয়ে যায়। অবশেষে, উলামায়ে কিরাম, ধর্মীয় নেতারা, সর্দারগণ ও উচ্চবিত্তরা এই ফক্বিরের হাতে রাসূলের পথে বাই'আত নেয় এবং জুম'আর খুতবায় অধমের নাম উচ্চারণ করে অধমকে তাদের আমির (নেতা) নিযুক্ত করে। এই সময় অবধি হাজার হাজার ব্যক্তি কাফেরদের সাথে লড়াইয়ের আকাঙ্ক্ষায় জড়ো হয়েছে। সেনাদের প্রশিক্ষণ ও পরিচালনার ব্যবস্থা, বিভিন্ন বিভাগ, পদে তাদেরকে বিন্যস্তকরণ এবং বিচ্ছিন্নকরণের (সেনাদের আলাদা আলাদা অভিযানে প্রেরণ) ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মুসলিম বাহিনী এবং কাফেরদের মধ্যে অদূর ভবিষ্যতে একটি মুখোমুখি সংঘাতের সম্ভাবনা রয়েছে, আল্লাহ চাইলে তারা পরাভূত হবে, আর এভাবে এটকের বিখ্যাত দুর্গসহ তাদের সমগ্র দেশ পুরোপুরি মুসলমানদের শাসনের আওতায় আনা হবে।

এভাবে অচিরেই কাফেররা অবনমিত হবে এবং তাদের অঞ্চলগুলিতে শরিয়তের শাসন কায়েম হবে।

আপনারা মুসলমানদের সুস্থতা ও স্থিতিশীলতা, কাফেরদের অপদস্থতা ও সাইয়েদুল মুরসালিনের দ্বীনের বিজয়ের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তাঁর উপর, তাঁর বংশধর এবং সাহাবায়ে কেরামের উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। পরবর্তী ঘটনাগুলি পরে বিস্তারিতভাবে আপনাদের জানানো হবে। আপনারা এই চিঠির বাহকের কাছ থেকে বাকী ঘটনাগুলি সম্পর্কে জানতে পারেন। কেননা আপনাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য আমাদের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা এবং আপনাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করা ছাড়া আর লেখার মত কিছু নেই। (এই চিঠিটি) লেখার সময় উপস্থিত হামিদ-উদ্দিন তাঁর (সৈয়দ আহমাদ রহ.) সালাম জানায়। সৈয়দ আহমাদ রহ. এর সীলমোহরের ছাপ ()

Source : Saiyid Ahmad Shahid – His Life and mission, Abul Hassan Nadwi, p. 395-6, www.abulhassannadwi.org

কবিতা

রায় বেরেলীর জঙ্গী পীর

ফররুখ আহমদ

সবাই যখন আরাম খুঁজে ছোটে ঘরের পানে
জঙ্গী পীরের ডাক শোনা যায় জঙ্গের ই ময়দানে।
সবাই ভাবে পীরের কথা শুনেছি তো ঢের
এমন পীরের কথা তো ভাই পাইনি কভু টের।
পাল্কী ছেঁড়ে পায় দলে বা তাজীতে সওয়ার
তসবি কোথায় হাতে যে তার নাঙ্গা তলওয়ার।
নাই জোব্বার রঙ্গীন বাহার, সাজ-সজ্জা নাই
হাত মেললে বলেন তিনি, "লড়াই করা চাঁই"।
বলেন শুধু, 'অন্যায় যা করো ধুলিসাৎ'
পাপ মুলুকে করো কায়েম দ্বীনি হুকুমাত।
ভুঁড়ির বহর বেশি যাঁদের পালান তাঁরা সব
রুদ্ধ ঘরে আলোচনায় জমান কলরব।
তর্ক ধরে ধর্ম নিয়ে হন না ঘরের বার
জামাত ভেঙ্গে করেন তাঁরা জিন্দেগী গুজার।
টাকা বাড়ে, ভুঁড়ি বাড়ে- বাড়ে রাতের ঘুম;
পথে পথে কেঁদে মরে মুসলিম মজলুম।
বিদেশ থেকে এল কখন ফিরিঙ্গী ডাকাত
কৌশলে ভাই নিলো কেড়ে তাদের হুকুমাৎ।
বন্দী থেকে সেই অবধি খাচ্ছে কেবল মার
শিকল পরা হাতে তাদের নাইকো হাতিয়ার।
রায় বেরেলীর 'আউলীয়া পীর' সৈয়দ আহমদ
খান্দান যার সবার সেরা উচ্চ যাঁহার পদ।
মুসলমানের বিপদ দেখে হলেন ঘরের বার

তসবি ছেড়ে হাতে নিলেন নাঙ্গা তলোওয়ার।
ভন্ড যারা পালায় তারা পীরের সুরত দেখে
সাচ্চা মুমিন পীরের কাছে জিহাদ করা শেখে।
হায়াত-মউত খোদার রাহে যিনি সঁপেন ভাই
এমন পীরের কাছেই শুধু শিক্ষা নেওয়া চাই।
রায় বেরেলীর 'আউলিয়া পীর' মস্ত মুজাহিদ
তার ডাকে ভাই মুসলমানের ভাঙ্গে মরণ নিঁদ।
মুসলমানের জামাত দেখে সবাই করে ভয়
এক জামাতে এলেই তারা করবে জগৎ জয়!
শিখ মুলুকে ছিল রাজা বিষম যুলুমবাজ
মুসলমানের জামাত দেখে তুলিল আওয়াজ।
হল্লা ক'রে দল পাকালো হিংসুটে সব শিখ
রায় বেরেলীর আউলিয়া পীর বিপদে নির্ভীক!
খোদার নামে ঝান্ডা তুলে শঙ্কা বিহীন প্রাণে
লক্ষ ভিড়ের সাথে লড়েন জঙ্গেরি ময়দানে।
জিহাদী মেঘ ফাটলো আবার কাল বৈশাখী ঝড়ে
জঙ্গী পীরের কথায় বুঝি যমীনে বাজ পড়ে।
সামনে লড়াই কঠিন দেখে চালাক শিকের রাজা
ভাবল তখন পিছন থেকে দেবে কঠিন সাজা।
হামলা করে পিছন থেকে সামনে যেতে ভয় !
বালাকোটে শহীদ হলেন সেনানি দুর্জয় !
বুকের খুনে গেলেন এঁকে স্বাধীনতার পথ
রায় বেরেলীর জঙ্গী সে পীর নবীর উম্মত।

সংগ্রহ : বালাকোট-চেতনা উজ্জীবন পরিষদ, সম্মেলন স্মারক ২০১৬

বালাকোট ডাক দিয়ে যায়

রুহুল আমিন খান

বালাকোট ডাক দিয়ে যায়
তৌহিদের সৈনিকেরা, রাসূলের প্রেমিকেরা
উজ্জীবিত হও পুনঃ ঈমানের বজ্র চেতনায়।

শকুনি মেলেছে ডানা, দিয়েছে ভয়াল হানা
হিংস্র ক্রুর হায়েনার দল
বিষধর গোক্ষুরের দেখো হে স্ফীত ফনা
ভয়ঙ্কর উদ্ধত ছোবল।
চারদিক ঘেরি আসে অতি দ্রুত বাহু অক্টোপাসী
বীভৎস ক্লিন্ন দানো অস্তিত্ব বিনাশী।

বহতা নদীর মত বয়ে গেছে অমূল্য সময়
হয়েছে অনেক অপচয়।
মজলুমের শোনো আহাজারি
শোণিতাক্ত প্রিয় দেশ
যুদ্ধের ময়দান দেখো দিগন্ত বিসারি।

ওঠো, জাগো, আর দেরি নয়
জিহাদে ঝাপিয়ে পড়ো
বজ্র কুওয়াত নিয়ে ঈমানের, হিম্মত দুর্জয়।
ভুলে যাও হিংসা লোভ দলাদলি
ক্ষুদ্র স্বার্থ যতো
দাঁড়াও মজবুত হয়ে
অটল অনড় দৃঢ় সীসা ঢালা প্রাচীরের মতো।
ডাকে ওই বালাকোট
ঈমানের, আমলের, জিহাদের দীক্ষা পুনঃ লও
উম্মার ক্রান্তিকালে মুহাম্মদী তরীকায় ঐক্যবদ্ধ হও।

ডাক দিয়ে যায় শহীদান
জাতির মুমূর্ষু দেহে সঞ্চারিত হয় নব প্রাণ

শাহাদাতী তাজা খুনে। যে জাতি মরিতে জানে
সে জাতি মরে না কোনদিন
চির দীপ্ত চির অমলিন
অনির্বাণ জেনো সেই শিখা
আজ হোক কাল হোক
অঙ্কিত ললাটদেশে হবে তার বিজয়ের টিকা।

হক প্রতিষ্ঠাই হলো মুমিনের যিন্দেগীর একমাত্র ব্রত
এভারেস্ট শৃঙ্গের মত
সদা উচ্চ শির তার চির সমুন্নত।
সে চির স্বাধীন
উদার উন্মুক্ত নীলে মুক্তপক্ষ দুরন্ত শাহীন।
বহিবার হয় যদি শৃংখলের ভার
তার আগে শাহাদাত অভিপ্রাত তামান্না যে তার।
মুমিন প্রস্তুত দিতে রাহেলিল্লা প্রাণ বিসর্জন
অবশ্যই তার কাছে আকাংখিত
শৃগাল-শতায়ু থেকে দিনেকের সিংহের জীবন।
সাফল্য-সুবর্ণ দ্বারে উপনীত অমর শহীদ
নিবিড় নৈকট্য তার অবস্থান মালিকের
যথা নিত্য চিরায়ত ঈদ।
প্রেরণার মহাউৎস সাইয়্যিদ আহমাদ শহীদ
স্মরণীয় বরণীয় যামানার শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ
অকাতরে বালাকোটে দিয়ে নিজ প্রাণ
দিয়ে গেল গোলামির শৃংখল-মুক্তির সন্ধান।
তরীকত, তাসাউফ মুর্শিদে বরহক কা-কে কয়
দিয়ে গেল সেই পরিচয়।
বালাকোট রণাঙ্গনে শাহাদাত-শোণিতে সাঁতারি'
রেখে গেল অনুপম দৃষ্টান্ত-
হোসাইনের উত্তরাধিকারী।

সংগ্রহ : বালাকোট-চেতনা উজ্জীবন পরিষদ, সম্মেলন স্মারক ২০১৬

বালাকোট

হোসেন মাহমুদ

ইতিহাসের আলো-ছায়ার ব-দ্বীপে রক্ত আখরে লেখা একটি
বেদনার্ত নাম- বালাকোট
মে মাস এলেই পুরনো শরীর থেকে ঝরে পড়ে সব উড়োখুড়ো
উপেক্ষার পলকা জঙ্গল
ঝাঁ চকচকে তীক্ষ্ম তলোয়ারের মত সূর্যালোকে ঝলসে ওঠে সেই
জেহাদের স্মৃতি হৃদয়ে হৃদয়ে
আর শহীদি পেয়ালায় চুমুক দেয়া মানুষের আড়াল ছেড়ে
এসে দাঁড়ান আমাদের সামনে।

উপমহাদেশের মুসলমানরা তখন পাড়ি দিচ্ছিল এক ভয়াবহ
জাতীয় দুর্যোগের কাল
পূর্বদিক থেকে ক্রমশই বিস্তৃত হচ্ছিল দখলদার ইংরেজদের লোভ ও
আগ্রাসনের অদম্য বাহু
পশ্চিমে শতাব্দীর ব্যর্থতা ও বশ্যতার ঐতিহ্য ভেঙে মাথা তুলেছিল
দুর্দম নৃশংস বর্বর ক্ষমাহীন এবং ঘোরতর ইসলাম ও
মুসলিম বিদ্বেষী
পুঞ্জীভূত রোষে তারা গযবের মত আপতিত হয়েছিল
দ্বীনের অনুসারীদের উপর
পাঞ্জাব থেকে উত্তর-পশ্চিমে বিস্তৃত ভূখণ্ডে শুধু ধ্বনিত হচ্ছিল
কান্না আর আহাজারি।

রায়বেরেলির মর্দে মুজাহিদ সৈয়দ আহমদ সেদিন উড়িয়ে দিলেন
জেহাদের প্রদীপ্ত পতাকা
শিখদের নির্যাতন প্রতিরোধে শুরু হল তাঁর দুঃসাহসী ন্যায়ের
সপক্ষে তুমুল সংগ্রাম
একের পর এক লড়াইয়ে পরাজিত শিখরা দেখল পায়ের নিচ থেকে
ক্রমেই সরে যাচ্ছে মাটি
চিরচরিত নিয়মে তারা অবলম্বন করল সকল কুটিলতা ও
হীন ষড়যন্ত্রের পথ।

কী দুঃখ! কী লজ্জা! পুরনো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে
দেখা গেল একালে আবারও

বিধর্মী শত্রুর নগদ অর্থের প্রলোভন স্বপক্ষ ত্যাগ করল
লোভী উপজাতীয় সরদারেরা
সাহসের শেষ বিন্দুতে ভর করে মরণপণ লড়লেন মর্দে মুজাহিদ
ও তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গীগণ
তারপর ইসলাম ও মুসলমানের জন্য হাসিমুখে উৎসর্গ
করলেন নিজেদের জীবন।

বালাকোটের বিপর্যয় শোক ও বেদনায় বাকরুদ্ধ করলেও
রুদ্ধ হয়নি জেহাদের স্রোতধারা
স্থান থেকে স্থানে, হৃদয় থেকে হৃদয়ে সঞ্চালিত হয়েছে অবিরাম
সংগ্রামের অনিঃশেষ প্রেরণা
প্রজন্মের পর প্রজন্ম পূর্বসূরির জ্বালানো আলো থেকে নিজের মশালে
ধরিয়ে নিয়েছে আগুন
আর ইতিহাসের পাতায় এভাবেই রচিত হয়েছে ক্রমাগত এক একটি
প্রোজ্জ্বল মাইলফলক।

সংগ্রহ : বালাকোট-চেতনা উজ্জীবন পরিষদ, সম্মেলন স্মারক ২০১৬

দুটি কবিতা

আবদুল মুকিত চৌধুরী

শহীদ মহান (০১)

গোল চলছে ফাঁকা মাঠে
দেশে দেশে আজ পরজীবীদের বিচরণ
মাভৈঃ! নামবে 'জনতন্ত্রের শ্রীচরণ'!
আগ্রাসীকুল অভিনয়রত গণ-মুক্তি পর্বে
বিধ্বংসী এ বিভীষিকার পর্দা কখন পড়বে?

দুষ্কৃতিদের ভাড়ের কলসি জলবিহারে
মাৎস্য ন্যায় বুদ্ধুরা কি বুঝতে পারে?
আপন পায়ে কুড়াল মারছে বেকুবগুলো
শুড়ির সাক্ষী লুণ্ঠন করে চাল ও চুলো।

ওরা ব্যস্ত অষ্টবজ্র সম্মিলনে,
আল্লা'র রজ্জুধারী স্বজন যায় হননে,
এ আক্কেল সেলামী দিয়েই ফতুর হবে
ঘুঘু চরার পালা এখন ভিটেয় তবে।

উড়ে এসে জুড়ে বসতে কে করে মানা?
বিজ্ঞ পিতার সন্তানকুল গো-মূর্খ না!
তবু কবি গায় ফজরের গানঃ কানে তূলো
তবু ছেঁড়া চুলে খোপা বাঁধায় স্বপ্নগুলো।
সে স্বপ্ন হয় মিছে সোনার পাথর বাটি
উলুবনে মুক্তো ছড়ানো হলো মাটি।
মনে পড়ে যায় আন্দালুসের নান্দীপাঠে,
হায় রে আল্লা! গোল চলছে ফাঁকা মাঠে!

সালাম নিও (০২)

অপভাষ্যে ভূলুণ্ঠিত মানবাধিকার
সংগ্রাম সে তো অবলুপ্তির প্রহর গুণে
বিধ্বংসীর বিপরীতে সোম্বা ঘুরে দাঁড়াবার
প্রেরণা এখন স্তিমিতির ঘুমপাড়ানি শুনে।
সৌভাগ্যই বলতে হবে শহীদ মহান
'সন্ত্রাসী' এই তকমার বোঝা বওনি তুমি
ত্রিমুখী শত্রু পরিবেষ্ঠিত এ আত্মদান
ব্যর্থ হয়নি, স্বাধীন হয়েছে মাতৃভূমি।

ভিত্তিমূলে অত্যাচারীর সাতমহলার
আঘাত হানার এ প্রক্রিয়া যুগ যুগ জিও
দস্যুগুলোয় তাড়িয়ে দেয়ার মাড়িয়ে দেয়ার
সিংহপুরুষ এবং সাথীরা সালাম নিও।

সংগ্রহ : বালাকোট-চেতনা উজ্জীবন পরিষদ, সম্মেলন স্মারক ২০১৬

বালাকোট আমার অহংকার

মুহাম্মাদ রায়হান চৌধুরী আল-আহমাদী

শাহ সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরলভী
ঈমানী চেতনার মহাবীর তুমি
আমরা কি তোমায় ভুলিতে পারি
বালাকোট আমার অহংকার-জোগায় ঈমানী শক্তি।

শহীদে বালাকোট আওলাদে নাবী
শাহ সায়্যিদ ইরফানের নয়ণমণি তুমি
শাহ আব্দুল আযীজ দেহলভীর যোগ্য উত্তরসূরী
হৃদয় মাঝে ভেসে ওঠে-তোমারই স্মৃতি।

কত সুমহান তোমার ত্বরীকায়ে মুহাম্মাদী
বায়্যাতের মাধ্যমে নিয়েছো জিহাদের অঙ্গীকার তুমি
ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে জাগালে ভারতবাসী
তোমারই আযাদী আন্দোলন -আজ পেয়েছে বিশ্ব পরিচিতি।

ত্বরীকত তাসাউফ সুন্নাতের মহান হাদি
জীবন দিয়ে হক্ব প্রতিষ্ঠা করলে তুমি
এমন রাহবার আজ আর পাব কি?
বালাকোট প্রান্তরে-জ্বালিয়েছো ঈমানের বাঁতি।

ত্বরীকার ইমাম তোমার কথার করি স্মরণ
আধ্যাত্মিকতার মহা দূর্গ গড়েছিলে তুমি
ইলমে লাদুন্নীর ফয়েজে হয়েছিলে ফয়জাভী
প্রশংসনীয় তোমার-নিয়ম নীতি।

কামেল পীরের সোহবতে ধন্য কত জ্ঞানী
বানিয়েছো বহু মুজাহিদ সূফী অলী তুমি
শাহ নিজামপুরী, শাহ জৈনপুরী, শাহ লখনভী, শহীদ তিতুমীর আর ঝানঝানাবী
ভুলবো না কভু-মোরা তোমারই প্রীতি।

বালাকোট চেতনায় উজ্জীবিত বিশ্ববাসী
যুগের অন্যতম ইসলামী সংস্কারক তুমি
মানিকতলা, ফুরফুরা, বশিরহাট, গজারিয়ার তুমি দিশারী–
তোমার মাঝে খুঁজে পায় রুহানি জ্যোতি।

হিন্দুস্তান হতে মারিফতের নূর ছড়ালে হে বেরলভী
সদা দিও খাস নেগাহ তুমি
ছতুরা, ছারছীনা, দারুল আমান, সোনাকান্দা, ধামতী তোমার ভিখারী
বালাকোট দর্শনে আছে-বিশেষ শান্তি।

মুরিদের প্রিয় মুর্শিদ শহীদে বালাকোটী
মহান নিসবতে রেখে তুমি
দ্বারীয়াপুর, মাগুরা, সূফীয়া, ফান্দাউক, ফুলতলী, বদরপুর, ফরাযীকান্দী
তোমার প্রেমে থাকে যেন-দিবারাতি।

যতই করুক তোমার বদনাম হোক বিরোধী
সবসময় সিলসিলার আদর্শ তুমি
জবাব দিতে রুহানি সন্তানেরা প্রস্তুত আছি
মুজাদ্দিদে যামান তুমি-হাদীয়াতুছ্ ছালেকীনের উক্তি।

নেদায়ে ইসলাম, জমিয়েতে হিযবুল্লাহ, তালীমে হিযবুল্লাহ, আঞ্জুমানে আল-ইসালাহ এর জাগরণী
ঈমানী চেতনার প্রাণ পুরুষ দো'আ দিও তুমি
আকাবীরদের পথে মতে যেন জীবন দিতে পারি
মহতি এই নিবেদনে পেলাম মনের প্রশান্তি।

(সংক্ষেপ)

অভিন্ন নদীর স্রোত

মাসুক আহমেদ

যেখানে শেষ হয়েছিল কারবালা
বালাকোটের শুরুটা যেন সেখান থেকেই।

ফোরাত নদীর তীর থেকে শহীদের প্রবাহিত যে পবিত্র রক্তস্রোত-
সময়ের সিড়ি বেয়ে প্লাবিত করলো বালাকোট।

এভাবেই দেখো, বুকের তাঁজা রক্তের রং দিয়ে আমাদের আত্মজ পবিত্র পূর্ববর্তীগণ
রচনা করলেন ঈমানের ইতিহাস।

বদর। খন্দক। উহুদ। খাইবার। কারবালা। বালাকোট -
যেন কালের স্রোতে ভেসে চলা একটি নদীরই বিভিন্ন নাম।

নষ্টমনা পাপাত্মারা যতবার হিংস্র লোভার্ত কুদৃষ্টি দিয়েছে,
ততোবারই তুমি কি দেখোনি ঈমানের সেই নদীতে জ্যোতির্ময় জোয়ার?

দুরাচারী দুর্বৃত্ত আবু জেহেল, এযিদ শিমারের ভ্রূণজাত পৃথ্বীরাজ, গৌরগোবিন্দ,
রনজিৎ সিং কিংবা গাদ্দার মীরজাফর -
যেমনি বয়ে চলেছে ইবলিশের অহমের মূত্র,
দেখোনি কি, বিপরীতভাবে সত্যের প্রচ্ছন্ন হিমালয় থেকে সতত প্রবাহমান
পাকপ্রসবণ।

এই সত্য-মিথ্যা, হক্ব-বাতিল, তিমির-আলোর
সংঘাতময়তা চিরন্তন।

তাইতো ফারুকী ধমনী উত্তেজিত হয় সেরহিন্দে।
শুকিয়ে যায় কখনো আনা সাগর আজমীরে।
হুসাইনি শাহাদাতে লাল হয় কারবালা।

হাসানি রক্তের উত্তরাধিকারী
বেরেলীর বীর সায়্যিদ আহমাদ -
বালাকোটে পান করেন শাহাদাতের পেয়ালা।

সংগ্রহঃ অভিযাত্রিক

Dedicated Poem
Mo'min Khan Mo'min

(Some selective verses from poetic genius of Urdu Literature
Mo'min Khan Mo'min's famous poem, dedicated to
Saayid Ahmad Barelvi are following)

If Sayyid Ahmad Imam of the age and of the believers
Resolves to bring war to the irreligious infidels,
Why not write on the pages of the universe the year of battle,
The setting forth of the infidel-destroying Mahdi, with a musketlike

And again:

I rinse the essence of reflection with pure rose water
For I praise to the progeny of the dispenser of heavy water,
Who is he? Ahmad Imam of the world and of the people;
Follower of the Sunnat of the Prophet only.
Why ought not the earth challenge the sun's brightness,
Once his banner of glory casts its shadow here.
Such the grandcur of the keystone of the glorious castle
That a thousand times inferior appear the heights of the universe.
Since he has no occupation other the Jihad,
Whoseever opposes him is an infidel.
From his era the sun draws constant glory
For justice makes night and day equal.
That king, star of religion, has angels for soldiers
And the dust of his army is the light of the sun and the moon.
That fiery nature, destroyer of infidels, uprooter of idolaters
Whose footprint is similar to the sun on the day of judgement.
Like thunderbolt he strikes at sinners and polytheists,
Producing fiery spikes and sparking grains.
A cavalier riding a celestial steed, surrounded by stars;

Halo-like the sky his slave, the sun his servant.
The year of exit of the sovereign of the kingdom of the faithful;
The true Imam, the sign of Mahdi, The light of Ali.

Source : Kulliyat, cit., II, p. 107. Mo'min and the Mujahidin Movement, Amedeo Maiello, P.655